পথের পাঁচালী
অপরাজিত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা৭০০ ০৭৩

নতুন মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৩৬৮

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

অপু

প্রথম খণ্ড

পথের পাঁচালী

পিতৃদেবকে

বল্লালী বালাই

পথের পাঁচালী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ী। হরিহর সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ, পৈতৃক আমলের সামান্য জমিজমার আয় ও দু-চারি ঘর শিষ্য-সেবকের বার্ষিক প্রণামীর বন্দোবস্ত হইতে সাদাসিদাভাবে সংসার চালাইয়া থাকে।

পূর্ব দিন ছিল একাদশী। হরিহরের দূরসম্পর্কীয় দিদি ইন্দিরা ঠাকৃরুণ সকালবেলা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চালভাজার গুঁড়া জলখাবার খাইতেছে। হরিহরের ছয় বৎসরের মেয়েটি চুপ করিয়া পাশে বসিয়া আছে ও পাত্র হইতে তুলিবার পর হইতে মুখে পুরিবার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিমুঠা ভাজার গুঁড়ার গতি অত্যন্ত করুণভাবে লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ক্রমশূন্যায়মান কাঁসার জামবাটির দিকে হতাশভাবে চাহিতেছে। দু-একবার কি বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না। ইন্দির ঠাকৃরুণ মুঠার পর মুঠা উঠাইয়া পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া খুকীর দিকে চাহিয়া বলিল, ও মা তোর জন্যে দুটো রেখে দেলাম না?—ওই ঘ্যাখো।

মেয়েটি করুণ চোখে বলিল, তা হোক্ পিতি, তুই খা—

দুটো পাকা বড় বীচে-কলার একটা হইতে আধখানা ভাঙিয়া ইন্দির ঠাকৃরুণ তাহার হাতে দিল। এবার খুকীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল দেখাইল—সে পিসিমার হাত হইতে উপহার লইয়া মনোযোগের সহিত ধীরে ধীরে চুষিতে লাগিল।

ও ঘর হইতে তাহার মা ডাকিল, আবার ওখানে গিয়ে ধন্না দিয়ে বসে আছে? উঠে আয় ইদিকে!

ইন্দির ঠাকৃরুণ বলিল, থাক্ বৌ—আমার কাছে বসে আছে, ও কিছু করচে না। থাক্ বসে—

তবুও তাহার মা শাসনের সুরে বলিল, না, কেনই বা খাবার সময় ওরকম বসে থাকবে? ওসব আমি পছন্দ করি নে, চলে আয় বলছি উঠে—

খুকী ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল।

ইন্দির ঠাকৃরুণের সঙ্গে হরিহরের সম্পর্কটা বড় দূরের। মামার বাড়ীর সম্পর্কে কি রকমের বোন। হরিহর রায়ের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ী ছিল পাশের গ্রাম যশড়া-বিষ্ণুপুর। হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায় মহাশয় অল্পবয়সে প্রথমবার বিপত্নীক হইবার পরে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে দ্বিতীয় বার তাঁহার বিবাহ দিবার দিকে পিতৃদেবের কোন লক্ষ্যই নাই। বছরখানেক কোনরকমে চক্ষুলজ্জায় কাটাইয়া দেওয়ার পরও যখন পিতার সেদিকে কোন উদ্যম দেখা গেল না, তখন রামচাঁদ মরীয়া হইয়া প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে নানারূপ অস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। দুপুর বেলা কোথাও কিছু নাই, সহজ মানুষ রামচাঁদ আহারাদি করিয়া বিছানায় ছটফট করিতেছেন —কেহ নিকটে বসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিলে রামচাঁদ সুর ধরিতেন— তাঁহার আর কে আছে, কে-ই বা আর তাঁহাকে দেখিবে—এখন তাঁহার মাথা ধরিলেই বা কি—ইত্যাদি। ফলে এই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে রামচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয়, এবং বিবাহের অল্পদিন পরে পিতৃদেবের মৃত্যু হইলে যশড়া-বিষ্ণুপুরের বাস উঠাইয়া রামচাঁদ স্থায়ীভাবে এখানেই বসবাস সুরু করেন। ইহা তাঁহার অল্প বয়সের কথা—রামচাঁদ এ গ্রামে আসিবার পরে শ্বশুরের যত্নে টোলে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং কালে এ অঞ্চলের মধ্যে ভাল পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তবে কোন বিষয়কর্ম কোনদিন তিনি করেন নাই, করার উপযুক্ত তিনি ছিলেন কিনা, সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহের কারণ আছে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস তাঁহার স্ত্রী-পুত্র শ্বশুর বাড়ীতেই থাকিত। তিনি নিজে পাড়ার পতিরাম মুখুয্যের পাশার আড্ডায় অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দুইবেলা ভোজনের সময় শ্বশুরবাড়ী হাজির হইতেন মাত্র, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত— পণ্ডিতমশায়, বৌটা ছেলেটা আছে, আখেরটা তো দেখতে হবে? রামচাঁদ বলিতেন—কোন ভাবনা নেই ভায়া, ব্রজো চক্কোত্তির ধানের মরাই-এর তলা কুড়িয়ে খেলেও এখন ওদের দু-পুরুষ হেসে-খেলে কাটবে। পরে তিনি ছক্কা ও পুঞ্জুড়ির জোড় কি ভাবে মিলাইলে বিপক্ষের ঘর ভাঙিতে পারিবেন, তাহাই একমনে ভাবিতেন।

ব্রজ চক্রবর্তীর ধানের মরাই-এর নিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা যে কতটা বে-আন্দাজী ধরণের হইয়াছিল, তাহা শ্বশুরের মৃত্যুর পরে রামচাঁদের বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই। এ গ্রামে তাঁহার জমিজমাও ছিল না, নগদ টাকাও বিশেষ কিছু নয়। দুই চারিটি শিষ্য-সেবক এদিক-ওদিক জুটিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা কোন রকমে সংসার চালাইয়া পুত্রটিকে মানুষ করিতে থাকেন। তাঁহার পূর্বে তাঁহার এক জ্ঞাতি-ভ্রাতার বিবাহ তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতেই হয়।

তাহারও এইখানেই বাস করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারাও রামচাঁদের অনেক সাহায্য হইত। জ্ঞাতি-ভ্রাতার পুত্র নীলমণি রায় কমিসেরিয়েটে চাকরী করিতেন, কিন্তু কর্ম উপলক্ষ্যে তাঁহাকে বরাবর বিদেশে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি শেষকালে এখানকার বাস একরূপ উঠাইয়া বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া কর্মস্থলে চলিয়া যান। এখন তাঁহাদের ভিটাতে কেহ নাই।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাক্‌রুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে-এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক-আধ রাত্রি কাটাইয়া, পথের খরচ কৌলীন্য-সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে তল্‌পি-বাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাক্‌রুণ ভাল মনে করিতেই পারে না। বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর ভাই-এর আশ্রয়ে দু-মুঠা অন্ন পাইয়া আসিতেছিল, কপালক্রমে সেই ভাইও অল্প বয়সে মারা গেল। হরিহরের পিতা রামচাঁদ অল্প পরেই এ ভিটাতে বাড়ী তুলিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইন্দির ঠাক্‌রুণের এ সংসারে প্রথম প্রবেশ। সে সকল আজিকার কথা নহে।

তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে। শাঁখারীপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। চক্রবর্তীদের ফাঁকা মাঠে সীতানাথ মুখুয্যে নতুন কলমের বাগান বসাইল এবং সে সব গাছ আবার বুড়া হইতেও চলিল। কত ভিটায় নতুন গৃহস্থ বসিল, কত জনশূন্য হইয়া গেল, কত গোলোক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কাল-প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জনসন্ টম্‌সন্ সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।

শুধু ইন্দির ঠাক্‌রুণ এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপ্‌-ছিপে চেহারার হাস্যমুখী তরুণী নহে, পচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা, গাল তোব্‌ড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, দূরের জিনিস আগের মত চোখে ঠাহর হয় না, হাত তুলিয়া যেন রৌদ্রের ঝাঁজ হইতে বাঁচাইবার ভঙ্গিতে চোখ ঢাকিয়া বলে, কে আসে? নবীন? বেহারী? না, ও, তুমি রাজু।

এই ভিটারই কি কম পরিবর্তনটা ইন্দির ঠাক্‌রুণের চোখের উপর ঘটিয়া গেল! ঐ ব্রজ চক্রবর্তীর যে ভিটা আজকাল জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে, কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে পাত পাড়িত। বড় চণ্ডীমণ্ডপে কি পাশার আড্ডাটাই বসিত সকালে বিকালে! তখন কি ছিল ঐ

রকম বাঁশবন! পৌষপার্বণের দিন ওই ঢেঁকীশালে একমণ চাল কোটা হইত পৌষ-পিঠার জন্য—চোখ বুজিয়া ভাবিলেই ইন্দির ঠাকুরুণ সে সব এখনও দেখিতে পায় যে! ঐ রায়বাড়ীর মেজবৌ লোকজন সঙ্গে করিয়া চাল কুটাইতে আসিয়াছেন, ঢেঁকীতে দমাদম পাড পড়িতেছে, সোনার বাউটি রাঙা-হাতে একবার সামনে সরিয়া আসিতেছে আবার পিছাইয়া যাইতেছে, জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, তেমনি স্বভাবচরিত্র। নতুন যখন ইন্দির ঠাকুরুণ বিধবা হইল, তখন প্রতি দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে নিজের হাতে জলখাবার গোছাইয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয় যাইতেন। কোথায় গেল কে! সেকালের আর কেহ বাঁচিয়া নাই যার সঙ্গে সুখদুঃখের দুটো কথা কয়।

তারপর এ সংসারে আশ্রয়দাতা রামচাঁদ মারা গেলেন, তাঁর ছেলে হরিহর তো হইল সেদিন। ঘাটের পথে লাফাইয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইত, মুখুয্যেদের তেঁতুল গাছে ডাঁশা তেঁতুল খাইতে গিয়া পড়িয়া হাত ভাঙিয়া দুই-তিন মাস শয্যাগত ছিল; সেদিনের কথা। ধুমধাম করিয়া অল্প বয়সে তাহার বিবাহ হইল—পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসরের নববিবাহিতা পত্নীকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া দেশছাড়া হইয়া গেল। আট দশ বছর প্রায় কোন খোঁজ-খবর ছিল না—কালেভদ্রে এক-আধখানা চিঠি দিত, কখনো কখনো দু'পাঁচ টাকা বুড়ীর নামে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইত। এই বাড়ী আগুলিয়া কত কষ্টে কতদিন না খাইয়া, প্রতিবেশীর দুয়ারে চাহিয়া চিন্তিয়া তাহার দিন গিয়াছে।

অনেকদিন পরে হরিহর আজ ছয় সাত বৎসর আসিয়া ঘর সংসাব পাতিয়াছে, তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে—সেও প্রায় ছয় বৎসরেরটি হইতে চলিল। বুড়ী ভাবিয়াছিল এতদিনে সেই ছেলেবেলার ঘর-সংসার আবার বজায় হইল। তাহার সঙ্কীর্ণ জীবনে সে অন্য সুখ চাহে নাই, অন্য প্রকার সুখদুঃখের ধারণাও সে করিতে অক্ষম—আশৈশব-অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পুরাতন পথে যদি গতির মোড়টা ঘুরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সে খুশী, তাহার কাছে সেটাই চরম সুখের কাহিনী।

হরিহরের ছোট্ট মেয়েটাকে সে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারে না—তাহার নিজেরও এক মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার বিশ্বেশ্বরী। অল্প বয়সেই বিবাহ হয় এবং বিবাহের অল্প পরেই মারা যায়। হরিহরের মেয়ের মধ্যে বিশ্বেশ্বরী মৃত্যুপারের দেশ হইতে চল্লিশ বছর পরে তাহার অনাথা মায়ের কোলে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। চল্লিশ বছরের নিভিয়া-যাওয়া ঘুমন্ত মাতৃত্ব মেয়েটার মুখের বিপন্ন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অবোধ চোখের হাসিতে—একমুহূর্তে সচকিত আগ্রহে, শেষ-হইতে-চলা জীবনের ব্যাকুল ক্ষুধায় জাগিয়া উঠে।

কিন্তু যাহা সে ভাবিয়াছিল তাহা হয় নাই। হরিহরের বৌ দেখিতে টুক্‌টুকে সুন্দরী হইলে কি হইবে, ভারী ঝগড়াটে, তাহাকে তো দুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, কি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজিয়া মেলে না, বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছে!

সে খুঁটিনাটি লইয়া বুড়ীর সঙ্গে দু'বেলা ঝগড়া বাধায়। অনেকটা ঝগড়া চলিবার পর বুড়ী নিজস্ব একটি পিতলের ঘটী কাঁখে ও ডান হাতে একটা কাপড়ের পুঁটুলি ঝুলাইয়া বলিত—চল্লাম নতুন বৌ, আর যদি কখনো এ বাড়ীর মাটি মাড়াই, তবে আমার—। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া বুড়ী মনের দুঃখে বাঁশবাগানে সারাদিন বসিয়া কাটাইত। বৈকালের দিকে সন্ধান পাইয়া হরিহরের ছোট্ট মেয়েটা তাহার কাছে গিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিত—ওঠ্ পিতিমা, মাকে বল্‌বো আল্ তোকে বক্‌বে না, আয় পিতিমা। তাহার হাত ধরিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বুড়ী বাড়ী ফিরিত। সর্বজয়া মুখ ফিরাইয়া বলিত, ঐ এলেন! যাবেন আর কোথায়! যাবার কি আর চুলো আছে এই ছাড়া?—তেজটুকু আছে এদিকে ষোল আনা।

এ রকম উহারা বাড়ী আসার বৎসর-খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে—বহুবার হইয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই হয়।

হরিহরের পুবের ভিটায় খড়ের ঘরখানা অনেকদিন বে-মেরামতি অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই ঘরটাতে বুড়ী থাকে। একটা বাঁশের আল্‌নায় খান-দুই ময়লা ছেঁড়া থান। ছেঁড়া জায়গাটার দুই প্রান্ত একসঙ্গে করিয়া গেরো বাঁধা। বুড়ী আজকাল ছুঁচে সুতা পরাইতে পারে না বলিয়া কাপড় সেলাই করিবার সুবিধা নাই, বেশী ছিঁড়িয়া গেলে গেরো বাঁধে। একপাশে একখানা ছেঁড়া মাদুর ও কতকগুলি ছেঁড়া কাঁথা। একটা পুঁটুলিতে রাজ্যের ছেঁড়া কাপড় বাঁধা। মনে হয় কাঁথা বুনিবার উপকরণ স্বরূপ সেগুলি বহুদিন হইতে সযত্নে সঞ্চিত আছে, কখনও দরকার হয় নাই, বর্তমানে দরকার হইলেও কাঁথা বুনিবার মত চোখের তেজ আর তাহার নাই। তবুও সেগুলি পরম যত্নে তোলা থাকে, ভাদ্রমাসে বর্ষার পর রৌদ্র ফুটিলে বুড়ী সেগুলো খুলিয়া মাঝে মাঝে উঠানে রৌদ্রে দেয়। বেতের পেঁটরাটার মধ্যে একটা পুঁটুলি বাঁধা কতকগুলো ছেঁড়া লালপাড় শাড়ী—সেগুলি তাহার মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর; একটা পিতলের চাদরের ঘটী, একটা মাটির ছোবা, গোটা দুই মাটির ভাঁড়। পিতলের ঘটীতে চালভাজা ভরা থাকে, রাত্রে হামানদিস্তা দিয়া গুঁড়া করিয়া তাই মাঝে মাঝে খায়। মাটির ভাঁড়গুলার কোনটাতে একটুখানি তেল, কোনটাতে একটু নুন, কোনটাতে সামান্য একটু খেজুরের গুড়। সর্বজয়ার কাছে চাহিলে সব সময়

মেলে না বলিয়া বুড়ী সংসার হইতে লুকাইয়া আনিয়া সেগুলি বিবাহের বেতের পেঁটরার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়।

সর্বজয়া এ ঘরে আসে ক্বচিৎ কালেভদ্রে কখনো। কিন্তু সন্ধ্যার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ এ গল্প ও গল্প শুনিবার পর খুকী বলে—পিতি, সেই ডাকাতের গপ্পটা বল্ তো। গ্রামের একঘর গৃহস্থবাড়ীতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকী ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাক্‌রুণের মুখস্থ ছিল। অল্পবয়সে ঘাটে পথে সমবয়সী সঙ্গিনীদের কাছে ছড়া মুখস্থ বলিয়া তখনকার দিনে ইন্দির ঠাক্‌রুণ কত প্রশংসা আদায় করিয়াছে। তাহার পর অনেকদিন সে এরকম ধৈর্যশীল শ্রোতা পায় নাই, পাছে মরিচা পড়িয়া যায়, এইজন্য তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার শানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুন্‌সে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে—

এই পর্যত বলিয়া সে হাসি-হাসি মুখে প্রতীক্ষার দৃষ্টিতে ভাইঝির দিকে চাহিয়া থাকে। খুকী উৎসাহের সঙ্গে বলে—চুলোবাঁধা এক—মিন্‌সে।—'মি' অক্ষরটার উপর অকারণ জোর দিয়া ছোট্ট মাথাটি সামনে তাল রাখিবার ভাবে ঝুঁকাইয়া পদটার উচ্চারণ শেষ করে। ভারি আমোদ লাগে খুকীর।

তাহার পিসি ভাইঝিকে ঠকাইবার চেষ্টায় এমন সব ছড়া আবৃত্তি করে ও পাদপূরণের জন্য ছাড়িয়া দেয়, যাহা হয়তো দশ পনেরো দিন বলা হয় নাই—কিন্তু খুকী ঠিক মনে রাখে, তাহাকে ঠকানো কঠিন।

খানিক রাত্রে তাহার মা খাইতে ডাকিলে সে উঠিয়া যায়।

হরিহর রায়ের আদি বাসস্থান যশড়া-বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধনী-বংশ চৌধুরীরা নিষ্কর ভূমিদান করিয়া যে কয়েকঘর ব্রাহ্মণকে সেকালে গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন, হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায় তাহাদের মধ্যে একজন।

বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথ সকল ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্‌দী, বাউড়ী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান,—লাঠি এবং সড়কী চালানোতে সুনিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা দিয়া দূর পল্লীতে গৃহস্থ-বাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে অনেক সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতেন। বাংলা দেশে বহু জমিদার ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের অর্থের মূলভিত্তি যে এই পূর্বপুরুষসঞ্চিত লুণ্ঠিত ধনরত্ন, যাঁহারই প্রাচীন বাংলার কথা জানেন, তাঁহারা ইহাও জানেন।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এইরূপ অখ্যাতি ছিল। তাঁহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙার মাঠের মধ্যে, ঠাকুরঝি পুকুর নামক সেকালকার এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত। ঠ্যাঙাড়েদের কার্যপ্রণালী ছিল অদ্ভুত ধরণের। পথ-চলতি লোকের মাথায় লাঠির আঘাত করিয়া আগেই তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তবে তাহারা তাহার কাছে অর্থান্বেষণ করিত—মারিয়া ফেলিবার পর এরূপ ঘটনাও বিচিত্র ছিল না যে, দেখা গেল নিহত ব্যক্তির কাছে সিকি পয়সাও নাই। পুকুরের মধ্যে লাস গুঁজিয়া রাখিয়া ঠ্যাঙাড়েরা পরবর্তী শিকারের উপর দিয়া এ বৃথা শ্রমটুকু পোষাইয়া লইবার আশায় নিরীহমুখে পুকুরপাড়ের গাছতলায় ফিরিয়া যাইত। গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে সেই বটগাছ আজও আছে, সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চোদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষাদের লাঙলের ফালে সেই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠিয়া থাকে।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের ওদিকে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থসংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিষপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারে চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা দুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির

হইয়া পড়িলেন, ইচ্ছা রহিল যে সম্মুখে পাঁচক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জ বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু আন্দাজ করিতে কিরূপ ভুল হইয়াছিল—কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জের বাজারে পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে সূর্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরঝি পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথমে ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন, ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ অপরে বালক,—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়-পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা আসিয়া শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্রের জীবনদান—বংশের একমাত্র পুত্র—পিণ্ডলোপ ইত্যাদি। ঘটনাক্রমে বীরু রায়ও নাকি সেদিনের দলের মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাঁহার হাতে-পায়ে পড়িয়া অন্তত পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়ে দলের অন্যরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত রাতে ঠাকুরঝি পুকুরের জলে টোকাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিলেন।

এই ঘটনার বেশী দিন পরে নয়, ঠিক পর বৎসর পূজার সময়। বাঙ্গলা ১২৩৮ সাল। বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার খাইয়া তবে আসিয়া দক্ষিণ শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন-চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম।

সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়ীতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রিতে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া সকলে দেশের দিকে রওনা হইলেন। দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে ধলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহনায় একঠা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের জোগাড় হইতে

লাগিল। বড চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই। একস্থানে মাঝিরা ও অন্যস্থানে বীরু রায়ের স্ত্রী রন্ধন চড়াইয়াছিলেন। সকলেরই মন প্রফুল্ল, দুইদিন পরেই দেশে পৌছানো যাইবে। বিশেষতঃ পূজা নিকটে, সে আনন্দ তো আছেই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্ চক্ করিতেছিল। হু-হু হওয়ায় চরের কাশফুলের রাশি আকাশ, জ্যোৎস্না, মোহনাব জল একাকাব কবিযা উডিতেছিল। হঠাৎ কিসেব শব্দ শুনিয়া দু একজন মাঝি রন্ধন ছাডিয়া উঠিয়া দাঁডাইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আডালে যেন একটা হুটপাট্ শব্দ, একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়াই তখনি থামিয়া যাইবার শব্দ। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবাব জন্য কাশঝোপেব আডালটা পার হইতে না হইতে কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চব হইতে জলে গিয়া ডুব দিল। চরের সেদিকটা জনহীন—কিছুই কাহারও চোখে পডিল না।

কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিলেন, তাঁহার চাকর আসিল। বীরু বায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল বন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেডাইতে বাহির হইয়াছে। দাঁডি-মাঝিদেব মুখ শুকাইয়া গেল, এদেশের নোনা গাঙ সমূহেব অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল কাশবনের আডালে বালির চরে বৃহৎ কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়া ছিল—ডাঙা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝনদীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল—তাহার পর কান্নাকাটি, হাত-পা ছোঁডাছুঁডি। গত বৎসর দেশের ঠাকুরঝি পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন। মূর্খ বীরু রায় ঠেকিয়া শিখিলেন যে, সে অদৃশ্য ধর্মাধিকরণের দণ্ডকে ঠাকুরঝি পুকুরের শ্যামাঘাসের দামে প্রতারিত করিতে পারে না, অন্ধকারেও তাহা আপন পথ চিনিয়া লয়।

বাড়ী আসিয়া বীরু রায় আর বেশী দিন বাঁচেন নাই। এইরূপে তাঁহার বংশে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। নিজের বংশ লোপ পাইলেও তাঁহার ভাইয়ের বংশাবলী ছিল। কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না,

সাবালক হইবার পূর্বেই কোন-না-কোন রোগে মারা যাইত। সকলে বলিল, বংশে ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহর রায়ের মাতা তারকেশ্বর দর্শনে গিয়া এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদাকাটা করিয়া একটি মাদুলি পান। মাদুলির গুণেই হৌক, বা ব্রহ্মশাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়ার ফলেই হৌক, এত বয়সেও হরিহর আজও বাঁচিয়া আছে।

দিনকতক পরে।

খুকী সন্ধ্যার পর শুইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীতে তাহার পিসিমা নাই, অন্য দুই মাসের উপর হইল একদিন তাহার মায়ের সঙ্গে কি ঝগড়া-ঝাটি হওয়ার পর রাগ করিয়া দূর গ্রামে কোন্ এক আত্মীয়বাড়ীতে গিয়া আছে। মায়েরও শরীর ওতদিন বড অপটু ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিবারও কোন লোক নাই। সম্প্রতি মা কাল হইতে আতুড ঘরে ঢোকা পর্যন্ত সে কখন খায় কখন শোয় তাহা কেহ বড দেখে না।

খুকী শুইয়া শুইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম না আসিল ততক্ষণ পিসিমার জন্য কাঁদিল। রোজ রাত্রে সে কাঁদে। তাহার পর খানিক রাত্রে কাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, কুড়ুনীর মা দাই রান্নাঘরের ছেঁচতলায় দাঁডাইয়া কথা বলিতেছে, পাডার নেডাব ঠাকুরমা, আরও কে কে উপস্থিত আছেন। সকলেই যেন ব্যস্ত উদ্বিগ্ন। খানিকটা জাগিয়া থাকিয়া আবার শুইয়া পডিল।

বাঁশবনে হাওয়া লাগিয়া শির্‌শির্ শব্দ হইতেছে, আঁতুড ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও কাহারা কথাবার্তা কহিতেছে। দাওয়ায় জ্যোৎস্না পডিয়াছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু পরে সে ঘুমাইয়া পডিল। খানিক রাত্রে ঘুমেব ঘোরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ও গোলমাল শুনিয়া আবার তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার বাবা ঘর হইতে বাহির হইয়া আতুড ঘরের দিকে দৌডাইয়া ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে যাইতেছে—কেমন আছে খুড়ী? কি হয়েছে? আঁতুড ঘরের ভিতর হইতে কেমন ধরণের গলার আওয়াজ সে শুনিতে পাইল। গলার আওয়াজটা তাহার মায়ের। অন্ধকারের মধ্যে ঘুমের ঘোরে সে কিছু বুঝিতে

না পারিয়া চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতেছিল। মা ও-রকম করিতেছে কেন? কি হইয়াছে মায়ের?

সে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে সে জানে না—কোথায় যেন বিড়াল ছানার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চট্ করিয়া তাহার মনে পড়িল পিসিমার ঘরের দাওয়ায় ভাঙা উনুনের মধ্যে মেনী বিড়ালের ছানাগুলা সে বৈকালবেলা লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে—ছোট তুলতুলে ছানা কয়টি, এখনও চোখ ফুটে নাই। ভাবিল—ঐ যাঃ—ওদের হুলো বেড়ালটা এসে বাচ্চাগুলোকে সব খেয়ে ফেললে···ঠিক।

ঘুমচোখে উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারের মধ্যে পিসিমার দাওয়ায় গিয়া উনুনের মধ্যে হাত পুরিয়া দেখিল বাচ্চা কয়টি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। হুলো বেড়ালের কোন চিহ্ন নাই কোনও দিকে। পরে সে অবাক হইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল এবং একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমেব ঘোরে আবার কিন্তু কোথায় বিড়ালছানা ডাকিতেছিল।

পবদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কুড়ুনীর মা দাই বলিল, ও খুকী, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েছে দেখবা না?···ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল—কোথায় ছিলে তুমি? যা কাণ্ড হয়েলো, কালপুরের পীরের দরগায় সিন্নি দেবানে—বড়ডো রক্ষে করেছেন রাত্তিরে।

খুকী এক দৌড়ে ছুটিয়া আঁতুড় ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট, প্রায় একটা কাচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভাল দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিট্‌মিট্ করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাতদুটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বলভাবে ঈষৎ ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণ পরে খুকী বুঝিল রাত্রিতে বিড়ালছানার ডাক বলিয়া যাহা মনে করিয়াছিল তাহা কি? অবিকল বিড়ালছানার ডাক—দূর হইতে শুনিলে কিছু বুঝিবার জো নাই। হঠাৎ অসহায়, অসম্ভব রকমের ছোট নিতান্ত ক্ষুদে ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নেড়ার ঠাকুরমা ও কুড়ুনীর মা দাই বারণ করাতে সে ইচ্ছাসত্ত্বেও আঁতুর ঘরে ঢুকিতে পারিল না।

মা আঁতুড় হইতে বাহির হইলে খোকার ছোট দোলাতে দোল দিতে দিতে খুকী কত কি ছড়া গান করে। সঙ্গে সঙ্গে কত সন্ধ্যাদিনের কথা, পিসিমার

কথা মনে আসিয়া তাহার চোখ জলে ভিজিয়া যায়। এই রকম কত ছড়া যে পিসিমা বলিত! খোকা দেখিতে পাড়ার লোক ভাঙিয়া আসে। সকলে দেখিয়া বলে, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে, কি মাথার চুল, কি রং! বলাবলি করিতে করিতে যায়—কি হাসি দেখেচ ন-দি?

খুকী কেবল ভাবে, তাহার পিসিমা একবার যদি আসিয়া দেখিত! সবাই দেখিতেছে, আর তাদের পিসিমাই কোথায় গেল চলিয়া—আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না? সে ছেলেমানুষ হইলেও একটু বুঝিয়াছে যে, এ বাড়িতে বাবা কি মা কেহই পিসিমাকে ভালবাসে না, তাহাকে আনিবার জন্য কেহ গা করিবে না। দিনমানে পিসির ঘরের দিকে চাহিলে মন কেমন করে, ঘরের কবাটটা এক একদিন খোলাই পড়িয়া থাকে। দাওয়ায় চামচিকার নাদি জমিয়াছে। উঠানে সে রকম আর ঝাট পড়ে না, এখানে শেওড়ার চারা, ওখানে কচু গাছ—পিসিমা বুঝি হইতে দিত। খুকীর বড় বড় চোখ জলে ভরিয়া যায় - -সেই ছড়া, সেই সব গল্প খুকী কি করিয়া ভোলে?

সেদিন হরি পালিতের মেয়ে আসিয়া তাহার মাকে বলিল, তোমাদের বুড়ী ঘাটের পথে দেখি মাঠের দিক থেকে একটা ঘটি আর পুঁটুলি হাতে করে আসছে—এসে চকোত্তি মশায়দের বাড়িতে ঢুকে বসে আছে, যাও দুগ্‌গাকে পাঠিয়ে দাও, হাত ধরে ডেকে আনুক, তাহ'লে রাগ পড়বে এখন—

হরি পালিতের বাড়ী বসিয়া বুড়ী তখন পাড়ার মেয়েদের মুখে হরিহরের ছেলে হওয়ার গল্প শুনিতেছিল।

ও পিতি!

বুড়ী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্গা হাঁপাইতেছে, যেন অত্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। বুড়ী ব্যগ্রভাবে দুর্গাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল—সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ঝাঁপাইয়া বুড়ীর কোলে পড়িল—তাহার মুখে হাসি অথচ চোখে জল—উঠানে ঝি-বউ যাহারা উপস্থিত ছিলেন, অনেকের চোখে জল আসিল। প্রবীণা হরিপালিতের স্ত্রী বলিলেন—নেও ঠাকুরঝি, ও তোমার আর জন্মে মেয়ে ছিল, সেই মেয়েই তোমার আবার ফিরে এসেছে—

বাড়ি আসিলে খোকাকে দেখিয়া তো বুড়ী হাসিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কতদিন পরে ভিটায় আবার চাঁদ উঠিয়াছে।

বুড়ী সকালে উঠিয়া মহা খুশিতে ভিতর উঠানে ঝাঁট দেয়, আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করে। দুর্গার মনে হয় এতদিনে আবার সংসারটা যেন ঠিকমত চলিতেছে, এতদিন যেন কেমন ঠিক ছিল না।

দুপুরে আহার করিয়া বুড়ী খিড়কীর পিছনে বাঁশবনের পথের উপর বসিয়া কঞ্চি কাটে। সেদিকে আর নদীর ধার পর্যন্ত লোকজনের বাস নাই, নদী অবশ্য খুব নিকটে নয়, প্রায় একপোয়া পথ—এই সমস্তটা শুধু বড় বড় আম-বাগান ও ঝুপসি বাঁশবন ও অনান্য জঙ্গল। কঞ্চি কাটার সময় দুর্গা আসিয়া কাছে বসে, আবোল-তাবোল বকে। ছোট এক বোঝা কাটা কঞ্চি জড়ো হইলে দুর্গা সেগুলি বহিয়া বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া আসে। কঞ্চি কাটিতে কাটিতে মধ্যাহ্নের অলস আমেজে শীতল বাঁশবনেব ছায়ায় বুড়ীর নানা কথা মনে আসে।

সেই কতকাল আগেকাব কথা সব!

সেই তিনি বার-তিনেক আসিয়াছিলেন—স্বপ্নেব মত মনে পড়ে। একবার তিনি পুঁটুলির মধ্যে কি খাবার আনিয়াছিলেন। বিশ্বশ্বরী তখন দুই বৎসরের। সকলে বলিল, ওলা—চিনিব ডেলাব মত। ঘটীর জলে গুলিয়া সেও একটু খাইয়াছিল। সেই একজন লোক আসিল—পুরানো সেই পেয়ারা গাছটাব কাছে ঠিক সন্ধ্যার সময় আসিয়া দাঁড়াইল, শ্বশুরবাড়ীর দেশ হইতে আসিয়াছে, একখানা চিঠি। চিঠি পড়িবার লোক নাই, ভাই গোলোকেও পূর্ব বৎসর মারা গিয়াছে—ব্রজ কাকার চণ্ডীমণ্ডপে পাশার আড্ডায় সে নিজের পত্তরখানা লইয়া গেল। সেদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে হয়—ন জ্যেঠা, মেজ জ্যেঠা, ব্রজ কাকা, ও-পাড়ার পতিত রায়ের ভাই যদু রায়, আর ছিল গোলোকের সম্বন্ধী ভজহরি। পত্তর পড়িলেন সেজ জ্যেঠা। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে আনলে এ চিঠি রে ইন্দির? তাহার পব ইন্দির ঠাকুরুণকে বাড়ী আসিয়া তখনই হাতের নোয়া ও প্রথম যৌবনের সাধের জিনিস বাপ-মায়ের দেওয়া রূপার পৈঁছেজোড়া খুলিয়া রাখিয়া কপালের সিন্দুর মুছিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিতে হইল। কত কালেব কথা—সে সব স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, তবু যেন মনে হয় সেদিনের!

নিবারণের কথা মনে হয়—নিবারণ, নিবারণ। ব্রজ কাকার ছেলে নিবারণ। ষোল বৎসরের বালক, কি টকটকে গায়ের রং, কি চুল! ঐ যে চণ্ডীমণ্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জ্বররোগে শয্যাগত হইয়া যায়-যায় হইয়াও দুই-তিন রহিল। আহা, বালক সর্বদা জল জল করিত, কিন্তু ইশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন—মৌরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুষানো হইতেছিল। নিবারণ চতুর্থ দিন রাত্রে মারা গেল; মৃত্যুর একটু আগেও সেই জল জল তার মুখে বুলি—তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই। সেই ছেলে মারা যাওয়ার পর পাঁচদিনের মধ্যে বড় খুড়ীর মুখে কেউ জল দেওয়াইতে পারে নাই—পাঁচদিনের

পর ভাসুর রামচাঁদ চক্কোত্তি নিজে ভ্রাতৃবধূর ঘরে গিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, তুই চলে গেলে আমার কি দশা হবে? এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাব মা? বড় খুড়ী বনিয়াদী ধনী ঘরের মেয়ে ছিলেন—জগদ্ধাত্রীর মত রূপ, অমন রূপসী বধূ এ অঞ্চলে ছিল না। স্বামীর পাদোদক না খাইয়া কখনও জল খান নাই—সেকালের গৃহিণী, রন্ধন করিয়া আত্মীয় পরিজনকে খাওয়াইয়া নিজে তৃতীয় প্রহরে সামান্য আহার করিতেন। দান-ধ্যানে, অন্নবিতরণে ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। লোককে বাঁধিয়া খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। তাই ভাসুরের কথায় মনের কোন কোমল স্থানে বুঝি ঘা লাগিল। তাহার পর তিনি উঠিয়াছিলেন ও জলগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু বেশীদিন বাঁচেন নাই, পুত্রের মৃত্যুর দেড় বৎসরের মধ্যেই তিনিও, পুত্রের অনুসরণ করেন।

একটু জল দে মা—এতটুকু দে—

জল খেতে নেই, ছিঃ বাবা—কবরেজ মশায় যে বারণ করেচেন—জল খায় না—

এতটুকু দে—এক ঢোঁক খাই মা—পায়ে পড়ি

দুপুরের পাখ্‌পাখালির ডাকে সুদূর পঞ্চাশ বছরের পার হইতে বাঁশের মর্ মর্ শব্দ কানে ভাসিয়া আসে।

খুকী বলে—পিতি, তোর ঘুম লেগেচে? আয় শুবি চল্।

হাতের দা-খানা রাখিয়া বুড়ী বলে—ওই দ্যাখো, আবার পোড়া ঝিমুনি ধরেচে—অবেলায় এখন আর শোবো না মা—এইগুলো সাঙ্গ করে রাখি—নিয়ে আয় দিনি ঐ বড় আগালেড়া?

খোকা প্রায় দশ মাসের হইল। দেখিতে রোগা-রোগা গড়ন, অসম্ভব রকমের ছোট্ট মুখখানি। নীচের মাড়িতে মাত্র দু'খানি দাঁত উঠিয়াছে। কারণে অকারণে যখন-তখন সে সেই দু'খানি মাত্র দুধে দাঁতওয়ালা মাড়ি বাহির করিয়া হাসে। লোকে বলে—বৌমা, তোমার খোকার হাসিটি বায়না করা। খোকাকে একটুখানি ধরাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, আপনা হইতে পাগলের মত এত হাসি সুরু করিবে যে, তাহার মা বলে—আচ্ছা খোকন আজ থামো, বড্ড হেসেচো, আজ বড্ড হেসেচো—আবার কালকের জন্যে একটু রেখে দাও।

মাত্র দুইটি কথা সে বলিতে শিখিয়াছে। মনে সুখ থাকিলে মুখে বলে জে—জে—জে—জে এবং দুধে-দাঁত বাহির করিয়া হসে। মনে দুঃখ হইলে বলে, না—না—না—না ও বিশ্রী রকমের চীৎকার করিয়া কাঁদিতে সুরু করে। যাহা সামনে পায়, তাহারই উপর ঐ নতুন দাঁত দু'খানির জোর পরখ করিয়া দেখে—মাটির ঢেলা, এক টুকবা কাঠ, মায়ের আঁচল; দুধ খাওয়াইতে বসিলে এক এক সময় সে হঠাৎ কাঁসার ঝিনুক-খানাকে মহা আনন্দে নতুন দাঁত দু'খানি দিয়া জোরে কামড়াইয়া ধরে। তাহার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলে—ওকি, হাঁরে ও খোকা, ঝিনুকখানাকে কামড়ে ধল্লি কেন?—ছাড় ছাড়—ওরে করিস কি—দু'খানা দাঁত তো তোব মোটে সম্বল—ভেঙ্গে গেলে তখন হাস্‌বি কি করে শুনি? খোকা তবু ছাড়ে না। তাহার মা মুখের ভিতর আঙুল দিয়া অতিকষ্টে ঝিনুকখানাকে ছাড়াইয়া লয়।

খুকীব উপব সব সময় নির্ভর করিয়া থাকা যায় না বলিয়া রান্নাঘরের দাওয়া খানিকটা উঁচু করিয়া বাঁশের বাখাবি দিয়া ঘিরিয়া তাহাব মধ্যে খোকাকে বসাইয়া বাখিয়া তাহাব মা নিজের কাজ করে। খোকা কাটরার মধ্যে শুনানি-হওয়া ফৌজদাবী মামলার আসামীব মত আটক থাকিয়া কখনো আপন মনে হাসে, অদৃশ্য শ্রোতাগণের নিকট দুবোধ্য ভাষায় কি বকে, কখনো বাখারির বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাঁশবনেব দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার মা ঘাট হইতে স্নান কবিয়া আসিলে—মায়েব ভিজে কাপড়ের শব্দ পাইতেই খোকা খেলা হইতে মুখ তুলিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে থাকে ও মাকে দেখিতে পাইয়া এক মুখ হাসিয়া বাখাবির বেড়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। তার মা বলে—একি, ওমা, এই কাজল পরিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে গেলাম, একেবারে হাঁড়ীচাঁচা পাখী সেজে বসে আছে? দেখি, এদিকে আয়। জোর করিয়া নাকমুখ রগড়াইয়া কাজল উঠাইতে গিয়া খোকার রাঙ্গা মুখ একেবারে সিঁদুর হইয়া যায়—মহা আপত্তি করিয়া রাগের সহিত বলে জে—জে—জে—জে, তাহার মা শোনে না।

ইহার পর মায়ের হাতে গামছা দেখিলেই খোকা থল্‌বল্ করিয়া হামাগুড়ি দিয়া একদিকে ছুটিয়া পলাইতে যায়। এক একদিন ঘাট হইতে আসিয়া সর্বজয়া বলে—খোকন বলে টু—উ—উ? দোলো তো খোকা? দোলে দোলে খোকন দোলে—! খোকা অমনি বসিয়া পড়িয়া সামনে পিছনে বেজায় দুলিতে থাকে ও মনের সুখে ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া গান ধরে—

(গীত)

জে—এ—এ—জে—জে—জে—এ—এ—ই
জে—জে—জে—জে—এ
জে—জে—জে—জে—জে···জে—

তার মা বলে, আচ্ছা থামো, আর তুলো না খোকা, হয়েচে, হয়েচে, খুব হয়েচে। কখনো কখনো কাজ করিতে করিতে সর্বজয়া কান পাতিয়া শুনিত, খোকার বেড়ার ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিতেছে না—যেন সে চুপ করিয়া গিয়াছে! তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিত—শেয়ালে নিয়ে গেল না তো? সে ছুটিয়া আসিয়া দেখিত খোকা সাজি-উপুড-করা এক রাশ চাঁপা ফুলের মত মাটির উপর বে-কায়দায় ছোট্ট হাতখানি রাখিয়া কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চারিদিক হইতে নাল্‌সে পিঁপড়ে, মাছি ও সুড়সুড়ি পিঁপড়ের দল মহালোভে ছুটিয়া আসিতেছে, খোকার পাতলা পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটা ঘুমের ঘোরে যেন একটু একটু কাঁপিতেছে, ঘুমের ঘোরে সে যেন মাঝে মাঝে ঢোক গিলিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতেছে—যেন জাগিয়া উঠিল, আবার তখনই এমন ঘুমাইয়া পড়িতেছে যে নিঃশ্বাসের শব্দটিও পাওয়া যাইতেছে না।

সকাল হইতে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহাদের বাঁশ-বাগানের ধারে নির্জন বাড়ীখানি দশ মাসের শিশুর অর্থহীন আনন্দ-গীতি ও অবোধ কলহাস্যে মুখরিত থাকে।

মা ছেলেকে স্নেহ দিয়া মানুষ করিয়া তোলে, যুগে যুগে মায়ের গৌরব-গাথা তাই সকল জনমনেব বার্তায় ব্যক্ত। কিন্তু শিশু যা মাকে দেয়, তাই কি কম? সে নিঃস্ব আসে বটে, কিন্তু তার মন-কাড়িয়া-লওয়া-হাসি, শৈশবতারল্য, চাঁদ-ছানিয়া-গড়া মুখ, আধ-আধ আবোল-তাবোল বকুনির দাম কে দেয়? ওই তার ঐশ্বর্য, ওবই বদলে সে সেবা নেয়, রিক্ত হাতে ভিক্ষুকের মত নেয় না।

এক একদিন যখন হরিহব বাজারের হিসাব কি নিজের লেখা লইয়া ব্যস্ত আছে—সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া গিয়া বলে, ওগো, ছেলেটাকে একটু ধরো না? মেয়েটা কোথায় বেরিয়েচে—ঠাকুরঝি গিয়েচে ঘাটে—ধর দিকি একটু।—আমি নাইবো না, ছেলে ঘাড়ে করে বসে থাকলেই হবে? হরিহব বলে—উঁহু, ওসব গোলমাল এখন এখানে নিয়ে এসো না, বড ব্যস্ত। সবজয়া রাগিয়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়। হরিহর হিসাবপত্র লিখিতে লিখিতে হঠাৎ দেখে ছেলে তার চটিজুতার পাটিটা মুখে দিয়া চিবাইতেছে! হরিহর জুতাখানা কাড়িয়া লইয়া বলে—আঃ, দ্যাখো বাধিয়ে গেল এক কাণ্ড, আছি একটা কাজ নিয়ে।

হঠাৎ একটা চড়ুই পাখী আসিয়া রোয়াকের ধারে বসে। খোকা বাবার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া সেদিকে দেখাইয়া হাত নাড়িয়া বলে—জে—জে—জে—জে—

হরিহরের বিরক্তি দূর হইয়া গিয়া ভারি মমতা হয়।

অনেক দিন আগের এক রাত্রির কথা মনে পড়ে।

নতুন পশ্চিম হইতে আসিয়া সেদিন সে গ্রামের সকলের পরামর্শে শ্বশুরবাড়ী স্ত্রীকে আনিতে গিয়াছিল। দুপুরের পর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের ঘাটে নৌকা পৌঁছিল। বিবাহের পরে একটিবার মাত্র সে এখানে আসিয়াছিল, পথঘাট মনে ছিল না, লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া সে শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার ডাকাডাকিতে একটি গৌরাঙ্গী ছিপছিপে চেহারার তরুণী কে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য বাহিরের দরজায় দাঁড়াইল এবং তাহার সহিত চোখাচোখি হওয়াতে সেখান হইতে চট্ করিয়া সরিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—হরিহর ভাবিতে লাগিল, মেয়েটি কে? তাহার স্ত্রী নয় তো? সে কি এত বড় হইয়াছে?

রাত্রিতে সন্ধান মিলিল। সর্বজয়া দারিদ্র্য হইতে রক্ষিত তাহার মায়ের একখানা লালপাড় মট্‌কা শাড়ী পরিয়া অনেক রাত্রে ঘরে আসিল। হরিহর চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দশ বৎসর আগেকার সে বালিকাপত্নীর কিছুই আর এই সুন্দরী তরুণীতে নাই—কে যেন ভাঙিয়া নতুন করিয়া গড়িয়াছে। মুখের সে কচিভাবটুকু আর নাই বটে, কিন্তু তাহার স্থানে যে সৌন্দর্য ফুটিয়াছে তাহা যে খুব সুলভ নহে হরিহরের সেটুকু বুঝিতে দেরি হইল না। হাত পায়ের গঠন, গতিভঙ্গি সবই নিখুঁত ও নতুন।

ঘরে ঢুকিয়া সর্বজয়া প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। যদিও সে বড় হইয়াছে, এ পর্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা একরূপ ঘটে নাই বলিলেই চলে। নববিবাহিতার সে লজ্জাটুকু তাহাকে যেন নতুন করিয়া পাইয়া বসিল। হরিহরই প্রথমে কথা কহিল। স্ত্রীর ডানহাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বিছানায় বসাইয়া বলিল—ব'সো এখানে, ভাল আছো?

সর্বজয়া মৃদু হাসিল। লজ্জাটা যেন কিছু কাটিয়া গেল। বলিল—এতদিন পরে বুঝি মনে পড়লো? আচ্ছা কি ব'লে এতদিন ডুব মেরে ছিলে? পরে সে হাসিয়া বলিল—কেন কি দোষ করেছিলাম বলো তো?

স্ত্রীর কথাবার্তায় অজ-পাড়াগাঁয়ের টান ও ভঙ্গিটুকু হরিহরের নতুন ও ভারি মিষ্ট বলিয়া মনে হইল। পরে সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল স্ত্রীর হাতে কেবল গাছ-কয়েক কড় ও কাচের চুড়ি ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। গরীব ঘরের মেয়ে, দিবার কেহ নাই, এতদিন খবর না লইয়া ভারি অন্যায় করিয়াছে সে! সর্বজয়াও চাহিয়া স্বামীকে দেখিতেছিল। আজ সারাদিন সে চারি পাঁচ বার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে—স্বাস্থ্যময় যৌবন হরিহরের সুগঠিত শরীরের প্রতি অঙ্গে যে বীরের ভঙ্গি আনিয়া দিয়াছে, তাহা বাংলা

দেশের পল্লীতে সচরাচর চোখে পড়ে না। বাপ-মায়ের কথাবার্তায় আজ সে শুনিয়াছে তাহার স্বামী পশ্চিম হইতে নাকি খুব লেখাপড়া শিখিয়া আসিয়াছে, টাকাকড়ির দিক হইতেও দু'পয়সা না আনিয়াছে এমন নয়। এতদিনে তাহার দুঃখ ঘুচিল, ভগবান বোধহয় এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সকলেই বলিত স্বামী তাহার সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে,—আর কখনো ফিরিবে না। মনে-প্রাণে একথা বিশ্বাস না করিলেও স্বামীর পুনরাগমন এতকাল তাহার কাছে দুরাশার মতই ঠেকিয়াছে। কত রাত্রি দুশ্চিন্তায় জাগিয়া কাটাইয়াছে, গ্রামের বিবাহ উপনয়ন উৎসবে ভাল করিয়া যোগ দিতে পারে নাই,—সকলেই আহা বলে, গায়ে পড়িয়া সহানুভূতি জানায়; অভিমানে তাহার চোখে জল আসিত—অনাবিল যৌবনের সোনালী কল্পনা এতদিন শুধু আড়ালে আবডালে নির্জন রাত্রিতে চোখের জলে ঝরিয়া পড়িয়াছে, কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে নাই, কিন্তু বসিয়া বসিয়া কতদিন ভাবিত—এই তো সংসারের অবস্থা, যদি সত্যসত্যই স্বামী ফিরিয়া না আসে, তবে বাপ-মায়ের মৃত্যুর পরে কোথায় দাঁড়াইবে—কে আশ্রয় দিবে?

এতদিনে কিনারা মিলিল।

হরিহর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, আমাকে যখন তুমি ওবেলা দরজার বাইরে দেখলে—তখন চিনতে পেরেছিলে? সত্যি কথা বোলো কিন্তু—

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—নাঃ, তা চিন্‌বো কেন! প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি, তারপর তখুনি—

আন্দাজে—

আন্দাজে নয় গো, আন্দাজে নয়—সত্যি-সত্যি। দেখলে না, তখ্‌খনি মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম? তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি বলতো, আমায় চিন্‌তে পেরেছিলে? বল তো গা ছুঁয়ে?

নানা কেজো-অকেজো কথাবার্তায় রাত বাড়িতে লাগিল। পরলোকগত দাদার কথা উঠিতে সর্বজয়ার চোখের জল আর বাঁধ মানে না হরিহর জিজ্ঞাসা করিল—বীণার বিয়ে কোথায় হ'ল? ছোট শালীর নাম জানিত না, আজই শ্বশুরের মুখে শুনিয়াছে।

তার বিয়ে হোল কুড়ুলে বিনোদপুর—ওই যে বড় গাঙ্, কি বলে? মধুমতী।—সেই মধুমতীর ধারে—

একটা প্রশ্ন বারবার সর্বজয়ার মনে আসিতে লাগিল—স্বামী তাহাকে লইয়া যাইবে তো? না, দেখাশুনা করিয়া আবার চলিয়া যাইবে সেই কাশী গয়া?

বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া সে কথাটা কিন্তু কোনরূপেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—তাহার মনের ভিতর কে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিল—না নিয়ে যাক্ গে—আবার তা নিয়ে বলা, কেন এত ছোট হতে যাওয়া ?

হরিহর সমস্যার সমাধান নিজ হইতেই করিল। বলিল—কাল চল তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাই—নিশ্চিন্দিপুরে—

সর্বজয়ার বুকে ধড়াস করিয়া যেন ঢেঁকির পাড় পড়িল—সামলাইয়া লইয়া মুখে বলিল—কালই কেন ? এ্যাদ্দিন পরে এলে—দুদিন থাকো না কেন ?··· বাবা মা কি তোমায় এখুনি ছেড়ে দেবেন ? পরশু আবার আমার বকুলফুলের বাড়ী তোমায় নেমন্তন্ন করে গিয়েছে—

—কে তোমার বকুলফুল ?—

—এই গাঁয়েই বাড়ী—এ-পাড়ায়, আবার ও-পাড়াতে বিয়ে হয়েচে। পরে সে আবার হাসিয়া বলিল, কাল সকালে তোমাকে দেখতে আসবে বলেচে যে—

কথাবার্তার স্রোত একভাবেই চলিল—রাত্রি গভীর হইল। বাড়ীর ধারেই সজনে গাছে রাতজাগা পাখী অদ্ভুত রব করিয়া ডাকিতেছিল। হরিহরের মনে হইল বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তের বাঁশবনের ছায়ায় একখানি স্নেহ-ব্যগ্র গৃহকোণ যখন তাহার আগমনের আশায় মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অভ্যর্থনা-সজ্জা সাজাইয়া বৃথা প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিসের সন্ধানেই সে তখন পশ্চিমের অনুর্বর অপরিচিত মরু-পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গৃহহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় ঘুরিয়া মরিতেছিল যে।

রাতজাগা পাখীটা একঘেয়ে ডাকিতেছিল, বাহিরের জ্যোৎস্না ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। এক হিসাবে এই রাত্রি তাহার কাছে বড় রহস্যময় ঠেকিতেছিল, সম্মুখে তাহাদের নবজীবনের যে পথ বিস্তীর্ণ ভবিষ্যতে চলিয়া গেল —আজ রাতটি হইতেই তাহার সুরু। কে জানে সে জীবন কেমন হইবে! কে জানে জীবন-লক্ষ্মী কোন্ সাজি সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহাদের সে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের পাথেয়রূপে ?

দুইজনেরই মনে বোধ হয় অনেকটা অস্পষ্টরূপে একই ভাব জাগিতেছিল। দুইজনেই চুপ করিয়া জানালার বাহিরের ফাঁকে জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া রহিল।

তার পর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে! তখন কোথায় ছিল এই শিশুর পাত্তা ?

ইন্দির ঠাকরুণ ফিরিয়া আসিয়াছে ছয় মাস হইল, সর্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই। আজকাল তাহার আরও মনে হয় যে ঐ বুড়ী ডাইনী সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে। হিংসা তো হয়ই, রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে। দু'বেলা কথায় কথায় বুড়ীকে সময় থাকিতে পথ দেখিবার উপদেশ ইঙ্গিতে জানাইয়া দেয়। সে পথ কোন্ দিকে—জ্ঞান হইয়া অবধি আজ পর্যন্ত সত্তর বৎসরের মধ্যে বুড়ী তাহার সন্ধান পায় নাই, এতকাল পরে কোথায় তাহা মিলিবে, ভাবিয়াই সে ঠাহর পায় না।

বর্ষার শেষদিকে বুড়ী অবশেষে এক যুক্তি ঠাওরাইল। ছয় ক্রোশ দূরে ভাণ্ডারহাটিতে তাহার জামাইবাড়ী। তাহার জামাই চন্দ্র মজুমদার বাঁচিয়া আছেন। জামাইয়ের অবস্থা বেশ ভাল, সম্পন্ন গৃহস্থ, অবশ্য মেয়ে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জামাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে—আজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বৎসরের আগের কথা—তাহার পর আর কখনও দেখাশোনা বা খবরাখবর লেন-দেন হয় নাই। তবুও যদি সেখানে যাওয়া যায়, জামাই একটু আশ্রয় দিতে কি গররাজী হইবে?

সন্ধ্যার পূর্বে ভাণ্ডারহাটি গ্রামে ঢুকিয়া একখানা বড় চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে গাড়োয়ান গাড়ী দাঁড় করাইল। গাড়োয়ানের ডাক-হাঁকে একজন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক আসিয়া বলিল—কোথাকার গাড়ী? তাহার পিছনে পিছনে একজন বৃদ্ধ বাড়ীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাহির হইলেন—কে রাধু? জিজ্ঞেস করো কোথা থেকে আসছেন?

বুড়ী চিনিল—কিন্তু অবাক হইয়া রহিল—এই সেই তাহার জামাই চন্দর! চল্লিশ বৎসর পূর্বের সে সবল দোহারা-গড়ন সুচেহারা ছেলেটির সঙ্গে এই পক্ককেশ প্রবীণ ব্যক্তির মনে মনে তুলনা করিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই কেমন এক বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে-উৎপন্ন—না-হাসি না-দুঃখ-গোছের মনের ভাবে সে বিহ্বলের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে মেয়ের নাম ধরিয়া কাঁদিল।

বিস্ময়বিমূঢ় চন্দ্র মজুমদার প্রথমটা আকাশ-পাতাল হাতড়াইতেছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিলেন ও আসিয়া শাশুড়ীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম

কবিলেন। একটু সামলাইয়া বুড়ী মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া ভাঙাগলায় বলিল—তোমার কাছে এয়েচি বাবাজী এতদিন পরে—একটুখানি আচ্ছয়ের জন্যি—আর কডা দিনই বা বাঁচবো। কেউ নেই আব ত্রিভুবনে—এই বয়সে দুটো ভাত কাপডের জন্যি—

মজুমদার মহাশয় বডছেলেকে গাডীব দ্রব্যাদি নামাইতে বলিলেন ও ছেলেব সঙ্গে শাশুডীকে বাডীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বিতীয়পক্ষের বিধবা মেয়ে ও বড পুত্রবধূ সংসাবেব গৃহিণী। আরও তিনটি পুত্রবধূ আছে। নাতি-নাতনীও তিন চারিটি।

তালগাছেব গুঁড়ির খুঁটি ও আডাবাঁধা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইখানা দাওয়া-উঁচু আটচালা ঘব। জিনিসপত্র, সিন্দুকতোরঙ্গে বোঝাই, পা ফেলিবার স্থানাভাব। মজুমদার মহাশয়েব বিধবা মেয়েটির নাম হৈমবতী। খুব ভাল মেয়ে—সে নিজের হাতে ফল কাটিয়া জল খাবাব সাজাইয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইল; একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলিল—দিদিমা, আমায় কখনো দেখেননি, না? কখনো তো এদিকে পায়ের ধূলো দ্যান্‌নি এর আগে! আক কেটে দেবো দিদিমা? দাঁত আছে? পাশের রান্নাঘরে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যাবেলা ভাত খাইতে বসিয়া হৈ চৈ করিতেছে। একজন চেঁচাইয়া বলিতেছে, ও মা দ্যাখো, উমি সব ডালটুকু আমার পাতে ঢেলে দিচ্ছে! পুত্রবধূ চেঁচাইতেছে, ওর কাছে খেতে বসিস্ কেন? রোজ না বলিচি আলাদা বসবি—এই উমি, বড্ড বাড হয়েচে, না?

কিন্তু দশ বারো দিন কাটিয়া গেলে বুড়ীর সব কেমন নতুন নতুন ঠেকিতে লাগিল, তেমন স্বস্তি পাওয়া যায় না—নতুন ধরণের ঘরদোর, নতুন পথঘাট, নতুন ভাবেব গৃহস্থালী। কেমন যেন মনে হয় এ ঠিক তাহার নিজের নয়, সব পর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ই মনে পডিত নিরিবিলি দাওয়া আর খুকী-খোকার মুখ। দিন কুডিক পরে বুড়ী যাইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল। এখানে আর মন টেকে না। কর্তার প্রথম পক্ষের শাশুডীর এ আকস্মিক আবির্ভাব ও তাঁহার মতলব শুনিয়া বাডীর বডবধূ প্রথম হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, অন্তর্ধানে খুশী ছাডা অ-খুশী হইলেন না। চন্দ্র মজুমদারের ইচ্ছা কি ছিল ভগবান জানেন, কিন্তু বড় ছেলে ও বডবধূর ভয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

অনেক দিন পরে আবার নিজের ঘরের দাওয়ায় দুর্গাকে কাছে লইয়া খোকাকে কাছে লইয়া বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেলশাখার মৃদু কম্পন দেখিতে দেখিতে সুখে বুড়ীর ঘুমের আমেজ আসে।

খুকী প্রথমে ভারি অভিমান করিয়াছিল, কথা কহিবে না, কাছে আসিবে

না—নানা কথায় সান্ত্বনা দিবাব পর আজকাল ভাব হইয়াছে। বুড়ী ভাইঝির মাথায় আদর করিয়া হাত বুলাইয়া বলে,—বেশ লাল একজোড়া ঢেঁড়ি ঝুম্‌কো হয় তো দিব্যি মানায়, না আজকাল কি উঠেচে—ওগুলোকে বলে কি ছাই—

শীত আসিল। বুড়ী ও-পাড়াব গাঙ্গুলী-বাড়ী গিয়া বুড়া রমানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাছে বলিল—ও রাম, জাড পড়লো বড্ড আবাব—তা গায়ে একখানা বস্তব এমন নেই যে, সকাল-সন্দে একটু মুড়িসুড়ি দিয়ে বসি, তা আমায় যদি একখানা—

রাম গাঙ্গুলী বলিলেন—আচ্ছা দিদি, একদিন এসো, এ মাসটায় আর হবে না—ও মাসে ববং দেখবো।

বহুদিন যাবৎ হাঁটাহাঁটি ঘোবা-ফেবাব পবে একদিন কুষ্ঠিয়াব বাঙা ছিটেব স্থতী চাদব একখানা বাহিব কবিয়া হাতে দিয়া বলিলেন—এই নাও দিদি, ভাবি গবম জিনিস—সাড়ে ন' আনা দাম—এব চেয়ে ভাল জিনিস আব নবাবগঞ্জে পাওয়া যায় না—বুধবাব এনে বেখেচি—ছাখো না খুলে?

বুড়ীর তখনও যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। আহ্লাদে একগাল হাসিয়া সে সেখানাকে খুলিয়া গায়ে জড়াইয়া বলিল—দিব্যি,—কেমন ওম্‌—মোটাসোটা দিব্যি কাপড—আঃ দাদা বেঁচে থাকো—কানাই বলাই বেঁচে থাকুক, অক্ষয় প্রমাই হোক—কাঙাল গবীবকে কেউ দেয় না, ওই অন্নদাব কাছে একখানা গায়ের কাপড চাচ্চি আজ তিন বছব থেকে—দেব দেব বলে, তা দিলে না—সখটা মিটিয়ে নি, কড়া দিনই আর বা?

সর্বজয়াকে আহ্লাদ কবিয়া দেখাইতেই সে বলিল, ছাখো ঠাকুরঝি, এ বাড়ী থেকে যে তুমি সাত দোব মেগে বেড়াবে তা হবে না, পষ্ট বলে দিচ্চি। ভিক্ষে মাগতে হয়, আলাদা বন্দোবস্ত কবো—

বুড়ী সে কথা হজম কবিয়া লইল। এরূপ অনেক কথাই তাহাকে দিনের মধ্যে দশবাব হজম কবিতে হয়। সেকালেব ছড়াটা সে এখনও ভোলে নাই—

লাথি ঝাঁটা পায়েব তল,
ভাত পাথরটা বুকেব বল—

ছুর্গা ভারি খুশী হইয়া বলে, ক' পয়সা দাম পিতিমা—কেমন রাঙা না? আশ্বাসের সুরে পিসি বলে, আমি মরে গেলে তোকে দিয়ে যাবো, তুই গায়ে দিস বড় হলে। নতুন চাদরের সোঁদা সোঁদা মাড়ের গন্ধটা বুড়ীর কাছে ভারি উপাদেয়—ভারি শৌখিন বলিয়া মনে হয়। সকালে চাদরখানা গায়ে জড়াইয়া ঝাঁট দিবার সময় মাঝে মাঝে নিজের দিকে চাহিয়া দেখে। নিষ্প্রয়োজনে ঘাটের পথে দাঁড়াইয়া থাকে, পথ-চলতি নিরীহ ঝি-বউকে ডাকিয়া বলে, কে যায়?

রাজীর মা?—এত বেলা যে?—ভূমিকা আর বেশী দূর না করিয়া একটু হাসিয়া নিজের গায়ের দিকে চাহিয়া বলে, এই গায়ের কাপড়খানা এবার ও-পাড়ার রামচাঁদ—সাড়ে ন' আনা দাম--

দু'একটা দুষ্টু মেয়ে বলে—উঃ ঠাক্‌মাকে রাঙা কাপড়ে যা মানিয়েচে! ঠাক্‌'মার বুঝি বিয়ে!

পথের পাঁচালী — ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ও পাড়ার দাসীঠাকরুণ আসিয়া হাসিমুখে বলিল—পয়সা দুটোর জন্যি এসেছিলাম বৌ, ইন্দির পিসি কাল আমার কাছ থেকে একটা নোনা নিয়ে এল, বল্লে কাল দাম গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসো—

সর্বজয়া ঘরের কাজকর্ম করিতেছিল, অবাক হইয়া বলিল—নোনা কিনে এনেচে তোমার কাছ থেকে?

দাসীঠাকরুণ ঘোর ব্যবসাদার মানুষ। সামান্য তেঁতুল আমড়া হইতে একগাছি শাক পর্যন্ত পয়সা না লইয়া কাহাকেও দেয় না। দাসীর অমায়িক ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিল—এনেচে কিনা জিজ্ঞেস্ করোনা তোমার ননদকে? সকালবেলা কি মিথ্যে বলতে এলাম দুটো পয়সার জন্যি? চার পয়সার কমে আমি দেবো না—বললে বুড়োমানুষ খাবার ইচ্ছে হয়েচে—তা যাক দু'পয়সাতেই—

রাগে সর্বজয়ার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। নোনার মত ফল, যাহা বিনা অপর্যাপ্ত বনে জঙ্গলে ফলে যে, গরু বাছুরের পর্যন্ত খাইয়া অরুচি ধরিয়া যায়, তাহা আবার পয়সা দিয়া কিনিয়া খাইবার লোক যে পাড়াগাঁয়ে আছে, তাহা সর্বজয়ার ধারণায় আসে না।

ঠিক এই সময় ইন্দির বুড়ী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্বজয়া তাহার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল—বলি হ্যাঁগা, তিন কাল গিয়েচে এককালে তো ঠেকেচ, যার ব'সে খাই তার পয়সার তো একটু দুখ-দরদ করে চলতে হয়? নোনা গিয়েচ কিনতে? কোথা থেকে তোমায় বসিয়ে আজ নোনা কাল দানা খাওয়াব? শখের পয়সা নিজে থেকে নিয়ে দাওগে যাও, পরের ওপর দিয়ে শখ করতে লজ্জা হয় না?

বুড়ীর মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, একটুখানি হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া

বলিল—তা দে বৌ—পাকা নোনাডা, তা ভাবলাম নিই খেয়ে, কডা দিনই বা বাঁচবো? তা দিয়ে দে ছুটো পয়সা—

সর্বজয়া চতুর্গুণ চীৎকার করিয়া বলিল—বড় পয়সা সস্তা দেখেচ কিনা? নিজের ঘটি-বাটি আছে বিক্রী করে দাও গিয়ে পয়সা—

পরে সে ঘড়া লইয়া খিড়কী ছুয়ার দিয়া ঘাটের পথে বাহির হইয়া গেল। দাসী খানিকটা দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—আমার নাকে খৎ, কানে খৎ, জিনিস বেচে এমন হয়রান তো কখনো হইনি! তোমায়ও বলি ইন্দির পিসি, নিজের পয়সাই যদি না ছিল তবে তোমার কাল নোনাটা আনা ভাল হয়নি বাপু, ও-রকম ধারে জিনিসপত্তর আর এনো না। তা তোমাদের ঝগড়া তোমরা কর, আমি গরিব লোক, ও বেলা আসবো, আমার পয়সা ছুটো বাপু ফেলে দিও—

দাসীর পিছু পিছু খুকী বাড়ীর বাহিরের উঠান পর্যন্ত আসিল। বলিতে বলিতে আসিল—পিসিমা বুড়ো মানুষ, একটা নোনা এনেচে, তা বুঝি বকে? খেতে ইচ্ছে হয় না, হ্যাঁ দাসীপিসি? বেশ নোনা, আমায় আধখানা কাল দিয়েছে—তোমার বাড়ী বুঝি গাছ আছে পিসি?--পরে সে ডাকিয়া কহিল—শোনো না দাসী, পিসি আমি একটা পয়সা দেবো এখন, পুতুলের বাক্সে আছে, মা ঘরে চাবি দিয়ে ঘাটে গেল, এলে লুকিয়ে দেবো এখন, মাকে বোলো না যেন পিসি!

ছুপুরের কিছু পূর্বে ইন্দির বুড়ী বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বাঁ হাতে ছোট একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, ডানহাতে পিতলের চাদরের ঘটিটা ঝুলানো, বগলে একটা পুরানো মাছুর, মাছুরের পাড় ছিঁড়িয়া কাটিগুলি ঝুলিতেছে।

খুকী বলিল, ও পিসি, যাসনে—ও পিসি কোথায় যাবি? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া মাছুরের পিছনটা টানিয়া ধরিল।···তুই চলে গেলে আমি কাঁদ্‌বো পিসি—ঠিক—

সর্বজয়া ঘরের দাওয়া হইতে বলিল, তা যাবে যাও, গেরস্তর অকল্যাণ করে যাওয়া কেন? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, এতকাল যার খেলে, তার একটা মঙ্গল তো দেখতে হয়, অনথ সময়ে না খেয়ে চলে গিয়ে তারপর গেরস্তর একটা অকল্যেণ বাধুক, এই তোমার ইচ্ছে তো?···ঐ রকম কুচক্কুরে মন না হ'লে কি আর এই দশা হয়?···

বুড়ী ফিরিল না। খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেল।

বুড়ী গিয়া গ্রামের ও-পাড়ার নবীন ঘোষালের বাড়ী উঠিল। নবীন ঘোষালের বউ সব শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, এমন তো কখনো

শুনিনি, হ্যাগা খুড়ী ? তা থাকো তুমি এইখানেই থাকো। মাস-দুই সেখানে থাকার পর বুড়ী সেখান হইতে বাহির হইয়া তিনকড়ি ঘোষালের বাড়ী ও তথা হইতে পূর্ণ চক্রবর্তীর বাড়ী আশ্রয় লইল। প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রথম আপ্যায়নের হৃদ্যতাটুকু কিছুদিন পর উবিয়া যাওয়ায় পরে বাড়ীর লোকে নানা রকমে বিরক্তি প্রকাশ করিত। পরামর্শ দিত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে। বুড়ী আরও দু'এক বাড়ী ঘুরিল, সব সময়ই তাহার ভরসা ছিল বাড়ী হইতে আর কেহ না হয়, অন্তত হরিহর ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু তিন মাস হইয়া গেল, কেহই আগ্রহ করিয়া ডাকিতে আসিল না। দুর্গাও আসে নাই। বুড়ী জানে ওপাড়া হইতে এ-পাড়া অনেক দূরে, ছোট মেয়ে এতদূরে আসিতে পারে না। সে আশায় আশায় ও-পাড়ায় দু'একবার গেল, খুকীর সঙ্গে দেখা হইল না।

বারো মাস লোকের বাড়ী আশ্রয় হয় না। পূব-পাড়ার চিন্তে গয়লানীর চালা ঘরখানি পড়িয়া ছিল—মাস দুই পরে সকলে মিলিয়া সেই ঘরখানি বুড়ীর জন্য ঠিক করিয়া দিল এবং ঠিক করিল পাড়া হইতে সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিবে। ঘরখানা নিতান্ত ছোট, ছিটে বেড়ার দেয়াল, পাড়া হইতে দূরে একটা বাঁশবনের মধ্যে! লোকের মুখে শুনিত সর্বজয়া নাকি বলিয়াছে—তেজ দেখুক পাঁচজনে। এ বাড়ী আর না, আমার বাছাদের মুখের দিকে যে তাকায়নি—তাকে আর আমার দোরে মাথা গলাতে হবে না, ভাগাড়ে পড়ে মরুক গিয়ে। যাহাদের সাহায্য করিবার কথা ছিল, তাহারা প্রথম দিনকতক খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগাইল, ক্রমে কিন্তু তাহাদের আগ্রহও কমিয়া গেল। বুড়ী ভাবে, কেন সেদিন অত রাগ করে চলে এলাম ? বৌ বারণ কল্লে, খুকী কত কাঁদলে, হাতে ধরে টানাটানি কল্লে—। নিজের উপর অত্যন্ত দুঃখে চোখের জলে দুই তোবড়ানো গাল ভাসিয়া যায়। বলে—শেষ কালডা এত দুঃখুও ছিল অদেষ্টে —আজ যদি মেয়েডাও থাকতো—

চৈত্র মাসের সাক্রান্তি। সারাদিন বড় রৌদ্রের তেজ ছিল, সন্ধ্যার সময় একটু একটু বাতাস বহিতেছে, গোসাঁইপাড়ায় চড়কের ঢাক এখনও বাজিতেছে, মেলা এখনও শেষ হয় নাই।

রৌদ্রে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া ও দুর্ভাবনায় বুড়ীর রোজ সন্ধ্যার পর একটু একটু জ্বর হয়। সে মাদুর পাতিয়া দাওয়ায় চুপ করিয়া শুইয়া আছে, মাথার কাছে মাটির ভাঁড়ে জল। পিতলের চাদরের ঘটিটা ইতিমধ্যে চার আনায় বাঁধা দিয়া চাল কেনা হইয়াছে। জ্বরের তৃষ্ণায় মাঝে মাঝে একটু একটু জল মাটির ভাঁড় হইতে খাইতেছে।

পিসিমা !······বুড়ী কাঁথা ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল, দাওয়ার পৈঠায় খুকী উঠিতেছে, পিছনে তাহাদের পাড়ার বেহারী চক্কত্তির মেয়ে রাজী। খুকীর পরনে ফর্সা কাপড়, আঁচলের প্রান্তে কি সব পোঁটলা-পুটলি বাঁধা। বুড়ীর মুখ দিয়া বেশী কথা বাহির হইল না। প্রবল আগ্রহে সে শীর্ণ হাত বাড়াইয়া তাহাকে জ্বরতপ্ত বুকে জড়াইয়া ধরিল।

—বলিসনে কাউকে পিসি, কেউ যেন টের পায় না, চড়ক দেখে সন্দে বেলা চুপিচুপি এলাম, রাজীও এল আমার সঙ্গে, চড়কের মেলা থেকে এই ছাখ্, তোর জন্যে সব এনেচি—

খুকী পুঁটলি খুলিল!

মুড়কি পিসিমা, তোর জন্যে দু'পয়সার মুড়কি আর দুটো কদ্‌মা, আর খোকার জন্যে একটা কাঠেব পুতুল—। বুড়ী ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। জিনিসগুলা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—দেখি দেখি, ও আমার মানিক, কত জিনিস এনেচে ছাখো! রাজরাণী হও, গরিব পিসির ওপর এত দয়া! দেখি খোকার কাঠের পুতুলডা! বাঃ দিব্বিঃ পুতুল—কডা পয়সা নিলে ?···

এক ঝোঁক কথাবার্তার পরে খুকী বলিল—পিসি, তোর গা যে বড্ড গরম ?

সমস্ত দিন টউরে বেড়িয়ে এই রকমডা হয়েছে, তাই বলি একটু শুয়ে থাকি—

ছেলেমানুষ হইলেও দুর্গা পিসিমার রৌদ্রে ঘুরিবার কারণ বুঝিল। দুঃখে ও অনাহারে শীর্ণ পিসিমার গায়ে সে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিল, তুই অবিশ্যি করে বাড়ী যাস--সন্দে বেলা গল্প শুনতে পাইনে কিছু না—কাল যাবি—কেমন তো ?

বুড়ী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বলিল, বৌ বুঝি তোকে কিছু বলে দিয়েছে আজ ?

রাজী বলিল—খুড়ীমা তো কিছু বলে দেয়নি পিসিমা, ওকে তো এখানে খুড়ীমা আসতে দেয় না। আমরা বললে বকে, তবে তুমি যেও পিসিমা। তুমি একটুখানি বলো, তাহলে খুড়ীমা আর কিছু বলবে না।

খুকী বলিল—কাল তুই ঠিক যাস পিসি, মা কিছু বলবে না—তা'হলে এখন বাড়ী যাই পিসি, কাউকে যেন বলিসনে ? কাল সকালে ঠিক যাস কিন্তু—

সকালে উঠিয়া বুড়ী দেখিল শরীরটা একটু হালকা। একটু বেলা হইলে ছোট্ট পুঁটুলিতে ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় দু'খানা ও ময়লা গামছাখানা বাঁধিয়া বুড়ী বাড়ীর দিকে চলিল। পথে গোপী বোষ্টমের বৌ বলিল, দিদি ঠাকুরুণ তা বাড়ী যাচ্ছ বুঝি ? বৌদিদির রাগ চলে গিয়েছে বুঝি !

বুড়ী একগাল হাসিল, বলিল, কাল দুর্গা যে সন্দে বেলা ডাকতে গিয়েছিল,

কত কাঁদলে, বললে মা বলেচে—চ' পিসি বাড়ী চ'—তা আমি বললাম—আজ তুই যা, কাল সক্কালে বেলাডা হোক, আমি বাড়ী গিয়ে উঠবো—মেয়ের আমার কত কান্না, যেতে কি চায়।···তাই সকালে যাচ্ছি—

বুড়ী বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল কেহ বাড়ী নাই। কাল সারারাত জ্বর-ভোগের পর এতটা পথ রৌদ্রে দুর্বলশরীরে আসিয়া বোধ হয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পুঁটুলিটা নামাইয়া সে নিজের ঘরের দাওয়ার পৈঠায় বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই খিড়কী দোর ঠেলিয়া সর্বজয়া স্নান করিয়া নদী হইতে ফিরিল। এদিকে চোখ পড়িলে বুড়ীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নিবাক হইয়া একটুখানি দাঁড়াইল। বুড়ী হাসিয়া বলিল—ও বৌ, ভাল আছিস? এই অ্যালাম এ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়সে—তাই বলি—

সর্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—তুমি এ বাড়ী কি মনে করে?

তাহার ভাবভঙ্গী ও গলার স্বরে, বুড়ীর হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল—এ বাড়ী আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না—সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েচি—ফের কোন্ মুখে এয়েচ?

বুড়ী কাঠের মত হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল—ও বৌ, অমন করে বলিস্‌নে—একটুখানি ঠাঁই দে আমাকে—কোথায় যাব আর শেষকালডা বল্ দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে—

ন্যাও, আর ভিটের দোহাই দিতে হবে না, ভিটের কল্যাণ ভেবে তোমার তো ঘুম নেই, যাও এক্ষুনি বিদেয় হও, নৈলে আমি অনর্থ বাধাবো—

ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইবে বুড়ী বোধ হয় আদৌ প্রত্যাশা করে নাই। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া যাইবার সময় যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, বুড়ী সেইরূপ মুঠা আঁকড়াইবার আশ্রয় খুঁজিতে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক চাহিল—আজ তাহার কেমন মনে হইল যে, বহুদিনের আশ্রয় সত্য সত্যই তাহার পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে, আর তাহাকে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

সর্বজয়া বলিল—যাও আর বসে থেকো না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমার কাজকর্ম আছে, এখানে তোমার জায়গা কোনো রকমে দিতে পারবো না—

বুড়ি পুঁটুলি লইয়া অতিকষ্টে আবার উঠিল। বাহির দরজার কাছে যাইতে

তাহার নজর পড়িল তাহার উঠান ঝাঁটের ঝাঁটাগাছটা পাঁচিলের কোণে ঠেস দেওয়ানো আছে, আজ তিন চার মাস তাহাতে কেহ হাত দেয় নাই। এই ভিটার ঘাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকী, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা...তার সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই। চিরকালের মত তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে!

সজনেতলা দিয়া পুঁটুলি বগলে যাইতে পিছন হইতে রায়বাড়ীর গিন্নী বলিল—ঠাক্‌'মা, ফিরে যাচ্ছ কোথায়? বাড়ী যাবে না? উত্তর না পাইয়া বলিল—ঠাক্‌'মা আজকাল কানের মাথা একেবারে খেয়েছে!

বৈকালে ও-পাড়া হইতে কে আসিয়া বলিল—ও মা ঠাকরুণ, তোমাদের বুড়ী বোধ হয় মরে যাচ্ছে, পালিতদের গোলার কাছে দুপুর থেকে শুয়ে আছে, রোদ্দুরে ফিরে যাচ্ছিল, আর যেতে পারেনি—একবার গিয়ে দেখে এস—দাদাঠাকুর বাড়ী নেই? একবার পাঠিয়ে দেও না।

পালিতদের বড় মাচার তলায় গোলার গায়ে ইন্দির ঠাক্‌রুণ মরিতেছিল একথা সত্য। হরিহরের বাড়ী হইতে ফিরিতে ফিরিতে তাহার গা কেমন করে, রৌদ্রে আর আগাইতে না-পারিয়া এখানেই শুইয়া পড়ে। পালিতেরা চণ্ডীমণ্ডপে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুকে পিঠে তেল মালিশ, পাখার বাতাস, সব করিবার পরে বেশী বেলায় অবস্থা খারাপ বুঝিয়া নামাইয়া রাখিয়াছে। পালিত-পাড়ার অনেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ বলিতেছে—তা রোদ্দুরে বেরুনেই বা কেন? সোজা রোদ্দুরটা পড়েচে আজ? কেহ বলিতেছে—এখুনি সাম্‌লে উঠবে এখন, ভির্‌মি লেগেছে বোধ হয়—

বিশু পালিত বলিল—ভির্‌মি নয়। বুড়ী আর বাঁচবে না; হরিজেঠা বোধ হয় বাড়ী নেই, খবর তো দেওয়া হয়েচে, কিন্তু এতদূরে আসে কে?

শুনিতে পাইয়া দীনু চক্রবর্তীর বড় ছেলে ফণী ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। সকলে বলিল—দাও দাদাঠাকুর, ভাগ্যিস এসে পড়েচ, একটুখানি গঙ্গাজল মুখে দাও দিকি। ছাখো তো কাণ্ড, বামুনপাড়া না কিছু না—কে একটু মুখে জল দেয়?

ফণী হাতের বৈঁচিকাঠের লাঠিটা বিশু পালিতের হাতে দিয়া বুড়ীর মুখের কাছে বসিল। কুশী করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ডাক দিল—পিসিমা!

বুড়ী চোখ মেলিয়া ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল, তাহার মুখে কোন উত্তর শুনা গেল না। ফণী আবার ডাকিল—কেমন আছেন পিসিমা? শরীর কি অসুখ মনে হচ্চে? পরে সে গঙ্গাজলটুকু মুখে

ঢালিয়া দিল। জল কিন্তু মুখের মধ্যে গেল না, বিশু পালিত বলিল—আর একবার দাও দাদাঠাকুর—

আর খানিকক্ষণ পরে ফণী বুড়ীর চোখের পাতা বুজাইয়া দিতেই কোটরগত অনেকখানি জল শীর্ণ গাল-দুটা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ইন্দির ঠাকৃরুণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।

আম-আঁটির ভেঁপু

ইন্দির ঠাকৃরুণের মৃত্যুর পর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝাঁপে-ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল, ওহে হরি, ভূষণো গোয়ালার দরুণ কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো?

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথা বলা হইল তাহাকে দেখিলে দশ বৎসর পূর্বের সে হরিহর রায় বলিয়া মনে হয় না। এখন যে মধ্যবয়সী, পুরাদস্তুর সংসারী, ছেলেমেয়েদের বাপ হরিহর খাজনা সাধিয়া গ্রামে গ্রামে ঘোরে, পৈতৃক আমলের শিষ্য-সেবকের ঘরগুলি সন্ধান করিয়া বসিয়া গুরুগিরি চালায়, হাটেমাঠে জমির ঘরামির সঙ্গে ঝিঙে-পটলের দরদস্তুর করিয়া ঘোরে, তাহার সঙ্গে আগেকার সে অবাধগতি, মুক্তপ্রাণ, ভবঘুরে যুবক হরিহরের কোন মিল নাই। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের সে-জীবন অনেক দূরের হইয়া গিয়াছে—সেই চুণার দুর্গের চওড়া প্রাচীরে বসিয়া বসিয়া দূর পাহাড়ের সূর্যাস্ত দেখা, কেদারের পথে তেজপাতার বনে রাত-কাটানো, শাহ্ কাশেম সুলেমানীর দরগার বাগান হইতে টক কমলা লেবু ছিঁড়িয়া খাওয়া, গলিত-রৌপ্যধারার মত স্বচ্ছ, উজ্জ্বল হিমশীতল স্বর্গনদী অলকানন্দা, দশাশ্বমেধ ঘাটের জলের ধারের রাণা—একটু একটু মনে পড়ে, যেন অনেকদিন আগেকার দেখা স্বপ্ন।

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, ছেলেটা আবার কোথায় গেল ? ও খোকা, খোকা-আ-আ—

পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয় সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপ্‌ছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছনে পড়লে এরি মধ্যে ? নাও এগিয়ে চলো—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা ? বড বড কান ?

হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্য-শিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে ? বড় বড কান ?—

হরিহর বলিল—কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে তব্‌ধি সুরু করেচো এটা কি, ওটা কি—কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি ? নাও এগিয়ে চলো দিকি !

বালক বাবার কথায় আগে চলিল।

নবীন পালিত বলিল, এক কাজ করো হরি, মাছ যদি ধরতে হয়, তবে বঁয়শার বিলে একদিন চলো যাওয়া যাক্—পূব-পাডার নেপাল পাড়ুই বাচ্‌ দিচ্চে, রোজ দেডমণ দু'মণ এইরকম পডচে—পাচ-সেরের নীচে মাছ নেই ! শুনলাম, একদিন শেষরাত্তিরে নাকি বিলের একেবারে মধ্যিখানে অথৈ জলে সাঁ সাঁ করে ঠিক যেন বকনা বাছুরের ডাক—বুঝ্‌লে ?

সকলে একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া নবীন পালিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—অনেক-কেলে পুরোনো বিল, গহিন জল, দেখেছো তো মধ্যিখানে জল যেন কালো শিউগোলা, পদ্মগাছের জঙ্গল, কেউ বলে রাঘব বোয়াল, কেউ বলে যক্ষি—যতক্ষণ ফর্সা না হোলো ততক্ষণ তো মশাই নৌকোর ওপরে সকলে বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগ্‌লো—

বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা-উৎসাহে পাশের এক উলুখডের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—ঐ যাচ্ছে বাবা, ঐ গেল বাবা, বড বড় কান, ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল, উঁহু উঁহু উঁহু—কাঁটা কাঁটা কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল,—আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশ' বার বারণ কচ্ছি না তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না।

বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা ?

হরিহর বলিল—কি তা কি আমি দেখেচি !—শূওর-টুওর হবে—নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

শূয়োর না বাবা, ছোট্ট যে। পরে সে নীচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

চল চল—হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি !…

নবীন পালিত বলিল—ও হোলো খরগোশ, খোকা, খরগোশ। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোশ থাকে, তাই। বালক বর্ণপরিচয়ে 'খ'-এ খরগোশের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এ রকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোশ !—জীবন্ত! একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়—ছবি না, কাচের পুতুল না—একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোশ !—এই রকম ভাঁটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে ! জল-মাটির তৈরী নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনমতে ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে ঘেরা সরু পথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল। নদীর ধারের বাবলা ও জীওল গাছের আড়ালে একটা বড় ইটের পাঁজার মত জিনিস নজরে পড়ে, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির জ্বালঘরের ভগ্নাবশেষ। সেকালে নীলকুঠির আমলে এই নিশ্চিন্দিপুর বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সার্নের হেডকুঠি ছিল, এ অঞ্চলের চৌদ্দটা কুঠির উপর নিশ্চিন্দিপুর কুঠির ম্যানেজার জন্ লারমার দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত। এখন কুঠির ভাঙা চৌবাচ্চাঘর, জ্বালাঘর সাহেবের কুঠি আপিস্, জঙ্গলাকীর্ণ ইটের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে প্রবলপ্রতাপ লারমার সাহেবের নামে এক সময় এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, আজকাল দু'একজন অতিবৃদ্ধ ছাড়া সে লোকের নাম পর্যন্ত কেহ জানে না।

মাঠের ঝোপঝাপগুলো উলুখড়, বনকলমী, সোদাল ও কুলগাছে ভরা। কলমীলতা সারা ঝোপগুলোর মাথা বড় বড় সবুজ পাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়াছে—ভিতরে স্নিগ্ধ ছায়া, ছোট গোয়ালে, নাটাকাঁটা ও নীল বন-অপরাজিতা ফুল সূর্যের আলোর দিকে মুখ উঁচু করিয়া ফুটিয়া আছে, পড়ন্ত বেলার ছায়ায় স্নিগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা, পাখীর ডাক, চারিধারে প্রকৃতির মুক্ত হাতে ছড়ানো ঐশ্বর্য, রাজার মত ভাণ্ডার বিলাইয়া দান, কোথাও এতটুকু দারিদ্র্যের আভাস

খুঁজিবার চেষ্টা নাই, মধ্যবিত্তের কার্পণ্য নাই। বেলাশেষের ইন্দ্রজালে মাঠ, নদী, বন মায়াময়।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকআলুর চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন সে গল্প করিতে লাগিলেন। একজন বলিল, কুঠির ইটগুলো নাকি বিক্রী হবে শুনছিলাম, নবাবগঞ্জের মতি দাঁ নাকি দরদস্তুর কচ্চে। মতি দাঁর কথায়, সে ব্যক্তি সামান্য অবস্থা হইতে কিরূপে ধনবান হইয়াছে সে কথা আসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, আষাড়ুর বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারী দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতির বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখী কৈ বাবা?

এই দেখো এখন, বাবলাগাছে এখুনি এসে বসবে—

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাবলাগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নীচু নীচু কুলগাছের অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এত ছোট গাছে কুল হয়? তাহাদের পাড়ায় যে কুলের গাছ আছে, তাহা খুব উঁচু বলিয়া ইচ্ছা থাকিলেও সে সুবিধা করিতে পারে না। ভারী আঁকৃশীটা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াও তুলিতে পারে না, কুপথ্যের জিনিস লুকাইয়া খাওয়া কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে—এ সে টের পায়। খবর পাইয়া মা আসিয়া বাড়ী ধরিয়া লইয়া যায়, বলে—ওমা আমার কি হবে। এমন দুষ্টু ছেলে হয়েচ তুমি? এই সেদিন উঠলে জ্বর থেকে, আজ অমনি কুলতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছ! একটুখানি পিছন ফিরেচি, আর অমনি এসে দেখি বাড়ী নেই! কটা কুল খেয়েচিস, দেখি মুখ দেখি?

সে বলে, কুল খাইনি তো মা, তলায় একটাও কুল পড়ে নেই, আমি বুঝি পাড়তে পারি?

পরে সে টুকটুকে মুখটি মায়ের মুখের অত্যন্ত নিকটে লইয়া গিয়া হাঁ করে। তাহার মা ভাল করিয়া দেখিয়া পুত্রের ননীর মত গন্ধ বাহির হওয়া সুন্দর মুখে চুমা খাইয়া বলে—কক্‌খনো খেও-না যেন খোকা!···তোমার শরীর সেরে উঠুক, আমি কুল কুড়িয়ে আচার করে হাঁড়িতে তুলে রেখে দেব—

তাই বোশেক জষ্টি মাসে খেও; লুকিয়ে লুকিয়ে ককখনো আর খেও না—কেমন তো?

হরিহর বলিল—কুঠি কুঠি বলছিলে, ঐ দ্যাখো খোকা সাহেবদের কুঠি—দেখেচো?

নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা যেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মত পড়িয়া ছিল, গতিশীল কালের প্রতীক নির্জন শীতের অপরাহ্ণ তাহার উপর অল্পে অল্পে তাহার ধূসর উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট আস্তরণ বিস্তার করিল।

কুঠির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের এক শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কনসারনের বিশাল হেডকুঠির এইটুকু ছাড়া অন্য কোনও চিহ্ন আর অখণ্ড অবস্থায় মাটির উপর দাঁড়াইয়া নাই। নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের ফলকে এখনও পড়া যায়—

Here lies Edwin Lermor,
The only son of John & Mrs Lermor,
Born May 13, 1853, Died April 27, 1860

অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রে ছায়াবিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে আড়াই-বাঁকীর মোহানা হইতে প্রবহমান জোর হওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন-সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ী হইতে এতদূরে আসিয়াছে। এতদিন নেড়াদের বাড়ী, নিজেদের বাড়ীর সামনেটা, বড়জোর রানুদিদিদের বাড়ী, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা। কেবল এক এক দিন তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া সে স্নানের ঘাট হইতে আব্‌ছা দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জালঘরটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত, মা, ওদিকে সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ঐ মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম লঙ্কার দেশে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নীচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে

আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ, সুরু হইয়াছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নীচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রং-এর ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল, হাঁ হাঁ, হাত দিও না হাত দিও না,—আল্‌কুশী আল্‌কুশী। কি যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখচি। আর কোনদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুলকে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে—তা তুমি কিছুতেই শুনবে না।—

হাত চুলকুবে কেন বাবা?

হাত চুলকুবে, বিষ বিষ—আলকুশী কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি রি করে জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চীৎকার সুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে গিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কীর দোর দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সবজয়া খিড়কীর দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হোল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না একটা দোলাই গায়ে না কিছু!

হরিহর বলিল, আঃ নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত। এদিকে যায়, ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আলকুশীর ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, কুঠির মাঠ দেখবো, কুঠির মাঠ দেখবো—কেমন হোল তো কুঠির মাঠ দেখা?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকাল বেলা। আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে. তাহার একটা ছোট টিনের বাক্স আছে, সেটার ডালা ভাঙা। বাক্সের সমুদয় সম্পত্তি সে উপুড় করিয়া মেঝেতে ঢালিয়াছে,—একটা রং ওঠা কাঠের ঘোড়া, চার পয়সা দামের একটা টোল-খাওয়া টিনের ভেঁপু-বাঁশী, গোটাকতক কড়ি—এগুলি সে মায়ের অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীপূজার কড়ির চুপড়ী হইতে খুলিয়া লইয়াছিল ও পাছে কেহ টের পায় এই ভয়ে সর্বদা লুকাইয়া রাখে—একটা দু'পয়সা দামের পিস্তল, কতকগুলো শুকনো নাটা ফল। দেখিতে ভাল বলিয়া তাহার দিদি কোথা হইতে অনেকগুলি কুড়াইয়া আনিয়াছিল, কিছু তাহাকে দিয়াছে, কিছু সে নিজের পুতুলের বাক্সে রাখিয়া

দিয়াছে। খানকতক খাপরার কুচি। গঙ্গা-যমুনা খেলিতে এই খাপরাগুলির লক্ষ্য অব্যর্থ বলিয়া বিশ্বাস 'হওয়ায় সেগুলি সযত্নে বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে, এগুলি তাহার মহা-মূল্যবান সম্পত্তি। এতগুলি জিনিসের মধ্যে সবে সে টিনের বাঁশীটা কয়েকবার বাজাইয়া সেটির সম্বন্ধে বিগতকৌতূহল হইয়া তাহাকে এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। কাঠের ঘোড়া নাড়াচাড়া করা হইয়া গিয়াছে। সেটিও এক পাশে পিঁজরাপোলের আসামীর ন্যায় পড়িয়া আছে। বর্তমানে সে গঙ্গা-যমুনা খেলিবার খাপরাগুলিকে হাতে লইয়া মনে মনে দাওয়ার উপর গঙ্গা-যমুনার ঘর আঁকা কল্পনা করিয়া চোখ বুজিয়া খাপরা ছুঁড়িয়া দেখিতেছে তাক ঠিক হইতেছে কিনা!

এমন সময়ে তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—ও অপু—। সে এতক্ষণ বাড়ী ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল। তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত। মানুষের গলার আওয়াজ পাইয়া অপু কলের পুতুলের মত লক্ষ্মীর চুপড়ীর কড়িগুলি তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিল। পরে বলিল—কি রে দিদি?

দুর্গা হাত নাড়িয়া ডাকিল—আয় এদিকে—শোন্—

দুর্গার বয়স দশ-এগার বৎসর হইল। গড়ন পাত্‌লা পাত্‌লা, রং অপুর মত অতটা ফর্সা নয়, একটু চাপা। হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মত চোখগুলি বেশ ডাগর ডাগর। অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কি রে?

দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নীচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। স্বর নীচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসে নি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসী জারাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথায় পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটুলিদের বাগানে সিঁদুরকোটার তলায় পড়েছিল—আন্ দিকি একটু নুন আর তেল?

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে? আমার কাপড় যে বাসি?

তুই যা না শিগ্‌গির করে, মা'র আসতে এখন ঢের দেরী—ক্ষার কাচতে গিয়েচে—শিগ্‌গির যা—

অপু বলিল—নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো—তুই খিড়কী দোরে গিয়ে ত্যাখ্ মা আসচে কিনা। দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল, তেল টেল যেন মেঝেতে ঢালিস্‌নে, সাবধানে নিবি, নইলে মা টের পাবে—তুই তো একটা হাবা ছেলে—

অপু বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল,—বলিল, নে হাত পাত।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?

—অতগুলো বুঝি হোল? এই তো ভারি বেশী—যা—আচ্ছা নে আর দু'খানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েচে রে, একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তা'হলে—

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি? মা যে তক্তার ওপর রেখে ত্যায়, আমি যে নাগাল পাইনে?

তবে থাক্‌কে যাক—আবার ওবেলা আনবো এখন—পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটী যা ধরেচে—দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে—

দুর্গাদের বাড়ীর চারিদিকেই জঙ্গল। হরিহর রায়ের জ্ঞাতি ভ্রাতা নীলমণি রায় সম্প্রতি গত বৎসর মারা গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যা লইয়া নিজ পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন। কাজেই পাশের এ ভিটাও জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। নিকটে আর কোনো লোকের বাড়ী নাই। পাঁচ মিনিটের পথ গেলে তবে ভুবন মুখুয্যের বাড়ী।

হরিহরের বাড়ীটাও অনেক দিন হইয়া গেল মেরামত হয় নাই, সামনের দিকের রোয়াক ভাঙা, ফাটলে বন-বিছুটির ও কালমেঘ গাছের বন গজাইয়াছে —ঘরের দোর-জানালার কপাট সব ভাঙা, নারিকেলের দড়ি দিয়া গরাদের সঙ্গে বাঁধা আছে।

খিড়কী দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শুনা গেল—দুগ্‌গা ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকচে, যা দেখে আয়—ওখানা খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল্—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জারানো আমের চাক্‌লাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠালগাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতেছিল, কারণ

চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনতা-সূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান্ মারিয়া ভেরেণ্ডা-কচার বেড়া পার করিয়া নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যাল্ না বাঁদর—নুন লেগে রয়েছে যে—

পরে দুর্গা নিরীহমুখে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? সকাল থেকে ক্ষার কেচে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল, একটুখানি যদি কোন দিক থেকে আসান আছে তোমাদের দিয়ে—অত বড মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায় পাড়ায় টোটো টোক্‌লা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায়?

অপু আসিয়া বলিল, মা, খিদে পেয়েচে।

রোসো রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু···একটুখানি হাঁপ জিরোতে দ্যাও। তোমাদের রাতদিন খিদে আর রাতদিন ফাই-ফরমাজ। ও দুগ্‌গা—দ্যাখ্‌তো বাছুরটা হাঁক পাড়চে কেন?

খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শসা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—চাল ভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে খাইতে বলিল—উঃ, চিবোনো যায় না। আম খেয়ে দাঁত টকে—

দুর্গার ভ্রূকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথে বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি?

সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিগ্যেস করো? আমি—এই তো এখন কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে—তুমি যখন ডাক্‌লে তখন তো—

স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। তাহার মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা—ডেকে ডেকে সারা হোল—কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা ক'রে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—

দিদির পিছনে পিছনে অপুও দুধ দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তার পিঠে দুম্ করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে—আবার কোনো দিন আম দেবো খেও—ছাই দেবো—এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জারাবো, এত বড় বড় গুটি হয়েচে, মিষ্টি যেন গুড—দেবো তোমায়? খেও এখন? হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে?

দুপুরের কিছু পরে হরিহর কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিল। সে আজকাল গ্রামের অন্নদা রায়ের বাড়ীতে গোমস্তার কাজ করে। জিজ্ঞাসা করিল—অপুকে দেখচিনে?

সর্বজয়া বলিল—অপু তো ঘুমুচ্চে।

দুগগা বুঝি—

সে সেই খেয়ে বেরিয়েচে—সে বাড়ী থাকে কখন? দুটো খাওয়ার সঙ্গে যা সম্পর্ক! আবার সেই খিদে পেলে তবে আস্‌বে—কোথায় কার বাগানে, কার আমতলায় জামতলায় ঘুরছে—এই চত্তির্ মাসের রোদ্দুর ফের হ্যাখোনা এই জ্বরে পড়লো বলে—অত বড় মেয়ে, বলে বোঝাবো কত? কথা শোনে, না কানে নেয়?

একটু পরে হরিহর খাইতে বসিয়া বলিল—আজ দশঘরায় তাগাদার জন্যে গেছলাম, বুঝলে? একজন লোক, বেশ মাতব্বর, পাঁচটা ছয়টা গোলা বাড়ীতে, বেশ পয়সাওলা লোক—আমায় দেখে—দণ্ডবৎ করে বল্লে—দাদাঠাকুর, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছেন? আমি বল্লাম—না বাপু, আমি তো কৈ—? বল্লে—আপনার কর্তা থাকতে তখন পূজা আচ্চায় সব সময়ই তিনি আসতেন, পায়ের ধুলো দিতেন। আপনারা আমাদের গুরুতুল্য লোক, এবার আমরা বাড়ীসুদ্ধ মন্তর নেবো ভাবচি—তা আপনি যদি আজ্ঞে করেন, তবে ভরসা করে বলি—আপনিই কেন মন্তরটা দেন না? তা আমি তাদের বলেচি আজ আর কোনো কথা বলবো না, ঘুরে এসে দু-এক দিনে—বুঝলে?

সর্বজয়া ডালের বাটি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল, বাটি মেঝেতে নামাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল। বলিল—হ্যাঁগো তা মন্দ কি? দাও না ওদের মন্তর? কি জাত? হরিহর সুর নামাইয়া বলিল—ব'লো না কাউকে।—সদ্গোপ। তোমার তো আবার গল্প করে বেড়ানো স্বভাব—

আমি আবার কাকে বলতে যাবো? তা হোক সে সন্দোপ, দাও গিয়ে দিয়ে, এই কষ্ট যাচ্ছে—ঐ রায়বাড়ীর আটটা টাকা ভরসা, তাও দু তিন মাস অন্তর তবে ছ্যায়—আর এদিকে রাজ্যির দেনা। কাল ঘাটের পথে সেজ ঠাকরুণ বললে—বৌমা, আমি বন্দক ছাড়া টাকা ধার দিইনে—তবে তুমি অনেক করে বললে বলে দিলাম—আজ পাঁচ পাঁচ মাস হয়ে গেল, টাকা আর রাখতে পারবোনা। এদিকে রাধা বোষ্টমের বৌ তো ছিঁড়ে খাচ্ছে, দু'বেলা তাগাদা আরম্ভ করেচে! ছেলেটার কাপড় নেই—দু তিন জায়গায় সেলাই, বাছা আমার তাই পরে হাসিমুখে নেচে নেচে বেড়ায়—আমার এমন হয়েচে যে ইচ্ছে করে একদিকে বেরিয়ে যাই—

আর একটা কথা ওরা বলছিল, বুঝলে? বলছিল গাঁয়ে তো বামুন নেই, আপনি যদি এ গাঁয়ে উঠে আসেন, তবে জায়গা জমি দিয়ে বাস করাই—গাঁয়ে এক ঘর বামুন বাস করানো আমাদের বড্ড ইচ্ছে। তা কিছু ধানের জমি-টমি দিতেও রাজী—পয়সার তো অভাব নেই। আজকাল চাষাদের ঘরেই লক্ষ্মী বাঁধা —ভদ্দর লোকেরই হয়ে পড়েচে হা ভাত যো ভাত—

আগ্রহে সর্বজয়ার কথা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল—এখ্‌খুনি। তা তুমি রাজী হ'লে না কেন? বললেই হোত যে আচ্ছা আমরা আসবো। ও-রকম একটা বড মানুষের আশ্রয়—এ গাঁয়ে তোমার আছে কি? শুধু ভিটে কামড়ে পড়ে থাকা—

হরিহর হাসিয়া বলিল—পাগল! তখুনি কি রাজী হ'তে আছে। ছোট-লোক, ভাববে ঠাকুরের হাঁড়ি দেখচি শিকেয় উঠেচে—উঁহু, ওতে খেলো হয়ে যেতে হয়—তা নয়, দেখি একবার চুপি চুপি মজুমদার মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে—আর এখন ওঠ্ বললেই কি ওঠা চলে? সব ব্যাটা এসে বলবে টাকা দাও, নৈলে যেতে দেবো না—দেখি পরামর্শ করে কি রকম দাঁড়ায়—

এই সময়ে মেয়ে দুর্গা কোথা হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া বাহিরের দুয়ারের আড়াল হইতে সতর্কতার সহিত একবার উঁকি মারিল এবং অপর পক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ দেখিয়া ও ধারের পাঁচিলের পাশ বাহিয়া বাহির-বাটির রোয়াকে উঠিল। দালানের দুয়ার আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দেখিল উহা বন্ধ আছে! এদিকে রোয়াকে দাঁড়ানো অসম্ভব, রৌদ্রের তাতে পা পুড়িয়া যায়, কাজেই সে স্থান হইতে নামিয়া গিয়া উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল। রৌদ্রে বেড়াইয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, আঁচলের খুঁটে কি কতকগুলা যত্ন করিয়া বাঁধা। সে আসিয়াছিল এই জন্য যে, যদি বাহিরের দুয়ার খোলা পায় এবং মা ঘুমাইয়া থাকে, তবে ঘরের মধ্যে চুপি চুপি ঢুকিয়া একটু শুইয়া লইবে।

কিন্তু বাবার, বিশেষত মার সামনে সম্মুখ দুয়ার দিয়া বাড়ী ঢুকিতে তাহার সাহস হইল না।

উঠানে নামিয়া সে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে সেখানেই বসিয়া পড়িয়া আঁচলের খুঁট খুলিয়া কতকগুলি শুক্‌নো রড়া ফলের বীচি বাহির করিল। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে আপন মনে সেগুলি গুনিতে আরম্ভ করিল, এক—দুই—তিন—চার—ছাব্বিশটা হইল। পরে সে দুই তিনটা করিয়া বীচি হাতের উল্টো পিঠে বসাইয়া উঁচু করিয়া ছুঁড়িয়া দিয়া পরে হাতের সোজা পিঠ পাতিয়া ধরিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—অপুকে এইগুলো দেবো—আর এইগুলো পুতুলের বাক্সে রেখে দেবো—কেমন বীচিগুলো তেল চুকচুক কচ্ছে—আজই গাছ থেকে পড়েচে, ভাগ্যিস আগে গেলাম, নৈলে সব গরুতে খেয়ে ফেলে দিতো, ওদের রাঙী গাইটা একেবারে রাক্কস, সব জায়গায় যাবে, সেবার কতকগুলো এনেছিলাম আর এইগুলো নিয়ে অনেকগুলো হোল।

সে খেলা বন্ধ করিয়া সমস্ত বীচি আবার সযত্নে আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়াইতে উড়াইতে মহাখুশির সহিত পুনরায় সোজা বাটীর বাহির হইয়া গেল।

অপুদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটা খুব বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল। কেবল তাহার মাথাটা উহাদের দালানের জানালা কি রোয়াক হইতে দেখা যায়। অপু মাঝে মাঝে সেইদিকে চাহিয়া দেখিত। যতবার সে চাহিয়া দেখে, ততবার তাহার যেন অনেক—অনেক—অনেক দূরের কোন দেশের কথা মনে হয়—কোন্ দেশ, এ তাহার ঠিক ধারণা হইত না—কোথায় যেন কোথাকার দেশ—মার মুখে ঐ সব দেশের রাজপুত্তুরদের কথাই সে শোনে।

অনেক দূরের কথায় তাহার শিশুমনে একটা বিস্ময়মাখানো আনন্দের ভাবের সৃষ্টি করিত। নীল রং-এর আকাশটা অনেক দূর, ঘুড়িটা—কুঠির মাঠটা অনেক দূর—সে বুঝাইতে পারিত না,—বলিতে পারিত না কাহাকেও, কিন্তু এসব কথায় তাহার মন যেন কোথায় উড়িয়া চলিয়া যাইত—এবং সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, অনেক দূরের এই কল্পনা তাহার মনকে অত্যন্ত

চাপিয়া তাহাকে যেন কোথায় লইয়া ফেলিয়াছে—ঠিক সেই সময়েই মায়ের জন্য তাহার মন কেমন হইয়া উঠিত, যেখানে সে যাইতেছে সেখানে তাহার মা নাই, অমনি মায়ের কাছে যাইবার জন্য মন আকুল হইয়া পড়িত। কতবার যে এ রকম হইয়াছে। আকাশের গায়ে অনেক দূরে একটা চিল উড়িয়া যাইতেছে—ক্রমে ছোট্ট—ছোট্ট—ছোট্ট হইয়া নীলুদের তালগাছের উঁচু মাথাটা পিছনে ফেলিয়া দূর আকাশে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে—চাহিয়া দেখিতে দেখিতে যেমন উড়ন্ত চিলটা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া যাইত, অমনি সে চোখ নামাইয়া লইয়া বাহির-বাটী হইতে এক দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। মা বলিত—ছ্যাখো ছ্যাখো ছেলের কাণ্ড ছ্যাখো—ছাড়্—ছাড়্—দেখছিস্ সকড়ী হাত?…ছাড়ো মানিক আমার, সোনা আমার, তোমার জন্যে এই ছ্যাখো চিংড়িমাছ ভাজছি—তুমি যে চিংড়িমাছ ভালোবাসো? হ্যাঁ, দুষ্টুমি করে না—ছাড়ো—

আহারাদির পর দুপুরবেলা তাহার মা কখনো কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। বাড়ীর ধারে নারিকেল গাছটাতে শঙ্খচিল ডাকিত, অপু নিকটে বসিয়া হাতের লেখা ক-খ লিখিতে লিখিতে একমনে মায়ের মুখের মহাভারত পড়া শুনিত! দুর্গাকে তাহার মা বলিত, একটা পান সেজে দে তো দুগ্‌গা। অপু বলিত মা, সেই ঘুঁটে-কুড়োনোর গল্পটা? তাহার মা বলে—ঘুঁটেকুড়োনোর কোন গল্প বল্ তো—ওই সেই হরিহোড়ের? সে তো অন্নদামঙ্গলে আছে, এতে তো নেই? পরে পান মুখে দিয়া সুর করিয়া পড়িতে থাকিত—

রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন।
কহিব অপূর্ব কথা না যায় বর্ণন॥
সোমদত্ত নামে রাজা সিন্ধুদেশে ঘর।
দেবদ্বিজে হিংসা সদা অতি—

অপু অমনি মায়ের মুখের কাছে হাতখানি পাতিয়া বলিত, আমায় একটু পান? মা চিবানো পান নিজের মুখ হইতে ছেলের প্রসারিত হাতের উপর রাখিয়া বলিত—এঃ বড্ড তেতো—এই খয়েরগুলোর দোষ, রোজ হাটে বারণ করি ও-খয়ের যেন আনে না, তবুও—

জানালার বাহিরে বাঁশবনের, দুপুরের রৌদ্র-মাখানো শেওড়া-ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের—বিশেষত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। ইহার কারণ কর্ণের উপর তাহার কেমন

একটা মমতা হয়। রথের চাকা মাটিতে পুঁতিয়া গিয়াছে—দুই হাতে প্রাণপণ সেই চাকা মাটি হইতে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—সেই নিরস্ত্র, অসহায়, বিপন্ন কর্ণের অনুরোধ মিনতি উপেক্ষা করিয়া অর্জুন তীর ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন! মায়ের মুখে এই অংশ শুনিতে শুনিতে দুঃখে অপুর শিশুহৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, চোখের জল বাগ মানিত না—চোখ ছাপাইয়া তাহার নরম তুলতুলে গাল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত—সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখে চোখের জল পড়ার যে আনন্দ, তাহা তাহার মনোরাজ্যে নব অনুভূতির সজীবত্ব লইয়া পরিচিত হইতে লাগিল! জীবন-পথে যেদিক মানুষের চোখের জলে, দীনতায়, মৃত্যুতে, আশাহত ব্যর্থতায়, বেদনায় করুণ—পুরোনো বইখানার ছেঁড়া পাতার ভরপুর গন্ধে, মায়ের মুখের মিষ্ট সুরে, রৌদ্রভরা দুপুরের মায়া-অঙ্গুলি-নির্দেশে, তাহার শিশুদৃষ্টি অস্পষ্টভাবে সে পথের সন্ধান পাইত। বেলা পড়িলে মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে, সে বাহিবে আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে এক এক দিন চাহিয়া দেখে—হয়তো কড়া চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্রে গাছটার মাথা ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট, নয় তো বৈকালের রাঙা রোদ অলসভাবে গাছটার মাথায় জড়াইয়া আছে··· সকলের চেয়ে এই বৈকালের রাঙা-রোদ-মাখানো গাছটার দিকে চাহিয়াই তাহার মন কেমন করিত। কর্ণ যেন ঐ অশত্থ গাছটার ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনও মাটি হইতে রথের চাকা দুই হাতে প্রাণপণে টানিয়া তুলিতেছে···রোজই তোলে—রোজই তোলে—মহাবীর, কিন্তু চির-দিনের কৃপার পাত্র কর্ণ।···বিজয়ী বীর অর্জুন নহে—যে রাজ্য পাইল, মান পাইল, রথের উপর হইতে বাণ ছুঁড়িয়া বিপন্ন শত্রুকে নাশ করিল; বিজয়ী কর্ণ-যে মানুষের চিরকালের চোখের জলে জাগিয়া রহিল, মানুষের বেদনার অনুভূতিতে সহচর হইয়া বিরাজ করিল—সে।

এক এক দিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড় কম লেখা আছে। ইহার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য এবং আশ মিটাইয়া যুদ্ধ জিনিসটা উপভোগ করিবার জন্য সে এক উপায় বাহির করিয়াছে। একটা বাখারি কিংবা হাল্‌কা কোন গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি, একেবারে দুশোটা বাণ দিলে মেরে! তারপর—ওঃ—সে কি যুদ্ধ। কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল! (এখানে সে মনে মনে যতগুলি বাণ হইলে তাহার

আশা মিটে তাহার কল্পনা করে, যদিও তাহার কল্পনার ধারা মার মুখে কাশীদাসী মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের প্রণালী সম্বন্ধে যাহা শুনা আছে তাহা অতিক্রম করে না) তারপর তো অর্জুন করলেন কি, ঢাল তরোয়াল নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লেন—পরে এই যুদ্ধ! দুর্যোধন এলেন—ভীম এলেন—বাণে বাণে আকাশ অন্ধকার করে ফেলেছে—আর কিছু দেখা গেল না।··· মহাভারতের রথিগণ মাত্র অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রক্ত-মাংসের দেহে জীবন্ত থাকিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, যশোলাভের পথ ক্রমশই কিরূপ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। বালকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে তাঁহাবা মাসেব পর মাস সমানভাবে অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন কি?···

গ্রীষ্মকালেব দিনটা, বৈশাখের মাঝামাঝি।

নীলমণি রায়ের ভিটার দিকে জঙ্গলের ধারে সেদিন দুপুরের কিছু পূর্বে দ্রোণগুরু বড বিপদে পড়িয়াছেন—কপিধ্বজ বথ একেবারে তাঁহার ঘাড়ের উপরে, গাণ্ডীব-ধনু হইতে ব্রহ্মাস্ত্র মুক্ত হইবার বিলম্ব চক্ষের পলক মাত্র, কুরুসৈন্যদলে হাহাকার উঠিয়াছে—এমন সময় শেওড়া বনের ওদিক হইতে হঠাৎ কে কৌতুকেব কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবিল, ও কিরে অপু! অপু চমকিয়া উঠিয়া আকর্ণ টানা জ্যা-কে হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার দিদি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। অপু চাহিতেই বলিল—হ্যাঁরে পাগলা, আপন মনে কি বকচিস বিড্ বিড্ করে, আর হাত পা নাড়ছিস? পরে সে ছুটিয়া আসিয়া সস্নেহে ভাই-এর কচি গালে চুমু খাইয়া বলিল—পাগল!···কোথাকার একটা পাগল, কি বকছিলি রে আপন মনে?

অপু লজ্জিতমুখে বার বার বলিতে লাগিল—যাঃ···বকছিলাম বুঝি?· আচ্ছা, যাঃ—

অবশেষে দুর্গা হাসি থামাইয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে—

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া বনের মধ্যে লইয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া হাসিমুখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস?···কত নোনা পেকেচে? ···এখন কি করে পাড়া যায় বল দিকি?

অপু বলিল—উঃ অনেক রে দিদি।—একটা কঞ্চি দিয়ে পাড়া যায় না?

দুর্গা বলিল—তুই এক কাজ কর্, ছুটে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে থেকে আঁকুষিটা নিয়ে আয় দিকি! আঁকুষি দিয়ে টান দিলে পড়ে যাবে দেখিস এখন—

অপু বলিল—তুই এখানে দাঁড়া দিকি, আমি আন্‌চি—

অপু আঁকুষি আনিলে দুজনে মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও চার পাঁচটার বেশী ফল পাড়িতে পারিল না—খুব উঁচু গাছ, সর্বোচ্চ ডালে যে ফল আছে তাহা দুর্গা আঁকুষি দিয়াও নাগাল পাইল না। পরে সে বলিল—চল আজ এইগুলো নিয়ে যাই, নাইবার বেলায় মাকে সঙ্গে আনবো—মার হাতে ঠিক নাগাল আসবে! দে নোনাগুলো আমার কাছে, তুই আঁকুষিটা নে। নোলক পরবি?

একটা নীচু ঝোপের মাথায় ওড়্‌কলমীলতায় শাদা শাদা ফুলের কুঁড়ি, দুর্গা হাতের ফলগুলা নামাইয়া নিকটের ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়িতে লাগিল। বলিল—এদিকে সরে আয়, নোলক পরিয়ে দি—

তাহার দিদি ওড়্‌কলমী ফুলের নোলক পরিতে ভালবাসসে, বনজঙ্গল সন্ধান করিয়া সে প্রায়ই খুঁজিয়া আনিয়া নিজে পরে ও ইতিপূর্বে কয়েকবার অপুকেও পরাইয়াছে। অপু কিন্তু মনে মনে নোলক-পরা পছন্দ করে না। তাহার ইচ্ছা, বলে, নোলকে তাহার দরকার নাই। তবে দিদির ভয়ে সে কিছু বলিল না। দিদিকে চটাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই, কারণ দিদিই বনজঙ্গল ঘুরিয়া কুলটা, জামটা, নোনাটা, আমড়াটা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লুকাইয়া খাওয়ায়, এমন সব জিনিস জুটাইয়া আনে, যাহা হয়তো কুপথ্য হিসাবে উহাদের খাইতে নিষেধ আছে। কাজেই অন্যায় হইলেও দিদির কথা না শুনা তাহার সাহসে কুলায় না।

একটা কুঁড়ি ভাঙিয়া সাদা জলের মত যে আঠা বাহির হইল, তাহার সাহায্যে দুর্গা অপুর নাকে কুঁড়ি আঁটিয়া দিল, পরে নিজেও একটা পরিল—তারপর ভাইয়ের চিবুকে হাত দিয়া নিজের দিকে ভাল করিয়া ফিরাইয়া বলিল—দেখি কেমন দেখাচ্চে? বাঃ বেশ হয়েচে—চল মাকে দেখাইগে—

অপু লজ্জিতমুখে বলিল—না দিদি—

—চল না—খুলে ফেলিসনে যেন—বেশ হয়েচে—

বাড়ী আসিয়া দুর্গা নোনাফলগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাইয়া রাখিল। সর্বজয়া রাঁধিতেছিল—দেখিয়া খুব খুশি হইয়া বলিল—কোথায় পেলি রে?

দুর্গা বলিল—ঐ লিচু-জঙ্গলে—অনেক আছে, কাল গিয়ে তুমি পাড়বে মা? এমন পাকা—একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা—

সে আড়াল ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ছাখো মা—

অপু নোলক পরিয়া দিদির পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—ও মা! ও আবার কে রে?—কে চিনতে তো পারচি নে—

অপু লজ্জায় তাড়াতাড়ি নাকের ডগা হইতে ফুলের কুঁড়ি খুলিয়া ফেলিল। —বলিল ঐ দিদি পরিয়ে দিয়েচে—

দুর্গা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চল্ রে অপু, ঐ কোথায় ডুগডুগী বাজচে, চল্ বাঁদর খেলাতে এসেছে ঠিক্, শীগগির আয়—

আগে আগে দুর্গা ও তাহার পিছনে পিছনে অপু বাটির বাহির হইয়া গেল। সম্মুখের পথ বাহিয়া, বাঁদর নয়, ও-পাড়ার চিনিবাস ময়রা মাথায় করিয়া খাবার ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে। ও-পাড়ায় তাহার দোকান, তা ছাড়া সে আবার গুড়ের ও ধানের ব্যবসাও করে। কিন্তু পুঁজি কম হওয়ায় কিছুতেই সুবিধা করিতে পারে না, অল্পদিনেই ফেল মারিয়া বসে। তখন হয়তো মাথায় করিয়া হাটে আলু পটল, কখনও পান বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। শেষে তাতেও যখন সুবিধা হয় না, তখন হয়তো সে ঝুলি ঘাড়ে করিয়া জাত-ব্যবসা আরম্ভ করে। পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, আবার পাথুরে চুন মাথায় করিয়া বেড়াইতেছে। লোকে বলে একমাত্র মাছ ছাড়া এমন কোনো জিনিস নাই, যাহা তাহাকে বিক্রয় করিতে দেখা যায় নাই। কাল দশহরা, লোকে আজ হইতেই মুড়কী সন্দেশ কিনিয়া রাখিবে। চিনিবাস হরিহর রায়ের দুয়ার দিয়া গেলেও বাড়ী ঢুকিল না। কারণ সে জানে এ বাড়ীর লোক কখনো কিছু কেনে না। তবুও দুর্গা-অপুকে দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাই নাকি?

অপু দিদির মুখের দিকে চাহিল। দুর্গা চিনিবাসের দিকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—নাঃ—

চিনিবাস ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গিয়া মাথার চাঙারী নামাইতেই বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ীতে পাঁচ ছয়টা গোলা আছে, এ গ্রামে অন্নদা রায়ের নীচেই জমিজমা ও সম্পত্তি বিষয়ে তাঁহার নাম করা যাইতে পারে।

ভুবন মুখুয্যের স্ত্রী বহুদিন মারা গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার সেজ ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এ সংসারের কর্ত্রী।

সেজ-বৌ-এর বয়স চল্লিশের উপর হইবে, অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

সেজ-বৌ একখানা মাজা পিতলের সরায় করিয়া চিনিবাসের নিকট হইতে মুড়কী, সন্দেশ, বাতাসা দশহরা পূজার জন্য লইলেন। ভুবন মুখুয্যের ছেলেমেয়ে ও তাঁহার নিজের ছেলে সুনীল সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের জন্যও খাবার কিনিলেন। পরে অপুকে সঙ্গে লইয়া দুর্গা চিনিবাসের পিছন পিছন ঢুকিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সেজ-বৌ নিজের ছেলে সুনীলের কাঁধে হাত দিয়া একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—যাও না, রোয়াকে

উঠে গিয়ে খাও না। এখানে ঠাকুরের জিনিস, মুখ থেকে ফেলে এঁটো করে বসবে।

চিনিবাস চাঙারী মাথায় তুলিয়া পুনরায় অন্য বাড়ী চলিল! দুর্গা বলিল —আয় অপু, চল্ দেখিগে টুনুদের বাড়ী—

ইহারা সদর দরজা পার হইতেই সেজ-বৌ মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—দেখতে পারিনে বাপু, ছুঁড়িটার যে কী হ্যাংলা স্বভাব—নিজের বাড়ী আছে, গিয়ে বসে কিনে খেগে যা না? তা না, লোকের দোর দোর—যেমন মা তেমনি ছাঁ—

ইহাদের বাটীর বাহির হইয়া দুর্গা ভাইকে আশ্বাস দিবার স্বরে বলিল—চিনিবাসের ভারি তো খাবার। বাবার কাছ থেকে দেখিস রথের সময় চারটে পয়সা নেবো—তুই দুটো, আমি দুটো। তুই আমি মুড়কী কিনে খাবো—

খানিকটা পরে ভাবিয়া ভাবিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—রথের আর কতদিন আছে রে দিদি?

পথের পাঁচালী — দশম পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে।

সর্বজয়া ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর কুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিল, পিছনে পিছনে অপু মায়ের আঁচল মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া ও বাড়ী হইতে আসিল। সর্বজয়া ঘড়া নামাইয়া রাখিয়া বলিল—তা তুই পেছনে পেছনে অমন করে ঘুরতে লাগলি কেন বল দিকি? ঘরকন্নার কাজকর্ম সারবো তবে তো ঘাটে যাবো? কাজ কর্তে দিবি না—না?

অপু বলিল—তা হোক্—কাজ তুমি ও বেলা ক'রো এখন মা, তুমি যাও ঘাটে। পরে মায়ের সহানুভূতি আকর্ষণের আশায় অতীব করুণস্বরে কহিল—আচ্ছা আমার খিদে কি পায় না? আজ চারদিন যে খাইনি।

—খাওনি তো করবো কি? রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে জ্বর বাধিয়ে বসবে, বল্লে কথা কানে নাও নাকি তোমরা? ছিষ্টির কাজ করবো তবে তো ঘাটে যাবো। বসে তো নেই? যা, ও রকম দুষ্টুমি করিস নে—তোমাদের ফরমাজ মত কাজ করবার সাধ্যি আমার নেই, যা—

অপু মায়ের আঁচল আরও জোর করিয়া মুঠা পাকাইয়া ধরিয়া বলিল—কক্ষনো তোমায় কাজ কর্তে দেবো না। রোজই তো করো, একদিন বুঝি

বাদ যাবে না? এক্ষুনি ঘাটে যাও—না, আমি শুন্‌বো না···করো দিকি কেমন কাজ করবে?

সর্বজয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ও রকম দুষ্টুমি করে না, ছিঃ—এই হয়ে গ্যালো বলে, আর একটুখানি সবুর করো—ঘাটে যাবো, ছুটে এসে তোমার ভাত চড়িয়ে দোব—দুষ্টুমি করে কি? ছাড় আঁচল, ক'খানা পল্‌তার বড়া ভাজা খাবি বল্‌ দিকি?

ঘণ্টাখানেক পর অপু মহা উৎসাহের সহিত খাইতে বসিল।

গ্রাস তুলিয়া সে ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া অর্ধেকখানি খালি করিয়া ফেলিয়া, পরে আরও দু'এক গ্রাস খাইয়া কিছু ভাত পাতের নীচে ছড়াইয়া বাকী জলটুকু শেষ করিয়া হাত তুলিয়া বসিল।

—কৈ খাচ্ছিস্‌ কৈ? এতক্ষণ তো ভাত ভাত ক'রে হাঁপাচ্ছিলে—পল্‌তার বড়া—পল্‌তার বড়া—ঐ তো সবই ফেলে রাখলি, খেলি কি তবে?

সর্বজয়া একবাটি দুধ-ভাত মাখিয়া পুত্রকে খাওয়াইতে বসিল। দেখি হাঁ কর্‌—তোমার কপালখানা—মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো ভাত আর ভাত—তা ছেলের দশা দেখলে হয়ে আসে—রোজ ভাত খেতে বসে মুখ কাঁচুমাচু—বাঁচবে কি খেয়ে? বাঁচতে কি এসেচ? আমায় জ্বালাতে এসেচ বৈ তো নয়—ও-রকম মুখ ঘুরিও না, ছিঃ—হাঁ করো লক্ষ্মী—দেখি এই দলাটা হ'লেই হোয়ে গেল—আবাব ওবেলা টুনুদের বাড়ি মনসার ভাসান হবে। তুই জানিস নে বুঝি? শীগগির খেয়ে নিয়ে চলো। আমরা সব—

দুর্গা বাড়ী ঢুকিল। কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিতেছে। এক-পা ধূলা, কপালের সামনে এক-গোছা চুল সোজা হইয়া প্রায় চার আঙুল উঁচু হইয়া আছে। সে সব সময় আপন মনে ঘুরিতেছে—পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাহার বড় একটা খেলাধূলা নাই—কোথায় কোন্‌ ঝোপে বৈঁচি পাকিল, কাদের বাগানে কোন্‌ গাছটায় আমের গুটি বাঁধিয়াছে, কোন্‌ বাঁশতলায় শেয়াকুল খাইতে মিষ্ট—এ সব তাহার নখদর্পণে? পথে চলিতে চলিতে সে সর্বদা পথের দুই পাশে সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে—কোথাও কাঁচপোকা বসিয়া আছে কি না! যদি কোথাও কণ্টিকারী গাছের পাকা ফল দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ খেলাঘরের বেগুন করিবার জন্য তাহা তুলিতে বসিয়া যাইবে। হয়তো পথে কোথাও বসিয়া সে নানারকমের খাপরা লইয়া ছুঁড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে, গঙ্গা-যমুনা খেলায় কোন্‌ খানায় ভাল তাক হয়—পরীক্ষায় যে-খানা ভাল বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেখানা সে সযত্নে আঁচলে বাঁধিয়া লইবে। সর্বদাই সে পুতুলের বাক্স ও খেলাঘরের সরঞ্জাম লইয়া মহাব্যস্ত।

সে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। সর্বজয়া বলিল—এলে। এসো, ভাত তৈরী। খেয়ে আমায় উদ্ধার করো—তারপর আবার কোনদিকে বেরুতে হবে বেরোও। বোশেখ মাসের দিন সকলের মেয়ে ছাখো গে যাও সেঁজুতি করচে, শিবপূজো করচে—আর অতবড় ধাড়ী মেয়ে—দিনরাত কেবল টো টো। সেই সকাল হতে না হতে বেরিয়েচে, আর এখন এই বেলা ত্বপুর ঘুরে গিয়েছে, এখন এল বাড়ী—মাথাটার ছিরি ছাখো না? না একটু তেল দেওয়া, না একটু চিরুণী ছোঁয়ানো—কে বলবে বামুনের মেয়ে, ঠিক যেন তুলে কি বাগ্‌দীদের কেউ—বিয়েও হবে ঐ তুলে-বাগ্‌দীদের বাড়ীতেই—আঁচলে ওগুলো কী ধনদৌলত বাঁধা—খোল্—

দুর্গা ভয়ে ভয়ে আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে কহিল—ওই রায়-কাকাদের বাড়ীর সামনে কালকাসুন্দে গাছে—পরে ঢোঁক গিলিয়া কহিল—এই অনেক বেনেবৌ তাই—

বেনে-বৌএর কথায় হৃদয় গলে না এমন পাষাণ জীবও জগতে অনেক আছে। সর্বজয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া কহিল—তোর বেনেবৌয়ের না নিকুচি করেচে, যত ছাই আর ভসসো রাতদিন বেঁধে নিয়ে ঘুরচেন—আজ টান মেরে তোমার পুতুলের বাক্স ঐ বাঁশতলার ডোবায় যদি না ফেলি তবে—

সর্বজয়ার কথা শেষ হইবার পূর্বেই এক ব্যাপার ঘটিল। আগে আগে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর সেজ ঠাকরুণ, পিছনে পিছনে তাঁহার মেয়ে টুনু ও দেওরের ছেলে সতু, তাহাদের পিছনে আর চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে সম্মুখে দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিল। সেজ ঠাকরুণ কোনো দিকে না চাহিয়া বা বাড়ীর কাহারও সহিত কোনো আলাপ না করিয়া সোজা হন্‌হন্ করিয়া ভিতরের দিকের রোয়াকে উঠিলেন। নিজের ছেলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কৈ নিয়ে আয় —বের কর পুতুলের বাক্স, দেখি—

এ বাড়ীর কেহ কোনো কথা বলিবার পূর্বেই টুনু ও সতু, দুজনে মিলিয়া দুর্গার টিনের পুতুলের বাক্সটা ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোয়াকে নামাইল এবং টুনু বাক্স খুলিয়া খানিকটা খুঁজিবার পর একছড়া পুঁতির মালা বাহির করিয়া বলিল—এই ছাখো মা, আমার সেই মালাটা—সেদিন যে সেই খেলতে গিয়েছিল, সেদিন চুরি করে এনেচে।

সতু বাক্সের এক কোন সন্ধান করিয়া গোটাকতক আমের গুটি বাহির করিয়া বলিল—এই ছাখো জ্যেঠিমা আমাদের সোনামুখী গাছের আম পেড়ে এনেচে।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ হইয়া গেল বা ইহাদের গতিবিধি এ বাড়ীর সকলের কাছেই এত রহস্যময় মনে হইল যে এতক্ষণ কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা

বাহির হয় নাই। এতক্ষণ পরে সর্বজয়া কথা খুঁজিয়া বলিল—কি, কি খুড়ীমা? কা হয়েচে? পরে সে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে ব্যগ্রভাবে উঠিয়া আসিল।

—এই ছাখো না কি হয়েছে, কীর্তিখানা দ্যাখো না একবার—তোমার মেয়ে সেদিন খেলতে গিয়ে টুনুর পুতুলের বাক্স থেকে এই পুঁতির মালা চুরি করে নিয়ে এসেছে—মেয়ে কদিন থেকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারপর সতু গিয়ে বললে যে, তোর পুঁতির মালা দুগ্‌গাদিদির বাক্সের মধ্যে দেখে এলাম—ছাখো একবার কাণ্ড—তোমার ও মেয়ে কম নাকি?—চোর—চোরের বেহদ্দ চোর—আর ওই ছাখো না—বাগানের আমগুলো গুটি পড়তে দেরি সয় না—চুরি করে নিয়ে এসে বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে।

যুগপৎ দুই চুরির অতর্কিততায় আড়ষ্ট হইয়া দুর্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল। সবজয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনিচিস এই মালা ওদের বাড়ী থেকে?

দুর্গা কথার উত্তর দিতে না দিতে সেজ-বৌ বলিলেন—না আনলে কি আর মিথ্যে করে বলচি নাকি! বলি এই আম কটা দ্যাখো না? সোনামুখীর আম চেন না নাকি? এও কি মিথ্যে কথা?

সবজয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না সেজখুড়ী, আপনার কথা মিথ্যে তা তো বলিনি! আমি ওকে জিজ্ঞেস করচি।

সেজ-ঠাকরুণ হাত নাড়িয়া ঝাঁজের সহিত বলিলেন—জিগ্যেস করো আর যা করো বাপু, ও মেয়ে সোজা মেয়ে হবে না আমি বলে দিচ্চি—এই বয়েসে যখন চুরি বিদ্যে ধরেচে, তখন এর পর যা হবে সে টেরই পাবে। চল্ রে সতু —নে—আমের গুটিগুলো বেঁধে নে—বাগানের আমগুলো লক্কিছাড়া ছুঁড়ীর জ্বালায় যদি চোখে দেখবার জো আছে। টুনু, মালা নিইচিস তো?

সবজয়ার কি জানি কেমন একটু রাগ হইল—ঝগড়াতে সে কিছু পিছু হটিবার পাত্র নয়, বলিল পুঁতির মালার কথা জানিনে সেজ-খুড়ী, কিন্তু আমের গুটিগুনো, সেগুনো পেড়েছে কি তলা থেকে কুড়িয়ে এনেছে, তার গায়ে তো নাম লেখা নেই সেজখুড়ী—আর ছেলেমানুষ যদি ধরো এনেই থাকে—

সেজ ঠাকরুণ অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন—বলি কথাগুলো তো বেশ কেটে কেটে বলচো? বলি আমের গুটিতে নাম লেখা না হয় নেই-ই, তোমাদের কোন্ বাগান থেকে এগুলো এসেছে তা বলতে পার? বলি টাকাগুনোতেও তো নাম লেখা ছিল না—তা তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলে? আজ এক বচ্ছরের ওপর হয়ে গ্যালো, আজ দেবো কাল দেবো—আসবো এখন ওবেলা—

টাকা দিয়ে দিও—ও আমি আর রাখতে পারবো না—টাকার জোগাড় করে রেখো বলে দিচ্চি।

দলবল সহ সেজ ঠাকৃরুণ দরজার বাহির হইয়া গেলেন। সর্বজয়া শুনিতে পাইল পথে কাহার কথার উত্তরে তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিতেছেন—ওই এ-বাড়ীর ছুঁড়ীটা, টুনুর বাক্স থেকে এই পুঁতির মালাছড়াটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে করেচে কি নিজের বাক্সে লুকিয়ে রেখেচে—আর ছাখো না এই আমগুলো—পাশেই বাগান, যত ইচ্ছে পাড়লেই হোল—তাই বলতে গেলাম, তা আমায় আবার কেটে কেটে বল্‌চে—(এখানে সেজ-বৌ সর্বজয়ার কথা বলিবার ভঙ্গী নকল করিলেন)—তা—এনেচে ছেলেমানুষ—ও রকম এনেই থাকে—ওতে কি তোমাদের নাম লেখা আছে নাকি ? (স্বর নীচু করিয়া) মা-ই কি কম চোর নাকি, মেয়ের শিক্ষে কি আর অম্‌নি হয়েচে ? বাড়ীসুদ্দ সব চোর—

অপমানে দুঃখে সর্বজয়ার চোখে জল আসিল। সে ফিরিয়া দুর্গার রুক্ষ চুলের গোছা টানিয়া ধরিয়া ডাল-ভাত মাখা হাতেই দুড়-দাড় করিয়া তাহার পিঠে কিলের উপর কিল ও চড়ের উপর চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—আপদ বালাই একটা কোত্থেকে এসে জুটেছে—মলেও আপদ চুকে যায়—মরেও না যে বাঁচি—হাড় জুড়োয়—বেরো বাড়ী থেকে, দূর হয়ে যা—যা এখ্‌খুনি বেরো—

দুর্গা মার খাইতে খাইতে ভয়ে খিড়কী দোর দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার ছেঁড়া রুক্ষ চুলের গোছা দু-এক গাছা সর্বজয়ার হাতে থাকিয়া গেল।

অপু খাইতে খাইতে অবাক হইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। দিদি পুঁতির মালা চুরি করিয়া আনিয়াছিল কিনা তাহা সে জানে না—পুঁতির মালাটা সে ইহার আগে কোনও দিন দেখে নাই—কিন্তু আমের গুটি যে চুরির জিনিস নয় তাহা সে নিজে জানে। কাল বৈকালে দিদি তাহাকে সঙ্গে করিয়া টুনুদের বাগানে আম কুড়াইতে গিয়াছিল এবং সোনামুখীর তলায় আম কটা পড়িয়াছিল, দিদি কুড়াইয়া লইল, সে জানে। কাল হইতে অনেকবার দিদি বলিয়াছে—ও অপু, এবার সেই আমের গুটিগুলো জারাবো; কেমন তো ! কিন্তু মা অসুবিধাজনকভাবে বাড়ী উপস্থিত থাকার দরুণ উক্ত প্রস্তাব আর কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। দিদির অত্যন্ত আশার জিনিস আমগুলো এভাবে লইয়া গেল, তাহার উপর আবার দিদি এরূপভাবে মারও খাইল। দিদির চুল ছিঁড়িয়া দেওয়ায় মায়ের উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। যখন তাহার দিদির মাথার সামনে রুক্ষ চুলের এক গোছা খাড়া হইয়া বাতাসে উড়ে

—তখনই কি জানি কেন, দিদির উপর অত্যন্ত মমতা হয়—কেমন যেন মনে হয়, দিদির কেহ কোথাও নাই—সে যেন একা কোথা হইতে আসিয়াছে—উহার সাথী কেহ এখানে নাই। কেবলই মনে হয়, কেমন করিয়া সে দিদির সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দিবে—সকল অভাব পূরণ করিয়া তুলিবে। তাহার দিদিকে সে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না।

খাওয়ার পরে অপু মায়ের ভয়ে ঘরের মধ্যে বসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহার মন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল। বেলা একটু পড়িলে সে টুনুদের বাড়ী, পটুলিদের বাড়ী, নেড়াদের বাড়ী—একে একে সকল বাড়ী খুঁজিল—দিদি কোথাও নাই। রাজকৃষ্ণ পালিতের স্ত্রী ঘাট হইতে জল লইয়া আসিতেছিলেন—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—জ্যেঠিমা, আমার দিদিকে দেখেচো? সে আজ ভাত খায়নি, কিছু খায়নি,—মা তাকে আজ বড্ড মেরেচে—মার খেয়ে কোথায় পালিয়েচে, দেখেচো জ্যেঠিমা?

বাড়ীর পাশের পথ দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিল—বাঁশ-বাগানে সে যদি বসিয়া থাকে? সেদিকে গিয়া সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল। সে খিড়কি-দরজা দিয়া বাড়ী ঢুকিয়া দেখিল, বাড়ীতে কেহ নাই। তাহার মা বোধহয় ঘাটে কি অন্য কোথাও গিয়াছে। বাড়ীতে বৈকালের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে। সম্মুখের দরজার কাছে যে বাঁশঝাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার একগাছা ঝুলিয়া-পড়া শুক্‌নো কঞ্চিতে তাহার পরিচিত সেই লেজ্‌ঝোলা হলদে পাখী আসিয়া বসিয়াছে। রোজই সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে কোথা হইতে আসিয়া এই বাঁশঝাড়ের ঐ কঞ্চিখানার উপর বসে—রোজ—রোজ—রোজ। আরও কত কি পাখী চারিদিকের বনে কিচ্‌ কিচ্‌ করিতেছে। নীলমণি রায়েদের পোড়ো ভিটা গাছপালার ঘন ছায়ায় ভরিয়া গিয়াছে। অপু রোয়াকে দাঁড়াইয়া দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার মাথার দিকটায় চাহিয়া দেখিল—একটু-একটু রাঙা রোদ গাছের মাথায় এখন মাখানো, মগডালে একটা কি সাদা মত দুলিতেছে, হয় বক, নয় কাহার ঘুড়ি ছিঁড়িয়া আটকাইয়া ঝুলিতেছে—সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন ছায়া আর অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। চারিদিক নির্জন··· কেহ কোনোদিকে নাই···নীলমণি রায়ের পোড়ো ভিটায় কচুঝাড়ের কালো ঘন সবুজ নতুন পাতা চক্ চক্ করিতেছে। তাহার মন হঠাৎ হু-হু করিয়া উঠিল। কতক্ষণ হইল, সেই গিয়াছে, বাড়ী আসে নাই, খায় নাই—কোথায় গেল দিদি?

ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা মিলিয়া উঠানে ছুটাছুটি করিয়া লুকো-

চুরি খেলিতেছে! রাণু তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল—ভাই, অপু এসেচে…ও আমাদের দিকে হবে, আয় রে অপু।

অপু তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি খেলবো না রাণুদি—দিদিকে দেখেচো?

রাণু জিজ্ঞাসা করিল,—দুগ্গা? না, তাকে তো দেখিনি! বকুলতলায় নেই তো?

বকুলতলার কথা তাহার মনেই হয় নাই! সেখানে দুর্গা প্রায়ই থাকে বটে! ভুবন মুখুয্যের বাড়ী হইতে সে বকুলতলায় গেল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে—বকুলগাছটা অনেক-দূর পর্যন্ত জুড়িয়া ডালপালা ছড়াইয়া ঝুপসি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তলাটা অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই…যদি কোনোদিকে গাছপালার আড়ালে থাকে! সে ডাক দিল—দিদি, ও দিদি! দিদি?

অন্ধকার গাছটায় কেবল কতকগুলো বক পাখা ঝট্‌পট্ করিতেছে মাত্র। অপু ভয়ে ভয়ে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বকুলতলী হইতে একটু দূরে ডোবার ধারে খেজুর গাছ আছে, এখন ডাঁশা খেজুরের সময়, সেখানেও তাহার দিদি মাঝে মাঝে থাকে বটে। কিন্তু অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, ডোবাটার দুই ধারে বাঁশবন, সেখানে যাইয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না। বকুল গাছের গুঁড়ির কাছে সরিয়া গিয়া সে দুই-একবার চীৎকার করিয়া ডাকিল—ভাঁট-শেওড়া বনে কি জন্তু তাহার গলার সাড়া পাইয়া খসখস শব্দ করিয়া ডোবার দিকে পলাইল।

বাড়ীর পথে ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সামনে সেই গাব গাছটা! একা সন্ধ্যার পর এ গাবগাছের তলার পথ দিয়া যাওয়া! সর্বনাশ! গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে! কেন যে তাহার এই গাছটার নীচে দিয়া যাইতে ভয় করে, তাহা সে জানে না। কোন কারণ নাই, এমনিই ভয় করে এবং কারণ কিছু নাই বলিয়া ভয় অত্যন্ত বেশী করে। এত দেরী পর্যন্ত সে কোনোদিন বাড়ীর বাহিরে থাকে নাই—আজ তাহার সে খেয়াল হইল না। মন ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক না থাকিলে সে কখনই এপথে আসিত না।

অপু খানিকক্ষণ অন্ধকার গাবতলাটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিল। তাহাদের বাড়ী যাইবার আর একটা পথ আছে—একটুখানি ঘুরিয়া পটুলিদের বাড়ীর উঠান দিয়া গেলে গাবতলার এ অজানা বিভীষিকার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়!

পটুলির ঠাকুরমা সন্ধ্যার সময় বাড়ীর রোয়াকে ছেলেপিলেদের লইয়া হাওয়ায় বসিয়া গল্প করিতেছেন। পটুলির মা রান্নাঘরে রাঁধিতেছেন।

উঠানে মাচাতলায় বিধু জেলেনী দাঁড়াইয়া মাছ বিক্রয়ের পয়সা তাগাদা করিতেছে।

অপু বলিল—দিদিকে খুঁজতে গিয়েছিলাম ঠাকুমা—বকুলতলা থেকে আসতে আসতে—

ঠাকুমা বলিলেন—দুগ্‌গা এই তো বাড়ী গেল। এই কতক্ষণ যাচ্ছে—ছুটে যা দিকি—বোধ হয় এখনো বাড়ী গিয়ে পৌছয়নি—

সে এক দৌড়ে বাড়ীব দিকে ছুটিল। পিছন হইতে পটুলির বোন রাজী চেঁচাইয়া বলিল—কাল সকালে আসিস্ অপু—আমরা গঙ্গা-যমুনা খেলার নতুন ঘর কেটেচি। ঢেঁকশালের পেছনে তিনতলায়—দুগ্‌গাকে বলিস—

তাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌছিয়া হঠাৎ সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল—দুর্গা আর্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে বাড়ীর দরজা দিয়া দৌড়াইয়া বাহির হইতেছে—পিছনে পিছনে তাহার মা কি একটা হাতে মারিতে মারিতে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে! দুর্গা গাবতলার পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, মা দরজা হইতে ধাবমানা মেয়ের পিছনে চেঁচাইয়া বলিল—যাও, বেরোও—একেবারে জন্মের মত যাও—আর কক্ষনো বাড়ী যেন ঢুকতে না হয়—বালাই, আপদ চুকে যাক্—একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।

ছাতিমতলায় গ্রামের শ্মশান। অপুর সমস্ত শরীর যেন জমিয়া পাথরের মত আড়ষ্ট ও ভারী হইয়া গেল। তাহার মা সবেমাত্র ভিতরের বাড়ীতে ঢুকিয়া মাটির প্রদীপটা রোয়াকের ধার হইতে উঠাইয়া লইতেছে। সে পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ঢুকিতেই তাহার মা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি আবার এতরাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে শুনি? মোটে তো আজ ভাত খেয়েচো?

তাহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিতেছিল। দিদি আবার মার খাইল কেন? সে এতক্ষণ কোথায় ছিল? দুপুর বেলা দিদি কি খাইল? সে কি আবার কোন জিনিস চুরি করিয়া আনিয়াছে? কিন্তু ভয়ে কোন কথা না বলিয়া সে কলের পুতুলের মত মায়ের কথা মত কাজ করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পরে ভয়ে ভয়ে প্রদীপ উস্কাইয়া নিজের ছোট বইয়ের দপ্তরটি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল। সে পড়ে মোটে তৃতীয় ভাগ—কিন্তু তাহার দপ্তরে দুখানা মোটা মোটা ভারী ইংরাজী কি বই, কবিরাজী ঔষধের তালিকা, একখানা পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালী, একখানা ১৩০৩ সালের পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি আছে। সে নানাস্থান হইতে চাহিয়া এগুলি জোগাড় করিয়াছে এবং এগুলি না পড়িতে পারিলেও রোজ একবার করিয়া খুলিয়া দেখে।

খানিকক্ষণ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া সে কি ভাবিল। পরে আর একবার

প্রদীপ উস্কাইয়া দিয়া পাতা-ছেঁড়া দাশুরায়ের পাঁচালীখানা খুলিয়া অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টাইতেছে, এমন সময়ে সর্বজয়া এক বাটি দুধ হাতে করিয়া ঢুকিয়া বলিল—এস, খেয়ে নাও দিকি!

অপু দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটি উঠাইয়া দুধ চুমুক দিয়া খাইতে লাগিল। অন্যদিন হইলে এত সহজে দুধ খাইতে তাহাকে রাজী করানো খুব কঠিন হইত। একটুখানি মাত্র খাইয়া সে বাটি মুখ হইতে নামাইল। সর্বজয়া বলিল—ওকি? নাও সবটুকু খেয়ে ফেলো—ওইটুকু দুধ ফেললে তবে বাঁচবে কি খেয়ে—

অপু বিনা প্রতিবাদে দুধের বাটি পুনরায় মুখে উঠাইল। সর্বজয়া দেখিল সে মুখে বাটি ধরিয়া রহিয়াছে কিন্তু চুমুক দিতেছে না···তাহার বাটিসুদ্ধ হাতটা কাঁপিতেছে···পরে অনেকক্ষণ মুখে ধরিয়া রাখিয়া হঠাৎ বাটি নামাইয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি হোল রে? কি হয়েচে, জিভ কামড়ে ফেলেছিস্?

অপু মায়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বাঁধ না মানিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিও—দিদির জন্যে বড্ড মন কেমন করচে!···

সর্বজয়া অল্পক্ষণ মাত্র চুপ করিয়া বসিয়া পরে সরিয়া আসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শান্তস্বরে বলিতে লাগিল—কেঁদো না, অমন করে কেঁদো না,—ঐ পটলিদের কি নেড়াদের বাড়ী বসে আছে—কোথায় যাবে অন্ধকারে? কম দুষ্টু মেয়ে নাকি? সেই দুপুর বেলা বেরুল—সমস্ত দিনের মধ্যে আর চুলের টিকি দেখা গেল না—না খাওয়া, না দাওয়া, কোথায় ওপাড়ার পালিতদের বাগানে বসে ছিল, সেখানে বসে কাঁচা আম আর জামরুল খেয়েছে, এক্ষুনি ডাকতে পাঠাচ্ছি—কেঁদো না অমন করে—আবার জ্বর আস্‌বে—ছিঃ।

পরে সে আঁচল দিয়া ছেলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বাকী দুধটুকু খাওয়াইবার জন্য বাটি তাহার মুখে তুলিয়া ধরিল—হাঁ করো দিকি, লক্ষী, সোনা, উনি এলেই ডেকে আনবেন এখন···একেবারে পাগল—কোত্থেকে একটা পাগল এসে জন্মেছে—আর এক চুমুক—হ্যাঁ—

রাত অনেক হইয়াছে। উত্তরের ঘরের তক্তাপোশে অপু ও দুর্গা শুইয়া আছে। অপুর পাশে তাহার মায়ের শুইবার জায়গা খালি আছে। কারণ মা এখনও রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসে নাই। তাহার বাবা আহারাদি সারিয়া পাশের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। বাবা বাড়ী আসিয়া দুর্গাকে পাড়া হইতে খুঁজিয়া আনিয়াছেন।

বাড়ী আসিয়া পর্যন্ত দুর্গা কাহারও সঙ্গে কোনো কথা বলে নাই! খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়াছে। অপু দুর্গার গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, মা কি দিয়ে মেরেছিল রে সন্দে বেলা? তোর চুল ছিঁড়ে দিয়েচে?

দুর্গার মুখে কোন কথা নাই।

সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—আমার উপর রাগ করেচিস্, দিদি? আমি তো কিছু করিনি।

দুর্গা আস্তে আস্তে বলিল—না বৈকি! তবে সতু কি করে টের পেলো যে পুঁতির মালা আমার বাক্সে আছে?

অপু প্রতিবাদের উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল। না—সত্যি আমি তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি দিদি, আমি তো দেখাইনি। আমি জানিনে যে তোর বাক্সে আছে—কাল সতু বিকেল বেলা এসেছিল, ওর সেই বড় রাঙা ভাঁটাটা নিয়ে আমরা খেল্‌ছিলাম—তার পর, বুঝলি দিদি, সতু তোর পতুলের বাক্স খুলে কি দেখছিল—আমি বল্লাম, ভাই, তুমি দিদিব বাক্সে হাত দিও না—দিদি আমাকে বকে—সেই সময় দেখেচে—

পবে সে দুর্গার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—খুব লেগেচে রে দিদি? কোথায় মেবেচে মা?

দুর্গা বলিল—আমাব কানের পাশে মা একটা বাড়ি যা মেরেছে—রক্ত বেরিযেছিল, এখনও কন্ কন্ কচ্ছে, এইখানে এই ছাখ হাত দিয়ে। এই—

এইখানে? তাই ত বে! কেটে গিয়েছে যে? একটু পিদিমের তেল লাগিয়ে দেব দিদি?

থাকগে—কাল পালিতদের বাগানে বিকেল বেলা যাব বুঝ্‌লি? কামরাঙ্গা যা পেবেচে! এই এই এত বড বড, কাউকে যেন বলিসনে। তুই আব আমি চুপি চুপি যাবো—আমি আজ দুপুর বেলা দুটো পেড়ে খেয়েচি—মিষ্টি যেন গুড—

এদিনের ব্যাপারটা এইরূপে ঘটিল।

অপু বাবার আদেশে তালপাতে সাতখানা ক খ হাতের লেখা শেষ করিয়া কি করা যায় ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর মধ্যে দিদিকে খুঁজিতে গেল। দুর্গা

মায়ের ভয়ে সকালে নাহিয়া আসিয়া ভিতরের উঠানের পেঁপেতলায় পুণ্যিপুকুরের ব্রত করিতেছে। উঠানে ছোট্ট চৌকোণা গর্ত কাটিয়া তাহার চারিধারে ছোলা, মটর ছড়াইয়া দিয়াছিল—ভিজে মাটিতে সেগুলির অঙ্কুর বাহির হইয়াছে—চারিদিকে কলার ছোট বোগ পুঁতিয়া ধারে পিটুলি গোলার আলপনা দিতেছে—পদ্মলতা,—পাখী, ধানের শীষ্, নতুন ওঠা সূর্য।

দুর্গা বলিল,—দাঁড়া, মন্তরটা বলে চল্ একজায়গায় যাব।

—কোথা রে, দিদি—

—চল্ না, নিয়ে যাবো এখন, দেখিস এখন—। পরে আনুষঙ্গিক বিধি অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিয়া সে এক-নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করিতে লাগিল—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা কে পুজে রে দুকুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী ভায়ের বোন্ ভাগ্যবতী—

অপু দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিল—ইঃ !

দুর্গা ছড়া থামাইয়া ইষৎ লজ্জা মিশানো হাসির সঙ্গে বলিল—তুই ও রকম কচ্চিস কেন ? যা এখান থেকে—তোর এখানে কি ?—যা।

অপু হাসিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে আবৃত্তি করিতে লাগিল—আমি সতী লীলাবতী ভাই বোন ভাগ্যবতী, হি হি, ভাই বোন ভাগ্যবতী—হি হি—

দুর্গা বলিল, তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না ? মাকে ব'লে তোমার ভ্যাংচানো বার করবো এখন—

ব্রতানুষ্ঠান শেষ করিয়া দুর্গা বলিল, চল গড়ের পুকুরে অনেক পানফল হ'য়ে আছে—ভোঁদার মা বলছিল, চল নিয়ে আসি—

গ্রামের একেবারে উত্তরাংশে চারিধারে বাঁশবন ও আগাছা এবং প্রাচীন আমকাঁঠালের বাগানের ভিতর দিয়া পথ। লোকালয় হইতে অনেক দূরে গভীর বন যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে মাঠের ধারে মজা পুকুরটা। কোনকালে গ্রামের আদি বাসিন্দা মজুমদারের বাড়ীর চতুর্দিকে যে গড়খাই ছিল তাহার অন্য অংশ এখন ভরাট হইয়া গিয়াছে—কেবল এই খাতটাতে বারোমাস জল থাকে, ইহারই নাম গড়ের পুকুর। মজুমদারের বাড়ী কোন চিহ্ন এখন নাই।

সেখানে পৌছিয়া তাহারা দেখিল পুকুরে পানফল অনেক আছে বটে, কিন্তু কিনারার ধারে বিশেষ কিছু নাই, সবই জল হইতে দূরে। দুর্গা বলিল—অপু, একটা বাঁশের কঞ্চি ছাখ তো খুঁজে—তাই দিয়ে টেনে টেনে আনবো। পরে সে পুকুরধারের ঝোপের শেওড়া গাছ হইতে পাকা শেওড়ার ফল তুলিয়া খাইতে লাগিল। অপু বনের মধ্যে কঞ্চি খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইয়া

বলিল—ও দিদি, ও ফল খাস্‌নি!—দূর্‌—আশ্‌শ্যাওড়ার ফল কি খায় রে? ও তো পাখীতে খায়—

দুর্গা পাকা ফল টিপিয়া বীজ বাহির করিতে করিতে বলিল—আয় দিকি—দ্যাখ দিকি খেয়ে—মিষ্টি যেন গুড—কে বলেছে খায় না? আমি তো কত খেইচি।

অপু কঞ্চি-কুড়ানো রাখিয়া দিদির কাছে আসিয়া বলিল—খেলে যে বলে পাগল হয়? আমায় একটা দে দিকি, দিদি—

পরে সে খাইয়া মুখ একটু কাঁচুমাচু করিয়া বলিল এট্‌টু এট্‌টু তেতো যে দিদি—

—তা এট্‌টু তেতো থাকবে না? তা থাক্‌, কেমন মিষ্টি বল্‌ দিকি—কথা শেষ করিয়া দুর্গা খুব খুশির সহিত গোটাকতক পাকা ফল মুখের মধ্যে পুরিল।

জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনো কোনো ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহাবা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন—তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্ট রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না—বিশ্বের অনন্ত-সম্পদেব মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘবেব বালকবালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুল ফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন!

খানিকটা পরে দুর্গা পুকুরের জলে একটু নামিয়া বলিল—কত নাল ফুল রয়েছে অপু। দাঁড়া তুলচি! জলে আরও নামিয়া সে দুইটা ফুলের লতা ধরিয়া টানিল—ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—ধর্‌ অপু। অপু বলিল—পানফল তো খুব জলে—ওখানে কি ক'রে যাবি দিদি? দুর্গা একটা কঞ্চি দিয়া দূর জলের পানফলের গাছগুলা টানিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। বলিল—বড্ড গড়ানো পুকুর রে—গড়িয়ে যাচ্চি ডুব জলে—নাগাল পাই কি ক'রে? তুই এক কাজ কর, পেছন থেকে আমার আঁচল ধ'রে টেনে রাখ দিকি, আমি কঞ্চি দিয়ে পানফলের ঐ ঝাঁকটা টেনে আনি।

বনের মধ্যে হলদে কি একটা পাখী ময়নাকাঁটা গাছের ডালের আগায় বসিরা পাছা নাচাইয়া ভারি চমৎকার শিষ দিতেছিল। অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কি পাখী রে দিদি?

—পাখী-টাখী এখন থাক্‌—ধর্‌ দিকি বেশ ক'রে আঁচলটা টেনে, গড়িয়ে যাবো—জোর ক'রে—

অপু পিছন হইতে আঁচল টানিয়া রহিল। দুর্গা পায়ে পায়ে নামিয়া যতদূর

যায় কঞ্চি আগাইয়া দিল। কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল তবু নাগাল আসে না—আরও একটুখানি নামিয়া আঙুলের আগায় মাত্র কঞ্চিখানাকে ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিল। অপু টানিয়া ধরিয়া থাকিতে থাকিতে শক্তিতে আর কুলাইতেছে না দেখিয়া পিছন হইতে হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে আঁচল ঢিলা হওয়াতে দুর্গা জলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল কিন্তু তখনই সামলাইয়া হাসিয়া বলিল—দূর, তুই যদি কোনো কাজের ছেলে—ধর্ ফের। অতিকষ্টে একটা পানফলের ঝাঁক কাছে আসিল—দুর্গা কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল কতগুলা পানফল ধরিয়াছে। পরে ডাঙায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—বড্ড কচি, এখনও দুধ হয়নি মধ্যে, আর একবার ধর্ তো। অপু আবার পিছন হইতে টানিয়া ধরিয়া রহিল। খানিকটা থাকিবার পর সে দিদির ঝুঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে টানের চোটে আবার দু-এক পা জলের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল—পরে কাপড় ভিজিয়া যায় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া হি কি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দুর্গা হাসিয়া বলিল, দূর !

ভাইবোনের কলহাস্যে খানিকক্ষণ ধরিয়া পুকুরপ্রান্তের নির্জন বাঁশবাগান মুখরিত হইতে লাগিল। দুর্গা বলিল, এতটুকু যদি জোর থাকে তোর গায়ে ? গাবের ঢেঁকী কোথাকার !

খানিকটা পরে দুর্গা জলে নামিয়া আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেছে, অপু ডাঙায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় অপু পাশের একটা শেওড়া গাছের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, দ্যাখ কি এখানে। ·· পরে সে ছুটিয়া গিয়া মাটি খুঁড়িয়া কি তুলিতে লাগিল।

দুর্গা জল হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কি রে ? পরে সেও উঠিয়া ভাইয়ের কাছে আসিল।

অপু ততক্ষণ মাটি খুড়িয়া কি একটা বাহির করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মাটি মুছিয়া সাফ করিতেছে। হাতে করিয়া আহ্লাদের সহিত দিদিকে দেখাইয়া বলিল—দ্যাখ দিদি, চকচক্ কচ্ছে—কি জিনিস রে ?

দুর্গা হাতে লইয়া দেখিল—গোলমত একদিকে ছুঁচোলো পল-কাটাকাটা চকচকে কি একটা জিনিস। সে খানিকক্ষণ আগ্রহের সহিত নানাভাবে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া তাহার রুক্ষচুলে-ঘেরা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ দেখিতেছে কিনা। চুপি-চুপি

বলিল—অপু, এটা বোধ হয় হীরে! চুপ কর, চেঁচাস্‌নে। পরে ভয়ে-ভয়ে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অপু দিদির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। হীরক বস্তুটি তাহার অজ্ঞাত নয় বটে,—মায়ের মুখে, দিদির মুখে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার হীরামুক্তার অলঙ্কারের ঘটা সে অনেকবার শুনিয়াছে; কিন্তু হীরা জিনিসটা কি রকম দেখিতে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে একটু ভুল ধারণা ছিল। তাহার মনে হইত হীরা দেখিতে মাছের ডিমের মত, হলদে হলদে, তবে নরম নয়—শক্ত।...

সর্বজয়া বাড়ী ছিল না, পাড়া হইতে আসিয়া দেখিল—ছেলেমেয়ে বাড়ীর ভিতর দিকে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কাছে যাইতে দুর্গা চুপি চুপি বলিল—মা, একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়েচি আমরা। গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়াছিলাম মা। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এইটে পোঁতা ছিল।

অপু বলিল—আমি দেখে দিদিকে বল্লাম, মা।

দুর্গা আঁচল হইতে জিনিসটা খুলিয়া মায়ের হাতে দিয়া বলিল—দ্যাখো দিকি কি এটা মা?

সর্বজয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। দুর্গা চুপি চুপি বলিল—মা, এটা ঠিক হীরে—নয়?

সর্বজয়ারও হীরক সম্বন্ধে ধারণা তাহাদের অপেক্ষা বেশী স্পষ্ট নহে। সে সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তুই কি ক'রে জানলি হীরে?

দুর্গা বলিল—মজুমদারেরা বড়লোক ছিলো তো মা? ওদের ভিটের জঙ্গলে কারা নাকি মোহর কুড়িয়ে পেয়েছিল—পিসি গল্প করতো। এটা একেবারে পুকুরের ধারে বনের মধ্যে পোঁতা ছিল, রোদ্দুর লেগে চক্‌চক্‌ করছিল,—এ ঠিক মা হীরে।

সর্বজয়া বলিল—আগে উনি আসুন, ওঁকে দেখাই।

দুর্গা বাহিরে উঠানে আসিয়া আহ্লাদের সহিত ভাইকে বলিল—হীরে যদি হয়, তবে দেখিস আমরা বড়মানুষ হয়ে যাবো।

অপু না বুঝিয়া বোকার মত হি হি করিয়া হাসিল।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে জিনিসটা বাহির করিয়া সর্বজয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। গোলমত, ধারকাটা ও পলতোলা, এক মুখ ছুঁচোলো—যেন সিন্দুর কৌটার ঢাকনির উপরটা। বেশ চক্‌চকে। সর্বজয়ার মনে হইল যেন অনেক রকম রং সে ইহার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। তবে কাচ যে নয়—ইহা ঠিক। এ রকম ধরণের কাচ সে কখনো দেখিয়াছে বলিয়া তো মনে হয়

না। হঠাৎ তাহার সমস্ত গা দিয়া যেন কিসের স্রোত বহিয়া গেল, তাহার মনের এক কোণে নানা সন্দেহের বাধা ঠেলিয়া একটা গাঢ় দুরাশা ভয়ে ভয়ে একটু উঁকি মারিল—সত্যিই যদি হীরে হয় তা হোলে ?

হীরক সম্বন্ধে তাহার ধারণাটা পরশপাথর কিংবা সাপের মাথার মণি জাতীয় ছিল। কাহিনীর কথা মাত্র, বাস্তব জগতে বড় একটা দেখা যায় না ; আর যদি বা দেখা যায়, তবে দুনিয়ার ঐশ্চর্য বোধহয় এক টুকরা হীরার বদলে পাওয়া যাইতে পারে।

খানিকটা পরে একটা পুঁটুলি হাতে হরিহর বাড়ী ঢুকিল।

সর্বজয়া বলিল—ওগো, শোনো, এদিকে এসো তো ! ছাখো তো এটা কি !

হরিহর হাতে লইয়া বলিল—কোথায় পেলে ?

—দুগগা গড়ের পুকুরে পানফল তুলতে গিয়েছিল, কুড়িয়ে পেয়েছে। কি বলো দিকি ?

হরিহর খানিকটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—কাচ, না হয়, পাথর-টাথর হবে—এতটুকু জিনিস, ঠিক বুঝতে পারচি নে।

সর্বজয়ার মনে একটুখানি ক্ষীণ আশার রেখা দেখা দিল—কাচ হইলে তাহার স্বামী কি চিনিতে পারিত না ? পরে সে চুপিচুপি, যেন পাছে স্বামী বিরুদ্ধযুক্তি দেখায় এই ভয়ে বলিল—হীরে নয় তো ? দুগ্‌গা বলছিলো মজুমদার বাড়ীর গড়ে তো কত লোক কত কি কুড়িয়ে পেয়েছে ! যদি হীরে হয় !

—হ্যাঁ, হীরে যদি পথেখাটে পাওয়া যেতো তবে আর ভাবনা কি ছিল ? তুমিও যেমন !···তাহার মনে মনে ধারণা হইল ইহা কাচ। পরক্ষণেই কিন্তু মনে হইল—হয়ত হইতেও পারে। বলা যায় কি ! মজুমদারেরা বড় লোক ছিল। বিচিত্র কি যে হয়ত তাহাদেরই গহনায় কোনো কালে বসানো ছিল, কি করিয়া মাটির মধ্যে পুঁতিয়া গিয়াছে ! কথায় বলে, কপালে না থাকিলে গুপ্তধন হাতে পড়িলেও চেনা যায় না—শেষে কি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্পের মত ঘটিবে ?

সে বলিল—আচ্ছা দাঁড়াও, একবার বরং গাঙ্গুলী-বাড়ী দেখিয়ে আনি।

রাঁধিতে রাঁধিতে সর্বজয়া বার বার মনে মনে বলিতে লাগিল—দোহাই ঠাকুর, কত লোক তো কত কি কুড়িয়ে পায়। এই কষ্ট যাচ্ছে সংসারের—বাছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিও—দোহাই ঠাকুর !

তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল।

খানিকটা পরে দুর্গা বাড়ী আসিয়া আগ্রহের স্বরে বলিল—বাবা এখনও বাড়ী ফেরে নি, হ্যাঁ মা ?

সঙ্গে সঙ্গে হরিহর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বলিল—হুঃ, তখনই আমি বল্লাম এ কিছুই নয়। গাঙ্গুলী মশায়ের জামাই সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন—তিনি দেখে বল্লেন, এ একরকম বেলোয়ারী কাচ—ঝাড়-লণ্ঠনে ঝুলোনো থাকে। রাস্তাঘাটে যদি হীরে-জহরৎ পাওয়া যেত, তা হোলে⋯তুমিও যেমন!

বৈশাখমাসের দিন। প্রায় দুপুর বেলা।

সর্বজয়া বাটনা বাটিতে বাটিতে ডান হাতের কাছে রক্ষিত একটা ফুলের সাজিতে (অনেকদিন হইতে ফুলের সহিত ইহার কোনো সম্পর্ক নাই, মশলা রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়) মশলা খুঁজিতে গিয়া বলিল—আবার জিরে-মরিচের পুঁটুলিটা কোথায় নিয়ে পালালি? বড্ড জ্বালাতন কচ্চিস অপু—বাঁধতে দিবিনে তারপর একটু পরেই বোলো এখন—মা ক্ষিদে পেয়েছে!

অপুর দেখা নাই।

—দিয়ে যা বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার—কেন জ্বালাতন কচ্চিস বল্ দিকি? দেখচিস বেলা হয়ে যাচ্ছে?

অপু রান্নাঘরের ভিতর হইতে দুয়ারের পাশ দিয়া ঈষৎ উঁকি মারিল; মায়ের চোখ সেদিকে পড়িতেই তাহার দুষ্টুমির হাসিভরা টুকটুকে মুখখানা শামুকের খোলার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার মত তৎক্ষণাৎ আবার দুয়ারের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সর্বজয়া বলিল—দ্যাখ দিকি কাণ্ড—কেন বাপু দিক করিস দুপুর বেলা? দিয়ে যা—

অপু পুনরায় হাসিমুখে ঈষৎ উঁকি মারিল।

—ওই আমি দেখতে পেয়েছি—আর লুকুতে হবে না, দিয়ে যা—

সর্বজয়া ছেলেকে ভালরূপেই চিনিত। যখন অপু ছোট্ট-খোকা দেড়-বছরেরটি তখন দেখিতে সে এখনকার চেয়েও টুকটুকে ফরসা ছিল। সর্বজয়ার মনে আছে, সে তাহার ডাগর চোখ-দুটিতে বেশ করিয়া কাজল পরাইয়া কপালের মাঝখানে একটা টিপ পরাইয়া দিত ও তাহার মাথায় একটা নাল রংএর কম দামের ঘুন্টিওয়ালা পশমের টুপি পরাইয়া, কোলে করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বাহিরের রকে দাঁড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার উদ্দেশ্যে সুর টানিয়া টানিয়া বলিত—

আয়রে পাখী—ই—ই লেজঝোলা,

আমার খোকনকে নিয়ে—এ—এ—গাছে তোল···

খোকা ট্যাপা ট্যাপা ফুলো-ফুলো গালে মায়ের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, পরে হঠাৎ কি মনে করিয়া সম্পূর্ণ দন্তহীন-মাড়ি বাহির করিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া মল-পরা অসম্ভবরূপ ছোট্ট পায়ে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইত। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিত—ওমা, খোকা আবার কোথায় লুকালো ? তাইতো, দেখতে তো পাচ্ছিনে। ও খোকা! ···পরে সে ঘাড়ের দিকে মুখ ফিরাইতেই শিশু আবার হাসিয়া মুখ সামনের দিকে ফিরাইত এবং নির্বোধের মত হাসিয়া মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইত। যতই সর্বজয়া বলিত—ওমা, কৈ আমার খোকা কৈ—আবার কোথায় গেলো—কৈ দেখি—ততই শিশুর খেলা চলিত। বারবার সামনে পিছনে ফিরিয়া সর্বজয়ার ঘাড়ে ব্যথা হইলেও শিশুর খেলা শেষ হইত না। সে তখন একেবারে আনকোরা টাট্‌কা, নতুন সংসারে আসিয়াছে। জগতের অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডারের এক অণুর সন্ধান পাইয়া তাহার অবোধ মন তখন সেটাকে লইয়াই লোভীর মত বারবার আস্বাদ করিয়া সাধ মিটাইতে পারিতেছে না—তখন তাহাকে থামায় এমন সাধ্য তাহার মায়ের কোথায় ? খানিকক্ষণ এরূপ করিতে করিতে তাহার ক্ষুদ্র শরীরে শক্তির ভাণ্ডার ফুরাইয়া আসিত, সে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হইয়া হাই তুলিতে থাকিত—সর্বজয়া ছোট্ট হাঁ-টির সামনে তুড়ি দিয়া বলিত—যাট যাট—এই দ্যাখো দেয়ালা ক'রে ক'রে এইবার বাছার আমার ঘুম আসচে। পরে সে মুগ্ধ নয়নে শিশু-পুত্রের টিপ-কাজল-পরা কচি-মুখের দিকে চাহিয়া বলিত—কত রঙ্গই জানে সনৃকু আমার—তবুও তো এই ষেটের দেড়বছরের! হঠাৎ সে আকুল চুম্বনে খোকার রাঙা-গাল দু'টি ভরাইয়া ফেলিত। কিন্তু মায়ের এই গাঢ় আদরের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াই শিশুর নিদ্রাতুর আঁখিপাতা ঢুলিয়া আসিত ; সর্বজয়া খোকার মাথাটা আস্তে আস্তে নিজের কাঁধে রাখিয়া বলিত—ওমা, সন্দেবেলা দ্যাখো ঘুমিয়ে পড়লো! এই ভাবচি সন্দেটা উৎরুলে দুধ খাইয়ে তবে ঘুম পাড়াবো—দ্যাখো কাণ্ড !···

সর্বজয়া জানিত—ছেলে আটবছরের হইলে কি হইবে, সেই ছেলেবেলাকার মত মায়ের সহিত লুকোচুরি খেলিবার সাধ এখনও মিটে নাই।

এমন সব স্থানে সে লুকায় যেখানে হইতে অন্ধও তাহাকে বাহির করিতে পারে ; কিন্তু সর্বজয়া দেখিয়াও দেখে না—এক জায়গায় বসিয়াই এদিকে ওদিকে চায়, বলে—তাই তো! কোথায় গেল ? দেখতে তো পাচ্ছিনে!···

অপু ভাবে—মাকে কেমন ঠকাইতে পারা যায়! মায়ের সহিত এ খেলা করিয়া মজা আছে। সর্বজয়া জানে যে, খেলায় যোগ দিবার ভান করিলে এইরূপ সারাদিন চলিতে পারে, কাজেই সে ধমক দিয়া কহিল—তা হোলে কিন্তু থাকলো প'ড়ে রান্নাবান্না। অপু, তুমি ঐ রকম করো খেতে চাইলে তখন মজাটা—

অপু হাসিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মশলার পুঁটুলি মায়ের সামনে রাখিয়া দিল।

তাহার মা বলিল, যা একটু খেলা করগে যা বাইরে। দেখ্‌গে যা দিকি তোর দিদি কোথায় আছে। গাবতলায় দাঁড়িয়ে একটু হাঁক দিয়ে ডাক দিকি। তার আজ নাইবার দিন—হতচ্ছাড়া মেয়ের নাগাল পাওয়ার জো আছে? যা তো, লক্ষ্মী ছেলে—

কিন্তু এখানে মাতৃ-আদেশ পালন করিয়া সুপুত্র হইবার কোনো চেষ্টা তাহার দেখা গেল না। সে বাটনা-বাটা-রত মায়ের পিছনে গিয়া কি করিতে লাগিল।

হু-উ-উ-উ-উম্—

সর্বজয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল অপু বড়ি দেওয়ার জন্য চালের বাতায় রক্ষিত একটা পুরানো চট্ আনিয়া মুড়ি দিয়া মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া আছে।

—দ্যাখো, দ্যাখো, ছেলের কাণ্ড দ্যাখো একবার। ও লক্ষ্মীছাড়া, ওতে যে সাত-রাজ্যির ধুলো। ফ্যাল্ ফ্যাল্—সাপ মাকড় আছে না কি আছে ওর মধ্যে—আজ কদ্দিন থেকে থেকে তোলা রয়েছে।

—হু-উ-উ-উ-উম্—(পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর সুরে)

নাঃ, বল্লে যদি কথা শোনে—বাবা আমার, সোনা আমার, ওখানা ফ্যাল —আমার বাটনার হাত—দুষ্টুমি কোরো না, ছিঃ!

থলে-মোড়া মূর্তিটা হামাগুড়ি দিয়া এবার দুই কদম আগাইয়া আসিল। সর্বজয়া বলিল, ছুঁবি ছুঁবি—ছুঁও না মানিক আমার—ওঃ, ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিইচি—ভারি ভয় হয়েছে আমার!

অপু হি-হি করিয়া হাসিয়া থলেখানা খুলিয়া এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাথার চুল, মুখ, চোখের ভুরু, কান ধূলায় ভরিয়া গিয়াছে। মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া সে সামনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত কিচ কিচ করিতেছে।

—ওমা আমার কি হবে! হ্যাঁরে হতভাগা, ধূলো মেখে যে একেবারে ভূত সেজেচিস্? উঃ—ওই পুরোনো থলেটার ধূলো! একেবারে পাগল!

ধূলিধূসরিত অবোধ পুত্রের প্রতি করুণা ও মমতায় সর্বজয়ার বুক ভরিয়া

আসিল ; কিন্তু অপুর পরণে বাসি কাপড়—নাহিয়া-ধুইয়া ছোঁয়া চলে না বলিয়া বলিল—ঐ গামছাখানা নে, ঐ দিয়ে ধূলোগুলো আগে ঝেড়ে ফ্যাল্। ছেলে যেন কি একটা!

খানিকটা পরে ছেলেকে রান্নাঘরে পাহারার জন্য বসাইয়া সে জল আনিতে বাহির হইয়া যাইতেছে, দেখে দরজা দিয়া দুর্গা বাড়ী ঢুকিতেছে। মুখ রৌদ্রে রাঙা, মাথার চুল উসকো-খুসকো, অথচ ধুলোমাখা পায়ে আল্‌তা পরা। একেবারে মায়ের সামনে পড়াতে আঁচলে-বাঁধা আম দেখাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল—এই পুণ্যিপুকুরের জন্যে ছোলার গাছ আনতে গেলাম রাজীদের বাড়ী, আম পেড়ে এনেচে, ভাগ হচ্ছে, তাই রাজীর পিসিমা দিলে।

—আহা, মেয়ের দশা ছাখো, গায়ে খড়ি উড়চে, মাথার চুল দেখলে গায়ে জ্বর আসে,—পুণ্যিপুকুরের জন্যে ভেবে তো তোমার রাত্তিরে ঘুম নেই!—পরে মেয়ের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল—ফের বুঝি লক্ষ্মীর চুবড়ি থেকে আলতা বের করে পরা হয়েচে?

দুর্গা আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া উসকোখুসকো চুল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল—লক্ষ্মীর চুবড়ির আলতা বৈকি! আমি সেদিন হাটে বাবাকে দিয়ে আলতা আনালাম এক পয়সার, তার দরুণ দু'পাতা আলতা আমার পুতুলের বাক্সে ছিল না বুঝি?

হরিহর কলকে হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আগুন লইতে আসিল।

সর্বজয়া বলিল—ঘণ্টায় ঘণ্টায় তোমাকে আগুন দি কোথা থেকে? সুঁদরী কাঠের বন্দোবস্ত ক'রে রেখেচো কিনা একেবারে! বাঁশের চেলার আগুন কতক্ষণ থাকে যে আবার ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাওয়ার আগুন যোগাব? পরে আগুন তুলিবার জন্য রক্ষিত একটা ভাঙা পিতলের হাতাতে খানিকটা আগুন উঠাইয়া বিরক্তমুখে সামনে ধরিল। পরে স্বর নরম করিয়া বলিল—কি হোল?

—এক রকম ছিল তো সবই ঠিক, বাড়ীসুদ্ধ সবাই মন্তর নেবার কথাই হয়েছিল; কিন্তু একটু মুস্কিল হ'য়ে যাচ্ছে। মহেশ বিশ্বেসের শ্বশুরবাড়ীর বিষয়-আশয় নিয়ে কি গোলমাল বেধেছে, বিশ্বেস মশায় গিয়েচে সেখানে চলে—সেই আসল মালিক কিনা। তাই আবার একটু পিছিয়ে গেল; আবার এদ্দিকেও তো অকাল পড়চে আষাঢ় মাস থেকে।

—আর সেই যে বাসের জায়গা দেবে, বাস করাবে বলেছিল, তার কি হোল?

—এই নিয়ে একটু মুস্কিল বেধে-গেল কিনা! ধরো যদি মন্তর নেওয়া পিছিয়ে যায়, তবে ও কথা আর কি করে ওঠাই?

সর্বজয়া খুব আশায় ছিল, সংবাদ শুনিয়া আশাভঙ্গ হইয়া পড়িল। বলিল, তা ওখানে না হয়, অন্য কোনো জায়গায় ছাখো না? বিদেশে মান আছে, এখানে কেউ পোছে? এই ছাখো, আম-কাঁটালের সময় একটা আম-কাঁটাল ঘরে নেই—মেয়েটা কাদের বাড়ী থেকে আজ দু'টো আধপচা আম নিয়ে এল।—পরে সে উদ্দেশে বাড়ীর পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—এই ঘরের দোর থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি আম পেড়ে নিয়ে যায়—বাছারা আমার চেয়ে চেয়ে ছাখে,—এ কি কম কষ্ট?

বাগানের কথার উল্লেখ হরিহর বলিল—উঃ, ও কি কম ধড়িবাজ নাকি? বছরে পঁচিশ-টাকা খাজনা ফেলে-ঝেলে হোতো, তাই কিনা লিখে নিলে পাঁচ টাকায়! আমি গিয়ে এত করে বললাম, কাকা, আমার ছেলেটা মেয়েটা আছে, ঐ বাগানে আম-জাম কুড়িয়ে মানুষ হচ্চে। আমার তো আর কোথাও কিছু নেই। আর ধরুন আমাদেব জ্ঞাতির বাগান—আপনার তো ঈশ্বর ইচ্ছেয় কোনো অভাব নেই, দু'টো অতবড় বাগান রয়েচে, আম-জাম নারকেল সুপুরি—আপনার অভাব কি? বাগানখানা গিয়ে ছেড়ে দিন গে যান। তা বল্লে কি জানো? বল্লে, নীলমণি দাদা বেঁচে থাকতে ওর কাছে নাকি তিনশো টাকা ধার করেছিল, তাই অমনি করে শোধ করে নিলে। শোন কথা! নীলমণিদাব বড্ড অভাব ছিল কিনা, তাই তিনশো টাকার জন্যে গিয়েচে ভুবন মুখুয্যের কাছে হাত পাততে! বৌদিকে ভালমানুষ পেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে নিলে আর কি।

—ভালমানুষ তো কত। সেও নাকি বলেচে যে জ্ঞাতি শত্তুর—ওর হাতে বাগান থাকলে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না, ফল-পাকুড় এমনিই খাবে, তার চেয়ে কিছু কম জমাতেও যদি বন্দোবস্ত হয়, খাজনাটা তো পাওয়া যাবে।

হরিহর বলিল—খাজনা কি আর আমি দিতাম না? বাগান জমা দেবে, তাই কি আমায় জানতে দিলে? বৌদিদিকে লুচি-মোহনভোগ খাইয়ে হাত ক'রে চুপি চুপি লিখিয়ে নিলে!...

বৈকালের দিকটা হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। অনেকক্ষণ হইতে মেঘ-মেঘ করিতেছিল, তবুও ঝড়টা যেন খুব শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অপুদের বাড়ীর সামনের বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলা পাঁচিলের উপর হইতে ঝড়ের বেগে হটিয়া ওধারে পড়াতে বাড়ীটা যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতে লাগিল—ধূলা, বাঁশপাতা, কাঁটালপাতা, খড়, চারিধার হইতে উড়িয়া তাহাদের উঠান ভরাইয়া ফেলিল। দুর্গা বাটীর বাহির হইয়া আম কুড়াইবার জন্য দৌড়াইল—অপুও দিদির পিছু পিছু ছুটিল। দুর্গা ছুটিতে ছুটিতে বলিল—

শীগ্‌গির ছোট্, তুই বরং সিঁদুরকৌটো-তলায় থাক্, আমি যাই সোনামুখী-তলায়—দৌড়ো—দৌড়ো। ধূলায় চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বড় বড় গাছের ডাল ঝড়ে বাঁকিয়া গাছ নেড়া নেড়া দেখাইতেছে। গাছে গাছে সোঁ সোঁ, বোঁ বোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে—বাগানে শুক্‌না ডাল, কুটা, বাঁশের খোলা উড়িয়া পড়িতেছে—শুক্‌না বাঁশপাতা ছুঁচালো আগাটা উঁচুদিকে তুলিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে উঠিতেছে—কুকৃশিমা গাছের শুঁয়ার মত পালকওয়ালা সাদা সাদা ফুল ঝড়ের মুখে কোথা হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতেছে—বাতাসের শব্দে কান পাতা যায় না।

সোনামুখী-তলায় পৌছিয়াই অপু মহা-উৎসাহে চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল—এই যে দিদি, ওই একটা পডলো রে দিদি—ঐ আর একটা রে দিদি। চীৎকার যতটা করিতে লাগিল তাহার অনুপাতে সে আম কুডাইতে পারিল না। ঝড ঘোর রবে বাডিয়া চলিয়াছে। ঝডের শব্দে আম পডার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না, যদি বা শোনা যায় ঠিক কোন জায়গা বরাবর শব্দটা হইল—তাহা ধরিতে পারা যায় না। দুর্গা আট নয়টা আম কুড়াইয়া ফেলিল, অপু এতক্ষণের ছুটাছুটিতে মোটে পাইল দুইটা। তাহাই সে খুশির সহিত দেখাইয়া বলিতে লাগিল—এই ছাখ্ দিদি, কত্ত বড ছাখ্—ঐ একটা পডলো—ওই ওদিকে—

এমন সময়ে হৈ-হাই শব্দে ভুবন মুখুয্যের বাডীর ছেলে-মেয়েরা সব আম কুডাইতে আসিতেছে শোনা গেল। সতু চেঁচাইয়া বলিল—ও ভাই, দুগ্‌গাদি আর অপু আম কুড়ুচ্ছে—

দল আসিয়া সোনামুখী-তলায় পৌছিল। সতু বলিল—আমাদের বাগানে কেন এয়েচ আম কুড়ুতে? সেদিন মা বারণ করে দিয়েচে না? দেখি কত-গুলো আম কুড়িয়েচো?

পরে দলের দিকে চাহিয়া বলিল—সোনামুখীব কতগুলো আম কুডিয়েচে দেখছিস টুনু? যাও আমাদের বাগান থেকে দুগ্‌গাদি—মাকে গিয়ে নইলে বলে দেবো।

রাণু বলিল—কেন তাড়িয়ে দিচ্ছিস সতু? ওরাও কুডক—আমরাও কুডই।

—কুড়োবে বই কি। ও এখানে থাকলে সব আম ওই নেবে। আমাদের বাগানে কেন আসবে ও? না, যাও দুগ্‌গাদি—আমাদের তলায় থাকতে দেবো না।

অন্য সময় হইলে দুর্গা হয়ত সহজে পরাজয় স্বীকার করিত না—কিন্তু

সেদিন ইহাদেরই কৃত অভিযোগে মায়ের নিকট মার খাইয়া তাহার পুনরায় বিবাদ বাধাইবার সাহস ছিল না। তাই খুব সহজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়া সে একটু মনমরা ভাবে বলিল—অপু, আয় রে, চল্। পরে হঠাৎ মুখে কৃত্রিম উল্লাসের ভাব আনিয়া বলিল—আমরা সেই জায়গায় যাই চল্ অপু, এখানে থাকতে না দিলে বয়ে গেল—বুঝলিতো?—এখানকার চেয়েও বড বড আম—তুই আমি মজা কবে কুডোবো এখন—চলে আয়—এবং এখানে এতক্ষণ ছিল বলিয়া একটা বৃহত্তর লাভ হইতে বঞ্চিত ছিল, চলিয়া যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে শাপে বর হইল, সকলের সম্মুখে এইরূপ ভাব দেখাইয়া যেন অধিকতব উৎসাহের সহিত অপুকে পিছনে লইয়া রাংচিতার বেডাব ফাঁক গলিয়া বাগানেব বাহির হইয়া গেল। রাণু বলিল—কেন ভাই ওদের তাডিয়ে দিলে—তুমি ভারি হিংসুক কিন্তু সতু দা! রাণুর মনে দুর্গার চোখেব চাহনি বড ঘা দিল।

অপু অতশত বোঝে নাই, বেডাব বাহিবেব পথে আসিয়া বলিল—কোন্ জায়গায় বড বড আম রে দিদি? পুটুদের সলতেখাগী-তলায়? কোন্ তলায় দুর্গা তাহা ঠিক কবে নাই, একটু ভাবিযা বলিল—চল্ গডের পুকুবেব ধারের বাগানে যাবি—ওদিকে সব বড বড গাছ আছে—চল—। গডের পুকুব এখান হইতে প্রায় পনেবো মিনিট ধরিয়া সুঁডি পথে অনবরত বন-বাগান অতিক্রম কবিয়া তবে পৌছানো যায়। অনেক কালের প্রাচীন আম ও কাঁঠালেব গাছ—গাছতলায় বন-চালতা ময়না-কাঁটা, যাঁডা গাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। দূব বলিয়া এবং জনপ্রাণীব বাসশূন্য গভীব বনের মধ্যে বলিয়া এ সব স্থানে কেঁহ বড একটা আম কুডাইতে আসে না। কাছিব মত মোটা মোটা অনেক কালেব পুবানো গুলঞ্চ লতা এগাছে ওগাছে দুলিতেছে, বড বড প্রাচীন গাছেব তলাকাব কাঁটাভরা ঘন ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া তলায় পডা আম বাহিব কবা সহজসাধ্য তো নহেই, তাহার উপর আবার ঘনায়মান নিবিড-কৃষ্ণ ঝোডো মেঘে ও বাগানের মধ্যের জঙ্গলে গাছের আওতায় এরূপ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কোথায় কি ভাল দেখা যায় না। তবুও খুঁজিতে খুঁজিতে নাছোডবান্দা দুর্গা গোটা আট-দশ আম পাইল।

হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—ওরে অপু—বৃষ্টি এল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝড়টা যেন খানিকক্ষণ একটু নরম হইল—ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পাওয়া গেল—একটু পরেই মোটা মোটা ফোঁটায় চডবড় করিয়া গাছের পাতায় বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিল।

—আয় আমরা এই গাছতলায় দাঁড়াই—এখানে বৃষ্টি পড়বে না—

দেখিতে দেখিতে চারিদিক ধোঁয়াকার করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল—বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবার জোরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল—ভরপুর টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ আসিতে লাগিল। ঝড় একটু যেন নরম পড়িয়াছিল—তাহাও আবার বড় বাড়িল—দুর্গা যে গাছতলায় দাঁড়াইয়াছিল, এমনি হয়ত হঠাৎ তথায় বৃষ্টি পড়িত না, কিন্তু পুবে হাওয়ার ঝাপ্‌টা গাছতলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল। বাড়ী হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে—অপু ভয়ের স্বরে বলিল—ও দিদি—বড্ড যে বৃষ্টি এল!

তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া, আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে—বিষ্টি হোল ভালই হোল—আমরা আবার সোনামুখী-তলায় যাবো এখন, কেমন তো?

দুজনে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—

নেবুর পাতায় করম্‌চা,
হে বিষ্টি ধ'রে যা—

কড়্—কড়্—কড়াৎ···প্রকাণ্ড বন-বাগানের অন্ধকার মাথাটা যেন এদিক্ হইতে ওদিক্ পর্যন্ত চিরিয়া গেল—চোখের পলকের জন্য চারিধারে আলো হইয়া উঠিল—সামনের গাছের মগডালে থোলো থোলো বন ধুঁধুল ফল ঝড়ে দুলিতেছে। অপু দুর্গাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ও দিদি।

ভয় কি রে!···রাম রাম বল্—রাম রাম রাম—নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা—

বৃষ্টির ঝাপটায় তাহাদের কাপড় চুল ভিজিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—গুম্-গুম্-গুম্-ম্-ম্—চাপা, গম্ভীর ধ্বনি—একটা বিশাল লোহার রুল কে যেন আকাশের ধাতব মেঝেতে এদিক হইতে ওদিকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে—অপু শঙ্কিত স্বরে বলিল—ঐ দিদি, আবার—

—ভয় নেই, ভয় কি? আর একটু স'রে আয়—এঃ তোর মাথাটা ভিজে যে একেবারে জুবড়ি হ'য়ে গিয়েছে—

চারিধারে শুধু মুষলধারে বৃষ্টিপতনের হুস্-স্-স্-স্ একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ-ও-ও-ও বোঁ-ও-ও-ও-ও রব, ডালপালার ঝাপটের শব্দ—মেঘের ডাকে কানে তালা ধরিয়া যায়। এক একবার দুর্গার মনে হইতেছিল সমস্ত বাগানখানা ঝড়ে মড়-মড় করিয়া ভাঙিয়া উপুড় হইয়া তাহাদের চাপা দিল বুঝি!

অপু বলিল—দিদি, বিষ্টি যদি আর না থামে?

হঠাৎ ঝটিকাক্ষুব্ধ অন্ধকার আকাশের এ-প্রান্ত হইতে সকলকে আলো,

জিহ্বা মেলিয়া বিদ্রূপের বিকট অট্টহাস্যের রোল তুলিয়া এক লহমায় ও প্রান্তের দিকে ছুটিয়া গেল।

কড়্ কড়্ কড়াৎ।

সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মাথায় বৃষ্টির ধোঁয়ার রাশি চিরিয়া ফাড়িয়া উড়াইয়া, ভৈরবী প্রকৃতির উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালকবালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

অপু ভয়ে চোখ বুজিল।

দুর্গা শুষ্ক গলায় উপরেব দিকে চাহিয়া দেখিল,—বাজ পড়িতেছে না কি!—গাছের মাথায় বন ধুঁধুলের ফল দুলিতেছে।

সেই বড লোহার রুলটাকে আকাশের ওদিক হইতে কে যেন আবার এদিকে টানিয়া আনিতেছিল—

শীতে অপুব ঠক্ ঠক্ কবিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বাব বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা, হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা, হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করমচা···ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।

সন্ধ্যা হইবার বেশী বিলম্ব নাই। ঝড-বৃষ্টি খানিকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। পথে জমিয়া যাওয়া বৃষ্টির জলের উপর ছপ্ ছপ্ শব্দ করিতে করিতে রাজকৃষ্ণ পালিতের মেয়ে আশালতা পুকুরের ঘাটে যাইতেছিল। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ মা, দুর্গা আর অপুকে দেখেচিস ও দিকে?

আশালতা বলিল—না খুড়ীমা, দেখিনি তো। কোথায় গিয়েচে? তারপর হাসিয়া বলিল—কি ব্যাঙ-ডাকানি জল হয়ে গেল খুড়ীমা!

—সেই ঝড়ের আগে দুজনে বেরিয়েচে আম কুড়োতে যাই ব'লে, আর তো ফেরেনি—এই ঝড-বিষ্টি গেল, সন্দে হোল, ও মা কোথায় গেল তবে?

সর্বজয়া উদ্বিগ্ন মনে বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল। কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় খিড়কীর দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় দুর্গা আগে আগে একটা ঝুনা নারিকেল হাতে ও পিছনে পিছনে অপু একটা নারিকেলের বাগলো টানিয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি ছেলে-মেয়ের কাছে গিয়া বলিল—ওমা আমার কি হবে! ভিজে যে সব একেবারে পান্তাভাত হইচিস! কোথায় ছিলি বিষ্টির সময়? ছেলেকে কাছে আনিয়া মাথায় হাত দিয়া বলিল—ওমা, মাথাটা যে ভিজে একেবারে জুবড়ি। পরে আহ্লাদের সহিত বলিল—নারকোল কোথা পেলি রে দুর্গা?

অপু ও দুর্গা দুজনেই চাপা কণ্ঠে বলিল -চুপ চুপ মা—সেজজেঠিমা বাগানে যাচ্ছে—এই গেল—ওদের বাগানের বেড়ার ধারের দিকে যে নারকোল গাছটা? ওর তলায় প'ড়ে ছিল। আমরাও বেরুচ্চি সেজ-জেঠিমাও ঢুকলো।

দুর্গা বলিল···অপুকে তো ঠিক দেখেচে—আমাকেও বোধ হয় দেখেছে! পরে সে উৎসাহের সঙ্গে অথচ চাপা স্বরে বলিতে লাগিল—একেবারে গাছের গোড়ায় প'ড়ে ছিল মা, আগে আমি টের পাইনি, সোনামুখী-তলায় যদি আম প'ড়ে থাকে তাই দেখতে গিয়ে দেখি বাগলোটা প'ড়ে রয়েচে। অপুকে বললাম—অপু, বাগলোটা নে—মার ঝাঁটার কষ্ট, ঝাঁটা হবে। তারপরই দেখি, —হস্তস্থিত নারিকেলটার দিকে উজ্জ্বল মুখে চাহিয়া বলিল—বেশ বড, না মা?

অপু খুশির স্বরে হাত নাড়িয়া বলিল—আমি অমনি বাগলোটা নিয়ে ছুট—

সর্বজয়া বলিল—বেশ বড দোমালা নারকোলটা। ছেঁচতলায় রেখে দে, জল দিয়ে নেবো—

অপু অনুযোগের স্বরে বলিল—তুমি বলো মা নারকোল নেই, নারকোল নেই,—এই তো হোল নারকোল! এইবার কিন্তু বডা করে দিতে হবে! আমি ছাড়বো না—কথ্‌খনো—

বৃষ্টির জলে ছেলেমেয়ের মুখ বৃষ্টিধোয়া জুঁই ফুলের মত সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠাণ্ডায় তাহাদের ঠোঁট নীল হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল ভিজিয়া কানের সঙ্গে লেপটাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। সর্বজয়া বলিল—আয় সব, কাপড় ছাড়িয়ে দিই আগে, পায়ে জল দিয়ে রোয়াকে ওঠ্‌ সব—

খানিক পরে সর্বজয়া কুয়ার জল তুলিতে ভুবন মুখুয্যের বাড়ী গেল।

ভুবন মুখুয্যের খিডকী-দোর পর্যন্ত যাইতেই সে শুনিল সেজঠাকৃরুণ বাড়ীর মধ্যে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিতেছেন।

—একটা মুঠো টাকা খরচ ক'রে তবে বাগান নেওয়া—মাগনা তো নয়। তার কোনো কুটোটা—যদি হাঘরেদেব জন্যে ঘরে ঢুকবার জো আছে! ঐ ছুঁড়ীটা রাদ্দিন বাগানে বসে আছে, কুটোগাছটা নিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে তুলবে—এতে মাগীরও শিক্ষে আছে, ও মাগী কি কম নাকি? ও মা, ভাবলাম বিষ্টি থেমেচে, যাই একবার বাগানটা গিয়ে দেখে আসি—এই এত বড় নারকোলটা কুড়িয়ে নিয়ে একেবারে দুড়্‌ দুড়্‌ দৌড়? এত শত্তুরতা যেন ভগবান সহ্যি না করেন—উচ্ছন্ন যান, উচ্ছন্ন যান—এই ভর্‌ সন্দে বেলা বলচি, আর যেন নারকোল খেতে না হয়—একবার শীগগির যেন ছাতিমতলাসই হন—

সর্বজয়া খিড়কীর বাহিরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেমেয়ের বর্ষণ-সিক্ত কচিমুখ মনে করিয়া সে ভাবিল, যদি গালাগাল ওদের লাগে!

বাবা—যে লোক ! দাঁতে বিষ আছে ! কি করি ? কথাটা ভাবিতেই তাহার গা শিহরিয়া উঠিয়া সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া গেল। সে আর মুখুয্যেবাড়ী ঢুকিল না—আশশেওড়া বনে, বাঁশঝাড়ের তলায় বর্ষণস্তব্ধ সন্ধ্যায় জোনাকী জ্বলিতেছে, পা যেন আর উঠিতে চাহে না—ভয়ে ভয়ে সে জল তুলিবার ছোট্ট বালতিটা ও ঘড়া কাঁখে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিল।

পথে আসিতে আসিতে ভাবিল—যদি নারকোলটা ওদের ফেরত দিই—তাহলেও কি গাল লাগবে ? তা কেন লাগবে—যার জিনিস তাকে তো ফেরত দেওয়া হ'ল, তা কখনো লাগে ?

বাড়ীতে পা দিয়াই মেয়েকে বলিল—দুগ্‌গা, নারকেলটা সতুদের বাড়ী দিয়ে আয় গিয়ে।

অপু ও দুর্গা অবাক হইয়া মায়ের মুখে দিকে চাহিয়া রহিল—

দুর্গা বলিল—এখ্‌খনি ?

হ্যাঁ,—এখখুনি দিয়ে আয়। ওদের খিড়কীর দোর খোলা আছে। চট ক'রে যা। ব'লে আয়, আমরা কুড়িয়ে পেইছিলাম, এই নাও দিয়ে গেলাম।

—অপু আমাকে একটু দাঁড়াবে না, মা ? বড্ড অন্ধকার হয়েচে, চল অপু আমার সঙ্গে।

ছেলেমেয়ে চলিয়া গেলে সর্বজয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দিতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—ঠাকুর, নারকোল ওরা শত্তুরতা ক'রে কুড়তে যায়নি সে তো তুমি জানো, এ গাল যেন ওদের না লাগে। দোহাই ঠাকুর, ওদের তুমি বাঁচিয়ে বর্তে রেখো ঠাকুর। ওদের তুমি মঙ্গল কোরো। তুমি ওদের মুখের দিকে চেও। দোহাই ঠাকুর।

গ্রামের প্রসন্ন গুরুমহাশয় বাড়ীতে একখানা মুদীর দোকান করিতেন। এবং দোকানেরই পাশে তাঁহার পাঠশালা ছিল। বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না। তবে এই বেতের উপর অভিভাবকদের বিশ্বাস গুরুমহাশয় অপেক্ষা কিছু কম নয়। তাই তাঁহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন, ছেলেদের-শুধু পা খোঁড়া এবং চোখ কানা না হয়, এইটুকু মাত্র নজর রাখিয়া তিনি যত ইচ্ছা বেত চালাইতে পারেন। গুরুমহাশয়ও তাঁহার শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র

বেতের সাহায্য পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বে-পরোয়া ভাবে বেত চালাইয়া থাকেন, যে ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়া যায় মাত্র।

পৌষ মাসের দিন। অপু সকালে লেপ মুড়ি দিয়া রৌদ্র উঠিবার অপেক্ষায় বিছানায় শুইয়াছিল, মা আসিয়া ডাকিল—অপু, ওঠ শীগ্‌গির্ ক'রে, আজ তুমি যে পাঠশালায় পড়তে যাবে! কেমন সব বই আনা হবে তোমার জন্যে,. শেলেট। হাঁ ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও, উনি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে পাঠশালায় দিয়ে আসবেন।

পাঠশালার নাম শুনিয়া অপু সদ্য নিদ্রোত্থিত চোখ দুটি তুলিয়া অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ধারণা ছিল যে যাহারা দুষ্ট ছেলে, মার কথা শোনে না, ভাইবোনদের সঙ্গে মারামারি করে, তাহাদেরই শুধু পাঠশালায় পাঠানো হইয়া থাকে। কিন্তু সে তো কোনদিন ওরূপ করে না, তবে সে কেন পাঠশালায় যাইবে?

খানিক পরে সর্বজয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—ওঠ অপু, মুখ ধুয়ে নাও, তোমার অনেক করে মুড়ি বেঁধে দেবো এখন, পাঠশালায় ব'সে ব'সে খেও এখন, ওঠো লক্ষ্মী মানিক! মায়ের কথার উত্তরে সে অবিশ্বাসের সুরে বলিল, —ইঃ! পরে মায়ের দিকে চাহিয়া জিভ বাহির করিয়া চোখ বুজিয়া একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া রহিল, উঠিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না।

কিন্তু অবশেষে বাবা আসিয়া পড়াতে অপুর বেশী জারিজুরি খাটিল না, যাইতে হইল। মা'র প্রতি অভিমানে তাহার চোখে জল আসিতেছিল, খাবার বাঁধিয়া দিবার সময় বলিল—আমি কখ্‌খনো আর বাড়ী আসচিনে, দেখো!

—ষাট ষাট, বাড়ী আসবিনে কি! ওকথা বলতে নেই, ছিঃ! পরে তাহার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—খুব বিদ্যে হোক্, ভালো করে লেখাপড়া শিখো, তখন দেখবে তুমি কত বড় চাকরী করবে, কত টাকা হবে তোমার, কোনো ভয় নেই!—ওগো, তুমি গুরুমশায়কে ব'লে দিও যেন ওকে কিছু বলে না।

পাঠশালায় পৌছাইয়া দিয়া হরিহর বলিল—ছুটি হবার সময়ে আমি আবার এসে তোকে বাড়ী নিয়ে যাবো অপু, ব'সে ব'সে লেখো, গুরুমশায়ের কথা শুনো, দুষ্টুমি কোরো না যেন! খানিকটা পরে পিছন ফিরিয়া অপু চাহিয়া দেখিল বাবা ক্রমে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। অকূল সমুদ্র! সে অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। পরে ভয়ে ভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল গুরুমহাশয় দোকানের মাচায় বসিয়া দাঁড়িতে সৈন্ধব লবন ওজন করিয়া.

কাহাকে দিতেছেন, কয়েকটি বড় বড় ছেলে আপন আপন চাটাই-এ বসিয়া নানারূপ কুস্বর করিয়া কি পড়িতেছে ও ভয়ানক দুলিতেছে। তাহার অপেক্ষা আর একটু ছোট একটি ছেলে খুঁটিতে ঠেস দিয়া আপন মনে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতেছে। আর একটি বড় ছেলে, তাহার গালে একটা আঁচিল, সে দোকানের মাচার নীচে চাহিয়া কি লক্ষ্য করিতেছে। তাহার সামনে দুজন ছেলে বসিয়া শ্লেটে একটা ঘর আঁকিয়া কি করিতেছিল, একজন চুপিচুপি বলিতেছিল, আমি এই ঢ্যারা দিলাম, অন্য ছেলেটি বলিতেছিল এই আমাব গোল্লা, সঙ্গে সঙ্গে তাব শ্লেটে আঁক পড়িতেছিল ও মাঝে মাঝে আড়চোখে বিক্রয়রত গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। অপু নিজের শ্লেটে বড় বড় করিয়া বানান লিখিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে ঠিক জানা যায় না, গুরুমহাশয় হঠাৎ বলিলেন—ফ'নে, শ্লেটে ওসব কি হচ্ছে রে? সম্মুখের সেই দুটি ছেলে অমনি শ্লেটখানা চাপা দিয়া ফেলিল, কিন্তু গুরুমহাশয়ের শ্যেনদৃষ্টি এড়ানো বড় শক্ত, তিনি বলিলেন, এই স'তে, ফ'নের শ্লেটটা নিয়ে আয় তো। তাঁহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে বড় আঁচিলওয়ালা ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেটখানা উঠাইয়া লইয়া গিয়া দোকানের মাচার উপর হাজির করিল।

হুঁ, এসব কি খেলা হচ্ছে শ্লেটে? স'তে ধরে নিয়ে আয় তো দুজনকে, কান ধ'রে নিয়ে আয়।

যেভাবে বড় ছেলেটা ছোঁ মারিয়া শ্লেট লইয়া গেল, এবং যে ভাবে বিপন্নমুখে সামনের ছেলে দুটি পায়ে পায়ে গুরু মহাশয়ের কাছে যাইতেছিল, তাহাতে হঠাৎ অপুর বড় হাসি পাইল, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরে খানিকটা হাসি চাপিয়া রাখিয়া আবার ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গুরুমহাশয় বলিলেন, হাসে কে? হাস্‌চো কেন খোকা, এটা কি নাট্যশালা? অ্যাঁ? এটা নাট্যশালা নাকি?

নাট্যশালা কি, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

—স'তে, একখানা থান ইঁট নিয়ে আয় তো তেঁতুলতলা থেকে, বেশ বড় দেখে?

অপু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া গেল, কিন্তু ইট আনীত হইলে দেখিল, ইটের ব্যবস্থা তাহার জন্য নহে, ঐ ছেলে দুটির জন্য। বয়স অল্প বলিয়াই হউক বা নতুন ভর্তি বলিয়াই হউক, গুরুমহাশয় সে যাত্রা তাহাকে রেহাই দিলেন।

পাঠশালা বসিত বৈকালে। সবশুদ্ধ আটদশটি ছেলেমেয়ে পড়িতে আসে।

সকলেই বাড়ী হইতে ছোট ছোট মাদুর আনিয়া পাতিয়া বসে; অপুর মাদুর নাই, সে বাড়ী হইতে একখানা জীর্ণ কার্পেটের আসন আনে। যে ঘরটায় পাঠশালা হয়, তার কোনো দিকে বেড়া বা দেওয়াল কিছু নাই; চারিধারে খোলা, ঘরের মধ্যে সারি দিয়া ছাত্রগণ বসে। পাঠশালা ঘরের চারিপাশে বন, পিছন দিকে গুরুমহাশয়ের পৈতৃক আমলের বাগান। অপরাহ্নের তাজা, গরম রৌদ্র বাতাবীলেবু, গাব ও পেয়ারাতলী আমগাছটার ফাঁক দিয়া পাঠশালার ঘরের বাঁশের খুঁটির পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। নিকটে অন্য কোনোদিকে কোনো বাড়ী নাই, শুধু বন ও বাগান, একধারে একটা যাতায়াতের সরু পথ।

আট-দশটি ছেলে মেয়ের মধ্যে সকলেই বেজায় দুলিয়া ও নানারূপ সুর করিয়া পড়া মুখস্থ করে; মাঝে মাঝে গুরুমহাশয়ের গলা শোনা যায়,—এই ক্যাবলা, ওর শেলেটের দিকে চেয়ে কি দেখছিস? কান ম'লে ছিঁড়ে দেবো একেবারে! হুটু, তোমার ক'বার নেতি ভিজুতে হবে? ফের যদি দেখি নেতি ভিজুতে উঠেচ—

গুরুমহাশয় একটা খুঁটি হেলান দিয়া একখানা তালপাতার চাটাইএর উপর বসিয়া থাকেন। মাথার তেলে বাঁশের খুঁটির হেলান দেওয়ার অংশটা পাকিয়া গিয়াছে। বিকালবেলা প্রায়ই গ্রামের দীনু পালিত কি রাজু রায় তাঁহার সহিত গল্প করিতে আসেন। পড়াশুনার চেয়ে এই গল্প-শোনা অপুর অনেক বেশী ভাল লাগিত। রাজু রায় মহাশয় প্রথম যৌবনে 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' স্মরণ করিয়া কি ভাবে আষাঢ়ুর হাটে তামাকের দোকান খুলিয়াছিলেন সে গল্প করিতেন। অপু অবাক হইয়া শুনিত। বেশ কেমন নিজের ছোট দোকানের ঝাঁপটা তুলিয়া বসিয়া বসিয়া দা দিয়া তামাক কাটা, তারপর রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশুরায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া। বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে—কি সুন্দর! বড় হইলে সে তামাকের দোকান করিবে।

এই গল্পগুজব এক এক দিন আবার ভাব ও কল্পনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠিত, গ্রামের ও পাড়ার রাজকৃষ্ণ সান্যাল মহাশয় যেদিন আসিতেন। যে কোনো গল্প হউক, যত সামান্যই হউক না কেন, সেটি সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসাধারণ। সান্যাল মহাশয় দেশভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত ছিলেন। কোথায় দ্বারকা, কোথায় সাবিত্রী পাহাড়, কোথায় চন্দ্রনাথ, তাহা

আবার একা দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না, প্রতিবারই স্ত্রী-পুত্র লইয়া যাইতেন এবং খরচপত্র করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া ফিরিতেন। দিব্য আরামে নিজের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া থেলো হুঁকা টানিতেছেন, মনে হইতেছে, সান্যাল মহাশয়ের মতন নিতান্ত ঘরোয়া, সেকেলে, পাড়াগাঁয়ের প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত গৃহস্থ বুঝি বেশী আর নাই, পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল দরজায় তালাবন্ধ, বাড়ীতে জনপ্রাণীর সাড়া নাই। ব্যাপার কি? সান্যাল মশায় সপরিবারে বিন্ধ্যাচল, না চন্দ্রনাথ ভ্রমণে গিয়াছেন। অনেকদিন আর দেখা নাই হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ঠুকঠুক শব্দে লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দুই গরুর গাড়ী বোঝাই হইয়া সান্যাল মশায় সপরিবারে বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ও লোকজন ডাকাইয়া হাঁটু সমান উঁচু জলবিছুটি ও অর্জুন গাছের জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বাড়ী ঢুকিতেছেন।

একটা মোটা লাঠি হাতে তিনি লম্বা পা ফেলিয়া পাঠশালায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন—এই যে প্রসন্ন, কি রকম আছো, বেশ জাল পেতে বসেচ যে! ক'টা মাছি পড়লো?

নামতা-মুখস্থ-রত অপুর মুখ অমনি অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সান্যাল মশায় যেখানে তালপাতার চাটাই টানিয়া বসিয়াছেন, সেদিকে হাতখানেক জমি উৎসাহে আগাইয়া বসিত। শ্লেট বই মুড়িয়া একপাশে রাখিয়া দিত, যেন আজ ছুটি হইয়া গিয়াছে, আর পড়াশুনার দরকার নাই; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাগর ও উৎসুক চোখদুটি গল্পের প্রত্যেক কথা যেন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার আগ্রহে গিলিত।

কুঠির মাঠের পথে যে জায়গাটাকে এখন নাল্‌তাকুঠির জোল বলে, ঐখানে আগে—অনেক কাল আগে—গ্রামের মতি হাজরার ভাই চন্দর্ হাজরা কি বনের গাছ কাটিতে গিয়াছিল। বর্ষাকাল—এখানে ওখানে বৃষ্টির জলের তোড়ে মাটি খসিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ চন্দর্ হাজরা দেখিল, এক জায়গায় যেন একটা পিতলের হাঁড়ির কানামত মাটির মধ্য হইতে একটুখানি বাহির হইয়া আছে। তখনই সে খুঁড়িয়া বাহির করিল। বাড়ী আসিয়া দেখে—এক হাঁড়ি সেকেলে আমলের টাকা। তাই পাইয়া চন্দর্ হাজরা দিনকতক খুব বাবুগিরি করিয়া বেড়াইল—এসব সান্যাল মশায়ের নিজের চোখে দেখা।

এক একদিন রেলভ্রমণের গল্প উঠিত। কোথায় সাবিত্রী পাহাড় আছে, তাহাতে উঠিতে তাঁহার স্ত্রীর কি রকম কষ্ট হইয়াছিল, নাভিগয়ায় পিণ্ড দিতে গিয়া পাণ্ডার সঙ্গে হাতাহাতি হইবার উপক্রম! কোথাকার এক জায়গায়

একটা খুব ভাল খাবার পাওয়া যায়, সান্যাল মশায় নাম বলিলেন—প্যাঁড়া নামটা শুনিয়া অপুর ভারি হাসি পাইয়াছিল—বড় হইলে সে 'প্যাঁড়া' কিনিয়া খাইবে।

আর একদিন সান্যাল মশায় একটা কোন জায়গার গল্প করিতেছিলেন। সে জায়গায় নাকি আগে অনেক লোকের বাস ছিল, সন্ধ্যার সময় তেঁতুলের জঙ্গলের মধ্যে দিয়া তাঁহারা সেখানে যান—সান্যাল মশায় যে জিনিসটা বার বার দেখিতে যান তাহার নাম বলিতেছিলেন—"চিকামসজিদ"। কি জিনিস তাহা প্রথমে সে বুঝিতে পারে নাই, পরে তাঁহার কথাবার্তার ভাবে বুঝিয়াছিল একটা ভাঙা পুরানো বাড়ী। অন্ধকার প্রায় হইয়া আসিয়াছিল—তাঁহারা ঢুকিতেই এক ঝাঁক চামচিকা সাঁ করিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অপু বেশ কল্পনা করিতে পারে চারিধারে অন্ধকার তেঁতুল জঙ্গল, কেউ কোথাও নাই, ভাঙা পুরানো দরজা, যেমন সে ঢুকিল অমনি সাঁ করিয়া চামচিকার দল পলাইয়া গেল —রাণুদের পশ্চিমদিকের চোরাকুঠরীর মত অন্ধকার ঘরটা।

কোন্ দেশে সান্যাল মহাশয় একজন ফকিরকে দেখিয়াছিলেন, সে এক অশথতলায় থাকিত। এক ছিলিম গাঁজা পাইলে সে খুশি হইয়া বলিত—আচ্ছা কোন্ ফল তোমরা খাইতে চাও বল। পরে ইপ্সিত ফলের নাম করিলে সে সম্মুখের যে কোন একটা গাছ দেখাইয়া বলিত—যাও, ওখানে গিয়া লইয়া আইস। লোকে গিয়া দেখিত হয়তো আমগাছে বেদানা ফলিয়া আছে, কিংবা পেয়ারা গাছে কলার কাঁদি ঝুলিয়া আছে।

রাজু রায় বলিতেন—ও সব মন্তর-তন্তরের খেলা আর কি। সে বার আমার এক মামা—

দীনু পালিত কথা চাপা দিয়া বলিতেন—মন্তরের কথা যখন ওঠালে, তখন একটা গল্প বলি শোনো। গল্প নয়, আমার স্বচক্ষে দেখা। বেলেডাঙার বুধো গাড়োয়ানকে তোমরা দেখেচো কেউ? রাজু না দেখে থাকো, রাজকৃষ্ট ভায়া তো খুব দেখেচো। কাঠের দড়ি-বাঁধা এক ধরণের খড়ম পায়ে দিয়ে বুড়ো বরাবর মিতে-কামারের দোকানে লাঙলের ফাল পোড়াতে আসতো। একশ' বছর বয়সে মারা যায়, মারাও গিয়েচে আজ পঁচিশ বছরের ওপর। জোয়ান বয়েসে আমরা তার সঙ্গে হাতের কব্জির জোরে পেরে উঠতাম না। একবার—অনেক কালের কথা—আমার তখন সবে হয়েচে উনিশ কুড়ি বয়েস, চাকদা' থেকে গঙ্গাচান ক'রে গরুর গাড়ী ক'রে ফিরছি। বুধো গাড়োয়ানের গাড়ী—গাড়ীতে আমি, আমার খুড়ীমা, আর অনন্ত মুখুয্যের ভাইপো রাম, যে আজকাল উঠে গিয়ে খুলনায় বাস করছে। কানসোনার মাঠের

কাছে প্রায় বেলা গেল, তখন ওসব দিকে কি রকম ভয়ভীত ছিল, তা রাজকৃষ্ট ভায়া জানো নিশ্চয়। একে মাঠের রাস্তা, সঙ্গে মেয়েমানুষের দল, কিছু টাকাকড়িও আছে—বড্ড ভাবনা হোল। আজকাল যেখানে নতুন গাঁ-খানা বসেচে?—ওই বরাবর এসে হোল কি জানো? জন-চারেক ষণ্ডামাৰ্কোগোছেব মিশ-কালো লোক এসে গাড়ীর পেছন দিকের বাঁশ দুদিক থেকে ধল্লে। এদিকে দুজন, ওদিকে দুজন। দেখে তো মশাই আমাদের মুখে আর রা-টা নেই, কোনো বকমে গাড়ীর মধ্যে ব'সে আছি, এদিকে তারাও গাড়ীর বাঁশ ধ'রে সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে, সঙ্গেই আসচে। বুধো গাড়োয়ান দেখি পিট্ পিট্ ক'রে পেছন দিকে চাইচে। ইশারা ক'রে আমাদের কথা বলতে বারণ ক'বে দিলে। বেশ, আছে। এদিকে গাড়ী একেবারে নবাবগঞ্জ থানার কাছাকাছি এসে পড়ল। বাজার দেখা যাচ্চে, তখন সেই লোক ক'জন বল্লে—ওস্তাদ্জী, আমাদেব ঘাট হয়েচে, আমরা বুঝতে পারিনি, ছেড়ে দাও। বুধো গাড়োয়ান বল্লে—সে হবে না ব্যাটারা। আজ সব থানায় নিয়ে গিয়ে বাঁধিয়ে দোব। অনেক কাকুতি মিনতির পর বুধো বল্লে—আচ্ছা যা, ছেড়ে দিলাম এবার, কিন্তু কক্ষনো এরকম আর করিসনি! তবে তাবা বুধো গাড়োয়ানের পায়ের ধুলো নিয়ে চ'লে গেল। আমার স্বচক্ষে দেখা। মন্তরের চোটে ওই যে ওরা বাঁশ এসে ধরেচে, ধ'রেই রয়েচে—আর ছাড়াবাব সাধ্যি নেই—চলেচে গাড়ীর সঙ্গে। একেবারে পেরেক-আঁটা হ'য়ে গিয়েচে। তা বুঝলে বাপু? মন্তব-তন্তবের কথা—

গল্প বলিতে বলিতে বেলা যাইত। পাঠশালাব চারিপাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্ণের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁঠালগাছের, জগডুমুর গাছের ডালে-ঝোলা গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনি পাখী মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালাঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেঝে, ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া, সবসুদ্ধ মিলিয়া এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।

সে গ্রামের ছায়া-ভরা মাটির পথে একটি মুগ্ধ গ্রাম্য বালকের ছবি আছে। বইদপ্তর বগলে লইয়া সে তাহার দিদির পিছনে পিছনে সাজিমাটি দিয়া কাচা, সেলাই করা কাপড় পরিয়া পাঠশালা হইতে ফিরিতেছে, তাহার ছোট্ট মাথাটির অমন রেশমের মত নরম, চিক্কণ সুখ-স্পর্শ চুলগুলি তাহার মা যত্ন করিয়া আঁচড়াইয়া দিয়াছে—তাহার ডাগর সুন্দর চোখদুটিতে কেমন যেন অবাক ধরণের চাহনি—যেন তাহারা এ কোন্ অদ্ভুত জগতে নতুন চোখ মেলিয়া চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হইয়া উঠিয়াছে। গাছপালায় ঘেরা এইটুকুই কেবল

তার পরিচিত দেশ—এখানেই মা রোজ হাতে করিয়া খাওয়ায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, দিদি কাপড় পরাইয়া দেয়, এই গণ্ডীটুকু ছাড়াইলেই তাহার চারিধারে ঘিরিয়া অপরিচয়ের অকূল জলধি! তাহার শিশু মন থৈ পায় না।

ঐ যে বাগানের ওদিকে বাঁশবন—ওর পাশ কাটিয়া যে সরু পথটা ওধারে কোথায় চলিয়া গেল—তুমি বরাবর সোজা যদি ও পথটা বাহিয়া চলিয়া যাও, তবে শাঁখারীপুকুরের পাড়ের মধ্যে অজানা গুপ্তধনের দেশে পড়িবে—বড় গাছের তলায় সেখানে বৃষ্টির জলে মাটি খসিয়া পড়িয়াছে—কত মোহরভরা হাঁড়ি-কলসীর কানা বাহির হইয়া আছে, অন্ধকার বনঝোপের নীচে, কচু, ওল ও বন-কলমীর চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে চাপা—কেউ জানে না কোথায়।

একদিন পাঠশালায় এমন একটি ঘটনা হইয়াছিল, যাহা তাহার জীবনের একটি নতুন অভিজ্ঞতা!

সেদিন বৈকালে পাঠশালায় অন্য কেহ উপস্থিত না থাকায় কোন গল্পগুজব হইল না, পড়াশুনা হইতেছিল—সে গিয়া বসিয়া পড়িতেছিল শিশুবোধক—এমন সময় গুরুমহাশয় বলিলেন—শেলেট নেও, শ্রুতিলিখন লেখো—

মুখে মুখে বলিয়া গেলেও অপু বুঝিয়াছিল গুরুমহাশয় নিজের কথা বলিতেছেন না, মুখস্থ বলিতেছেন, সে যেমন দাশুরায়ের পাঁচালী ছড়া মুখস্থ বলে, তেম্‌নি।

শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল অনেকগুলো অমন সুন্দর কথা এক-সঙ্গে পর পর সে কখনো শোনে নাই। ও সকল কথার অর্থ সে বুঝিতেছিল না, কিন্তু অজানা শব্দ ও ললিত পদের ধ্বনি, ঝঙ্কার-জড়ানো এক অপরিচিত শব্দ-সঙ্গীত, অনভ্যস্ত শিশুকর্ণে অপূর্ব ঠেকিল এবং সব কথার অর্থ না বোঝার দরুণই কুহেলি-ঘেরা অস্পষ্ট শব্দ-সমষ্টির পিছন হইতে একটা অপূর্ব দেশের ছবি বার বার উঁকি মারিতেছিল।

বড় হইয়া স্কুলে পড়িবার সময় সে বাহির করিয়াছিল ছেলেবেলাকার এই মুখস্থ শ্রুতিলিখন কোথায় আছে—

'এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত সমীর-সঞ্চারমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত—অধিত্যকা-প্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বন-পাদপসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়······পাদদেশে প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া······।'

সে ঠিক বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না, কিন্তু সে জানে তাহার মনে হয়, অনেক সময়েই মনে হয়—সেই যে বছর-দুই আগে কুঠির মাঠে সরস্বতী পূজার দিন নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন মাঠের ধার

বাহিয়া একটা পথকে দূরে কোথায় যাইতে দেখিয়াছিল সে। পথটার দু'ধারে যে কত কি অচেনা পাখী, অচেনা গাছপালা, অচেনা বনঝোপ,—অনেকক্ষণ সেদিন সে পথটার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। মাঠের ওদিকে পথটা কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া সে কূল পায় নাই।

তাহার বাবা বলিয়াছিল, ও সোনাডাঙা মাঠের রাস্তা, মাধবপুর-দশঘরা হ'য়ে সেই ধলচিতের খেয়াঘাটে গিয়ে মিশেচে!

ধলচিতের খেয়াঘাটে নয়, সে জানিত ও পথটা আরও অনেক দূরে গিয়াছে; রামায়ণ, মহাভাবতের দেশে।

সেই অশথ্ গাছের সকলের চেয়ে উঁচু ডালটার দিকে চাহিয়া থাকিলে যাহার কথা মনে উঠে—সেই বহুদূরেব দেশটা।

শ্রুতিলিখন শুনিতে শুনিতে সেই দুই-বছর আগে-দেখা পথটার কথাই তার মনে হইয়া গেল।

ঐ পথের ওধাবে অনেক দূরে কোথায় সেই জনস্থান-মধ্যবর্তী প্রস্রবণ পর্বত! বনঝোপেব স্নিগ্ধ গন্ধে, না-জানার ছায়া নামিয়া আসা ঝিকিমিকি সন্ধ্যায়, সেই স্বপ্নলোকের ছবি তাহাকে অবাক করিয়া দিল। কতদূবে সে প্রস্রবণ-গিরির উন্নত শিখব, আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ মেঘমালায় যাহার প্রশান্ত, নীল সৌন্দয সবদা আবৃত থাকে?

সে বড হইলে যাইয়া দেখিবে।

কিন্তু সে বেতসীকণ্টকিত তট, বিচিত্রপুলিনা গোদাবরী, সে শ্যামল জনস্থান, নীল মেঘমালায় ঘেরা সে অপূর্ব শৈলপ্রস্থ, রামায়ণে বর্ণিত কোনো দেশে ছিল না। বাল্মীকি বা ভবভূতি তাহাদের স্রষ্টিকর্তা নহেন। কেবল অতীত দিনের কোনো পাখীডাকা গ্রাম্য সন্ধ্যায় এক মুগ্ধমতি গ্রাম্যবালকের অপরিণত শিশু-কল্পনার দেশে তাহারা ছিল বাস্তব, একেবারে খাঁটি, অতি সুপরিচিত। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যাহাদের ভৌগোলিক অস্তিত্ব কোনোকালে সম্ভব ছিল না, শুধু এক অনভিজ্ঞ শৈশব-মনেই সে কল্পজগতের প্রস্রবণ-পর্বত তাহার সতত-সঞ্চরমাণ মেঘজালে ঢাকা নীল শিখরমালার স্বপ্ন লইয়া অক্ষয় আসন পাতিয়া বসিল!

পথের পাঁচালী — চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দুর্গা ভাইকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। পাড়ায় নানাস্থানে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। অন্নদা রায় মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আসিয়া ভাবিল—একবার এখানে দেখে যাই, খুড়ীমার সঙ্গেও দেখাটা হবে এখন—

অন্নদা রায়ের বাড়ী ঢুকিতেই একটা হৈ চৈ চীৎকার ও কান্নাকাটির কলবর তাহার কানে গেল। বাড়ীর মধ্যে না ঢুকিয়া সে দরজার কাছে দাঁড়াইল। রোয়াকের একপাশে দাঁড়াইয়া অন্নদা রায়ের বিধবা ভগ্নী সখী ঠাকরুণ চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছেন:—

—তাই কি মনে একটু ভয় আছে নাকি? ঢের ঢের জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ দেখিচি, এমন আর কখনো দেখিনি রে বাপু, পায়ে গড় করি—বলে ঐ যমের মত সোয়ামী, রাগলে হাড়ে মাসে এক রাখে না—তাই না হয় বাপু, একটু সমঝে চলি। সত্যিই তো, আজ তিন দিন ধরে বলচে ধানগুলো একটু রোদে দাও, ওগো ধানগুলো একটু রোদে দাও—কথা কি গেরাহ্যি হয় নাকি? না, কানে যায়? কার কথা কে শোনে? গেরস্থ ঘরের বৌ ধান ভানবে, কাজ করবে এই জানি—তা না, রাদ্দিন পটের বিবি সেজে ব'সে আছে!—'পটের বিবি' জিনিসটি পরিস্ফুট করিবার জন্য উত্তমরূপে সাজিয়া যেরূপ ভাবে বসিয়া থাকা উচিত বলিয়া সখীঠাকরুণের ধারণা তিনি এখানে তাহার অভিনয় করিলেন—এ তো বাবু কখনো কোথাও বাপের জন্মে দেখিনি, শুনিওনি—

দালানের মধ্য হইতে অন্নদা রায়ের পুত্রবধূ নাকীসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—পটের বিবি হ'য়ে সেজে বসে থাকি নাকি! কাল যে দশ সের মুগের ডাল ভাজলাম সারা বিকেল ধরে? দুপুর বেলা খেয়েই আরম্ভ করিচি, আর যখন পাঁচটার গাড়ী যাওয়ার শব্দ পেলাম তখনও খোলার তাতেই বসে আছি, দু-ধামা ডাল ভাজা রে, ভাঙা রে—ক'রে, অন্ধকার হয়ে গিয়েচে তখন উঠিচি—সে কি অমনি হয়? গা-গতর ব্যথা হয়ে গেচে, রাত্তিরে বলি বুঝি জ্বর হোলো, এমনি গায়ে-হাতে ব্যথা—তা কি কেউ দ্যাখে? তার ওপর সকালবেলা বিনি দোষে এই মার—কেন, সংসারে কি বসে বসে খাই?

এমন সময় অন্নদা রায়ের ছেলে গোকুল এক হাতে একখানা কাঁচা বাঁশের পাতাসুদ্ধ ডগা ও আর এক হাতে দা লইয়া বাড়ী ঢুকিল। স্ত্রীর কান্নার শেষ অংশ শুনিতে পাইয়া গর্জন করিয়া কহিল—এখনও তোমার হয়নি—এখনও তোমার অদেষ্টে বেস্তর দুক্‌খু আছে দেখচি—আমার রাগ বাড়িও না মেলা সক্কাল বেলা! আজ তিনদিন ধরে ধানগুলো রোদ্দুরে দেওয়ার জন্যে বলে বলে হয়রান—এই মেঘলা মেঘলা যাচ্চে, এর পর ধানগুলো যদি কলিয়ে যায়, তবে তোমার কোন্ বাবা এসে সামলাবে? সারা বছরের পিণ্ডি জুটবে কোত্থেকে?

গোকুলের বৌ হঠাৎ কান্না বন্ধ করিয়া তেজের সহিত জোর গলায় বলিয়া উঠিল—তুমি আমার বাবা তুলে গালাগালি করো না ব'লে দিচ্ছি—আমার

বাবা কি করেছে তোমার, কেন তুমি বাবার নামে যখন তখন যা তা বলবে ?

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গোকুল হাতের বাঁশ নামাইয়া রাখিয়া দা হাতে এক লাফে রোয়াকের সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া কহিল—তবে রে ! আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন—তোমার বাপের বাড়ীর আবদার না ঘুচিয়ে আমি আজ—

একটা খুনোখুনি ব্যাপার বুঝি বা হয় দেখিয়া বাড়ীর কৃষাণ উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—কি করেন দা-ঠাকুর—কি করেন, থামুন থামুন—পরে সে রোয়াকে উঠিল—দুর্গাও ছুটিয়া আসিল—সখী ঠাকৃরুণও রোয়াক হইতে দালানের মধ্যে ঢুকিলেন—খুব একটা হৈ চৈ হইল। দালানের মধ্যে গোকুলের স্ত্রী স্বামীর উদ্যত আক্রমণের সম্মুখে পিছাইয়া গিয়া মার ঠেকাইবার জন্য দুই হাত তুলিয়া দেওয়ালের গায়ে প্রাণপণে ঠেস দিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখে তাহার ভয়ের দৃষ্টি—কৃষাণ গিয়াই গোকুলের হাত হইতে দা-খানা কাড়িয়া লইল, পরে তাহাকে ধরিয়া দালানের বাহিরে আনিতে আনিতে বলিতে লাগিল—কি করেন, দা-ঠাকুর, থামুন—আঃ—আসুন নেমে—

গোকুলের বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেহ তেমন সবল নহে, বলিষ্ঠ কৃষাণের সহিত ম্যালেরিয়া-দুর্বল দেহ লইয়া হাত ছাড়াছাড়ির চেষ্টা করিতে গেলে দুর্বলতাটাই অধিকতর প্রকাশ হইয়া পড়িবে বুঝিয়া বলিতে বলিতে নামিল—ছ্যাখো না—একটা ডোল ধান, বীজ ধান, জল পেয়ে যদি কালিয়ে যায়, ও কি আর বোয়া হবে ? আজ তিনদিন ধরে বলচি—আবার তেজড়া দেখলে তো ? তোমার তেজ আমি—

দুর্গা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু এ সময় খুড়ীমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কথাবার্তার সময় নহে বুঝিয়া সে একপ্রকার নিঃশব্দেই অন্নদা রায়ের বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

পাঁচু বাঁড়ুয্যের বাড়ীর কাছে জামতলায় একজন লোক ঘটী-বাটি সারাইতে বসিয়াছে। কাঠের কয়লার হাপরে গনগনে আগুন পাড়ার লোকের অনেক ঘটীবাটী জড় করা। বেঁটে ধরণের লোকটা, পাকসিটে গড়নের চেহারা, বয়স কত বুঝিবার উপায় নাই, ত্রিশও হইতে পারে, পঞ্চাশও হইতে পারে! গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা, মুখের ডান দিকে একটা কাটা দাগ—হাতের কব্জিতে দড়ির মত শির বাহির হইয়া আছে ; পরণে আধময়লা ধুতি। পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ে তাহাকে ঘিরিয়া ঘটী-বাটি সারানো দেখিতেছে। দুর্গাও গেল। লোকটা বলিল—কি চাই খুকী ?

সে বলিল—কিছু না দেখবো।

বাড়ী ফিরিয়া মা'র কাছে বলিল—আজ মা গোকুল কাকা খুড়ীমাকে যা মেরেছে সে কি বলবো—পরে সে আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল!

সর্বজয়া বলিল—গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষা একটা বৈ তো নয়! আহা ভালোমানুষ বৌটা এমন হাতে আর এমন বাড়ীতে পড়েচে—ঠেঙা খেতে খেতেই জীবনটা গেল।

—আমাকে তো বড্ড ভালবাসে, যখন যা বাড়ীতে হবে, আমার জন্যে তুলে রেখে দেবে। খুড়ীমার কান্না দেখে এমন কষ্ট হ'ল মা! সখী ঠাক্‌মা আবার এখন উলটে খুড়ীমাকেই বকে—

সে তিন-চার দিন জামতলায় ঘটী-বাটি সারানো দেখিতে গেল। লোকটি তাহার বাড়ী, বাপের নাম সব খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করে। বলিল—তোমাদের বাড়ীর জিনিসপত্তর সারাবে না? নিয়ে এসো না খুকী?

দুর্গা বাড়ী আসিয়া মাকে বলিল—আমাদেব ভাঙা ঘটী-গাড়ুগুলো দেবে মা, একজন বেশ ভালমানুষ লোক এসেচে—ওপাড়ার পথে জামতলায় বসে সারাচ্ছে—

লোকটি তার নাম বলে পিতম—জাতে নাকি কাঁসারী। হাপর জ্বালাইতে জ্বালাইতে এক একবার সোজা হইয়া বসিয়া বলে—জয় রাধে। রাধে গোবিন্দ! সকাল বেলা তাহার কাছে পাড়ার অনেকে আসিয়া জোটে। সে চিম্‌টা দিয়া হাপর হইতে আগুন উঠাইয়া অনবরত তামাক সাজিয়া ভদ্রলোকের হাতে দিতেছে—দিবার সময় মুখখানা বিনয়ে কাঁচুমাচু করিয়া ঘাড় একধারে কাৎ করিয়া বলে—হেঁ হেঁ, তামাক ইচ্ছে করুন বাবাঠাকুর! রাধারাণী-পদ ভরসা!...নারকেলের কথা, আর বলবেন না বাবাঠাকুর, আর বছর জষ্টিমাসে বলি দিই গোটাকতক চারা বসিয়ে! আধকাঠা-খানেক জমিতে ছগণ্ডা চারা কিনে লাগিয়ে দিলাম—তা ব্যাঙের উপক্রুপে—একেবারে মূলশেকড় টুলশেকড সবসুদ্ধ...কটা টাকাই মাটি!

মুখুয্যে মশায় সকাল হইতে ঠায় বসিয়া আছেন, কোনো রকমে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া একটা পিতলের ঘড়া বিনা-মূল্যে সারাইয়া লইবেন। তামাক খাইতে খাইতে পূর্ব কথার খেই ধরিয়া বলিলেন—এই তো গেল কাণ্ড বাপু—তা—এবারও তো ভেবেছিলুম কুড়িখানেক চারা বাড়ীর পেছনে—তা এমন ম্যালেরিয়া ধরল—তোমাদের ওদিকে কি রকম হে কারিগর? (তিনি সকাল হইতেই তাহাকে কারিগর বলিয়া ডাকিতেছেন)।

—পরিপুন্ন—আজ্ঞে পরিপুন্ন—ম্যালেরিয়ার কথা বলবেন না বাবাঠাকুর—হাড় জ্বালিয়ে খেয়েচে—এই নিন্ আপনার ঘড়াটা, ছটা পয়সা দেবেন।

মুখুয্যে মশায় ঘড়াটা হাতে লইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলেন—হ্যাঁ! এর জন্যে আবার পয়সা—দিলে একটা জিনিষ ব্রাহ্মণকে সারিয়ে, অমনি কার্তিক মাসের দিনটা—তার আবার—

পিতম তাডাতাডি মুখুয্যে মশায়ের হাতের ঘডাটা ধরিয়া অত্যন্ত অমায়িকভাবে হাসিয়া বলে—আজ্ঞে না, মাপ করবেন বাবাঠাকুর, এমনি সারিয়ে দিতে পারবো না। এখনো সকাল বেলা বউনি হয় নি। আজ্ঞে না—তা পারবো না—ঘাডটা রেখে যান—বাড়ী গিয়ে পয়া কটা পাঠিয়ে দেবেন।

দুর্গার মা বলে—দেখিস দিকি—ভাঙা বাসন-কোসন বদলে নতুন বাসন-কোসন অনেক সময় ওরা দেয়—জিজ্ঞেস করিস তো।

পিতম খুব বাজী। দুর্গা বাড়ী হইতে বহিয়া বহিয়া এক রাশ পুরানো গাড়ু, ঘটী-বাটি, ঘডা তাহার কাছে লইয়া গিয়া হাজির করে। অর্ধেক দিনটা সে জামতলাতেই কাটায়—হাপর জ্বালানো, রাং ঝাল করা বসিয়া বসিয়া দেখে। পিতম বলিয়াছে তাহাকে একটা পিতলের আংটি গডাইয়া দিবে—ইহাও বলিয়াছে যে, সারাইবার পয়সা তাহাদের লাগিবে না। সর্বজয়া শুনিয়া বলে—আহা বড্ড ভাল লোকটা তো? আসচে বুধবাব অপুর জন্মবারটা, বলিস্—তাকে আসতে—আমাদেব এখানে দু'টো ডাল ভাত পেরসাদ পেয়ে যাবে এখন—

বুধবার সকালে উঠিয়া দুর্গা জামতলায় গিয়া দেখিল লোকটা নাই। জিজ্ঞাসা কবিয়া শুনিল পূর্বদিন সন্ধ্যার পর কোন্ সময়ে সে দোকান উঠাইয়া চলিয়া গিয়াছে—হাপরের গর্ত ও পোডা কয়লার রাশি ছাডা অন্য কোন চিহ্ন নাই। দুর্গা এখানে ওখানে খোঁজ করিল—এ'কে ওকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ জানে না সে কোথায় গিয়াছে। ভয়ে দুর্গার মুখ শুকাইয়া গেল—মা শুনিলে কি বলিবে। সংসাবেব অর্ধেক বাসন তাহার কাছে যে! সে দুর্গাকে বলিয়াছিল, ঝিকরহাটির বাজাবে তাহার কাঁসারিব দোকান আছে, সেখানে সে খবব পাঠাইয়াছে—তাহার ভাই একদিনের মধ্যে নতুন বাসন লইয়া আসিয়া পডিল বলিয়া—আসিলেই ভাঙা-চোরা বাসনগুলা সব বদলাইয়া দিবে। কোথায়ই বা সে আর কোথায়ই বা তাহার ভাই! কোথায় সে যে গেল তাহা দুর্গা অনেক খুঁজিয়াও পাইল না। কেবলমাত্র তাহাদেরই জিনিস গিয়াছে—অন্য হুঁশিয়ার লোকের এক টুকরা পিতলও খোয়া যায় নাই।

সারাদিনের পরে সন্ধ্যার সময় দুর্গা কাঁদো কাঁদো মুখে মাকে সব বলিল। হরিহর বিদেশে—কেই বা খোঁজ করে, কেই বা দেখে। সর্বজয়া অবাক্ হইয়া যায়। বলে—একবার তোর রায় জ্যেঠা মশায়কে গিয়ে বল্ তো? ওমা এমন কথা তো কক্ষনো শুনিনি!…হরিহর বাড়ী আসিলে ঝিকরহাটির

বাজারে খোঁজ করা হইয়াছিল—পিতম নামক কোন লোকের সেখানে কাঁসারির দোকান নাই বা উক্ত চেহারার কোনো লোকও সেখানে নাই।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাস।

অপু বৈকাল বেলা বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প করিতেছে, এমন সময় তাহার মা পিছনে ডাকিয়া বলিল—কোথায় বেরুচ্চিস রে অপু? চাল ভাজা আর ছোলা ভাজা ভাজচি—বেরিও না যেন।…এক্ষুনি খাবি—

অপু শুনিয়াও শুনিল না—যদিও সে চাল ছোলা ভাজা খাইতে ভালবাসে বলিয়াই মা তাহার জন্য ভাজিতে বসিয়াছে, ইহা সে জানে—তবুও সে কি করিতে পারে? এতক্ষণ কি খেলাটাই চলিতেছে নীলুদের বাড়ীতে! সে যখন বাহির দরজায় পা দিয়াছে, মা'র ডাক আবার কানে গেল—বেরুলি বুঝি! —ও অপু, বা রে, ঘ্যাখো মজা ছেলের! গরম গরম খাবি—আমি তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে এসে ভাজতে লাগলাম—ও অপু-উ-উ—

অপু এক ছুট দিয়া নীলুদের বাড়ী গিয়া পৌছিল। অনেক ছেলে জুটিয়াছিল, অপু আসিবার আগেই খেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে! নীলু বলিল,—চল অপু দক্ষিণ মাঠে পাখীর ছানা দেখতে যাবি? অপু রাজি হইলে দুজনে দক্ষিন মাঠে গেল। ধান ক্ষেতের ওপারেই নবাবগঞ্জের বাঁধা সড়কটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা হইয়া যেন মাঠের মাঝখান চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে এক মাইলের উপর হইবে। অপু এতদূর কখনো বেড়াইতে আসে নাই—তাহার মনে হইল যেন সমস্ত পরিচিত জিনিসের গণ্ডী ছড়াইয়া কোথায় কতদূরে নীলুদা তাহাকে টানিয়া আনিল। একটুখানি পরেই সে বলিল, বাড়ী চল নীলুদা, আমায় মা বকবে, সন্দে হ'য়ে যাবে, আমি একা গাবতলার পথ দিয়ে যেতে পারবো না। তুমি বাড়ী চল—

ফিরিতে যাইয়া নীলু পথ হারাইয়া ফেলিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কাহাদের একটা বড় আমবাগানের ধার দিয়া একটা পথ মিলিল। সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব আছে, আকাশে আবার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে—এমন সময় চলিতে চলিতে নীলু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপুর কনুই-এ টান দিয়া সম্মুখ দিকে চাহিয়া ভয়ের সুরে বলিল—ও ভাই অপু!

অপু সঙ্গীর ভয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল—কি রে নীলুদা? পরে সে চাহিয়া দেখিল, যে সুঁড়ি পথটা দিয়া তাহারা চলিতেছিল, তাহা কাহাদের উঠানে গিয়া শেষ হইয়াছে উঠানে। একখানা ছোট্ট চালাঘর ও একটা বিলাতী

আমড়ার গাছ। তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই নীলু ভয়ের সুরে বলিয়া উঠিল—আতুরী ডাইনীর বাড়ী!

অপুর মুখ শুকাইয়া গেল···আতুরী ডাইনীর বাড়ী।······সন্ধ্যাবেলা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহারা! কে না জানে যে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন্ এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, পরে মাছে তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়? কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনিতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সে কিছুই জানিতে পারিবে না, কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া সেই যে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবে না! কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে সে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ওসব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে,—তুই সেই কুঁচবরণ রাজকন্যার গল্পটা বল্ দিকি?

ঝাপসা দৃষ্টিতে সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিতে গেল বাড়ীতে কেহ আছে কিনা এবং চাহিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত শরীর যেন জমিয়া হিম হইয়া গেল···বেড়ায় বাঁশের আগড়ের কাছে—অন্য কেহ নয়, একেবারে স্বয়ং আতুরী ডাইনীই—তাদের—এমন কি যেন তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া!···

যাহার জন্য এত ভয়, তাহাকে একেবারে সম্মুখেই এভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অপুর সামনে পিছনে কোনো দিকেই পা উঠিতে চাহিল না।

আতুরী বুড়ী ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া, তোব্‌ড়ানো গালটা আরও ঝুলাইয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার ভঙ্গীতে মুখটা সামনের দিকে একটু বাড়াইয়া দিয়া পায়ে পায়ে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। অপু দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে, কোনো দিকেই আর পলাইবার পথ নাই—যে কারণেই হউক ডাইনীর রাগটা তাহার উপরেই—এখনই তাহার প্রাণটি সংগ্রহ করিয়া কচুর পাতায় পুরিবে!

মুখের খাবার ফেলিয়া, মায়ের ডাকের উপর ডাক উপেক্ষা করিয়া সে যে আজ মায়ের মনে কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার ফল এই ফলিতে চলিল! সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আমি কিছু জানিনে—ও বুড়ী পিসি—আমি আর কিছু করবো না—আমায় ছেড়ে দাও, আমি ইদিকে আর কখনো আসবো না—আজ ছেড়ে দাও ও বুড়ী পিসি—

নীলু তো ভয়ে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু অপুর এত ভয় হইয়াছিল যে চোখে তাহার জল ছিল না।

বুড়ী বলিল—ভয় কি মোরে, ও বাবারা? মোরে ভয় কি?···পরে খুব ঠাট্টা করা হইতেছে ভাবিয়া হাসিয়া বলিল, মুই কি ধ'রে নেবো খোকারা? এস মোর বাড়িতে এস—আমচুর দেবানি এস—

আমচুর! ডাইনী বুড়ী ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া বাড়ীতে পুরিতে চাহিতেছে—গেলেই আর কি!···ডাইনীরা রাক্ষসীরা যে এ-রকম ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলে এ-রকম কত গল্প তো সে মার মুখে শুনিয়াছে।

এখন সে কি করে। উপায়?

বুড়ী তাহার দিকে আরও খানিক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—ভয় কি, ও মোর বাবারা? মুই কিছু বলবো না, ভয় কি মোরে?

আর কি, সব শেষ! মায়ের কথা না শুনিবার ফল ফলিবার আর দেরী নাই, হাত বাড়াইয়া, তাহার প্রাণটা সংগ্রহ করিয়া এখনি কচুর পাতায় পু—রি—ল! প্রতিমুহূর্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল যে এখুনি বুড়ী হাসিমুখ বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া বিকট মূর্তি ধরিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিবে—রাক্ষসী রাণীর গল্পের মত! বনের অজগর সাপের দৃষ্টির কুহকে পড়িয়া হরিণশিশু নাকি অন্য দিকে চোখ ফিরাইতে পারে না, তাহারও চোখদুটির কুহক-মুগ্ধ দৃষ্টি সেরূপ বুড়ীর মুখের উপর দৃঢ়নিবদ্ধ ছিল—সে আড়ষ্ট কণ্ঠে দিশাহারা ভাবে বলিয়া উঠিল, ও বুড়ী পিসি, আমার মা কাঁদবে, আমায় আজ আর কিছু বোলো না—আমি তোমার গাছে কোনো দিন আমড়া নিতে আসি নি—আমার মা কাঁদবে—

আতঙ্কে সে নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে···বাড়ী, ঘর-দোর, গাছপালা, নীলু, চারিধার যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। কেহ কোনোদিকে নাই···কেবল একমাত্র সে আর আতুরী ডাইনীর ক্রূর দৃষ্টি মাখানো একজোড়া চোখ···আর অনেকদূরে কোথায় যেন মা আর তাহার চাল ভাজা খাওয়ার ডাক!···

পরক্ষণেই কিন্তু অত্যধিক ভয়ে তাহার একরূপ মরীয়া সাহস যোগাইল, একটা অস্পষ্ট আর্তরব করিয়া প্রাণভয়ে দিশাহারা অবস্থায় সে সম্মুখের ভাঁট, শেওড়া, রাংচিতার জঙ্গল ভাঙিয়া ডিঙাইয়া সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে যেদিকে দুই চোখ যায় ছুটিল—নীলুও ছুটিল তাহার পিছনে।

ইহাদের ভয়ের কারণ কি বুঝিতে না পারিয়া বুড়ী ভাবিল—মুই মাত্তিও যাইনি, ধত্তিও যাইনি—কাঁচা ছেলে, কি জানি মোরে দেখে কেন ভয় পালে সন্দেবেলা? খোকাডা কাদের?

অপু যখন বাড়ী আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সর্বজয়া সবে

উনুন ধরাইয়া তালের বড়া ভাজিবার আয়োজন করিতেছে, দুর্গা নিকটে বসিয়া তাল চাঁচিয়া রস বাহির করিতেছে। ছেলেকে দেখিয়া বলিল কোথায় ছিলি বল দিকি? সেই বেরিয়েচো বিকেলবেলা, কিছুই তো আজ খাবার খেলেনি—খিদেতেষ্টা পায় না?

মায়ের নিকটে বলিবার জিনিস অপুর মনে স্তূপাকার হইয়া সকলেই একসঙ্গে বাহিরে আসিবার জন্য এরূপভাবে চেষ্টা পাইতেছিল যে, পরস্পরের ঠেলাঠেলিতে পরস্পরের নির্গমনপথ এককালীন রুদ্ধ হইয়া গিয়া অপুকে একেবারে নির্বাক করিয়া দিল। সে শুধু বলিল—আমি কি কাপড় ছাড়বো মা? আমার এখানা ওবেলার কাপড়—

পরে সে বিস্ময়ের সহিত দেখিল যে, মা তাহাকে চালভাজা দেওয়ার কোন আগ্রহই না দেখাইয়া তালের রসটা ঘন পাতলা হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে দুর্গাকে বলিল—দু-চার খানা ভেজে দেখি, না হয়, বড় তক্তপোষের নীচেটায় চালের গুঁড়ো আছে, আর দুটো নিয়ে আসিস এখন—পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল, দাঁড়া অপু, তোকে গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

অপু বলিল—কেন মা, চাল-ছোলা ভাজা কৈ?

—তা চাল ভাজা তুই খেলি কৈ? এতবার ডাকলাম, তুই বেরিয়ে চলে গেলি, ঠাণ্ডা হয়ে গেল, দুর্গা খেয়ে ফেল্লে, তা এই বড়া তো হয়ে গেল বলে। ভাজবো আর দেবো।

অপু সেই বৈকাল বেলা হইতে মনের মধ্যে যে তাসের ঘর নির্মাণ করিতেছিল, এক ফুঁয়ে কে তাহা একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। এই তাহার মা তাহাকে ভালবাসে। সে বৈকালবেলা বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার পর হইতে অনবরত ভাবিতেছে—মা না জানি কত দুঃখই করিতেছে তাহার জন্য। অপু আমার এখনও কেন যে এলো না, তার জন্যে এত ক'রে ঘাট থেকে এসে ভাজা ভাজলাম, আহা সে দুটো খেলে না!—হাঁ, দায় পড়িয়াছে, তাহার জন্য ভাবিয়া তো মায়ের ঘুম নাই—মা দিব্যি সেগুলি দিদিকে খাওয়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—সে-ই শুধু এতক্ষণ মিছামিছি ভাবিয়া মরিতেছিল।

দুর্গা বলিল—মা শীগ্‌গির শীগ্‌গির ভেজে নাও। বড্ড মেঘ করে আসচে, বিষ্টি এলে আর ভাজা হবে না,—ঘরে যে জল পড়ে।—সেদিনকার মত হবে কিন্তু—

দেখিতে দেখিতে চারিধার ঘিরিয়া ঘনাইয়া-আসা মেঘের ছায়ায় বাঁশবনের মাথা কালো হইয়া উঠিল। খুব মেঘ জমিয়া আকাশ অন্ধকার হইয়াছে, অথচ

বৃষ্টি এখনও নামে নাই,—এ সময় মনে এক প্রকার আনন্দ ও কৌতুহল হয়—না জানি কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টিই আসিতেছে, পৃথিবী বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—অথচ বৃষ্টি হয় প্রতিবারই, পৃথিবী কোনবারেই ভাসায় না, তবুও এ মোহটুকু ঘোচে না! দুর্গার মন সেই অজানার আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে মাঝে মাঝে দাওয়ার ধারে আসিয়া নীচু চালের ছাঁচ হইতে মুখ বাড়াইয়া মেঘান্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল।

সর্বজয়া খানকতক বড়া ভাজিয়া বলিল—এই বাটিটা ক'রে ওকে দে তো দুগ্‌গা। ওর খিদে পেয়েচে, বিকেল থেকে কিছু তো খায় নি। এই শেষ কথাই কাল হইল এতক্ষণ অপু যা হয় এক রকম ছিল কিন্তু মায়ের শেষের দিকের আদরের সুরে তাহার অভিমানের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সে বড়া সুদ্ধ বাটিটা উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল—আমি খাবো না তো বড়া, কখ্‌খনো খাবো না—যাও—

সর্বজয়া ছেলের কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। গরীবের ঘরকন্না, কত কষ্টে যে কি যোগাড় করিতে হয় সে-ই জানে। আর হতভাগা ছেলেটা কিনা দু-দু'বার সেই কত কষ্টে সংগৃহীত মুখের জিনিস নষ্ট করিল। ক্ষোভে, রাগে সে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার আজ হয়েছে কি। তোমার অদৃষ্টে আজ ছাই লেখা আছে, খেও এখন তাই গরম গরম—

এবার অপুর পালা। এ রকম কথা মা'র মুখে সে কখনো শোনে নাই। কোথায় সে চাহিতেছে, মা দুটো আদরের কথা বলিয়া সান্তনা করিবে, না সন্ধ্যাবেলা এমন নিষ্ঠুর কথা। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা মা, আমি চালভাজা খাইনি তাতে আমার মনে কষ্ট হয় না, না? আমি বিকেল থেকে ভাবছিনে বুঝি? আমি কখ্‌খনো তোমাদের বাড়ী আর আসছিনে—আমি ছাই খাবো, কেন আমি ছাই খাবো? আর দিদি বুঝি সব ভাল ভাল জিনিস খাবে? আমি আসবো না তোমার বাড়ী, কখ্‌খনো আসবো না—।

পরে সে আতুরী বুড়ীর বাড়ী হইতে এইমাত্র যেরূপ অন্ধকার, কাঁটাবন, আমবন না মানিয়া ছুটিয়াছিল, এখনও রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেইরূপ মরীয়ার মত ছুটিল। ভাই-এর অভিমান-ভরা দৃষ্টি, ফুলা ঠোঁট ও কথা বলিবার ধরণ দুর্গার নিকট এরূপ হাস্যকর ঠেকিল যে, সে হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।—হি হি—অপুটা একেবারে পাগলা মা, কেমন বল্লে—পরে ভাই-এর কথা বলিবার উক্তির নকল করিয়া বলিল—আমি চালভাজা খাইনি—হি হি—তাতে বুঝি আমার কষ্ট হয় না? বোকা একেবারে মা—ও অপু, শুনে যা, ও অপু-উ-উ—

অপু ছুটিয়া পাঁচিলের পাশের পথ দিয়া পিছনের বাঁশবাগানের দিকে ছুটিল। আকাশে মেঘ তখনও থমকিয়া আছে; বাঁশবনের তলাটা ঝোপে ঝাড়ে নির্জন বর্ষাসন্ধ্যায় ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। সহজ অবস্থায় এরূপ স্থানে এ-সময় একা আসিবার কল্পনাই সে করিতে পারিত না কোনদিনও। কিন্তু বর্তমানে চারিধারের নির্জনতা ও অন্ধকার, বাঁশঝাড়ের মধ্যে কিসের খড়খড় শব্দ, অদূরে সল্‌তেখাগী-আমগাছে ভূতের প্রবাদ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—আমি কখ্‌খনো বাড়ী যাবো না তো! এ জন্মে আর বাড়ী যাবো না।—

অভিমানের প্রথম বেগটা কাটিয়া গেলে তাহার একটু গা ছমছম করিতে লাগিল—-ভয়ে ভয়ে সে একেবার দূরের সল্‌তেখাগী-আমগাছটার দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল—এখন যদি একটা ভূতে আমায় তুলে একেবারে মগডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়—মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে মরে—ভাববে; কেন সন্দেবেলা ছাই খাও বল্লাম, তাইতো খোকা আমার রাগ ক'রে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাথায় বেরিয়ে চ'লে গেল, আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মা'র কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে খানিকক্ষণ প্রতিহিংসার আনন্দে উপভোগ করিল। পরে সেখান হইতে সে গিয়া পাঁচিলের পাশের পথে দাঁড়াইল। তাহার ভয় ভয় করিতেছিল—সম্মুখের বাঁশঝাড়ে একটা যেন অস্পষ্ট শব্দ হইল, অপু একবার ভয়ে ভয়ে চোখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার মা ও দিদি রাণুদের বাড়ীর দিকে ডাকিতেছে—ও অপু-উ-উ। বাঁশ-ঝাড়ে আবার যেন একটা শব্দ হইল। সে মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তাহাকে খোসামোদ না করিলে সে নিজেই অত রাগের মাথায় বাড়ী গিয়া ঢুকিবে, সত্য সত্য এতটা আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য সে নয় নিশ্চয়ই! এবার তাহার দিদি রাণুদের বাড়ীর খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে যেন। সে ছুটিয়া দরজার সাম্‌নে পাঁচিলের কোণটাতে দাঁড়াইল। হঠাৎ আসিতে আসিতে পাঁচিলের পাশে চোখ পড়িতেই দুর্গা চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, ওই দাঁড়িয়ে রয়েচে মা!···ঐ দ্যাখো পাঁচিলের পাশে। পরে সে ছুটিয়া গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল। (ছুটিবার আবশ্যকতা ছিল না)—ওরে দুষ্টু, এখানে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েচে, আর আমি আর মা সমস্ত জায়গা খুঁজে বেড়াচ্চি, এই দ্যাখো।

দু'জনে মিলিয়া তাহাকে বাড়ীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া গেল।

এবার বাড়ী হইতে যাইবার সময় হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। বলিল—বাড়ী থেকে কিছু খেতে পায না, তবুও বাইরে বেরুলে দুধটা, ঘিটা—ওর শরীরটা সারবে এখন।

অপু জন্মিয়া অবধি কোথাও কখনো যায় নাই। এ গাঁয়েরই বকুলতলা, গোঁসাই বাগান, চালতেতলা, নদীব ধার—বড়জোর নবাবগঞ্জ যাইবার পাকা সড়ক—এই পর্যন্ত তাহার দৌড়। মাঝে মাঝে বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে খুব গরম পড়িলে তাহার মা বৈকালে নদীর ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিত। নদীর ওপাবেব খড়ের মাঠে বাবলা গাছে হলুদ রংএব ফুল ফুটিয়া থাকিত, গরু চরিত, মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো শিমূল গাছটাকে দেখিলে মনে হইত যেন কতকালেব পুরাতন গাছটা। রাখালেরা নদীর ধারে গরুকে জল খাওয়াইতে আসিত, ছোট্ট একখানা জেলে-ডিঙ্গি বাহিয়া তাহাদেব গাঁয়ের অক্রুব মাঝি মাছ ধবিবার দোয়াড়ি পাতিতে যাইত, মাঠেব মাঝে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল বৈকালের ঝিরঝিরে বাতাসে দুলিতে থাকিত—ঠিক সেই সময় হঠাৎ এক একদিন ওপারের সবুজ খড়ের জমির শেষে নীল আকাশটা যেখানে আসিয়া দূব গ্রামের সবুজ বনরেখার উপব ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিয়া দেখিতেই তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া যাইত—সে সব প্রকাশ কবিয়া বুঝাইয়া বলিতে জানিত না। শুধু তাহার দিদি ঘাট হইতে উঠিলে সে বলিত—দিদি দিদি, দ্যাখ, দ্যাখ ঐদিকে—পবে সে মাঠেব শেষের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—ঐ যে? ঐ গাছটাব পিছনে? কেমন অনেকদূর, না?

দুর্গা হাসিয়া বলিত—অনেকদূব—তাই দেখাচ্ছিলি? দূর, তুই একটা পাগল!

আজ সেই অপু সর্বপ্রথম গ্রামের বাহিরে পা দিল। কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসাহে তাহার রাত্রিতে ঘুম হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছিল, দিন গুণিতে গুণিতে অবশেষে যাইবার দিন আসিয়া গেল।

তাহাদেব গ্রামের পথটি বাঁকিয়া নবাবগঞ্জের সড়ককে ডাইনে ফেলিয়া মাঠের বাহিরে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের কাঁচা রাস্তার সঙ্গে মিশিয়াছে। দুর্গাপুরের রাস্তায় উঠিয়াই সে বাবাকে বলিল—বাবা, যেখান দিয়ে রেল যায় সেই রেলের রাস্তা কোন্ দিকে?

তাহার বাবা বলিল—সাম্‌নেই পড়বে এখন, চলো না। আমরা রেল-লাইন পেরিয়ে যাব এখন—

সে-বার তাহাদের রাঙী গাইয়ের বাছুর হারাইয়াছিল। নানা জায়গা খুঁজিয়াও দুই তিন দিন ধরিয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সে তার দিদির সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে বাছুর খুঁজিতে আসিয়াছিল। পৌষ মাস, ক্ষেতে ক্ষেতে কলাই গাছের ফলে দানা বাঁধিয়াছে, সে ও তাহার দিদি নীচু হইয়া ক্ষেত হইতে মাঝে মাঝে কলাইফল তুলিয়া খাইতেছিল—তাহাদের সামনে কিছুদূরে নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা, খেজুর গুড় বোঝাই গরুর গাড়ীর সারি পথ বাহিয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিতে করিতে আষাঢ়ুর হাটে যাইতেছিল।

তাহার দিদি পাকা রাস্তার ওপারে বহুদূর ঝাপসা মাঠেব দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া কি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল,—এক কাজ করবি অপু, চল যাই আমরা রেলের রাস্তা দেখে আসি, যাবি? অপু বিস্ময়ের স্বরে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—রেলের রাস্তা—সে যে অনেকদূর! সেখানে কি ক'রে যাবি?

তাহার দিদি বলিল—বেশী দূর বুঝি! কে বলেছে তোকে—ঐ পাকা বাস্তার ওপারে তো—না?

অপু বলিল—নিকটে হ'লে তো দেখা যাবে? পাকা রাস্তা থেকে দেখা যায়—চল দিকি দিদি, গিয়ে দেখি।

দুইজনে অনেকক্ষণ নবাবগঞ্জের সড়কে উঠিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি বলিল—বড্ড অনেক দূর, না? যাওয়া যাবে না—

—কিছু তো দেখা যায় না—অত দূরে গেলে আবার আসব কি ক'রে? তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু দূরের দিকে আবদ্ধ ছিল, লোভও হইতেছিল, ভয়ও হইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদি মরীয়া ভাবে বলিয়া উঠিল—চল যাই দেখে আসি অপু—কতদূর আর হবে? দুপুরের আগে ফিরে আসবো এখন, হয়তো রেলের গাড়ী যাবে এখন—মাকে বলবো বাছুর খুঁজতে দেরী হয়ে গেল—

প্রথমে তাহারা একটুখানি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল কেহ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা। পরে পাকা রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপুর রোদে ভাই-বোনে মাঠ বিল জলা ভাঙিয়া সোজা দক্ষিণ মুখে ছুটিল। দৌড়, দৌড়, দৌড়—নবাবগঞ্জের লাল রাস্তা ক্রমে অনেক দূর পিছাইয়া পড়িল—রোয়ার মাঠ, জলসত্র-তলা, ঠাকুর-ঝি পুকুর বামধারে, ডানধারে দূরে দূরে পড়িয়া রহিল—সামনে একটা ছোট বিল নজরে আসিতে লাগিল। তাহার দিদি হাসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মা টের পেলে কিন্তু—পিঠের ছাল তুলবে। অপু

একবার হাসিল—মরীয়ার হাসি। আবার দৌড়, দৌড়, দৌড়—জীবনে এই প্রথম বাধাহীন গণ্ডিহীন, মুক্তির উল্লাসে তাহাদের তাজা তরুণ রক্ত তখন মাতিয়া উঠিয়াছিল—পরে কি হইবে, তাহা ভাবিবার অবসর কোথায়?

পরে যাহা হইল, তাহা সুবিধাজনক নয়। খানিক দূরে গিয়া একটা বড় জলা পড়িল একেবারে সামনে—হোগলা আর শোলা গাছে ভরা, তাহার উপর তাহার দিদি পথ হারাইয়া ফেলিল—কোনো গ্রামও চোখে পড়ে না—সামনে কেবল ধান ক্ষেত, জলা, আর বেত-ঝোপ। ঘন বেতবনের ভিতর দিয়া যাওয়া যায় না, পাঁকে জলে পা পুঁতিয়া যায়, রৌদ্র এমন বাড়িয়া উঠিল যে, শীতকালেও তাহাদের গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—দিদির পরণের কাপড় কাঁটায় নানা স্থানে ছিড়িয়া গেল, তাহার নিজের পায়ে দু'তিনবার কাঁটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইল—শেষে রেলরাস্তা দূরের কথা, বাড়ী ফেরাই মুস্কিল হইয়া উঠিল। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, পাকা রাস্তাও আর দেখা যায় না, জল ভাঙিয়া ধানক্ষেত পার হইয়া যখন তাহারা বহু কষ্টে আবার পাকা রাস্তায় আসিয়া উঠিল তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া তাহার দিদি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তবে নিজের ও তাহার পিঠ বাঁচাইল।

সেই রেলের রাস্তা আজ এমনি সহজভাবেই সামনে পড়িবে—সেজন্য ছুটিতে হইবে না, পথ হারাইতে হইবে না—বকুনি খাইতে হইবে না।

কিছু দূর গিয়া সে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া দেখিল নবাবগঞ্জের পাকা সড়কের মত একটা উঁচু রাস্তা মাঠের মাঝখান চিরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বহুদূর গিয়াছে। রাঙা রাঙা খোয়ার রাশি উঁচু হইয়া ধারের দিকে সারি দেওয়া। সাদা সাদা লোহার খুঁটির উপর যেন একসঙ্গে অনেক দড়ির টানা বাঁধা—যতদূর দেখা যায় ঐ সাদা খুঁটি ও দড়ির-টানা-বাঁধা দেখা যাইতেছে।

তাহার বাবা বলিল—ঐ ছাখো খোকা, রেলের রাস্তা—

অপু একদৌড়ে ফটক পার হইয়া রাস্তার উপর আসিয়া উঠিল। পরে সে রেলপথের দুইদিকে বিস্ময়ের চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। দুইটা লোহা বরাবর পাতা কেন? উহার উপর দিয়া রেলগাড়ী যায়? কেন? মাটির উপর দিয়া না গিয়া লোহার উপর দিয়া যায় কেন? পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া যায় না? কেন? ওগুলোকে তার বলে? তাহার মধ্যে সোঁ সোঁ কিসের শব্দ? তারে খবর যাইতেছে? কাহারা খবর দিতেছে? কি করিয়া খবর দেয়? ওদিকে কি ইষ্টিশান? এদিকে কি ইষ্টিশান?

সে বলিল—বাবা, রেলগাড়ী কখন আসবে? আমি রেলগাড়ী দেখবো বাবা।

—রেলগাড়ী এখন কি ক'রে দেখবে ?······সেই দুপুরের সময় রেলগাড়ী আসবে, এখনও দু'ঘণ্টা দেরি !

—তা হোক্ বাবা, আমি দেখে যাবো, আমি কখ্‌গনো দেখিনি—হ্যাঁ বাবা—

—ও রকম কোরো না, ঐ জন্যে তোমায় কোথাও আনতে চাইনে—এখন কি ক'রে দেখবে ? সেই দুপুর একটা অবধি ব'সে থাক্‌তে হবে তা হোলে এই ঠায় রোদ্দুরে, চল্ আস্‌বার দিন দেখাবো।

অপুকে অবশেষে জল-ভরা চোখে বাবার পিছনে পিছনে অগ্রসর হইতে হইল।

তুমি চলিয়া যাইতেছ···তুমি কিছুই জানো না, পথের ধারে তোমার চোখে কি পড়িতে পারে, তোমার ডাগর নবীন চোখ বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় চারিদিককে গিলিতে গিলিতে চলিয়াছে—নিজের আনন্দের এ হিসাবে তুমিও একজন দেশ-আবিষ্কারক। অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই ! আমি যেখানে আর কখনো যাই নাই, আজ নতুন পা দিলাম, যে নদীর জলে নতুন স্নান করিলাম, যে গ্রামের হাওয়ায় শরীর জুড়াইলাম, আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায় ? আমার অনুভূতিতে তাহা যে অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি আজ সবপ্রথম মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়া উহার নবীনতাকে আস্বাদ করিলাম যে !

আমডোব ! ছোট্ট চাষাদের গাঁ-খানা—কেমন নামটি ! মেয়েরা উঠানে বিচালি কাটিতেছে, ছাগল বাঁধিতেছে, মুরগীকে ভাত খাওয়াইতেছে, বড় লোকেরা পাট শুকাইতেছে, বাঁশ কাটিতেছে—দেখিতে দেখিতে গাঁ পিছনে ছাড়িয়া একেবারে বাহিরের মাঠ···বিলে জল থৈ থৈ করিতেছে···উড়ি ধানের ক্ষেতে বক বসিয়া আছে···নাল ফুলের পাতা ও ফুটন্ত ফুলে জল দেখা যায় না।

খল্‌সেমারির বিলের প্রান্তে ঘন সবুজ আউশ ধানের ক্ষেতের উপরকার বৃষ্টি-ধৌত, ভাদ্রের আকাশের সুনীল প্রসার। সারা চক্রবাল জুড়িয়া সূর্যাস্তের অপরূপ বর্ণচ্ছটা, বিচিত্র রং-এর মেঘের পাহাড়, মেঘের দ্বীপ, মেঘের সমুদ্র, মেঘের স্বপ্নপুরী—খোলা আকাশের সহিত এ রকম পরিচয় তাহার এতদিন হয় নাই, মাঠের পারের দূরের দেশটা এবার তাহার রহস্য-অবগুণ্ঠন খুলিল আট বছরের ছেলেটির কাছে।

যাইতে যাইতে বড় দেরী হইল। তাহার বাবা বলিল—বড্ড হাঁ-করা ছেলে, যা দেখে তাতেই হাঁ ক'রে থাকো কেন অমন ? জোরে হাঁটো।

সন্ধ্যার পর তাহারা গন্তব্যস্থানে পৌছিল। শিষ্যের নাম লক্ষ্মণ মহাজন,

বেশ বড় চাষী ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাহিরের বড় আটচালা ঘরে মহা আদরে তাহারা থাকিবার স্থান করিয়া দিল।

লক্ষ্মণ মহাজনের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী সকালে স্নান করিবার জন্য পুকুরের ঘাটে আসিয়াছিল—জলে নামিতে গিয়া পুকুরের পাড়ে নজর পড়াতে সে দেখিল পুকুর পাড়ের কলাবাগানে একটি অচেনা ছোট ছেলে একখানি কঞ্চি হাতে কলাবাগানের একবার এদিক একবার ওদিক পায়চারি করিতেছে ও পাগলের মত আপন মনে বকিতেছে। সে ঘাড় নামাইয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাদের বাড়ী এসেছ, খোকা?

অপুর যত জারিজুরি তাহার মায়ের কাছে। বাহিরে সে বেজায় মুখচোরা। প্রথমটা অপুর মাথায় আসিল যে টানিয়া দৌড় দেয়। পরে সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—ওই ওদের বাড়ী—

বধূটি বলিল—বট্‌ঠাকুরদের বাড়ী? বট্‌ঠাকুরের গুরুমশায়ের ছেলে? ও!

বধূ সঙ্গে করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী পৃথক—লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ী হইতে সামান্য দূরে, কিন্তু মধ্যে পুকুরটা পড়ে।

বধূর ব্যবহারে অপুর লাজুকতা কাটিয়া গেল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরের জিনিসপত্র কৌতুহলের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ওঃ, কত কি জিনিস!...তাহাদের বাড়ীতে এ রকম জিনিস নাই। এরা খুব বড়লোক তো! কড়ির আলনা, রং-বেরং এর ঝুলন্ত শিকা, পশমের পাখী, কাঁচের পুতুল, মাটির পুতুল, শোলার গাছ—আরও কত কি।—দু একটা জিনিস সে ভয়ে ভয়ে হাত তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

বধূ এতক্ষণ ভাল করিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখে নাই—কাছের গোড়ায় দেখিয়া মনে হইল যে, এখনও ভারি ছেলেমানুষ, মুখের ভাব যেন পাচ বছরের ছেলের মত কচি। এমন সুন্দর সুবোধ চোখের ভাব সে আর কোন ছেলের চোখে এ পর্যন্ত দেখে নাই—এমন রং, এমন গড়ন, এমন সুন্দর মুখ, এমন তুলি দিয়া আঁকা ডাগর নিষ্পাপ চোখ...অচেনা ছেলেটির উপর বধূর বড় মমতা হইল।

অপু বসিয়া নানা গল্প করিল—বিশেষ করিয়া কল্যকার রেলপথের কথাটি। খানিকটা পরে বধূ মোহনভোগ তৈয়ারী করিয়া খাইতে দিল। একটা বাটিতে অনেকখানি মোহনভোগ, এত ঘি দেওয়া যে আঙুলে ঘিয়ে মাখামাখি হইয়া যায়। অপু একটুখানি মুখে তুলিয়া খাইয়া অবাক হইয়া গেল—এমন অপূর্ব জিনিস আর সে কখনো খায় নাই তো!—মোহনভোগে কিস্‌মিস্ দেওয়া

কেন ? কৈ তাহার মায়ের তৈরী মোহনভোগে তো কিসমিস থাকে না ? বাড়াতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে—মা, আজ আমাকে মোহনভোগ ক'রে দিতে হবে ? তাহার মা হাসিমুখে বলে—আচ্ছা ওবেলা তোকে ক'রে দেবো—পরে সে শুধু স্বজি জলে সিদ্ধ করিয়া একটু গুড় মিশাইয়া পুলটিসের মত একটা দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে, মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ কিন্তু তাহার মনে হইল এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারী মোহনভোগে আকাশ-পাতাল তফাৎ !...সঙ্গে সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মাও জানে না যে, এ রকমের মোহনভোগ হয় !—সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল, তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব—তাই তাহাদের বাড়ী ভাল খাওয়া দাওয়া হয় না।

একদিন পাড়াব এক ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীব বাড়ী অপুব নিমন্ত্রণ হইল। দুপুর বেলা, সে-বাড়ীব একটি মেয়ে আসিয়া অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। ওদের রান্নাঘবেব দাওয়ায় যত্ন কবিয়া পিঁড়ি পাতিয়া জল ছিটাইয়া অপুকে খাবার জায়গা কবিয়া দিল। যে মেয়েটি অপুকে ডাকিতে আসিয়াছিল, নাম তার অমলা, বেশ টুকটুকে ফর্সা বং, বড় বড় চোখ, বেশ মুখখানি, বয়স তার দিদির মতো ! অমলার মা কাছে বসিয়া তাহাকে—খাওয়াইলেন, নিজের হাতের তৈয়াবী চন্দ্রপুলি পাতে দিলেন। খাওয়ার পরে অমলা তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী দিয়া গেল। সেদিন বৈকালে খেলিতে খেলিতে অপুর পায়ের আঙুল হঠাৎ বাগানের বেড়ার দুই বাঁশের ফাঁকে পড়িয়া আটকাইয়া গেল। টাটকাচেবা নতুন বাঁশের বেড়া, আঙুল কাটিয়া রক্তারক্তি হইল, অমলা ছুটিয়া আসিয়া পা-খানা বাঁশেব ফাঁক হইতে বাহির না করিলে গোটা আঙুলটাই কাটা পড়িত। সে চলিতে পারিতেছিল না, অমলা তাহাকে কোলে করিয়া গোলার পাশ হইতে পাথরকুচির পাতা তুলিয়া বাটিয়া আঙুলে বাঁধিয়া দিল। পাছে বাবার বকুনি খাইতে হয়, এই ভয়ে অপু একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না।

সে রাত্রে শুইয়া অপু শুধু অমলারই স্বপ্ন দেখিল। সে অমলার কোলে বেড়াইতেছে, অমলার কাছে বসিয়া আছে, অমলার সঙ্গে খেলা করিতেছে, অমলা তাহার পায়ের আঙুলে পটি বাঁধিয়া দিতেছে, সে ও অমলা রেলরাস্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে—অমলার হাসিভরা চোখমুখ ঘুমের ঘোরে সারারাত নিজের কাছে কাছে। ভোরে সে খুঁজিতে লাগিল অমলা কখন

আসে। আরও সব ছেলেমেয়েরা আসিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল, ক্রমে বেশ বেলা হইল—কিন্তু অমলার দেখা নাই। বাড়ীর ভিতর হইতে বধূ খাবার খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইল—রোজ সকালে বিকালে বধূ নিজের হাতে খাবার তৈয়ারী করিয়া তাহাকে খাওয়াইত, খাওয়া শেষ করিয়া আসিবার সময় সে বধূকে জিজ্ঞাসা করিল—সকালে কি অমলাদিদি এসেছিল? না, সে আসে নাই। ক্রমে আরও বেলা হওয়াতে খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার বাবা তাহাকে স্নান করিবার জন্য ডাকিল। তবুও কোথায় অমলা? অভিমান তাহার মন ছাপাইয়া উঠিল, বেশ, নাই বা আসিল? অমলার সহিত তাহার জন্মের মত আড়ি—আর যদি সে কখনোও তাহার সহিত কথা কয়! বৈকালেও খেলা আরম্ভ হইল, সকলেই আসিল, অমলা নাই। পাঁচ ছয়টি ছেলেমেয়ে খেলিতে খেলিতে আসিলেও অপুর মনে হইল, কাহার সহিত সে খেলিবে? কেহই উপযুক্ত খেলার সাথী বলিয়া মনে হইল না। উৎসাহহীনভাবে সে খানিকক্ষণ খেলা করিল, তবুও অমলার দেখা নাই।

পরদিন সকালে অমলা আসিল। অপু কোনো কথা বলিল না। অমলা যেখানে বসে, সে তাহার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না, অথচ মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া দেখে, সে যে রাগ করিয়া এরূপ করিতেছে, অমলা তাহা বুঝিয়াছে কিনা। অমলা সত্যই প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, পরে সে যখন বুঝিল যে, কিছু একটা হইয়াছে নিশ্চয়, তখন সে কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খোকা কথা বলচো না কেন?···কি হয়েচে?

অপু অতশত বোঝে না, সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—কি হয়েচে বৈকি। তা কিছু কি আব হয়েচে? কাল আসনি কেন?

অমলা অবাক হইয়া বলিল—আসিনি, তাই কি?—সেইজন্যে রাগ করেচ? অপু ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, ঠিক তাই। অমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অপুকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিল বাড়ীর ভিতর। সেখানে বধূ সব শুনিয়া প্রথমটা হাসিয়া খুন হইল, পরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল,—তা হোলে অমলা তোমার আর এখন বাড়ী যাওয়ার যো নেই তো দেখচি—কি আর করবে, খোকা যখন তোমাকে ছাড়তে পারে না, তখন এখানেই থেকে যাও—আর না হয়—

বধূর কথার ভঙ্গিতে অমলা কি জানি কি একটা ঠাওরাইয়া লজ্জিত প্রতিবাদের সুরে বলিল—আচ্ছা যাও বৌদি—ও-রকম করলে কিন্তু কক্ষনো আর তোমাদের বাড়ী—

খানিকক্ষণ পরে অপু অমলার সঙ্গে তাহাদের বাড়ী গেল। অমলা

তাহাদের আলমারি খুলিয়া কাঁচের বড মেম-পুতুল, মোমের পাখী, গাছ আরও কত কি দেখাইল। কালীগঞ্জের স্নানযাত্রার মেলা হইতে সে-সব নাকি কেনা, অপু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। নতুন নতুন খেলার জিনিস—একটা রবারের বাঁদর, সেটা তুমি যেদিকে যাও, তোমার দিকে চাহিয়া চোখ পিট্‌পিট্‌ করিবে—একটা কিসের পুতুল, সেটার পেট টিপিলে তুহাতে মৃগীরোগীর মত হঠাৎ হাত পা ছুঁড়িয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে—সকলের চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস হইতেছে একটা টিনের ঘোডা; রাণুদির কাকা তাহাদেব বাড়ীর দালানের ঘডিতে যেমন দম দেয়, ঐরকম দম দিয়া ছাডিয়া দিলে খডখড করিয়া মেঝের উপব চলতে থাকে—অনেক দূব যায়—ঠিক যেন একেবারে সত্যিকারের ঘোডা। সেইটা দেখিয়া অপু অবাক হইয়া গেল। হাতে তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিযা অমলাব দিকে চাহিযা বলিল—এ কি রকম ঘোড়া, বেশ বেশ তো। এ কোথা থেকে কেনা, এর দাম কত?

তাহাব পব অমলা তাহাকে একটা সিঁদুরেব কৌটা খুলিয়া দেখাইল—সেটাব মধ্যে বাঙা রং-এব একখানা ছোট রাংতার মত কি। অপু বলিল—ওটা কি? রাংতা? অমলা হাসিয়া বলিল—রাংতা হবে কেন?—সোনার পাত দেখনি অপু? সোনার রং কি অত রাঙা? সোনার পাতখানা নাডিয়া চাডিয়া ভাল কবিয়া দেখিতে লাগিল। অমলার সহিত বাড়ী ফিরিতে ফিবিতে সে ভাবিল—আহা, দিদিটাব ও-সব খেলনা কিছুই নেই—মরে কেবল শুকনো নাটাফল আব রডাব বিচি কুডিয়ে, আর শুধু পরের পুতুল চুরি ক'রে মার খায়।...তাহাব দিদিব বয়সী অন্য কোন মেয়ের খেলনাব ঐশ্বর্য কত বেশী, তাহা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন দেখে নাই, আজ তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইযা দিদির প্রতি অত্যন্ত করুণায় তাহার মনটা যেন গলিয়া গেল। তাহার পয়সা থাকিলে সে দিদিকে একটা কলের ঘোডা কিনিয়া দিত—আব একটা রবারের বাঁদর...তুমি যেদিকে যাও, তোমাব দিকে চাহিয়া সেটা চোখ পিট্‌পিট করে...

বধ্যব কাছে একজোড়া পুরানো তাস ছিল; ঠিক একজোডা বলা চলে না, সেটা নানা জোডা তাসেব পরিত্যক্ত কাগজগুলি এক জায়গায় জডো করা আছে মাত্র—অপু সেগুলি লইয়া মাঝে-মধ্যে নাডে চাডে। রাণুদির বাড়ীতে মাঝে মাঝে তুপুরবেলা তাসের আড্ডা বসিত, সে বসিয়া বসিয়া খেলা দেখিত। টেক্কা, গোলাম, সাহেব, বিবি—কাগজে ধরা লইয়া মারামারি হয়—বেশ খেলা! সে তাস খেলিতে জানে না, তাহার মা দিদি কেহই জানে না। এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে যায়, তাহার মাকে লইয়া কেহ বসিতে চায় না, সকলে

বলে, ও কিছু খেলা জানে না, এক একদিন তাহার মা তাস খেলিতে বসে, এমন ভাব দেখায় যেন সে খুব পাকা খেলোয়াড়···খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু ধরা পড়ে। কেউ বলে, ও বৌ, একি? এখানে টেক্কা মেরে বসলে যে। দেখলে না ওহাতে রংয়ের গোলাম কাটলে?—তোমার চোখের সামনে যে? তাহার মা তাড়াতাড়ি অজ্ঞতা ঢাকিতে যায়, হাসিয়া বলে, তাই তো! বড্ড তো ভুল হ'য়ে গেছে, ও ঠাকুরঝি, মোটেই তো মনে নেই। পরে সে আবার খেলিতে থাকে, মুখ টিপিয়া হাসে, এর ওর দিকে চায়, এমন ভাবটা দেখায় যে তাহার কাছে সকলের হাতের তাসের খবরই আছে, এবার একটা কিছু না করিয়া সে ছাড়িবে না—কিন্তু খানিকটা পরে একজন অবাক হইয়া বলিয়া উঠে, একি বৌমা দেখি? ওমা আমার কি হবে! তোমার হাতে যে এমন বিন্তি ছিল, দেখাও নি? তাহার মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিজ্ঞের ভাব করিয়া বলে, আছে, আছে, ওর মধ্যে একটা কথা আছে! ইচ্ছে ক'রেই দেখাই নি—। সে আসলে বিন্তি কিসে হয় সব জানে না। তাহার খেলুড়ে রাগ করিয়া বলে—ওর মধ্যে আবার কথাটা কি শুনি? এমন হাতটা নষ্ট কল্লে? দাও তুমি তাস সেজোবৌকে দাও, তোমার আর খেলতে হবে না—ঢের হয়েচে। তাহার মা অপমান ঢাকিতে গিয়া আবার হাসে—যেন কিছুই হয় নাই, সবই ঠাট্টা, উহারা ঠাট্টা করিয়াই বলিতেছে, সেও সেই ভাবেই লইতেছে।

সে যদি এক জোড়া তাস পায় তবে সে, মা ও দিদি খেলে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুর বেলা তাদের বাড়ীর বনের দিকের সেই জানালাটা—যেটার কবাটগুলোর মধ্যে কি পোকায় কাটিয়া সরিষার মত গুঁড়া করিয়া দিয়াছে··· নাড়া দিলে ঝুর্‌ঝুর্ করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পুরানো কাঠের গুঁড়ার গন্ধ বার হয়—জানালার ধারের বন হইতে দুপুরের হাওয়ায় গন্ধভাদুলী লতার কটু গন্ধ আসে, রোয়াকের কালমেঘের গাছের জঙ্গলে দিদির পরিচিত কাচপোকাটা একবার ওড়ে, আবার বসে, আবার ওড়ে আবার বসে—নির্জন দুপুরে তারা তিনজনে সেই জানালাটির ধারে মাদুর পাতিয়া বসিয়া আপন মনে তাস খেলিবে। কিসে কিসে বিন্তি হয় তাদের নাই-বা থাকিল জানা, তাদের খেলায় বিন্তি না দেখাইতে পারিলেও চলিবে—সেজন্য কেহ কাহাকেও উঠাইয়া দিবে না, কোন অপমানের কথা বলিবে না, কোন হাসি-বিদ্রূপ করিবে না, যে যেরূপ পারে সেইরূপই খেলিবে। খেলা লইয়া কথা—নাই বা হইল বিন্তি দেখানো?

সন্ধ্যার পর বধূর ঘরে অপুর নিমন্ত্রণ ছিল। খাইতে বসিয়া খাবার জিনিসপত্র ও আয়োজনের ঘটা দেখিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। ছোট একখানা ফুলকাটা রেকাবীতে আলাদা করিয়া নুন ও নেবু কেন? নুন নেবু

তো মা পাতেই দেয়! প্রত্যেক তরকারির জন্যে আবার আলাদা আলাদা বাটি!—তরকারিই বা কত! অত বড় গলদা চিংড়ির মাথাটা কি তাহার একার জন্য?

লুচি! লুচি! তাহার ও তাহার দিদির স্বপ্নকামনার পরে এক রূপকথার দেশের নীল-বেলা আবছায়া দেখা যায়…কত রাতে, দিনে, ওলের ডাঁটা-চচ্চড়ী ও লাউছেঁচকি দিয়া ভাত খাইতে খাইতে, কত জল-খাবার-খাওয়া-শূন্য সকালে বিকালে, অন্যমনস্ক মন হঠাৎ লুব্ধ, উদাস গতিতে ছুটিয়া চলে সেখানে—যেখানে গরম রোদে দুপুর বেলা তাহাদের পাড়ার পাকা রাঁধুনি বীরু রায় গামছা কাঁধে ঘুরিয়া বেড়ায়, সদ্য-তৈয়ারী বড উনুনের বড লোহার কড়াই-এ ঘি চাপানো থাকে, লুচি-ভাজার অপূর্ব সুধারুচি-ঘ্রাণ আসে, কত ছেলেমেয়ে ভাল কাপড-জামা পরিয়া যাতায়াত করে, গাঙ্গুলি বাড়ীর বড নাটমন্দির ও জলপাই-তলা বিছাইয়া গ্রীষ্মের দিনে সতরঞ্চ পাতা হয়, একদিন মাত্র বছরে সে দেশের ঠিকানা খুঁজিয়া মেলে—সেই চৈত্র বৈশাখ মাসের রামনবমী দোলের দিনটি—তাহাদের সেদিন নিমন্ত্রণ থাকে ওপাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ী। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সে সুদিনের উদয় হইল কি করিয়া! খাইতে বসিয়া বার বার তাহার মনে হইতেছিল, আহা, তাহার দিদি এ রকম খাইতে পায় নাই কখনো।

পরদিন সকালে আবার খেলা আরম্ভ হইল। অমলা আসিতেই অপু ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—আমি আর অমলাদি একদিকে, আর তোমরা সব একদিকে—

খানিক খেলা হইবার পর অপুর মনে হইল অমলা তাহাকে দলে পাওয়ার অপেক্ষা বিশুকে দলে পাইতে ইচ্ছুক। ইহার প্রকৃত কারণ অপু জানিত না—অপু একেবারে কাঁচা খেলুড়ে, তাহাকে দলে লওয়ার মানেই পরাজয়—বিশু ডানপিটে ছেলে, তাহাকে দৌড়িয়া ধরা কি খেলায় হারানো সোজা নয়। এবার অমলা স্পষ্টই বিরক্তি প্রকাশ করিল। অপু প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে সে জেতে, যাহাতে অমলা সন্তুষ্ট হয়—কিন্তু বিশুর চেষ্টা সত্ত্বেও সে আবার হারিয়া গেল।

সেবার দল গঠন করিবার সময় অমলা ঝুঁকিল বিশুর দিকে।

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল! খেলা তাহার কাছে হঠাৎ বড বিস্বাদ মনে হইল—অমলা বিশুর দিকে ফিরিয়া সব কথা বলিতেছে, হাসিখুশি সবই তাহার সঙ্গে। খানিকটা পরে বিশু কি কাজে বাড়ী যাইতে চাহিলে অমলা তাহাকে বারবার বলিল যে, সে যেন আবার আসে। অপুর মনে অত্যন্ত ঈর্ষা হইল,

সারা সকালটা একেবারে ফাঁকা হইয়া গেল। পরে সে মনে মনে ভাবিল—বিশু খেলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে—গেলে খেলার খেলুড়ে কমে যাবে, তাই অমলাদি ঐরকম বলচে, আমি গেলে আমাকেও বলবে, ওর চেয়েও বেশী বলবে। হঠাৎ সে চলিয়া যাইবার ভান করিয়া বলিল—বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই, নাইবো। অমলা কোন কথা বলিল না, কেবল কামারদের ছেলে নাড়ুগোপাল বলিল—আবাব ওবেলা এসো ভাই!

অপু খানিক দূর গিয়া একবার পিছনে চাহিল—তাহাকে বাদ দিয়া কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই, পুরাদমে খেলা চলিতেছে, অমলা মহা-উৎসাহে খুঁটির কাছে বুড়ী দাঁড়াইয়াছে—তাহাব দিকে ফিবিয়াও চাহিতেছে না।

অপু আহত হইয়া অভিমানে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল, কাহাবও সঙ্গে কোন কথা বলিল না।

ভারি তো অমলাদি! না চাহিল তাহাকে—তাতেই বা কি?······

দিন দুই পরে হরিহর ছেলেকে লইয়া বাড়ী আসিল।

এই তো মোটে কয়দিন, এরই মধ্যে সর্বজয়া ছেলেকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না।

দুর্গার খেলা কয়দিন হইতে ভালবকম জমে নাই, অপুর বিদেশ-যাত্রার দিনকতক আগে দেশী-কুমড়ার শুকনো খোলার নৌকা লইয়া ঝগড়া হওয়াতে দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—এখন আরও অনেক কুমড়ার খোলা জমিয়াছে, দুর্গা কিন্তু আর সেগুলি জলে ভাসাইতে যায় না—কেন মিছিমিছি এ নিয়ে ঝগড়া ক'রে তার কান ম'লে দিলাম? আসুক সে ফিরে, আর কক্ষনো তার সঙ্গে ঝগড়া নয়, সব খোলা সেই নিয়ে নিক্।

বাড়ী আসিয়া অপু দিন পনেরো ধরিয়া নিজের অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত আশ্চর্য জিনিস যে দেখিয়াছে এই কয়দিনে! রেলের রাস্তা, যেখান দিয়া সত্যিকারের রেলগাড়ী যায়। মাটির আতা, পেঁপে, শসা—অবিকল যেন সত্যিকার ফল। সেই পুতুলটা, যেটার পেট টিপিলে মৃগীরোগীর মত হাত-পা ছুঁড়িয়া হঠাৎ খঞ্জনী বাজাইতে শুরু করে। অমলাদি? কতদূর যে সে গিয়াছিল, পদ্মফুলে ভরা বিল, কত অচেনা নতুন গাঁ পার হইয়া কত মাঠের উপরকার নির্জ্জন পথ বাহিয়া, সেই যে কোন্ গাঁয়ে পথের ধারের

কামার-দোকানে বাবা তাহাকে জল খাওয়াইতে লইয়া গেলে, তাহারা তাহাকে বাড়ীব মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া দুধ-চিঁড়ে বাতাসা খাইতে দিয়াছিল। কোন্‌টা ফেলিয়া সে কোন্‌টার গল্প করে!

রেলরাস্তার গল্প শুনিয়া তাহার দিদি মুগ্ধ হইয়া যায়, বার বার জিজ্ঞাসা কবে—কত বড় নোয়াগুলো দেখ্‌লি অপু? তার টাঙানো বুঝি? খুব লম্বা? বেলগাড়ী দেখতে পেলি? গেল?

না—রেলগাড়ী অপু দেখে নাই। এটাই কেবল বাদ পড়িয়াছে—সে শুধু বাবার দোষে। মোটে ঘণ্টা-চার-পাঁচ রেলরাস্তার ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই রেলগাড়ী দেখা যাইত—কিন্তু বাবাকে সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বেলা হইয়া যাওয়াতে ব্যস্ত অবস্থায় সর্বজয়া তাড়াতাড়ি অন্যমনস্কভাবে সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া উঠানে পা দিতেই কি যেন একটা সরু দড়ির মত বুকে আটকাইল ও সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা পটাং করিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার শব্দ হইল এবং দুদিক হইতে দুটা কি উঠানে ঢিলা হইয়া পড়িয়া গেল। সমস্ত কার্যটি চক্ষের নিমেষে হইয়া গেল, কিছু ভাল করিয়া দেখিবার কি বুঝিবার পূর্বেই।

অল্পখানিক পরেই অপু বাড়ী আসিল। দরজা পার হইয়া উঠানে পা দিতেই সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল—নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না —এ কি। বা রে, আমাব টেলিগিরাপের তার ছিঁড়লে কে?

ক্ষতিব আকস্মিকতায় ও বিপুলতায় প্রথমটা সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। পরে একটু সামলাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখিল উঠানের মাটিতে ভিজা পায়ের দাগ এখনও মিলায় নাই। তাহার মনের ভিতব হইতে কে ডাকিয়া বলিল—মা ছাড়া আর কেউ নয়। কক্‌খনো আব কেউ নয়, ঠিক মা। বাড়ী ঢুকিয়া সে দেখিল মা বসিয়া বসিয়া বেশ নিশ্চিন্ত-মনে কাঁঠাল-বীচি ধুইতেছে। সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল এবং যাত্রা-দলেব অভিমন্যুর মত ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বাঁশীর সপ্তমের মত রিন্‌রিনে তীব্র মিষ্টস্বরে কহিল—আচ্ছা মা, আমি কষ্ট ক'রে ছোটাগুলো বুঝি বন-বাগান ঘেঁটে নিয়ে আসিনি?

সর্বজয়া পিছনে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিল—কি নিয়ে এসেচিস? কি হয়েছে?

—আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কাঁটায় আমার হাত পা ছ'ড়ে যায়নি বুঝি?

—কি বলে পাগলের মত? হয়েচে কি?

—কি হয়েচে! আমি এত কষ্ট ক'রে টেলিগিরাপের তার টাঙালাম আর ছিঁড়ে দেওয়া হয়েচে, না?

- তুমি যত উদ্ঘুটি কাণ্ড ছাড়া তো এক দণ্ড থাকো না বাপু। পথের মাঝখানে কি টাঙানো রয়েছে—কি জানি টেলিগিরাপ কি কি গিরাপ, আসচি তাড়াতাড়ি, ছিঁড়ে গেল—তখন কি করবো বলো—

পরে সে পুনরায় নিজ কাজে মন দিল।

উঃ। কি ভীষণ হৃদয়হীনতা! আগে আগে সে ভাবিত বটে যে, তাহার মা তাহাকে ভালবাসে—অবশ্য যদিও তাহার সে ভ্রান্ত ধারণা অনেকদিন ঘুচিয়া গিয়াছে—তবুও মাকে এতটা নিষ্ঠুর পাষাণীরূপে কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। কাল সারাদিন কোথায় নীলমণি জ্যেঠার ভিটা, কোথায় পালিতদের বড় আমবাগান, কোথায় প্রসন্ন গুরুমহাশয়ের বাঁশবন—ভয়ানক ভয়ানক জঙ্গলে একা ঘুরিয়া বহু কষ্টে উঁচু ডাল হইতে দোলানো গুলঞ্চলতা কত কষ্টে যোগাড় করিয়া সে আনিল, এখুনি রেল-রেল খেলা হইবে সব ঠিকঠাক, আর কি না…

হঠাৎ সে মাকে একটা খুব কড়া, খুব রূঢ়, খুব একটা প্রাণ-বিঁধানো কথা বলিতে চাহিল—এবং খানিকটা দাঁড়াইয়া বোধ হয় অন্য কিছু ভাবিয়া না পাইয়া আগের চেয়েও তীব্র নিখাদে বলিল—আমি আজ ভাত খাবো না যাও—কখ্খনো খাবো না—

তাহার মা বলিল—না খাবি না খাবি যা—ভাত খেয়ে একেবারে রাজা ক'রে দেবেন কিনা? এদিকে তো রান্না নামাতে তর সয় না—না খাবি যা, দেখবো খিদে পেলে কে খেতে দ্যায়।

ব্যস্। চক্ষের পলকে—সব আছে, আমি আছি তুমি আছ—সেই তাহার মা কাঁঠাল-বীচি ধুইতেছে—কিন্তু অপু কোথায়? সে যেন কর্পূরের মত উবিয়া গেল। কেবল ঠিক সেই সময়ে দুর্গা বাড়ী ঢুকিতে দরজার কাছে তাহাকে পাশ কাটাইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্মিতস্বরে ডাকিয়া বলিল—ও অপু, কোথায় যাচ্ছিস অমন ক'রে, কি হয়েচে, ও অপু শোন—

তাহার মা বলিল—জানিনে আমি, যত সব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড বাপু তোমাদের, হাড় মাস কালি হয়ে গেল—কি এক পথের মাঝখানে টাঙিয়ে রেখেচে, আসছি ছিঁড়ে গেল—তা এখন কি হবে? আমি কি ইচ্ছে ক'রে ছিঁড়েছি? তাই ছেলের রাগ—আমি ভাত খাবো না—না খাস্ যা, ভাত খেয়ে সব একেবারে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবে কিনা তোমরা!

মাতাপুত্রের এরূপ অভিমানের পালায় দুর্গাকেই মধ্যস্থ হইতেই হয়—সে অনেক ডাকাডাকির পরে বেলা দুইটার সময় ভাইকে খুঁজিয়া বাহির করিল। সে শুষ্কমুখে উদাস নয়নে ও পাড়ার পথে রায়েদের বাগানে পড়ন্ত আমগাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিল।

বৈকালে যদি কেহ অপুদের বাড়ী আসিয়া তাহাকে দেখিত তবে সে কখনই মনে করিতে পারিত না যে, এ সেই অপু—যে আজ সকালে মায়ের উপর অভিমান করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল। উঠানের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তার টাঙানো হইয়া গিয়াছে। অপু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল, কিছুই বাকী নাই, ঠিক যেন একেবারে সত্যিকার রেলরাস্তার তার।

সে সতুদের বাড়ী গিয়া বলিল—সতুদা, আমি টেলিগিরাপের তার টাঙিয়ে রেখেচি আমাদের বাড়ীর উঠোনে, চল রেল রেল খেলা করি—আসবে?

—তার কে টাঙিয়ে দিলে রে?

—আমি নিজে টাঙালাম। দিদি ছোটা এনে দিয়েছিল—

সতু বলিল—তুই খেল্‌গে যা, আমি এখন যেতে পারবো না—

অপু মনে মনে বুঝিল, বড় ছেলেদের ডাকিয়া দল বাঁধিয়া খেলার যোগাড় করা তাহার কর্ম নয়। কে তাহার কথা শুনিবে? তবুও আর একবার সে সতুর কাছে গেল। নিরাশ মুখে রোয়াকের কোণটা ধরিয়া নিরুৎসাহভাবে বলিল—চল না সতুদা, যাবে? তুমি আমি আর দিদি খেলবো এখন? পরে সে প্রলোভনজনক ভাবে বলিল—আমি টিকিটের জন্যে এতগুলো বাতাবী নেবুর পাতা তুলে এনে রেখেচি। সে হাত ফাঁক করিয়া পরিমাণ দেখাইল।—যাবে?

সতু আসিতে চাহিল না। অপু বাহিরে বড় মুখ-চোরা, সে আর কিছু না বলিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। দুঃখে তার চোখে প্রায় জল আসিতেছিল—এত করিয়া বলিতেও সতু-দা শুনিল না!

পরদিন সকালে সে ও তাহার দিদি দুজনে মিলিয়া ইট দিয়া একটা বড় দোকানঘর বাঁধিয়া জিনিস-পত্রের যোগাড়ে বাহির হইল। দুর্গা বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যের সন্ধান বেশী রাখে—দুজনে মিলিয়া নোনাপাতার পান, মেটে-আলু ফলের আলু, রাধালতা ফুলের মাছ, তেলাকুচার পটল, চিচ্চিড়ের বরবটি, মাটির ঢেলার সৈন্ধব লবণ—আরও কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দোকান সাজাইতে বড় বেলা করিয়া ফেলিল। অপু বলল—চিনি কিসের করবি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—বাঁশতলার পথে সেই ঢিবিটায় ভাল বালি আছে—মা চাল-

ভাজা ভাজবার জন্যে আনে। সেই বালি চল্ আনি গে—সাদা চক্ চক্ কচ্ছে—ঠিক একেবারে চিনি—

বাঁশবনে চিনি খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা পথের ধারে বনের মধ্যে ঢুকিল। খুব উঁচু একটা বন, চটকা গাছের আগডালে একটা বড লতার ঘন সবুজ আড়ালে, টুকটুকে রাঙা, বড বড় সুগোল কি ফল দুলিতেছে! অপু ও দুর্গা দুজনেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অনেক চেষ্টায় গোটা কয়েক ফল-সুদ্ধ নীচের দিকে লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া তলায় পড়িতেই মহা আনন্দে দুজনে একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া সেগুলিকে মাটি হইতে তুলিয়া লইল।

পাকা ফল মোটে তিনটি। প্রধানত বিপণি-সজ্জার উদ্দেশ্যেই তাহা দোকানে এরূপ ভাবে রক্ষিত হইল যে খরিদ্দার আসিলে প্রথমেই যেন নজরে পড়ে। পুরাদমে বেচাকেনা আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্গা নিজেই পান কিনিয়া প্রায় ফুরাইয়া ফেলিল। খেলা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় সদর দরজা দিয়া সতুকে ঢুকিতে দেখিয়া অপু মহা আনন্দে তাহাকে আগাইয়া আনিতে দৌড়াইয়া গেল—ও সতুদা, দ্যাখো না কি রকম দোকান হয়েচে, কেমন ফল দ্যাখো? আমি আর দিদি পেড়ে আন্‌লাম—কি ফল বলো দিকি? জান?

সতু বলিল—ও তো মাকাল ফল—আমাদের বাগানে ক-ত ছিল!···সতু আসাতে অপু যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সতু-দা তাহাদের বাড়ীতে বড় একটা আসে না—তা ছাড়া সতু-দা ছেলেদের দলের চাঁই। সে আসাতে খেলার ছেলেমানুষিটুকু যেন ঘুচিয়া গেল!

অনেকক্ষণ পুরা মরসুমে খেলা চলিবার পর দুর্গা বলিল—ভাই আমাকে দু'মণ চাল দাও, খুব সরু, কাল আমার পুতুলের বিয়ের পাকা দেখা, অনেক লোক খাবে—

সতু বলিল—আমাদের বুঝি নেমন্তন্ন, না?

দুর্গা মাথা দুলাইয়া বলিল—তা বৈকি? তোমরা তো হোলে কনেযাত্রী—কাল সকালে এসে নকুতো ক'রে নিয়ে যাবো—সতুদা রাণুকে বলবে আজ রাত্তিরে যেন একটু চন্দন বেটে রাখে? কাল সকালে নিয়ে আস্‌বো—

দুর্গার কথা ভাল করিয়া শেষ হয় নাই এমন সময় সতু দোকানে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত পণ্যের মধ্য হইতে কি-একটা তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দৌড় দিয়া দরজার দিকে ছুটিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও, ওরে দিদিরে—নিয়ে গেল রে—বলিয়া তাহার রিনরিনে তীব্র মিষ্ট গলায় চীৎকার করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল!

বিস্মিত দুর্গা ভাল করিয়া ব্যাপারটা কি বুঝিবার আগেই সতু ও অপু দৌড়াইয়া দরজার বাহির হইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে খেলাঘরের দিকে চোখ পড়িতেই দুর্গা দেখিল সেই পাকা মাকাল ফল তিনটিব একটিও নাই !…

দুর্গা একছুটে দরজার কাছে আসিয়া দেখিল সতু গাবতলার পথে আগে আগে ও অপু তাহা হইতে অল্প নিকটে পিছু পিছু ছুটিতেছে। সতুর বয়স অপুর চেয়ে তিন চারি বৎসরের বেশী, তাহা ছাড়া সে অপুব মত ওরকম ছিপ্‌ছিপে মেয়েলি গড়নের ছেলে নয়—বেশ জোরালো হাত-পা-ওয়ালা ও শক্ত—তাহাব সহিত ছুটিয়া অপুব পারিবার কথা নহে—তবুও যে ধরি-ধরি কবিয়া তুলিযাছে, তাহাব একমাত্র কাবণ এই যে, সতু ছুটিতেছে পরের দ্রব্য আত্মসাৎ কবিয়া এবং অপু ছুটিতেছে প্রাণেব দায়ে।

হঠাৎ দুর্গা দেখিল যে সতু ছুটিতে ছুটিতে পথে একবারটি যেন নীচু হইয়া পিছনে ফিবিয়া চাহিল—সঙ্গে সঙ্গে অপুও হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল—সতু ততক্ষণ ছুটিয়া দৃষ্টিব বাহিব হইয়া চালতেতলার পথে গিয়া পড়িয়াছে।

দুর্গা দৌড়াইয়া গিয়া অপুর কাছে পৌছিল। অপু একদম চোখ বুজিয়া একটু সামনের দিকে নীচু হইয়া ঝুঁকিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইতেছে। দুর্গা বলিল—কি হয়েচে রে অপু ?

অপু ভাল করিয়া চোখ না চাহিয়াই যন্ত্রণার সুবে দু'হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—সতুদা চোখে ধূলো ছুঁড়ে মেরেচে—দিদি—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না রে—

দুর্গা তাড়াতাড়ি অপুব হাত নামাইয়া বলিল—সর সর, দেখি—ওরকম ক'রে চোখ রগড়াস নে, দেখি—

অপু ততখনি দুহাত আবাব চোখে উঠাইয়া আকুল সুবে বলিল—উহুঁ ও দিদি—চোখের মধ্যে কেমন কচ্চে—আমার চোখ কানা হয়ে গিয়েছে দিদি—

—দেখি দেখি ওরকম ক'রে চোখে হাত দিস্‌নে—সর্—পরে সে কাপড়ে ফুঁ পাড়িয়া চোখে ফাপ দিতে লাগিল। কিছু পরে অপু একটু চোখ মেলিয়া চাহিতে লাগিল—দুর্গা তাহার চোখের পাতা তুলিয়া অনেকবার ফুঁ দিয়া বলিল —এখন বেশ দেখতে পাচ্ছিস ? আচ্ছা তুই বাড়ী যা…আমি ওদের বাড়ী গিয়ে ওর মাকে আর ঠাকুমাকে সব ব'লে দিয়ে আসচি—রাণুকেও বলবো—আচ্ছা দুষ্টু ছেলে তো। তুই যা আমি আসচি এখ্‌খুনি—

রাণুদের খিড়্‌কি দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া দুর্গা কিন্তু যাইতে সাহস করিল না। সেজঠাকুরুণকে সে ভয় করে। খানিকক্ষণ খিড়্‌কির কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া সে বাড়ী ফিরিল। সদর দরজা দিয়া ঢুকিয়া সে

দেখিল অপু দরজার বাম ধারের কবাটখানি সাম্‌নে ঠেলিয়া দিয়া তাহারই আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতেছে। সে ছিঁচকাদুনে ছেলে নয়, বড় কিছুতেই সে কখনো কাঁদে না—রাগ করে বটে, কিন্তু কাঁদে না। দুর্গা বুঝিল আজ তাহার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে, অতি সাধের ফলগুলি গেল···তাহা ছাড়া আবার চোখে ধূলা দিয়া এরূপ অপমান করিল। অপুর কান্না সে সহ্য করিতে পারে না—তাহার বুকের মধ্যে কেমন যেন করে।

সে গিয়া ভাইয়ের হাত ধরিল—সান্ত্বনার স্বরে বলিল—কাঁদিস্ নে অপু—আয় তোকে আমার সেই কড়িগুলো সব দিচ্চি—আয়—চোখে কি আর ব্যথা বাড়চে ?···দেখি কাপড়খানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেচিস্ ?

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুর-বেলা অপু কোথাও বাহির না হইয়া ঘরেই থাকে। অনেকদিনের জীর্ণ পুরাতন কোঠা-বাড়ীর পুরাতন ঘর। জিনিসপত্র, কাঠের সেকালের সিন্দুক, কটা রং-এর সেকালের বেতের প্যাঁটরা, কড়ির আল্‌না, জলচৌকিতে ঘর ভরানো। এমন সব বাক্স আছে যাহা অপু কখনো খুলিতে দেখে নাই, তাতে রক্ষিত এমন সব হাঁড়ি-কলসী আছে যাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ !

সব-সুদ্ধ মিলিয়া ঘরটিতে পুরানো জিনিষের কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ বাহির হয়—সেটা কিসের গন্ধ সে জানে না, কিন্তু সেটা যেন বহু অতীত কথা মনে আনিয়া দেয়। সে অতীত দিনে অপু ছিল না, কিন্তু এই কড়ির আলনা ছিল, ঐ ঠাকুরদাদার বেতের ঝাঁপিটা ছিল, ঐ বড় কাঠের সিন্দুকটা ছিল, ওই যে সোঁদালি গাছের মাথা বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে, ওই পোড়ো জঙ্গলে-ভরা জায়গাটাতে কাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, আরও কত নামের কত ছেলেমেয়ে একদিন এই ভিটাতে খেলিয়া বেড়াইত, কোথায় তারা ছায়া হইয়া মিলিয়া গিয়াছে, কতকাল আগে !

যখন একা ঘরে থাকে, মা ঘাটে যায়—তখন তাহার অত্যন্ত লোভ হয় ওই বাক্সটা, বেতের ঝাঁপিটা খুলিয়া দিনের আলোয় বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কি অদ্ভুত রহস্য উহাদের মধ্যে গুপ্ত আছে। ঘরের আড়ার সর্বোচ্চ তাকে কাঠের বড় বারকোসে যে তালপাতার পুঁথির স্তূপ ও খাতাপত্র আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল সেগুলি তাহার ঠাকুরদাদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের—তাহার বড় ইচ্ছা ওইগুলি যদি হাতের নাগালে ধরা দেয়, তবে সে একবার নীচে নামাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। এক একদিন বনের ধারে জানালাটায় বসিয়া দুপুর বেলা সে সেই ছেঁড়া কাশীদাসের মহাভারতখানা লইয়া পড়ে, সে নিজেই খুব ভাল পড়িতে শিখিয়াছে,

আগেকার মত আর মুখে শুনিতে হয় না, নিজেই জলের মত পড়িয়া যায় ও বুঝিতে পারে। পড়াশুনায় তাহার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, তাহার বাবা মাঝে মাঝে তাহাকে গাঙ্গুলি বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বৃদ্ধদের মজলিসে লইয়া যায়, রামায়ণ কি পাঁচালী পড়িতে দিয়া বলে, পড়ো তো বাবা, এঁদের একবার শুনিয়ে দাও তো? বৃদ্ধেরা খুব তারিফ করেন, দীনু চাটুয্যে বলেন—আর আমার নাতিটা, এই তোমার খোকারই বয়স হবে, দুখানা বর্ণপরিচয় ছিঁড়লে বাপু, শুনলে বিশ্বেস করবে না, এখনো ভাল ক'রে অক্ষর চিনলে না—বাপের ধারা পেয়ে বসে আছে—ঐ যে-কদিন আমি আছি রে বাপু, চক্ষু বুজলেই লাঙলের মুঠো ধর্‌তে হবে। পুত্রগর্বে হরিহরের বুক ভরিয়া যায়। মনে মনে ভাবে—ওকি তোমাদের মত হবে? কর্ল্লে তো চিরকাল সুদের কারবার!—হোলামই বা গরীব, হাজার হোক পণ্ডিতবংশ তো বটে, বাবা মিথ্যেই তালপাতা ভরিয়ে ফেলেননি পুঁথি লিখে, বংশে একটা ধারা দিয়ে গিয়েছেন, সেটা যাবে কোথায়?

তাদের ঘরের জানালার কয়েক হাত দূরেই বাড়ীর পাঁচিল এবং পাঁচিলের ওপাশ হইতেই পাচিলের গা ঘেঁষিয়া কি বিশাল আগাছার জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে! জানালায় বসিয়া শুধু চোখে পড়ে সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ভাঁটশেওড়া গাছের মাথাগুলো, এগাছে ওগাছে দোদুল্যমান কত রকমের লতা, প্রাচীন বাঁশঝাড়ের শীর্ষ বয়সের ভারে যেখানে সোঁদালি, বন-চালতা গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার নীচের কালো মাটির বুকে খঞ্জন পাখীর নাচ! বড় গাছপালার তলায় হলুদ, বনকচু, কচুওলের ঘন-সবুজ জঙ্গল ঠেলাঠেলি করিয়া সূর্যের আলোর দিকে মুখ ফিরাইতে প্রাণপণ করিতেছে, এই জীবনের যুদ্ধে যে গাছটা অপারগ হইয়া গর্বদৃপ্ত প্রতিবেশীর আওতায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে, পাতাগুলি বিবর্ণ মৃত্যুপাণ্ডুর, ডাঁটা গলিয়া আসিল—মরণাহত দৃষ্টির সম্মুখে শেষ-শরতের বন ভরা পরিপূর্ণ ঝলমলে রৌদ্র, পরগাছার ফুলের আকুল আর্দ্র সুগন্ধ মাখানো পৃথিবীটা তাহার সকল সৌন্দর্যরহস্য, বিপুলতা লইয়া ধীরে ধীরে আড়ালে মিলাইয়া চলিয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর ধার হইতে এ বনজঙ্গল একদিকে সেই কুঠির মাঠ, অপর দিকে নদীর ধার পর্যন্ত একটানা চলিয়াছে। অপুর কাছে এ বন অফুরন্ত ঠেকে, সে দিদির সঙ্গে কতদূর এ বনের মধ্যে তো বেড়াইয়াছে, বনের শেষ দেখিতে পায় নাই—শুধু এইরকম তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়া পথ, মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো থোলো থোলো বনচালতার ফুল চারিধারে। সুঁড়ি পথটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এগাছের ওগাছের তলা

দিয়া বন-কলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্‌দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে—শুধুই বন-ধুঁধুলের লতা কোথায় সেই ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরিষগাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পরগাছার ঝাড় নজরে আসে !

এই বন তার শ্যামলতার নবীন স্পর্শটুকু তার আর দিদির মনে বুলাইয়া দিয়াছিল ! জন্মিয়া অবধি এই বন তাহাদের সুপরিচিত, প্রতি পলের প্রতি মুহূর্তের নীরব আনন্দে তাহাদের পিপাসুহৃদয় কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রসে ভরিয়া তোলে। বর্ষাসতেজ, ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কাঁটার সুগন্ধ ফুলের হলুদ রংএর শীষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় মোটা ময়না কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগতি আসা-যাওয়া, পত্রপুষ্পফলের সে প্রাচুর্য, সবাকার অপেক্ষা যখন ঘনবনের প্রান্তবর্তী, ঝোপঝাড়ের সঙ্গীহীন বাঁকা ডালে বনের কোন অজানা পাখী বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের বিচিত্র, অপূর্ব, গভীর আনন্দরসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। সে যেন স্বপ্ন, যেন মায়া, চারিপাশ ঘিরিয়া পাখী গান গায়, ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া ফুল পড়ে, সূর্যাস্তের আলো আরও ঘন ছায়াময় হয়।

এই বনের মধ্যে কোথায় একটা মজা, পুরানো পুকুর আছে, তারই পাড়ে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে, আজকাল যেমন পঞ্চানন্দ ঠাকুর গ্রামের দেবতা, কোনো সময়ে ঐ মন্দিরের বিশালক্ষী দেবী সেইরকম ছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রামের মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠিত দেবতা, এক সময়ে কি বিষয়ে সফলমনস্কাম হইয়া তাঁহারা দেবীর মন্দিরে নরবলি দেন, তাহাতে রুষ্ট হইয়া দেবী স্বপ্নে জানাইয়া যান যে তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, আর কখনো ফিরিবেন না। অনেক কালের কথা, বিশালাক্ষীর পূজা হইতে দেখিয়াছে এরূপ কোনো লোক আর জীবিত নাই, মন্দির ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে, মন্দিরের সম্মুখের পুকুর মজিয়া ডোবায় পরিণত হইয়াছে, চারিধার বনে ছাইয়া ফেলিয়াছে, মজুমদার বংশেও বাতি দিতে আর কেহ নাই।

কেবল—সেও অনেকদিন আগে—গ্রামের স্বরূপ চক্রবর্তী ভিন-গাঁ হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিতেছিলেন—সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে নামিয়া আসিতে পথের ধারে দেখিলেন একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে দাঁড়াইয়া। স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পথে কেহ কোথাও নাই, এ সময় নিরালা বনের ধারে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া স্বরূপ চক্রবর্তী দস্তুরমত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু তিনি কোনো কথা কহিবার পূর্বেই মেয়েটি ঈষৎ গর্বমিশ্রিত অথচ মিষ্টিস্বরে বলিল—আমি এ গ্রামের বিশালাক্ষী

দেবী। গ্রামে অল্পদিনে ওলাউঠার মড়ক আরম্ভ হবে—ব'লে দিও চতুর্দশীর রাত্রে পঞ্চাননতলায় একশ' আটটা কুমড়ো বলি দিয়ে যেন কালীপূজা করে। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্তম্ভিত স্বরূপ চক্রবর্তীর চোখের সামনে মেয়েটি চারিধারের শীত-সন্ধ্যার কুয়াশায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। এই ঘটনার দিন-কয়েক পবে সত্যই সেবার গ্রামে ভয়ানক মড়ক দেখা দিয়াছিল।

এ সব গল্প কতবার শুনিয়াছে। জানালার ধারে দাঁড়াইলেই বিশালাক্ষী ঠাকুরের কথা তাহার মনে ওঠে। দেবী বিশালাক্ষীকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় না? হঠাৎ সে বনের পথে হয়ত গুলঞ্চের লতা পাড়িতেছে—সেই সময়—

খুব সুন্দর দেখিতে, রাঙা-পাড় শাড়ী পরনে, হাতে গলায় মা-দুর্গার মত হার বালা।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড ভাল ছেলে, কি বর চাও?

সে বিছানায় গিয়া শোয়। এক একবার ঝিরঝিরে হাওয়ায় কত কি লতাপাতাব তিক্তমধুর গন্ধ ভাসিয়া আসে, ঠিক দুপুব বেলা, অনেক দূরের কোনো গাছের মাথার উপর হইতে গাঙ-চিল টানিয়া টানিয়া ডাকে, যেন এই ছোট্ট গ্রামখানির অতীত ও বর্তমান সমস্ত ছোটো-খাটো সুখ-দুঃখ শান্তি-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে, শরৎ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রভরা, নীল-নির্জন আকাশপথে, এক উদাস, গৃহ-বিবাগী পথিক-দেবতার সুকণ্ঠের অবদান দূর হইতে দূরে মিলাইয়া চলিয়াছে।

কখন সে ঘুমাইয়া পড়ে বুঝিতে পারে না, ঘুমাইয়া উঠিয়া দেখে বেলা একেবাবে নাই। জানালার বাহিবে সারা বনটায় ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, বাঁশঝাড়ের আগায় রাঙা রোদ।

প্রতিদিন এই সময়ে—ঠিক এই ছায়া-ভরা বৈকালটিতে নির্জন বনের দিকে চাহিয়া তাহার অতি অদ্ভুত কথা সব মনে হয়। অপূর্ব খুশিতে মন ভরিয়া ওঠে, মনে হয় এ রকম লতাপাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূতি আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন্ অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না—একটা বড় কোনো আনন্দ ইহাদের শেষে অপেক্ষা করিয়া আছে যেন!

এই অপরাহ্ণগুলির সঙ্গে, আজন্মসাথী, সুপরিচিত, এই আনন্দ ভরা বহুরূপী

বনটার সঙ্গে কত রহস্যময়, স্বপ্ন-দেশের বার্তা যে জড়ানো আছে। বাঁশঝাড়ের উপকার ছায়া-ভরা আকাশটার দিকে চাহিয়া সে দেখিতে পায়, এক তরুণ বীরের উদারতার সুযোগ পাইয়া কে প্রার্থী একজন তাহার অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল মাগিয়া লইতে হাত পাতিয়াছে পিটুলি গোলা পান করিয়া কোথাকার এক ক্ষুদ্র দরিদ্র বালক খেলুড়েদের কাছে 'দুধ খেয়েছি', 'দুধ খেয়েছি' বলিয়া উল্লাসে নৃত্য করে,—ঐ যে পোড়ো ভিটার বেলতলাটা—ওইখানেই তো শরশয্যা-শায়িত প্রবীণ বীর ভীষ্মদেবের মরণাহত ওষ্ঠে তীক্ষ্ণবাণে পৃথিবী ফুঁড়িয়া অর্জুন ভোগবতীধারা সিঞ্চন করিয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে সরযূতটের কুসুমিত কাননে মৃগয়া করিতে গিয়া রাজা দশরথ মৃগভ্রমে যে জল-আহরণরত দরিদ্র বালককে বধ করেন—সে ঘটিয়াছিল ওই রাণুদিদিদের বাগানের বড় জাম-গাছটার তলায় যে ডোবা—তাহারই ধারে।

তাহাদের বাড়ী একখানা বই আছে, পাতাগুলা সব হলদে, মলাটটার খানিকটা নাই, নাম লেখা আছে, 'বীরাঙ্গনা কাব্য', কিন্তু লেখকের নাম জানে না, গোড়ার দিকের পাতাগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বইখানা বড় ভাল লাগে—তাহাতে সে পড়িয়াছে :—

অদূরে দেখিনু হ্রদ, সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্নউরু! দেখি উচ্চে উঠিনু কাঁদিয়া
এ কি কুস্বপন নাথ দেখাইলা মোরে!

কুলুইচণ্ডী ব্রতের দিন মায়ের সঙ্গে গ্রামের উত্তর মাঠে যে পুরানো, মজা পুকুরের ধারে সে বনভোজন করিতে যায়—কেউ জানে না চারিধারে বনে ঘেরা সেই ছোট্ট পুকুরটাই মহাভারতের সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ। ঐ নির্জন মাঠের পুকুরটার মধ্যে সে ভগ্নউরু, অবমানিত বীর থাকে একা একা, কেউ দেখে না, কেউ খোঁজ করে না। উত্তর মাঠের কলা-বেগুনের ক্ষেত হইতে কৃষাণেরা ফিরিয়া আসে, জনমানুষের চিহ্ন থাকে না কোনো দিকে—সোনাডাঙা মাঠের পারের অনাবিষ্কৃত, বসতিশূন্য অজানা দেশে চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকার ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, তখন হাজার হাজার বছরের পুরাতন মানব-বেদনা কখনো বা দরিদ্র পিতার প্রবঞ্চনামুগ্ধ অবোধ বালকের উল্লাসে কখনো বা এক ভাগ্যহত, নিঃসঙ্গ অসহায় রাজপুত্রের ছবিতে তাহার প্রবর্ধমান, উৎসুক মনের সহানুভূতিতে জাগ্রত ও সার্থক হয়। ঐ অজ্ঞাতনামা লেখকের বইখানা পড়িতে পড়িতে কতদিন যে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিয়াছে!

তাহার বাবা বাড়ী নাই। বাড়ী থাকিলে তাহাকে এক মনে ঘরে বসিয়া

দপ্তর খুলিয়া পড়িতে হয়। একেবারে বেলা শেষ হইয়া যায় তবুও ছুটি হয় না। তাহার মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে। আর কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্থ করিবে? আজ আর বুঝি সে খেলা করিবে না। বেলা বুঝি আর আছে? বাবার উপর ভারি রাগ হয়, অভিমান হয়।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটি হইয়া যায়। বই পত্তর কোনরকমে ঝুপ করিয়া এক জায়গায় ফেলিয়া রাখিয়া ছায়াভরা উঠানে গিয়া খুশিতে সে নাচিতে থাকে।

অপূর্ব অদ্ভুত বৈকালটা···নিবিড় ছায়াভরা গাছপালার ধারে খেলাঘর··· গুলঞ্চ-লতার তার টাঙানো···খেজুর ডালের ঝাঁপ···বনের দিক হইতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বাহির হয়···রাঙা রোদটুকু জেঠামহাশয়দের পোড়ো ভিটার বাতাবীলেবুর গাছের মাথায় চিক্ চিক্ করে, চক্‌চকে বাদামী রংএর ডানাওয়ালা তেড়ো পাখী বনকলমী ঝোপে উড়িয়া আসিয়া বসে···তাজা মাটির গন্ধ···ছেলেমানুষের জগৎ ভরপুর আনন্দে উছলিয়া ওঠে, কাহাকে সে কি করিয়া বুঝাইবে সে কি আনন্দ!

সন্ধ্যার পর সর্বজয়া ভাত চড়াইয়াছিল! অপু দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছে। খুব অন্ধকার, একটানা ঝিঁঝিঁপোকা ডাকিতেছে।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—পূজোর আর কদিন আছে, মা?

দুর্গা বঁটি পাতিয়া তরকারী কাটিতেছিল। বলিল,—আর বাইশ দিন আছে, না মা?

সে হিসাব ঠিক করিয়াছে। তাহার বাবা বাড়ী আসিবে, অপুর, মায়ের, তাহার জন্য পুতুল, কাপড়, আল্‌তা।

আজকাল সে বড় হইয়াছে বলিয়া তাহার মা অন্য পাড়ায় গিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে দেয় না। লুচি খাইতে কেমন তাহা সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে। ফুট্‌ফুটে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে বাঁশবনের আলোছায়ার জাল-বুনানি পথ বাহিয়া সে আগে আগে পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া লক্ষ্মীপূজার খই-মুড়ি ভাজা আঁচল ভরিয়া লইয়া আসিত। বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁক বাজে, পথে লুচি-ভাজার গন্ধ বাহির হয়, হয়তো পাড়ার কেউ পূজার শীতলের নৈবেদ্য একখানা তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়। সেও অনেক খই-মুড়ি আনিত, তাহার মা দুইদিন ধরিয়া তাহাদের জলপান খাইতে দিত, নিজেও খাইত। সেবার সেজ ঠাকরুণ বলিয়াছিল—ভদ্দর লোকের মেয়ে আবার চাষা লোকের মত বাড়ী বাড়ী ঘুরে খই-মুড়ি নিয়ে বেড়াবে কি! ওসব দেখ্‌তে খারাপ···ওরকম আর পাঠিও না বৌমা—সেই হইতে সে আর যায় না।

দুর্গা বলিল—তাস খেলবে?

—তা যা ও ঘর থেকে তাসটা নিয়ে আয় একটু খেলি—

দুর্গা বিপন্নমুখে অপুর দিকে চাহিল। অপু হাসিয়া বলিল—চল্ আমি দাঁড়াচ্চি—

তাহার মা বলিল—আহা হা, মেয়ের ভয় দেখে আর বাঁচি নে, সারাদিন বলে হেঁট্-মাটি ওপর ক'রে বেড়াবার সময় ভয় থাকে না, আর রাত্রিতে এঘর থেকে ওঘর যেতে একেবারে সব আড়ষ্ট!…

শিষ্যবাড়ী হইতে অপুর আনা সেই তাসজোড়াটা। তাস খেলায় তিন জনেরই কৃতিত্ব সমান। অপু এখনও সব রং চেনে না—মাঝে মাঝে হাতের তাস বিপক্ষদলের খেলোয়াড় মাকে দেখাইয়া বলে, এটা কি রং, রুইতন? দ্যাখো না মা—

দুর্গার মন আজ খুব খুশি আছে। রাত্রিতে রান্না প্রায়ই হয় না, ওবেলার বাসি ভাত তরকারি থাকে। আজ ভাত চড়িয়াছে, তরকারী রান্না হইবে, ইহাতে তাহার মহা আনন্দ। আজ যেন একটা উৎসবের দিন। অপু বলে—তাস খেলতে খেলতে সেই গল্পটা বলো না মা, শ্যামলঙ্কার গল্পটা?

হঠাৎ সে মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে। মায়ের গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবদারের সুরে বলে—সেই ছড়াটা বলো না মা, সেই—শ্যামলঙ্কা বাটনা বাটে মাটিতে লুটায় কেশ।

দুর্গা বলে—খেলার সময় ছড়া বললে খেলা কি ক'রে হবে অপু? ওঠ্—

সর্বজয়া বলিল—দুগ্‌গা, পাতালকোঁড় আজ কোথায় পেলি রে?

—সেই যে গোঁসাইদের বড় বাগানটা আছে? সেই রাঙী গাই খুঁজতে একবার তুই আর আমি, অপু? সেখানে অনেক ফুটেছিল, কেউ টের পায়নি মা, খুব বন কি না? তা হোলে লোকে তুলে নিয়ে যেতো—

অপু বলিল, সেখানে গিইছিলি? উঃ, সে যে বড্ড বন রে দিদি!

সর্বজয়া সস্নেহে বার বার ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সেদিনকার সেই অপু—আয় চাঁদ আয় চাঁদ খোকনের কপালে টী-ই-ই-ই দিয়ে যা—বলিলে বারবার কলের পুতুলের মত চাঁদের মত কপালখানি অঙ্গুলিবদ্ধ হস্তের দিকে ঝুঁকাইয়া দিত, সে কি না আজ তাস খেলিতে বসিয়াছে! তাহার কাছে দৃশ্যটা বড় অভিনব ঠেকে! অপু খেলিতে না পারিলে বা আশা করিয়া পিট্ জিততে না পারিলে কিংবা অপুর হাতে খারাপ তাসগুলো গিয়া নিজের হাতে ভাল তাস আসিলে, বিপক্ষদলের খেলোয়াড় হইয়াও তাহার মনে কষ্ট হইতেছিল।

দুর্গা বলিল—আজ কি হয়েছে জান মা—

অপু বলিল—যাঃ তা হ'লে তোর সঙ্গে আড়ি কর্‌বো, ব'লে দ্যাখ—

—করগে যা আড়ি—শোনো মা, মা ও পোস্তদানার নাম জানে না, আজ রাজীদের বাড়ী পোস্তদানা রোদ্দুরে দিয়েচে, ও বল্লে, কি রাজীদি? রাজী বল্লে, যষ্টিমধু, খেয়ে দ্যাখ—ও খেয়ে এল মা সেখানে দাঁড়িয়ে, বুঝ্‌তেও পাল্লে না যে পোস্ত—এমন বোকা—না মা?

অপু মুখে বলিল বটে কিন্তু দিদির সহিত সে আড়ি করিবে না। সেই যে যেদিন তাহার পাকা মাকাল ফলগুলো সতুদা লইয়া পলাইয়াছিল, সেদিন তাহাব দিদি সাবাদিন বন বাগান খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় কোথা হইতে আঁচলে বাঁধিয়া এক রাশ মাকাল ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে খুলিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিল—কেমন, হ'লো এখন? বড্ড যে কাঁদ্‌ছিলি সকাল বেলা? সে সন্ধ্যায় কিসে যে বেশী আনন্দ পাইয়াছিল—মাকাল ফলগুলা হইতে কি, দিদির মুখের, বিশেষ করিযা তাহার ডাগর চোখেব মমতাভরা স্নিগ্ধ হাসি হইতে—তাহা সে জানে না।

—ছক্কার খেলা, অপু, বুঝেসুজে খেলিস—?—দুর্গা মহাখুশির সহিত তাস ছড়াইয়া সাজাইতে লাগিল···

—কি ফুলেব গন্ধ বেরুচ্চে, না দিদি?

তাহাদেব মা বলিল, তাহাদের জেঠামশায়দেব ভিটার পিছনে ছাতিম গাছ আছে সেই ফুলেব গন্ধ। অপু ও দুর্গা দুজনেই আগ্রহেব স্বরে জিজ্ঞাসা কবিল ·হ্যাঁ মা, ওই ছাতিম তলায় একবাব বাঘ এসেছিল বলেছিলে না? কিন্তু তাহাব মা তাড়াতাড়ি তাস ফেলিয়া উঠিয়া বলিল—ঐ যাঃ ভাত পুড়ে গেল, ধবাগন্ধ বেরিয়েচে—ভাতটা নামিয়ে, দাঁড়া বলচি—

খাইতে বসিয়া দুর্গা বলিল—পাতালকোঁড়ের তরকারীটা কি সুন্দর খেতে হয়েছে মা। তাহার মুখ স্বর্গীয় তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুও বলিল—বাঃ! খেতে ঠিক মাংসের মত, না দিদি? পাতালকোঁড় এক জায়গায় কত ফুটে আছে মা, আমি ভাবি ব্যাঙের ছাতা, তাই তুলিনে—।

উভয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাক্যে সর্বজয়ার বুক গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তবুও কি আর উপযুক্ত উপকরণ সে পাইয়াছে? লোকের বাড়ীতে ভোজে রাঁধিতে ডাকে সেজ ঠাকরুণকে, ডাকুক না দেখি একবার তাহাকে, রান্না কাহাকে বলে সেজঠাকরুণকে সে—হুঁ। সর্বজয়া বলিল—অপুর হাতে জল ঢেলে দে দুগ্‌গা, ওকি ছেলের কাণ্ড! ঐ রাস্তার মাঝখানে মুখ ধোয়? রোজই রাত্রে তুই ওই পথের ওপর—

কিন্তু অপু আর এক পাও নড়িতে চাহে না, সম্মুখে সেই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক,

অন্ধকার বাঁশবন, ঝোপ-জঙ্গলের অন্ধকার ঝিঙের বীচির মত কালো। পোড়ো ভিটেবাড়ী···আরও অজানা কত কি বিভীষিকা! সে বুঝিতে পারে না যেখানে প্রাণ লইয়া টানাটানি, সেখানে পথের উপরে আঁচানোটাই কি এত বেশী!

তাহার পর সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচ-লাগা শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু ভরিয়া যায়। মধ্য রাত্রে বেণুবনশীর্ষে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না উঠিয়া শিশিরসিক্ত গাছপালায়, ডালে-পাতায় চিক্‌চিক্ করে। আলো আঁধারের অপরূপ মায়ায় বনপ্রান্ত ঘুমন্ত পরীর দেশের মত রহস্য-ভরা। শন্ শন্ করিয়া হঠাৎ হয়তো এক ঝলক হাওয়া সোঁদালির ডাল দুলাইয়া, তেলাকুচো ঝোপের মাথা কাঁপাইয়া বহিয়া যায়।

এক একদিন এই সময় অপুর ঘুম ভাঙিয়া যাইত।

সেই দেবী যেন আসিয়াছেন, সেই গ্রামের বিস্মৃতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী।

পুলিনশালিনী ইছামতীর ডালিমের রোঁয়ার মত স্বচ্ছ জলের ধারে, কুচা শেওলা ভরা ঠাণ্ডা কাদায় কতদিন আগে যাহাদের চরণ-চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তীরের প্রাচীন সপ্তপর্ণ টাও হয়তো যাদের দেখে নাই, পুরানো কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে তারাই এক সময়ে ফুল-ফল-নৈবেদ্যে পূজা দিত, আজকালকার লোকেরা কে তাঁহাকে জানে!

তিনি কিন্তু এ গ্রামকে এখনও ভোলেন নাই।

গ্রাম নিশুতি হইয়া গেলে অনেক রাত্রে, তিনি বনে বনে ফুল ফুটাইয়া বেড়ান, বিহঙ্গশিশুদের দেখাশুনা করেন, জ্যোৎস্না-রাত্রের শেষ প্রহরে ছোট্ট ছোট্ট মৌমাছিদের চাকগুলি বুনো-ভাঁওরা, নাটকান, পুঁয়ো ফুলের মিষ্ট মধুতে ভরাইয়া দেন।

তিনি জানেন কোন্ ঝোপের কোণে বাসক ফুলের মাথা লুকাইয়া আছে, নিভৃত বনের মধ্যে ছাতিম ফুলের দল কোথায় গাছের ছায়ায় শুইয়া, ইছামতীর কোন্ বাঁকে সবুজ শেওলার ফাঁকে ফাঁকে নীল-পাপ্‌ড়ি কলমীফুলের দল ভিড় পাকাইয়া তুলিতেছে, কাঁটা গাছের ডাল-পালার মধ্যে ছোট্ট খড়ের বাসায় টুনটুনি পাখীর ছেলেমেয়েরা কোথায় ঘুম ভাঙিয়া উঠিল।

তাঁর রূপের স্নিগ্ধ আলোয় বন যেন ভরিয়া গিয়াছে। নীরবতায়, জ্যোৎস্নায়, সুগন্ধে, অস্পষ্ট আলো-আঁধারের মায়ায় রাত্রির অপরূপ শ্রী।

দিনের আলো ফুটিবার আগেই কিন্তু বনলক্ষ্মী কোথায় মিলাইয়া যান, স্বরূপ চক্রবর্তীর পর তাঁহাকে কেহ কোনোদিন দেখে নাই।

গ্রামের অন্নদা রায় মহাশয় সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

গ্রামে জরীপ আসাতে উত্তর মাঠে তাঁবু পড়িয়াছে। জরীপের কর্মচারী মাঠের মধ্যে নদীর ধারে আপিস্ খুলিয়াছেন, ছোটখাটো আমলাও সঙ্গে আসিয়াছে বিস্তর। গ্রামের সকল ভদ্রলোকেই কিছু জমিজমার মালিক, পিতৃপুরুষের অর্জিত এই সব সম্পত্তির নিরাপদ কূলে জীবনতরণীর লগি কসিয়া পুঁতিয়া জড়-পদার্থের ন্যায় উদ্যমহীন, গতিহীন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় দিনগুলি একরূপ বেশই কাটিতেছিল, কিন্তু এবার সকলেই একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাম হয়ত শ্যামের জমি নির্বিবাদে নিজের বলিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে, যদু দশ বিঘাব খাজনায় বারো বিঘা নিরুপদ্রপে দখল করিতেছে, এতদিন যাহা পূর্ণ শান্তিতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, এইবার সে সকলের মধ্যে গোলমাল পৌছিল। বিপদ একরূপ সর্বজনীন হইলেও অন্নদা রায়েব বিপদ একটু অন্য ধরণের বা একটু বেশী গুরুতর। তাঁহার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা বহুদিন যাবৎ পশ্চিম-প্রবাসী। এতদিন তিনি উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতিব আম-কাঁঠালের বাগান ও জমি নির্বিঘ্নে ভোগ করিতেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ভরসা ছিল জরীপের সময় পারিয়া উঠিলে সবই, অন্ততঃ পক্ষে কতকাংশ নিজের বলিয়া লিখাইয়া লইবেন কিন্তু কি জানি গ্রামেব কে উক্ত প্রবাসী জ্ঞাতিকে কি পত্র লিখিয়াছেন—ফলে অদ্য দিন-দশেক হইল জাতিভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্রটি জরীপের সময় বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করিতে আসিয়াছে।

মুখের গ্রাস তো গেলই, তাহা ছাড়া বিপদ আরও আছে, ঐ আত্মীয়ের অংশের ঘবগুলিই বাড়ীর মধ্যে ভাল, রায় মহাশয় গত ত্রিশ বৎসর সেগুলি নিজে দখল করিয়া আসিতেছেন, সেগুলি ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে—জ্ঞাতিপুত্রটি শৌখীন ধরণের কলেজের ছেলে, একখানিতে শোয়, একখানিতে পড়াশুনা করে—উপরের ঘরখানি হইতে লোহার সিন্দুক, বন্ধকী মাল, কাগজপত্রাদি সরাইয়া ফেলিতে হইয়াছে। নীচের যে ঘরে পালিত-পাড়া হইতে সস্তাদরে কেনা করিবরগা রক্ষিত ছিল, সে ঘরও শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে হইবে।

বৈকালবেলা। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কয়েকটি লোক আসিয়াছেন—এই সময়েই পাশা খেলার মজলিস্ বসে। কিন্তু অদ্য এখনও কাজ মেটে নাই। অন্নদা রায় একে একে সমাগত খাতক-পত্র বিদায় করিতেছিলেন।

উঠানের রোয়াকের ঠিক নীচেই একটি অল্পবয়সী কৃষকবধূ একটা ছোট ছেলে সঙ্গে লইয়া অনেকক্ষণ হইতে ঘোমটা দিয়া বসিয়াছিল, সে এইবার তাহার পালা আসিয়াছে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রায় মহাশয় মাথা সাম্‌নে একটু নীচু করিয়া চশমার উপর হইতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—কে? তোর আবার কি?

কৃষক-বধূটি আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল—মুই কিছু টাকার যোগাড় করিচি অনেক কষ্টে, মোর টাকাডা নেন—আর গোলার চাবিটা খুলে ভান, বড্ড কষ্ট যাচ্চে মনিব ঠাকুর, সে আর কি বল্‌বো—

অন্নদা রায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, বলিলেন—হরি, নেও তো ওর টাকাটা গুণে? খাতাখানায় দেখো তারিখটা, সুদটা আর একবার হিসেব ক'রে দেখো—

কৃষক-বধূ আঁচলের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিয়া হরিহরের সম্মুখে রোয়াকের ধারে রাখিয়া দিল। হরিহর গুনিয়া বলিল—পাঁচ টাকা!

রায় মহাশয় বলিলেন—আচ্ছা—জমা ক'রে নাও—তারপর? আর টাকা কৈ?

—ওই এখন ভান, তারপর দোব—মুই গতর খাটিয়ে শোধ ক'রে তোলবো,—এখন এই নিয়ে মোর গোলার চাবিডা খুলে ভান, মোর মাতোরে তুটো খেইয়ে তো আগে বাঁচাই, তার পর ঘরদোর ফুটো হয় গিয়েছে, সে না হয়—।

এমন নিরুদ্বেগে কথা বলিতেছিল যেন গোলার চাবি তাহার করতলগত হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।

রায় মহাশয় কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—ওঃ, ভারি যে দেখচি মাগীর আব্দার, চল্লিশ টাকার কাছাকাছি সুদে আসলে বাকি—পাঁচ টাকা এনেচি, নিয়ে গোলা খুলে ভান! ছোট লোকের কাণ্ডই আলাদা—যা এখন অসময়ে দিক্ করিস্ নে—

কৃষক-বধূ চণ্ডীমণ্ডপের অন্য কাহারও অপরিচিতা নহে, দীনু ভট্টাচার্য্যি চোখে ভাল দেখিতেন না, বলিলেন—কে ও অন্নদা?

—ওই ওপাড়ার তম্‌রেজের বৌ—দিন চারেক হোল তম্‌রেজ মারা গিয়েচে না? সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকী, তাই মরবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবি দিয়ে রেখেচি, এখন গোলা খুলিয়ে ভান—হেন করুন—তেন করুন—

পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেলেও তম্‌রেজের বৌ অত চম্‌কিয়া উঠিত না। সে ব্যাপার এখন অনেকটা বুঝিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—

—ওকথা বলবেন মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা নিমফল ছেল, ওবছর গড়িয়ে দিইছিল। তাই ভোঁদা সেকরার দোকানে বিক্রী করে পাঁচটা টাকা

দেলে। ছেলেমানুষের জিনিস ব্যাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কি করি এখন দুটো খেইয়ে বাঁচি, ভাবলাম এর পর দিন দেন মালিক তো মোর বাছারে মুই আবার নিমফল গড়িয়ে দেবো! তা দেন মনিব ঠাকুর চাবিডা দিয়ে—

—যা যা—এখন যা—এ সব টাকাকড়ির কাণ্ড কি নাকে কাঁদলেই মেটে? তা মেটে না। সে তুই কি বুঝবি, থাকতো তোর সোয়ামী তো বুঝতো, যা এখন দিক্ করিস্‌নি—ওই পাচ টাকা তোর নামে জমা রৈল—বাকী টাকা নিয়ে আয় তারপর দেখা যাবে—

অন্নদা রায় চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে পুরিতে পুরিতে উঠিয়া পড়িলেন ও বাড়ীর ভিতরে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তমরেজের বৌ আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল—কনে যান্ ও মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা উপায় ক'রে যান, ও রে মুই খাওয়াবো কি, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই—মোর গোলা না খুলে দ্যান, মোব টাকা কড়া মোরে ফেরৎ দ্যান—

রায় মহাশয় মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্দে বেলা মাগী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে—এক মুঠো টাকা জলে যাচ্ছে তার খোঁজ নেই, গোলা খুলে দাও, টাকা ফেরৎ দাও—গোলায় আছে কি তোর? জোর শলি-চারেক ধান, তাতে টাকা হবে? ও পাঁচ টাকাও উসুল হ'য়ে রৈল, আমার টাকা দেখবো না! ওঁর ছেলে কি খাবে ব'লে দ্যাও—ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি? যা, পারিস তো নালিশ ক'রে খোলাগে যা—

রায় মহাশয় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে দীনু ভট্‌চাযি্য বলিলেন—হ্যাঁগা বৌ, তম্‌রেজ কদ্দিন হ'লো—কৈ তা তো—

—বুধবারের দিন বাবা ঠাকুর, হাট থে ভাঙন মাছ আনলে, পেঁয়াজ দিয়ে রাঁধলাম—ভাত দেলাম—সহজ মানুষ ভাত খেলে দিব্যি—খেয়ে বললে মোর শীত করচে, কাঁথা চাপা দিয়ে দ্যাও, দেলাম—ওমা পইতে তারা উঠ্‌তি না উঠ্‌তি মানুষ দেখি আর সাড়াশব্দ দেয় না, দুপর হতি না হতি মোরে পথে বসিয়ে—মোর খোকারে পথে বসিয়ে—চোখের জলে তাহার গলা আটকাইয়া গেল। মিনতির স্বরে বলিল—আপনারা এটু বলেন—ব'লে গোলার চাবিডা দিইয়ে দ্যান, সংসারের বড্ড কষ্ট হয়েচে—কর্জ কি মুই বাকী রাখবো—যে ক'রে হোক্—

এই সময়ে নবাগত জ্ঞাতিপুত্রটি আসিয়া পড়াতে কথাবার্তা বন্ধ হইল। দীনু বলিলেন—এস হে নীরেন বাবাজী, মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে বুঝি? এই তোমার বাপ ঠাকুরদার দেশ, বুঝলে হে, কি রকম দেখলে বল?

নীরেন একটু হাসিল। তাহার বয়স একুশ বাইশের বেশী নয়—বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, সুপুরুষ। কলিকাতার কলেজে আইন পড়ে, অত্যন্ত মৌনী প্রকৃতির

মানুষ—দেখিবার জন্য পিতা কর্তৃক প্রেরিত হইলেও কাজকর্ম সে কিছুই দেখে না, বোঝেও না, দিন রাত নভেল পড়িয়া ও বন্দুক ছুঁড়িয়া কাটায়। সঙ্গে একটি বন্দুক আনিয়াছে, শিকারের ঝোঁক খুব।

নীরেন উপরে নিজের ঘরে ঢুকিয়া গিয়া দেখিল, গোকুলের স্ত্রী ঘরের মেঝেতে বসিয়া পড়িয়া মেঝে হইতে কি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছে। দোরের কাছে যাইতেই তাহার নজর পড়িল, তাহার দামী বিলাতী আলোটা মেঝেতে বসানো। উহার কাঁচের ডুম্‌টা ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, সারা মেঝেতে কাঁচ ছড়ানো। দোরের কাছে জুতার শব্দ পাইয়া গোকুলের স্ত্রী চম্‌কাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল, সে আঁচল পাতিয়া মেঝে হইতে কাঁচের টুকরাগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিতেছিল,—ভাবে মনে হয় প্রতিদিনের মত ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আলোটি জ্বালিতে গিয়াছিল, কি করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, এবং আলোর মালিক আসিবার পূর্বেই অপরাধের চিহ্নগুলি নিজেই তাড়াতাড়ি সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিল হঠাৎ বামাল ধরা পড়িয়া অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল। ক্ষতিকারিণীর লজ্জার ভারটা লঘু করিয়া দিবার জন্যই নীরেন হাসিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে বৌদি, আলোটা ভেঙে ব'সে আছেন বুঝি? এই দেখুন ধরা প'ড়ে গেলেন, জানেন তো আইন পড়ি। আচ্ছা এখন একটু চা ক'রে নিয়ে আসুন তো বৌদি চট্ করে, দেখি কেমন কাজের লোক। দাঁড়ান আলোটা জেলে নিই, ভাগ্যিস্ বাক্সে আর একটা ডুম্ আছে।

গোকুলের স্ত্রী সলজ্জ স্বরে বলিল, দেশলাই আনবো ঠাকুরপো!

নীরেন কৌতুকের স্বরে বলিল—দেশলাই আনেন নি তবে আলো পেড়ে কি করছিলেন শুনি?

বধূ এবার হাসিয়া ফেলিল, নিম্নস্বরে বলিল—ঝুল প'ড়ে রয়েচে, ভাবলুম একটু মুছে দিই, তা যেমন কাঁচটা নামাতে গেলাম কি জানি ও সব ইংরেজি কলের আলো—কথা শেষ না করিয়াই সে পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া নীচে পলাইল।

নীরেন দশ বারো দিন আসিয়াছে বটে, সম্পর্কে বৌদিদি হইলেও গোকুলের স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বিশেষ আলাপ হয় নাই। কাঁচ ভাঙার সন্ধ্যা হইতে কিন্তু উভয়ের মধ্যে নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচটা কাটিয়া গেল। নীরেন অবস্থাপন্ন পিতার পুত্র, তাহার উপর বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই প্রথম আসা, নিঃসঙ্গ আনন্দহীন প্রবাসে দিনগুলি কাটিতে চাহিতেছিল না। সমবয়সী বৌদির সহিত পরিচয়ের পথটা সহজ হইয়া যাওয়ার পর হইতে সকাল-সন্ধ্যায় চা-পানের সময়টি, সহজ আদান-প্রদানের মাধুর্যে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল!···

দুপুরে সেদিন দুর্গা বেড়াইতে আসিল। রান্নাঘরের দুয়ারে উঁকি মারিয়া

বলিল—কি রাঁধচো ও খুড়ীমা? বধূ বলিল—আয় মা আয়, একটু কাজ করে দিবি? একা আর পেরে উঠচিনে।...দুর্গা মাঝে মাঝে যখনই আসে, খুড়ীমার কার্যে সাহায্য করে। সে মাছ কুটিতে কুটিতে বলিল—হ্যাঁ খুড়ীমা, এ কাঁকড়া কোথায় পেলে? এ কাঁকড়া তো খায় না।

—কেন খাবে না রে, দূর। বিধু জেলেনী ব'লে গেল এ কাঁকড়া সবাই খায়।

—হ্যাঁ খুড়ীমা, ওমা সেকি, একি তুমি কিন্‌লে?

—কিন্‌লামই তো, ওই অতগুলো পাঁচ-পয়সায় দিয়েচে বিধু।

দুর্গা কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা! এ কাঁকড়া আবার পয়সা দিয়ে কেনেই বা কে, খায়ই বা কে? ভালমানুষ পেয়ে বিধু ঠকিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সরলা খুড়ীমাটির উপর তাহার স্নেহ নিবিড়তর হইয়া উঠিল।

সেদিন নাকি গোকুল-কাকা খুড়ীমার মাথায় খড়মের বাড়ী মারিয়াছিল—স্বর্ণ গোয়ালিনী তাহাদের বাড়ী গল্প করে। সে-ও সেদিন নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। খুড়ীমা স্নান করিতে আসিয়া মাথা ডুবাইয়া স্নান করিল না পাছে জ্বালা করে। সেদিন দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু কিছু বলে নাই পাছে খুড়ীমা অপ্রতিভ হয়—এক ঘাট লোকের সামনে লজ্জা পায়। তবুও রায়-জেঠি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—বৌমা নাইলে না?...খুড়ীমা হাসির উত্তর দিল—নাবো না আজ আর দিদিমা, শরীরটা ভাল নেই।

খুড়ীমা ভাবিয়াছিল তাহার মার খাওয়ার কথা বুঝি কেহ জানে না। কিন্তু খুড়ীমা ঘাট হইতে উঠিয়া গেলেই রায়-জেঠি বলিল—দেখেচো বৌটাকে কি রকম মেরেচে গোকলো, মাথার চুলে রক্ত একেবারে আটা হয়ে এঁটে আছে!

...রায়-জেঠির ভারি অন্যায়। জানো তো বাপু, তবে আবার জিজ্ঞেস করাই বা কেন, আর সকলকে বলাই বা কেন?...

মাছ ধুইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় দুর্গা ভয়ে ভয়ে বলিল—খুড়ীমা, তোমাদের চিঁড়ের ধান আছে? মা বলছিল অপু চিঁড়ে খেতে চেয়েছে, তা আমাদের তো এবার ধান কেনা হয়নি!...গোকুলের বউ চুপি চুপি বলিল—আসিস এখন দুপুরের পর! দালানের দিকে ইসারায় দেখাইয়া কহিল—ঘুমুলে আসিস্!

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমা, তোমাদের বাড়ী কে এসেছে, আমি একদিনও দেখিনি কিন্তু।

—ঠাকুরপোকে দেখিসনি? এখন নেই কোথায় বেরিয়েচে, বিকেলবেলা

আসিস, দেখা হবে এখন।…তারপর গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল…তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হলে কিন্তু দিব্যি মানায়।

দুর্গা লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল—দূর!

গোকুলের বউ আবার হাসিয়া বলিল—কেন রে, দূর কেন? কেন আমাদের মেয়ে কি খারাপ? দেখি? সে দুর্গার চিবুকে হাত দিয়া মুখখানা একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দ্যাখ্‌ তো এমন দুগ্‌গা-প্রতিমার মত সুন্দর মুখখানি? হোলই বা বাপের পয়সা নেই!

দুর্গা ঝাঁকুনি দিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া কহিল—যাও খুড়ীমা যেন কি …পরে সে একপ্রকার ছুটিয়াই খিড়কী দোর দিয়া বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—খুড়ীমার আর সব ভাল, কেবল একটু বোকা, নৈলে দ্যাখো না…দূর!…

দুর্গা চলিয়া যাইতে না যাইতে স্বর্ণ গোয়ালিনী দুধ দুহিতে আসিল। বধূ ঘর হইতে বলিল—ও সন্ন আমার হাত জোড়া, বাছুরটা ওই বাইরের উঠোনে পিটুলি-গাছে বাঁধা আছে—নিয়ে আয়, রোয়াকে ঘটিটা মাজা আছে দ্যাখ।—

সখী ঠাকরুণের এতক্ষণে পূজাহ্নিক সমাপ্ত হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া উত্তর দিকে স্থানীয় কালীমন্দিরের উদ্দেশে মুখ ফিরাইয়া প্রণাম করিতে করিতে টানিয়া টানিয়া আবৃত্তির সুরে বলিতে লাগিলেন—দোহাই মা সিদ্ধেশ্বরী, দিন দিও মা, ভবসমুদ্দুর পার কোরো মা—মা রক্ষেকালী, রক্ষে কোরো, মা-গো?

গোকুলের বউ রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল—ও পিসিমা, নারকোলের নাড়ু রেখে দিইচি, দুটো খেয়ে জল খান।

হঠাৎ সখী ঠাকরুণ রোয়াক হইতে ডাক দিলেন—বৌমা দেখে যাও তো এদিকে।

স্বর শুনিয়া গোকুলের বউএর প্রাণ উড়িয়া গেল। সখী ঠাকরুণকে সে যমের মত ভয় করে। মায়া দয়া বিতরণ সম্বন্ধে ভগবান সখী ঠাকরুণের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রোয়াকের কোণে জড়ো-করা মাজা বাসনগুলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিলেন—দ্যাখো তো চক্ষু দিয়ে, দেখ্‌তে পাচ্ছো? একেবারে স্পষ্ট জলের দাগ দেখলে তো! এখান থেকে সন্ন ঘটি তুলে নিয়েচে, তারপর সেই শুদ্দুরের ছোঁয়া এঁটো বাসন আবার হেঁসেলে নিয়ে সাত-রাজ্যি জড়ানো হয়েচে! বাঃ! জাতজন্মো একেবারে গেল!

সখী ঠাকরুণ হতাশভাবে রোয়াকে বসিয়া পড়িলেন। যেন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইলে ইহার চেয়ে বেশী হতাশ হইতে পারিতেন না।

—হা'ঘরে হাড়হাভাতে ঘরের মেয়ে আন্‌লেই অমনি হয়, ভদ্দর লোকের রীতি শিখবেই বা কোথা থেকে—জানবেই বা কোথা থেকে? বাসন মাজলি তা দেখলি নে এঁটো গেল কি রৈল? তিনপহর বেলা হয়েচে, ভাবলুম একটু জল মুখে দিই! শুদ্দুরের এঁটো, এখ্‌খুনি নেয়ে মরতে হোত—ভাগ্যিস ঘটিটা ছুঁইনি।

গোকুলের বউ বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল—কেন মত্তে সন্ন পোড়ার-মুখীকে ঘটি তুলে নিতে বল্লাম, নিজে দিলেই হোত।

সখী ঠাক্‌রুণ মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—ধিঙ্গী হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈলে যে? যাও হাঁড়িকুড়ি ফেলে দাও গিয়ে! বাসন-কোসন মেজে আনো ফের। রান্নাঘরে গোবর দিয়ে নেয়ে এসো। যত লক্ষ্মীছাড়া ঘরের মেয়ে জুটে সংসারটাকে ছারেখারে দিলে।—সখী ঠাক্‌রুণ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে ঘরে ঢুকিলেন বাহিরের খররৌদ্র তাঁহার সহ্য হইতেছিল না।

হুকুম-মত সকল কাজ সারিতে বেলা একেবারে পড়িয়া গেল। নদীতে সে যখন পুনরায় স্নান করিতে গেল, তখন রৌদ্রে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় ও পরিশ্রমে তাহার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে।

ঘাটে বৈকালের ছায়া খুব ঘন, ওপারের বড় শিমূল গাছটায় রোদ চিক্‌ চিক করিতেছে। নদীর বাঁকে একখানা পাল-তোলা নৌকা দাঁড় বাহিয়া বাঁক ঘুরিয়া যাইতেছে। হালের কাছে একজন লোক দাঁড়াইয়া কাপড় শুকাইতেছে, কাপড়টা ছাড়িয়া দিয়াছে, বাতাসে নিশানের মত উড়িতেছে। মাঝনদীতে একটা কচ্ছপ মুখ তুলিয়া নিশ্বাস লইয়া আবার ডুবিয়া গেল—সোঁ-ও-ও-ও-ভুস!

নদীর জলের কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সুন্দর গন্ধ আসে, ছোট্ট নদী; ওপারের চরে একটা পানকৌড়ি মাছ-ধরা বাঁশের দোয়াড়ির উপর বসিয়া আছে।

এইসময় প্রতিদিন তাহার শৈশবের কথা মনে পড়ে—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠোসে—

গোকুলের বউ খানিকক্ষণ পানকৌড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। মায়ের মুখ মনে পড়ে। সংসারে আর কেহ নাই যে, মুখের দিকে চায়! মায়ের কি মরিবার বয়স হইয়াছিল? গরীব পিতৃকুলে কেবল এক গাঁজাখোর ভাই আছে, সে কোথায় কখন্‌ থাকে—তার ঠিকানা নাই। গত বছর পূজার সময় এখানে আসিয়া চারদিন ছিল। সে লুকাইয়া লুকাইয়া ভাইকে নিজের বাক্স হইতে যাহা সামান্য কিছু পুঁজি—সিকিটা দুয়ানিটা বাহির করিয়া দিত। পরে একদিন সে হঠাৎ এখান হইতে উধাও হয়। চলিয়া গেলে প্রকাশ পাইল যে, এক কাবুলি আলোয়ান-বিক্রেতার নিকট একখানি আলোয়ান ধারে কিনিয়া তাহার

খাতায় ভগ্নীপতির নাম লিখাইয়া দিয়াছে। তাহা লইয়া অনেক হৈ চৈ হইল। পিতৃকুলের অনেক সমালোচনা, অনেক অপমান! ভাইটির সেই হইতে আর কোন সন্ধান নাই।

নিঃসহায় ছন্নছাড়া ভাইটার জন্য সন্ধ্যাবেলা কাজের ফাঁকে মনটা হু হু করে। নির্জন মাঠের পথের দিকে চাহিয়া মনে হয়, গৃহহারা পথিক ভাইটা হয়তো দূরের কোন্ জনহীন আঁধার মেঠো-পথ বাহিয়া একা কোথায় চলিয়াছে, রাত্রে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, মুখের দিকে চাহিবার কোনো মানুষ নাই।···

বুকের মধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠে, চোখের জলে ছায়াভরা নদীর জল, মাঠ, ঘাট, ওপারের শিমুল গাছটা, বাঁকের মোড়ে বড় নৌকাখানা—সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

পথের পাঁচালী সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অপু সেদিন জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়াছিল। বেলা দুইটা বা আড়াইটার কম নয়, রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর। প্রথমে সে তিনকড়ি জেলের বাড়ী গেল। তিনকড়ির ছেলে বঙ্কা পেয়ারাতলায় বাখারী চাঁচিতেছিল, অপু বলিল—এই কড়ি খেলবি। খেলিবার ইচ্ছা থাকিলেও বঙ্কা বলিল তাহাকে এখনি নৌকায় যাইতে হইবে, খেলা করিতে গেলে বাবা বকিবে। সেখান হইতে সে গেল রামচরণ জেলের বাড়ী। রামচরণ দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল; অপু বলিল—হৃদয় বাড়ী আছে? রামচরণ বলিল—হৃদয় কেন ঠাকুর? কড়ি খেলা বুঝি? এখন যাও, হৃদে বাড়ী নেই।

ঠিক দুপুর বেলায় ঘুরিয়া অপুর মুখ রাঙা হইয়া গেল। আরও কয়েকস্থানে বিফল মনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাবুরাম পাড়ুইয়ের বাড়ীর নিকটবর্তী

তেঁতুলতলার কাছে আসিয়া তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তেঁতুলতলায় কড়িখেলার আড্ডা খুব জমিয়াছে। সকলেই জেলেপাড়ার ছেলে, কেবল ব্রাহ্মণ-পাড়ার ছেলের মধ্যে আছে পটু। অপুর সঙ্গে পটুর তেমন আলাপ নাই, কারণ পটুর যে পাড়ায় বাড়ী. অপুদের বাড়ী হইতে তাহা অনেকে দূর। অপুর চেয়ে পটু কিছু ছোট; অপুর মনে আছে, প্রথম যেদিন সে প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ভর্তি হইতে যায়, সেদিন এই ছেলেটিকেই সে শান্তভাবে বসিয়া তালপাতা মুখে পুরিয়া চিবাইতে দেখিয়াছিল। অপু তাহার কাছে গিয়া বলিল—কটা কড়ি?···পটু কড়ির গেঁজে বাহির করিয়া দেখাইল। রাঙা সুতার বুনানি ছোট্ট গেঁজেটি—তাহার অত্যন্ত সখের জিনিস। বলিল, সতেরোটা এনেছি—সাতটা সোনা-গেঁটে; হেরে গেলে আরও আনবো।—পরে সে গেঁজেটা দেখাইয়া হাসিমুখে কহিল—কেমন দেখচিস। গেজেটায় একপণ কড়ি ধরে।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমটা পটু হারিতেছিল, পরে জিতিতে শুরু করিল। কয়েকদিন মাত্র আগে পটু আবিষ্কার করিয়াছে যে, কড়ি খেলায় তাহার হাতের লক্ষ্য অব্যর্থ হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্যই সে দিগ্বিজয়ের উচ্চাশায় প্রলুব্ধ হইয়া এতদূর আসিয়াছিল। খেলার নিয়মানুসারে পটু উপর হইতে টুক্ করিয়া বড় কড়ি দিয়া তাক্ ঠিক করিয়া মারিতেই যেমন একটা কড়ি বোঁ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, অমনি পটুর মুখ অসীম আহ্লাদে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। পরে সে জিতিয়া-পাওয়া কড়িগুলি তুলিয়া গেঁজের মধ্যে পুরিয়া লোভে ও আনন্দে বার বার গেঁজেটির দিকে চাহিয়া দেখে, সেটা ভর্তি হইতে আর কত বাকী!

কয়েকজন জেলের ছেলে কি পরামর্শ করিল। একজন পটুকে বলিল—আর এক হাত তফাৎ থেকে তোমায় মারতে হবে ঠাকুর, তোমার হাতে টিপ বেশী।

পটু বলিল—বা রে, তা কেন, টিপ বেশী থাকাটা দোষ বুঝি? তোমরাও জেত না, আমি তো কাউকে বারণ করিনি।

—পরে সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জেলের ছেলেরা সব একদিকে হইয়াছে। পটু ভাবিল—এত বেশী কড়ি আমি কোনদিন জিতিনি; আজ আর খেলচি নে, খেল্লে কি আর এই কড়ি বাড়ী নিয়ে যেতে পারবো? আবার একহাত বাধ্ বেশী। সব হেরে যাব। হঠাৎ সে কড়ির ছোট্ট থলিটি হাতে লইয়া বলিল—আমি এক হাত বেশী নিয়ে খেলবো না, আমি বাড়ী যাচ্ছি।······পরে জেলেদের ভাবভঙ্গী ও চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি দেখিয়া সে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কড়ির থলিটি শক্ত মুঠায় চাপিয়া রাখিল।

একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল—তা হবে না ঠাকুর, কড়ি জিতে পালাবে বুঝি ?···সঙ্গে সঙ্গে সে হঠাৎ পটুর থলিসুদ্ধ হাতটা চাপিয়া ধরিল। পটু ছাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু জোরে পারিল না ; বিষণ্নমুখে বলিল—বা রে, ছেড়ে দাও না আমার হাত।—পিছন হইতে কে একজন তাহাকে ঠেলা মারিল ; সে পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু কড়ির থলি ছাড়িল না। সে বুঝিয়াছে এইটিই কাড়িবার জন্য ইহাদের চেষ্টা। পড়িয়া সে প্রাণপণে থলিটা পেটের কাছে চাপিয়া রাখিতে গেল ; কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, তাহাতে গায়ের জোরও কম, জেলেপাড়ার বলিষ্ঠ ও তাহার চেয়ে বয়সে বড় ছেলেদের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিতে পারিবে ! হাত হইতে কড়ির থলিটি অনেকক্ষণ কোন ধারে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল—কড়িগুলি চারিধারে ছত্রাকার হইয়া গেল।

অপু প্রথমটা পটুর দুর্দশায় একটু খুশী যে না হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ সেও অনেক কড়ি হারিয়াছে। কিন্তু পটুকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, বিশেষ করিয়া তাহাকে অসহায়ভাবে পড়িয়া মার খাইতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে ভিড় ঠেলিয়া আগাইয়া গিয়া বলিল—ছেলেমানুষ ওকে তোমরা মারচ কেন ? বা রে, ছেড়ে দাও—ছাড়ো। পরে সে পটুকে মাটি হইতে উঠাইতে গেল, কিন্তু পিছন হইতে কাহার হাতের ঘুষি খাইয়া খানিকক্ষণ সে চোখে কিছু দেখিতে পাইল না ; তারপর ঠেলাঠেলিতে সে-ও মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপুকে সেদিন বেদম প্রহার খাইতে হইত নিশ্চয়ই, কারণ তাহার মেয়েলি ধরণের হাতে-পায়ে কোন জোর ছিল না ; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নীরেন এই পথে আসিয়া পড়াতে বিপক্ষদল সরিয়া পড়িল। পটুর লাগিয়াছিল খুব বেশী ; নীরেন তাহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। একটু সামলাইয়া লইয়াই সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—ছড়ানো কড়িগুলার দু'একটি ছাড়া বাকীগুলি অদৃশ্য, মায় কড়ির থলিটি পর্যন্ত। পরে সে অপুর কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অপুদা, তোমার বেশী লাগেনি তো ?

এতদূরে ঠিক দুপুর বেলা জেলের ছেলেদের দলে মিশিয়া কড়ি খেলিতে আসিবার জন্য নীরেন দু'জনকে বকিল। সময় কাটাইবার জন্য নীরেন পাড়ার ছেলেদের লইয়া অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিয়াছিল, সেখানে গিয়া কাল হইতে পড়িবার জন্য দুজনকেই বার বার বলিল। পটু চলিতে চলিতে শুধুই ভাবিতেছিল—কেমন সুন্দর কড়ির গেঁজেটা আমার, সেদিন অত ক'রে ছিবাসের কাছে চেয়ে নিলাম—গেল ! আমি যদি কড়ি জিতে আর না খেলি তা তাদের কি ? সে তো আমার ইচ্ছে।

বাড়ী ঢুকিয়াই অপু দুর্গাকে বলিল—দিদি, শিউলিতলায় গুঁড়ির কাছে আমি একটা বাঁকা-কঞ্চি রেখে গিইছি, আর তুই বুঝি সেটাকে ভেঙে দু'খণ্ড ক'রে রেখেচিস্ ?

দুর্গা সেখানাকে ভাঙিয়াছিল ঠিকই।—আহা, ভারি তো একখানা বাঁকা কঞ্চি! তোর যত পাগলামি—বাঁশবাগান খুঁজলে কঞ্চি আর মিলবে না বুঝি ? কঞ্চির ভাবি অমিল কিনা।

অপু লজ্জিত মুখে বলিল—অমিল না তো কি ? তুই এনে দে দিকি ওইরকম একখানা কঞ্চি। আমি খুঁজে পেতে নিয়ে আস্‌বো, আর তুই সব ভেঙে-চুরে রাখবি—বেশ তো!

তার চোখে জল আসিয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দেবো এখন এনে যত চাস, কান্না কিসের!

বাঁকা-কঞ্চি অপুব জীবনে এক অদ্ভুত জিনিস! একখানা শুক্‌নো হালকা, গোড়াব দিক মোটা আগার দিক সরু, বাঁকা কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা-কঞ্চি হাতে করিয়া এক এক দিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপনমনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়, নিজেকে কখনো বাজপুত্র, কখনো তামাকের দোকানী, কখনো ভ্রমণকাবী, কখনো বা সেনাপতি, কখনো মহাভারতের অর্জুন কল্পনা করে ও আপনমনে বিড বিড করিয়া কাল্পনিক ঘটনা যাহা ওই অবস্থায় তাহাব জীবনে ঘটিলে তাহাব আনন্দ হইত, সেই সব ঘটনা বলিয়া যায়। কঞ্চি যত মনের মত হালকা হইবে ও পরিমাণ মত বাঁকা হইবে তাহার আনন্দ ও কল্পনা ততই পরিপূর্ণতা লাভ করে; কিন্তু সে রকম কঞ্চি সংগ্রহ করা যে কত শক্ত অপু তাহা বোঝে। কত খুঁজিয়া তবে একখানা মেলে!

অপু যে বাঁকা কঞ্চি হাতে এ রকম করিয়া বেড়ায়, এ কথা কেউ না বুঝিতে পাবে অপুর সেদিকে অত্যন্ত চেষ্টা। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাকে আপনমনে বকিতে দেখিলে পাগল ভাবিবে বা অন্য কিছু মনে করিবে, এই আশঙ্কায় পারতপক্ষে জনসমাগমপূর্ণ স্থানে অথবা যেদিকে কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িতে পারে, সে সব দিকে না গিয়া নদীর ধারে—নির্জন বাঁশবনের পথে—নিজেদের বাড়ীর পিছনে তেঁতুলতলায় ঘোরে। এ অবস্থায় তাহাকে কেহ না দেখে, সেদিকে তাহার অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি। ক্বচিৎ যদি কেহ আসিয়া পড়ে, তখনি সে জিভ্ কাটিয়া হাতের কঞ্চিখানা ফেলিয়া দেয়···পাছে কেহ কিছু মনে করে—এজন্য তাহার ভারি লজ্জা।

কেবল জানে তাহার দিদি। তাহাকে এ অবস্থায় দু'একবার দেখিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই দিদির কাছে আর লুকাইয়া কি হইবে? তাই সে পাঁকা-কঞ্চির কথা দিদিকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিল। অন্য লোক হইলে লজ্জায় অপু কখনই একথার উল্লেখ করিতে পারিত না, যদিও কেহই জানে না অপুর সহিত বাঁকা কঞ্চির কি রহস্যময় সম্পর্ক, তবুও অপুর মনে হয় সকলেই সেকথা জানে, বলিলেই সকলে তাহাকে পাগল বলিয়া ঠাট্টা করিবে। কে বুঝিবে— একখানা বাঁকা কঞ্চি হাতে পাইলে, সে না খাইয়া দাইয়া নদীর ধারে কি কোন জনহীন বনের পথে কি অপূর্ব আনন্দেই সারাদিন একা-একা কাটাইয়া দিতে পারে।...

দিদিকে অনুরোধ করিয়াছিল—মাকে যেন এসব বলিসনে দিদি! দুর্গা বলে নাই। সে জানে, অপু একটা পাগল। ভারি মমতা হয় ওর উপর, ছোট্ট বোকা আদুরে ভাইটা—এসব মাকে বলিয়া কি হইবে?

মধুসংক্রান্তির ব্রতের পূর্বদিন সর্বজয়া ছেলেকে বলিল—কাল তোদের মাষ্টার মশায়কে নেমন্তন্ন ক'রে আসিস...বলিস দুপুর-বেলা এখানে খেতে।

মোটা চালের ভাত, পেঁপের ডালনা, ডুমুরের সুক্তনি, থোড়ের ঘণ্ট, চিংড়ি মাছের ঝোল, কলার বড়া ও পায়েস।

দুর্গাকে তাহার মা পরিবেশন কার্যে নিযুক্ত করিয়াছে। নিতান্ত আনাড়ি, —ভয়ে ভয়ে এমন সন্তর্পণে সে ডালের বাটি নিমন্ত্রিতের সম্মুখে রাখিয়া দিল— যেন তাহার ভয় হইতেছে এখনি কেহ বকিয়া উঠিবে। অত মোটা চালের ভাত নীরেনের খাওয়া অভ্যাস নাই; এত কম তৈলঘৃতের রান্না তরকারি কি করিয়া লোকে খায়, তাহা সে জানে না। পায়েস পান্সে—জল-মিশানো দুধের তৈরী, একবার মুখে দিয়াই পায়েস-ভোজনের উৎসাহ তাহার অর্ধেক কমিয়া গেল। অপু মহা খুশি ও উৎসাহ-সহকারে খাইতেছিল, এত সুখাদ্য তাহাদের বাড়ীতে দু'একদিন মাত্র হইয়াছে—আজ তাহার স্মরণীয় উৎসবের দিন!—আপনি আর একটু পায়েস নিন মাষ্টার মশায়। নিজে সে এটা-ওটা বার বার দিদির কাছে চাহিয়া লইতেছিল।

বাড়ী ফিরিলে গোকুলের বউ হাসিমুখে বলিল—দুগ্‌গাকে পছন্দ হয় ঠাকুরপো? দিব্যি দেখতে-শুনতে। আহা! আহা! বড় গরীবের মেয়ে, পয়সা নেই। কার হাতে যে পড়বে!—সারা জীবন প'ড়ে প'ড়ে ভুগ্‌বে। তা তুমি ওকে বিয়ে কর না কেন ঠাকুরপো, তোমাদেরই পালটি ঘর—মেয়েও দিব্যি। ভাইবোনের দু'জনেরই কেমন পুতুল-পুতুল গড়ন!

জরীপের তাঁবু হইতে ফিরিতে গিয়া নীরেন সেদিন গ্রামের পিছনের আম-বাগানের পথ ধরিয়াছিল। একটা বনে-ঘেরা সরু পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিল বাগানের ভিতর হইতে একটি মেয়ে সম্মুখের পথের উপর আসিয়া উঠিতেছে, সে চিনিল—অপুর বোন দুর্গা। জিজ্ঞাসা করিল—কি খুকী তোমাদের বাগান বুঝি এইটে ?

দুর্গা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া লজ্জিত হইল, কিছু বলিল না।

পরে সে পথের পাশে দাঁড়াইয়া নীরেনকে পথ ছাড়িয়া দিতে গেল। নীরেন বলিল—না না খুকী, তুমি চল আগে আগে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হোল। ঐদিকে একটা পুকুরের ধারে গিয়ে পড়েছিলাম, তারপর পথ খুঁজে হয়রান। যে বন তোমাদের দেশে !

দুর্গা যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নীরেনের মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে কিসের ফল গোটাকতক পথেব উপব পডিয়া গেল।

নীরেন বলিল—কি যেন পড়ে গেল খুকী ! কিসের ফল ওগুলো ?

দুর্গা নীচু হইয়া কুড়াইতে কুড়াইতে সঙ্কুচিতভাবে বলিল—ও কিছু না, মেটে আলু।

মেটে আলু ? খেতে ভাল লাগে বুঝি ? কিসের ফল ওগুলো ?

এ প্রশ্ন দুর্গার কাছে অত্যন্ত কৌতুককর ঠেকিল। একটি পাঁচ বছরের ছেলে যা জানে, চশমা-পরা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানে না। সে বলিল—এ ফল তো খায় না, এ তো তেতো।

তবে তুমি যে—

দুর্গা সলজ্জস্বরে বলিল—আমি নিয়ে যাচ্ছি এমনি—খেলবার জন্যে !··· একথা তাহার মনে ছিল যে, এই চশমা পরা ছেলেটির সঙ্গেই সেদিন খুড়ীমা ঠাট্টাচ্ছলে তাহার বিবাহের কথা তুলিয়াছিল। তাহার ভারী কৌতূহল হইতেছিল, ছেলেটিকে সে ভাল কবিয়া দেখে। কিন্তু মধুসংক্রান্তির ব্রতের দিনও তাহা সে পারে নাই, আজও পারিল না।

—অপুকে ব'লো কাল সকালে যেন বই নিয়ে যায়—বলবে তো ?

দুর্গা চলিতে চলিতে সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িল।

আর একটু গিয়া পাশের একটা পথ দেখাইয়া বলিল—এই পথ দিয়ে গেলে আপনার খুব সোজা হবে।

নীরেন বলিল,—আচ্ছা, আমি চিনে যাব এখন, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই, তুমি একলা যেতে পারবে ?

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল—ঐ তো আমাদের বাড়ী একটু এগিয়ে গিয়েই, আমি তো···এইটুকু একলা যাবো এখন। আপনি আর—

দুর্গাকে ইহার আগে নীরেন কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই,—চোখ দুটির অমন সুন্দর ভাব কেবল দেখিয়াছে ইহারই ভাই অপুর মধ্যে। যেন পল্লী-প্রান্তের নিভৃত চূত-বকুল-বীথির প্রগাঢ় শ্যামস্নিগ্ধতা ডাগর চোখ দু'টির মধ্যে অর্ধসুপ্ত রহিয়াছে। প্রভাত এখনও হয় নাই, রাত্রিশেষের অলস অন্ধকার এখনও জড়াইয়া। তবে তাহা প্রভাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় বটে,—কত সুপ্ত আঁখির জাগরণ, কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, ঘরে ঘরে কত নবীন জাগরণের অমৃত উৎসব—জানালায় জানালায় ধূপগন্ধ।

দুর্গা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কেমন যেন উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। নীরেনের মনে হইল সে কি বলিবে মনে করিয়া বলিতে পারিতেছে না। সে বলিল—না খুকী, তোমাকে আর একটু এগিয়ে দিই? চল, তোমাদের বাড়ীর সামনে দিয়েই যাই।

দুর্গা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলে, পরে একটু মুখ টিপিয়া হাসিল। নীরেনের মনে হইল এইবার সে কথা বলিবে। পরক্ষণে কিন্তু দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া তাহার সহিত যাইতে হইবে না জানাইয়া দিয়া, বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিয়া গেল।

দুপুর বেলা। ছাদে কাপড় তুলিতে আসিয়া গোকুলের বউ নীরেনের ঘরের দুয়ারে উঁকি দিয়া দেখিল! গরমে নীরেন বিছানায় শুইয়া খানিকটা এপাশ ওপাশ করিবার পর, নিদ্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, মেজেতে মাদুর পাতিয়া বাড়ীতে পত্র লিখিতেছিল।

গোকুলের বউ হাসিয়া বলিল—ঘুমোও নি যে ঠাকুরপো? আমি ভাবলাম ঠাকুরপো ঘুমিয়ে পড়েচে বুঝি। আজ মোচার ঘণ্ট যে বড় খেলে না—পাতেই রেখে এলে, সেদিন তো সব খেয়েছিলে?

—আসুন বৌদি। মোচার ঘণ্ট খাবো কি? বাঙালে কাণ্ড সব; যে ঝাল তাতে খেতে ব'সে কি চোখে দেখ্‌তে পাই—কোন্‌টা ঘণ্ট; কোন্‌টা কি?

গোকুলের বউ ঘরের দুয়ারের কবাটে মাথাটা হেলাইয়া ঠেস দিয়া, অভ্যস্ত-ভাবে মুখের নীচু দিকটা আঁচল দিয়া চাপিয়া দাঁড়াইল।

—ইস, ঠাকুরপো, বড্ড শহুরে চাল দিচ্ছ যে! ওইটুকু ঝাল আর তোমাদের সেখানে কেউ খায় না—না?

—মাপ করবেন বৌদি, এতে যদি 'ওইটুকু' হয়, তবে আপনাদের বেশীটা

একবার খেয়ে না দেখে আমি এখান থেকে যাচ্চি নে! যা থাকে কপালে—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন। দিন্ একদিন চক্ষুলজ্জার মায়া কাটিয়ে যত খুশি লঙ্কা।

—ওমা আমার কি হবে! চক্ষুলজ্জার ভয়েই শিল-নোড়ার পাট তুলে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে আছি না কি ঠাকুরপো? শোনো কথা ঠাকুরপোর—বলে কি না যাঁহা বায়ান্ন···হাসির চোটে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। খানিকটা পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা তোমাদের সেখানে গরম কেমন ঠাকুরপো?

—সেখানে, কোথায়? কলকাতায় না পশ্চিমে? পশ্চিমের গরম কি রকম সে এখান থেকে কি বুঝতে পারবেন। সে বাংলাদেশ থেকে বোঝা যাবে না। জোশেখ মাসের দিনে রাত্রে কি কেউ ঘরের মধ্যে শুতে পারে? ছাদে বিকেলে জল ধ'রে ছাদ ঠাণ্ডা ক'রে রেখে তাইতে রাত্রে শুতে হয়।

—আচ্ছা তোমরা যেখানে থাক এখান থেকে কত দূর?

—এখান থেকে রেলে প্রায় দু'দিনের রাস্তা। আজ সকালের গাড়ীতে মাঝের পাড়া স্টেশনে চড়লে কাল দুপুর-রাত্রে পৌঁছোনো যায়।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, শুনিচি নাকি গয়াকাশীর দিকে পাহাড় কেটে রেল নিয়ে গিয়েচে—সত্যি?

—সত্যি। অনেক বড় বড় পাহাড়, ওপরে জঙ্গল—তার ভেতর দিয়ে যখন রেলগাড়ী যায়—একেবারে অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না, গাড়ীর মধ্যে আলো জেলে দিতে হয়।

গোকুলের বউ উৎসুকভাবে বলিল—আচ্ছা, ভেঙে পড়ে না?

—ভেঙে পড়বে কেন বৌদি? বড় বড় এঞ্জিনিয়ারে সুড়ঙ্গ তৈরী করেচে, কত টাকা খরচ করেচে, ভাঙলেই হোল। একি আপনাদের রায়পাড়ার ঘাটের ধাপ যে দু'বেলা ভাঙচে?

এঞ্জিনিয়ার কোন জিনিস গোকুলের বউ তাহা বুঝিতে পারিল না। বলিল—পাহাড়টা মাটির না পাথরের?

মাটিরও আছে, পাথরেরও আছে। নাঃ বৌদি, আপনি একেবারে পাড়াগেঁয়ে। আচ্ছা, আপনি রেলগাড়ীতে কতদূর গিয়েছেন?

গোকুলের বউ আবার কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। চোখ প্রায় বুজিয়া মুখ একটুখানি উপরের দিকে তুলিয়া ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বলিল—ওঃ, ভারি দূর গিইচি, একেবারে কাশী গয়া মক্কা গিইচি! সেই ওবছর পিসশাশুড়ী আর সতুর মার সঙ্গে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেখতে গিইছিলাম। সেই আমার জন্মের মধ্যে কম্ম—রেলগাড়ীতে চড়া।

এই মেয়েটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সামান্য সূত্র ধরিয়া তাহার চারিপাশে এমন একটা হাসি-কৌতুকের জাল বুনিতে পারে—যাহা নীরেনের ভারি ভাল লাগে। যে ধরণের লোকের মনের মধ্যে আনন্দের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার থাকে, কারণে-অকারণে যার অন্তর্নিহিত আনন্দের উৎস মনের পাত্র উপ্‌চাইয়া পড়িয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া তোলে, এই পল্লীবধূটি সেই দলের একজন। আজকাল নীরেন মনে মনে ইহারই আগমনের প্রতীক্ষা করে—না আসিলে নিরাশ হয়; এমন-কি যেন একটু গোপন অভিমানও হইয়া থাকে।

—আচ্ছা, বৌদি, আপনাদের সবাই চলুন একবার পশ্চিমে, সব বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

—এবাড়ীর লোকে বেড়াতে যাবে পশ্চিমে! তুমিও যেমন ঠাকুরপো! তাহলে উত্তর মাঠের বেগুন-ক্ষেতে চৌকি দেবে কে?

কথার শেষে সে আর একদফা ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকের হাসি হাসিয়া উঠিল। একটু পরে গম্ভীর হইয়া নীচু স্বরে বলিল—দ্যাখো, ঠাকুরপো, একটা কথা রাখ্‌বে।

—কি কথা বলুন আগে।

—যদি রাখো তো বলি।

—ও সাদা কাগজে সই করা আমার দ্বারা হবে না, বৌদি! জানেন তো আইন পড়ি! আগে কথাটা শুন্‌বো, তারপর কথার উত্তর দেবো।

গোকুলের বউ দুয়ার ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে আসিল। কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া বলিল—এই মাকৃড়ী দু'টো রেখে আমায় পাঁচটা টাকা দেবে?

নীরেন বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কেন বলুন তো?

—সে এখন বোল্‌বো না। দেবে ঠাকুরপো?

—আগে বলুন টাকা দিয়ে কি হবে? নৈলে কিন্তু—

গোকুলের বৌ নিম্নস্বরে বলিল—আমি এক জায়গায় পাঠাবো। দ্যাখো তো এই চিঠিখানার ওপরের ঠিকানাটা ইংরিজিতে কি লেখা আছে।

নীরেন পড়িয়া বলিল—আপনার ভাই, না বৌদি?

—চুপ চুপ, এ বাড়ীর কাউকে বোলো না যেন! পাঁচটা টাকা চেয়ে পাঠিয়েচে, কোথায় পাবো ঠাকুরপো, কি রকম পরাধীন জানো তো? তাই ভাবলাম এই মাকৃড়ী দু'টো—টাকা পাঁচটা দাও গিয়ে ঠাকুরপো—হতভাগা ছোঁড়াটার কি কেউ আছে ভূ-ভারতে?...গোকুলের বউএর গলার স্বর চোখের জলে ভারী হইয়া উঠিল।

নীরেন বলিল—টাকা আমি দেবো বৌদি, পাঁচটা হয়, দশটা হয় আপনি যখন হোক্ শোধ দেবেন; কিন্তু মাকৃড়ী আমি নিতে পারবো না—

গোকুলের বউ কৌতুকের ভঙ্গীতে ঘাড় দুলাইয়া হাসিমুখে বলিল, তা হবে না ঠাকুরপো, বাঃ বেশ তো তুমি! তারপর আমি তোমার ঋণ রেখে ম'রে যাই আর তুমি—সে হবে না, ও তোমায় নিতেই হবে। আচ্ছা যাই ঠাকুরপো, নীচে অনেক কাজ প'ড়ে রয়েচে—

সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, কিন্তু সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিম্নস্বরে বলিল—টাকার কথা কিন্তু কাউকে বোলো না যেন ঠাকুবপো! কাউকে না—বুঝলে?

দুর্গা কাঁথাব তলা হইতে অত্যন্ত খুশির সহিত ডাকিল—অপু, ও অপু—

অপু জাগিয়াই ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কথা বলে নাই। বলিল—দিদি, জানালাটা বন্ধ ক'রে দিবি? বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে—

দুর্গা উঠিয়া জানলা বন্ধ কবিয়া দিয়া বলিল—বাণুব দিদির বিয়ে কবে জানিস? আর কিন্তু বেশী দেরী নেই। খুব ঘটা হবে, ইংরিজি বাজনা আসবে। দেখেচিস তুই ইংবিজি বাজনা?

—হ্যাঁ, সব মাথায় টুপি প'রে বাজায়, এই বড বড বাঁশি—মস্ত বড ঢাক আমি দেখিচি—আর একবকম বাঁশি বাজায়, কালো কালো, অত বড নয়, ফ্লোট্ বাঁশি খলে—এমন চমৎকার বাজে! ফ্লোট্ বাঁশি শুনেচিস?

দুর্গা আর একটা কথা ভাবিতেছিল।

কাল সে বৈকালে ওপাড়ার খুড়ীমার কাছে বেড়াইতে যায়। একটা সেকথাব পর খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্‌গা তোর সঙ্গে ঠাকুরপোর কোথায় দেখা হয়েছিল রে?

সে বলিল—কেন খুড়ীমা? পবে সে দিনের কথা বলিল। কৌতুকেব সুরে বলিল, পথ হারিয়ে খুড়ীমা ওতেই—একেবারে গড়ের পুকুর—সেই বনেব মধ্যে—

খুড়ীমা হাসিয়া বলিল—আমি কাল ঠাকুরপোকে বলছিলাম তোব কথা—বল্‌ছিলাম—গরীরের মেয়ে ঠাকুরপো, কিছু দেবার-থোবার সাধ্যি তো নেই বাপের—বড্ড ভাল মেয়ে—যেন একালেরই মেয়ে না—তা ওকে নাওগে না? তাই ঠাকুরপো তোর কথা-টথা জিগ্যেস করছিল—বল্লে, ঘাটের পথে সেদিন কোথায় দেখা হোল—পথ ভুলে ঠাকুরপো কোথায় গিয়ে পড়েছিল—এই সব।

তারপর আমি আজ তিনদিন ধ'রে ভাবছি শ্বশুর-ঠাকুরকে দিয়ে তোর বাবাকে বলাবো। ঠাকুরপোর যেন মত আছে মনে হোল, তোকে যেন মনে লেগেচে—

দুর্গা গোয়াল হইতে বাছুর বাহির করিয়া রৌদ্রে বাঁধিল বটে, কিন্তু অন্যদিন বাড়ীর কাজ তবু ত যাহোক্ কিছু করে, আজ সে ইচ্ছা তাহার মোটেই হইতেছিল না। এক একদিন, তাহার এরকম মনের ভাব হয়; সেদিন সে কিছুতেই বাড়ীর গণ্ডীতে আটকাইয়া থাকিতে পারে না—কে তাহাকে পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। আজ যেন হাওয়াটা কেমন সুন্দর, সকালটা না-গরম-না-ঠাণ্ডা কেমন যেন মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায় নেবুফুলের—যেন কি একটা মনে আসে, কি তাহা সে বলিতে পারে না।

বাড়ীর বাহির হইয়া সে রাণুদের বাড়ী গেল। ভুবন মুখুয্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, এই তার প্রথম মেয়ের বিবাহ, খুব ঘটা করিয়াই বিবাহ হইবে। বাজিওয়ালা আসিয়া বাজির দরদস্তুর করিতেছে। সীতানাথ এ-অঞ্চলের, বিখ্যাত রসুনচৌকি বাজিয়ে, তাহারও বায়না হইয়াছে, বিবাহ উপলক্ষ্যে নানাস্থান হইতে কুটুম্বের দল আসিতে শুরু করিয়াছে। তাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ীর উঠান সারগরম।

দুর্গার মনে ভারি আনন্দ হইল,—আর দিনকতক পরে ইহাদেরই বাড়ীতে কত বাজি পুড়িবে। সে কোনো বাজি কখনও দেখে নাই, কেবল একবার গাঙ্গুলী বাড়ীর ফুলদোলে একটা কি বাজি দেখিয়াছিল, হুস করিয়া আকাশে উঠিয়া একেবারে যেন মেঘের গায়ে গিয়া ঠেকে। সেখান হইতে আবার পড়িয়া যায় এমন চমৎকার দেখায়!···অপু বলে হাউই বাজি।

দুপুরের পর মা দালানে আঁচল বিছাইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িলে সে সুড়ুৎ করিয়া পুনরায় বাড়ীর বাহির হইল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি, রৌদ্রের তেজ চড়িয়াছে, একটানা তপ্ত হাওয়ায় রাণুদের বাগানের বড় নিমগাছটার হল্‌দে পাতাগুলা ঘুরিতে ঘুরিতে ঝরিয়া পড়িতেছে—কেহ কোনদিকে নাই, নেড়াদের বাড়ীর দিকে কে যেন একটা টিন বাজাইতেছে। বু-উ-উ-উ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। কাঁচপোকা! দুর্গা নিজের অনেকটা অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি আঁচল মুঠার মধ্যে পাকাইয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।

কাঁচপোকা নয়, সুদর্শন পোকা।

তাহার মুঠার আঁচল আপনা আপনি খুলিয়া গেল—আগ্রহের সহিত পা টিপিয়া টিপিয়া সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল। সামনের পথের উপর বসিয়াছে, পাখার উপর শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ছিটার মত বিন্দু বিন্দু দাগ!

সুদর্শন পোকা—ঠিক পোকা নয়—ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কথা—তাহার মার মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পণে

ধূলার উপর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বার বার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল—সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো···সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো (অবিকল এই রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল—অপুকে ভালো রেখো, মাকে ভালো রেখো, বাবাকে ভালো রেখো, ওপাড়ার খুড়ীমাকে ভালো রেখো—পরে একটু ভাবিয়া ইতস্তত করিয়া—বলিল—নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রাণুদিদিদের মত বাজিবাজনা হয়।

ভক্তের অর্ঘ্যের আতিশয্যে পোকাটা ধূলার উপর বিপন্নভাবে চক্রাকারে ঘুরিতেছিল, দুর্গা মনের সাধ মিটাইয়া প্রার্থনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত পাশ কাটাইয়া গেল।

পাড়ার ভিতরকার পথে পথে মাথার উপর প্রথম ফাল্গুনের সুনীল, এমন কি অনেকটা ময়ূরকণ্ঠী রংএর আকাশ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে।

শেওড়া বনের মাঝখান দিয়া নদীর ঘাটের সরু পথ। সুঁড়িপথের দুধারেই আম বাগান। তপ্ত বাতাস আম্র-বাউলের মিষ্ট গন্ধে, বনে বনে মৌমাছি ও কাঁচপোকার গুঞ্জনরবে, ছায়াগহন আমবনে কোকিলের ডাকে, স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে।

বাগানগুলি পার হইয়া চড়কতলার মাঠ। ঘাসে-ভরা মাঠে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে। দুর্গা ঝোপের মধ্যে সৈঁয়াকুল খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল—সৈঁয়াকুল এখন আর বড় থাকে না, শীতের শেষেই ঝরিয়া যায়। ওই উঁচু ঢিবিতে ঝোপের মধ্যে একটা গাছে অনেক সৈঁয়াকুল সেদিনও ত সে খাইয়া গিয়াছে কিন্তু এখন আর নাই, সব ঝরিয়া গিয়াছে, গোলমরিচের মত শুকনা সৈঁয়াকুল ঘন ঝোপের তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে। এক ঝাঁক শালিক পাখি ঝোপের মধ্যে কিচ্ কিচ্ করিতেছিল, দুর্গা নিকটে যাইতে উড়িয়া গেল।

তাহার মনে খুশির আবার একটা প্রবল ঢেউ আসিল। উৎসবের নৈকট্য, রাণুর দিদির বাসরে রাত জাগা ও গান শুনিবার আশা—

খুশিতে তাহার ইচ্ছা হইল সে মাঠের এধার হইতে ওধার পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়ায়। একবার সে হাত দুটা ছড়াইয়া ডানার মত লম্বা করিয়া দিয়া খানিকটা ঘুরপাক খাইয়া খানিকটা ছুটিয়া গেল। সে উড়িতে চায়!···শরীর তো হাল্কা জিনিস—হাত ছড়াইয়া ডানার মত বাতাস কাটিতে কাটিতে যদি যাওয়া যাইত!

শুধু শব্দ করিবার আনন্দে সে শুকনা ঝরাপাতার রাশির উপর ইচ্ছা করিয়া

জোরে জোরে পা ফেলিয়া মচ্ মচ্ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পাতা ভাঙ্গিয়া গিয়া শুকনা শুকনা ধূলা মিশানো, খানিকটা সোঁদা সোঁদা খানিকটা তিক্ত গন্ধে জায়গাটা ভরিয়া গেল।

সামনে একটু দূরে সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইবার কাঁচা সড়ক। একখানা গরুর গাড়ী ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে মাঠের পথের দিকে যাইতেছে! টাটকা কাটা কঞ্চির ঘেরা বাঁধিয়া তাহার উপর কাঁথা ও ছেঁড়া লাল নক্সা-পাড় কাপড় ঘিরিয়া ছই তৈয়ারী করিয়াছে। ছই-এর মধ্যে কাহাদের একটা ছোট মেয়ে একঘেয়ে, একটানা ছেলেমানুষি ধরণে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে—কোন্ গাঁয়ের চাষাদের মেয়ে বোধহয় বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুর বাড়ী চলিয়াছে।

দুর্গা অবাক হইয়া একদৃষ্টে গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিয়ের পর মা, বাবা, অপু—সব ছাড়িয়া এই রকম কোথায় কতদূর চলিয়া যাইতে হইবে হয়ত—যখন তখন সেখান হইতে তাহারা আসিতে দিবে কি? সে এতক্ষণ একথা ভাবিয়া দেখে নাই—এই বাগান, বাসকফুলের ঝাড, রাঙী গাইটা, উঠানের কাঁঠালতলাটা যাহা সে এত ভালবাসে, এই শুকনা পাতার গন্ধ, ঘাটের পথ—এইসব ছাড়িয়া যাইতে হইবে চিরকালের, চিরকালের জন্য! ছই-এর মধ্যের ছোট্ট মেয়েটা বোধ হয় সেই দুঃখেই কাঁদিতেছে।

কাঁচা সড়কটা ছাড়াইয়া আর একটা ছোট পোড়ো মাঠ পার হইলেই নদী।

ওপারে জেলেরা কি মাছ ধরিতেছে? খয়রা? এপারে আসিলে দু'পয়সার মাছ কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইত। অপু খয়রা মাছ খাইতে বড় ভালবাসে!

বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যার পর সে অনেকক্ষণ ধরিয়া পুতুলের বাক্স গুছাইল। ঘরের মেঝেতে তাহার মা তেল পুরিতে গিয়া অনেকটা কেরোসিন তেল ফেলিয়া দিয়াছে, তাহার গন্ধ বাহির হইতেছে, হাওয়াটা যেন একটু গরম। পুতুল-গুছানো প্রায় শেষ হইয়াছে, অপু আসিয়া বলিল—তুই বুঝি আমার বাক্স থেকে ছোট আর্সিখানা বের ক'রে নিয়েছিস দিদি?

—হুঁ—আর্সি তো আমার—আমিই তো আগে দেখতে পেয়েছিলাম, তক্তপোশের নীচে পড়েছিল। যাও, আমি আর্সি আমার বাক্সে রাখবো। বেটাছেলে আবার আর্সি নিয়ে কি হবে?

—বা রে তোমার আর্সি বই কি? ও-পাড়ার খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে মা তো কি বের্তোতে আর্সি এনেছিল, আমি তো আগেই মার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। না দিদি, দাও—

কথা শেষ করিয়াই সে দিদির পুতুলের বাক্সের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার মধ্যে আর্সি খুঁজিতে লাগিল।

দুর্গা ভাইয়ের গালে এক চড় লাগাইয়া দিয়া বলিল—দুষ্টু কোথাকার—আমি পুতুল গুছিয়ে রাখচি আর উনি হাণ্ডুল পাণ্ডুল করচেন—যা আমার বাক্সে হাত দিতে হবে না তোমার—দেবো না আমি আর্সি।

কিন্তু কথা শেষ না হইতেই অপু ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহার রুক্ষচুলের গোছা ধরিয়া টানিয়া আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। কান্না-আট্‌কানো গলায় বলিতে লাগিল—কেন তুমি আমাকে মারবে? আমার লাগে না বুঝি?—দাও আমায়—মাকে বোলে দেবো—লক্ষ্মীর চুপড়ি থেকে আল্‌তা চুরি কোরেচ—

আল্‌তা চুরির কথায় দুর্গা ক্ষেপিয়া গেল। ভাইএর কান ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিয়া উপরি উপরি-পটাপট কয়েকটা চড় দিতে দিতে বলিল—আল্‌তা নিইচি? আমি আল্‌তা নিইচি? লক্ষ্মীছাড়া দুষ্টু বাঁদর! আর তুমি যে লক্ষ্মীর চুপড়ির গা থেকে কড়িগুলো খুলে লুকিয়ে রেখেচ, মাকে বলে দেবো না?

চীৎকার, কান্না ও মারামারির শব্দ শুনিয়া সর্বজয়া ছুটিয়া আসিল।

ততক্ষণে দুর্গা অপুর কান ধরিয়া তাহাকে মাটিতে প্রায় শোয়াইয়া ফেলিয়াছে—অপুও প্রাণপণে দুর্গার চুলের গোছা মুঠি পাকাইয়া টানিয়া এরূপ ধরিয়া আছে যে, দুর্গার মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই।

অপুর লাগিয়াছিল বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ত্যাখো না মা, আমার আর্সিখানা বাক্স থেকে বের ক'রে নিজের বাক্সে রেখে দিয়েছে—দিচ্চে না—এমন চড় মেরেচে গালে—

দুর্গা প্রতিবাদ করিয়া বলিল—না মা, ত্যাখো না আমার পুতুলের বাক্স গোছাচ্ছি, ও এসে সেগুলো সব—

সর্বজয়া আসিয়া মেয়ের পিঠের উপর দুম্ দুম্ করিয়া সজোরে কয়েকটি কিল বসাইয়া দিয়া বলিল—ধাড়ী মেয়ে—কেন তুই ওর গায় হাত দিবি যখন তখন?—ওতে আব তোতে অনেক তফাৎ জানিস?—আর্সি—আর্সি তোমার কোন্ পিণ্ডিতে লাগবে শুনি? কথায় কথায় উনি যান ওকে তেড়ে মার্তে। মরণ আর কি! পুতুলের বাক্স—রোসো—

কথা শেষ না করিয়াই সে মেয়ের গুছানো পুতুলের বাক্স উঠাইয়া এক টান্ মারিয়া বাহির উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

—ধাড়ী মেয়ের কোন কাজ নেই কেবল খাওয়া আর পাড়ায় পাড়ায় টো টো ক'রে বেড়ানো—আর কেবল পুতুলের বাক্স আর পুতুলের বাক্স। ও সব টেনে এক্ষুনি বাঁশ-বাগানে ফেলে দিয়ে আসচি। দিচ্চি তোমার খেলা ঘুচিয়ে একেবারে—

দুর্গার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পুতুলের বাক্স তাহার প্রাণ, দিনের মধ্যে দশবার সে পুতুলের বাক্স গোছায়—পুতুল, রাংতা, ছোপানো কাপড়, আল্‌তা, কত কষ্টের সংগ্রহ করা নাটাফল, টিনমোড়া আর্সিখানা, পাখীর বাসা—সব অন্ধকার উঠানের মধ্যে কোথায় কি ছড়াইয়া পড়িল! মা যে তাহার পুতুলের বাক্স এরূপ নির্মমভাবে ফেলিয়া দিতে পারে একথা সে ভাবিতে পারিত না। কত কষ্টে কত জায়গা হইতে জোগাড় করা কত জিনিস উহার মধ্যে?

কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া সে কেমন অবাক হইয়া রহিল।

অপুর কাছেও বোধ হয় শাস্তিটা কিছু বেশী কঠোর বলিয়া ঠেকিল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া চুপচাপ গিয়া শুইয়া পড়িল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে, মেঝেতে কেরোসিন তেলের গন্ধ বাহির হইতেছে, ঘরের মধ্যে বাঁশ-বনের মশা বিন্ বিন্ করিতেছে। খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া দুর্গা গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভাঙা জানালা দিয়া ফাল্গুন জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় পড়িয়াছে, পোড়ো ভিটার দিক হইতে ভুর ভুর করিয়া লেবু ফুলের গন্ধ আসিতেছে।

একবার তাহার মনে হইল উঠিয়া গিয়া পুতুলের বাক্সটা ও ছড়ানো জিনিসগুলো তুলিয়া আনে—কাল সকালে কি আর পাওয়া যাইবে? কত কষ্টের জিনিসগুলো! কিন্তু সাহস পাইল না। আনিতে গেলে মা যদি আবার মারে?

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। হঠাৎ সে গায়ের উপর কাহার হাত অনুভব করিল। অপু ভয়ে ভয়ে ডাকিল—দিদি? দুর্গা কোনো জবাব দিবার পূর্বেই অপু বালিসে মুখ গুঁজিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমি আর করবো না—আমার ওপর রাগ করিস্‌নে দিদি—তোর পায়ে পড়ি। কান্নার আবেগে তাহার গলা আটকাইয়া যাইতে লাগিল।

দুর্গা প্রথমটা বিস্মিত হইল—পরে সে উঠিয়া বসিয়া ভায়ের কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। —কাঁদিস্‌নে চুপ, চুপ, মা শুনতে পেলে আবার আমায় বকবে, চুপ কাঁদতে নেই—আচ্ছা আমি রাগ করবো না, কেঁদো না ছিঃ—চুপ—

তাহার ভয় হইতেছিল অপুর কান্না শুনিলে মা আবার হয়তো তাহাকেই মারিবে।

অনেক করিয়া সে ভাইয়ের কান্না থামাইল। পরে শুইয়া শুইয়া তাহাকে নানা গল্প, বিশেষত রাণুর দিদির বিয়ের গল্প বলিতে লাগিল। একথা-ওকথার

পর অপু দিদির গায়ে হাত দিয়া চুপি চুপি বলিল—একটা কথা বলবো দিদি ? —তোর সঙ্গে মাষ্টার মশায়ের বিয়ে হবে—

দুর্গার লজ্জা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত কৌতুহলও হইল ; কিন্তু ছোট ভাইএর কাছে এ সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তা বলিতে তাহার সঙ্কোচ হওয়াতে সে চুপ করিয়া রহিল।

অপু আবার বলিল—খুড়ীমা বল্‌ছিল রাণুর মায়ের কাছে আজ বিকালে। মাষ্টার মশায়ের নাকি অমত নেই—

কৌতুহলের আবেগে চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল—হ্যাঁ—বল্‌ছিল—যাঃ—তোর সব যেমন কথা—

অপু প্রায় বিছানায় উঠিয়া বসিল—সত্যি বল্‌চি দিদি, তোর গা ছুঁয়ে বল্‌চি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, আমাকে দেখেই তো কথা উঠল। বাবাকে দিয়ে পত্তর লেখাবে সেই মাষ্টার মশায়ের বাবা যেখানে থাকেন সেখানে—

—মা জানে ?

—আমি এসে মাকে জিগ্যেস করবো ভাবলাম—ভুলে গিইচি। জিগ্যেস করবো দিদি ? মা বোধ হয় শোনে নি। কাল খুড়ীমা মাকে ডেকে নিয়ে বল্‌বে বল্‌ছিল—

পরে সে বলিল—তুই কত রেলগাড়ী চড়বি দেখিস, মাষ্টার মশাইরা থাকেন এখান থেকে অনেক দূর—রেলে যেতে হয়—

দুর্গা চুপ করিয়া রহিল।

সে রেলগাড়ীর ছবি দেখিয়াছে—অপুর একখানা বইয়ের মধ্যে আছে। খুব লম্বা, অনেকগুলা চাকা, সামনের দিকে কল, সেখানে আগুন দেওয়া আছে, ধোঁয়া ওড়ে। রেলগাড়ীখানা আগাগোড়া লোহার, চাকাও তাই—গরুর গাড়ীর মত কাঠের চাকা নয়। রেল লাইনের ধারে কোনো খড়ের বাড়ী নাই, থাকিতে পারে না, পুড়িয়া যায়। রেলগাড়ী যখন চলে তখন তাহার নল হইতে আগুন বাহির হয় কিনা! সে ভাইএর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। তাহার পর দুজনেই চুপ করিয়া ঘুমাইবার যোগাড় করিল। ঘুমাইতে গিয়া একটা কথা বার বার দুর্গার মনে হইতেছিল —ঠাকুর সুদর্শন তাহার কথা শুনিয়াছেন। আজই তো সুদর্শনের কাছে সে —ঠাকুরের বড্‌ড দয়া—মা তো ঠিক কথা বলে!

অপু বলিল—লীলাদির জন্যে কেমন চমৎকার শাড়ী কেনা হয়েচে, আজ লীলাদির কাকা বিয়ের জন্যে কিনে এনেচে রানাঘাট থেকে, সেজ জেঠিমা বল্লে —বালুচরের শাড়ী—

দুর্গা হাসিমুখে বলিল—একটা ছড়া জানিস্ ?…পিসি বল্‌তো,

বালুচরের বালুর চ'রে একটা কথা কই—
মোষের পেটে ময়ূর ছানা দেখে এলাম সই।

অপু কাউকে একথা এখনো বলে নাই—তাহার দিদিকেও না।

সেদিন চুপি চুপি দুপুরে সে যখন তাহার বাবার ঐ বই-বোঝাই কাঠের সিন্দুকটা লুকাইয়া খুলিয়াছিল, সিন্দুকটার মধ্যে একখানা বইএর মধ্যেই এই অদ্ভুত কথাটার সন্ধান পাইয়াছে।

উঠানের উপর বাঁশঝাড়ের ছায়া তখন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হয় নাই, ঠিক-দুপুরে সোনাডাঙার তেপান্তর মাঠের সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের ছায়ার মত এক জায়গায় একরাশ ছায়া জমাট বাঁধিয়া ছিল।

একদিন সে দুপুরবেলা বাপের অনুপস্থিতিতে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চুপি চুপি বইয়ের বাক্সটা লুকাইয়া খুলিল। অধীর আগ্রহের সহিত সে এ-বই ও-বই খুলিয়া খানিকটা করিয়া ছবি দেখিতে এবং খানিকটা করিয়া বই-এর মধ্যে ভাল গল্প লেখা আছে কিনা দেখিতে লাগিল। একখানা বইয়ের মলাট খুলিয়া দেখিল নাম লেখা আছে 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ'! ইহার অর্থ কি, বইখানা কোন্ বিষয়ের তাহা সে বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। বইখানা খুলিতেই একদল কাগজ-কাটা পোকা নিঃশব্দে বিবর্ণ মার্বেল কাগজের নীচে হইতে বাহির হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে যেদিকে দুই চোখ যায় দৌড় দিল। অপু বইখানা নাকের কাছে লইয়া গিয়া ঘ্রাণ লইল, কেমন পুরানো গন্ধ! মেটে রঙের পুরু পুরু পাতাগুলার এই গন্ধটা তাহার বড ভাল লাগে—গন্ধটায় কেবলই বাবার কথা মনে করাইয়া দেয়। যখনই এ গন্ধ সে পায় তখনই কি জানি কেন তাহার বাবার কথা মনে পড়ে!

অত্যন্ত পুরানো মার্বেল কাগজের বাঁধাই করা মলাটের নানাস্থানে চটা উঠিয়া গিয়াছে। এই পুরানো বইএর উপরই তাহার প্রধান মোহ। সেইজন্য সে বইখানা বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া অন্যান্য বই তুলিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিল।

লুকাইয়া পড়িতে পড়িতে এই বইখানিতেই একদিন সে পড়িল বড় অদ্ভুত কথাটা। হঠাৎ শুনিলে মানুষ আশ্চর্য হইয়া যায় বটে—কিন্তু ছাপার অক্ষরে

বইখানার মধ্যে এ কথা লেখা আছে, সে পড়িয়া দেখিল। পারদের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে লেখক লিখিয়াছেন,—শকুনির ডিমের মধ্যে পারদ পুরিয়া কয়েকদিন রৌদ্রে রাখিতে হয়, পরে সেই ডিম মুখের ভিতর পুরিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। অপু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—আবার পড়িল—আবার পড়িল।

পরে নিজের ডালাভাঙা বাক্সটার মধ্যে বইখানা লুকাইয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে অবাক হইয়া গেল।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—শকুনিরা বাসা বাঁধে কোথায় জানিস্ দিদি?

তাহার দিদি বলিতে পারে না। সে পাড়ার ছেলেদের—সতু, নীলু, কিনু, পটল, নেডা—সকলকে জিজ্ঞাসা করে। কেউ বলে সে এখানে নয়; উত্তর মাঠে উঁচু গাছের মাথায়। তাহার মা বকে—এই দুপুরবেলা কোথায় ঘুরে বেড়াস্! অপু ঘরে ঢুকিয়া শুইবার ভান করে, বইখানা খুলিয়া সেই জায়গাটা আবার পড়িয়া দেখে আশ্চর্য! এত সহজে উডিবার উপায়টা কেউ জানে না? হয়তো এই বইখানা আর কাহারো বাড়ী নাই, শুধু তাহার বাবারই আছে; হয়তো এই জায়গাটা আর কেহ পডিয়া দেখে নাই, শুধু তাহারই চোখে পডিয়াছে এতদিনে।

বইখানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া আবার সে আঘ্রাণ লয়—সেই পুরানো পুরানো গন্ধটা! এই বইয়ে যাহা লেখা আছে, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার মনের আর কোন অবিশ্বাস থাকে না।

পারদের জন্য ভাবনা নাই—পারদ মানে পারা সে জানে। আয়নার পেছনে পারা মাখানো থাকে, একখানা ভাঙা আয়না বাড়ীতে আছে, উহা যোগাড় করিতে পারিবে এখন। কিন্তু শকুনির ডিম এখন সে কোথায় পায়?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে এক একদিন তাহার দিদি ডাকে—আয় শোন্ অপু, মজা দেখবি আয়। পরে সে একমুঠা পাতের ভাত লইয়া বাড়ীর খিড়কিদোরের বাঁশবাগানে গিয়া হাঁক দেয়—আয় ভুলো—তু-উ-উ-উ। ডাক দিয়াই দুর্গা ভাইয়ের দিকে হাসি হাসি মুখে চুপ করিয়া থাকে যেন কি অপূর্ব রহস্যপুরীর দুয়ার এখনই তাহাদের চোখের সামনে খুলিয়া যায়! হঠাৎ কোথা হইতে কুকুরটা আসিয়া পড়িতেই দুর্গা হাত তুলিয়া বলিয়া উঠে—ওই এসেছে! কোত্থেকে এলো দেখলি?—খুশিতে সে হি হি করিয়া হাসে।

রোজ রোজ ঐ কুকুরকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারে দুর্গার আমোদ হয় ভারী—তুমি হাঁক দেও, কেউ কোথাও নাই, চারিদিকে চুপ! ভাত মাটিতে নামাইয়া দুর্গা চোখ বুঝিয়া থাকে, আশা ও কৌতূহলের ব্যাকুলতায় বুকের

মধ্যে টিপ টিপ করে, মনে মনে ভাবে—আজ ভুলো আসবে না বোধ হয়, দেখি দিকি কোত্থেকে আসে। আজ কি আর শুনতে পেয়েছে!—

হঠাৎ ঘনঝোপে একটা শব্দ ওঠে—

চক্ষের নিমেষে বনজঙ্গলের লতা পাতা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভুলো কোথা হইতে নক্ষত্রবেগে আসিয়া হাজির।

অমনি দুর্গার সমস্ত গা দিয়া একটা কিসের স্রোত বহিয়া যায়। বিস্ময় ও কৌতুকে তাহার মুখ-চোখ উজ্জ্বল দেখায়। মনে মনে ভাবে—ঠিক শুন্‌তে পায় তো, আসে কোত্থেকে। আচ্ছা কাল একটু চুপি চুপি ডেকে দেখবো দিকি, তাও শুন্‌তে পাবে?

এই আমোদ উপভোগ করিতে সে মায়ের বকুনি সহ্য করিয়াও রোজ খাইবার সময় নিজে বরং কিছু কম খাইয়া কুকুরের জন্য কিছু ভাত পাতে সঞ্চয় করিয়া রাখে।

অপু কিন্তু দিদির কুকুর ডাকিবার মধ্যে কি আছে তাহা খুঁজিয়া পায় নাই। দিদির ওসব মেয়েলি ব্যাপারের মধ্যে সে আসে নাই। অধীর আগ্রহে ভোজনরত শীর্ণ কুকুরটার দিকে সে চাহিয়াও দেখে না, শুধু শকুনির ডিমের কথা ভাবে।

অবশেষে সন্ধান মিলিল। হীরু নাপিতের কাঁঠালতলায় রাখালেরা গরু বাঁধিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে তেল-তামাক আনিতে যায়। অপু গিয়া তাহাদের পাড়ার রাখালকে বলিল—তোরা কত মাঠে মাঠে বেড়াস, শকুনির বাসা দেখ্‌তে পাস? আমাদের যদি একটা শকুনির ডিম এনে দিস আমি দুটো পয়সা দেবো।

দিন চারেক পরেই রাখাল তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কোমরের থলি হইতে দুইটা কালো রংএর ছোট ছোট ডিম বাহির করিয়া বলিল—এই দ্যাখ ঠাকুর এনেচি। অপু তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া বলিল, দেখি। পরে আহ্লাদের সহিত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিল—শকুনির ডিম! ঠিক তো? রাখাল সে সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ উত্থাপিত করিল। ইহা শকুনির ডিম কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই, সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া কোথাকার কোন্ উঁচু গাছের মগ্‌ডাল হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে—কিন্তু দুই আনার কমে দিবে না।

পারিশ্রমিক শুনিয়া অপু অন্ধকার দেখিল। বলিল, দুটো পয়সা দেবো, আর আমার কড়িগুলো নিবি? সব দিয়ে দেবো, এক টিনের ঠোঙা কড়ি—সব। এই এত বড় বড় সোনাগেঁটে—দেখবি? দেখাবো?

রাখালকে সাংসারিক বিষয়ে অপুর অপেক্ষা অনেক হুঁশিয়ার বলিয়া মনে হইল। সে নগদ পয়সা ছাড়া কোনো রকমেই রাজি হয় না। অনেক দর-দস্তুরের পর আসিয়া চার পয়সায় দাঁড়াইল। অপু দিদির কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা পয়সা যোগাড় করিয়া তাহাকে চুকাইয়া দিয়া ডিম দুইটি লইল। তাহা ছাড়া রাখাল কিছু কড়িও লইল। এই কড়িগুলা অপুর প্রাণ, অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার বিনিময়েও সে এই কড়ি এখনো হাতছাড়া করিত না অন্য সময়; কিন্তু আকাশে উড়িবার আমোদের কাছে কি আর বেগুন-বীচি খেলা!

ডিমটা হাতে করিয়া, তাহার মনটা যেন ফুঁ দেওয়া রবারের বেলুনের মত হাল্কা হইয়া ফুলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটু সন্দেহের ছায়া তাহার মনে আসিয়া পৌঁছিল, এটুকু এতক্ষণ ছিল না। ডিম হাতে পাওয়ার পর হইতে যেন কোথা হইতে ওটুকু দেখা দিল, খুব অস্পষ্ট! সন্ধ্যার আগে আপনমনে নেড়াদের জামগাচের কাটা গুড়ির উপর বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, সত্যি সত্যি উড়া যাইবে তো! সে উড়িয়া কোথায় যাইবে? মামার বাড়ির দেশে? বাবা যেখানে আছেন সেখানে? নদীর ওপারে? শালিক পাখী ময়না পাখীর মত ও-ই আকাশের গায়ে তারাটা যেখানে উঠিয়াছে?···

সেই দিনই, কি তাহার পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগে দুর্গা সলিতার জন্য ছেঁড়া নেকড়া খুঁজিতেছিল। তাকে হাঁড়ি-কলসীর পাশে গোঁজা সলিতা পাকাইবার ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়ের টুকরার তাল হাতড়াইতে হাতড়াইতে কি যেন ঠক করিয়া তাহার পিছন হইতে গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর অন্ধকার, ভাল দেখা যায় না, দুর্গা মেজে হইতে উঠাইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—ওমা কিসের দুটো বড় বড় ডিম এখানে! এঃ, প'ড়ে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েচে—দেখেচো কি পাখী ডিম পেড়েচে ঘরের মধ্যে মা!

তাহার পর কি ঘটিল, সে কথা না তোলাই ভালো। অপু সেদিন রাত্রে খাইল না···কান্না···হৈ হৈ কাণ্ড। তাহার মা ঘাটে গল্প করে—ছেলেটার যে কি কাণ্ড, ওমা এমন কথা তো কখনো শুনিনি—শুনেচো সেজ ঠাকুরঝি, শকুনির ডিম নিয়ে নাকি মানুষে উড়তে পারে—ওই ওদের বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটা বদ্‌মায়েসের ধাড়ি। তাকে বুঝি বলেচে, সে কোত্থেকে দুটো কাগের না কিসের ডিম এনে বলেছে—এই নেও শকুনের ডিম। তাই নাকি আবার চার পয়সা দিয়ে কিনেচে তার কাছে। ছেলেটা যে কি বোকা সে আর তোমার কাছে কি বল্‌বো সেজ ঠাকুরঝি—কি করি যে এ ছেলে নিয়ে আমি!

কিন্তু বেচারী সর্বজয়া কি করিয়া জানিবে? সকলেই তো কিছু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' পড়ে নাই বা সকলেই কিছু পারদের গুণও জানে না।

আকাশে তাহা হইলে তো সকলেই উড়িত।

অনেক দিন হইতে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজির সঙ্গে অপুর বড় ভাব। গাঙ্গুলী পাড়ার গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি, সদানন্দ বৃদ্ধ সামান্য খড়ের ঘরে বাস করেন। বিশেষ গোলমাল ভালবাসেন না, প্রায়ই নির্জনে থাকেন, সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে গাঙ্গুলীদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বসেন। অপুর বাল্যকাল হইতে হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া মাঝে মাঝে নরোত্তম দাসের কাছে লইয়া যাইত—সেই হইতেই দুজনের মধ্যে খুব ভাব। মাঝে মাঝে অপু গিয়া বৃদ্ধের নিকট হাজির হয়, ডাক দেয়,—দাদু আছো? বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া লতাপাতার চাটাইখানা দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলেন—এসো দাদাভাই এসো বসো বসো—

অন্যস্থানে অপু মুখচোরা, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না—কিন্তু এই সরল শান্তদর্শন বৃদ্ধের সঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়া থাকে, বৃদ্ধের সঙ্গে তাহার আলাপ, খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপের মত ঘনিষ্ঠ, বাধাহীন ও উল্লাস-ভরা! নরোত্তম দাসের কেহ নাই, বৃদ্ধ একাই থাকেন—এক স্বজাতীয় বৈষ্ণবের মেয়ে কাজকর্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সারা বিকাল ধরিয়া অপু বসিয়া বসিয়া গল্প শোনে ও গল্প করে। একথা সে জানে না যে, নরোত্তম দাস বাবাজি তাহার বাবার অপেক্ষাও বয়সে অনেক বড়, অন্নদা রায়ের অপেক্ষাও বড় —কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধতার জন্যই অপুর কেমন যেন মনে হয় তার সতীর্থ, এখানে আসিলে তাহার সকল সঙ্কোচ, সকল লজ্জা আপনা হইতেই ঘুচিয়া যায়। গল্প করিতে করিতে অপু মন খুলিয়া হাসে, এমন সব কথা বলে যাহা অন্যস্থানে সে ভয়ে বলিতে পারে না, পাছে প্রবীণ লোকেরা কেহ ধমক দিয়া 'জ্যাঠা ছেলে' বলে। নরোত্তম দাস বলেন—দাদু, তুমি আমার গৌর,—তোমাকে দেখলে আমার মনে হয় দাদু, আমার গৌর তোমার বয়সে ঠিক তোমার মতই সুন্দর, সুশ্রী, নিষ্পাপ ছিলেন—ওই রকম ভাবমাখানো চোখ ছিল তাঁরও—

অন্যস্থানে এ কথায় অপুর হয়ত লজ্জা হইত, এখানে সে হাসিয়া বলে—দাদু

তা হোলে এবার তুমি আমায় সেই বইখানার ছবি দেখাও।

বৃদ্ধ ঘর হইতে 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'খানা বাহির করিয়া আনেন। তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ, নির্জনে পড়িতে পড়িতে তিনি মুগ্ধ বিভোর হইয়া থাকেন। ছবি মোটে দু'খানি, দেখানো শেষ হইয়া গেলে বৃদ্ধ বলেন, আমি মরবার সময়ে বইখানা তোমাকে দিয়ে যাবো দাদু, তোমার হাতে বইয়ের অপমান হবে না—

তাঁহার এক শিষ্য মাঝে মাঝে পদ রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে আসিত। বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়া বলিতেন, পদ বেঁধেচো বেশ করেচো, ওসব আমায় শুনিও না বাপু, পদকর্তা ছিলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—তাঁদের পর ওসব আমার কানে বাজে—ওসব গিয়ে অন্য জায়গায় শোনাও।

সহজ, সামান্য, অনাড়ম্বর জীবনের গতি-পথ বাহিয়া এখানে কেমন যেন একটা অন্তঃসলিলা মুক্তির ধারা বহিতে থাকে, অপুর মন সেটুকু কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে তাহা তাজা মাটি, পাখী, গাছপালার সাহচর্যের মত অন্তরঙ্গ ও আনন্দপূর্ণ ঠেকে বলিয়াই দাদুর কাছে আসিবার আকর্ষণ তাহার এত প্রবল!

ফিরিবার সময় অপু নরোত্তম দাসের উঠানের গাছতলাটা হইতে একরাশি মুচুকুন্দ-চাঁপা ফুল কুড়াইয়া আনে। সেগুলি সে বিছানায় রাখিয়া দেয়। তাহার পর সন্ধ্যার আলো জ্বলিলেই বাবার আদেশে পড়িতে বসিতে হয়। ঘণ্টাখানেকের বেশী কোনোদিনই পড়িতে হয় না, কিন্তু অপুর মনে হয় কত রাতই যে হইয়া গেল! পরে ছুটি পাইয়া সে শুইতে যায়, বিছানায় শুইয়া পড়ে,—আর অমনি আজকার দিনের সকল খেলা-ধূলা সারাদিনের সকল আনন্দের স্মৃতিতে ভরপুর হইয়া বিছানায় রাখা মুচুকুন্দ-চাঁপার গন্ধ তাহার ক্লান্ত দেহমনকে খেলাধূলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর বালক-প্রাণকে অভিভূত করিয়া বহিতে থাকে। বিছানায় উপুড় হইয়া ফুলের রাশির মধ্যে মুখ ডুবাইয়া সে অনেকক্ষণ ঘ্রাণ লয়।

সেদিন তাহার দিদি চুপি চুপি বলে—চড়ুইভাতি করবি অপু?

তাহাদের দোর দিয়া পাড়ার সকলে কুলুই-চণ্ডীর ব্রতের বন-ভোজনে গ্রামের পিছনের মাঠে যায়। তাহার মাও যায় কিন্তু তাহাকে লইয়া যায় না। সেখানে সব নিজের নিজের জিনিসপত্র। অত চাল ডাল তাহাদের নাই। আর বন-ভোজনে গিয়া সকলে বাহির করে কত কি জিনিস, ভাল চাল, ডাল, ঘি দুধ—তাহার মা বাহির করে শুধু মোটা চাল, মটরের ডাল-বাটা, আর দুই

একটা বেগুন। পাশে বসিয়া ভুবন মুখুয্যেদের সেজ ঠাকুরুণের ছেলেমেয়ের নতুন আখের গুড়ের পাটালি দিয়া দুধ ও কলা মাখিয়া ভাত খায়; নিজের ছেলে মেয়েদের জন্য তাহার মায়ের মন কেমন করে।

তাহার অপুও ওই-রকম দুধ কলা দিয়া পাটালি মাখিয়া ভাত খাইতে ভালবাসে।—

শান্ত মাঠের ধারের বনে রাঙা সন্ধ্যা নামে, বাঁশবনের পথে ফিরিতে শুধু ছেলের মুখই মনে পড়ে।

নীলমণি রায়ের জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার ওধারের খানিকটা বন দুর্গা নিজের হাতে দা দিয়া কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাইকে বলিল—দাঁড়িয়ে দ্যাখ্ তেঁতুলতলায় মা আস্‌চে কিনা—আমি চাল বের ক'রে নিয়ে আসি শীগ্‌গির ক'রে—

একটা ভাল নারিকেলের মালায় দুই পলা তেল চুপি চুপি তেলের ভাঁড়টা হইতে বাহির করিয়া আনিল। অপহৃত মালামাল বাহিরে আনিয়া ভাইয়ের জিম্মা করিয়া বলিল—শীগগির নিয়ে যা, দৌড়ো অপু—সেইখানে রেখে আয়, দেখিস যেন গরু-টরুতে খেয়ে ফেলে না—

এমন সময় মাতোর মা তাহার ছোট ছেলেকে পিছনে লইয়া খিড়কীর দোর দিয়া উঠানে ঢুকিল। দুর্গা বলিল—এদিকে কোত্থেকে তম্‌রেজের বৌ?

মাতোর মায়ের বয়সও খুব বেশী নয়, দেখিতেও মন্দ ছিল না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই কষ্টে পড়িয়া মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বলিল—কুঠির মাঠে গিয়াছিলাম কাঠ কুড়ুতি—বুঁইচের মালা নেবা?

দুর্গা তো বন বাগান খুঁজিয়া নিজেই কত বৈঁচিফল প্রায়ই তুলিয়া আনে, ঘাড় নাড়াইয়া বলিল—সে কিনিবে না।

মাতোর মা বলিল—নেও না দিদি ঠাক্‌রোণ, বেশ মিষ্টি বুঁইচে মধুখালির বিলির ধারের থে তুলেলাম—কোঁচড় হইতে একগোছা মালা বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখো কত বড বড! কাঠ নিয়ে বাজারে যেতি, বিক্রী কত্তি, পয়সা পেতি বড্ড বেলা হয়ে যাবে, মাতোরে ততক্ষণ এক পয়সার মুড়ি কিনে দেতাম। নেও, পয়সায় দু গাছি দেবানি—

দুর্গা রাজি হইল না, বলিল—অপু, ঘটিতে একগাল-খানিক চালভাজা আছে, নিয়ে এসে মাতোর হাতে দে তো! উহারা খিড়্‌কী দোর দিয়াই পুনরায় বাহির হইয়া গেলে দুজনে জিনিসপত্র লইয়া চলিল।

চারিদিক বনে ঘেরা। বাহির হইতে দেখা যায় না। খেলাঘরের মাটির ছোবার মত ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই দ্যাখ্ অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসিচি এক জায়গা

থেকে। পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো···

অপু মহা উৎসাহে শুকনা লতা-কাটি কুড়াইয়া আনে। এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারী রান্না হইবে, না খেলাঘরের বনভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সে রকম হইবে,—ধূলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁটাল পাতার লুচি ?

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি। বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের! চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার ঝুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে সেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধ-পোড়া কটা দূর্বাঘাসের উপর খঞ্জন পাখীরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপ-ঝাপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি! প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে-ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটুফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবি লেবু গাছটায় কয়দিনের কুয়াসায় ফুল অনেক ঝরিয়া গেলেও থোপা থোপা সাদা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট, অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধি-সন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলায় পথটি, ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়া ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু—তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু হু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!

আর যদি সে না ফেরে—যদি নিতম পিসির মত হয় ?

এই ভিটাতেই নিতম পিসি ছিল, বিবাহ হইয়া কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে ফিরিয়া আসে নাই! অনেককাল আগের কথা—ছেলেবেলা হইতে গল্প শুনিয়া আসিতেছে! সকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়, সে কতদূর ? কোথায় ? কেহ আর তাহার খোঁজ-খবর করে না ; আছে কি নাই, কেহ জানে না। বাপকে নিতম পিসি আর দেখে নাই ; মাকে আর দেখে নাই, ভাই-বোনকেও না। সব একে একে মরিয়া গিয়াছে। মাগো, মানুষ কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়। কেন তাহার খোঁজ কেহ যে করে নাই! কতদিন সে নির্জনে এই নিতম পিসির কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে! আজ যদি হঠাৎ সে ফিরিয়া আসে—এই ঘোর-জঙ্গল-ভরা জনশূন্য বাপের ভিটা দেখিয়া কি ভাবিবে ?

তাহারও যদি ঐ রকম হয়? ঐ তাহার বাবাকে, মাকে, অপুকে ছাড়িয়া— আর কখনো দেখা হইবে না—কখনো না—কখনো না—এই তাদের বাড়ী, গাবতলা, ঘাটের পথ?

ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে, দরকার নাই। কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে, যাহা আর কখনো আসে নাই। দিনে রাতে, খেলা-ধূলার, কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে একথা তাহার প্রায়ই মনে হয়…ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে…আসিতেছে… শীঘ্রই আসিতেছে…

চড়ুই-ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু হাসিয়া যেন কতকটা সম্ভ্রমের স্বরে বলিল—কি হচ্ছে দুর্গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আয় না বিনি, চড়ুই-ভাতি কচ্চি—বোস্—

মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্কত্তির মেয়ে—পরণে আধময়লা শাড়ী, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাধাসিধা। তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বাস করে। অবস্থাও ভাল নয়। বিনি দুর্গার ফরমাইজ খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে কি না করিবে এরূপ একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুকনো কাঠ দ্যাখ্‌তো—আগুনটা জ্বলচে না ভাল—

বিনি তখনি কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে একবোঝা শুক্‌না বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্‌গা দিদি—না আর আন্‌বো?…দুর্গা যখন বলিল—বিনি এসেছে—ও-ও তো এখানে খাবে—আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল— কি কি তরকারী দুগ্‌গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা ছোবাতে তেঁলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফেলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে

ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মত রং হচ্চে দেখচিস্ অপু! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুন ভাজা, না?

অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন-ভাজা, সম্ভবপর হইবে। তাহার পর দু'জনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন ভাজা, আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েছে রে বেগুন ভাজা?

অপু বলে,—বেশ হয়েচে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন—

লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অত্য একেবারে বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষো মেটে-আলুর ফল ও পান্‌সে আধ-পোড়া বেগুন ভাজা দিয়া চড়ুই-ভাতির ভাত খাইতে বসিল। দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময়মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুক্‌নো আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুরতলায় ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত-তরকারী খাওয়া!

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হিহি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আট্‌কাইয়া যাইতেছিল যেন! বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম।

দুর্গা বলিল—অপু, ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল -

যে জীবন কত শত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ-মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সে মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অজস্র যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন্ ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলেফলে দুঃখসুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নতুন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসঙ্কটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ। অজানার আনন্দ! সামান্য সামান্য, ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ!

অপু বলিল—মাকে কি বল্‌বি দিদি? আবার ওবেলা ভাত খাবি?

—দূর, মাকে কখনো বলি! সন্দের পর দেখিস্ খিদে পাবে এখন—

যুগীর বামুন বলিয়া পাড়ায় জল খাইতে চাহিলে লোকে ঘটিতে করিয়া জল খাইতে দেয়; তাহাও আবার মাজিয়া দিতে হয়! বিনি দু-একবার ইতস্তত করিয়া অপুর গ্লাসটা দেখাইয়া বলিল—আমার গাসে একটু জল ঢেলে দেও তো অপু? জল তেষ্টা পেয়েছে!

অপু বলিল—নাও বিনি দি, তুমি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাও না!

তবু যেন বিনির সাহস হয় না। দুর্গা বলিল—নে না বিনি, গেলাসটা নিয়ে খা না!

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে দুর্গা বলিল—হাঁড়িটা ফেলা হবে না কিন্তু, আবার আর-একদিন বনভোজন করবো—কেমন তো? ওই কুলগাছটার ওপরে টাঙিয়ে রেখে দেবো?

অপু বলিল—হ্যাঁ, ওখানে থাকবে কিনা? মাতোর মা কাঠ কুড়োতে আসে, দেখতে পেলে নিয়ে যাবে দিদি—ভারি চোর—

একটা ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলির মধ্যে ছোবাটা দুর্গা রাখিয়া দিল।

অপুর বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। ঐ ঘুলঘুলিটার ওপিঠে আর একটা ছোট ঘুলঘুলি আছে, তাহার মধ্যে অপু লুকাইয়া চুরুটের বাক্স রাখিয়া দিয়াছে, দিদি সেদিকে যদি যাইয়া পড়ে!

নেড়াদের বাড়ীতে কিছুদিন আগে নেড়ার ভগ্নীপতি ও তাহার এক বন্ধু আসিয়াছিল। কলিকাতার কাছে কোথায় বাড়ী। খুব বাবু, খুব চুরুট খায়। এই একবার খাইল, আবার এই খাইতেছে। অপুর মনে মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল সেও একবার চুরুট খাইয়া দেখিবে, কেমন লাগে। সে নেড়ার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গ্রামের হরিশ যুগীর দোকান হইতে তিন পয়সার রাঙা কাগজে মোড়া দশটি চুরুট কিনিয়া আনে। সেদিন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে একা বসিয়া চুপি চুপি একটা চুরুট ধরাইয়া খাইয়াছিল—ভাল লাগে নাই, তেতো, তেতো, কেমন একটা ঝাঁজ—দু'টান খাইয়া সে আর খাইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভাগের বাকী চারটি চুরুট সে ফেলিয়াও দিতে পারে নাই, নেড়ার ভগ্নীপতির নিকট সংগৃহীত একটি খালি চুরুটের বাক্সে সে-কয়টি সে ওই পোড়োভিটার জঙ্গলে ভাঙা পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে! প্রথম চুরুট খাইবার দিন চুরুট টানা শেষ হইয়া গেলে ভয়ে তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিতেছিল, পাছে মুখের গন্ধ মা টের পায়। পাকাকুল অনেক করিয়া খাইয়া নিজের মুখের হাই হাত পাতিয়া ধরিয়া অনেকবার পরীক্ষা করিয়া তবে সে সেদিন পুনর্বার মনুষ্য-সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। যায় বুঝি আজ বামালসুদ্ধ ধরা পড়িয়া!

কিন্তু দিদির পাঁচিলের ওপিঠে যাইবার দরকার হয় না। এপিঠেই সারা হইয়া যায়।

কথাটা সর্বজয়া ঘাটে গিয়া পাড়ার মেয়েদের মুখে শুনিল।

আজ কয়েকদিন হইতে নীরেনের সঙ্গে অন্নদা রায়ের, বিশেষ করিয়া তাহার ছেলে গোকুলের মনান্তর চলিতেছিল। কাল দুপুর বেলা নাকি খুব ঝগড়া ও চেঁচামেচি বাধে। ফলে কাল রাত্রেই নীরেন জিনিসপত্র লইয়া এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অন্নদা রায়ের প্রতিবেশী যজ্ঞেশ্বর দীঘড়ীর স্ত্রী হরিমতি বলিতেছিলেন—সত্যি মিথ্যে জানিনে, ক'দিন থেকে তো নানা রকম কথা শুনতে পাচ্ছি—আমি বাপু বিশ্বেস করিনে, বৌটা তেমন নয়। আবার নাকি শুনলাম নীরেন লুকিয়ে টাকা দিয়েছে, বৌ নাকি টাকা কোথায় পাঠিয়েছিল, নীরেনের হাতের লেখা রসিদ ফিরে এসে গোকুলের হাতে পড়েচে, এই সব। —যাক্ বাপু, সে সব পরের কুচ্ছ শুনে কি হবে? নীরেন শুনলাম বলেচে—আপনারা সকলে মিলে একজনের উপর অত্যাচার কর্তে পারেন, তাতে দোষ হয় না?—আপনারা ভাবেন ভাবুন, বৌ ঠাকরুণ একবার হুকুম করুন আমি ওঁকে এই দণ্ডে আমার হারানো মায়ের মত মাথায় ক'রে নিয়ে যাবো—তারপর আপনারা যা করবার করবেন। তারপর খুব হৈ চৈ খানিকক্ষণ হোল—সন্দের আগেই সে গয়লাপাড়া থেকে একখানা গাড়ী ডেকে আনলে, জিনিসপত্তর নিয়ে চলে গেল।

সর্বজয়া কথাটি শুনিয়া বড় দমিয়া গেল। ইতিমধ্যে স্বামীকে দিয়া অন্নদা রায়কে নীরেনের পিতার নিকট এ বিবাহ সম্বন্ধে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছে। নীরেনকে আরও দুইবার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—ছেলেটিকে তাহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে। হরিহর তাহাকে অনেকবার বুঝাইয়াছে, নীরেনের পিতা বড় লোক—তাহাদের ঘরে তিনি কি আর পুত্রের বিবাহ দিবেন? সর্বজয়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই, তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন সাহস পাইয়াছে—এ বিবাহের যোগাযোগ যেন দুরাশা নয়, ইহা ঘটিবে।

হরিহর মনে মনে বিশ্বাস না করিলেও স্ত্রীর অনুরোধে অন্নদা রায়কে কয়েকবার তাগিদ দিয়াছিল বটে। কিন্তু এখন যে বড় বিপদ ঘটিল!

ইতিমধ্যে একদিন পথে দুর্গার সঙ্গে গোকুলের বউয়ের দেখা হইল। সে চুপি চুপি দুর্গাকে অনেক কথা বলিল, নীরেন কেন চলিয়া গেল তাহারই ইতিহাস বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

—এই রকম ঝাঁটালাথি খেয়েই দিন যাবে—কেউ নেই দুগ্‌গা—তাই কি ভাইটা মানুষ? কোথাও যে দুদিন জুড়ুবো সে জায়গা নেই—

সহানুভূতিতে দুর্গার বুক ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খুড়ীমার কলঙ্কের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও তাহার দুঃখে সান্ত্বনাসূচক নানা কথা অস্পষ্টভাবে তাহার মনের মধ্যে জোট পাকাইয়া উঠিল। সব কথা গুছাইয়া বলিতে না পারিয়া শুধু বলিল, ওই সখী ঠাকুরমা যা লোক! বলুক গে না, সে কর্‌বে কি? কেঁদো না খুড়ী মা লক্ষ্মীটি, আমি রোজ যাবো তোমার কাছে—

সর্বজয়া শুনিয়া আগ্রহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বৌমা কি বল্লে টল্লে দুর্গা?···তা নীরেনের কথা কিছু হোল না কি?

দুর্গা লজ্জিত স্বরে বলিল—তুমি কাল জিগ্যেস কোরো না ঘাটে? আমি জানি নে—

অপু একবার জিজ্ঞাসা করিল—খুড়ীমার কাছে কি শুন্‌লি, মাষ্টার মশায় আর আস্‌বেন না?

দুর্গা ধমক দিয়া কহিল—তা আমি কি জানি—যাঃ—

পড়ন্ত রোদে ছায়াভরা পথটি কেমন যেন মন-কেমন-করা-করা। সে তাহার ভাই-এর জন্য। এ-রকম তাহার হয়, কতবার হইয়াছে, বেশীক্ষণ ধরিয়া সে বাড়ী না থাকে, কি ভাইকে না দেখে, ভাইয়ের রাশি রাশি কাল্পনিক দুঃখের কথা মনে হইয়া মনের মধ্যে কেমন করে।

তাহাব অমন দুধে-আলতা রংএর সোনার পুতুলের মত ভাইটা ময়লা-আধছেঁড়া-মত একখানা কাপড় পরিয়া বাড়ীর দরজার সামনে আপনমনে একা একা কড়ি চালিয়া বেগুন-বীচি খেলিতেছে। তাহার কাছে পয়সা চায় এটা-ওটা কিনিতে, সে দিতে পারে না—ভারী কষ্ট হয় মনে—

দিন কয়েক পরে। ভুবন মুখুয্যের বাড়ী রাণুর দিদির বিবাহ শেষ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কুটুম্ব-কুটুম্বিনীরা সকলে যান নাই। ছেলে মেয়েও অনেক। একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দুর্গার বেশ আলাপ হইয়াছে, তার নাম টুনি। তার বাপও আসিয়াছিলেন। আজ দুপুরের পর স্ত্রী ও কন্যাকে

কিছুদিনের জন্য এখানে রাখিয়া কর্মস্থানে গিয়াছেন। ঘণ্টাখানেক পরে, সেজ ঠাকৃরুণ এ ঘরে কি কাজ করিতেছিলেন, টুনির মায়ের গলা তাঁহার কানে গেল। সেজ ঠাকৃরুণ দালানে আসিয়া বলিলেন—কি রে হাসি, কি?

টুনির মা উত্তেজিতভাবে ও ব্যস্তভাবে বিছানাপত্র, বালিসের তলা হাত্‌ড়াইতেছে, উঁকি মারিতেছে, তোষক উল্টাইয়া ফেলিতেছে; বলিল—এই একটু আগে আমার সেই সোনাব সিঁদুরের কৌটোটা এই বিছানার পাশে এইখানটায় বেখেচি, খোকা দোলায় চেঁচিয়ে উঠল, উনি বাড়ী থেকে এলেন—আর তুল্‌তে মনে নেই—কোথায় গেল আব তো পাচ্ছি নে?—

সেজ ঠাকৃরুণ বলিলেন—ওমা সে কি? হাতে কবে নিযে যাসনি তো?

না দিদিমা, এইখানে বেখে গেলুম। বেশ মনে আছে, ঠিক এইখানে—

সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, কৌটার সন্ধান নাই। সেজ ঠাকৃরুণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, দালানে প্রথমটা এ বাড়ীব ছেলে-মেয়ে ছিল, তারপর খাবাব খাওয়ার ডাক পড়িলে ছেলেমেয়েরা সব খাবাব খাইতে যায়, তখন বাহিবেব লোকেব মধ্যে ছিল দুর্গা। সেজ ঠাকৃরুণেব ছোট মেযে টেঁপি চুপি চুপি বলিল—আমবা যেই খাবাব খেতে গেলাম দুগ্‌গাদি তখন দেখি যে খিড়কীব দোব দিযে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই মাত্তর আবাব এসেচে—

সেজ ঠাকৃরুণ চুপি চুপি কি পবামর্শ কবিলেন, পবে রুক্ষস্ববে দুর্গাকে বলিলেন—কৌটো দিযে দে দুগ্‌গা, কোথায় বেখেছিস বল্—বাব কব এখ্‌খুনি বল্‌চি—

দুর্গাব মুখ শুকাইযা এতটুকু হইয়া গিযাছিল, সেজ ঠাকৃরুণের ভাবভঙ্গিতে তাহাব জিব যেন মুখেব মধ্যে জড়াইয়া গেল। অস্পষ্টভাবে কি বলিল ভাল বোঝা গেল না।

টুনিব মা এতক্ষণ কোনো কথা বলে নাই—একজন ভদ্রঘবেব মেযেকে সকলে মিলিয়া চোব বলিয়া ধবাতে সে একটু অবাক হইযা গিয়াছিল, বিশেষতঃ দুর্গাকে সে কযেকদিন এখানে দেখিতেছে. দেখিতে বেশ চেহাবা বলিযা দুর্গাকে সে পছন্দ করে— স চুবি কবিবে ইহা কি সম্ভব? সে বলিল—ও নেযনি .বাধহয সেজদি—ও কেন—

সেজ ঠাকরুণ বলিলেন—তুমি চুপ ক'বে থাকো না! তুমি ওব কি জানো, নিযেচে কি না নিয়েচে আমি জানি ভাল ক'রে—

একজন বলিলেন—তা নিয়ে থাকিস বের ক'রে দে, নয়তো কোথায় আছে বল্—আপদ চুকে গেল। দিয়ে দে লক্ষীটি, কেন মিথ্যে…

দুর্গা যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল—তাহার পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি তো জানিনে কাকীমা—আমি তো—

সেজ ঠাক্‌রুণ বলিলেন—বল্লেই আমি শুন্‌বো? ঠিক ও নিয়েচে—ওর ভাব দেখে আমি বুঝতে পেরেচি। আচ্ছা, ভাল কথায় বল্‌চি কোথায় রেখেচিস্ দিয়ে দে, জিনিস দিয়ে দাও ত কিছু বোল্‌ব না—আমার জিনিস পেলেই হোল—

পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন—ভদ্দরলোকের মেয়ে চুরি করে কোথাও শুনিনি তো কখনো। এই পাড়াতেই বাড়ী নাকি?

সেজ ঠাক্‌রুণ বলিলেন—তুমি ভাল কথার কেউ নও! দেখবে তুমি মজাটা একবার? তুমি আমার বাড়ীর জিনিস নিয়ে হজম কর্তে গিয়েচো—একি যা তা পেয়েচ বুঝি?—তোমায় আমি আজ—

পরে তিনি দুর্গার হাতখানা ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহাকে দালানের মাঝখানে আনিয়া বলিলেন, দুর্গা বল্ এখনও কোথায় রেখেছিস্?… বল্‌বি নে? না তুমি জানো না, তুমি খুকী—তুমি কিচ্ছু জানো না—শীগ্‌গির বল্, নৈলে দাঁতের পাটি একেবারে সব ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ফেলবো এখুনি! বল্ শীগ্‌গির—বল এখনো বলচি—

টুনির মা হাত ধরিতে আগাইয়া আসিতেছিল, একজন কুটুম্বিনী বলিলেন, রোসো না, দেখচো না ওই ঠিক নিয়েচে। চোরের মারই ওষুধ—দিয়ে দাও এখুনি মিটে গেল,—কেন মিথ্যে—

দুর্গার মাথার মধ্যে কেমন করিতেছিল। সে অসহায়ভাবে চারিদিকে চাহিয়া অতি কষ্টে শুকনো জিবে জড়াইয়া উচ্চারণ করিল—আমি তো জানিনে কাকীমা, ওরা সব চ'লে গেল আমিও তো—কথা বলিবার সময় সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেজ ঠাকরুনের দিকে চোখ রাখিয়া দেওয়ালের দিকে ঘেঁষিয়া যাইতে লাগিল।

পরে সকলে মিলিয়া আরও খানিকক্ষণ তাহাকে বুঝাইল। তাহার সেই এক কথা—সে জানে না।

কে একজন বলিল—পাকা চোর—

টেঁপি বলিল—বাগানের আমগুলো তলায় পড়বার যো নেই কাকীমা—

শেষোক্ত কথাতেই বোধ হয় সেজ ঠাকরুণের কোন ব্যথায় ঘা লাগিল। তিনি হঠাৎ বাজখাঁই রকমের আওয়াজ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—তবে রে পাজি, নচ্ছার, চোরের ঝাড়, তুমি জিনিস দেবে না? দেখি তুমি দেও কি না দেও! কথা শেষ না করিয়াই তিনি দুর্গার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার

মাথাটা লইয়া সজোরে দেওয়ালে ঠুকিতে লাগিলেন। বল কোথায় রেখেচিস্—বল্ এখুনি—বল্ শীগ্‌গির—বল।

টুনির মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেজ ঠাকরুণের হাত ধরিয়া বলিল, করেন কি—করেন কি সেজদি—থাক্‌গে আমার কৌটো—ওরকম ক'রে মারেন কেন!—ছেড়ে দিন্—থাক্, হয়েছে, ছাড়ুন, ছিঃ! টুনি মার দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পূর্বোক্ত কুটুম্বিনী বলিলেন…এঃ রক্ত পড়ছে যে…

দুর্গার নাক দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে কেহ লক্ষ্য করে নাই। বুকের কাপড়ের খানিকটা রক্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

টুনির মা বলিলেন, শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয় টেঁপি—রোয়াকের বাল্‌তিতে আছে ছ্যাখ্—

চেঁচামেচি ও হৈ চৈ শুনিয়া পাশের বাড়ীর কামারদের ঝি-বৌরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল? রাণুর মা এতক্ষন ছিলেন না—দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে কামার-বাড়ী বসিয়া গল্প করিতেছিলেন—তিনিও আসিলেন।

মারের চোটে দুর্গার মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল, সে দিশেহারা ভাবে ভিড়ের মধ্যে একবার চাহিয়া দেখিল।

জল আসিলে রাণুর মা তাহার চোখে মুখে জল দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন। তাহার মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, সে দিশাহারা ভাবে বসিয়া পড়িল। রাণুর মা বলিলেন—অমন ক'রে কি মারে সেজদি?… রোগা মেয়েটা—ছিঃ—

—তোমরা ওকে চেনোনি এখনো। চোরের মার ছাড়া ওষুদ নেই এই ব'লে দিলুম—মারের এখনো হয়েছে কি—না পাওয়া গেলে ছাড়বো না কি? হরি রায় আমায় যেন শূলে ফাঁসে দেয় এরপর—

রাণুর মা বলিলেন—হয়েচে, এখন একটু সাম্‌লাতে দেও সেজদি—যে কাণ্ড করেচো।

টুনির মা বলিল—ওমা এত হবে জানলে কে কৌটোর কথা বল্‌তো?… চাইনে আমার কৌটো—ওকে ছেড়ে দাও সেজ্‌দি—

সেজ ঠাকরুণ এত সহজে ছাড়িতেন কি না বলা যায় না, কিন্তু জনমত তাঁহার বিরুদ্ধে রায় দিতে লাগিল। কাজেই তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রাণুর মা তাহাকে ধরিয়া ওদিকের দরজা খুলিয়া খিড়কীর উঠানে বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন—খুব ক্ষেণে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলি যা হোক! যা আস্তে আস্তে যা—টেঁপি খিড়কীটা ভাল ক'রে খুলে দে—

দুর্গা দিশাহারা ভাবে খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া গেল, মেয়েছেলে ও যাহারা উপস্থিত ছিল—সকলে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

একজন বলিল—তবুও তো স্বীকার কল্লে না—কি রকম দেখচো একবার? চোখ দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা জল পড়লো না—

রাণুর মা বলিলেন—জল পড়বে কি ভয়েই শুকিয়ে গিয়েচে। চোখে কি আর জল আছে? ওই-রকম ক'রে মারে সেজদি?

পথের পাঁচালী — একবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামে বারোয়ারী চড়কপূজার সময় আসিল। গ্রামের বৈদ্যনাথ মজুমদার চাঁদার খাতা হাতে বাড়ী বাড়ী চাঁদা আদায় করিতে আসিলেন। হরিহর বলিল, না খুড়ো, এবার আমার এক টাকা চাঁদা ধরাটা অনেয্য হয়েছে—এক টাকা দেবার কি আমার অবস্থা?

বৈদ্যনাথ বলিলেন—না হে না, এবার নীলমণি হাজরার দল। এ রকম দলটি এ অঞ্চলে কেউ চক্ষেও দেখেনি। এবার পালপাড়ার বাজারে মহেশ সেক্‌রার বালক-কেত্তনের দল গাইবে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চাই-ই—

বৈদ্যনাথ এমন ভাব দেখাইলেন যেন নিশ্চিন্দপুরবাসিগণের জীবন-মরণ এই প্রতিযোগিতার সাফল্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

অপু একটা কঞ্চি টানিতে টানিতে বাড়ী ঢুকিয়া বলিল, পাকা কঞ্চি বাবা, তোমার খুব ভালো কলম হবে, ডোবার ধারের বাঁশতলায় পড়েছিল, কুড়িয়ে আনলাম—পরে সে হাসিমুখে সেটা কতকটা উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখাইয়া বলিল হবে না বাবা তোমার কলম? কেমন পাকা, না?

চড়কের আর বেশী দেরী নাই। বাড়ী বাড়ী গাজনের সন্ন্যাসী নাচিতে বাহির হইয়াছে। দুর্গা ও অপু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদলের পিছনে পিছনে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইল। অন্য অন্য গৃহস্থবাড়ী হইতে পুরানো কাপড় দেয়, চাল পয়সা দেয়—কেউ বা ঘড়া দেয়—তাহারা কিছুই দিতে পারে না দুটো চাল ছাড়া—এজন্য তাহাদের বাড়ীতে এ দল কোনো বারই আসে না। দশ বারো দিন সন্ন্যাসী-নাচনের 'পর চড়কের পূর্বরাত্রে নীলপূজা আসিল।

নীলপূজার দিন বৈকালে একটা ছোট খেজুরগাছে সন্ন্যাসীরা কাঁটা ভাঙে—এবার দুর্গা আসিয়া খবর দিল প্রতি বৎসরের সে গাছটাতে এবার কাঁটা-ভাঙা হইবে না, নদীর ধারে আর একটা গাছ সন্ন্যাসীরা এবার পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়াছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া দুর্গা ও অপু সেখানে গিয়া জোটে। তারপর কাঁটা-ভাঙার নাচ হইয়া গেলে সকলে চড়কতলাটাতে একবার বেড়াইতে যায়। খেজুরের ডাল দিয়া নীলপূজার মণ্ডপ ঘিরিয়াছে—চড়কতলার মাঠের শেওড়াবন ও অন্যান্য জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইল—রাণী, পুঁটি, টুনু—এদের বাড়ীতে কড়া শাসন আছে, দুর্গার মত টো টো করিয়া যেখানে সেখানে বেড়াইবার হুকুম নাই—অতি কষ্টে বলিয়া কহিয়া ইহারা চড়কতলা পর্যন্ত আসিয়াছে।

টুনি বলিল—আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে—

রাণী বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মড়া হবে। তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ডু নিয়ে আসবে—ছড়া বল্‌তে বল্‌তে আসবে—ওর সব মন্তর আছে—

দুর্গা বলিল—আমি জানি ওদের ছড়া, শুন্‌বি বোল্‌বো?

স্ব্‌গগো থেকে এলো রথ
নাম্‌লো খেতুতলে
চব্বিশ কুটী বাণবর্ষা শিবের সঙ্গে চলে—
সত্যযুগের মড়া আর আওল যুগের মাটি
শিব শিব বলরে ভাই ঢাকে দ্যাও কাঠি—

পরে হাসিয়া বলে—কেমন চমৎকার এবার গোষ্ঠবিহারে পুতুল হয়েচে নীলুদা?···দাশু কুমোরের বাড়ী দেখে এলাম—দেখিস্‌নি রাণু?

পুঁটি বলিল—সত্যিকার মড়ার মুণ্ডু রাণুদি?

—নয় তো কি?···অনেক রাত্রে যদি আসিস্ তো দেখ্‌তে পাবি। চল্ ভাই আমরা বাড়ী যাই—আজ রাতটা ভালো নয়—আয়রে অপু, দুগ্‌গাদি আয়।

অপু বলিল—কেন ভালো নয় রাণুদি? কি হবে আজ রাতে?···

রাণী বলিল—সে সব কথা বলতে নেই—তুই আয় বাড়ী। অপু গেল না কিন্তু দুর্গা ওদের দলের সঙ্গে চলিয়া গেল।—তারপর হঠাৎ মেঘ করিল, সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। অপু বাড়ী ফিরিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই, সন্ধ্যা হইতে শ্মশানের ও মড়ার মুণ্ডের গল্প শুনিয়া তাহার কেমন ভয় ভয়

করিতেছে। মোড়ের বাঁশবনের কাছে আসিয়া মনে হইল কিসের যেন কটুগন্ধ বাহির হইতেছে। সে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল, আর একটুখানি গিয়া নেড়ার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা। নেড়ার ঠাকুরমা নীলপূজার নৈবেদ্য হাতে চড়কতলার পূজা দিতে যাইতেছে। অপু অন্ধকারে প্রথমটা চিনিতে পারে নাই, পরে চিনিয়া বলিল—কিসের গন্ধ বেরিয়েচে ঠাকুমা?

বুড়ী বলিল—আজ ওঁরা সব বেরিয়েচেন কিনা? তারই গন্ধ আর কি—

অপু বলিল—কারা ঠাকুমা?

—কারা আবার—শিবের দলবল, সন্দে বেলা ওঁর নাম করতে নেই—রাম রাম—রাম রাম—

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ, শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে, রহস্যে, অজানার অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। সে আতঙ্কের স্বরে বলিল—আমি কি ক'রে বাড়ী যাবো ঠাক্‌মা!

বুড়ী বকিয়া উঠিল—তা এত রাত করাই বা কেন বাপু আজকের দিনে?··· এসো আমার সঙ্গে। নীল পূজোর থালাখানা দিয়ে আসি তারপর এগিয়ে দেবো'খন। ধন্যি যা হোক—

বারোয়ারী তলায় ঘাস চাঁচিয়া প্রকাণ্ড বাঁশের মেরাপ বাঁধিয়া সামিয়ানা টাঙানো হইয়াছে। যাত্রার দল আসে আসে—এখনও পোঁছে নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, লোকে বলে কাল সকালের গাড়ীতে আসিবে, সকাল চলিয়া গেলে, বৈকালের আশায় থাকে। অপুর স্নানাহার বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। রাত্রে অপুর ঘুম হয় না, বাঁধভাঙা বন্যার স্রোতের মত কৌতূহল ও খুশির যে কী প্রবল অদম্য উচ্ছ্বাস! বিছানায় ছট্‌ফট্ করে। এপাশ-ওপাশ করে। যাত্রা হবে! যাত্রা হবে! যাত্রা হবে!

মায়ের বারণ আছে অত বড় মেয়ে পাড়া ছাড়িয়া কোথাও না যায়, দুর্গা চুপি চুপি গিয়া দেখিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মীর কাছে আসর-সজ্জা ও বাঁশের গায়ে ঝুলানো লাল নীল কাগজের অভিনবত্ব সম্বন্ধে গল্প করে, অপুর মনে হয়, যে পঞ্চাননতলায় সে দু'বেলা কড়িখেলা করে, সেই তুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত সামান্য স্থানটাতে আজ বা কাল নীলমণি হাজরার দলের যাত্রার মত একটা অভূতপূর্ব অবাস্তব ঘটনা ঘটিবে, এও কি সম্ভব? কথাটা যেন তাহার বিশ্বাসই হয় না।

হঠাৎ শুনিতে পাওয়া যায় আজ বিকালেই দল আসিবে। এক ঝলক রক্ত যেন বুক হইতে নাচিয়া চল্‌কাইয়া একেবারে মাথায় উঠিয়া পড়ে!···

কুমার-পাড়ার মোড়ে দুপুরের পর হইতেই সকল ছেলের সঙ্গে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর দূরে একখানা গরুর গাড়ী তাহার চোখে পড়িল। সাজের বাক্স বোঝাই—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ খানা! পটু একে একে আঙুল দিয়া গুণিয়া খুশির সুরে বলিল—অপুদা, আমরা এদের পেছনে পেছনে এদের বাসায় গিয়ে দেখে আসব, যাবি? সাজের গাড়ীগুলোর পেছনে দলের লোকেরা যাইতেছে, সকলের মাথায় টেরিকাটা, অনেকের জুতা হাতে। পটু একজন দাড়িওয়ালা লোককে দেখাইয়া কহিল—এ বোধহয় রাজা সাজে, না অপুদা?

আকাশ বাতাসের রং একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল—অপু মহা উৎসাহে বাড়ী ফিরিয়া দেখে তাহার বাবা দাওয়ায় বসিয়া কি লিখিতেছে ও গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান করিতেছে। সে ভাবে যাত্রা আসিবার কথা তাহার বাবাও জানিতে পারিয়াছে, তাই এত স্ফূর্তি। উৎসাহে হাত নাড়িয়া বলে—সাজ একেবারে পাঁচ গাড়ী বাবা! এ রকম দল!—

হরিহর শিষ্যবাড়ী বিলি করার জন্য বালির কাগজে কবচ লিখিতেছিল, মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সুরে বলে—কিসের সাজ রে খোকা? অপু আশ্চর্য হইয়া যায়, এতবড় ঘটনা বাবার জানা নাই! বাবাকে সে নিতান্ত কৃপার পাত্র বিবেচনা করে।

সকালে উঠিয়া অপুকে পড়িতে বসিতে হয়। খানিক পরে সে কাঁদো কাঁদো ভাবে বলে—আমি বারোয়ারী তলায় যাবো বাবা, সকলে যাচ্চে আর আমি এখন বুঝি ব'সে ব'সে পড়বো! এখ্‌খুনি যদি যাত্রা আরম্ভ হয়?

তাহার বাবা বলে—পড়ো, পড়ো, এখন ব'সে পড়ো, যাত্রা আরম্ভ হ'লে ঢোল বাজবার শব্দ তো শুনিতে পাওয়া যাবে। তখন না হয় যেও এখন। প্রৌঢ় বয়সের ছেলে, নিজে সব সময়ে আজকাল বিদেশে থাকে; অল্পদিনের জন্য বাড়ী আসিয়া ছেলেকে চোখ-ছাড়া করিতে মন চায় না। অভিমানে রাগে অপুর চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। সে কান্না-ভরা গলায় আবার শুভঙ্করী শুরু করে—মাস মাহিনা যার যত, দিন তার পড়ে কত?

কিন্তু সকালে যাত্রা বসে না, খবর আসে ওবেলা বসিবে। ওবেলা অপু মায়ের কাছে যাইয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে বাবার অত্যাচারের কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণনা করে। সর্বজয়া আসিয়া বলে—দাও না গো ছেলেটাকে ছেড়ে? বছরকারের দিনটা—তোমার ন মাস বাড়ীতে থাকা নেই বছরে, আর ও একদিনের পড়াতে একেবারে তর্কালঙ্কার ঠাকুর হয়ে উঠবে কি না!

অপু ছুটি পায়। সারা দুপুর তাহার বারোয়ারী তলায় কাটে। বৈকালে

যাত্রা বসিবার পূর্বে বাড়ীতে খাবার খাইতে আসিল। বাবা রোয়াকে বসিয়া কবচ লিখিতেছে। অন্যদিন এ সময় তাহাকে তাহার বাবার কাছে বসিয়া বই পড়িতে হয়। পাছে ছেলে ছুটিয়া যায় এই ভয়ে তাহার বাবা তাহাকে খুশি রাখিবার জন্য নানারকম কৌতুকের আয়োজন করে। বলে, খোকা চট ক'রে শেলেটে লিখে আনো দিকি, ঐঃ ভূত বাপ্‌রে !···অপু সব অদ্ভুত ধরণের কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া আনিয়া দেখায়। বলে, বাবা এইটে হ'য়ে গেলে আমি কিন্তু চ'লে যাবো···তাহার বাবা বলে—যেও এখন, যেও এখন খোকা—আচ্ছা চট্ ক'রে লিখে আনো দিকি—আর একটা অদ্ভুত কথা বলে। অপু আবার হাসিয়া উঠে।

আজ কিন্তু অপুর মনে হইল, বাহির হইতে কি একটা প্রচণ্ড শক্তি আসিয়া তাহাকে তাহার বাবা নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। বাবা নির্জন ছায়া-ভয়া বৈকালে বাঁশবন ঘেরা বাড়ীতে একা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছে, কিন্তু এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে বসাইয়া রাখে। এখন যদি বলে—খোকা, এস পড়তে বসো—অমনি চারিদিক হইতে একটা যেন ভয়ানক প্রতিবাদের হট্টগোল উঠিবে। সকলে যেন বলিবে—না, না, এ হয় না! এ হয় না! যাত্রা যে বসে বসে !···কোন উল্লাসের প্রবল শক্তি তাহার বাবাকে যেন নিতান্ত অসহায়, নিরীহ, দুর্বল করিয়া দিয়াছে। সাধ্য নাই যে, তাহার পড়িবার কথা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে। বাবার জন্য অপুর মন কেমন করে।

দুর্গা বলিল—অপু, তুই মাকে বল্‌না আমিও দেখতে যাবো। অপু বলে—মা দিদি কেন আসুক না আমার সঙ্গে ? চিক্ দিয়ে ঘিরে দিয়েচে, সেইখেনে বসবো ? মা বলে—এখন থাক্; আমি, ওই ওদের বাড়ীর মেয়েরা যাবে, তাদের সঙ্গে যাবো,—আমার সঙ্গে যাবে এখন।

বারোয়ারী তলায় যাইবার সময় দুর্গা পিছন হইতে তাহাকে ডাকিল—শোন্ অপু! পরে সে কাছে আসিয়া হাসিহাসি মুখে বলিল—হাত পাত দিকি! অপু হাত পাতিতেই দুর্গা তাহার হাতে দুটো পয়সা রাখিয়াই তাহার হাতটা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া মুঠা পাকাইয়া দিয়া বলিল—দু' পয়সার মুড়কী কিনে খাস্, নয়তো যদি নিচু বিক্রি হয় তো কিনে খাস। ইহার দিনসাতেক পূর্বে একদিন অপু আসিয়া চুপি চুপি দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোর পুতুলের বাক্সে পয়সা আছে ? একটা দিবি ? দুর্গা বলিয়াছিল—কি হবে পয়সা তোর ? অপু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল—নিচু খাবো—কথা শেষ করিয়া সে পুনরায় লজ্জার হাসি হাসিল। কৈফিয়তের সুরে বলে—বোষ্টমদের বাগানে ওরা মাচা বেঁধেচে দিদি, অনেক নিচু পেড়েছে,

ঘু-ঝুড়ি-ই-ই—এক পয়সায় ছটা, এই এত বড় বড়, একেবারে সিঁদুরের মত রাঙা! সতু কিন্‌লে, সাধন কিন্‌লে—পরে একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আছে দিদি? দুর্গার পুতুলের বাক্সে সেদিন কিছুই ছিল না, সে কিছু দিতে পারে নাই। অপুকে বিরসমুখে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সেদিন তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, তাই বৈকালে সে বাবার কাছে পয়সা দুটা চড়ক দেখিবার নাম করিয়া চাহিয়া লয়। সোনার ভাঁটার মত ভাইটা, মুখের আব্‌দার না রাখিতে পারিলে দুর্গার ভারি মন কেমন করে।

অপু চলিয়া গেলে তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলে—দুগ্‌গা একটা কাজ কর তো! রাণুদের বাগান থেকে দুটো সাদা গন্ধভেদালি পাতা খুঁজে নিয়ে আয় তো—অপুর শরীরটা অসুক করেচে, একটু ঝোল করে দোব!

মায়ের কথায় সে একছুটে রাণুদের বাগানে যায়—বাগানে মানুষ-সমান উঁচু ঘন আগাছার জঙ্গলের মধ্যে গন্ধভেদালির পাতা খুঁজিতে খুঁজিতে মনের সুখে মাথা দুলাইয়া পিসিমার মুখে ছেলেবেলায় শেখা একটি ছড়া আবৃত্তি করে—

হলুদ বনে বনে—
নাক-ছাবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে—

যাত্রা আরম্ভ হয়। জগৎ নাই, কেহ নাই—শুধু অপু আছে, আর নীলমণি হাজ্‌রার যাত্রার দল আছে সাম্‌নে। সন্ধ্যার আগে বেহালায় ইমন আলাপ করে। ভাল বেহালাদার, পাড়াগাঁয়ের ছেলে কখনও সে ভাল জিনিস শোনে না—উদাস-করুণ সুরে হঠাৎ মন কেমন করিয়া উঠে···মনে হয় বাবা এখনও বসিয়া বাড়ীতে সেই কি লিখিতেছে—দিদি আসিতে চাহিয়াও আসিতে পারে নাই। প্রথম যখন জরির সাজ-পোষাক পরিয়া টাঙানো ঝাড় ও কড়ির ডুমের আলো-সজ্জিত আসরে রাজা মন্ত্রীর দল আসিতে আরম্ভ করে, অপু মনে মনে ভাবে এমন সব জিনিস তাহার বাবা দেখিল না! সবাই তো আসরে আসিয়াছে গ্রামের, তাহাদের পাড়ার কোনও লোক তো বাকী নাই! বাবা কেন এখনো···? পালা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে! সেবার সে বালক-কীর্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি, আর এ কি! কি সব সাজ! কি সব চেহারা!···

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছ তো?···তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই। বাবার দিকে ফিরিয়া বলে—বাবা দিদি এসেচে?···চিকের মধ্যে বুঝি?

মন্ত্রীর গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যখন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বনে চলিতেছেন, তখন কাঁদুনে সুরে বেহালায় সঙ্গত হয়। তারপর রাজা করুণ রস বহুক্ষণ জমাইয়া রাখিবার জন্য স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া এক এক পা করিয়া থামেন, আর এক এক পা অগ্রসর হইতে থাকেন, সত্যিকার জগতে কোন বনবাসগমনোদ্যত রাজা নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ না হইলে একদল লোকের সম্মুখে সেরূপ করে না। বিশ্বস্ত রাজ-সেনাপতি রাগে এমন কাঁপেন যে মৃগীরোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষেও তাহা হিংসার বিষয় হইবার কথা। অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনো দেখে নাই!

তারপর কোথায় চলিয়া গিয়াছেন রাজা, কোথায় গিয়াছেন রাণী।···ঘন নিবিড় বনে শুধু রাজপুত্র অজয় ও রাজকুমারী ইন্দুলেখা ভাইবোন ঘুরিয়া বেড়ায়। কেউ নাই যে তাদের মুখের দিকে চায়, কেউ নাই যে নির্জন বনে তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলে। ছোট ভাইয়ের জন্য ফল আনিতে একটু দূরে চলিয়া যাইয়া ইন্দুলেখা আর ফেরে না। অজয় বনের মধ্যে বোনকে খুঁজিয়া বেড়ায়—তাহার পর নদীর ধারে হঠাৎ খুঁজিয়া পায় ইন্দুলেখার মৃতদেহ—ক্ষুধার তাড়নায় বিষফল খাইয়া সে মরিয়া গিয়াছে। অজয়ের করুণ গান—কোথা ছেড়ে গেলি এ বনকান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণসাথী রে—শুনিয়া অপু এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে চাহিয়াছিল—আর থাকিতে পারে না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে।

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী!···যায় বুঝি ঝাড়গুলো গুঁড়ো হইয়া, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়। রব ওঠে—ঝাড় সামলে ঝাড় সামলে। কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে—ধন্য বিচিত্রকেতু!

মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া জুড়ির দীর্ঘ গান ও বেহালার কসরৎ-এর সময় অপুকে তাহার বাবা ডাকিয়া বলে—ঘুম পাচ্ছে···বাড়ী যাবে খোকা? ঘুম! সর্বনাশ! না সে বাড়ী যাইবে না। বাহিরে ডাকিয়া তাহার বাবা বলে—এই দুটো ওয়সা রাখো বাবা, কিছু কিনে খেও, আমি বাড়ী গেলাম! অপুর ইচ্ছা হয় সে একপয়সার পান কিনিয়া খাইবে, পানের দোকানের কাছে অত্যন্ত কিসের ভিড় দেখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখে, অবাক। সেনাপতি বিচিত্রকেতু হাতিয়ারবন্দ অবস্থায় বার্ডসাই কিনিয়া ধরাইতেছেন—তাঁহাকে ঘিরিয়া রথ-

যাত্রার ভিড়। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! রাজকুমার অজয় কোথা হইতে আসিয়া বিচিত্রকেতুর কনুইএ হাত দিয়া বলিল—একপয়সার পান খাওয়াও না কিশোরীদা ?...রাজপুত্রের প্রতি সেনাপতির বিশ্বস্ততার নিদর্শন দেখা গেল না—হাত ঝাড়া দিয়া বলিল—যাঃ অত পয়সা নেই—ওবেলা সাবানখানা যে দুজনে মাখ্‌লে আমাকে কি বলেছিলে ? রাজপুত্র পুনরায় বলিল—খাওয়াও না কিশোরীদা ? আমি বুঝি কখনো কিছু দিইনি তোমাকে ? বিচিত্রকেতু হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

অপুর সমবয়সী হইবে। টুকটুকে, বেশ দেখিতে, গানের গলা বড় সুন্দর। অপু মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে—বড় ইচ্ছা হয় আলাপ করিতে। হঠাৎ সে কিসের টানে সাহসী হইয়া আগাইয়া যায়—একটু লজ্জার সঙ্গে বলে—পান খাবে ?...অজয় একটু অবাক হয় বলে—তুমি খাওয়াবে ? নিয়ে এস না। দুজনে ভাব হইয়া যায়। ভাব বলিলে ভুল হয়। অপু মুগ্ধ, অভিভূত হইয়া যায়! ইহাকেই সে এতদিন মনে মনে চাহিয়া আসিয়াছে—এই রাজপুত্র অজয়কে। তাহার মায়ের শত রূপকথার কাহিনীর মধ্য দিয়া শৈশবের শত স্বপ্নময়ী মুগ্ধ কল্পনার ঘোরে তাহার প্রাণ ইহাকেই চাহিয়াছে—এই চোখ, এই মুখ, এই গলার স্বর! ঠিক সে যাহা চায় তাহাই। অজয় জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের বাড়ী কোথায় ভাই ?...আমাকে একজনের বাড়ী খেতে দিয়েছে, বড্ড বেলায় খেতে দেয়। তোমাদের বাড়ীতে খায় কে ?...

খুশিতে অপুর সারা গা কেমন করে,—ভাই, আমাদের বাড়ীতে একজন খেতে যায়, সে আজ দেখলাম ঢোলক বাজাচ্চে—তুমি কাল থেকে যেও, আমি এসে ডেকে নিয়ে যাবো—ঢোলকওয়ালা না হয় তুমি যে বাড়ীতে আগে খেতে, সেখানে খাবে—

খানিকক্ষণ দু'জনে এদিক-ওদিক বেড়াইবার পর অজয় বলে—আমি যাই ভাই, শেষ সিনে আমার গান আছে—আমার পার্ট কেমন লাগ্‌চে তোমার ?

শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙিলে অপু বাড়ী আসে। পথে আসিতে আসিতে যে যেখানে কথা বলে, তাহার মনে হয় যাত্রার একৃটো হইতেছে। বাড়িতে তাহার দিদি বলে—ও অপু, কেমন যাত্রা শুন্‌লি ?...অপুব মনে হয়, গভীর জনশূন্য বনের মধ্যে রাজকুমারী ইন্দুলেখা কি বলিয়া উঠিল। কিসের যে ঘোর তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! মহা খুশির সহিত সে বলে—কাল থেকে, অজয় যে সেজেছিল মা, সে আমাদের বাড়ী খেতে আসবে—

তাহার মা বলে—দুজন খাবে ?—দুজনকে কোত্থেকে—

অপু বলে,—তা না, একজন তো চ'লে যাবে, শুধু অজয় খাবে—

দুর্গা বলে—কেমন যাত্রা রে অপু?···এমন কক্ষনো দেখিনি—কেমন গান কল্লে যখন সেই রাজকন্যে ম'রে গেল! অপুর তো রাত্রে ঘুমের ঘোরে চারিধারে যেন বেহালার সঙ্গীত হয়। ভোর হইলে একটু বেলায় তাহার ঘুম ভাঙে—শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছে, তৃপ্তির সঙ্গে ঘুম হয় নাই, সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোয় চোখ যেন ছুঁচ বিঁধে। চোখে জল দিলে জ্বালা করে কিন্তু তাহার কানে একটা বেহালা-ঢোল-মন্দিরার ঐকতান বাজ্‌না তখনও যেন বাজিতেছে—তখনও যেন সে যাত্রার আসরে বসিয়া আছে।

ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারাণী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গীতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো। কাল যে ইন্দুলেখা সাজিয়াছিল তাহাকে মানাইয়াছিল মন্দ নয় বটে, কিন্তু তাহার মনে মনে রাজকন্যা ইন্দুলেখার যে প্রতিমা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাহার দিদিকে লইয়া, ঐ রকম গায়ের রং, অমনি বড় বড় চোখ, অমনি সুন্দর মুখ, অমনি সুন্দর চুল!

ইন্দুলেখা তাহার সকল করুণা, স্নেহ, মাধুরী লইয়া কোন্ সেকালের দেশের অতীত জীবনের পরে আবার তাহার দিদি হইয়া যেন ফিরিয়া আসিয়াছে—কাল তাই ইন্দুলেখার কথার ভঙ্গীতে, প্রতি পদক্ষেপে দিদিই যেন ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। যখন গভীর বনে সে শতস্নেহে ছোট ভাইকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে খাওয়াইবার জন্য ফল আহরণ করিতে গিয়া একা নির্জন বনের মধ্যে হারাইয়া গেল—সেই একদিনের মাকাল ফলের ঘটনাই অপুর ক্রমাগত মনে হইতেছিল।

দুপুরবেলা খাইবার জন্য অপু গিয়া অজয়কে ডাকিয়া আনিল। তাহার মা দুজনকে এক জায়গায় খাইতে দিয়া অজয়ের পরিচয় লইতে বসিল। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, তাহার কেহ নাই, এক মাসী তাহাকে মানুষ করিয়াছিল, সেও মরিয়া গিয়াছে। আজ বছর খানেক যাত্রার দলে কাজ করিতেছে। সর্বজয়ার ছেলেটির উপর খুব স্নেহ হইল—বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে খাওয়াইল। খাওয়াইবার উপকরণ বেশী কিছু নাই, তবু ছেলেটি খুব খুশির সঙ্গে খাইল। তাহার পর দুর্গা মাকে চুপি চুপি বলিল—মা ওকে সেই বালকের গানটা গাইতে বল না—সেই 'কোথা ছেড়ে গেলি এ বন-কান্তারে প্রাণপ্রিয় প্রাণ-সাথীরে'—

অজয় গলা ছাড়িয়া গানটি গাহিল—অপু মুগ্ধ হইয়া গেল, সর্বজয়ার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল। আহা এমন ছেলের মা নাই! তাহার পর সে আরও

গান গাহিল। সর্বজয়া বলিল—বিকেলে মুড়ি ভাজ্‌বো, তখন এসে অবিশ্যি করে মুড়ি খেয়ে যেও—লজ্জা করো না যেন—যখন খুশি আস্‌বে, আপনার বাড়ীর মত, বুঝ্‌লে ?

অপু তাহাকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারের দিকে বেড়াইতে গেল। সেখানে অজয় বলিল, ভাই তোমার তো গলা বড় মিষ্টি—একটা গান গাও না ?··· অপুর খুব ইচ্ছা হইল ইহার কাছে গান গাহিয়া সে বাহাদুরী লইবে। কিন্তু বড় ভয় করে—এ একজন যাত্রাদলের ছেলে—এর কাছে তার গান গাওয়া ? নদীর ধারে বড শিমুলগাছটার তলায় চলা-চল্‌তির পথ হইতে কিছুদূরে বাঁশ-ঝোপের আডালে দুজনে বসে। অপু অনেক কষ্টে লজ্জা কাটাইয়া একটা গান ধরে—শ্রীচরণে ভার একবার গা তোল হে অনন্ত—দাশু রায়ের পাঁচালীর গান, বাবার মুখে শুনিয়া সে লিখিয়া লইয়াছে। অজয় অবাক্ হইয়া যায়, বলে—এমন গলা ভাই ? তা তুমি গান গাও না কেন ?···আর একটা গাও। অপু উৎসাহিত হইয়া আর একটা ধরে—খেয়ার আশে বসে রে মন ডুব্‌ল বেলা খেয়ার ধারে। তাহার দিদি কোথা হইতে শিখিয়া আসিয়া গাহিত, সুরটা বড় ভাল লাগায় অপু তাহার কাছ হইতে শিখিয়াছিল—বাড়ীতে কেহ না থাকিলে মাঝে মাঝে গানটা তাহারা দুজনে গাহিয়া থাকে।

গান শেষ হইলে অজয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল—এমন গলা থাকলে যে কোনো দলে ঢুক্‌লে পনেরো টাকা করে মাইনে সেধে দেবে বলচি তোমায়—এর ওপর একটু যদি শেখো !

বাড়ীতে কেহ না থাকিলে দিদির সাম্‌নে গাহিয়া অপু কতদিন দিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—হ্যাঁ দিদি, আমার গলা আছে ? গান হবে ?···দিদি তাহাকে বাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিদির আশ্বাস যতই আশাপ্রদ হৌক, আজ একজন সঙ্গীতদক্ষ খাস যাত্রার দলের নামকরা মেডেলওয়ালা গায়কের মুখে এ প্রশংসার কথা শুনিয়া আনন্দে অপু কি বলিয়া উত্তর করিবে ঠাওর করিতে পারিল না।

বলিল—তোমার ঐ গানটা আমায় শোনাও না ?—তারপর দুইজনে গলা মিলাইয়া সে গানটা গাহিল।

অনেকক্ষণ হইয়া গেল। নদী বাহিয়া ছপ্ ছপ্ করিয়া নৌকা চলিতেছে, নদীর পাড়ের নীচে জলের ধারে একজন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অজয় বলিল—কি খুঁজছে ভাই ! অপু বলিল—ব্যাঙাচি খুঁজচে, ছিপে মাছ ধরবে—তাহার পর বলিল—আচ্ছা ভাই, তুমি আমাদের এখানে থাকো না কেন ?···যেও না কোথাও, থাক্‌বে ?···

এমন চোখ, এমন মিষ্টি গলার সুর! তাহার উপর অপুর কাছে সে সেই রাজপুত্র অজয়। কোন্ বনে ফিরিতে ফিরিতে অসহায় ছন্নছাড়া রূপবান্ রাজার ছেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া ভাব হইয়া গিয়াছে—চিরজন্মের বন্ধু! আর তাহাকে কি করিয়া ছাড়া যায়!

অজয়ও অনেক মনের কথা বলিয়া ফেলিল। এমন সাথী তাহার আর জুটে নাই। সে প্রায় চল্লিশ টাকা জমাইয়াছে। আর একটু বড় হইলে সে এ-দল ছাডিয়া দিবে। অধিকারী বড মারে। সে আশুতোষ পালের দলে যাইবে—সেখানে খুব সুখ, রোজ রাত্রে লুচি। না খাইলে তিন আনা পয়সা খোরাকী দেয়। এ দল ছাড়িলে সে আবার অপুদের বাড়ী আসিবে ও সে সময় কিছুদিন থাকিবে। বৈকালের কিছু আগে অজয় বলিল—চল ভাই, আজ আবার এখুনি আসর হবে, সকাল সকাল ফিরি। যদি 'পরশুরামের দর্প-সংহার' হয় তবে আমি নিয়তি সাজবো, দেখো কেমন একটা গান আছে—

আরও তিন দিন যাত্রা হইল। গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথেঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়। গ্রামের মেয়েরা দলের ছেলেদের বাড়ী ডাকাইয়া যাহার যে গান ভাল লাগিয়াছে তাহার মুখে সে গান ফরমায়েস করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অপু আরও তিন চারটা গান শিখিয়া ফেলিল। একদিন সে যাত্রার দলের বাসায় অজয়ের সঙ্গে গিয়াছে, সেখানে তাহাকে দলের সকলে মিলিয়া ধরিল, তাহাকে একটা গান গাহিতে হইবে। সেখানে সকলে অজয়ের মুখে শুনিয়াছে সে খুব ভাল গান গাহিতে পারে। অপু বহু সাধ্যসাধনার পর নিজের বিদ্যা ভাল করিয়া জাহির করিবার খাতিরে একটা গাহিয়া ফেলিল। সকলে তাহাকে ধরিয়া অধিকারীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানেও তাহাকে একটা গাহিতে হইল। অধিকারী কালো রংএর ভুঁড়িওয়ালা লোক, আসরে জুডি সাজিয়া গান করে। গান শুনিয়া বলিল—এস না খোকা, দলে আস্‌বে? অপুর বুকখানা আনন্দে ও গর্বে দশহাত হইল। আরও সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরে—এস, চলো তোমাকে আমাদের দলে নিয়ে যাই। অপুর তো ইচ্ছা সে এখনি যায়। যাত্রার দলে কাজ করা যে মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেকথা এতদিন সে কেন জানিত না, ইহাই তো আশ্চর্যের বিষয়! সে গোপনে অজয়কে বলিল, আচ্ছা ভাই, এখন যদি আমি দলে যাই, আমাকে কি সাজতে দেবে? অজয় বলিল—এখন এই সখী টখী, কি বালকের পার্ট এই রকম, তারপর ভাল ক'রে শিখলে—

অপু সখী সাজিতে চায় না—জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া

তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য। অজয় তাহাকে চুপি চুপি কষ্টি-পাথরের-রং একটা ছোকরাকে দেখাইয়া কহিল, এই যে দেখচো, এর নাম বিষ্টু তেলি। আমার সঙ্গে মোটে বনে না, আমার নিজের পয়সার দেশালাই কিনে বালিশের তলায় রেখে শুই, দেশলাই উঠিয়ে নেয় চুরুট খেতে, আর দেয় না। আমি বলি, আমার রাত্রে ভয় করে, দেশলাইটা দাও। অন্ধকারে মন ছম্ ছম্ করে, তাই সেদিন চেয়েছিলাম ব'লে এমনি থাব্ড়া একটা মেরেচে! নাচে ভালো বলে অধিকারী বড খাতির করে, কিছু বলবারও যো নেই—

দিনপাঁচেক পরে যাত্রা দলের গাওনা শেষ হইয়া গেলে তাহারা রওনা হইল। অজয় বাড়ীর ছেলের মত যখন তখন আসিত যাইত, এই কয় দিনে সে যেন অপুরই আর এক ভাই হইয়া পড়িয়াছিল। অপুরই বয়সী ছোট ছেলে, সংসারে কেহ নাই শুনিয়া সর্বজয়া তাহাকে এ কয়দিন অপুর মত যত্ন করিয়াছে। দুর্গাও তাহাকে আপন ভাইয়ের চোখে দেখিয়াছে—তাহার কাছে গান শিখিয়া লইয়াছে, কত গল্প শুনাইয়াছে, তাহার পিসিমার কথা বলিয়াছে, তিনজনে মিলিয়া উঠানে বড ঘর আঁকিয়া গঙ্গা যমুনা খেলিয়াছে, খাইবার সময় জোর করিয়া বেশী খাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাত্রাদলে থাকে, কে কোথায় ছাখে, কোথায় শোয়, কি খায়, 'আহা' বলিবার কেহ নাই; গৃহ-সংসারের যে স্নেহস্পর্শ বোধ হয় জন্মাবধিই তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, অপ্রত্যাশিতভাবে আজ তাহার স্বাদ লাভ করিয়া লোভীর মত সে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না।

যাইবার সময় সে হঠাৎ পুঁটুলি খুলিয়া কষ্টে সঞ্চিত পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া সর্বজয়ার হাতে দিতে গেল। একটু লজ্জার সুরে বলিল—এই পাঁচটা টাকা দিয়ে দিদির বিয়ের সময় একখানা ভাল কাপড—

সর্বজয়া বলিল—না বাবা, না—তুমি মুখে বললে এই খুব হোল, টাকা দিতে হবে না, তোমার এখন টাকার কত দরকার—বিয়ে-থাওয়া ক'রে সংসারী হতে হবে—

তবু সে কিছুতেই ছাড়ে না। অনেক বুঝাইয়া তবে তাহাকে নিরস্ত করিতে হইল।

তাহার পর সকলে উহাদের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে খানিকটা পথ পর্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল। যাইবার সময় সে বার বার বলিয়া গেল দিদির বিয়ের সময় অবশ্য করিয়া যেন তাহাকে পত্র দেওয়া হয়।

গাবতলার ছায়ায় ছায়ায় তাহার সুকুমার বালকমূর্তি ভাঁটশেওড়া ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেলে হঠাৎ সর্বজয়ায় মনে লইল, বড্ড ছেলেমানুষ, আহা এই বয়সে বেরিয়েছে নিজের রোজগার নিজে করতে। অপুর আমার যদি ঐরকম হোত—মাগো!···

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম প্রথম যখন হরিহর কাশী হইতে আসিল তখন সকলে বলিত, তাহার ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, এ অঞ্চলে ওরকম বিদ্যা শিখিয়া কেহ আসে নাই। তাহার বিদ্যার সুখ্যাতি সকলের মুখে ছিল, সকলে বলিত সে এইবার একটা কিছু করিবে। সর্বজয়াও ভাবিত, শীঘ্রই উহারা তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া একটা ভাল চাকরী দিবে (কাহারা চাকরী দেয় সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্র-বক্ষের মত অস্পষ্ট)! কিন্তু মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া বহুকাল চলিয়া গেল, অর্ধরাত্রির মাথায় কোনো জরির পোশাক-পরা ঘোড়সওয়ার সভাপণ্ডিত পদের নিয়োগ-পত্র লইয়া ছুটিয়া আসিল না, বা আরব্য উপন্যাসের দৈত্য কোন মণি-খচিত মায়াপ্রাসাদ আকাশ বাহিয়া উড়াইয়া আনিয়া তাহাদের ভাঙা ঘরে বসাইয়া দিয়া গেল না, বরং সে ঘরের পোকা-কাটা কবাট দিন দিন আরও জীর্ণ হইতে চলিল, কড়িকাঠ আরও ঝুলিয়া পড়িতে চাহিল; আগে যাও বা ছিল তাও আর সব থাকিতেছে না, তবু সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই। হরিহরও বিদেশ হইতে আসিয়া প্রতিবারই একটা একটা আশার কথা এমনভাবে বলে, যেন সব ঠিক, অল্পমাত্র বিলম্ব আছে, অবস্থা ফিরিল বলিয়া। কিন্তু হয় কৈ?···

জীবন বড় মধুময় শুধু এইজন্য যে, মাধুর্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। হোক্ না স্বপ্ন মিথ্যা, কল্পনা বাস্তবতার লেশশূন্য, নাই বা থাকিল সব সময় তাহাদের পিছনে সার্থকতা; তাহারাই যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহারা আসুক, জীবনে অক্ষয় হোক তাহাদের আসন; তুচ্ছ সার্থকতা, তুচ্ছ লাভ।

হরিহর বাড়ী হইতে গিয়াছে প্রায় দুই তিন মাস। টাকাকড়ি খরচপত্র অনেক দিন পাঠায় নাই। দুর্গা অসুখে ভুগিতেছে একটু বেশী, খায় দায় অসুখ হয়, দু'দিন একটু ভাল থাকে, হঠাৎ একদিন আবার হয়।

সর্বজয়া মেয়ের বিবাহের জন্য স্বামীকে প্রায়ই তাগাদা দেয়। স্বামীকে

দিয়া দুই-তিন খানা পত্র নীরেন্দ্রের পিতা রাজ্যেশ্বর বাবুর নিকট লিখিয়াছে। সেদিকের আশা সে এখনও ছাড়ে নাই। হরিহর বলে, তুমি কি খেপ্‌লে না কি? ওসকল বড় লোকের কাণ্ড, রাজ্যেশ্বর কাকা কি আর আমাদের পুঁছবেন? তবুও সর্বজয়া ছাড়ে না; বলে, লেখো না, আর একখানা লিখেই ছ্যাখো না—নীরেন ত পছন্দই ক'রে গিয়েছে।

দুই এক মাস চলিয়া যায়, বিশেষ কোন উত্তর আসে না, আবার সে স্বামীকে পত্র লিখিবার জন্য তাগাদা দিতে সুরু করে।

এবার হরিহর যখন বিদেশে যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে এইবার সে এখান হইতে উঠিয়া অন্যত্র বাস করিবার একটা কিছু ঠিক করিয়া আসিবেই।

পাড়ার একপাশে নিকানো পুছানো ছোট্ট খড়ের ঘর দু' তিন খানা। গোয়ালে হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী বাঁধা, মাচা ভরা বিচালী, গোলা ভরা ধান! মাঠের ধারের মটর ক্ষেতের তাজা, সবুজ গন্ধ খোলা হাওয়ায় উঠান দিয়া বাহিয়া যায়। পাখী ডাকে—নীলকণ্ঠ, বাবুই, শ্যামা। অপু সকালে উঠিয়া বড় মাটির ভাঁড়ে-দোয়া একপাত্র তাজা সফেন কালো গাইএর দুধের সঙ্গে গরম মুড়ির ফলার খাইয়া পড়িতে বসে। দুর্গা ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। সকলেই জানে, সকলেই খাতির করে, আসিয়া পায়ের ধূলা লয়। গরীব বলিয়া কেহ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে না।

…শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই, সর্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে। তাহার মনে হয়, এতকাল পরে সত্য-সত্যই একটা কিছু লাগিয়া যাইবে। মনের মধ্যে কে যেন বলে।

কেন এতদিন হয় নাই? কেন এতকাল পরে? সেই ছেলেবেলাকার দিনে শ্যামতলায় সজনেতলায় ঘুরিবার সময় হইতে সেঁজুতির আলপনা আঁকার মন্ত্রের সঙ্গে এ সাধ যে তাহার মনে জড়াইয়া আছে, লক্ষ্মীর আল্‌তা-পরা পায়ের দাগ আঁকা আঙিনায় শ্বশুর বাড়ীর ঘর-সংসার পাতাইবে। এরকম ভাঙা পুরানো কোঠা বাঁশবন কে চাহিয়াছিল?

দুর্গা একটা ছোট মানকচু কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্নাঘরে ধর্ণা দিয়া বসিয়া থাকে। তাহার মা বলে, তোর হোল কি দুগ্‌গা? আজ কি ব'লে ভাত খাবি? কাল সন্ধ্যে বেলাও তো জ্বর এসেছে! দুর্গা বলে, তা হোক মা, সে জ্বর বুঝি—একটু তো মোটে শীত করলো?—তুমি এই মানকচুটা ভাতে দিয়ে দুটো ভাত—। তাহার মা বলে—যাঃ, অসুখ হোয়ে তোর খাই খাই বড্ড বেড়েছে। আজ কাল যদি ভাল থাকিস্ তো পরশু বরং দেবো।

অনেক কাকুতি মিনতির পর না পারিয়া শেষে মানকচু তুলিয়া রাখিয়া

দেয়। খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আপন মনে বলে, আজ খুব ভাল আছি, আজ আর জ্বর আসবে না আমার—ওবেলা দুখানা রুটি আর আলুভাজা খাবো। একটু পরে হাই ওঠে, সে জানে ইহা জ্বর আসার পূর্বলক্ষণ! তবুও সে মনকে বোঝায়, হাই উঠুক, এমনি তো হাই ওঠে, জ্বর আর হবে না। ক্রমে শীত করে, রৌদ্রে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হয়। সে রৌদ্রে না গিয়া মনকে প্রবোধ দেয় যে, শীত বোধ হওয়া একটা স্বাভাবিক শারীরিক ব্যাপার, জ্বর আসার সহিত ইহার সম্পর্ক কি?

কিন্তু কোনো প্রবোধ খাটে না। রৌদ্র না পড়িতে পড়িতে জ্বর আসে, সে লুকাইয়া গিয়া রৌদ্রে বসে, পাছে মা টের পায়। তাহার মন হু-হু করে, ভাবে —জ্বর জ্বর ভেবে এরকম হচ্চে, সত্যি সত্যি জ্বর হয় নি—

রাঙা রোদ শেওলাধরা ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে গিয়া পড়ে। বৈকালের ছায়া ঘন হয়। দুর্গার মনে হয় অন্যমনস্ক হইয়া থাকিলে জ্বর চলিয়া যাইবে। অপুকে বলে, বোস দিকি একটু আমার কাছে, আয় গল্প করি।

একদিন আর-বছর ঘন বর্ষার রাতে সে ও অপু মতলব আঁটিয়া শেষরাত্রে পিছনে সেজঠাকুরুণদের বাগানে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল, হঠাৎ দুর্গার পায়ে পট্ করিয়া এক কাঁটা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় পিছু হটিয়া বাঁ পা খানা যেখানে রাখিল, সেখানে বাঁ পায়েও পট্ করিয়া আর একটা!—সকাল বেলা দেখা গেল, পাছে রাত্রে উহারা কেহ তাল কুড়াইয়া লয়, এজন্য সতু তালতলার পথে সোজা করিয়া সারি সারি বেলকাঁটা পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

আর একদিন যা আশ্চর্য ব্যাপার!

কোথা লইতে সেদিন এক বুড়ো বাঙাল মুসলমান একটা বড় রং-চং করা কাচ বসানো টিনের বাক্স লইয়া খেলা দেখাইতে আসে। ওপাড়ায় জীবন চৌধুরীর উঠানে সে খেলা দেখাইতেছিল। দুর্গা পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পয়সা ছিল না। আর সকলে এক এক পয়সা দিয়া বাক্সের গায়ে একটা চোঙের মধ্যে চোখ দিয়া সব দেখিতেছিল।

বুড়ো মুসলমানটি বাক্স বাজাইয়া সুর করিয়া বলিতেছিল, তাজ বিবিকা রোজা দেখো, হাতী বাঘকা লড়াই দেখো! এক একজনের দেখা শেষ হইলে যেমন সে চোঙ হইতে চোখ সরাইয়া লইতেছিল অমনি দুর্গা তাহাকে মহা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কি দেখলি রে ওর মধ্যে? সব সত্যিকারের?

উঃ। সে কি অপূর্ব ব্যাপার দেখিয়াছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না! কি-সে সব!

সকলের দেখা একে একে হইয়া গেল। দুর্গা চলিয়া যাইতেছিল, বুড়ো মুসলমানটি বলিল, দেখ্‌বে না খুকী ? দুর্গা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, নাঃ—আমার কাছে পয়সা নেই।

লোকটি বলিল, এসো এসো খুকী, দেখে যাও—পয়সা লাগবে না—

দুর্গার একটু লজ্জা হইয়াছিল, মুখে বলিল, নাঃ—কিন্তু আগ্রহে কৌতূহলে তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া উঠিল।

লোকটি বলিল—এসো এসো, দোষ কি ?—এসো, ছাখো—

দুর্গা উজ্জ্বলমুখে পায়ে পায়ে বাক্সের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল বটে, তবুও সাহস করিয়া মুখটা চোঙের মধ্যে দিতে পারে নাই। লোকটি বলিল, এই নলটার মধ্যে দিয়ে তাকাও দিকি খুকী ?

দুর্গা মাথার উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোন বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায় ? কত সাহেব, মেম, ঘর-বাড়ী, যুদ্ধ, সে সব কথা বলিতে পারে না। কি জিনিসই সে দেখিয়াছিল !

অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনও দিন আসে নাই।

গল্প ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে দুর্গা জ্বরের ধমকে আর বসিতে পারে না, উঠিয়া ঘরের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া শোয়।

আজকাল বাবা বাড়ী নাই, অপুকে আর খুঁজিয়া মেলা দায়। বই দপ্তরে ঘুণ ধরিবার যোগাড় হইয়াছে। সকালবেলা সেই যে সে এক পুঁটুলি কড়ি লইয়া বাহির হয়, আর ফেরে একেবারে দুপুর ফুরিয়া গেলে খাইবার সময়। তাহার মা বকে—ছেলের না নিকুচি করেছে—তোমার লেখাপড়া একেবারে ছিকেয় উঠ্‌লো ? এবার বাড়ী এলে সব কথা ব'লে দেবো, দেখো এখন তুমি—

অপু ভয়ে ভয়ে দপ্তর লইয়া বসে। বইগুলা খুব চারিদিকে ছড়ায়। মাকে বলে, একটু খয়ের দাও মা, আমি দোয়াতের কালিতে দেবো—

পরে সে বসিয়া বসিয়া হাতের লেখা লিখিয়া রৌদ্রে দেয়। শুকাইয়া গেলে খয়ের-ভিজানো কালি, চক্‌ চক্‌ করে—অপু মহা খুশির সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে—ভাবে—আর একটু খয়ের দেবো কাল থেকে—ওঃ কী চক্‌ চক্‌ করছে ছাখো একবার ! পানের বাটা হইতে মাকে লুকাইয়া বড় একখণ্ড খয়ের লইয়া কালির দোয়াতে দেয়। পরে লেখা লিখিয়া শুকাইতে দিয়া কতটা আজ জল জল্‌ করে দেখিবার জন্য কৌতূহলের সহিত সেদিকে চাহিয়া থাকে মনে হয় —আচ্ছা, যদি আর একটু দি ?

একদিন মা'র কাছে ধরা পড়িয়া যায়। মা বলে, ছেলের লেখার সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল ড্যালা ড্যালা খয়েরের রোজ দরকার—রেখে দে খয়ের—

ধরা পড়িয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া বলে, খয়ের নৈলে কালি হয় বুঝি?—আমি বুঝি এমনি এমনি—

—না, খয়ের নৈলে কালি হবে কেন? এইসব রাজ্যির ছেলে আর লেখাপড়া কচ্চে না—তাদের সের সের খয়ের রোজ যোগানো রয়েচে যে দোকানে! যাঃ—

অপু বসিয়া বসিয়া একখানা খাতায় নাটক লেখে। বহু লিখিয়া খাতাখানা সে প্রায় ভরাইয়া ফেলিয়াছে, মন্ত্রির বিশ্বাসঘাতকতায় রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বনে যান, রাজপুত্র নীলাম্বর ও রাজকুমারী অম্বা বনের মধ্যে দস্যুর হাতে পড়েন, ঘোর যুদ্ধ হয়, পরে রাজকুমারীর মৃতদেহ নদীতীরে দেখা যায়। নাটকে সতু বলিয়া একটি জটিল চরিত্র সৃষ্ট হইবার অল্প পরেই বিশেষ কোনো মারাত্মক দোষের বর্ণনা না থাকা সত্ত্বেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। নাটকের শেষদিকে রাজপুত্রী অম্বার নারদের বরে পুনর্জীবন প্রাপ্তি বা বিশ্বস্ত সেনাপতি জীবনকেতুর সহিত তাঁহার বিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় যাঁহারা বলেন যে, গত বৈশাখ মাসে দেখা যাত্রার পালা হইতে এক নামগুলি ছাড়া মূলতঃ কোন অংশই পৃথক নহে, বা সেই হইতেই ইহা হুবহু লওয়া, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অতীতের কোনো এক নীরব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে নির্জন বাসকক্ষের স্তিমিতদীপশয্যায় এক প্রাচীন কবির নীলমেঘের মত দৃশ্যমান সদূর-নিনাদিত দূর বনভূমির স্বপ্ন যদি কালিদাসকে মুক্ত মেঘের বর্ণনে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, তাহা হইলেই বা কি?—সে বিস্তৃত শুভ-যামিনীর বন্দনা মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে হাজার বৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছে।

আগুন দিয়াই আগুন জ্বালানো যায়, ছাইয়ের ঢিপিতে মশাল গুঁজিয়া কে কোথায় মশাল জ্বালে?

দপ্তরে একখানা বই আছে,—বইখানার নাম চরিতমালা, লেখা আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পুরাতন বই, তাহার বাবার নানা যায়গা হইতে ছেলের জন্য বই সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, কোথা হইতে একখানা আনিয়াছিল, অপু মাঝে মাঝে খানিকটা পড়িয়া থাকে। বইখানাতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ঐ রকম হইতে চায়। হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চামড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কসিত, মেষপালক ডুবাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে

মগ্ন থাকিত—সে ঐ রকম হইতে চায়। 'বীজগণিত' কি জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রঙ্কোর মত। সে এই হাতে লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভঙ্করী এসব তাহার ভাল লাগে না। ঐ রকম নির্জন গাছ-তলায়, বনের ছায়ায়, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে 'ভূচিত্র' (জিনিসটা কি?) পাতিয়া পড়িবে, বড বড় বই পডিবে, পণ্ডিত হইবে ঐরকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সে সব জিনিস? কোথায় বা 'ভূচিত্র', কোথায় বা 'বীজগণিত', কোথায় বা লাটিন ব্যাকরণ?—এখানে শুধু কডি কষার আর্যা আর তৃতীয় নাম্‌তা।

মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পডিতে চায়, তাহা এখানে কই?

কয়দিন খুব বর্ষা চলিতেছে। অন্নদা রায়ের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যাবেলায় মজলিস বসে। সেদিন সেখানে নীলকুঠীর ভুতের গল্প হইতে স্বরু হইয়া পুরীর কোন্ মন্দিরের মাথায় পাঁচ মণ ভারী চুম্বক পাথর বসানো আছে, যাহার আকর্ষণের বলে নিকটবর্তী সমুদ্রগামী জাহাজ প্রায়ই পথভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া তীরবর্তী মগ্ন শৈলে লাগিয়া ভাঙিয়া যায় প্রভৃতি—আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত নানা আজগুবি কাহিনীর বর্ণনা চলিতেছিল। শ্রোতাদের কাহারও উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, এরকম আজগুবি গল্প ছাড়িয়া কাহারও বাড়ী যাইতে মন সরিতেছিল না। ভূগোল হইতে শীঘ্রই গল্পের ধারা আসিয়া জ্যোতিষে পৌছিল। দীনু চৌধুরী বলিতেছিলেন—ভৃগু সংহিতার মত অমন বই তো আর নেই। তুমি যাও, শুধু জন্মরাশিটা গিয়ে দিয়ে দাও, তোমার বাবার নাম, কোন্ কুলে জন্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ সব ব'লে দেবে—তুমি মিলিয়ে নাও—গ্রহ ও রাশিচক্রের যত রকম ইচ্ছে হয়—তা সব দেওয়া আছে কি না! মায় তোমার পূর্বজন্ম পর্যন্ত—

সকলে সাগ্রহে শুনিতেছিলেন, কিন্তু রামময় হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—না ওঠা যাক্, এর পর আর যাওয়া যাবে না—দেখচো না কাণ্ডখানা? একটা বড় ঝট্‌কা টট্‌কা না হলে বাঁচি, গতিক বড় খারাপ, চলো সব—

বৃষ্টির বিরাম নাই! একটু থামে, আবার অমনি জোরে আসে, বৃষ্টির ছাটে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া।

হরিহর মোটে পাঁচটা টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেই অনেক দিন হইয়া গেল—রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস ব'লে দেখতে পাস্‌নে, ডাকবাক্সটার কাছে ব'সে থাকবি—পিওন যেমন আস্‌বে আর অম্‌নি জিগ্যেস করবি—

অপু বলে—বা, আমি বুঝি ব'সে থাকি নে? কালও তো এলো, পুঁটিদের চিঠি, আমাদের খবরের কাগজ দিয়ে গেল—জিগ্যেস করে এস দিকি পুঁটিকে? কাল তবে আমাদের খবরের কাগজ কি ক'রে এল? আমি থাকিনে বৈ কি!

বর্ষা রীতিমত নামিয়াছে। অপু মায়ের কথায় ঠায় রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে পিওনের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। সাধু কর্মকারের ঘরের চালা হইতে গোলা পায়রার দল ভিজিতে ভিজিতে ঝটাপট করিয়া উড়িতে উড়িতে রায়েদের পশ্চিমের ঘরের কার্নিসে আসিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া ছ্যাখে। আকাশের ডাককে সে বড় ভয় করে। বিদ্যুৎ চম্‌কাইলে মনে মনে ভাবে—দেবতা কি রকম নলপাচ্চে দেখচো, এইবার ঠিক ডাকবে—পরে সে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকে।

বাড়ী ফিরিয়া ছ্যাখে মা ও দিদি সারা বিকাল ভিজিতে ভিজিতে রাশীকৃত কচুর শাক তুলিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় জড়ো করিয়াছে।

অপু বলে—কোথেকে আন্‌লে মা? উঃ কত!

দুর্গা হাসিয়া বলে—কত—! উ-উঃ! তোমার তো ব'সে ব'সে বড় সুবিধে। ওই ওদের ডোবার জামতলা থেকে—এই এতটা এক হাঁটু জল। যাও দিকি?

সকালে ঘাটে গিয়া নাপিত বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়। সর্বজয়া কাপড়ের ভিতর হইতে কাঁসার একখানা রেকাবী বাহির করিয়া বলে, এই ছ্যাখো জিনিসখানা, খুব ভালো—ভরণ না, কিছু না, ফুল কাঁসা। তুমি বলেছিলে, তাই বলি যাই নিয়ে—এ সে জিনিস নয়, এ আমার বিয়ের দান—এখন এ জিনিস আর মেলে না—

অনেক দরদস্তুরের পর নাপিত-বৌ নগদ একটি আধুলি আঁচল হইতে খুলিয়া দিয়া রেকাবিখানা কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লয়। কাউকে যেন না প্রকাশ করে—সর্বজয়া এ অনুরোধ বার বার করে।

দুই একদিনে ঘনীভূত বর্ষা নামিল। হু-হু পূবে হাওয়া, খানাডোবা সব থৈ-থৈ করিতেছে—পথে ঘাটে একহাঁটু জল, দিন রাত সোঁ সোঁ, বাঁশবনে ঝড় বাধে—বাঁশের মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে—আকাশের কোথাও ফাঁক

নাই—মাঝে মাঝে আগেকার চেয়েও অন্ধকার করিয়া আসে—কালো কালো মেঘের রাশ হু-হু উড়িয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন্ কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থল-আকাশ একেবারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্য-সৈন্য, বাহিনীর পর বাহিনী, অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী, অদৃশ্য রথী মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে—প্রজ্বলন্ত অত্যুগ্র দেববজ্র আগুন উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে বিশাল কৃষ্ণচমূর এদিক্-ওদিক্ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া ফাঁড়িয়া এই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছে—এই আবার কোথা হইতে রক্তবীজের বংশ করাল কৃষ্ণছায়ায় পৃথিবী অন্তরীক্ষ অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে।

মহাঝড়!

দিন রাত সোঁ-সোঁ শব্দ—নদীর জল বাড়ে—কত ঘরদোর কত জায়গায় যে পড়িয়া গেল!...নদী-নালা জলে ভাসিয়া গিয়াছে—গরু-বাছুর গাছের তলে, বাঁশবনে, বাড়ীর ছাঁচতলায় অঝোরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, পাখী-পাখালির শব্দ নাই কোনোদিকে! চার পাঁচদিন সমান ভাবে কাটিল—কেবল ঝড়ের শব্দ আর অবিশ্রান্ত ধারা বর্ষণ! অপু দাওয়ায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি ভিজা মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল—আমাদের বাঁশতলায় জল এসেছে দিদি, দেখবি? দুর্গা কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল—না উঠিয়াই বলিল—কতখানি জল এসেচে রে? অপু বলে, তোর জ্বর সারলে কাল দেখে আসিস। তেঁতুলতলার পথে হাঁটু জল! জিজ্ঞাসা করে—মা কোথায় রে?

ঘরে একটা দানা নেই—দুটোখানি বাসি চালভাজা মাত্র আছে। অপু কান্নাকাটি করে,—তা হবে না মা, খিদে পায় না বুঝি—আমি দুটি ভাত খাবো—হুঁ-উ—

তার মা বলিল, লক্ষ্মী মাণিক আমার—এ রকম কি করে! অনেক ক'রে চালভাজা মেখে দেবো এখন—রাঁধবো কেমন ক'রে, দেখচিস নে কি রকম সেঁওটা করেচে? উনুনের মধ্যে এক উনুন জল যে? পরে সে কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কি বাহির করিয়া হাসিমুখে দেখাইয়া বলে—এই ছাখো একটা কইমাছ, বাঁশতলায় কানে হেঁটে দেখি বেড়াচ্চে—বন্যের জল পেয়ে সব উঠে আসছে গাঙ থেকে—বরোজ পোতার ডোবা ভেসে নদীর সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়েচে কি না। তাই সব উঠে আসচে—

দুর্গা কাঁথা ফেলিয়া ওঠে—অবাক হইয়া যায়। বলে, দেখি মা মাছটা? হ্যা মা, কইমাছ বুঝি কানে হেঁটে বেড়ায়? আর আছে? অপু এখনি বৃষ্টিমাথায় ছুটিয়া যায় আর কি—অনেক কষ্টে তাহার মা তাহাকে থামায়।

দুর্গা বলে—একটু জ্বর সারলে কাল সকালে চল্ অপু, তুই আর আমি বাঁশবাগান থেকে মাছ নিয়ে আসবো এখন। পরে সে অবাক হইয়া ভাবে—বাঁশবাগানে মাছ। কি ক'রে এল? বাঃ তো!—মা কি আর ভাল ক'রে খুঁজেচে। খুঁজলে আরও সেখানে আছে—দেখতে পেলাম না কি রকম কইমাছ কানে হাঁটে—কাল সকালে দেখবো—সকালে জ্বর সেরে যাবে।

চারিদিকের বন-বাগান ঘিরিয়া সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যার মেঘে ত্রয়োদশীর অন্ধকারে চারিধার একাকার! দুর্গা যে বিছানা পাতিয়া শুইয়া আছে, তাহারই এক পাশে তাহার মা ও অপু বসে। সর্বজয়া ভাবে—আজ যদি এখখুনি একখানা পত্তর আসে নীরেন বাবাজীর? কি জানি, তা কি আর হ'তে পারে না? নীরেন তো পছন্দই ক'রে গিয়েছে—কি জানি কি হোল অদেষ্টে! নাঃ, সে সব কি আর আমার অদেষ্টে হবে? তুমিও যেমন! তা হোলে আর ভাবনা কি ছিল?

ওদিকে ভাইবোনে তুমুল তর্ক বাধিয়া যায়! অপু সরিয়া মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসে—ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেজায় শীত করে। হাসিয়া বলে—মা—কি? সেই—শামলঙ্কা বাট্‌না বাটে মাটিতে লুটায় কেশ?

দুর্গা বলে—ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েচেন দেশ—

অপু বলে—দূর—হ্যাঁ মা তাই? ততক্ষণে মা আমার ছেড়ে গিয়েছেন দেশ? কথাটা বলিয়াই সে দিদির অজ্ঞতায় হাসে।

সর্বজয়ার বুকে ছেলের অবোধ উল্লাসের হাসি শেলের মত বেঁধে। মনে মনে ভাবে—সাতটা নয়, পাঁচটা নয়—এই তো একটা ছেলে—কি অদেষ্ট যে ক'রে এসেছিলাম—তার মুখের আব্দার রাখতে পারিনে—ঘি না, লুচি না, সন্দেশ না—কি না শুধু দুটো ভাত—নিনক্যি! আবার ভাবে—এই ভাঙা ঘর, টানাটানির সংসার—অপু মানুষ হোলে আর এ দুঃখ থাকবে না—ভগবান তাকে মানুষ ক'রে তোলেন যেন।

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া গল্প করে, যখন প্রথম সে নিশ্চিন্দপুরে ঘর করিতে আসিয়াছিল, তখন এক বৎসর এই রকম অবিশ্রান্ত বর্ষায় নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে ঘাটের পথে মুখুয্যেবাগানের কাছে বড় বোঝাই নৌকো পর্যন্ত আসিয়াছিল।

অপু বলে—কত বড় নৌকো মা?

—মস্ত—ওই যে খোট্টাদের চুনের নৌকো, সাজিমাটির নৌকো মাঝে মাঝে আসে দেখচিস তো—অত বড়—

দুর্গা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে—মা তুমি চারগুচির বিনুনি কর্ত্তে জানো?

অনেক রাত্রে সর্বজয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায়, অপু ডাকিতেছে—মা, ওমা ওঠো—আমার গায়ে জল পড়চে—

সর্বজয়া উঠিয়া আলো জ্বালে—বাহিরে ভয়ানক বৃষ্টির শব্দ হইতেছে—ফুটা ছাদ দিয়া ঘরের সর্বত্র জল পড়িতেছে। সে বিছানা সরাইয়া পাতিয়া দেয়। দুর্গা অঘোর জ্বরে শুইয়া আছে—তাহার মা গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে তাহার গায়ের কাঁথা ভিজিয়া সপ সপ করিতেছে। ডাকিয়া বলে—দুর্গা—ও দুর্গা শুন্‌চিস্? একটু ওঠ দিকি? বিছানাটা সরিয়ে নি ও দুর্গা—শীগগির, একেবারে ভিজে গেল যে সব?

ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেও সর্বজয়ার ঘুম আসে না। অন্ধকার রাত—এই ঘন বর্ষা···তাহার মন ছম্ ছম্ করে—ভয় হয় একটা যেন কিছু ঘটিবে···কিছু ঘটিবে। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। ভাবে—সে মানুষেরই বা কি হোল? কোন পত্তরও আসে না—টাকা মরুক্‌গে যাক্। এরকম তো কোনবার হয় না? তাঁর শরীরটা ভাল আছে তো? মা সিদ্ধেশ্বরী, স-পাঁচ আনার ভোগ দেবো, ভাল খবর এনে দাও মা।

তার পরদিন সকালের দিকে সামান্য একটু বৃষ্টি থামিল। সর্বজয়া বাটির বাহির হইয়া দেখিল বাঁশবনের মধ্যের ছোট ডোবাটা জলে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। ঘাটের পথে নিবারণের মা ভিজিতে ভিজিতে কোথায় যাইতেছিল, সর্বজয়া ডাকিয়া বলিল—ও নিবারণের মা শোন্—পরে সলজ্জভাবে বলিল—সেই তুই একবার বলেছিলি না, বিন্দাবুনি চাদরের কথা তোর ছেলের জন্যে—তা নিবি?···

নিবারণের মা বলিল—আছে? দেয়া একটু ধরুক্, মোর ছেলেরে সঙ্গে ক'রে এখনি আস্‌বো এখন—নতুন আছে মা-ঠাক্‌রুণ, না পুরোনো?···

সর্বজয়া বলিল, তুই আয় না—এখুনি দেখ্‌বি? একটু পুরোনো কিন্তু সে কেউ গায়ে দেয়নি—ধোয়া তোলা আছে—পরে একটু থামিয়া বলিল—তোরা আজকাল চাল ভান্‌ছিস্ নে?

নিবারণের মা বলিল—এই বাদলায় কি ধান শুকোয় মা-ঠাক্‌রোণ?—খাবার ব'লে দুটোখানি রেখে দিইচি অম্‌নি—

সর্বজয়া বলিল—এক কাজ কর্ না—তাই গিয়ে আমার আধকাঠা খানেক আজ দিয়ে যাবি? একটু সরিয়া আসিয়া মিনতির সুরে বলিল—বিষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনবার লোক পাচ্ছি নে—টাকা নিয়ে বেড়াচ্ছি, তা কেউ যদি রাজি হয়—বড় মুস্কিলে পড়িচি মা।

নিবারণের মা স্বীকার হইয়া গেল,—বলিল—আস্‌বো এখন নিয়ে, কিন্তু সে

ভেটেল ধানের চালির ভাত কি আপনারা খেতে পারবেন মা-ঠাক্‌রোণ ?—বড্ড মোটা—

নিমছাল সিদ্ধ দুর্গা আর খাইতে পারে না। তাহার অসুখ একভাবেই আছে। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই। বলে—এক পয়সার বিস্কুট আনিয়ে দেবে মা, নোনতা, মুখে বেশ লাগে ?

সাবু তাই জোটে না, তার বিস্কুট !

বৈকালবেলা হইতে আবার ভয়ানক বৃষ্টি নামিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ও যেন বেশী করিয়া আসে—ঘোর বর্ষণমুখর নির্জন, জলে থৈ থৈ, হু হু পূবে হাওয়া বওয়া, মেঘ অন্ধকারে একাকার ভাদ্র-সন্ধ্যা ! আবার সেইরকম কালো কালো পেঁজা তুলোর মতো মেঘ উড়িয়া চলিয়াছে। বৃষ্টির শব্দে কান পাতা যায় না। দরজা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে বৃষ্টির ছাট্‌ হু হু করিয়া ঢোকে—ছেঁড়া পলে ছেঁড়া কাপড়-গোঁজা ভাঙা কবাটের আড়ালের সাধ্য কি যে ঝড়ের ভীম আক্রমণের মুখে দাঁড়ায়।

বেশী রাত্রে সকলে ঘুমাইলে বেশী বৃষ্টি নামিল। সর্বজয়ার ঘুম আসে না—সে বিছানায় উঠিয়া বসে। বাহিরে শুধু একটানা হুস্‌ হুস্‌ জলের শব্দ; ক্রুদ্ধ দৈত্যের মতো গর্জমান একটানা গোঁ গোঁ রবে ঝড়ের দমকা বাড়ীতে বাধিতেছে ! জীর্ণ কোঠাখানা এক একবারের দমকায় যেন থর থর করিয়া কাঁপে, ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া যায়—গ্রামের একধারে বাঁশবনের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া নিঃসহায় !—মনে মনে বলে—ঠাকুর, আমি মরি তাতে খেদ নেই—এদের কি করি ? এই রাত্তিরে যাই বা কোথায় ? মনে মনে বসিয়া বসিয়া ভাবে—আচ্ছা যদি কোঠা পড়ে, তবে দালানের দেওয়ালটা বোধ হয় আগে পড়বে—যেমন শব্দ হবে অমনি পান্‌চালার দোর দিয়ে এদের টেনে বার ক'রে নেবো—

সে যেন আর বসিয়া থাকিতে পারে না—কয়দিন সে ওলশাক কচুশাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছে—নিজে উপবাসের পর উপবাস দিয়া ছেলে-মেয়েকে যাহা কিছু সামান্য খাদ্য ছিল খাওয়াইতেছে—শরীর ভাবনায় অনাহারে দুর্বল, মাথার মধ্যে কেমন করে।

ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ, অনেক রাত্রে ঝড় বাড়িল। বাহিরে কি ঝটকা আসিল। উপায় !. একবার বড় একটা দমকায় ভয় পাইয়া সে ঝড়ের গতিক বুঝিবার জন্য সন্তর্পণে দালানের দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে মুখ বাড়াইল—বৃষ্টির ছাটে কাপড় চুল সব ভিজিয়া গেল—হু হু একটা হাওয়ার শব্দে বৃষ্টিপতনের ঝড়ের শব্দ ঢাকিয়া গিয়াছে—বাহিরে কিছু দেখা যায় না—

অন্ধকারে মেঘে আকাশে-বাতাসে গাছপালায় সব একাকার! ঝড়বৃষ্টির শব্দে আর কিছু শোনা যায় না।

এই হিংস্র অন্ধকার ও ক্রুর ঝটিকাময়ী রজনীর আত্মা যেন প্রলয়দেবের দূতরূপে ভীম ভৈরব বেগে সৃষ্টি গ্রাস করিতে ছুটিয়া আসিতেছে—অন্ধকারে, রাত্রে, গাছপালায়, আকাশে, মাটিতে তাহার গতিবেগ বাধিয়া শব্দ উঠিতেছে—স্থ-ই-শ—স্থ-উ-উ-ইশ্—স্থ-উ-উ-উ-ইশ্—এই শব্দের প্রথমাংশের দিকে বিশ্ব-গ্রাসী দূতটা যেন পিছু হটিয়া বলসঞ্চয় করিতেছে—স্থ-উ-উ এবং শেষের অংশটায় পৃথিবীর উচ্চ নীচ তাবৎ বায়ুস্তর আলোড়ন, মন্থন করিয়া বায়ুস্তরে বিশাল তুফান তুলিয়া তাহার সমস্ত আসুরিকতার বলে সর্বজয়াদের জীর্ণ কোঠাটার পিছনে ধাক্কা দিতেছে ই-ই-শ! কোঠা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, আর থাকে না। ইহার মধ্যে যেন কোন অধীরতা, বিশৃঙ্খলতা, ভ্রমভ্রান্তি নাই—যেন দৃঢ়, অভ্যস্ত, প্রণালীবদ্ধ ভাবের কর্তব্যকার্য। বিশ্বটাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভার যে লইয়াছে, যুগে যুগে এরকম কত হাস্যমুখী সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করিয়া অনন্ত আকাশের অন্ধকারে তারাবাজির মত ছড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে যে মহাশক্তিমান ধ্বংসদূত—এ তার অভ্যস্ত কার্য এতে তার অধীরতা উন্মত্ততা সাজে না।—

আতঙ্কে সর্বজয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল—আচ্ছা, যদি এখন একটা কিছু ঘরে ঢোকে? মানুষ কি অন্য কোনো জানোয়ার? চারদিকে ঘন বাঁশবন, জঙ্গল, লোকজনের বসতি নাই—মাগো। জলের ছাটে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে···হাত দিয়া দেখিল ঘুমন্ত অপুর গা জলে ভিজিয়া ন্যাতা হইয়া যাইতেছে—সে কি করে? আর কত রাত আছে?—সে বিছানা হাতড়াইয়া দেশলাই খুঁজিয়া কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালে। ডাকে—ও অপু ওঠ্ তো? শুনছিস, ও অপু? ওঠ্ দিকি। দুর্গাকে বলে—পাশ ফিরে শো তো দুগ্গা। বড্ড জল পড়ছে—একটু স'রে পাশ ফের দিকি—

অপু উঠিয়া বসিয়া ঘুমচোখে চারিদিকে চায়—পরে আবার শুইয়া পড়ে। হুড়ুম করিয়া বিষম কি শব্দ হয়, সর্বজয়া তাড়াতাড়ি আবার দুয়ার খুলিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিল—বাঁশবাগানের দিকটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে—রান্নাঘরের দেওয়াল পড়িয়া গিয়াছে!—তাহার বুক কাঁপিয়া ওঠে—এইবার বুঝি পুরানো কোঠাটা—? কে আছে, কাহাকে সে এখন ডাকে? মনে মনে বলে—হে ঠাকুর, আজকের রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দাও, হে ঠাকুর, ওদের মুখের দিকে তাকাও—

তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, ঝড় থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও

অল্প অল্প পড়িতেছে। পাড়ার নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী গোয়ালে গরুর অবস্থা দেখিতে আসিতেছেন, এমন সময় খিড়্‌কীদোরে বার বার ধাক্কা শুনিয়া দোর খুলিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন—নতুন বৌ! সর্বজয়া ব্যস্তভাবে বলিল—ন' দি, একবার বট্‌ঠাকুরকে ডাকো দিকি? একবার শিগ্‌গির আমাদের বাড়ীতে আসতে বলো—দুগ্‌গা কেমন করচে!

নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—দুগ্‌গা? কেন কি হয়েচে দুগ্‌গার?

সর্বজয়া বলিল—ক'দিন থেকে তো জ্বর হচ্ছিল—হচ্চে আবার যাচ্চে—ম্যালেরিয়ার জ্বর, কাল সন্দে থেকে জ্বর বড্ড বেশী—তার ওপর কাল রাত্রে কি রকম কাণ্ড তো জানই—একবার শীগ্‌গির বট্‌ঠাকুরকে—

তাহার বিস্রস্ত কেশ ও রাত-জাগা রাঙা রাঙা চোখের কেমন দিশাহারা চাহনি দেখিয়া নীলমণি মুখুয্যের স্ত্রী বলিলেন—ভয় কি বৌ—দাঁড়াও আমি এখুনি ডেকে দিচ্চি—চল আমি যাচ্চি—কাল আবার রাত্তিরে গোয়ালের চালাখানা পড়ে গেল, বাবা কাল রাত্তিরের মত কাণ্ড আমি তো কখনো দেখি নি—শেষরাত্রে সব উঠে গরুটরু সরিয়ে রেখে আবার শুয়েচে কি না? দাঁড়াও আমি ডাকি—

একটু পরে নীলমণি মুখুয্যে, তাঁহার বড় ছেলে ফণি, স্ত্রী ও দুই মেয়ে সকলে অপুদের বাড়ীতে আসিলেন। রাত্রের অন্ধকারে সেই দৈত্যটা যেন সারা গ্রামখানা দলিত, পিষ্ট, মথিত করিয়া দিয়া আকাশ-পথে অন্তর্হিত হইয়াছে—ভাঙা গাছের ডাল, পাতা, চালের খড়, কাঁচা বাঁশপাতা, বাঁশের কঞ্চিতে পথ ঢাকিয়া দিয়াছে—ঝাড়ের বাঁশ নুইয়া পথ আটকাইয়া রাখিয়াছে। ফণি বলিল—দেখেছেন বাবা কাণ্ডখানা? সেই নবাবগঞ্জের পাকারাস্তা থেকে বিলিতি চট্‌কা গাছটার পাতা উড়িয়ে এনেচে!—নীলমণি মুখুয্যের ছোট ছেলে একটা চড়ুই পাখী বাঁশপাতার ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিল।

দুর্গার বিছানার পাশে অপু বসিয়া আছে—নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েছে বাবা অপু?—অপুর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। বলিল, দিদি কি সব বক্‌ছিল জ্যেঠামশায়।

নীলমণি বিছানার পাশে বসিয়া বলিলেন—দেখি হাতখানা?—জ্বরটা একটু বেশী, আচ্ছা কোনো ভয় নেই—ফণি, তুমি একবার চট ক'রে নবাবগঞ্জে চলে যাও দিকি শরৎ ডাক্তারের কাছে—একেবারে ডেকে নিয়ে আসবে। পরে তিনি ডাকিলেন—দুর্গা, ও দুর্গা? দুর্গার অঘোর আচ্ছন্ন ভাব, সাড়া শব্দ নাই। নীলমণি বলিলেন, এঃ, ঘরদোরের অবস্থা তো বড্ড খারাপ? জল

প'ড়ে কাল রাত্রে ভেসে গিয়েছে···তা বৌমার লজ্জার কারণই বা কি—আমাদের ওখানে না হয় উঠলেই হোত? হরিটারও কাণ্ডজ্ঞান আর হোল না এ জীবনে—এই অবস্থায় এই রকম ঘরদোর, সারানোর একটা ব্যবস্থা না ক'রে কি যে করচে, তাও জানিনে—চিরকালটা ওর সমান গেল—

তাহার স্ত্রী বলিলেন—ঘর সারাবে কি, খাবার নেই ঘরে, নৈলে কি এরকম আতান্তরে ফেলে কেউ বিদেশে যায়? আহা রোগা মেয়েটা কাল সারারাত ভিজেচে—একটু জল গরম করতে দাও—ওই জানালাটা খুলে দাও তো ফণি!

একটু বেলায় নবাবগঞ্জ হইতে শরৎ ডাক্তার আসিলেন—দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। বলিয়া গেলেন যে, বিশেষ ভয়ের কোনো কারণ নাই। জ্বর বেশী হইয়াছে, মাথায় নিয়মিতভাবে জলপটি দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। হরিহর কোথায় আছে জানা নাই—তবুও তাহার পূর্ব ঠিকানায় তাহাকে একখানি পত্র দেওয়া হইল।

পরদিন ঝড় থামিয়া গেল—আকাশের মেঘ কাটিতে সুরু করিল। নীলমণি মুখুয্যে দুবেলা নিয়মিত দেখাশোনা করিতে লাগিলেন। ঝড়-বৃষ্টি থামিবার পরদিন হইতেই দুর্গার জ্বর আবার বড় বাড়িল। শরৎ ডাক্তার সুবিধা বুঝিলেন না। হরিহরকে আর একখানা পত্র দেওয়া হইল।

অপু তাহার দিদির মাথার কাছে বসিয়া জলপটি দিতেছিল। দিদিকে দু-একবার ডাকিল—ও দিদি শুন্‌ছিস্, কেমন আছিস্, ও দিদি? দুর্গার কেমন আচ্ছন্ন ভাব। ঠোঁট নড়িতেছে—কি যেন আপন মনে বলিতেছে, ঘোর ঘোর। অপু মুখের কাছে কান লইয়া গিয়া দু-একবার চেষ্টা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিল না।

বৈকালের দিকে জ্বর ছাড়িয়া গেল। দুর্গা আবার চোখ মেলিয়া চাহিতে পারিল এতক্ষণ পরে। ভারি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, চিঁচিঁ করিয়া কথা বলিতেছে, ভাল করিয়া না শুনিলে বোঝা যায় না কি বলিতেছে।

মা গৃহকার্যে উঠিয়া গেলে অপু দিদির কাছে বসিয়া রহিল। দুর্গা চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—বেলা কত রে?

অপু বলিল—বেলা এখনও অনেক আছে—রোদ্দুর উঠেচে আজ দেখিচিস্ দিদি? এখনও আমাদের নারকেল গাছের মাথায় রোদ্দুর রয়েচে।

খানিকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা বলিল না। অনেক দিন পরে রৌদ্র ওঠাতে অপুর ভারি আহ্লাদ হইয়াছে। সে জানলার বাহিরে রৌদ্রালোকিত গাছটার মাথায় চাহিয়া রহিল

খানিকটা পরে দুর্গা বলিল—শোন অপু—একটা কথা শোন্—

—কি রে দিদি? পরে সে দিদির মুখের আরও কাছে মুখ লইয়া গেল

—আমায় একদিন তুই রেলগাড়ী দেখাবি?

—দেখাবো এখন—তুই সেরে উঠলে বাবাকে ব'লে আমরা সব একদিন গঙ্গা নাইতে যাবো রেলগাড়ী ক'রে—

সারা দিন-রাত্রি কাটিয়া গেল। ঝড় বৃষ্টি কোনও কালে হইয়াছিল মনে হয় না। চারিধারে দারুণ শরতের রৌদ্র।

সকাল দশটার সময় নীলমণি মুখুয্যে অনেকদিন পরে নদীতে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া তেল মাখিতে বসিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর উত্তেজিত স্বর তাঁর কানে গেল—ওগো, এসো তো একবার এদিকে শীগগির—অপুদের বাড়ীর দিক থেকে যেন একটা কান্নার গলা পাওয়া যাচ্ছে—

ব্যাপার কি দেখিতে সকলে ছুটিয়া গেলেন।

সর্বজয়া মেয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিতেছে—ও দুর্গ্‌গা চা দিকি—ওমা ভাল ক'রে চা দিকি—ও দুগ্‌গা—

নীলমণি মুখুয্যে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—কি হয়েচে—সরো সরো সব দিকি—আহা কি সব বাতাসটা বন্ধ ক'রে দাঁড়াও?

সর্বজয়া ভাসুর সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কি হোল, মেয়ে অমন করচে কেন?

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অন্তরের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে—দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

তখন আবার শরৎ ডাক্তারকে ডাকা হইল। বলিলেন—ম্যালেরিয়ার শেষ স্টেজটা আর কি—খুব জ্বরের পর যেমন বিরাম হয়েচে আর অমনি হার্টফেল ক'রে—ঠিক এরকম একটা case হ'য়ে গেল সেদিন দশঘরায়—

আধঘণ্টার মধ্যে পাড়ার লোকে উঠান ভাঙিয়া পড়িল।

পথের পাঁচালী | **পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ**

হরিহর বাড়ীর চিঠি পায় নাই।

এবার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হরিহর রায় প্রথমে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর

যায়। কাহারও সঙ্গে তথায় তাহার পরিচয় ছিল না শহর-বাজার জায়গা, একটা না একটা কিছু উপায় হইবে এই কুহকে পড়িয়াই সেখানে গিয়াছিল। গোয়াড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর সে সন্ধান পাইল যে, শহরে উকিল কি জমিদারের বাড়ীতে দৈনিক বা মাসিক চুক্তি হিসাবে চণ্ডীপাঠ করার কার্য প্রায়ই জুটিয়া যায়। আশায় আশায় দিন পনেরো কাটাইয়া বাড়ী হইতে পথখরচ বলিযা যৎসামান্য যাহা কিছু আনিয়াছিল ফুরাইয়া ফেলিল, অথচ কোথাও কিছু সুবিধা হইল না।

সে পড়িল মহাবিপদে—অপরিচিত স্থান, কেহ একটি পয়সা দিয়া সাহায্য করে এমন নাই—খোড়ে বাজারের যে হোটেলটিতে ছিল, পয়সা ফুয়াইয়া গেলে সেখান হইতে বাহির হইতে হইল। একজনের নিকট শুনিল স্থানীয় হরিসভায় নবাগত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পথিককে বিনামূল্যে থাকিতে ও খাইতে দেওয়া হয়। অভাব জানাইয়া হরিসভার একট' কুঠুরির একপাশে থাকিবার স্থান পাইল বটে, কিন্তু সেখানে বড় অসুবিধা, অনেকগুলি নিষ্কর্মা গাঁজাখোর লোক রাত্রিতে সেখানে আড্ডা করে, প্রায় সমস্ত রাত্রি হৈ হৈ করিয়া কাটায়, এমন কি গভীর রাত্রিতে এক একদিন এমন ধরণের স্ত্রীলোকের যাতায়াত দেখা যাইতে লাগিল যাহাদের ঠিক হরিমন্দির দর্শন-প্রার্থিনী ভদ্রমহিলা বলিয়া মনে হয় না।

অতিকষ্টে দিন কাটাইয়া সে শহরে বড় বড় উকীল ও ধনী গৃহস্তের বাড়ীতে ঘুরিতে লাগিল। সারাদিন ঘুরিয়া অনেক বাত্রিতে ফিরিয়া এক-একদিন দেখিত তাহাবই স্থানটিতে তাহারই বিছানাটা টানিয়া লইয়া কে একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। হরিহর কয়েকদিন বাহিরের বারান্দায় শুইয়া কাটাইল। প্রায়ই এরূপ হওয়াতে ইহা লইয়া গাঁজাখোর সম্প্রদায়ের সহিত তাহার একটু বচসা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা হরিসভার সেক্রেটারীর কাছে গিয়া কি লাগাইল তাহারাই জানে—সেক্রেটারী বাবু নিজ বাড়ীতে হরিহরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন ও বলিলেন, তাঁহাদের হরিসভায় তিনদিনের বেশী থাকিবার নিয়ম নাই, সে যেন অন্যত্র বাসস্থান দেখিয়া লয়।

সন্ধ্যার পরে জিনিসপত্র লইয়া হরিহরকে হরিসভার বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইল।

খোড়ে নদীর ধারে অল্প একটু নির্জন স্থানে পুঁটুলিটি নামাইয়া রাখিয়া নদীর জলে হাত মুখ ধুইল।

সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নাই—সেদিন একটি কাঠের গোলাতে বসিয়া শ্যামাবিষয় গান করিয়াছিল—গোলার অধিকারী একটি টাকা প্রণামী দেয়—সেই টাকাটি হইতে কিছু পয়সা ভাঙাইয়া বাজার হইতে মুড়ি ও দই কিনিয়া

আনিল। খাবার গলা দিয়া যেন নামে না—মাত্র দিন-দশেকের সম্বল রাখিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। অন্য প্রায় দুই মাসের উপর হইয়া গেল—এ পর্যন্ত একটি পয়সা পাঠাইতে পারে নাই, এতদিন কি করিয়া তাহাদের চলিতেছে! অপু বাড়ী হইতে আসিবার সময় বার বার বলিয়া দিয়াছে—তাহার জন্য একখানা পদ্মপুরাণ কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য। ছেলে বই পড়িতে বড় ভালবাসে—মাঝে মাঝে সে যে বাপের বাক্স-দপ্তর হইতে লুকাইয়া বই বাহির করিয়া লইয়া পড়ে, তাহা হরিহর বুঝিতে পারে, বাক্সের ভিতর আনাড়ি হাতের হেলাগোছা করা থাকে—কোন্ বই বাবা বাক্সের কোথায় রাখে ছেলে তাহা জানে না—উন্টাপান্টা করিয়া সাজাইয়া চুরি ঢাকিবার অক্ষম চেষ্টা করে—হরিহর বাড়ী ফিরিয়া বাক্স খুলিলেই বুঝিতে পারে ছেলের কীর্তি।

তাহার বাড়ী হইতে আসিবার পূর্বে হরিহর যুগীপাড়া হইতে একখানা বটতলার গদ্য পদ্মপুরাণ পড়িবার জন্য লইয়া আসে—অপু বইখানা দখল করিয়া বসিল—রোজ রোজ পড়ে—কুচুনী পাড়ায় শিবঠাকুরের মাছ ধরিতে যাওয়ার কথাটা পড়িতে তাহার ভারি আমোদ—হরিহর বলে—বইখানা দ্যাও বাবা, যাদের বই তারা চাচ্চে যে—অবশেষে একখানা পদ্মপুরাণ তাহাকে কিনিয়া দিতে হইবে—এই সর্তে বাবাকে রাজী করাইয়া তবে সে বই ফেরৎ দেয়। আসিবার সময় বার বার বলিয়াছে—সেই বই একখানা এনো কিন্তু বাবা, এবার অবিশ্যি অবিশ্যি। দুর্গার উঁচু নজর নাই, সে বলিয়া দিয়াছে, একখানা সবুজ হাওয়াই কাপড় ও একপাতা ভাল আলতা লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু সে সব তো দূরের কথা, কি করিয়া বাড়ীতে সংসার চলিতেছে সেই না এখন সমস্যা? সন্ধ্যার পর পূর্বপরিচিত কাঠের গোলাটায় গিয়া সে রাত্রের মত আশ্রয় লইল। ভাল ঘুম হইল না—বিছানায় শুইয়া বাড়ীতে কি করিয়া কিছু পাঠায় এই ভাবনায় এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সে লক্ষ্যহীন ভাবে পথের একস্থানে দাঁড়াইল। রাস্তার ও ধারে একটা লাল ইটের লোহার ফটকওয়ালা বাড়ী। অনেকক্ষণ চাহিয়া তাহার কেমন মনে হইল এই বাড়ীতে গিয়া দুঃখ জানাইলে তাহার একটা উপায় হইবে। কলের পুতুলের মত সে ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সাজানো বৈঠকখানা, মার্বেল পাথরের ধাপে স্তরে স্তরে বসানো ফুলের টব, পাথরের পুতুল, পাম্, দরজায় ঢুকিবার স্থানে পা-পোষ পাতা। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন। অপরিচিত লোক দেখিয়া কাগজ পাশে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? কি দরকার?

হরিহর বিনীতভাবে বলিল—আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ—সংস্কৃত পড়া আছে, চণ্ডী পাঠ-টাট করি—তা ছাড়া ভাগবৎ কি গীতাপাঠও—

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ভাল করিয়া কথা না শুনিয়াই তাঁহার সময় অত্যন্ত মূল্যবান, বাজে কথা শুনিবার সময় নিতান্ত সংক্ষেপ জানাইয়া দিবার ভাবে বলিলেন না, এখানে ওসব কিছু এখন সুবিধে হবে না, অন্য জায়গায় দেখুন।

হরিহর মরিয়া ভাবে বলিল—আজ্ঞে নতুন শহরে এসেচি, একেবারে কিছু হাতে নেই—বড় বিপদে পড়িচি, কদিন ধ'রে কেবলই—

প্রৌঢ় লোকটি তাড়াতাড়ি বিদায় করিবার ভঙ্গীতে ঠেস দেওয়ার তাকিয়াটা উঠাইয়া একটা কি তুলিয়া লইয়া হরিহরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—এই নিন, যান, অন্য কিছু হবে-টবে না, নিন্।

সেটা যে শ্রেণীর মুদ্রাই হউক, সেটাই অন্য সুরে দিতে আসিলে হরিহর লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিত না—এরূপ সে বহুস্থানে লইয়াছেও; কিন্তু সে বিনীত ভাবে বলিল—আজ্ঞে ও আপনি রাখুন, আমি এমনি কারুর কাছে নিইনে···আমি শাস্ত্র পাঠ টাট করি—তা ছাড়া কারুর কাছে—আচ্ছা থাক্—

একটু শুভযোগ বোধহয় ঘটিয়াছিল। রক্ষিত মহাশয়ের কাঠের গোলাতেই একদিন একটা সন্ধান জুটিল। কৃষ্ণনগরের কাছে একটা গ্রামে একজন বর্ধিষ্ণু মহাজন গৃহ-দেবতার পূজা-পাঠ করিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ খুঁজিতেছে, যে বরাবর টিকিয়া থাকিবে। রক্ষিত মহাশয়ের যোগাযোগে অবিলম্বে হরিহর সেখানে গেল—বাড়ীর কর্তাও তাহাকে পছন্দ করিলেন। থাকিবার ঘর দিলেন, আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হইল না।

কয়েকদিন কাজ করিবার পরেই পূজা আসিয়া পড়িল। বাড়ী যাইবার সময় বাড়ীর কর্তা দশটাকা প্রণামী ও যাতায়াতের গাড়ীভাড়া দিলেন, গোয়াড়ীতে রক্ষিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইতে আসিলে সেখান হইতেও পাঁচটি টাকা প্রণামী পাওয়া গেল।

আকাশে-বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সবুজ লতাপাতায়, পথিকের চরণ-ভঙ্গীতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেলপথের দুপাশে কাশ ফুলের ঝাড় গাড়ীর বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে, চলিতে চলিতে বাড়ীর কথা মনে হয়।

একদল শান্তিপুরের ব্যবসায়ী লোক পূজার পূর্বে কাপড়ের গাঁট ক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছিল, চূর্ণীঘাটের খেয়ার নৌকায় উঠিয়া কলরব করিতেছে—সর্বত্র একটা উৎসবের উল্লাস। রাণাঘাটের বাজারে সে স্ত্রী ও পুত্রকন্যার জন্য কাপড় কিনিল। দুর্গা লালপাড় কাপড় পরিতে ভালবাসে, তাহার জন্য বাছিয়া

একখানা ভাল কাপড়, ভাল দেখিয়া আল্তা কয়েক পাতা। অপুর 'পদ্মপুরাণ' অনেক সন্ধান করিয়াও মিলিল না, অবশেষে একখানা 'সচীত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ছয় আনা মূল্যে কিনিয়া লইল। গৃহস্থালীর টুক্‌টাক দু একটা জিনিস—সর্বজয়া বলিয়া দিয়াছিল একটা কাঠের চাকী-বেলুনের কথা, তাহাও কিনিল।

দেশের স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালের দিকে সে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। পথে বড় একটা কাহারও সহিত দেখা হইল না, দেখা হইলেও সে হন্ হন্ করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কাহারও দিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। দরজায় ঢুকিতে ঢুকিতে আপন মনে বলিল—উঃ দ্যাখো কাণ্ডখানা, বাঁশ-ঝাড়টা ঝুঁকে পড়েচে একেবারে পাঁচিলের ওপর, ভুবন কাকা কাটাবেনও না—মুস্কিল হয়েছে আচ্ছা—পরে সে বাড়ীর উঠানে ঢুকিয়া অভ্যাসমত আগ্রহের স্বরে ডাকিল—ও অপু—

তাহার গলার স্বর শুনিয়া সর্বজয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিহর হাসিয়া বলিল,—বাড়ীর সব ভালো? এরা সব কোথায় গেল? বাড়ী নেই বুঝি?

সর্বজয়া শান্তভাবে আসিয়া স্বামীর হাত হইতে ভারী পুঁটুলিটা নামাইয়া লইয়া বলিল, এসো—ঘরে এসো। স্ত্রীর অদৃষ্টপূর্ব শান্তভাব হরিহর লক্ষ্য করিলেও তাহার মনে কোনো খটকা হইল না—তাহার কল্পনার স্রোত তখন উদ্দাম বেগে অন্যদিকে ছুটিয়াছে—এখনই ছেলে মেয়ে ছুটিয়া আসিবে, দুর্গা আসিয়া হাসিমুখে বলিবে—কি বাবা এর মধ্যে? অমনি তাড়াতাড়ি হরিহর পুঁটুলি খুলিয়া মেয়ের কাপড় ও আল্তার পাতা এবং ছেলের 'সচিত্র চণ্ডী-মাহাত্ম্য বা কালকেতুর উপাখ্যান' ও টিনের রেলগাড়ীটা দেখাইয়া তাহাদের তাক লাগাইয়া দিবে! সে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, বেশ কাঁঠালের চাকী-বেলুন এনিচি এবার—পরে কিছু নিরাশামিশ্রিত সতৃষ্ণনয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, কৈ—অপু, দুগ্‌গা এরা বুঝি সব বেরিয়েচে—

সর্বজয়া আর কোনো মতেই চাপিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো দুগ্‌গা কি আর আছে গো—মা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েচে—এতদিন কোথায় ছিলে!

গাঙ্গুলী বাড়ীর পূজা অনেক কালের। এ কয়দিন গ্রামে অতি বড় দরিদ্রও অভুক্ত থাকে না। সব বনেদি বন্দোবস্ত, নির্দিষ্ট সময়ে কুমার আসিয়া প্রতিমা

গড়ায়, পোটো চলচিত্র করে, মালাকার সাজ যোগায়, বারাসে-মধুখালির দ' হইতে বাউরীরা রাশি রাশি পদ্মফুল তুলিয়া আনে।

আঁসমালির দীনু সানাইদার অন্য অন্য বৎসরের মত রসুনচৌকি বাজাইতে আসিল। প্রভাতের আকাশে আগমনীর আনন্দ সুর বাজিয়া ওঠে—আসন্ন হেমন্ত ঋতুর স্নেহ-অভ্যর্থনা,—নব ধান্যগুচ্ছের, নব আগন্তুক শেফালিদলের, হিমালয়ের পার হইতে উড়িয়া আসা পথিক-পাখী শ্যামার, শিশির-স্নিগ্ধ মৃণাল-ফোটা হেমন্তসন্ধ্যার।

নূতন কাপড় পরাইয়া ছেলেকে সঙ্গে লইয়া হরিহর নিমন্ত্রণ খাইতে যায়। একখানি অগোছালো চুলে-ঘেরা ছোট মুখের সনির্বন্ধ গোপন অনুরোধ দুয়ারের পাশের বাতাসে মিশাইয়া থাকে—হরিহর পথে পা দিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে—ছেলেকে বলে, এগিয়ে চলো, অনেক বেলা গিয়েচে বাবা—

গাঙ্গুলী বাড়ীর প্রাঙ্গন উৎসববেশে সজ্জিত হাসিমুখ ছেলেমেয়েতে ভরিয়া গিয়াছে। অপু চাহিয়া দেখিল সতু ও তাহার ভাই কেমন কমলালেবু রং-এর জামা গায়ে দিয়াছে—সবুজ সাড়ী পরিয়া ও দিব্যি চুল বাঁধিয়া রাণু-দিদিকে যা মানাইয়াছে! গাঙ্গুলী বাড়ীর মেয়ে সুনয়নী খোঁপায় রজনীগন্ধা ফুল গুঁজিয়া আর পাঁচ ছয়টি মেয়ের সঙ্গে পূজার দালানে দাঁড়াইয়া খুব গল্প করিতেছে ও হাসিতেছে। সুনয়নী বাদে বাকী মেয়েদের সে চেনে না, বোধ হয় অন্য জায়গা হইতে উহাদের বাড়ী পূজার সময় আসিয়া থাকিবে—শহরের মেয়ে বোধহয়, যেমন সাজগোজ, তেমনি দেখিতে। অপু একদৃষ্টে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। ওদিকে কে চেঁচাইয়া বলিতেছে—বড় সামিয়ানাটা আনবার ব্যবস্থা এখনও হোল না? বাঃ—তোমাদের যা কাজকর্ম, দেখো এর পর মজাটা তারপর ব্রাহ্মণ খেতে বসবে পাঁচটায়?

পথের পাঁচালী — ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে দিন কাটিয়া গেল। শীতকালও শেষ হইতে চলিয়াছে।

দুর্গার মৃত্যুর পর হইতেই সর্বজয়া অনবরত স্বামীকে এ গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবার জন্য তাগিদ দিয়া আসিতেছিল, হরিহরও নানা স্থানে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। কিন্তু কোনো স্থানেই কোন সুবিধা হয় নাই। সে আশা সর্বজয়া আজকাল একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছে। মধ্যে গত শীতকালে হরিহরের

জ্ঞাতিভ্রাতা নীলমণি রায়ের বিধবা স্ত্রী এখানে আসিয়াছেন ও নিজেদের ভিটা জঙ্গলাবৃত হইয়া যাওয়াতে ভুবন মুখুয্যের বাটীতে উঠিয়াছেন। হরিহর নিজের বাটীতে বৌদিদিকে আনিয়া রাখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল, কিন্তু নীলমণি রায়ের স্ত্রী রাজী হন নাই। এখানে বর্তমানে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে মেয়ে অতসী ও ছোট ছেলে সুনীল। বড় ছেলে সুরেশ কলিকাতায় স্কুলে পড়ে, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে এখানে আসিতে পারিবে না। অতসীর বয়স বছর চৌদ্দ, সুনীলের বয়স আট বৎসর। সুনীল দেখিতে তত ভাল নয়, কিন্তু অতসী বেশ সুশ্রী, তবে খুব সুন্দরী বলা চলে না। তাহা হইলেও বরাবর ইহারা লাহোর কাটাইয়াছে, নীলমণি রায় সেখানে কমিসারিয়েটে চাকরী করিতেন, সেখানেই ইহাদের জন্ম, সেখানেই লালিত-পালিত; কাজেই পশ্চিম-প্রদেশ-সুলভ নিটোল স্বাস্থ্য ইহাদের প্রতি অঙ্গে।

ইহারা এখানে প্রথম আসিলে সর্বজয়া বড়মানুষ জা'য়ের সঙ্গে মেশামেশি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুনীলের মা নগদে ও কোম্পানীর কাগজে দশহাজার টাকার মালিক একথা জানিয়া জা'য়ের প্রতি সম্ভ্রমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা কম করে নাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বজয়া নির্বোধ হইলেও বুঝিতে পারিল যে, সুনীলের মা তাহাকে ততটা আমল দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার স্বামী চিরকাল বড় চাকরী করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ছেলেমেয়ে অন্যভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সুরু হইতেই তিনি দরিদ্র জ্ঞাতি পরিবার হরিহরের সঙ্গে এমন একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিতে লাগিলেন যে, সর্বজয়া আপনিই হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। কথায় ব্যবহারে কাজে খুঁটিনাটি সব ব্যাপারেই তিনি জানাইয়া দিতে লাগিলেন যে সর্বজয়া কোনরকমেই তাঁহাদের সঙ্গে সমানে সমানে মিশিবার যোগ্য নহে। তাঁহাদের কথাবার্তায় পোষাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে এই ভাবটা অনবরত প্রকাশ পায় যে তাঁহারা অবস্থাপন্ন ঘর। ছেলে মেয়ে সর্বদা ফিটফাট সাজিয়া আছে, কাপড় এতটুকু ময়লা হইতে পায় না, চুল সর্বদা আঁচড়ানো, অতসীর গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, কানে সোনার দুল, একপ্রস্থ চা ও খাবার না খাইয়া সকালে কেহ কোথাও বাহির হয় না, সঙ্গে পশ্চিমা চাকর আছে, সে-ই সব গৃহকর্ম করে—মোটের উপর সব বিষয়েই সর্বজয়াদের দরিদ্র সংসারের চালচলন হইতে উহাদের ব্যাপারের বহু পার্থক্য।

সুনীলের মা নিজের ছেলেকে গ্রামের কোন ছেলের সঙ্গেই বড় একটা মিশিতে দেন না, অপুর সঙ্গেও নয়—পাছে, পাড়াগাঁয়ের এই সব অশিক্ষিত, অসভ্য ছেলেপিলেদের দলে মিশিয়া তাঁহার ছেলেমেয়ে খারাপ হইয়া যায়।

তিনি এ গ্রামে বাস করিবার জন্য আসেন নাই, জরীপের সময় নিজেদের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে আসাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ভুবন মুখুয্যেরা ইঁহাদের কিছু জমা রাখেন, সেই খাতিরে পশ্চিম কোঠায় দু'খানা ঘর ইঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়াও ইঁহাদের পৃথক হয়। ভুবন মুখুয্যেদের সঙ্গে ব্যবহারে সুনীলের মায়ের কোনো পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; কারণ ভুবন মুখুয্যের পয়সা আছে, কিন্তু সর্বজয়াকে তিনি একেবারে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না।

দোলের সময় নীলমণি রায়ের বড ছেলে সুরেশ কলিকাতা হইতে আসিয়া প্রায় দিন দশেক বাড়ী রহিল। সুরেশ অপুরই বয়সী, ইংরাজী ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। দেখিতে খুব ফর্সা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। নিয়মিত ব্যায়াম করে বলিয়া শরীর বেশ বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান। অপুর অপেক্ষা এক বৎসর মাত্র বয়স বেশী হইলেও আকৃতি ও গঠনে পনেরো ষোল বৎসরের ছেলের মত দেখায়। সুরেশও এপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বড একটা মেশে না। ওপাড়ার গাঙ্গুলী বাড়ীর রামনাথ গাঙ্গুলীর ছেলে তাহার সহপাঠী। গাঙ্গুলীবাড়ী রামনবমী দোলের খুব উৎসব হয়, সেই উপলক্ষ্যে সে-ও মামার বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছে। সুরেশ অধিকাংশ সময় সেইখানেই কাটায়, গাঁয়ের অন্য কোনো ছেলে মিশিবার যোগ্য বলিয়া সে-ও বোধ হয় বিবেচনা করে না।

যে পোড়ো ভিটাটা জঙ্গলাবৃত হইয়া বাড়ির পাশে পড়িয়া থাকিতে সে জ্ঞান হইয়া অবধি দেখিতেছে, সেই ভিটার লোক ইহারা। সে হিসাবে ইহাদের প্রতি অপুর একটি বিচিত্র আকর্ষণ। তাহার সমবয়সী সুরেশ কলিকাতায় পড়ে—ছুটিতে বাড়ী আসিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেকদিন হইতে সে প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু সুরেশ আসিয়া তাহার সহিত তেমন মিশিল না, তা ছাড়া সুরেশের চালচলন ও কথাবার্তার ধরণ এমনি যে, সে যেন প্রতিপদেই দেখাইতে চায়, গ্রামের ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশী উঁচু। সমবয়সী হইলেও মুখচোরা অপু তাহাতে আরও ভয় পাইয়া কাছে ঘেঁষে না।

অপুও এখনও পর্যন্ত কোনো স্কুলে যায় নাই, সুরেশ তাহাকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছে, আমি বাড়ীতে বাবার কাছে পড়ি। দোলের দিন গাঙ্গুলীদের পুকুরে বাঁধাঘাটে জলপাইতলায় বসিয়া সুরেশ গ্রামের ছেলেদিগকে দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ভঙ্গীতে এ প্রশ্ন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। অপুকে বলিল—বলতো ইণ্ডিয়া বাউণ্ডারী কি? জিওগ্রাফী জানো?

অপু বলিতে পারে নাই। সুরেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, অঙ্ক কি কষেচ? ডেসিমল্ ফ্র্যাক্‌শন কষতে পারো?

অপু অতশত জানে না। না জানুক, তাহার সেই টিনের বাক্সটিতে বুঝি কম বই আছে? একখানা নিত্যকর্মপদ্ধতি, একখানা পুরানো প্রাকৃতিক ভূগোল, একখানা শুভঙ্করী, পাতা-ছেঁড়া বীরাঙ্গনা কাব্য একখানা, মায়ের সেই মহাভারত—এই সব। সে ঐ সব বই পড়িয়াছে,—অনেকবার পড়া হইয়া গেলেও আবার পড়ে। তাহার বাবা প্রায়ই এখান ওখান হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া বই আনিয়া দেয়,—ছেলে খুব লেখাপড়া শিখিবে, পণ্ডিত হইবে, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ বিষয়ে বিকারের রোগীর মত তাহার একটা অদম্য, অপ্রশমনীয় পিপাসা। কিন্তু তাহার পয়সা নাই, দূরের স্কুলের বোর্ডিং-এ রাখিয়া দিবার মত সঙ্গতির একান্ত অভাব, নিজেও খুব বেশী লেখাপড়া জানে না। তবুও যতক্ষণ সে বাড়ী থাকে নিজের কাছে বসাইয়া ছেলেকে এটা ওটা পড়ায়, নানা গল্প করে, ছেলেকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য নিজে একখানা শুভঙ্করীর সাহায্যে বাল্যের অধীত বিস্মৃত বিদ্যা পুনরায় ঝালাইয়া তুলিয়া তবে ছেলেকে অঙ্ক কষায়। যাহাতেই মনে করে ছেলের জ্ঞান হইবে, সেইটাই হয় ছেলেকে পড়িতে দেয়, নতুবা পড়িয়া শোনায়। সে বহুদিন হইতে 'বঙ্গবাসীর' গ্রাহক, অনেক দিনের পুরানো 'বঙ্গবাসী' তাহাদের ঘরে জমা আছে, ছেলে বড় হইলে পড়িবে এজন্য হরিহর সেগুলিকে সযত্নে বাণ্ডিল বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, এখন সেগুলি কাজে লাগাইতেছে। মূল্য দিতে না পারায় নূতন কাগজ আর তাহাদের আসে না, কাগজওয়ালারা কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ছেলে যে এই 'বঙ্গবাসা' কাগজখানার জন্য কিরূপ পাগল, শনিবার দিনটা সকালবেলা খেলাধূলা ফেলিয়া কেমন করিয়া সে যে ভুবন মুখুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে—হরিহর তাহা খুব জানে বলিয়াই ছেলের এত আদরের জিনিসটা যোগাইতে না পারিয়া তাহার বুকের ভিতর বেদনায় টন্‌টন্ করে।

অপু তবুও পুরাতন 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া অনেক গল্প শিখিয়াছে। পটুর কাছে বলে—লিউকা ও রাফেল, মার্টিনিক দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাত, সোনাকরা জাদুকরের গল্প, আরও কত কথা! কিন্তু স্কুলের লেখাপড়া তাহার কিছুই হয় না। মোটে ভাগ পর্যন্ত অঙ্ক জানে, ইতিহাস নয়, ব্যাকরণ নয়, জ্যামিতি পরিমিতির নামও শোনে নাই—ইংরেজির দৌড় ফার্স্ট বুকের ঘোড়ার পাতা।

ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার মায়ের একটু অন্যরূপ ধারণা। সর্বজয়া

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। ছেলে স্কুলে পড়িয়া মানুষ হইবে এ উচ্চ আশা তাহার নাই। তাহার পরিচিত মহলে কেউ কখনো স্কুলের মুখ দেখে নাই। তাহার যে সব শিষ্য-বাড়ি আছে, ছেলে আর কিছুদিন পরে সে সব ঘরে যাতায়াত করিবে, সেগুলি বজায় রাখিবে, ইহাই তাহার বড় আশা। আরও একটা আশা সর্বজয়া রাখে। গ্রামের পুরোহিত দীনু ভটাচার্য বৃদ্ধ হইয়াছেন। ছেলেরাও কেহ উপযুক্ত নয়। রাণীর মা, গোকুলের বৌ, গাঙ্গুলী বাড়ীর বড়বধূ সকলেই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ইহার পর অপুকে দিয়া কাজকর্ম করাইবেন, দীনু ভট্টাচার্যের অবর্তমানে তাঁহার গাঁজাখোর পুত্র ভোম্বলের পরিবর্তে নিষ্পাপ, সবল, সুশ্রী এই ছেলেটি গ্রামের মনসা-পূজায় লক্ষ্মীপূজায় তাহাদের আয়োজনের সঙ্গী হইয়া থাকিবে, গ্রামের মেয়েরা এই চায়। অপুকে সকলেই ভালবাসে। ঘাটে পথে প্রতিবেশিনীদের মুখে এ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে সর্বজয়া অনেকবার শুনিয়াছে, এবং এইটাই বর্তমানে তাহার সবচেয়ে উচ্চ আশা। সে গরীব ঘরের বধূ, ইহা ছাড়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা নাই। এই যদি ঘটে তাহা হইলে শেষ রাত্রের স্বপ্নকে সে হাতের মুঠায় পায়।

একদিন একথা ভুবন মুখুয্যের বাড়ীতে উঠিয়াছিল। দুপুরের পর সেখানে তাসের আড্ডায় পাড়ার অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সর্বজয়া সকলের মন যোগাইবার ভাবে বলিল—এই বড় খুড়ী আছেন, ঠাকুমা আছেন, মেজদি আছেন, এঁদের যদি দয়া হয় তবে অপু আমার সামনের ফাগুনে পৈতেটা দিয়ে নিয়ে গাঁয়ের পূজোটাতে হাত দিতে পারে। ওর আমার তাহ'লে ভাবনা কি? আট দশ ঘর শিষ্যবাড়ী আছে, আর যদি মা সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছায় গাঙ্গুলী-বাড়ীর পূজোটা বাঁধা হয়ে যায় তাহ'লেই—

সুনীলের মা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তাঁহার ছেলে সুরেশ বড় হইলে আইন পড়িয়া—তাঁহার জ্যেঠতুত ভাই—পাটনার বড় উকীল, তাঁহার কাছে আসিয়া ওকালতি করিবে। সুরেশের সে মামা নিঃসন্তান অথচ খুব পসার-ওয়ালা উকীল। এখন হইতেই তাঁহাদের ইচ্ছা যে, সুরেশকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান,—কিন্তু সুনীলের মা পরের বাড়ী ছেলে রাখিতে যাইবেন কেন ইত্যাদি সংবাদ নির্বোধ সর্বজয়ার মত হাউ হাউ না বকিয়াও, ইতিপূর্বে মাঝে-মিশালে কথাবার্তার ফাঁকে তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ভুবন মুখুয্যের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া সর্বজয়া ছেলেকে বলিল—শোন একটা কথা—পরে চুপি চুপি বলিল—তোর জ্যেঠিমার কাছে গিয়ে বলিস্ না যে, জ্যেঠিমা আমার জুতো নেই, আমায় এক জোড়া জুতো দাও না কিনে?

অপু বলিল, কেন মা ?

—বলিস্ না, বড়লোক ওরা, চাইলে হয়তো ভালো এক জোড়া জুতো দেবে এখন—দেখিস্‌নি যেমন ঐ সুরেশের পায়ে আছে ? তোর পায়ে ওই রকম লাল জুতো বেশ মানায়—

অপু লাজুক মুখে বলিল—আমার বড় লজ্জা করে মা, আমি বল্‌তে পারবো না—কি হয়তো ভাববে—আমি···

সর্বজয়া বলিল—তা এতে আবার লজ্জা কি ! আপনার জন—বলিস্ না, তাতে কি ?

—হুঁ···উ—সে আমি বল্‌তে পার্‌বো না মা। আমি কথা বল্‌তে পারিনে জ্যেঠিমার সাম্‌নে—

সর্বজয়া রাগ করিয়া বলিল—তা পার্‌বে কেন ? তোমার যত বিদ্যি সব ঘরের কোণে—খালি পায়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছো, আজ দু'বছর পায়ে জুতো নেই সে ভালো, বড় লোক, চাইলে হয় তো দিয়ে দিত কিনে—তা তোমার মুখ দিয়ে বাক্যি বেরুবে না—মুখচোরার রাজা—

পূর্ণিমার দিন রাণীদের বাড়ী সত্যনারায়ণের পূজার প্রসাদ আনিতে অপু সেখানে গেল। রাণী তাহাকে ডাক দিয়া হাসিমুখে বলিল—আমাদের বাড়ী তো আগে আগে কত আস্‌তিস্, আজকাল আসিস্ নে কেন রে ?

—কেন আস্‌বো না রাণুদি,—আসি তো ?

রাণী অভিমানের সুরে বলিল, হ্যাঁ আসিস্ ! ছাই আসিস্ ! আমি তোর কথা কত ভাবি। তুই ভাবিস্ আমার, আমাদের কথা ?

—না বৈ কি ! বা রে—মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো দিকি ?

এ ছাড়া অন্য কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তাহার যোগাইল না। রাণী তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে গিয়া তাহার জন্য ফল প্রসাদ ও সন্দেশ লইয়া আসিয়া হাতে দিল। হাসিয়া বলিল, থালা-সুদ্ধ নিয়ে যা, আমি কাল গিয়ে খুড়ীমার কাছ থেকে নিয়ে আসবো—

রাণীর মুখের হাসিতে তাহার উপর একটা নির্ভরতার ভাব আসিল অপুর। রাণুদি কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আজকাল, রাণুদির মতো সুন্দরী এ পর্যন্ত অন্য কোনো মেয়ে সে দেখে নাই। অতসীদি সর্বদা বেশ ফিটফাট থাকে বটে, কিন্তু দেখিতে রাণুদির কাছে লাগে না। তাহা ছাড়া অপু জানে, এ গ্রামের মেয়েদের মধ্যে, রাণুদির মত মন কোনো মেয়ের নয়। দিদির পরই যদি সে কাহাকেও ভালবাসে সে রাণুদি ! রাণুদিও যে তাহার দিকে টানে, তাহা কি আর অপু জানে না ?

সে থালা তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—রাণুদি, তোমাদের এই পশ্চিমের ঘরের আলমারিতে যে বইগুলো আছে সতুদা পড়তে দেয় না। একখানা দেবে পড়তে? প'ড়েই দিয়ে যাব।

রাণী বলিল—কোন্ বই আমি তো জানিনে, দাঁড়া আমি দেখছি—

সতু প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না, অবশেষে বলিল—আচ্ছা পড়তে দিই, যদি এক কাজ করিস্। আমাদের মাঠের পুকুরে রোজ মাছ চুরি যাচ্ছে—জ্যাঠামশায় আমাকে বলেছে, সেখানে গিয়ে দুপুর বেলা চৌকি দিতে,—আমার সেখানে একা একা ভালো লাগে না, তুই যদি যাস্ আমার বদলে তবে বই পড়তে দেবো—

রাণী প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—বেশ তো? ও ছেলেমানুষ সেই বনের মধ্যে ব'সে মাছ চৌকি দেবে বৈকি? তুমি বুড়ো ছেলে পারো না, আর ও যাবে? যাও তোমায় বই দিতে হবে না, আমি বাবার কাছে চেয়ে দেবো—

অপু কিন্তু রাজী হইল। রাণীর বাবা ভুবন মুখুয্যে বিদেশে থাকেন, তাঁহার আসিবার অনেক দেরি অথচ এই বইগুলোর উপর তাহার বড লোভ। এগুলি পড়িবার লোভে সে কতদিন লুব্ধচিত্তে সতুদের পশ্চিমেব ঘরটায় যাতায়াত করিয়াছে। দু-একখানা একটু আধটু পড়িয়াছেও। কিন্তু সতু নিজে তো পড়েই না, কাহাকেও পড়িতে দেয় না। নায়কের ঠিক সঙ্কটময় মুহূর্তটিতে হাত হইতে বই কাড়িয়া লইয়া বলে—রেখে দে অপু, এ ছোট কাকার বই, ছিঁড়ে যাবে, দে।

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল।

প্রতিদিন দুপুরবেলা আলমারী হইতে বাছিয়া একখানি করিয়া বই সতুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া যায় ও বাঁশবনের ছায়ায় কতকগুলো সেওড়াগাছের কাঁচা ডাল পাতিয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া একমনে পড়ে। বই অনেক আছে···প্রণয়-প্রতিমা, সরোজ-সরোজিনী, কুসুম-কুমারী, সচিত্র যৌবনে-যোগিনী নাটক, দস্যু-দুহিতা, প্রেম-পরিণাম বা অমৃতে গরল, গোপেশ্বরের গুপ্তকথা······সে কত নাম করিবে। এক-একখানি করিয়া সে ধরে, শেষ না করিয়া আর ছাড়িতে পারে না। চোখ টাটাইয়া ওঠে, রগ টিপ্ টিপ্ করে; পুকুরধারে নির্জন বাঁশবনের ছায়া ইতিমধ্যে কখন দীর্ঘ হইয়া মজা পুকুরটার পাটা-শেওলার দামে নামিয়া আসে, তাহার খেয়ালই থাকে না কোন্দিক দিয়া বেলা গেল।

কি গল্প! সরোজিনীকে সঙ্গে লইয়া সরোজ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে যাইতেছেন, পথে নবাবের হুকুমে সরোজের হইয়া গেল প্রাণদণ্ড, সরোজিনীকে একটা অন্ধকার ঘরে চাবিতালা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। গভীর রাত্রে কক্ষের

দরজা খুলিয়া গেল, নবাব মত্ত অবস্থায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—সুন্দরী, আমার হুকুমে সরোজ মরিয়াছে, আর কেন···ইত্যাদি। সরোজিনী সদর্পে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন—রে পিশাচ, রাজপুত রমণীকে তুই এখনও চিনিস নাই, এ দেহে প্রাণ থাকিতে—ইত্যাদি। এমন সময় কাহার ভীম পদাঘাতে কারাগারের জানালা ভাঙ্গিয়া গেল। নবাব চমকাইয়া উঠিয়া দেখিলেন—একজন জটাজুটধারী তেজঃপুঞ্জ-কলেবর সন্ন্যাসী, সঙ্গে যমদূতের মত বলিষ্ঠ চার-পাঁচজন লোক। সন্ন্যাসী রোষকষায়িত নয়নে নবাবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—নরাধম, রক্ষক হইয়া ভক্ষক?—পরে সরোজিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন···মা, আমি তোমার স্বামীর গুরু—যোগানন্দ স্বামী, তোমার স্বামীর প্রাণহানি হয় নাই, আমার কমণ্ডলুর জলে পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে, এখন তুমি চল মা আমার আশ্রমে, বৎস সরোজ তোমার অপেক্ষা করিয়া আছে।—গ্রন্থকারের লিপিকৌশল সুন্দর,—সরোজের এই বিস্ময়জনক পুনরুজ্জীবন আরও বিশদভাবে ফুটাইবার জন্য তিনি পরবর্তী অধ্যায়ের প্রতি পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া বলিতেছেন—এইবার চল পাঠক, আমরা দেখি বধ্যভূমিতে সরোজের প্রাণদণ্ড হইবার পর কি উপায়ে তাহার পুনর্জীবন লাভ সম্ভব হইল—ইত্যাদি।

এক একটি অধ্যায় শেষ করিয়া অপুর চোখ ঝাপ্‌সা হইয়া আসে,—গলায় কি যেন আট্‌কাইয়া যায়। আকাশের দিকে চাহিয়া সে দু-এক মিনিট কি ভাবে,—আনন্দে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তাহার দুই কান দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে থাকে, পরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্তী অধ্যায়ে মন দেয়। সন্ধ্যা হইয়া যায়, চারিধারে ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসে, মাথার উপর বাঁশঝাড়ে কত কী পাখীর ডাক শুরু হয়, উঠি উঠি করিয়াও বইএর পাতার এক ইঞ্চি উপরে চোখ রাখিয়া পড়িতে থাকে—যতক্ষণ অক্ষর দেখা যায়।

এই রকম বই তো সে কখনো পড়ে নাই? কোথায় লাগে সীতার বনবাস আর ডুবালের গল্প?

বাড়ী আসিলে তাহার মা বকে—এমন হাবলা ছেলেও তুই? পরের মাছ চৌকি দিস্ গিয়ে সেই একলা বনের মধ্যে ব'সে একখানা বই পড়বার লোভে? আচ্ছা বোকা পেয়েছে তোকে!

কিন্তু বোকা অপুর লাভ যেদিক দিয়া আসে, তাহার সেদিক সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই! আজকাল সে দুইখানা বই পাইয়াছে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা'।—উইঢিবি, বৈঁচিবনের প্রেক্ষাপটে নিস্তব্ধ দুপুরের মায়ায় দৃশ্যের পর দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়া চলে—জেলেখা নদীর উপর

বসিয়া আহত নয়েনের শুশ্রূষা করিতেছে, আওরঙ্গজেবের দরবারে নিজেকে পাঁচহাজারী মন্‌সবদারের মধ্যে স্থান পাইতে দেখিয়া শিবাজী রাগে ফুলিয়া ভাবিতেছেন—শিবাজী পাঁচহাজারী? একবার পুণায় যাও তো, শিবাজীর ফৌজে কত পাঁচহাজারী মন্‌সবদার আছে গণিয়া আসিবে!...

রাজবারার মরুপর্বতে, দিল্লী-আগ্রার রঙ-মহালে শিস্‌মহালে, ওড়্‌না-পেশোয়াজ-পরা সুন্দরীদলের সঙ্গে তাহার সারাদিনমান কাটে। এ কোন্ জগৎ—যেখানে শুধু জ্যোৎস্না, তলোয়ার-খেলা, সুন্দর মুখের বন্ধুত্ব, আহেরিয়া-উৎসবে দীর্ঘবর্শা হাতে ঘোড়ায় চড়িয়া উষর উপত্যকা ও ভুট্টাক্ষেত পার হইয়া ছোটা?

বীরের যাহা সাধ্য, রাজপুতের যাহা সাধ্য, মানুষের যাহা সাধ্য—প্রতাপ সিংহ তাহা করিয়াছিলেন! হল্‌দিঘাটের পার্বত্য-বর্ত্মের প্রতি পাষাণ-ফলকে তাহার কাহিনী লেখা আছে। দেওয়ারের রণক্ষেত্রের দ্বাদশ-সহস্র রাজপুত্রের হৃদয়-রক্তে তাহার কাহিনী অক্ষয় মহিমায় লেখা আছে।

বহুদিন পরেও প্রাচীন যোদ্ধগণ শীতের রাত্রিতে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া পৌএপৌত্রীগণের নিকট হল্‌দিঘাটের অদ্ভুত বীরত্বের কথা বলিত।...

অদৃশ্যহস্তনিক্ষিপ্ত একটি বর্শা আসিল।...অপু এই গ্রামের চিরশ্যাম বনভূমির ছায়ায়, লতাপাতার নিবিড়তায়, ভিজামাটির গন্ধে মানুষ হইয়াছে—তবুও সে জানে রাজপুতনার ভীল-প্রদেশের বা আরাবল্লী-মেবারের প্রত্যেকটি স্থান; নাহারা-মগ্‌রোব অপূর্ব বন্য সৌন্দর্য সে ভাল করিয়াই চেনে।—পর্বত হইতে অবতরণশীল শস্ত্রপাণি তেজসিংহের মূর্তি কি সুন্দর মনে হয়!...

'সেই চপ্পন প্রদেশে অনেক দিন অবধি সেই ভীল গ্রামের নির্জনে কন্দরে ও উন্নতশিখরে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত শ্রুত হইত। অতি প্রত্যূষে নির্জন প্রান্তরে, পথিকগণ কখনও কখনও একটি রমণীর পাণ্ডুর মুখ ও চঞ্চল নয়ন দেখিতে পাইত; লোকে বলিত কোন বিশ্রামশূন্যা উদ্বিগ্না বনদেবী হইবে।'——সেই গানের অস্পষ্ট করুণ মূর্ছনা যেন অপুর কানে বাঁশবাগানের পিছন হইতে ভাসিয়া আসে!

কমলমীর, সূর্যগড়ের যুদ্ধ, সেনাপতি শাহবাজ খাঁ, সুন্দরী নূরজাহান, পুষ্পকুমারী, বন্য ভীল-প্রদেশ, বীর বালক চন্দন সিংহ—দূর সুদূর কল্পনা।—তবু কত নিকট, কত বাস্তব মনে হয়। রাজবারার মরুভূমি আর নীল আরাবল্লীর উন্নত পর্বতের শিখরে শিখরে চেনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, দেবী মেবার লক্ষ্মীর অলক্ত-রক্ত-পদচিহ্ন আঁকা রহিয়াছে বনবাস ও বীর-নদীর তটভূমির শিলাখণ্ডে, ঝরণার উপল-রাশির উপরে, বাজরা ও জওয়ার ক্ষেতে ও মৌউল বনে।

চিতোর রক্ষা হইল না। রাণা অমরসিংহ বাদশাহের সম্মান গ্রহণ করিলেন। সর্বহারা পিতা প্রতাপসিংহ যিনি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বনে পর্বতে ভীলের পাল লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি ব্যথাক্ষুব্ধচিত্তে কোথা হইতে দেখিয়াছিলেন এ সব?

তপ্ত চোখের জলে পুকুর, উইঢিবি, বৈঁচিবন, বাঁশবাগান—সব ঝাপ্‌সা হইয়া আসে।

সেদিন দুপুরে তাহার বাবা একটা কাগজের মোড়ক দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল—দ্যাখো তো খোকা, কি বলো দিকি?

অপু তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল; উৎসাহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—খবরের কাগজ? না বাবা?

সেদিন রামকবচ লিখিয়া দিয়া বেহারা ঘোষের শাশুড়ীর নিকট যে তিনটি টাকা পাইয়াছে, স্ত্রীকে গোপন করিয়া হরিহর তারই মধ্যে দু'টাকা খবরের কাগজের দাম পাঠাইয়া দিয়াছিল, স্ত্রী জানিতে পারিলে অন্য পাঁচটা অভাবের গ্রাস হইতে টাকা দুইটাকে কোন মতেই বাঁচানো যাইত না।

অপু বাবার হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাগজের মোড়কটা লইয়া খুলিয়া ফেলে। হ্যাঁ—খবরের কাগজ বটে। সেই বড় বড় অক্ষরে, 'বঙ্গবাসী' কথাটা লেখা, সেই নতুন কাগজের গন্ধটা, সেই ছাপা, সেই সব—যাহার জন্য বৎসরখানেক পূর্বে সে তীর্থের কাকের মত অধীর আগ্রহে ভুবন মুখুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপের ডাকবাক্সটার কাছে পিওনের অপেক্ষায় প্রতি শনিবারে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত। খবরের কাগজ! খবরের কাগজ! কি সব নতুন খবর না জানি দিয়াছে? কি অজানা কথা সব লেখা আছে ইহার বড় বড় পাতায়?

হরিহরের মনে হয়—দুইটা টাকার বিনিময়ে ছেলের মুখে যে আনন্দের হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহার তুলনায় কোন বন্ধকী মাকড়ী খালাসের আত্মপ্রসাদ মোটেই বেশী হইত না!

অপু খানিকক্ষণ পড়িয়া বলে—দ্যাখো বাবা, একজন 'বিলাত যাত্রী'র চিঠি বেরিয়েচে, আজ থেকেই নতুন বেরুলো। খুব সময়ে আমাদের কাগজটা এসেছে—না বাবা?

তবুও তার মনে দুঃখ থাকিয়া যায় যে, গত বৎসর কাগজখানা হঠাৎ উহারা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে জাপানী মাকড়সাসুরের গল্পটার শেষ ভাগ তাহার পড়া হয় নাই, রাইকো রাজসভায় যাওয়ার পর তাহার যে কি ঘটিল তাহা সে জানিতে পারে নাই।

একদিন রাণী বলিল—তোর খাতায় তুই কি লিখছিস্ রে?

অপু বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কোন্ খাতায় ? তুমি কি ক'রে—

—আমি তোমাদের বাড়ী সেদিন দুপুরে যাইনি বুঝি ? তুই ছিলিনে, খুড়িমার সঙ্গে কতক্ষণ ব'সে কথা বললাম। কেন, খুড়িমা তোকে বলে নি ? তাই দেখলাম তোর বইএর দপ্তরে তোর সেই রাঙা খাতাখানায় কি সব লিখিচিস্···আমার নাম রয়েচে, আর দেবী সিং না কি একটা—

অপু লজ্জায় লাল হইয়া বলিল—ও একটা গল্প।

—কি গল্প রে ? আমায় কিন্তু পড়ে শোনাতে হবে।

পরদিন রাণী একখানা ছোট বাঁটানো খাতা অপুর হাতে দিয়া বলিল—এতে তুই আমাকে একটা গল্প লিখে দিস্—একটা বেশ ভাল দেখে। দিবি তো ? অতসী বল্‌ছিল তুই ভাল লিখতে পারিস নাকি। লিখে দে, আমি অতসীকে দেখাবো।

অপু রাত্রে বসিয়া বসিয়া খাতা লেখে। মাকে বলে—আর একটা পলা তেল দাও না মা। এইটুকু লিখে রাখি আজ। তাহার মা বলে—আজ রাত্তিরে আর পড়ে না—মোটে দু'পলা তেল আছে, কাল আবার রাঁধবো কি দিয়ে ? এইখানে রাঁধছি, এই আলোতে ব'সে পড। অপু ঝগড়া করে।

মা বলে—এঃ, ছেলের রাত্তির হলে যত লেখা-পড়ার চাড়্—সারাদিন চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই। সকালে করিস্ কি ? যা তেল দেব না।

অবশেষে অপু উনুনের পাড়ে কাঠের আগুনের আলোয় খাতাখানা আনিয়া বসে। সর্বজয়া ভাবে—অপু আর একটু বড় হলে আমি ওকে ভাল দেখে বিয়ে দেবো। এ ভিটেতে নতুন পাকা বাড়ী উঠ্‌বে। আস্‌চে বছর পৈতেটা দিয়ে নি, তারপর গাঙ্গুলী বাড়ীর পুজোটা যদি বাঁধা হয়ে যায়—

···চার-পাঁচদিন পরে সে রাণীর হাতে খাতা ফিরাইয়া দিল। রাণী আগ্রহের সহিত খাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—লিখেচিস ?

অপু হাসি হাসি মুখে বলিল—দ্যাখো না খুলে ?

রাণী দেখিয়া খুশির স্বরে বলিল—ওঃ অনেক লিখেচিস্ যে রে ! দাঁড়া অতসীকে ডেকে দেখাই।

অতসী দেখিয়া বলিল—অপু লিখেচে না আরও কিছু—ইস্ ! এ সব বই দেখে লেখা।

অপু প্রতিবাদের স্বরে বলিল—ইঃ, বই দেখে বই কি ? আমি তো গল্প বানাই—পটুকে জিজ্ঞেস ক'রো দিকি অতসী-দি ? ওকে বিকেলে গাঙের ধারে ব'সে ব'সে কত বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলিনে বুঝি ?

রাণী বলিল—না ভাই, ও লিখেছে আমি জানি ! ও ওই রকম লেখে।

খাস যাত্রার পালা লিখেছিল খাতাতে, আমায় পড়ে শোনালে। পরে অপুকে বলিল—নাম লিখে দিস্‌নি তোর? নাম লিখে দে।

অপু এবার একটু অপ্রতিভতার স্বরে বলিল যে, গল্পটা তাহার শেষ হয় নাই, হইলেই নাম লিখিয়া দিবে এখন! 'সচিত্র যৌবনে-যোগিনী' নাটকের ধরণে গল্প আরম্ভ করিলেও শেষটা কিরূপ হইবে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই; অথচ দীর্ঘ দিন তাহার কাছে খাতা থাকিলেও রাণুদি—বিশেষ করিয়া অতসীদি পাছে তাহার কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে অসমাপ্ত অবস্থাতেই ফেরৎ দিয়াছে।

তাহার বাবা বাড়ীতে নাই। সকালে উঠিয়া সে তাহাদের গ্রামের আর সকলের সঙ্গে পাশের গ্রামের এক আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গেল। সুনীলও গেল তাহার সঙ্গে। নানা গ্রামের ফলারে বামুনের দল পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূর হইতেও হাঁটিয়া আসিয়াছে। এক-এক ব্যক্তি পাঁচ-ছয়টি করিয়া ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সকলকে সুবিধামত স্থানে বসাতে গিয়া একটা দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম। প্রত্যেকের পাতে চারিখানা করিয়া লুচি দিয়া যাইবার পর পরিবেশনকারীরা বেগুনভাজা পরিবেশন করিতে আসিয়া দেখিল কাহারও পাতে লুচি নাই—সকলেই পার্শ্ববর্তী চাদরে বা গামছায় লুচি তুলিয়া বসিয়া আছে! একটি ছোট ছেলে অতশত না বুঝিয়া পাতের লুচি ছিঁড়িতে যাইতেছে—তাহার বাপ বিশ্বেশ্বর ভট্‌চায ছোঁ মারিয়া ছেলের পাত হইতে লুচি উঠাইয়া পাশের চাদরে রাখিয়া বলিল—এগুলো রেখে দাও না! আবার এখুনি দেবে এখন।

তাহার পর খানিকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ সোরগোল হইতে লাগিল—'লুচির ধামাটা এ সারিতে,' 'কুম্‌ড়োটা যে আমার পাতে একেবারেই,'···'ওহে, গরম গরম দেখে,' 'মশাই কি দিলেন হাত দিয়ে দেখুন দিকি, স্রেফ্‌ কাঁচা ময়দা'··· ইত্যাদি। ছাঁদার পরিমাণ লইয়া কর্মকর্তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের তুমুল বিবাদ। কে একজন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—তা হোলে সেখানে ভদ্দর লোকদের নেমতন্ন করতে নেই। স'-পাঁচগণ্ডা লুচি এ একেবারে ধরা-বাঁধা ছাঁদার রেট্—বল্লাল সেনের আমল থেকে বাঁধা রয়েচে। চাইনে তোমার ছাঁদা, কন্দপ্পো মজুমদার এমন জায়গায় কখনও—

কর্মকর্তা হাতে পায়ে ধরিয়া কন্দর্প মজুমদারকে প্রসন্ন করিলেন।

অপুও এক পুঁটলি ছাঁদা বহিয়া আনিল। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওমা, এযে কত এনেচিস—দেখি খোল্ তো? লুচি পানতুয়া, গজা—কত রে! ঢেকে রেখে দি, সকাল বেলা খেও এখন।

অপু বলিল—তোমায়ও কিন্তু মা খেতে হবে—তোমার জন্যে আমি চেয়ে দু'বার ক'রে পানতুয়া নিয়েচি।

সর্বজয়া বলিল—হ্যাঁরে, তুই বল্লি নাকি আমার মা খাবে দাও? তুই তো হাবলা ছেলে!

অপু ঘাড় ও হাত নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, তাই বুঝি আমি বলি! এমন ক'রে বল্লাম তারা ভাবলে আমি খাবো।

সর্বজয়া খুশির সহিত পুঁটুলিটা তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে অপু সুনীলদের বাড়ী গেল। উহাদের ঘরের রোয়াকে পা দিয়াই শুনিল, সুনীলের মা সুনীলকে বলিতেছেন—ওসব কেন ব'য়ে আনলি বাড়ীতে? কে আনতে বলেচে তোকে? সুনীলও সকলের দেখাদেখি ছাঁদা বাঁধিয়াছিল, বলিল—কেন মা সবাই তো নিলে—অপুও তো এনেচে।

সুনীলের মা বলিলেন—অপু আনবে না কেন—ও ফলারে বামুনের ছেলে! ও এর পর ঠাকুরপুজো ক'বে আর ছাঁদা বেঁধে বেড়াবে,—ওই ওদের ধারা। ওর মা-টাও অমনি হ্যাংলা। ঐ জন্যে আমি তখন তোমাদের নিয়ে এ গাঁয়ে আসতে চাইনি। কুসঙ্গে পড়ে যত কুশিক্ষা হচ্ছে! যা, ও সব অপুকে ডেকে দিয়ে আয়—যা; না হয় ফেলে দিগে যা। নেমন্তন্ন করেচে নেমন্তন্ন খেলি—ছোট-লোকের মত ওসব বেঁধে আনবার দরকার কি!

অপু ভয় পাইয়া আর সুনীলদের ঘরে ঢুকিল না। বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিল যাহা তাহার মা পাইয়া এত খুশি হইল, জ্যাঠাইমা তাহা দেখিয়া এত রাগিল কেন? খাবারগুলো কি ঢেলামাটি যে, সেগুলো ফেলিয়া দিতে হইবে? তাহার মা হ্যাংলা? সে ফলারে বামুনের ছেলে? বা রে! জ্যেঠিমা যেন অনেক পানতুয়া-গজা খাইয়াছে, তাহার মা ও-সব কিছুই খাইতে পায় না। আর সেই বা নিজে এ সব ক'দিন খাইয়াছে? সুনীলের কাছে যাহা অন্যায়, তাহার কাছে সেটা কেমন করিয়া অন্যায় হইতে পারে!

লেখাপড়া বড় একটা তাহার হয় না, সে এই সবই করিয়া বেড়ায়। ফলার খাওয়া, ছাঁদা বাঁধা, বাপের সঙ্গে শিষ্যবাড়ী যাওয়া, মাছধরা। সেই ছোট্ট ছেলে পটু—জেলেপাড়ায় কড়ি খেলিতে গিয়া সে সেবার মার খাইয়াছিল—সে এ সব বিষয়ে অপুর সঙ্গী। আজকাল সে আরও বড় হইয়াছে, মাথাতে লম্বা হইয়াছে, সব সময় অপুদার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ওপাড়া হইতে এ পাড়ায় আসে শুধু অপুদার সঙ্গে খেলিতে, আর কাহারও সঙ্গে সে বড় একটা মেশে না। তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া অপুদা যে জেলের ছেলেদের হাতে মার খাইয়াছিল, সেকথা সে এখনো ভোলে নাই।

মাছ ধরিবার শখ অপুর অত্যন্ত বেশী। সোনাডাঙা মাঠের নীচে ইচ্ছামতীর ধারে কাঁচিকাটা খালের মুখে ছিপে খুব মাছ ওঠে। প্রায়ই সে এইখানটিতে গিয়া নদীতীরে একটা বড় ছাতিম গাছের তলায় মাছ ধরিতে বসে। স্থানটা তাহার ভারি ভালো লাগে, একেবারে নির্জন,. দুধারে নদীর পাড়ে কত কি গাছপালা নদীর জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওপারে ঘন সবুজ উলুবন, মাঝে মাঝে লতাদোলানো কদম শিমুল গাছ, বেগুনী রংএর বনকলমী ফুলে ছাওয়া ঝোপ, দূরে মাধবপুর গ্রামের বাঁশবন, পাখীর ডাকে, বনের ছায়ায়, উলুবনের শ্যামলতায় মেশামেশি মাখামাখি স্নিগ্ধ নির্জনতা!

সেই ছেলেবেলায় প্রথম কুঠীর-মাঠে আসার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন নদীর কি মোহ যে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে! ছিপ ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে চাহিতেই তাহার মন অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। মাছ হোক বা না হোক, যখনই ঘন বৈকালের ছায়া মাঠের ধারের খেজুর ঝোপের ডাঁসা খেজুরের গন্ধে ভরপুর হইয়া উঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বৌ-কথা-কও, পাপিয়ার ডাক ভাসিয়া আসে, ডালে-ডালে অভ্র-আবীর ছড়াইয়া সূর্যদেব সোনাডাঙার মাঠের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙশালিকের দল কলরব করিতে করিতে বাসায় ফেরে, তখনই তাহার মন বিভোর হইয়া ওঠে, পুলক-চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখে; মনে হয়—মাছ না পাওয়া গেলেও রোজ সে এইখানটিতে আসিয়া বসিবে, ঠিক এই বড় ছাতিমগাছের তলাটাতে।

মাছ প্রায়ই হয় না, শরের ফাৎনা স্থির জলে দণ্ডের পর দণ্ড নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অটল। একস্থানে অতক্ষণ বসিয়া থাকিবার ধৈর্য তাহার থাকে না, সে এদিকে ওদিকে ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায়, ঝোপের মধ্যে পাখীর বাসার খোঁজে ফিরিয়া আসিয়া হয়ত চোখে পড়ে ফাৎনা একটু একটু ঠুকরাইতেছে। ছিপ তুলিয়া বলে—দূর! ঝেঁয়া মাছের ঝাঁক লেগেছে, এখানে কিছু হবে না। পরে সেখান হইতে ছিপ তুলিয়া একটু দূরে শেওলা দামের পাশে গিয়া টোপ ফেলে। জলটার গভীর কালো রংএ মনে হয় বড় রুই কাৎলা এখনি টোপ গেলে আর কি! ভ্রম ঘুচিতে বেশী দেরী হয় না, পরের ফাৎনা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এক একদিন সে এক-একখানা বই সঙ্গে করিয়া আনিয়া বসে।

ছিপ ফেলিয়া বই খুলিয়া পড়ে। সুরেশের নিকট হইতে সে একখানা নীচের ক্লাসের ছবিওয়ালা ইংরেজি বইও তাহার অর্থপুস্তক চাহিয়া লইয়াছে। ইংরাজি সে বুঝিতে পারে না, অর্থপুস্তক দেখিয়া গল্পের বাংলাটা বুঝিয়া লয় ও

ইংরাজি বইখানাতে শুধু ছবি দেখে! দূর দেশের কথা ও সকল রকম মহত্বের কাহিনী খুব ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড দোলা দেয়, এই বইখানাতে সেই ধরণের অনেকগুলি গল্প আছে। কোথাকার মুক্তপ্রান্তরে একজন ভ্রমণকারী বিষম তুষারঝটিকার মধ্যে পথ হারাইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতে প্রাণ হারায়, অজানা মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া ক্রিষ্টোফার কলম্বস কিরূপে আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন—এমনি সব গল্প। যে দু'টি ইংরাজ বালক-বালিকা সমুদ্র-তীরেব শৈলগাত্রে গাঙচিলের বাসা হইতে ডিম সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, সে সাহসিনী বালিকা প্রাস্কোভিয়া লপুলফ নির্বাসিত পিতার নির্বাসনদণ্ড প্রত্যাহার করিবার আশায় জনহীন তুষারাবৃত প্রান্তরের পথে সুদূর সাইবেরিয়া হইতে একা বাহিব হইয়াছিল—তাহাদের যেন সে দেখিলেই চিনিতে পারে!

স্যার ফিলিপ সিডনীর ছোট্ট গল্পটুকু পড়িয়া তাহার চোখ দু'টি জলে ভরিয়া যায়। সুরেশকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে—সুরেশ দা, গল্পটা জান তুমি? বড ক'রে বলো না?

সুবেশ বলে—ও, জুটফেনের যুদ্ধের কথা!

অপু অবাক হইয়া বলে—কি সুরেশ দা? জুটফেন! কোথায় সে?

সুরেশ ঐটুকুর বেশী আর বলিতে পারে না?...

মাসখানেক পরে একদিন।

মাছ ধরিতে গিয়া একটা বড সরপুঁটি মাছ কি করিয়া তাহার ছিপে উঠিয়া গেল।

লোভ পাইয়া সে জায়গাটা আর অপু ছাড়ে না—গাছের ডালপালা ভাঙিয়া আনিয়া বিছাইয়া বসে।

ক্রমে বেলা যায়, নদীর ধারের মাঠে আবার সেই অপূর্ব নীরবতা, ওপারের দেয়াডির মাঠের পারে সুদূরপ্রসারী সবুজ উলুবনে, কাশ-ঝোপে, কদম-শিমূল গাছের মাথায় আবার তাহার শৈশব পুলকের শুভমুহূর্তেব অতি পরিচিত, পুরাতন সাথী—বৈকালের মিলাইয়া যাওয়া শেষ রোদ।

বঙ্গবাসীতে 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে পড়া সেই সুন্দর গল্পটি তাহার মনে পড়ে।

সে সুরেশদাদার ইংরাজি ম্যাপে ভূমধ্যসাগর কোথায় দেখিয়াছে তারই

ওপারে ফ্রান্স দেশ সে জানে। কতকাল আগে ফ্রান্স দেশের বুকে তখন বৈদেশিক সৈন্যবাহিনী চাপিয়া বসিয়াছে, দেশ বিপন্ন, রাজা শক্তিহীন, চারিদিকে অরাজকতা, লুঠতরাজ! জাতির এই ঘোর অপমানের দিনে, লোরেন্ প্রদেশের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক-দুহিতা পিতার মেষপাল চরাইতে যায়, আর মেষের দলকে ইতস্ততঃ ছাড়িয়া দিয়া নিভৃত পল্লীপ্রান্তরের তৃণভূমির উপর বসিয়া সুনীল নয়ন দু'টি আকাশ পানে তুলিয়া নির্জনে দেশের দুর্দশা চিন্তা করে। দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার নিষ্পাপ কুমারী মনে উদয় হইল, কে তাহাকে বলিতেছে—তুমি ফ্রান্সের রক্ষাকর্ত্রী, তুমি গিয়া রাজসৈন্য জড়ো কর, অস্ত্র ধর, দেশের জাতির পরিত্রাণের ভার তোমার হাতে! দেবী মেরী তাহার উৎসাহদাত্রী—দূর স্বর্গ হইতে তাঁহার আহ্বান আসে দিনের পর দিন। তারপর নবতেজদৃপ্ত ফরাসী সৈন্যবাহিনী কি করিয়া শত্রুদলকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, কি করিয়া ভাবময়ী কুমারী নিজে অস্ত্র ধরিয়া দেশের রাজাকে সিংহাসনে বসাইলেন, তারপর অজ্ঞানান্ধ লোকে কি করিয়া তাঁহাকে ডাইনী অপবাদে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিল এ সকল কথাই সে আজ পড়িয়াছে।

এই বৈকাল বেলাটাতে, এই শান্ত নদীর ধারে গল্পটা ভাবিতে ভাবিতে কি অপূর্ব ভাবেই তাহার মন পূর্ণ হইয়া যায়।—কুমারীর যুদ্ধের কথা, জয়ের কথা, অন্য সব কথা সে তত ভাবে না। কিন্তু যে ছবিটি তার বার বার মনে আসে তাহা শুধু নির্জন প্রান্তরে চিন্তারতা বালিকা আর চারিধারে যদৃচ্ছবিচরণশীল মেষদল, নিম্নে শ্যাম তৃণভূমি, মাথার উপর মুক্ত নীল আকাশ। একদিকে দুর্ধর্ষ বৈদেশিক শত্রু, নিষ্ঠুরতা, জয়লালসার দর্প, রক্তস্রোত,—অপর দিকে এক সরলা, দিব্য ভাবময়ী, নীলনয়না পল্লীবালিকা। ছবিটি তাহার প্রবর্ধমান বালক-মনকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

আরও ছবি মনে আসে! কতদূরে নীল সমুদ্রে ঘেরা মার্টিনিক দ্বীপ। চারিদিকে আখের ক্ষেত, মাথার উপর নীল আকাশ—বহু—বহু দূর—শুধু নীল আকাশ আর নীল সবুজ। শুধু নীল আর নীল। আরও কত কি, তাহা বুঝানো যায় না—বলা যায় না।

ছিপ গুটাইয়া সে বাড়ীর দিকে যাইবার যোগাড় করে। নদীর ধারে ধারে নতশীর্ষ বাব্‌লা ও সাঁইবাব্‌লার বন নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ফুলের ভার ঝরাইয়া দিতেছে। সোনাডাঙা মাঠের মাঝে ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার আড়ালে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে,—যেন কোন্ দেবশিশু আলকার জলন্ত ফেনিল সোনার সমুদ্র হইতে ফুঁ দিয়া বুদ্‌বুদ তুলিয়া খেলাচ্ছলে আকাশে

উড়াইয়া দিয়াছিল, সেই মাত্র সেটা পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর বনান্তরালে নামিয়া পড়িতেছে।

পিছন হইতে কে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সে জোর করিয়া হাত দিয়া চোখ ছাড়াইয়া লইতেই পটু খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সামনে আসিয়া বলিল— তোকে খুঁজে খুঁজে কোথাও পাইনে অপুদা; তারপর ভাবলাম তুই ঠিক মাছ ধর্তে এইছিস, তাই এলাম। মাছ হয় নি?…একটাও না? চল্ বরং একখানা নৌকা খুলে নিয়ে বেড়িয়ে আসি—যাবি?

কদমতলায় সায়েরের ঘাটে অনেক দূরদেশ হইতে নৌকা আসে, গোল-পাতা বোঝাই, ধান বোঝাই, ঝিনুক বোঝাই নৌকা সারি সারি বাঁধা। নদীতে জেলেদের ঝিনুক তোলা নৌকায় বড় জাল ফেলিয়াছে। এ সময় প্রতি বৎসরই ইহারা দক্ষিণ হইতে ঝিনুক তুলিতে আসে, মাঝ-নদীতে নৌকায় নৌকায় জোড়া দিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে। অপু ডাঙায় বসিয়া দেখিতেছিল—একজন কালোমত লোক বার বার ডুব দিয়া ঝিনুক খুঁজিতেছে ও অল্পক্ষণ পরে নৌকার পাশে উঠিয়া হাতের থলি হইতে দু'চারিখানা ঝিনুক বালি-কাদার রাশি হইতে ছাঁকিয়া নৌকার খোলে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। অপু খুশির সহিত পটুকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—দেখছিস্ পটু, কতক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে? আয় গুণে দেখি এক দুই ক'রে। পারিস তুই অতক্ষণ ডুবে থাকৃতে?…

নদীর দূর্বাঘাস-মোড়া তীরটি ঢালু হইয়া জলের কিনারা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এখানে-ওখানে বোঝাই নৌকায় খোঁটা পোঁতা—নোঙর ফেলা। ইহারা কত দেশ হইতে আসিয়াছে, কত বড় নদী খাল পার হইয়া, বড বড় নোনা গাঙের জোয়ার-ভাঁটা-তুফান খাইয়া বেড়ায়,—অপুর ইচ্ছা করে মাঝিদের কাছে বসিয়া সে সব দেশের গল্প শোনে? তাহার কেবল নদীতে নদীতে, সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়াইতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু সে চায় না। সুরেশের বইখানাতে নানা দেশের নাবিকদের কথা পড়িয়া অবধি ঐ ইচ্ছাই তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পটু ও সে নৌকার কাছে গিয়া দর করে—ও মাঝি, এই গোলপাতা একপটি কি দর?…তোমার এই ধানের নৌকো কোথাকার, ও মাঝি? ঝালকাটির? সে কোন্ দিকে, এখেন থেকে কতদূর?…

পটু বলিল—অপুদা, চল্ তেঁতুলতলার ঘাটে একখানা ডিঙি দেখি, একটু বেড়িয়ে আসি চল্।

দু'জনে তেঁতুলতলার ঘাট হইতে একখানা ছোট্ট-ডিঙি খুলিয়া লইয়া, তাহাকে এক ঠেলা দিয়া ডিঙির উপর চড়িয়া বসিল। নদীজলের ঠাণ্ডা আর্দ্র-

গন্ধ উঠিতেছে, কলমী-শাকের দামে জলটিপি বসিয়া আছে, চরের ধারে-ধারে চাষীরা পটোলক্ষেত নিড়াইতেছে, কেহ ঘাস কাটিয়া আঁটি বাঁধিতেছে, চালতে-পোতার বাঁকে তীরবর্তী ঘন ঝোপে গাঙ্‌শালিকের দল কলরব করিতেছে, পড়ন্ত বেলায় পুব আকাশের গায়ে নানারঙের মেঘস্তূপ।

পটু বলিল—অপু-দা একটা গান কর না? সেই গানটা সেদিনের!

অপু বলিল—সেটা নয়! বাবার কাছে সুর শিখে নিয়েছি একটা খুব ভাল গানের। সেইটে গাইবো, আর-এট্টু ওদিকে গিয়ে কিন্তু ভাই, এখানে ডাঙায় ওই সব লোক রয়েচে—এখানে না।

—তুই ভারি লাজুক অপু-দা। কোথায় লোক রয়েচে কতদূরে, আর তোর গান গাইতে—দূর, ধর্‌ সেইটে!

খানিকটা গিয়া অপু গান সুরু করে। পটু বাঁশের চটায় বৈঠাখানা তুলিয়া লইয়া নৌকার গলুইএ চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শোনে, নৌকা বাহিবার আবশ্যক হয় না, স্রোতে আপনা-আপনি ভাসিয়া ডিঙিখানা ঘুরিতে ঘুরিতে লা-ভাঙার বড় বাঁকের দিকে চলে। অপুর গান শেষ হইলে পটু একটা গান ধরিল। অপু এবার বাহিতেছিল। নৌকা কম দূরে আসে নাই—লা-ভাঙার বাঁকটা নজরে পড়িতেছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ পটু ঈশানকোনের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ও অপু-দা, কি রকম মেঘ উঠেচে দেখচিস্? এখুনি ঝড় এলো ব'লে—নৌকা ফেরাবি?

অপু বলিল—হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে গান গাইতে লাগে ভালো, চল্ আরও যাই।

কথা বলিতে বলিতে ঘন কালো মেঘখানা মাধবপুরের মাঠের দিক হইতে উঠিয়া সারা আকাশ ভরিয়া ফেলিল; তাহার কালো ছায়া নদীজল ছাইয়া ফেলিল। পটু উৎসুক চোখে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল। অনেক দূরে সোঁ সোঁ রব উঠিল, একটা অস্পষ্ট গোলমালের সঙ্গে অনেক পাখীর কলরব শোনা গেল, ঠাণ্ডা হাওয়া বহিল, ভিজা মাটির গন্ধ ভাসিয়া আসিল, পাখাওয়ালা আকন্দের বীজ মাঠের দিক হইতে অজস্র উড়িয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে গাছপালা মাথা লুটাইয়া, দোলাইয়া, ভাঙিয়া ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল।

নদীর জল ঘন কাল হইয়া উঠিল, তীরের সাঁইবাব্‌লা ও বড় বড় ছাতিম গাছের ডালপালা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, সাদা বকের দল কালো আকাশের নীচে দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া উড়িয়া পালাইল। অপুর বুক ফুলিয়া উঠিল, উৎসাহে উত্তেজনায় সে হাল ছাড়িয়া চারিধারে চাহিয়া ঝড়ের কাণ্ড

দেখিতে লাগিল, পটু কোঁচার কাপড় খুলিয়া ঝড়ের মুখে পালের মত উড়াইয়া দিতেই বাতাস বাধিয়া সেখানা ফুলিয়া উঠিল।

পটু বলিল—বড্ড মুখোড় বাতাস অপু-দা, সামনে আর নৌকো যাবে না। কিন্তু যদি উল্টে যায়? ভাগ্যিস সুনীলকে সঙ্গে করে আনি নি।

অপু কিন্তু পটুর কথা শুনিতেছিল না, সেদিকে তাহার কান ছিল না—মনও ছিল না। সে নৌকোর গলুইতে বসিয়া একদৃষ্টে সম্মুখের ঝটিকাক্ষুব্ধ নদী ও আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চারিধারে কালো নদীর নর্তনশীল জল, উড়ন্ত বকের দল, ঝোড়ো মেঘের-রাশি, দক্ষিণ দেশের মাঝিদের সিন্দুকের স্তূপগুলা, স্রোতে ভাসমান কচুরীপানার দাম সব যেন মুছিয়া যায়। নিজেকে সে 'বঙ্গবাসী' কাগজের সেই বিলাত-যাত্রী কল্পনা করে! কলিকাতা হইতে তাহার জাহাজ ছাড়িয়াছে; বঙ্গোপসাগরের মোহনায় সাগরদ্বীপ পিছনে ফেলিয়া সমুদ্র মাঝের কত অজানা দ্বীপ পার হইয়া, সিংহল-উপকূলের শ্যামসুন্দর নারিকেলবন-শ্রী দেখিতে দেখিতে কত অপূর্ব দেশের নীল পাহাড় দূর চক্রবালে রাখিয়া সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় অভিষিক্ত হইয়া, নতুন দেশের নব নব দৃশ্য পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে!—চলিয়াছে!—চলিয়াছে!

এই ইছামতীর জলের মতই কালো, গভীর, ক্ষুব্ধ, দূরের সে অদেখা সমুদ্রবক্ষ, এই রকম সবুজ বনঝোপ আরব সমুদ্রের সে দ্বীপটিতেও। সেখানে এইরকম সন্ধ্যায় গাছতলায় বসিয়া এডেন বন্দরে সেই বিলাত-যাত্রী লোকটির মত সে রূপসী মেয়ের হাত হইতে এক গ্লাস জল চাহিয়া লইয়া খাইবে। চাল্‌তেপোতার বাঁকের দিকে চাহিলে খবরের কাগজের বর্ণিত জাহাজের পিছনের সেই উড়নশীল জলচর পক্ষীর ঝাঁককে সে একেবারে স্পষ্ট দেখিতে পায় যেন!…

সে ওই সব জায়গায় যাইবে, ওই সব দেখিবে, বিলাত যাইবে, জাপান যাইবে, বাণিজ্য-যাত্রা করিবে, বড় সদাগর হইবে, অনবরত দেশে-বিদেশে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরিবে, বড় বড় বিপদের মুখে পড়িবে; চীন-সমুদ্রের মধ্যে আজিকার এই মন-মাতানো কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বিষম ঝড়ে তাহার জাহাজ ডুবু-ডুবু হইলে 'আমার অপূর্ব ভ্রমণ'এ পঠিত নাবিকদের মত সেও জালি-বোটে করিয়া ডুবোপাহাড় গায়ে-লাগা গুগ্‌লী-শামুক পুড়াইয়া খাইতে খাইতে অকূল দরিয়ায় পাড়ি দিবে! ওই যে মাধবপুর গ্রামে বাঁশবনের মাথায় তুঁতে রংএর মেঘের পাহাড় খানিকটা আগে ঝুঁকিয়াছিল—ওরই ওপারে সেই সব নীলসমুদ্র, অজানা বেলাভূমি, নারিকেলকুঞ্জ, আগ্নেয়গিরি, তুষারাস্তীর্ণ প্রান্তর, জেলেখা, সরযু, গ্রেস ডার্লিং, জুটকেন, গাঙচিল-পাখীর-ডিম-আহরণরতা সেই

সব সুশ্রী ইংরাজ বালক-বালিকা, সোনা-করা যাদুকর বটগাছ, নির্জন-প্রান্তরে চিন্তারতা লোরেনের সেই নীলনয়না পল্লীবালা জোয়ান—আরও কত কি আছে! তাহার টিনের বাক্সের বই কখানা, রাণু-দিদির বাড়ীর বইগুলি, সুরেশ দাদার কাছে চাহিয়া লওয়া বইখানা, পুরাতন 'বঙ্গবাসী' কাগজগুলা ওই সব দেশের কথাই তাহাকে বলে, সে সব দেশে কোথায় কাহারা যেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সেখান হইতে তাহারও ডাক আসিবে একদিন,—সেও যাইবে!···

একথা তাহার ধারণায় আসে না কতদূরে সে সব দেশ, কে তাহাকে লইয়া যাইবে, কি করিয়া তাহার যাওয়া সম্ভব হইবে! আর দিনকতক পরে বাড়ী-বাড়ী ঠাকুর পূজা করিয়া যাহাকে সংসার চালাইতে হইবে, রাত্রিতে যাহার পড়িবার তেলের জন্য মায়ের বকুনি খাইতে হয়, অত বয়স পর্যন্ত যে ইস্কুলের মুখ দেখিল না, ভাল কাপড়, ভাল জিনিস যে কাহাকে বলে জানে না—সেই মূর্খ, অখ্যাত সহায়সম্পদহীন পল্লীবালককে বৃহত্তর জীবনের আনন্দ-যজ্ঞে যোগ দিতে কে আহ্বান করিবে?

এ সব প্রশ্ন মনে জাগিলে হয়ত তাহার তরুণ-কল্পনার রথবেগ—তাহার আশাভরা জীবন-পথের দুর্বার মোহ, সকল ভয় সকল সংশয়কে জয় করিতে পারিত; কিন্তু এ সকল কথা তাহার মনে ওঠে না। শুধু মনে হয়—বড় হইলেই সব হইবে, অগ্রসর হইলেই সকল সুযোগ-সুবিধা পথের মাঝে কুড়াইয়া পাইবে··· এখন শুধু বড় হইবার অপেক্ষা মাত্র! সে বড় হইলে সুযোগ পাইবে, দিক দিক হইতে তাহার সাদর আমন্ত্রণ আসিবে,—সে জগৎ-জানার, মানুষ-চেনার দিগ্বিজয়ে যাইবে।

রঙীন ভবিষ্যৎ-স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার বাকী পথটুকু কাটিয়া যায়। বৃষ্টি আর পড়ে না, ঝড়ে কালো মেঘের রাশি উড়াইয়া আকাশ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তেঁতুলতলার ঘাটে ডিঙি ভিড়িতেই তাহার চমক ভাঙে; নৌকা বাঁধিয়া পটুর আগে আগে সে বাঁশবনের পথে উল্লাসের শিস দিতে দিতে বাড়ীর দিকে চলে। সে-ও তাহার মা ও দিদির মত স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।

আসলে অপু কিন্তু ঘুমায় নাই, সে জাগিয়াছিল। চোখ বুজিয়া শুইয়া রাত্রে মায়ের সঙ্গে বাবার যেসব কথাবার্ত্তা হইতেছিল, সে সব শুনিয়াছে। তাহারা

এদেশের বাস উঠাইয়া কাশী যাইতেছে। এদেশে অপেক্ষা কাশীতে থাকিবার নানা সুবিধার কথা বাবা গল্প করিতেছিল মায়ের কাছে। বাবা অল্প বয়সে সেখানে অনেকদিন ছিল, সে দেশের সকলের সঙ্গে বাবার আলাপ ও বন্ধুত্ব, সকলে চেনে বা মানে। জিনিসপত্রও সস্তা। তাহার মা আগ্রহ প্রকাশ করিল, সে সব সোনার দেশে কখনও কাহারও অভাব নাই,—দুঃখ এদেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে। মা আজ যাইতে পাইলে আজই যায়, একদিনও আর থাকিবার ইচ্ছা নাই। শেষে স্থির হইল বৈশাখ মাসের দিকে তাহাদের যাওয়া হইবে।···

গঙ্গানন্দপুরের সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুর-বাড়ীতে সর্বজয়ার পূজা মানত ছিল। ক্রোশ তিনেক দূরে কে পূজা দিতে যায়—এইজন্য এ পর্যন্ত মানত শোধ হয় নাই। এবার এদেশ হইতে যাইবার পূর্বে পূজা দিয়া যাওয়া দরকার; কিন্তু খুঁজিয়া লোক মিলিল না। অপু বলিল—সে পূজা দিয়া আসিবে, ও ঐ গ্রামে তাহার পিসিমা থাকেন, তাঁহাব সহিত কখনও দেখাশোনা হয় নাই, অমনি দেখা করিয়া আসিবে। তাহার মা বলিল—যাঃ, বকিস নে তুই, একলা যাবি বৈ কি? এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ পথ।

অপু মায়ের সঙ্গে তর্ক শুরু করিল—আমি বুঝি সবদিন এইরকম বাড়ীতে বসে থাক্‌বো! যেতে পারবো না কোথাও বুঝি? আমার বুঝি চোখ নেই, কান নেই, পা নেই?

—সব আছে। উনি একলা যাবেন সেই গঙ্গানন্দপুর—বড় সাহসী পুরুষ কিনা!

অবশেষে কিন্তু অপুর নির্বন্ধাতিশয্যে তাহাকেই পাঠাইতে হইল।

সোনাডাঙা মাঠের বুক চিরিয়া উঁচু মাটির পথ। পথের দু'ধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দফুলের বন, দীর্ঘ, শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভারে নত হইয়া দুর্বাঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পথে কোনো লোক নাই, দুপুরের অল্পই দেরী আছে, গাছপালার ছায়া ছোট হইয়া আসিতেছে। অপুর খালি পায়ে বেলে-মাটির তাত লাগিতেছে—তাহাতে বেশ আরাম হয়। পথের ধারে বনে ঝোপে কত কি ফুল ফুটিয়াছে, সাঁই-বাবলাগাছের নতুন ফোটা ফুলের শীষ, সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে, ছোট এক রকমের গাছে রাঙা রাঙা বন-ডুমুরের মত কি ফল অজস্র পাকিয়া টুক্‌টুক করিতে, মাটির মধ্য হইতে কেমন রোদ-পোড়া সোঁদা সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে।···সে মাঝে মাঝে নীচু হইয়া ঝোপের ভিতর হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বৈঁচিফল তুলিয়া হাতে-সেলাই-করা রাঙা সাটিনের জামাটার দু'পকেট ভর্তি করিয়া লইতেছিল।

যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না যে, সে কী ভালবাসে এই মাটির তাজা রোদপোড়া গন্ধটা এই ছায়াভরা দূর্বাঘাস, সূর্যের আলো-মাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখী, বনঝোপ, ঐ দোলানো ফুল-ফলের থোলো, আলকুশী, বনকলমী, নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিত তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না; ভারি মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে—খোকা, তুমি শুধু পথে-পথে বেড়িয়ে বেড়াও—তাহা হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়া ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে—শুধুই হাঁটে।···মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশবনে কঞ্চির ডালে ডালে শর্-শর্ শব্দ, বৈকালের রোদে সোনার সিঁদুর ছড়ানো আর নানা রঙ-বেরঙ-এর পাখীর গান।

অপুর শৈশব কাটিতেছিল এই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। এক ঋতু কাটিয়া গিয়া কখন অন্য ঋতু পড়ে—গাছপালায়, আকাশে বাতাসে, পাখীর কাকলীতে তাহার বার্তা রটে। ঋতুতে ঋতুতে ইছামতীর নব নব পরিবর্তনশীল। রূপ সম্বন্ধে তাহার চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—কোন্ ঋতু গাছপালায় জলে-স্থলে শূন্যে ফুলে ফলে কি পরিবর্তন ঘটায়, তাহা সে ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাদের সহিত এই ঘনিষ্ঠ যোগ সে ভালবাসে, ইহাদের ছাড়া সে জীবন কল্পনা করিতে পারে না। এই বিরাট অপরূপ ছবি চোখের উপরে রাখিয়া সে মানুষ হইতেছিল। গ্রীষ্মের খরতাপ ও গুমটের অবসানে সারা দিকচক্রবাল জুড়িয়া ঘননীল-মেঘসজ্জার গম্ভীর সুন্দর রূপ, অস্তবেলায় সোনা-ডাঙার মাঠের উপরকার আকাশে কত বর্ণের মেঘের খেলা, ভাদ্রের শেষে ফুটন্ত কাশ-ফুলে ভরা মাধবপুরের দূরপ্রসারিত চর, চাঁদনি রাতে জ্যোৎস্নাজালের খুপ্‌রি-কাটা বাঁশবনের তলা,—অপুর স্ফুটনোন্মুখ কৈশোরের সতেজ আগ্রহভরা অনাবিল মনে ইহাদের অপূর্ব বিশাল সৌন্দর্য চিরস্থায়ী ছাপ মারিয়া দিয়াছিল, কান্তিরসের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, চুপি চুপি তাহার কানে অমৃতের দীক্ষামন্ত্র শুনাইয়াছিল। অপু কখনো জীবনে এ শিক্ষা বিস্মৃত হয় নাই। চিরজীবন সৌন্দর্যের পূজারী হইবার যে ব্রত, নিজের অলক্ষিতে মুক্তরূপা প্রকৃতি তাহাকে তাহা ধীরে ধীরে গ্রহণ করাইতেছিলেন।···

নতিডাঙার বাঁওড়ে কাহারা মাছ ধরিতেছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল। গ্রামের মধ্যে একটা কানা ভিখারী একতারা বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে—ও গান তো অপু জানে—কতবার গাহিয়াছে :—

'দিন-দুপুরে চাঁদের উদয় রাত্ পোহানো হোল ভার।···'

বোষ্টম-দাদু গান খুব ভাল গায়।

হরিশপুরের মধ্যে ঢুকিয়া পথের ধারে একটা ছোট্ট চালাঘরে পাঠশালা বসিয়াছে, ছেলেরা সুর করিয়া নামতা পড়িতেছে, সে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। গুরুমশায়ের বয়স বেশী নয়; তাহাদের গাঁয়ের প্রসন্ন গুরুমশায়ের চেয়ে অনেক কম।

আর এক কথা তাহার বার বার মনে হইতেছিল। এইতো সে বড় হইয়াছে, আর ছোট নাই, ছোট থাকিলে কি আর মা একা কোথাও ছাড়িয়া দিত?... এখন কেবলই চলা, কেবলই সাম্‌নে আগাইয়া যাওয়া। তাহা ছাড়া, আসচে মাসের এই দিনটিতে তাহারা কতদূরে, কোথায় চলিয়া যাইবে! কোথায় সেই কাশী—সেখানে!

বৈকালের দিকে গঙ্গানন্দপুরে গিয়া পৌঁছিল। পাড়ার মধ্যে পৌঁছিতেই কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা তাহাকে এমন পাইয়া বসিল যে, সে কোনো দিকে চাহিতেই পারিল না। কায়ক্লেশে সম্মুখের পথে দৃষ্টি রাখিয়া কোনরকমে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সকলেই তাহার দিকে চাহিতেছে। সে যে আজ আসিবে তাহা যেন সকলেই জানে, হয়তো ইহারা এতক্ষণ মনে মনে বলিতেছে—এই সেই যাচ্ছে, দ্যাখ্ দ্যাখ্ চেয়ে। সে যে পুঁটুলির ভিতর বাঁধিয়া নারিকেল-নাড়ু লইয়া যাইতেছে, তাহাও যেন সকলে জানে। তাহার পিসেমশাই কুঞ্জ চক্রবর্তীর বাড়ীটা কোন্‌দিকে একথাটা পর্যন্ত সে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অবশেষে এক বুড়ীকে নির্জনে পাইয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করাতে সে বা্ল ও দেখাইয়া দিল। বাড়ীটার সামনে পাঁচিল-ঘেরা। উঠানে ঢুকিয়া সে কাহারবার সাক্ষাৎ পাইল না। দু একবার কাশিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় সাধ্য কলাটি কতক্ষণ সে চৈত্রমাসের খররৌদ্রে বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিত ঠিল— নাই, কিন্তু খানিকটা পরে একজন আঠারো উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে হার কাজে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই দেখিল—দরজার কাছে কাহাদেক একটি অপরিচিত, প্রিয়দর্শন বালক পুঁটুলি হাতে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটি বিস্মিতভাবে বলিল—তুমি কে খোকা? কোত্থেকে আসচো? —অপু আনাড়ির মত আগাইয়া আসিয়া অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল—এই আমার বাড়ী—নিশ্চিন্দিপুরে, আমার—নাম অপু।

তাহার মনে হইতেছিল—না আসিলেই ভাল হইত। হয়তো তাহার পিসিমা তাহার এরূপ অপ্রত্যাশিত আগমনে বিরক্ত হইবে, হয়তো ভাবিবে কোথা

হইতে আবার এক আপদ আসিয়া জুটিল!...তাহা ছাড়া,—কে জানিত আগে যে অপরিচিত স্থানে আসিয়া কথাবার্তা কওয়া এত কঠিন কাজ? তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিল।

কিন্তু মেয়েটি তখনই ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া মহা-আদরে রোয়াকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তাহার মা-বাবা কেমন আছেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার চিবুকে হাত দিয়া কত আদরের কথা বলিল। দিদিকে যদিও কখনও দেখে নাই তবুও দিদির নাম করিয়া খুব দুঃখ করিল। নিজের হাতে তাহার গায়ের জামা খুলিয়া, হাতমুখ ধোয়াইয়া শুকনা গামছা দিয়া মুছাইয়া তাড়াতাড়ি এক গ্লাস চিনির সরবৎ করিয়া আনিল। পিসি বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়, অল্প বয়স—রাজীর দিদির চেয়ে একটু বড়।

তাহার পিসিও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। জ্ঞাতিসম্পর্কে ভাইপোটি যে দেখিতে এত সুন্দর বা তাহার বয়স এত কম তাহার পিসি বোধ হয় ইতিপূর্বে জানিত না। তাই পাশের বাড়ী হইতে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া অপুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে একটু গর্বের সহিত বলিল—আমার ভাইপো, নিশ্চিন্দিপুরে বাড়ী, খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে, সম্পর্কে খুবই আপন, তবে আসা যাওয়া নেই তাই!...পরে সে পুনরায় গর্বের চোখে অপুর দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবটা এই—ছাখো আমার ভাইপোর কেমন রাজপুত্তুরের মত চেহারা, এখন বোঝ কি দরের—কি বংশের মেয়ে আমি!...

ক. সন্ধ্যার পর কুঞ্জ চক্রবর্তী বাড়ী আসিল। পাকশিটে-মারা চোয়াড়ে-
খুপ গাড়ে চেহারা, বয়স বুঝিবার উপায় নাই। তাহার পিসিকে দেখিয়া তাহার
অনা লজ্জা হইয়াছিল, পিসেমশায়কে তেমনি তাহার ভয় হইল। ছেলেবেলায়
কাস্তি প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িত, তেমনি যেন চেহারাটা। মনে হইল এ
শুনাষ্ট যেন এখনই বলিতে পারে—বড্ড জ্যাঠা ছেলে দেখচি তো তুমি?...

সৌ পরদিন সকালে উঠিয়া অপু পাড়ার পথে এদিক-ওদিক একটু ঘুরিয়া আসিল
তাঁরদিক জঙ্গলে ভরা, ফাঁকা জমি—দুর্বাঘাস প্রায় নাই, এমন জঙ্গল। এই একটা বাড়ী, আবার বনে-ঘেরা সুঁড়ি পথ বাহিয়া গিয়া আবার দূরে একটা বাড়ী। অনেক সময় লোকের বাড়ীর উঠানের উপর দিয়া পথ। তাহার বয়সী দু'চারজনকে খেলা করিতে দেখিল বটে, কিন্তু সকলেই তাহার দিকে এমন হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল যে, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সে তাহাদের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

পিসির বাড়ীর দিকে ফিরিবার সময়ও বিপদ। এরূপ সকালে মার কাছে

সে চিঁড়া, মুড়ি, নাড়ু বা বাসি-ভাত খাইয়া থাকে। এখানে কি উহারা দিবে? কাল তো রাত্রে ভাত খাইবার সময় দুধের সঙ্গে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে। আজ যদি সে এখনই ফিরে, তবে হয়তো উহারা ভাবিবে ছেলেটা ভারি পেটুক; খাবার খাইবার লোভে-লোভে এত সকালে বাড়ী ফিরিল। রোজ রোজ খাবার খাওয়া কি ভাল?—এখন সে কি করে? নাঃ, বাড়ী ফিরিবে না। আরও খানিক পথে-পথে ফিরিয়া একেবারে সেই ভাত খাওয়ার সময়ের একটু আগে বাড়ী যাইবে। অপরিচিত জায়গার এতক্ষণ পথেই বা কোথায় দাঁড়াইয়া থাকে।

পায়ে পায়ে সে অবশেষে বাড়ীতেই আসিয়া পৌঁছিল।

একটি ছয় সাত বছরের মেয়ে একটা কাঁসার বাটি হাতে বাড়ী ঢুকিয়া উঠান হইতে ডাকিয়া কহিল—নাউ রেঁধেচো জ্যেঠিমা, মোরে একটু দেবে?—অপুর পিসিমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল—কে রে, গুল্‌কী? না ওবেলা রাঁধবো, এসে নিয়ে যাস্। গুল্‌কী বাটি নামাইয়া রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, ছেলেদের চুলের মতো খাটো। ময়লা কাপড় পরণে, মাথায় তেল নাই, রং শ্যামবর্ণ। অপুর দিকে চাহিয়া, কি বুঝিয়া একবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া সে বাটি উঠাইয়া চলিয়া গেল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটা কাদের পিসিমা?

তাহার পিসি বলিল—কে, গুল্‌কী? ওদের বাড়ী এখানে না—ওর মা-বাপ কেউ কোথাও নেই। নিবারণ মুখুয্যের বউ—এই যে পাশের বাড়ী, ওর দূর সম্পর্কের জেঠী—সেখানেই থাকে।

পরদিন পাড়ার একটা ছেলে আসিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে ভাব করিল ও সঙ্গে করিয়া গ্রামের সকল পাড়া ঘুরাইয়া দেখাইয়া বেড়াইল। বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিল—সেই অনাথা মেয়ে গুল্‌কী পথের ধারে পা ছড়াইয়া একলাটি বসিয়া কি খাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আঁচলে গুটাইতে গেল—আঁচলে একরাশ আধপাকা বকুল ফল। অপু ইতিমধ্যে পিসিমার কাছে তাহার আরও পরিচয় লইয়াছে; নিবারণ মুখুয্যের বৌ ভাল ব্যবহার করে না, লোক ভাল নয়—পিসিমা বলিতেছিল—জেঠী তো নয় রণচণ্ডী, কত দিন খেতেও দেয় না, এর ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়। নিজের পুষ্যিই সাতগণ্ডা—তাদেরই জোটে না, তার আবার পর!…গুল্‌কীকে দেখিয়া অপুর মোটেই লজ্জা হয় না।—ছোট্ট এতটুকু মেয়েটা, আহা কেহ নাই! তাহার সঙ্গে ভাব করিতে অপুর বড় ইচ্ছা হইল। সে কাছে গিয়া বলিল—আঁচলে কি লুকুচ্চিস্ দেখি খুকী? গুল্‌কী হঠাৎ আঁচল গুটাইয়া লইয়া ফিক করিয়া হাসিয়া নীচু হইয়া

দৌড় দিল। তাহার কাণ্ড দেখিয়া অপুর হাসি পাইল। ছুটিবার সময় গুল্‌কীর আঁচলের বকুলফল পড়িতে পড়িতে চাহিয়াছিল, সেগুলি সে কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল—প'ড়ে গেল, সব প'ড়ে গেল, নিয়ে যা তোর বকুল ও খুকী, কিছু বোলবো না, ও খুকী !···গুলকী ততক্ষণে উধাও হইয়াছে।

পুকুরে স্নান সারিয়া আসিয়া সে বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিতে পাইল খিড়্‌কী-দরজার আড়াল হইতে গুল্‌কী একবার একটুখানি করিয়া উঁকি মারিতেছে আর একবার মুখ লুকাইতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে গুলকী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। অপু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—দাঁড়া, তোকে ধর্‌ছি এক দৌড়ে—বলিয়া সে খিড়কী-দরজার দিকে ছুটিল। গুলকী আর পিছন দিকে না চাহিয়া পথ বাহিয়া সোজা পুকুরপাড়ের দিকে ছুট্ দিল। কিন্তু অপুর সঙ্গে পারিবে কেন ? নিরুপায় দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেই অপু তাহার ঝাঁকড়া চুলগুলা মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—বড় ছুট দিচ্ছিলি যে ? আমার সঙ্গে ছুটে বুঝি তুই পারবি, খুকী !—গুল্‌কীর প্রথমটা ভয় হইয়াছিল বুঝি বা তাহাকে মারিবে ! কিন্তু অপু চুলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া ফেলায়, সে বুঝিল এ একটা খেলা। সে আবার সেই রকম হাসিয়া ফেলিল।

অপুর বড় দয়া হইল। তাহার মুখের হাসিতে এমন একটা আভাস ছিল যাহাতে অপুর মনে হইল এ তাহার সঙ্গে ভাব করিতে চায়—খেলা করিতে চায় ; কিন্তু ছেলেমানুষ কথা কহিতে জানে না বলিয়া এইরকম উঁকিঝুঁকি মারিয়া—ফিক্ করিয়া হাসিয়া—দৌড়িয়া পলাইয়া—তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অন্য উপায় ইহার জানা নাই। এ যেন ঠিক তাহার দিদি ! এই বয়সে দিদি যেন এই রকমই ছিল—এই রকম আঁচলে কুল-বেল-বৈঁচি বাঁধিয়া আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইত, কেহ বুঝিত না, কেহ দেখিত না, এই রকম পেটুক—এই রকম বুদ্ধিহীন ছোট মেয়ে !

অপু ভাবিল—এর সঙ্গে কেউ খেলা করে না, একে নিয়ে একটু খেলি ! আহা, মা-বাপ-হারা দুঃখী মেয়ে, আপন মনে বেড়ায় !···সে গুল্‌কীর চুলের মুঠা ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়াছিল, বলিল—খেলা করবি খুকী ? চল ঐ পুকুরের পাড়ে। না, এক কাজ কর খুকী, আমি তোকে ধরবো—আর তুই ছুটে যাবি ; ঐ কাঁঠালগাছটা বুড়ী। আয়—

মুঠা ছাড়িয়া দিতেই গুল্‌কী আর-না দাঁড়াইয়া আবার নীচু হইয়া দৌড় দিল। অপু চেঁচাইয়া বলিল—আচ্ছা যা, যা দেখি কদ্দুর যাবি—ঠিক তোকে ধরবো দেখিস। আচ্ছা, ঐ গেলি তো এই ত্থাখ্—বলিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া

সে এক দৌড় দিল—চু-উ-উ-উ-উ। গুল্‌কী পিছন দিকে চাহিয়া অপুকে দৌড়িতে দেখিয়া প্রাণপণে যতটুকু তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলায় দৌড়িবার চেষ্টা করিল—কিন্তু অপু একটুখানি ছুটিয়া গিয়াই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ভারি ছুট্‌তে শিখিচিস খুকী, না? তা-কি তুই আমার সঙ্গে পারিস্। চল্ চোর চৌকীদার খেলা করবি—তুই হবি চোর—এই কাঁটাল পাতা চুরি করে পালাবি, বুঝলি?···আর আমি হবো চৌকিদার, তোকে ধরবো।

গুল্‌কীর মুখে হাসি আর ধরিতেছিল না—হয়তো সে এতক্ষণ মনে মনে চাহিতেছিল এই সুন্দর ছেলেটির সঙ্গে ভাব করিতে। মাথা নাড়িয়া আশ্বাস দিবার স্বরে বলিল—কাঁইবিচি নেবে? অপু মনে ভাবিল চাষার গ্রামে থাকিয়া ও এই সব কথা শিখিয়াছে—তাহাদের গ্রামে যেমন গোয়ালা কি সদ্‌গোপের ছেলেমেয়েরা কথা বলে তেমনি।

দুপুরবেলা তাহার পিসিমা ডাকিলে পিছনে গুল্‌কী আসিল। অপুর খাওয়া হইয়া গেলে তাহার পিসি জিজ্ঞাসা করিল—ভাত খাবি গুল্‌কী? অপুর পাতে বোস্—মোচার ঘণ্ট আছে—ডাল দিচ্ছি। অপু ভাবিল—আহা, ও খাবে জান্‌লে দু'খানা মাছ ওর জন্যে রেখে দিতাম। গুল্‌কী দ্বিরুক্তি না করিয়া নির্লজ্জভাবে খাইতে বসিল। অনেকগুলি ভাত চাহিয়া লইয়া ডাল দিয়া সেগুলি মাখিল পরে অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া অত ভাত না খাইতে পারিয়া পাতের পাশে রাশী-কৃত ঠেলিয়া রাখিল। তবুও উঠিবার নাম করে না। অপুর পিসিমা হাসিয়া বলিল—আর খেতে হবে না গুল্‌কী—হাঁস্ ফাঁস্ কচ্ছিস্—নে ওঠ্, কত ভাত নিয়ে ফেল্‌লি ছ্যাখ্‌তো? তোর কেবল দৃষ্টি-খিদে—পরে বলিল, জ্যেঠিমার কাণ্ড ছ্যাখো—এতখানি বেলা হয়েচে—কাঁচা মেয়েটা—ভাত খেতে ডাকেও না?—হলোই বা পর—তা হলেও কচি তো?

শনিবারে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে অপু পূজা দিতে গেল। আচার্য ঠাকুরের খুব লম্বা সাদা দাড়ি বুকের ওপর পড়িয়াছে, বেশ চেহারা। তাঁহার বিধবা মেয়ে বাপের সঙ্গে সঙ্গে আসে, পূজার আয়োজন করিয়া দেয়, বৃদ্ধ বাপকে খুব সাহায্য করে। মেয়েটি বলিল, চার পয়সা দক্ষিণে কেন খোকা? এতে তো হবে না, বারের পূজোতে দু'আনা দক্ষিণে লাগ্‌বে। অপু বলিল—আমার মা যে চার পয়সা দিয়েচে মোটে, আর তো আমার কাছে নেই? মেয়েটি খানকতক কলা মূলা বাছিয়া একখানা পাতায় মুড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—ঠাকুরের প্রসাদ এতে রৈল, বেলপাতা আর সিঁদুরও দিলাম, তোমাদের বাড়ির মেয়েদের দিও। অপু ভাবিল—বেশ লোক এরা, আমার যদি পয়সা থাক্‌তো আরও দু'পয়সা দিতাম—

পিসিমার বাড়ী ফিরিয়া সে বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার আলোতে বসিয়া পিসিমার সঙ্গে পূজার গল্প করিতেছে, পাশের গুল্‌কীর বাড়ীতে হঠাৎ গুল্‌কীর সরু গলার আকাশ-ফাটানো চীৎকার শোনা গেল—ওরে জ্যেঠী, অমন ক'রে মেরো না—ওরে বাবারে—ও জ্যেঠী মোর পিট কেটে অক্ত পড়চে—মেরো না জ্যেঠী—সঙ্গে সঙ্গে একটা কর্কশ গলায় শোনা গেল—হারামজাদী—বদমায়েস—চৌধুরীদের বাড়ী গিয়েচো নেম্‌তন্ন খেতে, এমনি তোমার নোলা? তোমার নোলায় যদি আজ হাতা পুড়িয়ে ছেঁকা না দিই—লোকের বাড়ী খেয়ে খেয়ে বেড়াবে আর শতেকক্ষোয়ারীরা চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পায় না, বলে কি খেতে দেয় না—আপদ্ বালাই কোথাকার—বাড়ীতে তোমায় খেতে দেয় না? তোমায় আজ—

অপুর পিসিমা বলিল···দেখ্‌চো ঠেস্ দিয়ে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বলচে? সত্যি কথা বল্লেই লোকের সঙ্গে আর ভাব থাকে না—তাহলেই তুমি খারাপ—। অপুর মনটা আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। চোখের জলে গলা আড়ষ্ট হওয়ার দরুণ কোন কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আহারাদি সারিয়া অপু গোয়ালা পাড়ার দিকে চলিল। আগের দিন তাহার পিসেমশায় ঠিক করিয়া দিয়াছে এ গ্রাম হইতে নবাবগঞ্জে তামাক বোঝাই বাড়ী যাইবে, সেই গাড়ীতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময় রওনা হইলে সকালের দিকে নিশ্চিন্দিপুরের পথে তাহাকে উহারা নামাইয়া দিবে।

অল্পদূর গিয়া বামুনপাড়ার পথের মোড়ে গুল্‌কীর সঙ্গে দেখা। সে সন্ধ্যায় খেলা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। অপু বলিল—বাড়ী চলে যাচ্ছি রে খুকী আজ—সারাদিন ছিলি কোথায়? খেলতে এলিনে, কিছু না—! পরে গুল্‌কী অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছে দেখিয়া বলিল—সত্যিরে, সত্যি বল্‌চি, এই দ্যাখ্ পুঁটলী, কার্তিক গোয়ালার বাড়ী গিয়ে গাড়ী উঠবো—আয়-না আমার সঙ্গে, এগিয়ে দিবি?

গুল্‌কী পিছনে পিছনে অনেকদূর বলিল—বামুন পাড়া ছাড়িয়া খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তাহার পরেই গোয়ালাপাড়া। গুল্‌কী মাঠের ধার পর্যন্ত আসিল। অপুর রাঙা সাটিনের জামাটার দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল—তোমার এই আঙা জামাটা ক'পয়সা?

অপু হাসিমুখে বলিল—দু'টাকা—তুই নিবি? গুল্‌কী ফিক করিয়া হাসিল। অর্থাৎ—তুমি যদি দাও, এখ্‌খনি।

হঠাৎ সামনের পথে চোখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, মাঠের শেষে গাছে

পালার ফাঁকে আলো হইয়া উঠিয়াছে—অমনি কেমন করিয়া তাহার মনে হইল আগামী মাসের এমন দিনটাতে তাহারা, কোথায় কতদূরে চলিয়া যাইবে! পরে গুল্‌কীকে বলিল—আর আসিস নে খুকী, তুই চলে যা—অনেকদূরে এসে গিইচিস্—তোর বাড়ীতে হয়তো আবার বক্‌বে—চলে যা খুকী—আবার এলে দেখা হবে, কেমন তো? হয়তো আর আসবো না, আমরা কাশী চলে যাবো বোশেখ মাসে, সেখানে বাস কর্‌বো—।

গুল্‌কী একবার ফিক্ করিয়া হাসিল।

সেদিন পূর্ণিমা কি চতুর্দশী এমনি একটা তিথি। সে এদিকে আর কখনও আসে নাই, কিন্তু বাল্যের এই একা প্রথম বিদেশ-গমন-সম্পর্কিত একটা ছবি অনেক দিন পর্যন্ত তাহার মনে ছিল—সোজা মাঠের পথের দূর-প্রান্তে গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, (বা চতুর্দশীর চন্দ্র, তাহার ঠিক মনে ছিল না) পিছনে পিছনে অল্পদিনের পরিচিতা, অনাথা, অবোধ, ঝাঁকড়াচুল ছোট একটি মেয়ে তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছে।

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। সে জিনিসপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ দিয়া দিল। সেকালের কাঁঠালকাঠের বড় তক্তপোষ, সিন্দুক, পিঁড়ি ঘরে অনেকগুলি ছিল, খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত-করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরে দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে, সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্ত্রীর সাবিত্রী-ব্রত উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—বাপু আছেই বা কি দেশে যে থাকতে বলবো—তা ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোনো কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আসবো, যদি ভগবান দিন দেন—

রাণী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ী আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁরে অপু তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চ'লে যাবি ? সত্যি ?

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি, জিজ্ঞেস করো মাকে—

তবুও রাণী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণী অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল, কবে যাবি রে ?

—সামনের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আসবি নে আর কখনো ?

রাণীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি ক'রে ?

অপু বলিল—আমি কি করবো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা ? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে ? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো রাণুদি, বড় হোলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রাণী বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও শেষ করে দিলি নে, খাতায় নাম সইও কোরে দিলিনে, তুই বেশ ছেলে তো অপু ?

চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে বাটির বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রাণুদি মিছামিছি কেন রাগ করে। সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে ?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্যে নিজে জলে নেবে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট্ কাটলাম, একদিন মাছ ধরবিনে তাতে ?

এবার রামনবমীর দোল, চড়কপূজা ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিনের পরে পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব, অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এ সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোন ত্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরী বুড়ী মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজ-কাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরী বুড়ীর সেই দো-চালা ঘরখানা। অনেক লোক জড়ো হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনীর ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল—তখন সে ছোট ছিল—এখন তাহার সে কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার

মনে হইল আতুরী বুড়ী ডাইনী নয়, কিছু নয়—গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—গরীব, অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না, থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সৎকারের লোক হয় না? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া ঢালিল এক হাঁড়ি শুক্না আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ী আম্‌সি আম্‌চুর তৈয়ারী করিয়া দিত ও তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আম্‌সি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আর-বছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেবো অপু, একখানা সীতাহরণের পট দেখিস যদি মেলায় পাস? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পান্‌সে পুতুপুতু পট তাই তোর কিনতে হবে, আমি পারবো না, যা—কেন রাম-রাবণের যুদ্ধ একখানা কেন্ না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ—তোর যা কাণ্ড! কেন ঠাকুর দেবতার পট বুঝি ভাল হোল না? দিদির শিল্পানুভূতিশক্তির উপর অপুর কোন কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

তাহাদের বেড়ার গায়ে বাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখীর ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কল্‌মীর ফুলের দুলুনিতে—দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর! আর কখনো, কখনো সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না।

মেলার গোলমালের মধ্যে কে চমৎকার বাঁশি বাজাইতেছে। নতুন সুর তাহার বড় ভাল লাগে—খুঁজিয়া বাহির করিল মালপাড়ার হারাণ মাল এক বাণ্ডিল বাঁশের বাঁশি চাঁচিয়া বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছে ও বিজ্ঞাপন-স্বরূপ একটি বাঁশি নিজে বাজাইতেছে। অপু জিজ্ঞাসা করিল—একটা ক'পয়সা? হারাণ মাল তাহাকে খুব চেনে। কতবার তাহাদের রান্নাঘর ছাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমরা নাকি শোন্‌লাম খোকা গাঁ ছেড়ে চল্লে? তা কোথায় যাচ্চ—হ্যাগা? অপু দেড় পয়সা দিয়া সরু বাঁশের বাঁশি একটা কিনিল। বলিল, কোন্ কোন্ ফুটোতে আঙুল টেপো হারাণ কাকা? একবার দেখিয়ে দাও দিকি।

মনে আছে একবার অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সে খানিকক্ষণ জাগিয়া ছিল।

দূর নদীতে অন্ধকার রাত্রে জেলেদের আলোয় মাছধরা দোনা-জালের একঘেয়ে একটানা ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। এমন সময় তাহার কানে গেল অনেক দূরে যেন কুঠীর মাঠের পথের দিকে অত রাত্রে কে খোলা গলায় গান গাহিয়া পথ চলিয়াছে। কুঠীর মাঠের পথে বেশী রাত্রে বড় একটা কেহ হাঁটে না তবুও আধঘুমে কতদিন যে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় অচেনা পথিক-কণ্ঠে মধুকানের পদ-ভাঙা গানের তানকে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে শুনিয়াছে—কিন্তু সে-বার যা শুনিয়াছিল তাহা একেবারে নতুন। সুরটা যে আয়ত্ত করিতে পারে নাই—আধ-জাগরণের ঘোরে সুষমাময়ী সুরলক্ষ্মী দুই ঘুমের মাঝখানের পথ বাহিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কোনদিন আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই—কিন্তু অপু কি তাহা কোনোদিন ভুলিবে?

চড়ক দেখিয়া নানা গাঁয়ের চাষাদের ছেলেমেয়েরা রঙিন কাপড় জামা, কেউ বা নতুন কোরা শাড়ী পরণে, সারি দিয়া ঘরে ফিরিতেছে। ছেলেরা বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। গোষ্ঠবিহারের মেলা দেখিতে চার পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও লোকজন আসিয়াছিল। শোলার পাখী, কাঠের পুতুল, রঙিন কাগজের পাখা, রং করা হাঁড়ি, ছোবা—সকলেরই হাতে কোনো না কোনো জিনিস। চিনিবাস বৈষ্ণব মেলায় বেগুনি-ফুলুরীর দোকান খুলিয়াছিল, তাহার দোকান হইতে অপু দু'পয়সার তেলে-ভাজা খাবার কিনিয়া হাতে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। ফিরিতে ফিরিতে মনে হইল, যেখানে তাহারা উঠিয়া যাইতেছে সেখানে কি রকম গোষ্ঠবিহার হয়? হয়তো সে আর চড়কের মেলা দেখিতে পাইবে না। মনে ভাবিল—সেখানে যদি চড়ক না হয় তবে বাবাকে বোলবো, আমি দেখ্‌বো বাবা, নিশ্চিন্দিপুর চল যাই—না হয় দু'দিন এসে খুড়ীমাদের বাড়ী থেকে যাবো?

চড়কের পরদিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতে লাগিল। কাল দুপুরে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার মা তাহাকে গরম গরম পরোটা ভাজিয়া দিতেছিল। নীলমণি জ্যেঠার ভিটায় নারিকেল গাছটার পাতাগুলি জ্যোৎস্নার আলোয় চিকৃচিক্ করিতেছে—চাহিয়া দেখিয়া অপুর মন দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এতদিন নতুন দেশে যাইবার জন্য তাহার যে উৎসাহটা ছিল, যতই যাওয়ার দিন কাছে আসিয়া পড়িতেছে, ততই আসন্ন বিরহের গভীর ব্যথায় তাহার মনের সুরটি করুণ হইয়া বাজিতেছে।

এই তাহাদের বাড়ীর ঘর, ওই বাঁশবন, সলতে-খাগীর আমবাগানটা, নদীর ধার, দিদির সঙ্গে চড়ুই ভাতি করার ওই জায়গাটা—এ সব সে কত ভালবাসে! ওই অমন নারিকেলের গাছ কি তাহারা যেখানে যাইতেছে সেখানে আছে? জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এই নারিকেল গাছ সে এখানে দেখিতেছে, জ্যোৎস্নারাত্রে পাতাগুলি কি সুন্দর দেখায়! সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রে এই দাওয়ায় বসিয়া জ্যোৎস্না-ঝরা নারিকেল শাখার দিকে চাহিয়া কত রাত্রে দিদির সঙ্গে সে দশপঁচিশ খেলিয়াছে, কতবার মনে হইয়াছে কি সুন্দর দেশ তাহাদের এই নিশ্চিন্দিপুর! যেখানে যাইতেছে, সেখানে কি রান্নাঘরের দাওয়ার পাশে বনের ধারে এমন নারিকেল গাছ আছে? সেখানে কি সে মাছ ধরিতে পারিবে, আম কুড়াইতে পারিবে, নৌকা বাহিতে পারিবে, রেল রেল খেলিতে পারিবে, কদমতলার সায়েরের ঘাটের মত ঘাট কি সে দেশে আছে? রাণুদি আছে? সোনাডাঙার মাঠ আছে? এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছামিছি ছাড়িয়া যাওয়া?

দুপুরে এক কাণ্ড ঘটিল।

তাহার মা সাবিত্রীব্রতের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, হরিহর পাশের ঘরে আহারাদি সারিয়া ঘুমাইতেছে, অপু ঘরের মধ্যের তাকের উপরিস্থিত জিনিসপত্র কি লওয়া যাইতে পারে না পারে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে। উঁচু তাকের উপর একটা কলসী সরাইতে গিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা কি জিনিস গড়াইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। সে সেটাকে মেজে হইতে কুড়াইয়া নামিয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। ধূলা ও মাকড়সার ঝুল মাখা হইলেও জিনিসটা কি বা তাহার ইতিহাস বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না।

সেই ছোট্ট সোনার কৌটাটা, আর বছর যেটা সেজঠাকরুণদের বাড়ী হইতে চুরি গিয়াছিল।

দুপুরে কেহ বাড়ী নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মত কানে আসে। আপন মনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি ক'রে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিল!

সে একটুখানি ভাবিল, পরে ধীরে ধীরে খিড়কী দোরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল—বহুদূর পর্যন্ত বাঁশবন যেন দুপুরের রৌদ্রে ঝিমাইতেছে, সেই শঙ্খ-চিলটা কোন্ গাছের মাথায় টানিয়া টানিয়া ডাকিতেছে, দ্বৈপায়ন হ্রদ লুক্কায়িত

প্রাচীন যুগের সেই পরাজিত ভাগ্যহত রাজপুত্রের বেদনাকরুণ মধ্যাহ্নটা! একটুখানি দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে হাতের কৌটাটাকে একটান মারিয়া গভীর বাঁশবনের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার দিদি ভুলো কুকুরের ডাক দিলে যে ঘন বন-ঝোপের ভিতর দিয়া ভুলো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিত, ঠিক তাহার পাশে রাশীকৃত শুকনা বাঁশ ও পাতার রাশির মধ্যে বৈচিঝোপের ধারে কোথায় গিয়া সেটা গড়াইয়া পড়িল।

মনে মনে বলিল—রইল ওইখানে, কেউ জান্‌তে পার্‌বে না কোনো কথা, ওখানে আর কে যাবে?

সোনার কৌটার কথা অপু কাহাকেও কিছু জানাইল না, কখনও জানায় নাই, এমন কি মাকেও না।

দুপুর একটু গড়াইয়া গেলে হীরু গাড়োয়ানের গরুর গাড়ী রওনা হইল। সকালের দিকে আকাশে একটু একটু মেঘ ছিল বটে, কিন্তু বেলা দশটার পূর্বেই সেটুকু কাটিয়া গিয়া পরিপূর্ণ প্রচুর বৈশাখী মধ্যাহ্নের রৌদ্র গাছে-পালার পথে মাঠে যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। পটু গাড়ীর পিছনে পিছনে অনেক দূর পর্যন্ত আসিতেছিল, বলিল—অপু-দা, এবার বারোয়ারীতে ভাল যাত্রাদলের বায়না হয়েচে, তুই শুন্‌তে পেলিনে এবার—

অপু বলিল—তুই পালার কাগজ একখানা বেশী ক'রে নিবি, আমায় পাঠিয়ে দিবি—

আবার সেই চড়কের মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। মেলার চিহ্ন-স্বরূপ সারা মাঠটায় কাটা ডাবের খোলা গড়াগড়ি যাইতেছে, কাহারা মাঠের একপাশে রাঁধিয়া খাইতেছে, আগুনে কালো মাটির ঢেলা ও একপাশে কালিমাখা নতুন হাঁড়ি পড়িয়া আছে। হরিহর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছিল। কাজটা কি ভাল হইল? কতদিনের পৈতৃক ভিটা, ওই পাশের পোড়ো ভিটাতে সে সব ধূমধাম একেবারে শেষ হইয়া গিয়াছিলই তো, যা-ও বা মাটির প্রদীপ টিম্ টিম্ করিতেছিল, আজ সন্ধ্যা হইতে চিরদিনের জন্য নিবিয়া গেল। পিতা রামচাঁদ তর্কবাগীশ স্বর্গ হইতে দেখিয়া কি মনে করিবেন?

গ্রামের শেষ বাড়ী হইতেছে আতুরী বুড়ীর সেই দোচালা ঘরখানা, যতক্ষণ দেখা গেল অপু হাঁ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পরই একটা বড় খেজুর-বাগানের পাশ দিয়া গাড়ী গিয়া একেবারে আষাঢ়ু যাইবার বাঁধা রাস্তার উপর উঠিল। গ্রাম শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বজয়ার মনে হইল যা কিছু দারিদ্র্য, যা কিছু হীনতা, যা কিছু আপনার সব রহিল পিছনে পড়িয়া—এখন সামনে শুধু নতুন সংসার, নতুন জীবনযাত্রা, নব সচ্ছলতা!

ক্রমে রৌদ্র পড়িল—গাড়ী তখন সোনাডাঙার মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। হরিহর মাঠের মধ্যের একটা বড় বটগাছ দেখাইয়া কহিল—এই ছাখো, ঠাকুরঝি পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বটগাছ। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি মুখ বাহির করিয়া দেখিল। পথ হইতে অল্প দূরেই একটা নাবাল জমির ধারে বিশাল বটগাছটা চারিধারে ঝুরি গাড়িয়া বসিয়া আছে। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাহার বালকপুত্রের গল্প সে কতবার শুনিয়াছে। আজ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাহার শ্বশুরের পূর্বপুরুষ এই রকম সন্ধ্যাবেলা ওই বটতলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ ও তাহার অবোধ পুত্রকে অর্থলোভে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পাশের ওই নাবাল জমি, যেটা সেকালের ঠাকুরঝি পুকুর ছিল—ওইখানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ছেলেটির মা হয় তো পুত্রের বাড়ী ফিরিবার আশায় কত মাস, কত বছর বৃথা অপেক্ষা করিত, সে-ছেলে আর ফিরে নাই—মাগো। সর্বজয়ার চোখ হঠাৎ জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে, গলায় কি একটা আটকাইয়া যায়!

সোনাডাঙার মাঠ এ অঞ্চলেব সকলের বড় মাঠ। এখানে ওখানে বনঝোপ, শিমুল বাবুল গাছ, খেজুব গাছে খেজুরের কাঁদি ঝুলিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড ঝুলিতেছে, চারিধারে বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাক। দূরপ্রসারী মাঠের উপর তিসির, ফুলের রং-এর মত গাঢ় নীল আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি কোথাও বাধে না, ঘন সবুজঘাসে মোড়া উঁচু নীচু মাঠের মধ্যে কোথাও আবাদ নাই, শুধুই গাছপালা-বনঝোপের প্রাচুর্য আব বিশাল মাঠটার শ্যামপ্রসার, সম্মুখে কাঁচা মাটির চওড়া পথটা গৃহত্যাগী উদান বাউলের মত দূর হইতে দূবে আপন মনে বাঁকিয়া চলিয়াছে। একটু দূরে গিয়া বারাসে-মধুখালির বিল পড়িল। কোন প্রাচীন কালের নদী শুকাইয়া গিয়া জীবনের যাত্রাপথের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, অন্তর্হিত নদীর বিশাল খাতটা যেন পদ্মফুলে ভরা বিল। অপু গাড়িতে বসিয়া মাঠ ও চারিধারের অপূর্ব আকাশের রংটা দেখিতে দেখিতে যাইতেছিল। বেলাশেষের স্বপ্নপটে আবার কত কি শৈশবকল্পনার আসা-যাওয়া! এই তো সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াছে। এখন হয়তো কোথায় কতদূরে চলিবে, যাওয়া তার সবে সম্ভব হইল, এইবার হয়তো সে-সব দেশ, স্বপ্ন-দেখা সে অপূর্ব জীবন!

হরিহর দূরের একটা গ্রাম আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই হোল ধঞ্চে-পলাশগাছি, ওরই ওপাশে নাটাবেড়ে—ওইখানে বনবিবির দরগা-তলায় শ্রাবণ মাসে ভারী মেলা হয়, এমন সস্তা কুমড়ো আর কোথাও মেলে না।

আষাঢ়ু বাজারের নীচে খেয়ায় বেত্রবতী পার হইবার সময় চাঁদ উঠিল, জ্যোৎস্নার আলোয় জল চিক্‌ চিক্‌ করিতেছিল। আজ আষাঢ়ুর হাট,

কয়েকজন হাটুরে লোক কলরব করিতে করিতে ওপার হইতে খেয়ানৌকায় এপারে আসিতেছে। অপুদের গাড়ীসুদ্ধ পার হইয়া ওপারে উঠিল। অপু বাবাকে বলিয়া আষাঢ়ুর বাজার দেখিতে নামিল। ছোট বাজার, সারি সারি ঝাঁপতালা দোকান, সেকরার দোকানের ঠুকঠাক শুনা যাইতেছে, একটা খেজুর গুড়ের আড়তের সামনে বহু গরুর গাড়ীর ভীড়। মাঝেরপাড়া ষ্টেশন এখনও প্রায় চারিক্রোশ, রাস্তা কাঁচা হইলেও বেশ চওড়া, দুধারে নীলকুঠীর সাহেবদের আমলে রোপিত বট, অশ্বত্থ, তুঁতগাছ। বৈশাখ মাসের প্রথমে পথিপার্শ্বের বট অশ্বত্থের ডালের মধ্যে কোথায় কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইতেছে, সারাপথটা প্রাচীন বটের সারির ঝুরি দোলানো। কচি পাতার রাশি জ্যোৎস্না লাগিয়া স্বচ্ছ দেখাইতেছে।

বাংলার বসন্ত, চৈত্র বৈশাখের মাঠে, বনে, বাগানে, যেখানে, সেখানে, কোকিলের এলোমেলো ডাক, নবপল্লব নাগকেশর অজস্র ফুলের ভারে বনফুলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ দক্ষিণহাওয়ায় উল্লাসে আনন্দনৃত সুরু করিয়াছে। এরূপ অপরূপ বসন্তদৃশ্য অপু জীবনে এই প্রথম দেখিল। এই অল্প বয়সেই তাহার মনে বাংলার মাঠ, নদী, নিরালা বনপ্রান্তরের সুমুখ জ্যোৎস্না-রাত্রির যে মায়ারূপ অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার উত্তরকালের শিল্পীজীবনের কল্পনামুহূর্তগুলি মাধুর্যে ও প্রেরণায় ভরিয়া তুলিবার তাহাই ছিল শ্রেষ্ঠ উপাদান।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী পৌছিল। আজ অনেকক্ষণ হইতেই কখন গাড়ী স্টেশনে পৌছাইবে সেই আশায় অপু বসিয়াছিল, গাড়ী থামিতেই নামিয়া সে একদৌড়ে গিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাজির হইল। সন্ধ্যা সাড়ে আটটার ট্রেন অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে সারা রাত্রির মধ্যে আর ট্রেন নাই। ঐ হীরু গাড়োয়ানের গরু দুইটার জন্যই এরূপ ঘটিল, নতুবা এখনি সে ট্রেন দেখিতে পাইত। প্ল্যাটফর্মে একরাশ তামাকের গাঁট সাজানো—দুজন রেলেব লোক একটা লোহার বাক্স মত দেখিতে অথচ খুব লম্বা ডাণ্ডাওয়ালা কলে তামাকের গাঁট চাপাইয়া কি করিতেছে। জ্যোৎস্না পড়িয়া রেলের পাটি চিক্ চিক্ করিতেছে। ওদিকে রেল লাইনের ধারে একটা উঁচু খুঁটির গায়ে দুটা লাল আলো, এদিকে আবার ঠিক সেই রকম দুটা লাল আলো। স্টেশন ঘরে টেবিলের উপরে চৌপায়া তেলের লণ্ঠন জ্বলিতেছে। এক রাশ বাঁধানো খাতাপত্র। অপু দরজার কাছে গিয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিল, একটা ছোট্ট খড়মের বউলের মত জিনিস টিপিয়া স্টেশনের বাবু খট্ খট্ শব্দ করিতেছে।

ইষ্টিশান! ইষ্টিশান! বেশী দেরী নয় কাল সকালেই সে রেলের গাড়ী শুধু যে দেখিবে তাহা নয়, চড়িবে!

প্ল্যাটফর্ম হইতে নড়িতে তাহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু তাহার বাবা ডাকিতে আসিল। খড়মের বউলের মত জিনিসটাই নাকি টেলিগ্রাফের কল, তাহার বাবা বলিল।

অপু ফিরিয়া দেখিল স্টেশনের পুকুর-ধারে রাঁধিয়া খাইবার যোগাড় হইতেছে। আর একখানি গাড়ী পূর্ব হইতেই সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। আরোহীর মধ্যে আঠারো-উনিশ বৎসরের এক বৌ ও এক যুবক। অপু শুনিল বৌটি হবিব্‌পুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর, ভাইয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ী যাইতেছে। তাহার মায়ের সঙ্গে বৌটির খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। তাহার মা খিচুড়ীর চাল ডাল ধুইতেছে, বৌটি আলু ছাড়াইতেছে। রান্না একত্র হইবে।

সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন আসিল। অপু হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ হইতে গাড়ী দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার বাবা বলিল, খোকা, অত ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থেকো না, সরে এসো এদিকে। একজন খালাসীও লোকজনদের হটাইয়া দিতেছিল।

কতবড় ট্রেনখানা? কি ভয়ানক শব্দ! সামনের একেই ইঞ্জিন বলে? উঃ! কী কাণ্ড!

হবিব্‌পুরের বৌটি ঘোমটা খুলিয়া কৌতূহলের সহিত প্রবেশমান ট্রেনখানার দিকে চাহিয়া ছিল।

গাড়ীতে হৈ হৈ করিয়া মোট-ঘাট সব উঠানো হইল। কাঠের বেঞ্চি সব মুখোমুখি করিয়া পাতা। গাড়ীর মেজেটা যেন সিমেণ্টের বলিয়া মনে হইল। ঠিক যেন ঘর একখানা; জানলা দরজা সব হুবহু! এই ভারী গাড়ীখানা, যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যে আবার চলিবে, সে বিশ্বাস অপুর হইতেছিল না। কি জানি হয়তো নাও চলিতে পারে; হয়তো উহারা এখনই বলিতে পারে, ওগো তোমরা সব নামিয়া যাও, আমাদের গাড়ী আজ চলিবে না! তারের বেড়ার এদিকে একজন লোক একবোঝা উলুঘাস মাথায় করিয়া ট্রেনখানা চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, অপুর মনে হইল লোকটা কৃপার পাত্র! আজিকার দিনে যে গাড়ী চড়িল না সে বাঁচিয়া থাকিবে কি করিয়া? হীরু গাড়োয়ান ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে।

গাড়ী চলিল। অদ্ভুত, অপূর্ব দুলুনি! দেখিতে দেখিতে মাঝেরপাড়া স্টেশন, লোকজন, তামাকের গাঁট, হাঁ-করিয়া-দাঁড়াইয়া-থাকা হীরু গাড়োয়ান,

সকলকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ী বাহিরের উলুখড়ের মাঠে আসিয়া পড়িল। গাছপালাগুলা সট্‌সট্‌ করিয়া দুদিকের জানালার পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে—কী বেগ! এরই নাম রেলগাড়ী! উঃ মাঠখানা যেন ঘুরাইয়া ফেলিতেছে। ঝোপঝাপ গাছপালা, উলুখড়ের ছাউনি ছোটো-খাটো চাষাদের ঘর সব একাকার করিয়া দিতেছে! গাড়ীর তলায় জাঁতা-পেষার মত একটানা শব্দ হইতেছে—সামনের দিকে ইঞ্জিনের কি শব্দটা!

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে!

অনেকদিন আগের সে দিনটা!

সে ও দিদি যেদিন দুজনে বাছুর খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন—আর আজ?

ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢ়ু-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে!...

তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই ফেলিয়া আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে বাঁশবনে আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ীর প্রতি গৃহ কোণে—আজ কিন্তু সত্যসত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!...

তাহার যেন মনে হয়, দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়। কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল! তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক-মুহূর্ত্তের মধ্যে...আতুরী ডাইনী...নদীর ঘাট...তাহাদের কোঠাবাড়ীটা...চালতে-তলার পথ...রাণুদি...কত বৈকাল, কত দুপুর...কতদিনের কত হাসি-খেলা...পটু...দিদির মুখ...দিদির কত না-মেটা সাধ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে...

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক্‌-ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার-বার বলিতে চাহিল—আমি যাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে ক'রে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্চে—

সত্যই সে ভুলে নাই!

উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল-সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এই সব সময়েই, তাহার মনে পডিত এক ঘনবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাডাগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়েব কথা—

অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ী দেখাবি?

মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

অক্রূর সংবাদ

দুপুরের পর রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইল। অপুর চোখে দু-বার কয়লার গুঁড়া পডা সত্ত্বেও সে গাডীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সারাদিনটা বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। স্টেশনে স্টেশনে ওগুলোকে কি বলে? সিগ্‌ন্যাল? পডিতেছে উঠিতেছে কেন? গাডী যেখানে লাগিতেছে সেখানটা উঁচুমত ইটের গাঁথা, ঠিক যেন রোয়াকের মত। তাকে প্ল্যাটফর্ম বলে? কাঠের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজী ও বাংলাতে সব স্টেশনের নাম লেখা আছে কুড়লগাছি, গোবিন্দপুর, বানপুর। গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘণ্টা পড়ে—ঢং ঢং ঢং ঢং—চার ঘা, অপু শুনিয়াছে, একটা বড় লোহার চাকার চারিধারে হাতল-পরানো, তাহাই ঘুরাইলে সিগন্যাল পড়ে—কুড়লগাছি স্টেশনে অপু লক্ষ্য করিয়া দেখিল।

সর্বজয়া এবার লইয়া মোটে দুইবার রেলে চড়িল। আর একবার সেই কোন্ কালে—উনি তখন নতুন কাশী হইতে আসিয়া দেশে সংসার পাতিয়াছেন—জ্যৈষ্ঠমাসে আড়ংঘাটায় যুগোলকিশোর ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিল—সে কি আজকের কথা? সে খুশির সহিত স্টেশনে স্টেশনে মুখ বাড়াইয়া লোকজনের ওঠা নামা লক্ষ্য করিতেছিল। বউঝিরা উঠিতেছে নামিতেছে—কেমন সব চেহারা, কেমন কাপড়-চোপড়, গহনাপত্র! জগন্নাথপুর স্টেশনে ভাল মুড়ির মোয়া ফেরি করিতেছে দেখিয়া সে ছেলেকে বলিল—অপু মুড়ির মোয়া খাবি? তুই তো ভালবাসিস্, নেব তোর জন্যে? স্টেশনে টেলিগ্রাফের তারের ওপর কি পাখী বসিয়া দোল খাইতেছে, অপু ভাল করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ছ্যাখো মা, কাদের বাড়ীর খাঁচা থেকে একটা ময়না পাখী পালিয়ে এসেচে।

নৈহাটী স্টেশনে গাড়ী বদলাইয়া গঙ্গার প্রকাণ্ড পুলটার উপর দিয়া যাইবার সময় সূর্য অস্ত যাইতেছিল, সর্বজয়া একদৃষ্টে চাহিয়াছিল—ওপার হইতে হু-হু বাতাস বহিতেছে, গঙ্গার জলে নৌকা, দুপারে কত ভাল বাড়ী বাগান, এসব দৃশ্য জীবনে সে কখনো দেখে নাই। ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—দেখেচিস্ অপু, একখানা ধোঁয়ার জাহাজ? পরে সে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া আপন মনে বলিল—মা গঙ্গা, তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি, অপরাধ নিও না মা, কাশীতে গিয়ে ফুল বিল্বিপত্রে তোমায় পূজো করবো, অপুকে ভাল রেখো, যে জন্যে যাওয়া তা যেন হয়, সেখানে যেন আশ্রয় হয় মা—

আনন্দে, পুলকে, অনিশ্চয়তার রহস্যে তাহার হৃদয় দুলিতেছিল—এ রকম মনোভাব এর আগে সে কখনো অনুভব করে নাই। সুবিধায় হোক, অসুবিধায় হোক, অবাধ মুক্ত জীবনের আনন্দ সে পাইল এই প্রথম; তার চিরকালের বাঁশবনের বেড়া ঘেরা ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ পল্লীজীবনে এ রকম সচল দৃশ্যরাজি, এ রকম অভিনব গতির বেগ, এত অনিশ্চয়ের পুলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনও হয় নাই—যে জীবন চারিধারে পাঁচিল দেওয়াল তুলিয়া আপনাকে আপনি ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ চলিয়াছে, চলিয়াছে, সম্মুখে চলিয়াছে—ওই পশ্চিম আকাশের অস্তমান সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া—নদ-নদী দেশ-বিদেশ ডিঙাইয়া ছুটিয়াছে—এই চলিয়া চলার বাস্তবতাকে সে প্রতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল আজ!—এই তো সেদিন এক বৎসর আগেও নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীতে কত রাত্রে শুইয়া যখনই সে ভাবিত, সুবিধা হইলে একবার চাকদা কি কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানে যাইবে, তখনই তাহা সম্ভবের ও নিশ্চয়তার বহু বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হইয়াছে—আর আজ?

ব্যাণ্ডেল স্টেশনে গাড়ি আসিবার একটু আগে সম্মুখের বড় লাইন দিয়া একখানা বড় গাড়ী হু-হু শব্দে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অপু বিস্ময়ের সঙ্গে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কি আওয়াজ!—উঃ—! ব্যাণ্ডেল স্টেশনে পৌছিয়া তাহারা গাড়ী হইতে নামিল। এদিকে-ওদিকে এঞ্জিন দৌড়িতেছে, বড় বড় মালগাড়ীগুলা স্টেশন কাঁপাইয়া প্রতি পাঁচমিনিট অন্তর না থামিয়া চলিয়া যাইতেছে। হৈ হৈ শব্দ—এদিকে এঞ্জিনের সিটির কানে-তালা-ধরা আওয়াজ, ওদিকে আর একখানা যাত্রীগাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে, গার্ড সবুজ নিশান দুলাইতেছে—সন্ধ্যার সময় স্টেশনের পূর্বে পশ্চিমে লাইনের ওপর এত সিগ্‌ন্যাল! ঝাঁকে ঝাঁকে—লাল সবুজ আলো জ্বলিতেছে—রেল, এঞ্জিন গাড়ী, লোকজন!—

একটু রাত্রি হইলে তাহাদের কাশী যাইবার গাড়া আসিয়া বিকট শব্দে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইল। বিশাল স্টেশন, বেজায় লোকের ভিড়—সর্বজয়া কেমন দিশাহারা হইয়া গেল—তাড়া খাইয়া অনভ্যস্ত, আড়ষ্ট পায়ে স্বামীর পিছনে পিছনে একখানা কামরার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিহর অতিকষ্টে দুর্জয় ভিড় ঠেলিয়া বেপথুমানা স্ত্রীকে ও দিশাহারা পুত্রকে কায়ক্লেশে গাড়ীর বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া কুলীর সাহায্যে মোটগাঁট উঠাইয়া দিল।

ভোরের দিকে সর্বজয়ার তন্দ্রা গেল ছুটিয়া। ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিয়াছে—মাঠ, মাটি, গাছপালা একাকার করিয়া ছুটিয়াছে—রাত্রের গাড়ী বলিয়া তাহারা সকলে এক গাড়ীতেই উঠিয়াছে—হরিহর তাহাকে মেয়ে-কাম্‌রায় দেয় নাই। গাড়ীতে ভিড় আগের চেয়ে কম—এক এক বেঞ্চে এক একজন লম্বা হইয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। উপরের বেঞ্চে একজন কাবুলী নাক ডাকাইতেছে। অপু কখন উঠিয়া হাঁ করিয়া জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

হরিহর জাগিয়া উঠিয়া ছেলেকে বলিল—ওরকম ক'রে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকো না খোকা, এখখুনি চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে—

কয়লার গুঁড়ো তো নিরীহ জিনিস, চোখদুটা যদি উপড়াইয়া চলিয়াও যায় তবুও অপুর সাধ্য নাই যে, জানালাব দিক হইতে এখন চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে। সে প্রায় সারারাত্রি ঠায় এইভাবে বসিয়া! বাবা মা তো ঘুমাইতেছিল—সে যে কত কি দেখিয়াছে! কত স্টেশনে গাড়ী দাঁড়ায় নাই, আলো লোকজন সুদ্ধ স্টেশনটা হুস করিয়া হাউইবাজীর মত পাশ কাটাইয়া উড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল—রাত্রে কখন তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই সে মুখ বাহির করিয়া দেখিল যে, গভীর রাত্রির

জ্যোৎস্নায় রেলগাড়ীখানা ঝড়ের বেগে একটা কোন নদীর ছোট সাঁকো পার হইতেছে,—সামনে খুব উঁচু একটা কালোমত ঢিবি, ঢিবিটার ওপরে অনেক গাছপালা, নদীর জলে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল, আকাশে সাদা সাদা মেঘ—তারপর সেই ধরণের বড় বড় আরও কয়েকটা ঢিবি, আরও সেই রকম গাছপালা। তাহার পর একটা বড় স্টেশন লোকজন, আলো—পাশের লাইনে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—একজন পানওয়ালার সঙ্গে একটা লোকের যা ঝগড়া হইয়া গেল—স্টেশনে একটা বড় ঘড়ি ছিল—সে তাহার মাস্টার মশায় নীরেন বাবুর কাছে ঘড়ি দেখিতে শিখিয়াছিল, গুনিয়া গুনিয়া দেখিল রাত্রি তিনটা বাজিয়া বাইশ মিনিট হইয়াছে। তারপর আবার গাড়ী ছাড়িল—আবার কত গাছ, আবার সেই ধরণের উঁচু উঁচু ঢিবি—অনেক সময়ে রেলের রাস্তার দুইধারেই সেইরকম ঢিবি—গাড়ীতে সবাই ঘুমাইতেছে, ইহারা যদি কিছু দেখিবে না তবে রেলগাড়ী চড়িয়াছে কেন! কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করে যে অত ঢিবি কিসের? এক একবার সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল গাড়ীখানা কত জোরে যাইতেছে—চুল বাতাসে উড়িয়া মুখে পড়ে, মাটি দেখা যায় না, যেন কে মাটির গায়ে কতকগুলি সরল রেখা টানিয়া চলিয়াছে,—উঃ! রেলগাড়ী কি জোরে যায়! কৌতূহলে, উত্তেজনায় সে একবার এদিকের জানালায়, একবার ওদিকের জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছিল।

মাঝে মাঝে পূর্বদিকের দ্রুতবিলীয়মান অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইতেছিল, কত দূরে তাহারা আসিয়াছে! এসব কোন্ দেশের উঁচু নীচু মাঠ দিয়া তাহারা চলিয়াছে?

সকালের দিকে আবার একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, একটা প্রকাণ্ড স্টেশনে সশব্দে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল—প্ল্যাটফর্মের পাথরের ফলকে নাম লেখা আছে—পাটনা সিটি!

তাহার পর কত স্টেশন চলিয়া গেল। কি বড় বড় পুল! গাড়ী চলিয়াছে, চলিয়াছে, মনে হয় বুঝি পুলটা শেষ হইবে না—কত ধরণের সিগ্ন্যাল, কত কল-কারখানা, একটা কোন্ স্টেশনের ঘরে মধ্যে একটা লোহার থামের গায়ে চোঙ্ লাগানো মত—তাহারই মধ্যে মুখ দিয়া একজন রেলের বাবু কি কথা কহিতেছে—প্রাইভেট্ নম্বর? হাঁ আচ্ছা—সিক্সটি নাইন্—সিক্সটি নাইন্—হাঁ?—উনসত্তর—ছয়ের পিঠে নয়—হাঁ—হাঁ—

সে অবাক্ হইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিল—ও কি কল বাবা? ওর মধ্যে মুখ দিয়ে ওরকম বলচে কেন?

তখন বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে এমন সময় হরিহর বলিল—এইবার আমরা কাশী পৌছে যাবো ; বাঁ দিকে চেয়ে থেকো, গঙ্গার পুলের ওপর গাড়ী উঠলেই কাশী দেখা যাবে—

অপু একটা কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিল। আজ সে সারা পথ টেলিগিরাপের তার ও খুঁটি দেখিতে দেখিতে আসিতেছে—সেই একটি বার ছাড়া এমন করিয়া এর আগে কখনও দেখে নাই জীবনে। এইবার যদি সে রেল-রেল খেলার সুযোগ পায়, তখনই সে ওই ধরণের তারের খুঁটি বসাইবে। কি ভুলটাই করিত আগে! যেখানে যাইতেছে, সেখানকার বনে গুলঞ্চ-লতা পাওয়া যায় তো ?

দিন পনেরো কাটিয়া গিয়াছে। বাঁশফট্‌কা গলির একখানা মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ীর একতলার হরিহর বাসা লইয়াছে। কোনো পূর্ব পরিচিত লোকের সন্ধান সে মিলাইতে পারে নাই। আগে যাহারা যে-সব জায়গায় ছিল, এখন সে-সব স্থানে তাহাদের সন্ধান কেহ দিতে পারে না। কেবল বিশ্বেশ্বরের গলির পুরাতন হালুইকার রামগোপাল সাহু এখনও বাঁচিয়া আছে!

বাড়ীর ওপরের তলায় একজন পাঞ্জাবী সপরিবারে থাকে, মাঝের তলায় এক বাঙালী ব্যবসায়ী থাকে, বাইরের ঘরটা তাঁর দোকান ও গুদাম—আশে পাশের দু'তিন ঘরে তাঁর রন্ধন ও শয়নঘর।

এ পাঁচ-ছয় দিনে সর্বজয়া নিকটবর্তী সকল জায়গা স্বামীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছে। স্বপ্নেও কখনো সে এমন দৃশ্যের কল্পনা করে নাই,—এমন মন্দির! এমন ঠাকুর দেবতা! এত ঘরবাড়ী!—আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মন্দির এতদিন তাহার কাছে স্থাপত্য-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন বলিয়া জানা ছিল—কিন্তু বিশ্বনাথের মন্দির?—অন্নপূর্ণার মন্দির? দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরকার লালপাথরের মন্দিরগুলা?

মধ্যে একদিন সে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রে বিশ্বনাথের আরতি দেখিতে গিয়াছিল—সে যে কি ব্যাপার তাহা সে মুখে বলিতে পারে না। ধূপধূনার ধোঁয়ায় মন্দির অন্ধকার হইয়া গেল—সাত-আটজন পূজারী একসঙ্গে মন্ত্র পড়িতে লাগিল—কি ভিড়, কি জাঁকজমক, কত বড় ঘরের মেয়েরা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের বেশভূষারই বা কি বাহার! কোথাকার একজন রাণী আসিয়াছিলেন—সঙ্গে চার-পাঁচজন চাকরাণী। দামী বারাণসী শাড়ী পরণে, সোনার কল্কাবসানো আঁচলটা আরতির পঞ্চপ্রদীপের আলোয় আগুনের মত জ্বলিতেছিল—কি টানা ডাগর চোখ—কি ভুরু, কি মুখশ্রী—[illegible]কারের রাণী সে কখনো দেখে নাই—গল্পেই শুনিয়াছে—হাঁ, রাণীর মত রূপ

বটে! তাঁহাকে বেশীক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছে কি ঠাকুরের আরতি বেশীক্ষণ দেখিয়াছে, তাহা সে জানে না।

ঠাকুর-দেবতার মন্দির ছাড়া এক-একখানা বসতবাড়ীই বা কি!···দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্দিপুরের গাঙ্গুলী বাড়ী গিয়া সে গাঙ্গুলীদের নাটমন্দির দো-মহলা বাড়ী, বাঁধানো পুকুরঘাট দেখিয়া মনে মনে কত ঈর্ষান্বিত হইত—মনে আছে একবার দুর্গাকে বলিয়াছিল···দেখেচিস্ বড়লোকের বাড়ীঘরের কি লক্ষ্মীছিরি?—এখন সেসব বাড়া রাস্তার দুধারে দেখিতেছে—তাহার কাছে গাঙ্গুলীবাড়ী?

এত গাড়ীঘোড়া একসঙ্গে যাইতে কখনও সে দেখে নাই। গাড়ীই বা কত ধরণের! আসিবার দিনে রাণাঘাটে, নৈহাটিতে সে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়াছে, বটে, কিন্তু এত ধরণের গাড়ী সে আগে কখনো দেখে নাই। দু চাকার গাড়ীই যে কত যায়! তাহার তো ইচ্ছা করে পথের ধারে দাঁড়াইয়া দু'দণ্ড এই সব দ্যাখে—কিন্তু স্ত্রীলোকটি সঙ্গে থাকে বলিয়া লজ্জায় পারে না।

অপু তো একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছে; এরকম কাণ্ডকারখানা সে কখনো কল্পনায় আনিতে পারে নাই। তাদের বাসা হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট বেশী দূর নয়, রোজ বিকালে সেখানে বেড়াইতে যায়। রোজই যেন চড়কের মেলা লাগিয়াই আছে। এখানে গান হইতেছে, ওখানে কথা হইতেছে, ওদিকে কে একজন রামায়ণ পড়িতেছে, লোকজনের ভিড়, হাসিমুখ, উৎসব, অপু সেখানে শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখে আর সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া মহা-উৎসাহে গল্প করে।

কাহাদের চাকর একটি ছোট ছেলেকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া রোজ বেড়াইতে আনে, অপু ভাব করিয়াছে,—তাহার নাম পণ্টু, ভাল করিয়া কথা কহিতে জানে না, ভারি চঞ্চল, তাই পাছে হারাইয়া যায় বলিয়া বাড়ীর লোকেদের এই জেল-কয়েদীর মত ব্যবস্থা। অপু হাসিয়া খুন। চাকরকে অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু সে ভয়ে দড়ি খুলিতে চাহে না। বন্দী নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অবোধ—এ ধরণের ব্যবহার যে প্রতিবাদযোগ্য, সে জ্ঞানই তাহার নাই। বাড়ী আসিলে সর্বজয়া রোজ তাহাকে বকে—একলা একলা ওরকম যাস কেন? শহর বাজার জায়গা, যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলিস্?···মায়ের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, একথা সে মাকে হাত নাড়িয়া দু'বেলা অধ্যবসায়সহকারে বুঝায়।

কাশীতে আসিয়া হরিহরের আয়ুও বাড়িল। কয়েক স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়া সে কয়েকটি মন্দিরে নিত্য পুরাণ-পাঠের কার্য যোগাড় করিল। তাহা ছাড়া একদিন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল,—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ বিকেলে

নিয়ে বোসো না কেন? কত ফিকিরে লোক পয়সা আনে, তোমার কেবল ব'সে ব'সে পরামর্শ আঁটা—

স্ত্রীর তাড়া খাইয়া হরিহর কাশীখণ্ডের পুঁথি লইয়া বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে। পুরাণ-পাঠ করা তাহার কিছু নূতন ব্যবসায় নহে, দেশে শিষ্যবাড়ী গিয়া কত ব্রত-পার্বণ উপলক্ষ্যে সে এ কাজ করিয়াছে। পুঁথি খুলিয়া সুস্বরে সে বন্দনা গান সুরু করে—

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং।
······স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত বেণুং
·········ব্রহ্মগোপালবেশং।

ভিড মন্দ হয় না।

বাসায় ফিরিয়া বালির কাগজে কি লেখে। স্ত্রীকে বলে, শুধু শ্লোক প'ড়ে গেলে কেউ শুন্‌তে চায় না—ওই বাঙাল কথকটার ওখানে আমার চেয়ে বেশী ভিড় হয়—ভেবেচি গোটাকতক পালা লিখবো, গান থাকবে। কথকতার মতও থাকবে, নৈলে লোক জমে না—বাঙালটার সঙ্গে পরশু আলাপ হোল, দেবনাগরীর অক্ষরপরিচয় নেই, শুধু ছড়া কেটে মেয়ে ভুলিয়ে পয়সা নেয়—আমার রেকাবী কুড়িয়ে ছ' আনা, আট আনা, আর ওর একটা টাকার কম নয়—শুন্‌বে একটু কেমন লিখ্‌চি?

খানিকটা সে পড়িয়া শুনায়। বলে—ঐ কথকের পুঁথি দেখে বনের বর্ণনাটা লিখে নেবো ভেবেচি—তা কি দেবে?

—তুমি কোন্ খান্‌টায় ব'সে কথা বলো বলতো? একদিন শুন্‌তে যেতে হবে—

—যেও না, শীতলার মন্দিরের নীচেই বসি—কালই যেও, নতুন পালাটা বল্‌বো, কাল একাদশী আছে, দিন্‌টা ভালো—

—আসবার সময় বিশ্বেশ্বরের গলির দোকান থেকে চার পয়সার পানফলের জিলিপী এনো দিকি অপুর জন্যে—সেদিন ওপরের খোট্টা বউ কি পূজো ক'রে আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে জল খেতে দিলে, বল্লে, পানফলের জিলিপী, বিশ্বেশ্বরের গলিতে পাওয়া যায়, খেতে গিয়ে ভাবলুম অপু জিলিপী খেতে বড় ভালবাসে—তা জল খেতে দিয়েচে আমি আর কি ব'লে নিয়ে আসি—এনো দিকি আজ চার পয়সার!

কয়েকদিন ধরিয়া হরিহরের কথকতা শুনিতে বেশ ভিড় হইতেছে। একখানা বড় বারকোশে করিয়া নারদঘাটের কালীবাড়ীর ঝি বড় একটা সিধা আনিয়া অপুদের দাওয়ায় নামাইল। সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল—আজ বুঝি

বারের পূজো ?—উনি বাড়ী আস্‌চেন দেখলে হ্যাঁ ঝি ? ঝি চলিয়া গেলে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—এদিকে আয় অপু—এই ত্থাখ তোর সেই নারকেলের কোঁপল—তুই ভালবাসিস, কিস্‌মিস্‌, কলা, কত বড় বড় আম দেখেছিস্‌, আয় খাবি দিই—বোস্‌ এখানে—

উৎসাহ পাইয়া হরিহর পুরাতন খাতাপত্রের তাড়া আবার বাহির করে। সর্বজয়া বলে—ধ্রুবচরিত্র শুন্‌তে শুন্‌তে লোকের কান যে ঝালাপালা হোল, নতুন একটা কিছু ধরো না ? সারা সকাল ও দুপুর বসিয়া হরিহর একমনে জড়ভরতের উপখ্যানকে কথকতার পালার আকারে লিখিয়া শেষ করে। মনে পড়ে এই কাশীতেই বসিয়া আজ বাইশ বৎসর পূর্বে যখন সে গীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদ করে, তখন তাহার বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। দেশে গিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যেন নিজের কাছে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। কাশীতে এত ছিল না —দেশে ফিরিয়া চারিধারে দাশুরায়ের গান, দেওয়ানজীর গান, গোবিন্দ অধিকারীর শুকসারীর দ্বন্দ্ব, লোকা ধোপার দলের মতি জুড়ির গানের বিস্তৃত প্রচলন ও পসার তাহার মনে একটা নতুন ধরণের প্রভাব বিস্তার করিল।

রাত্রে স্ত্রীর কাছে গল্প করিত—বাজারের বারোয়ারীতে কবির গান হচ্চে বুঝলে ?—ব'সে ব'সে শুন্‌লাম বুঝলে ?—সোজা পদ সব—কিছুই না, রও না, সংসারটা একটু গুছিয়ে নিয়ে বসি ভাল হ'য়ে—নতুন ধরণের পালা বাঁধবো —এরা সকলে গায় সেই সব মান্ধাতা আমলের পদ—রাজুকে তাই কাল বলছিলাম—

অনেক রাত্রে উঠিয়া এক একদিন হরিহর বাহিরে দাওয়ায় বসিয়া কি ভাবিত, অনির্দিষ্ট কোন আনন্দে তাহার মন যেন পালকের মত হালকা হইয়া উঠিত।

কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে।—

ঝাড়লণ্ঠনের আলো-দোলানো বড় আসরে সে দেখিতে পায়, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে তাহার ছড়া, গান, শ্যামা-সঙ্গীত, পদ, রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া গাওনা হইতেছে। কত দূরদূরান্তর হইতে মাঠ-ঘাট ভাঙ্গিয়া লোকে খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া আনিয়া বসিয়া আছে গান শুনিতে! দলের অধিকারীরা তাহার বাড়ী আসিয়া পালা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাঃ! ভারি চমৎকার তো! কার বাঁধা ছড়া?—'কবির গুরু ঠাকুর গুরু—' গুরু ঠাকুরের?—না। নিশ্চিন্দপুরের হরিহর রায় মহাশয়ের।

এই দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়াই তো বাইশ বৎসর পূর্বে মনে মনে কত ভাঙা-গড়া করিয়াছে—তারপর কবে সে সব ধীরে ধীরে ভুলিয়া গেল—কবে ধীরে ধীরে

নূতন খাতাপত্রের তাড়া বাক্সের অনাদৃত, গুপ্ত কোণ আশ্রয় করিয়া দিনের আলো হইতে মুখ লুকাইয়া রহিল—যৌবনের স্বপ্নজাল জীবন-মধ্যাহ্নে কুয়াশার মত দিগন্তে দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

হারানো যৌবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে, কত কথা মনে পড়ে—জীবনের সেসব দিনকে আর একবারও ফেরানো যায় না?

দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেক ছেলের সঙ্গে অপুর ভাব হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহার বয়সী সব ছেলেই স্কুলে পড়ে, সে-ই কেবল এখনো স্কুলে পড়ে নাই; নিশ্চিন্দিপুরে মাছ ধরিয়া ও নৌকায় বেড়াইয়া দিন কাটানো চলিত বটে, কিন্তু এখানে সমবয়সীদের কাছে কিছু পড়ে না বলিতে লজ্জা করে।

তাহা ছাড়া দশাশ্বমেধ ঘাটে যেসব ছেলের সঙ্গে তাহার ভাব হইয়াছে, সবাই অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। পন্টুর দাদা একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিল যে তাহার বাবাকে খুব বিদেশে বেড়াইতে হয়। অপু বলিয়াছিল—কেন তোমাদের বুঝি খুব শিষ্য-বাড়ী আছে? পন্টুর দাদা আশ্চর্য হইয়া বলিল—শিষ্য বাড়ী? কিসের ভাই?···

অপু সদুত্তর দিবার পূর্বেই সে বলিল—আমার বাবা কণ্ট্রাক্টরী করেন কি না? তা ছাড়া কাঁথিতে ছোট জমিদারী আছে—তবে আজকাল কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে?

এক একদিন বৈকালে অপু দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতে গিয়া বাবার মুখে পুরাণ-পাঠ শোনে। হরিণশিশু শ্বাপদ কর্তৃক নিহত হইলে হরিণবালকের স্নেহাসক্ত রাজর্ষি ভরতের করুণ বিরহবেদনা ও পরিশেষে তাঁহার মৃত্যুর কাহিনী শীতলা-মন্দিরের পৈঠার উপর বসিয়া একমনে শুনিতে শুনিতে তাহার চোখে জল আসে—এদিকে আবার যখন সিন্ধু সৌবীরের রাজা বহুগণ তাঁহার স্বরূপ না জানিয়া রাজর্ষি ভরতকে শিবিকাবাহক নিযুক্ত করেন—তখন হইতে কৌতূহলে ও উৎকণ্ঠায় তাহার বুক দুরু দুরু করে, মনে হয় এইবার একটা কিছু ঘটিবে; ঠিক ঘটিবে। কথকতার শেষে পূরবী সুরের আশীর্বচনটি তাহার ভারি ভাল লাগে—

কালে বর্ষতু পর্জন্য পৃথিবী শস্যশালিনী
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ···

সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে অস্তসূর্যের রাঙা আভা ও পূরবীর মূর্চ্ছনার সঙ্গে হরিণ-বালকের বিয়োগবেদনাতুর রাজর্ষির ব্যথা যেন মিশাইয়া থাকে।

বাড়ীতে কাগজ কলম বাবার কাছে লইয়া গিয়া বলে—আমায় লিখে দাও না বাবা, ঐ যে তুমি গাও—কালে বর্ষতু পর্জন্যং?

হরিহর খুশি হইয়া বলে—তুই বুঝি শুনিস্ খোকা ?

—আমি তো রোজই থাকি—তুমি কাল যখন ভরতের মা মারা যাওয়ার কথা বল্‌ছিলে আমি তখন তো তোমার পিছন দিকে বসে—মন্দিরের ধাপে—

—তোর কি রকম লাগে—ভাল লাগে ?

—খু-উ-উ-উব। আমি তো রোজ রোজ শুনি—

অপু কিন্তু একটা কথা লুকায়। যেদিন তাহার সঙ্গীরা থাকে, সেদিন কিন্তু বাবার দিকে সে যায় না। সেদিন বাবার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহার বাবা দেখিতে পাইয়া ডাকিল—খোকা, ও খোকা—

তাহার সঙ্গের বন্ধুটি বলিল—তোমাকে চেনে না কি ?

অপু শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানায়, হ্যাঁ। সে বাবার কাছে আসে নাই সেদিন। তাহার বাবা ঘাটে কথকতা করিতেছে, একথা বন্ধুরা পাছে টের পায়! সে পল্টুর দাদা ছাড়া অন্য বন্ধুদের কাছে গল্প করিয়াছে কাশীতে তাহাদের বাড়ী আছে, তাহারা কাশীতে হাওয়া বদ্‌লাইতে আসিয়াছে, দেশে খুব বড় বাড়ী, তাহার বাবা কণ্ট্রাক্টরী করেন, তা ছাড়া দেশে জমিদারীও আছে। শেষে বলে—কিন্তু জমিদারী থাকলে কি হবে, কিস্তি দিয়ে কিই বা থাকে ?

তাহার বন্ধুদের বয়স তাহার অপেক্ষা খুব বেশী নয় বলিয়াই বোধ হয় তাহার বর্ণিত গল্পের সঙ্গে তাহার পোষাক পরিচ্ছদের অসঙ্গতি ধরা পড়ে না, বিশেষতঃ তাহার সুন্দর মুখের গুণে সব মানাইয়া যায়।

পূর্ণিমার দিন কথক ঠাকুরের ওখানে বেশ ভিড় হইল। সন্ধ্যার পর হরিহর কথা শেষ করিয়া ঘাটের রানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, কথক ঠাকুর জলে হাত মুখ ধুইতে নামিল। হরিহরকে দেখিয়া বলিল—এই যে আপনিও আছেন, দেখলেন তো কাণ্ড, পুন্নিমের দিনটা—বলি আজ দিনটা ভাল আছে, বামন-ভিক্ষে লাগাই—আগে আগে এই কাশীতে বামন-ভিক্ষা হোলে পনের সের আধমণ করে চাল পড়তো—আজকাল মশাই মহা বামন-ভিক্ষেতেও লোকে ভেজে না—চালের ত একটা দানাও না—এদিকে সিকে-পাঁচেক হবে, তার মধ্যে আবার দুটো অচল দোয়ানি—।—মশায়ের শিক্ষা কোথায় ?

—শিক্ষা তো ছিল এই কাশীতেই, অনেকদিন আগে। তবে এত দিন দেশেই ছিলাম—এইবার এখানে এসে বাসা ক'রে আছি—

—মশায়ের বাসা কি নিকটে ?—একটু চা খাওয়াতে পারেন ?—কদিন থেকে ভাবচি একটু চা খাবো—এই দেখুন না, চাদরের মুড়োয় চা বেঁধে নিয়ে নিয়ে ঘুরি, বলি না হয় কোনো হালুইকরের দোকানে একটু গরমজল করিগে—গলা বসে গিয়েছে, একটু লোন্-চা খেলে গলাটা···

হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন না এই তো নিকটেই আমার বাসা—চলুন না?

কথককে লইয়া হরিহর বাড়ী আসিল।

চা খাওয়ার পাট কোন কালে নাই। কড়ায় জল গরম করিয়া চা তৈরী হইল। অপু কাঁসার গ্লাসে চা রেকাবিতে কিছু খাবার কথকের সামনে লইয়া আসিল। খাবার দেখিয়া কথকঠাকুর ভারি খুশি হইল—খাবারের আশা সে করে নাই।

—এটি ছেলে বুঝি! বাঃ বেশ ছেলে তো আপনার? ভারি সুন্দর দেখতে—বাঃ—এস এস বাবা, থাক্ থাক কল্যাণ হোক—লোন্-চা করিয়েচেন তো মশায়?—দেখি—

হরিহর বলিল—আপনার কি ছেলেপিলে সব এখানেই—

—সংসার নেই তো ছেলেপিলে? দশ বিঘে জমিও বেরিয়ে গেল অথচ ও মূলেও হাভাত—জমি ক'বিঘে যদি আজ থাক্‌তো—তো আজ কি এই এতদূরে আসি—আপনিও যেমন!...এসব কি আর দেশ মশাই?...বিশ্বেশ্বর অবিশ্যি মাথায় থাকুন—এমন শীতকাল যাচ্ছে মশাই—না একটু খেজুর রস, না একটু গুড় পাটালি—আমার নিজের মশাই তুকুড়ি খেজুর গাছ—

—মশাইয়ের দেশটা কোথায়?—

—সাতক্ষীরের সন্নিকট,—বাদুড়ে শীতলকাটি জানেন? শীতল-কাটির চক্কত্তিরা খুব ঘরানা—

হরিহর তামাক সাজিয়া নিজে কয়েক টান্ দিয়া কথকঠাকুরের হাতে দিয়া বলিল—খান—

—কিছু না মশায়, ফাগুন মাসের দিকে তো যাই—একটা বাগান আছে দিয়ে আসি বিক্রি ক'রে,—আমরা আবার শ্রোত্রিয় কিনা?...তা জমি দশ বিঘে ছিল, তাই বন্ধক দিয়ে পণ যোগাড় করলাম—বিয়েও করলাম,—মশাই দশ বছর ঘর করলাম—হোল কি জানেন? সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরের চাল থেকে কুমড়ো কাট্‌তে গিয়েছে—ছিল মশাই সেখানে সাপ আমার জন্যে তৈরী হয়ে—হাতে দিয়েচে কামড়ে—আমি আবার নেই সেদিন বাড়ী—কেই বা বদ্যি কবরেজ দেখিয়েচে, কেই বা কি করেচে—পাটুলির ঘাট পার হচ্চি—গাঁয়ের মহেশ সাধুখাঁ ওপার থেকে আসচে, আমায় বল্লে শিগ্‌গির বাড়ী যান মশায়—আপনার বাড়ী বড় বিপদ—কি বিপদ তা বলে না—বাড়ী পৌঁছে দেখি আগের রাত্রিতেই তো গিয়েচে ম'রে।—এই গেল ব্যাপার মশাই... জমিকে জমিও গেল—এদিকেও—। সেই থেকে বলি, যাই দেশে থেকে আর কিই বা হবে—কোত্থেকে পাবো তিন চারশ টাকা যে

যাই বিশ্বনাথের ওখানে…অন্নকষ্টটা তো হবে না—আজ বছর আষ্টেক হয়ে গেল। এক খুড়তুতো ভাই আছে—জমিজমা সামান্য যা একটু আছে, দখল ক'রে ব'সে আছে—বলে তোমার ভাগ নেই—বেশ বাপু নেই তো নেই—গোলমালের মধ্যে কখখনো আমি যাবো না—করগে যা দখল। উঠি মশাই,—আপনার এখানে বেশ চা খাওয়া গেল—আপনার ছেলেটি কোথায় গেল?—বেশ ছেলে, খাসা—

পুরানো চামড়ার তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা ঝাড়িয়া লইয়া কথকঠাকুর পায়ে দিয়া দরজার কাছে আসিল—যাইতে যাইতে বলিল—কালও লাগাবো বামনভিক্ষে—দেখি কি হয়—

হরিহরের বাসাটা বিশেষ ভাল নয়। নীচের তলার স্যাঁতসেঁতে ঘর, তাও মাত্র দুখানি, এত অন্ধকার যে হঠাৎ বাহির হইতে আসিলে ঘরের কোনো জিনিস নজরে পড়ে না। এরকম স্থানে সর্বজয়া কখনো বাস করে নাই, তাহাদের দেশের বাড়ী পুরানো হইলেও রৌদ্রহাওয়া খেলিবার বড় বড় দরজা জানালা ছিল, সেকালের উঁচু ভিতরে কোঠা, খট খট করিত, শুকনা। এ বাসার স্যাঁতসেঁতে মেজে ও অন্ধকারে সর্বজয়ার মাথা ধরে। অপু তো মোটেই ঘরে থাকে না, সূর্যালোকপুষ্ট নবীন তরুর ন্যায় শুধু আলোর দিকে তার মুখটি থাকে ফিরানো. নিশ্চিন্দিপুরের মুক্ত মাঠে, নদীর আলো-হাওয়ায় মানুষ হইয়া এই বদ্ধঘরের অন্ধকারে তার প্রাণ হাপাইয়া ওঠে, একদণ্ডও সে এখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

কাশী দেখিয়া সে একটু নিরাশ হইয়াছে। বড় বড় বাড়ীঘর থাকিলে কি হইবে, এখানে বন নাই মোটেই।

সন্ধ্যার দিকে একদিন কথকঠাকুর হরিহরের বাসায় আসিল। এ-কথা-ওকথার পর বলিল—কৈ আপনার ছেলেকে দেখ্‌চি নে?

হরিহর বলিল—কোথায় বেরিয়েচে খেলা করতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকেই [illegible] গেছে, একটু

কথকঠাকুর উড়ানির প্রান্তে বাঁধা কি' দ্রব্য খুলিতে খুলিতে বলিল—আপনার ছেলের সঙ্গে বড় ভাব হয়ে গিয়েছে মশাই—সেদিন ঘাটে কাছে ডেকে বসিয়ে অনেকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা কইলাম—কড়ি খেলতে ভালবাসে তাই এই ত্নটো সমুদ্রের কড়ি সেদিন ব্রতের সিধেয় কারা দিইছিল, ভাবলাম ওকে দিয়ে আসি—রেখে দিন আপনি ও এলে দেবেন—

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অপু বাবাকে ধরিল সে স্কুলে ভর্তি হইবে। বলিল—সবাই পড়ে ইস্কুলে বাবা, আমিও পড়বো—ওই তো গলির মোড় ছাড়িয়ে একটুখানি গিয়েই ভাল ইস্কুল—

হরিহর ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। যদিও ছাত্রবৃত্তি স্কুল তবে ইংরাজী পড়াও হয়। প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে—সে প্রায় পাঁচ বছর হইয়া গিয়াছে—এই তাহার পুনরায় অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া।

মাঘমাসের মাঝামাঝি কথকঠাকুর একটুকরা বালির কাগজ হাতে একদিন হরিহরের বাসায় আসিয়া হাজির। কাগজের টুকরা দেখাইয়া বলিল—দেখুন তো মশাই পড়ে, এই রকম যদি লিখি তবে হয়?

হরিহর পড়িয়া দেখিল কাশীবাসী রামগোপাল চক্রবর্তী নামে কোনো লোক কথক ঠাকুরের নামে স্বগ্রামের দশবিঘা জমি দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, অমুক অমুক অমুক সাক্ষী, স্থান দশাশ্বমেধ ঘাট, অমুক তারিখ। কথক ঠাকুর বলিল—ব্যাপারটা কি জানেন? আমাদের দেশে কুমুরে গ্রামের রামগোপাল চক্কত্তি ভারি পণ্ডিত ছিলেন, মরবার বছর খানেক আগে আমাকে বললেন, রামধন তোমার তো কিচ্ছু নেই, ভাবছি তোমাকে বিঘে দশেক জমি দান করব—তুমি নেবে কি? তা ভাবলাম সদ্ব্রাহ্মণ দিতে চাচ্ছেন, দোষই বা কী? তারপর তিনি মুখে মুখে জমিটা আমায় দিয়ে দিলেন। দিলেন দিলেন—এতকাল তত গা করিনি, কাশীতেই থাকবো, দেশে ঘরে থাকবো না কি হবে জমি? তারপর চক্কত্তি গেলেন মারা। জমির দানটা মুখে মুখেই রয়ে গেল। এতকাল পরে ভাবচি দেশে যাবো—ছেলেপিলে না হলে কি আর মানুষ মশাই? আপনাকে বলতে কি, শ তিনেক টাকা হাত করেচি—করেচি জলাহার ক'রে মশাই—আর শ ত্নই টাকা পেলে শ্রোত্রিয় ঘরের মেয়ে পাওয়া যায়—তা যদি তাই ঘটে তবে জমিটা দরকার হবে তো? ভাবলাম মুখে মুখে দান, সে কি আর চক্কত্তি মশাই-এর ছেলেরা মানবে? ভেবে চিন্তে এই কাগজখানা ব'সে ব'সে লিখিচি—নিজেই লিখিচি মশাই, সই টই সব—দুজন সাক্ষী, সব বানানো—দেখি লেখা কাগজ যদি মানে। গিয়ে বলবো, এই ত্থাখো তোমার বাবা এই জমিটা দান করেচেন—

উঠিবার সময় কথকঠাকুর বলিল—ভালো কথা মশাই, মঙ্গলবারে মাঘী-পূর্ণিমার দিন আপনার ছেলেকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো ওই টেওটার রাজার ঠাকুর বাড়ীতে, ঠিক মানমন্দিরের গায়েই একেবারে। সন্ধ্যের পর বছর বছর ব্রাহ্মণভোজন করায় কিনা। একটু সগর্বে বলিল—আমায় একখানা করে নেমন্তন্ন পত্তর ছ্যায়, বেশ ভাল খাওয়ায়, চমৎকার। আমি এসে নিয়ে যাবো সেদিন কিন্তু।

মাঘীপূর্ণিমার দিন শেষ রাত্রি হইতে পথে স্নানার্থীদের ভিড় দেখিয়া সর্বজয়া অবাক্ হইয়া গেল। দলে দলে মেয়ে পুরুষে 'জয় বিশ্বনাথজী কি জয়,' 'বোলো ব্যোম', 'বোলো ব্যোম' বলিতে বলিতে দুরন্ত মাঘেও শীতকে উপেক্ষা করিয়া স্নানের জন্য চলিয়াছে। একটু বেলা হইলে পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সর্বজয়াও স্নান করিতে গেল—গঙ্গার ঘাটের জল, সিঁড়ি, মন্দির পথ সব উৎসববেশে সজ্জিত নরনারীতে পূর্ণ। জলে নামা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ষষ্ঠির মন্দিরে লাল নিশান উড়িতেছে।

সন্ধ্যার আগে কথকঠাকুর অপুকে লইতে আসিল। সর্বজয়া বলিল—পাঠিয়ে দাও গিয়ে, কেউ নেই, অপুর ওপর একটা দম হয়েচে, দশাশ্বমেধ ঘাটে ওকে ডেকে কাছে বসিয়ে গল্প করে, একদিন নাকি পেঁপে কিনে খাইয়েচে—পাঠিয়ে দাও, লোক ভালো—

অপু প্রথমে কথকঠাকুরের সঙ্গে তাহার বাসায় গেল। খোলার ঘর, মাটির দেওয়ালের নানাস্থানে খড়ি দিয়া হিসাব লেখা। নমুনা:

সিয়ারসোলের রাণীর বাড়ী ভাগবত পাঠ	...	৪৲
মুসম্মত কুন্তার ঠাকুর বাড়ী —ঐ—	...	৩৲
ধারক লালজী দোবের একদিন খোরাকী	...	।০

বিশেষ কিছু আসবাবপত্র নাই। একখানা সরু চৌকী পাতা, একটা ছোট টিনের তোরঙ্গ, একটা দড়ি-টাঙানো আল্‌না, একজোড়া খড়ম। দেওয়ালের গায়ে পেরেকে একটা বড় পদ্মবীজের মালা টাঙানো।

কথকঠাকুর বলিল—কমলালেবু খাবে?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে আপনার?

কি জানি কেন এই কথকঠাকুরের কাছে তাহার কোনো প্রকার লজ্জা কি সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল না। লেবুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল—'কালে বর্ষতু পর্জন্যং' জানেন আপনি?

—কালে বর্ষতু পর্জন্যং? খুব জানি, রোজ বলি তো, একদিন শুনো না—

—এখন ন না বলুএকটিবার?

কথক সুর করিয়া বলিল বটে কিন্তু অপুর মনে হইল তাহার বাবার মুখে শুনিলে আরও ভাল লাগে, কথকের গলা বড় মোটা।

দেশে লইয়া যাইবার জন্য কথকঠাকুর নানা খুচ্‌রা মাটির ও পাথরের জিনিস—পুতুল, খেল্‌না, শিবলিঙ্গ, মালা, কাঠের কাঁকই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। অপুকে দেখাইয়া বলিল—কাশীর জিনিস, সবাই বল্‌বে কি এনেচ দেখি। তাই নিয়ে যাবো—

নানা সরু গলি পার হইয়া একটা অন্ধকার বাড়ীর দরজার সাম্‌নে আসিয়া কথকঠাকুর দাঁড়াইল। নীচু দরজা দিয়া অতি কষ্টে কথকের সঙ্গে ঢুকিয়া অপুর মনে হইল বাড়ীটায় কেহ কোথাও নাই, সব নিঝুম। কথকঠাকুর দু'একবার গলায় কাশির শব্দ করিতে কে একজন দালানের চারপাই হইতে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া মোটা গলায় হিন্দীতে কি জিজ্ঞাসা করিল, অপু তাহা বুঝিতে পারিল না। কথকঠাকুর পরিচয় দিবার পরেও মনে হইল লোকটা তাহাকে চিনেও না, বা তাহাদের আগমন প্রত্যাশাও করে নাই। পরে লোকটা যেন একটু বিরক্তির সহিত কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিতে গেল। কিন্তু ফিরিতে এত দেরি করিতে লাগিল যে, অপুর মনে হইল হয়ত ইহারা বলিবে তোমাদের তো নিমন্ত্রণ হয় নাই, যাও তোমরা। যাহাই হউক, অন্ধকারে ঠায় পনেরো মিনিট দাঁড়াইবার পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া দালানের একস্থানে আধ-অন্ধকারে খানকতক শালপাতা পাতিয়া ইহাদের বসাইয়া দিল। একটা মোটা পিতলের লোটায় জল দিয়া গিয়াছে। কথকঠাকুর যেন ভয়ে ভয়ে গিয়া আসনের উপর বসিল। রাজার বাড়ী কি না জানি খাওয়া! অধীর আগ্রহে অপু প্রায় আরও বিশ মিনিট পাতা পাতিয়া বসিয়া রহিল—কাহারও দেখা নাই। নিমন্ত্রণ খাইতে পাইবার নিশ্চয়তার সম্বন্ধে যখন পুনরায় অপুর মনে সন্দেহ দেখা দিতেছে ঠিক সেই সময় পরিবেশকের আবির্ভাবরূপ অঘটন ঘটিল! মোটা মোটা আটার পুরা ও স্বাদগন্ধহীন বেগুনের ঘণ্ট—শেষে খুব বড় বড় লাড্ডু। অপু কামড়াইতে গিয়া লাড্ডু দাঁত বসাইতে পারিল না, এত কঠিন। কথকঠাকুর চাহিয়া চাহিয়া সেই মোটা পুরী খান দশ বারো আগ্রহের সহিত খাইল। মাঝে মাঝে অপুর দিকে চাহিয়া বলিতেছিল—পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরো না, বেশ খাওয়ায়—বেশ লাড্ডু, না? দাঁতে এখনও খুব জোর আছে, বেশ চিবুতে পারি।

একশত বৎসর একসঙ্গে থাকিলেও কেহ হয়তো আমার হৃদয়ের বাহিরে থাকিয়া যায় যদি না কোন বিশেষ ঘটনায় সে আমার হৃদয়ের কবাট খুলিতে পারে। আজকার এই নিমন্ত্রণ খাইতে আসার-অনাদর, অবজ্ঞা, অপু বালক

হইলেও বুঝিয়াছিল। তাহার পরও এই খাইবার লোভে ও আনন্দে অপুর অন্তরতম হৃদয়ে ঘা লাগিল। তাহার মনে হইল এ কথকঠাকুর অতি অভাজন! ভাবিল, কথকঠাকুর কখনও কিছু খেতে পায় না, আহা এই লাড্ডু তাই অমন করে খাচ্ছে—ওকে একদিন মা'কে ব'লে বাসাতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো—

করুণা ভালবাসার সব চেয়ে মূল্যবান মশলা, তার গাঁথুনি বড় পাকা হয়। তাহার শৈশব মনে এই বিদেশী, দুদিনের পরিচিত, বাঙাল কথকঠাকুর তাহার দিদি ও গুলকীর সঙ্গে এক হারে গাঁথা হইয়া গেল স্বদ্ধ এক লাড্ডু খাইবার অধীর লোভের ভঙ্গীতে।

ইহার অল্পদিন পরেই কথকঠাকুর দেশে চলিয়া গেল। রাজঘাটের স্টেশনে কথকঠাকুরের নির্বন্ধাতিশয্যে হরিহর অপুকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেল। হরিহরের মনে হইল আজ বাইশ বৎসর পূর্বে সে যাহা করিতে দেশে গিয়াছিল—সেই ব্যক্তি তাহার বর্তমান বয়সের চেয়েও অন্ততঃ আট বৎসর বেশী বয়সে তাহাই করিতে অর্থাৎ নূতন করিয়া সংসার পাতিতে দেশে চলিয়াছে। সুতরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে? কোন্ কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?

গাড়ী ছাড়িলে অপুর চোখে জল আসিল। বালকের প্রাণে সময়ে সময়ে বয়স্ক লোকের উপর স্থায়ী সত্যিকার স্নেহ আসে। দুর্লভ বলিয়াই তাহা বড় মূল্যবান।

মাঘ মাসের শেষের দিকে একদিন হরিহর হঠাৎ বাড়ী ঢুকিয়াই উঠানের ধারে বসিয়া পড়িল। সর্বজয়া কি করিতেছিল, কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলিল,—কি হয়েচে এমন ক'রে ব'সে পড়লে যে? স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু মুখের কথাটা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। হরিহরের চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল, ডান হাতখানা যেন কাঁপিতেছে। সর্বজয়া হাত ধরিয়া তুলিতে আসিতে সে ঘোরা ঘোরা আচ্ছন্নভাবে বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

সর্বজয়া গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরে তাহার গা পুড়িয়া যাইতেছে। সন্তর্পণে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল —অপু আসচে, তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েচে ওপরের ওই নন্দবাবু, বোধ হয় গোধুলিয়ার মোড়ে তার দোকানে নিয়ে গিয়েচে,—

অপু দোকানে যায় নাই, নন্দবাবুর ঘরের সামনে ছাদে বসিয়া বই

পড়িতেছিল। মাসখানেক হইল নন্দবাবুর সঙ্গে অপুর খুব আলাপ জমিয়াছে। নন্দবাবুর বয়স কত তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার ক্ষমতা তাহার হয় নাই, তবে তাহার বাবার চেয়ে ছোট মনে হয়। নন্দবাবুর উপরের ঘরে সে অনেকগুলি বই আবিষ্কার করিয়াছে—নন্দবাবু যখন ঘরে থাকে তখন বই লইয়া ছাদে বসিয়া পড়ে। কিন্তু ভয় হয় পাছে নন্দবাবু পড়িতে না দিয়া বই কাড়িয়া লয়, কারণ একদিন সেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ছাদের এক কোণে রৌদ্রে বসিয়া অপু পড়িতেছিল, নন্দবাবু ঘরের ভিতর কি খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধমক দিয়া বলিল—আরে রেখে দাও, তোমার ব'সে ব'সে যত ঐ সব বই পড়া, কোথাকার জিনিস কোথায় রাখো তার ঠিক নেই, কাজের সময় খুঁজে মেলে না—যাও, রাখো বই, যাও—

সে তো ঘরের অন্য কোনো জিনিসে হাত দেয় না, তবে তাহাকে বকিবার কারণ কি? সেই হইতে সে ভয়ে ভয়ে বই লইয়া থাকে।

নন্দবাবু সন্ধ্যার সময় টেরি কাটিয়া ভাল জামা কাপড় পরিয়া শিশি হইতে কি গন্ধ মাখিয়া রোজ বেড়াইতে যায়। অপুর গায়ে একদিন একটু শিশি হইতে ছড়াইয়া দিয়াছিল, বেশ ভুরভুরে গন্ধটা।

সন্ধ্যার পরও সে আগে আগে নন্দবাবুর ঘরে পড়িতে যাইত। কিন্তু সন্ধ্যার পরে নন্দবাবু আলমারি হইতে একটা বোতল লইয়া লাল-মত একটা ওষুধ খায়। সে সময়ে সে একদিন ঘরে গিয়া পড়িলে তাহাকে ভারি বকিয়াছিল। নন্দবাবুদের ঘরে উঠিবার সিঁড়ি অন্যদিকে—আর একদিন রাত্রে হঠাৎ ওপরের ঘরে গিয়া সে দেখিয়াছিল একটি কে স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া নন্দবাবু বলিয়াছিল—এখন যাও অপূর্ব, ইনি আমার শালী—দেখতে এসেচেন, এখুনি চলে যাবেন। ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে শুনিয়াছিল নন্দবাবু বলিতেছে—ও আমাদের নীচের ভাড়াটের ছেলে—কিছু বোঝে সোজে না।

নন্দবাবু তাহাকে প্রায়ই তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করে। বলে, তোমার মাকে ব'লে পান নিয়ে এস দিকি? আমার চাকরটা পান সাজতে জানে না—

অপু মায়ের কাছে আবদার করিয়া প্রায়ই পান আনে। নন্দবাবু মাঝে মাঝে বলে—তোমার মা আমার কথা কিছু বলেন টলেন নাকি—না?—অপু বাড়ী আসিয়া মাকে বলে—নন্দবাবু বেশ লোক মা—তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস করে।

—আমার কথা? আমার কথা কি জিজ্ঞেস করে?

—বলছিলো তোমার মাকে বোলো, আমি তাঁর কথা জিজ্ঞেস্ করি-টরি—বেশ লোক—

—করুক সে—তুই পাজি ছেলে অত ওপরের ঘরে যাস্-টাস্ কেন ? বিকেলে ওপরে ব'সে ব'সে কি করিস্ ?

হরিহরের জ্বরটা একটু কমিল। অপু স্কুল হইতে আসিয়া বই নামাইয়া রাখিতেছে। পায়ের শব্দ পাইয়া হরিহর বলিল—খোকা এস, একটু বসো বাবা—

অপু বসিয়া বসিয়া স্কুলের গল্প পড়িতে লাগিল। হাসিমুখে নীচু স্বরে বলিল—এই দু'মাস তো স্কুলে গিইচি, এরই মধ্যে বাবা, সবাই খুব ভালবাসে, রোজ রোজ ফার্স্ট বেঞ্চে বসি—স্কুলে আমাদের ক্লাসে একখানা ছাপিয়ে কাগজ বার করবে একমাস অন্তর। আমাকে সেই দলে নিয়েচে—তোমায় দেখাবো বাবা বেরুলে—

হরিহরের বুকের ভিতরটা মমতায় বেদনায় কেমন করে। অপু একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলে—একটা লেখা লিখেচি—কাগজখানা ছাপাবে বলেচে, আমার নামে—কিন্তু যারা দু'টাকা কোরে চাঁদা দেবে শুধু তাদেরই লেখা ছাপবে বলেচে—দু'টাকা দেবে বাবা ?

হরিহর অধীর আগ্রহে ছেলের হাত হইতে কাগজখানা লইয়া পড়িতে সুরু করে। ছেলে যে লেখে সে খবর সে জানিত না। রাজপুত্রের মৃগয়ার গল্প, সুন্দর বানানো, হরিহর খুশি হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসে, বলে,—তুই লিখেচিস্ খোকা ?

—আমি তো আরো কত লিখিচি বাবা, ভূতের গল্প, রাজকন্যের—বাড়ী থাকতে রাণুদির খাতায় লিখে লিখে দিতাম তো—

সর্বজয়া টাকার নাম শুনিয়া দিতে চাহে না। স্বামী অসুখে পড়িয়া, এ অবস্থায় যাহা আছে তাহা সংসারের খরচেই কুলাইবে না, দরকার নাই ছাপানো কাগজে। হরিহর বুঝাইয়া বলিয়া টাকা দেওয়ায়, বলে—দাও গিয়ে, আহা খোকার লেখাটা ছাপিয়ে আসুক, সেরে উঠে পথ্যি করলেই ঠাকুরবাড়ীর ভাগবত পাঠটা তো ঠিকই রয়েচে—ওতেও তো গোটা দশেক টাকা পাবো—

দিন দুই পরে অপু নিরাশ মুখে রাঙা ঠোঁট ফুলাইয়া বাবার কাছে চুপি চুপি আসিয়া বলে, হ'লো না বাবা। ছাপাখানাওয়ালার লোকেরা বেশী দাম চেয়েচে, তাই আজ স্কুলে ব'লে দিয়েচে, চার টাকা ক'রে চাঁদা চাই,—

ছেলের মুখের নিরাশার ভাব হরিহরের বুকে খচ করিয়া বিঁধে। খানিকক্ষণ অন্য কথার পর সে বলে—ছাখ দিকি খোকা তোর মা কোথায় গেল ? বালিশের তলা হইতে চাবির থোলো বাহির করিয়া দিয়া বলে—চুপি চুপি ওই কাঠের ছাপ বাক্স. যেটাতে আমার কঞ্চির কলমের বাণ্ডিল আছে, ওইটেই খোল্ তো ?

…কোণে ছাখ্‌তো ক টাকা আছে? তাহার পরে হরিহর সন্তর্পণে বাক্সখোলা-নিরত পুত্রের দিকে মমতার চোখে চাহিয়া থাকে। অবোধ, অবোধ, নিতান্ত অবোধ।…ওর সুন্দর, শুভ্র চাঁদের মত ললাটটি ওর মায়ের ললাট, চোখ দুটি ওর মায়ের চোখ। যখন হরিহর প্রথমে যৌবনে বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনে, নববধূ সর্বজয়া অবিকল সেই মুখের হাসি এগারো বছরের অপুর অনাবিল নবীন মুখে!

অকারণে হরিহরের বুকের মধ্যে স্নেহসমুদ্র উদ্বেল উত্তাল হইয়া উঠিয়া চোখে জল ভরিয়া আনে।

অপু যেন প্রথম বসন্তের নবকিশলয়, তাহার মুখের আনন্দ যেন প্রভাতের নব-অরুণ আভা, তার ডাগর ডাগর নীলাভ চোখদুটির চাহনির মধ্যে নিজের অতীত যৌবনদিনের সে অসীম স্বপ্ন, সুনাল পাহাড়ের নবীন শালতরুশ্রেণীর উল্লাস-মর্মর—কূলহারা সমুদ্রের দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি।

অপু চুপি চুপি বাবাকে দেখাইয়া বলে…চারটে টাকা আছে বাবা—হরিহর সময় অসময়ের জন্য টাকা কয়টি রাখিয়া দিয়াছে নিজের বাক্সে লুকাইয়া, স্ত্রী জানে না, কাজেই সে নিশ্চিন্তমনে বলিতে পারিল—নিয়ে যা খোকা, চাঁদা দিয়ে দিস্, কিন্তু তোর মাকে যেন বলিস্‌নে।

অপু খুশির সুরে বলে—ছাপা বেরুলে তোমায় দেখাবো বাবা, আমার নামে ছাপিয়ে দেবে বলেচে—এই সোমবারের পরের সোমবারে বেরুবে—

পরদিন সকাল হইতে হরিহরের অসুখ আবার বাড়িল।

সর্বজয়া ভয় পাইয়া ছেলেকে বলিল—নন্দবাবুকে বল্‌গে যা তো—একবার এসে দেখে যান—

নন্দবাবু দেখিয়া বলিল—একজন ডাক্তার ডাকতে হবে অপূর্ব, তোমার মাকে বলো।

বৈকালে নন্দবাবুই একজন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—ঠাণ্ডা লেগে হয়েচে, ব্রঙ্কো-নিমোনিয়া—ভাল নার্সিং চাই, নীচের ঘরে কি এমনি ক'রে থাকে!…খোকা, তুমি একটা শিশি নিয়ে এস আমার ডাক্তারখানায়, ওষুধ দেবো—

অপু কয়দিন গিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারী হইতে ঔষধ আনিল। বিশেষ কোনো ফল দেখা গেল না। দিন দিন হরিহর দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে টাকা যে কয়টি ছিল—ভিজিটে ও পথ্যে খরচ হইয়া গেল। ডাক্তার বলিল, অন্ততঃ এক সের করিয়া দুধ ও অন্যান্য ফল না

খাইতে দিলে রোগী দুর্বল হইয়া পড়িবে। সাড়ে তিন টাকা দামের একটা বিলাতী পথ্যের ব্যবস্থাও দিয়া গেল। বিদেশ, বিভুঁই জায়গা। একবার দেখিয়া সাহস দেয় এমন লোক নাই। সর্বজয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিল।

এই বিপদের মধ্যে সর্বজয়া আবার এক নূতন বিপদে পড়িল। উপরের ছাদে দাঁড়াইয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে রাঁধিবার ঘর দেখা যায়। ইতিপূর্বেও সে মাঝে মাঝে নন্দবাবুকে ছাদ হইতে তার রান্নাঘরের দিকে উঁকি ঝুঁকি মারিতে দেখিয়াছে, সম্প্রতি হরিহরের অসুখ হইবার পর হইতে নন্দবাবু বড় বাড়াইয়া তুলিল। নানা অছিলায় সে দিনে দশবার ঘরের মধ্যে আসে—আগে আগে অপুকে আড়াল করিয়া জিজ্ঞাসা করিত—আজকাল সরাসরিই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাবার্তা বলে। প্রথমটা সর্বজয়া কিছু মনে করে নাই—বরং বিপদের সময় এই অনাত্মীয় লোকটি যথেষ্ট সাহায্য ও দেখাশুনা করিতেছে ভাবিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞই ছিল, কিন্তু ক্রমেই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল, যে এই যে বাড়াবাড়ি—ইহা কোথায় যেন বেখাপ ঠেকিতেছে। নন্দবাবু নিজে পান কিনিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া বলে—চাকরদের হাতে পান সাজা—জীবনটা গেল বৌঠাকৃরুণ—সাজুন দিকি একবার—তাহাতেও সর্বজয়া দোষ ধরে নাই, বরং এই প্রবাসী আত্মীয়স্নেহবঞ্চিত লোকটির উপর মনে মনে একটু করুণাই হইত—কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ক্রমে শোভনতার সীমা ডিঙাইতে চলিল। আজকাল পান আনিয়া বলে—রাখো দিকি বৌঠাকৃরুণ। হাত হইতে সর্বজয়া লইবে—এইরূপই যেন চায়। অপু তো পাগল—অধিকাংশ সময়ই বাড়ীতে তাহাকে খুঁজিয়া মেলে না—ওঘরে হরিহর অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে—আর ঠিক সেই সময়টিতেই নন্দবাবু ঘরে আসিবে রোগী দেখিতে!···ছলছুতায় একথা-ওকথায় আধঘণ্টা না কাটাইয়া সে ঘর হইতে যায় না। বলে কোনো ভয় নেই বৌঠাকৃরুণ—আমি আছি ওপরে—অপূর্ব থাকে না থাকে—ওই সিঁড়িটার ওপর গিয়ে ডেকো না! বিপদের সময় অত বাছ্‌তে গেলে···একটু চুন দাও তো! বোঁটা নেই?—আহা আঙুলের মাথাতে ক'রেই একটু দাও না অমনি—

হরিহরের জ্ঞান হইলেই ছেলের জন্য অস্থির হইয়া উঠে। এদিক-ওদিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলে—খোকা কৈ! খোকা কৈ!—সর্বজয়া বলে—আসচে, তাই কি হতচ্ছাড়া ছেলে একটু কাছে বস্‌বে—বেরিয়েচে বুঝি সেই ঘাটে। ছেলে বাড়ী এলে বলে—বস্‌তে পারিস্‌নে একটু কাছে!—খোকা খোকা ক'রে পাগল—খোকার তো ভেবে ঘুম নেই—যা বস্‌গে যা, গায়ে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে নেই বুঝি? ছেলে হ'য়ে স্বগ্‌গে ঘণ্টা দেবেন কি না?

অপু অপ্রতিভ মুখে বাবার শিয়রের পাশে বসে। কিন্তু খানিকটা বসিয়াই

মনে ভাবে—ওঃ! কতক্ষণ ব'সে থাকবো—বেশ তো? আমার বুঝি একটু বেড়াতে কি খেলা করতে নেই। কন্‌কনে ঠাণ্ডায় পা অবশ হইয়া আসে। তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করে—একদৌড়ে একেবারে সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। জলের রানা, নির্মল মুক্ত হাওয়া, সুবেশ নরনারীর ভিড়। পণ্টু, সুধীর গুলু···পটল··· পণ্টুর দাদা। রামনগরের রাজার সেই ময়ূরপঙ্খীটার আজ আবার বাচ, বেলা চারটার সময়। উস্‌খুস্‌ করিতে করিতে চক্ষুলজ্জায় সন্ধ্যা করিয়া ফেলে, মায়ের ভয়ে যাইতে সাহস পায় না।

সকালে সর্বজয়া একদিন ছেলেকে বলিল—হ্যাঁরে ওই সাদা বাড়ীটার পাশে কোন্‌ ছত্তর জানিস্‌?

—উঁহু—

—তুই ছত্তরে খাস্‌নি একদিনও এখানে এসে? কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কিন্তু, জানিস্‌নে বুঝি! খেয়ে আসিস্‌ না আজ···দেখেই আসিস্‌ না?

—কাশীতে এলে ছত্তরে খেতে হয় কেন?

—খেলে পুণ্যি হয়—আজ দশাশ্বমেধ ঘাটে নেয়ে অম্‌নি ছত্তর থেকে খেয়ে আসিস্‌—বুঝ্‌লি।

বেলা বারোটায় সময় সত্র হইতে খাইয়া অপু বাড়ী ফিরিল। তাহার মা রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া বাটিতে কি লইয়া খাইতেছিল—তাহাকে দেখিয়া প্রথমটা লুকাইবার চেষ্টা করিল বটে কিন্তু অপু অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে —লুকাইতে গেলে সন্দেহ জাগানো হয় ভাবিয়া সহজ সুরে বলিবার চেষ্টা করিল —খেয়ে এলি? কেমন খাওয়ালে রে?

মা অড়হরের ডাল ভিজা খাইতেছে।

—ভালো নাঃ—কুমড়োর একটা ছাই ঘণ্ট—ব'সে ব'সে হয়রান—বড্ড ময়লা কাপড় পরা লোক সব খেতে যায়—আমি আর যাচ্ছি নে, পুণ্যিতে আমার দরকার নেই—ওকি খাচ্চ মা? তোমার বের্ত্তো নাকি? রান্না হয় নি?

—আজতো আমার কুলুইচণ্ডী! এই তুটো অড়হরের ডাল ভিজে—বেশ খেতে লাগে—আমি বড্ড ভালবাসি···খাবি তুটো ওবেলা?

রাত্রিতেও রান্না হইল না। তাহার মা বলিল—অড়হরের ডাল ভিজে খেয়ে ত্যাখ্‌ দিকি? বেশ লাগ্‌বে এখন—এবেলা রাঁধলাম না, ভারি তো খাস্‌, এত কটা ভাতে বসিস্‌ বই তো নয়—ওই খেয়ে কি আর খেতে পারবি?

পরদিন তুপুরে নন্দবাবু একতাড়া পান অপুর হাতে দিয়া বলিল—তোমার মার কাছ থেকে সেজে নিয়ে এসো তো? রোগীর ঘরের পাশের ঘরে সর্বজয়া বসিয়া পান সাজিতেছে; নন্দবাবু জুতার শব্দ করিতে করিতে উপর হইতে

নামিয়া রোগীর ঘরে ঢুকিল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই সেখান হইতে বাহির হইয়া সর্বজয়া যে-ঘরে পান সাজিতেছে সেখানে ঢুকিল। সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া সর্বজয়ার ঝিমুনি ধরিয়াছিল, জুতার শব্দে চমক ভাঙিল। একেবারে সম্মুখে নন্দবাবু, বলিল—পান সাজা হয়েচে বৌঠাকৃরুণ? সর্বজয়া নীরবে সাজা পানের খিলিগুলি রেকাবীতে করিয়া সামনের দিকে ঠেলিয়া দিতে নন্দবাবু এক খিলি তুলিয়া মুখের মধ্যে পুরিয়া বলিল—চুন বড্ড কম হয় বৌঠাকৃরুণ তোমার পানে, সরো দেখি আমি নিচ্চি—

সর্বজয়ার কোলের কাছে পানের বাটা। বাড়ীতে কেহ নাই, অপু কোথায় বাহির হইয়াছে। পাশের ঘরে হরিহর ঔষধের বশে ঘুমাইতেছে। নিস্তব্ধ দুপুর। হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল যেন নন্দবাবু চুন লইবার অছিলায় অনাবশ্যকরূপে—তাহার অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে চাহিতেছে—একটা অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া এক লহমার মধ্যে সে উঠিয়া গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইল। একটা বিদ্যুতের মত কিসের স্রোত তাহার পা হইতে মাথা পর্যন্ত খেলিয়া গেল। আঙুল দিয়া সিঁড়ি দেখাইয়া তীব্রস্বরে বলিল—চলে যান এখ্‌খুনি ওপরে—কখ্‌খনো আর নীচে আসবেন না—নীচে এলে আমি মাথা খুঁড়ে খুন হবো—কেন আপনি আসেন? খবরদার আর আসবেন না—

সর্বজয়া পড়িল মহা ফাঁপরে। বিদেশ জায়গা, এই রোগী ঘরে—নিঃসহায়, হাতে একটি পয়সা নাই, একটি পরিচিত লোক কোনো দিকে নাই, ছেলের বছর এগারো বয়স মোটে—তাও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, নিতান্ত নির্বোধ। এদিকে এই সব উৎপাত।

উপরের পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কালেভদ্রে নীচে নামে—এক আধবার সর্বজয়াকে উপরে তাহার ঘরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ ছয় মাস কাশীতে আসিয়াও সর্বজয়া না পারে হিন্দি বলিতে, না পারে ভাল বুঝিতে, কাজেই আলাপ মোটেই জমে নাই। অদ্য তাহার কাছে গিয়া নন্দবাবুর ঘটনা আনুপূর্বিক বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পাঞ্জাবী মেয়েটির নাম সুরযকুঁয়ারী, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পাঞ্জাবের রোয়ালসর জেলার অধিবাসী; স্বামীটি রেলে ওভারসিয়ারের কাজ করে। মেয়েটির বয়স খুব অল্প না হইলেও দেখিতে কমবয়সী, গৌরাঙ্গী, আয়তনয়না, আঁটসাঁট দীর্ঘগড়ন। সে সব শুনিয়া বলিল—কোনো ভয় নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন, আবার যদি কিছু বদমায়েসীর ভাব দেখেন আমায় বলিবেন, আমার স্বামীকে দিয়া উহার নাক কাটিয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাড়িব।

ঠিক দুপুর। কয় রাত্রি জাগিবার পর সর্বজয়া মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উত্তরের ঘরের জানালা দিয়া একফালি রৌদ্র

আসিয়া সরু উঠানটাতে বাঁকাভাবে পড়িয়াছে। অপু মাটির মাল্‌সাটে গাঁদা-ফুলের গাছ লাগাইয়াছিল, দু-তিনটা একপেটে গাঁদা নিতান্ত বিরক্তভাবে ফুটিয়া আছে,—তলায় একটা বিড়াল-ছানা বসিয়া। অপু বাবার বিছানার পাশেই বসিয়াছিল। তাহার বাবা আজ সকাল হইতে একটু ভাল আছে—ডাক্তার বলিয়াছে বোধহয় জীবনের আশা হইল। ভাল থাকিলেও রোগীর খুব চৈতন্য আছে বলিয়া মনে হয় না, বেহুঁস্ অবস্থা। তাহার বাবা হঠাৎ চোখ খুলিয়া তাহার দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া কি বলিল। অপুর মনে হইল বাবা তাহাকে আরও কাছে সরিয়া আসিতে বলিতেছে। অপু সরিয়া আসিতে হরিহর রোগশীর্ণ ক্ষীণ দুই হাতে ছেলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অপু একটু অবাক্ হইল, বাবার চোখের ওরকম দৃষ্টি কখনো সে দেখে নাই।

রাত্রি দশটার সময় নিদ্রিত অপুর কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছে—মা অঘোরে ঘুমাইতেছে, বাবার গলার মধ্যে নানাস্বরে যেন কি শব্দ হইতেছে। তাহার কেমন ভয় ভয় ঠেকিল। ঝুল-মাখানো কড়িকাঠ, স্যাঁতসেঁতে মেঝে, হাডভাঙা শীত, কাঠকয়লার আগুনের ধোঁয়া—সব মিলিয়া যেন একটা কঠিন দুঃস্বপ্ন। বাবার অসুখ সারিলে যেন বাঁচা যায়।

শেষ রাত্রে তাহার মায়ের ঠেলা পাইয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—অপু, ও অপু ওঠ, শীগগির গিয়ে ওপর থেকে হিন্দুস্থানী বৌকে ডেকে আন্‌তো—

অপু উঠিয়া শুনিল বাবার গলার সেই শব্দটা আরও বাড়িয়াছে। উপর হইতে স্বরযকুঁয়ারী আসিবার একটু পরেই রাত্রি চারটার সময় হরিহর মারা গেল।

মাঝ-বর্ষার ধারামুখর কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে মনে হয় যে পৃথিবীর রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলা স্বপ্ন না সত্য? এই মেঘ, এই দুর্দিন, অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এরাই রহিল চিরসাথী—দিগন্তের মায়া-লীলার মত চৈত্র বৈশাখের যে দিনগুলা অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহা ফিরিয়া আসে?

চারিধার হইতে সর্বজয়াকে কি এক কুয়াশায় ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মধ্য দিয়া না দেখা যায় পথ, না চেনা যায় সাথী, না জানা যায় কোথায় আছি। সন্দেহ হয় এ কুয়াশা বোধহয় বেলা হইলে, রৌদ্র উঠিলেও কাটিবে না, এর পিছনে আছে আকাশ-ছাওয়া ফিকে ধূসর রং-এর সারাদিনব্যাপী অকাল বাদলের মেঘ!

বিপদের দিনে পাঞ্জাবী ওভারসিয়ার জালিম সিং ও তাহার স্ত্রী যথেষ্ট উপকার করিল। জালিম সিং অফিস কামাই করিয়া সৎকারের লোকের জন্য

বাঙালীটোলায় ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সেবকও আসিয়া পৌছিল।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সৎকার-অন্তে সন্ধ্যাবেলা অপু স্নান করিয়া ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপর উঠিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু তাহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল। বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অন্তদিগন্তের ম্লান আলো পাথরের মন্দিরগুলার আগাটুকুতে মাত্র চিক্‌চিক্ করিতেছে। সারাদিনের ব্যাপারে দিশাহারা অপুর মনে হইল তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছেঃ

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী···

যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল,—রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্বচন গান করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী···
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ····· ············

কোনোরূপে মাসখানেক কাটিল। এই একমাসের মধ্যে সর্বজয়া নানা উপায় চিন্তা করিয়াছে কিন্তু কোনোটাই সমীচীন মনে হয় না। দু-একবার দেশে ফিরিবার কথাও যে তাহার না মনে হইয়াছে এমন নয়, কিন্তু যখন সে কথা মনে ওঠে, তখনই সে তাহা চাপিয়া যায়। প্রথমত তো দেশের এক ভিটাটুকু ছাড়া বাকী সব কতক দেনার দায়ে, কতক এমনি বেচিয়া কিনিয়া আসা হইয়াছে, জমিজমা কিছুই আর নাই; দ্বিতীয়ত সেখান হইতে বিদায় লইবার পূর্বে সে পথে, ঘাটে, বৌ-ঝিদের সম্মুখে নিজেদের ভবিষ্যতের সুখের ছবি কতভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছে। নিশ্চিন্দিপুরের মাটি ছাড়িয়া যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র, এ পোড়া মূর্খের দেশে তাহার স্বামীর কদর কেহ বুঝিল না,

কিন্তু যেখানে যাইতেছে সেখানে যে তাহাকে সকলে লুফিয়া লইবে, অবস্থা ফিরিতে যে এক বৎসরও দেরী হইবে না—এ কথা হাতমুখ নাড়িয়া সর্বজয়া কতভাবে তাহাদের বুঝাইয়াছে! এই তো চৈত্র মাস, এক বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই। ইহারই মধ্যে এরূপ নিঃসম্বল, দীন অবস্থায়, তাহার উপরে বিধবার বেশে সেখানে ফিরিয়া গিয়া সকলের সম্মুখে দাঁড়াইবার কথাটা ভাবিতেই সে লজ্জায় সঙ্কোচে মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। যাহা হইবার এখানেই হউক, ছেলের হাত ধরিয়া কাশীর পথে ভিক্ষা করিয়া সে ছেলেকে মানুষ করিবে, কে দেখিতে আসিবে এখানে?

মাসখানেক পরে একটা সুবিধা হইল। কেদার ঘাটের এক ভদ্রলোক মিশনের অফিসে জানাইলেন যে, তাঁহার পরিচিত এক ধনী পরিবারের জন্য একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে আবশ্যক, জাতের মেয়ে, ঘরে আসিবেন, কাজকর্মে সাহায্য করিবেন। মিশন এরূপ কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারেন কি না? শেষ পর্যন্ত মিশনের যোগাযোগে ভদ্রলোকটি অপুদের সেখানে পাঠাইতে রাজী হইলেন। সর্বজয়া অকূলসমুদ্রে কূল পাইয়া গেল। দিন-দুই পরে সেই ভদ্রলোকটি বলিয়া পাঠাইলেন যে, বাসা একেবারে উঠাইয়া যাইবার জন্য যেন ইহারা প্রস্তুত হয়, কারণ সেই ধনী গৃহস্থদের বাটি কাশীতে নয়, তাঁহাদের বাড়ীর কাহারা কাশীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন, ফিরিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন।

প্রকাণ্ড বড় হল্‌দে রঙের বাড়ীটা। কাশীতে যে রকম বড় বড় বাড়ী আছে, সেই ধরণের খুব বড় বাড়ী। সকলের পিছনে পিছনে সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া সঙ্কুচিতভাবে বাড়ির ভিতর ঢুকিল।

অন্তঃপুরে পা দিতেই অভ্যর্থনার একটা রোল উঠিল—তাহার জন্য নহে—যে দলটি এইমাত্র কাশী হইতে বেড়াইয়া ফিরিল, তাহাদের জন্য।

ভিড় ও গোলমাল একটু কমিলে বাড়ীর গিন্নী সর্বজয়ার সম্মুখে আসিলেন। খুব মোটাসোটা, এক সময়ে বেশ সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়, বয়স পঞ্চাশের উপর। গিন্নিকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন—থাক্, থাক্, এসো, এসো—আহা এই অল্প বয়সেই এই—এটি ছেলে বুঝি? খাসা ছেলে, কি নাম?

আর একজন কে বলিলেন—বাড়ী বুঝি কাশীতেই? না?—তবে বুঝি—

সকলের কৌতূহল-দৃষ্টির সম্মুখে সর্বজয়া বড় লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। গিন্নির হুকুমে যখন ঝি তাহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে তাহাকে লইয়া গেল, তখন সে হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

পরদিন হইতে সর্বজয়া চুক্তিমত রান্নার কাজে ভর্তি হইল। রাঁধুনী সে

একা নয়, চার পাঁচজন আছে। তিন চারটা রান্নাঘর। আঁশ, নিরামিষ, দুধের ঘর, রুটির ঘর, বাহিরের লোকদিগের রান্নার আলাদা ঘর। ঝি-চাকরের সংখ্যা নাই। রান্নাবাড়াটা অন্তঃপুরের মধ্যে হইলেও একটু পৃথক। সেদিকটা যেন ঝি-চাকর-বামুনের রাজত্ব। বাড়ীর মেয়েরা কাজ বলিয়া ও বুঝাইয়া দিয়া যান মাত্র, বিশেষ কারণ ঘটিলে রান্নাবাড়ীতে বড় একটা থাকেন না।

সর্বজয়া কি রাঁধিবে একথা লইয়া আলোচনা হয়। সর্বজয়ার বরাবরই বিশ্বাস সে খুব ভাল রাঁধিতে পারে। সে বলিল নিরামিষ তরকারী রান্নার ভার বরং তাহার উপর থাকুক। রাঁধুনী বামনী মোক্ষদা মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—বাবুদের রান্না তুমি কর্‌বে? তা হ'লেই তো চিত্তির? পরে পাঁচি-ঝিকে ডাক দিয়া কহিল, শুন্‌চিস্ ও পাঁচি, কাশীর ইনি বল্‌চেন নাকি বাবুদের তরকারী রাঁধবেন! কি নাম গা তোমার? ভুলে যাই—মোক্ষদার ওষ্ঠের কোণের ব্যঙ্গের হাসিতে সর্বজয়া সেদিন সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু দু'একদিনেই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পাড়াগাঁয়ের কোনো তরকারী রান্না সেখানে খাটিবে না। ঝোলে যে এত চিনি মিশাইতে হয় বা বাঁধাকপির ফ্রিটার্স বলিয়া একটা যে তরকারী আছে, একথা সে এই প্রথম শুনিল।

গৃহিণী সর্বজয়াকে মাস-দুই বেশ যত্ন করিয়াছিলেন। হাল্‌কা কাজ দেওয়া, খোঁজ খবর নেওয়া। ক্রমে ক্রমে অন্য পাঁচজনের সমান হইয়া দাঁড়াইতে হইল। বেলা দুটা পর্যন্ত কাজ করার পর প্রথম প্রথম সে বড় অবসন্ন হইয়া পড়িত। এভাবে অনবরত আগুনের তাতে থাকার অভ্যাস তাহার কোনো কালে নাই, অত বেলায় খাইবার প্রবৃত্তিও বড় একটা থাকে না। অন্য অন্য রাঁধুনীরা নিজেদের জন্য আলাদা করিয়া মাছ-তরকারী লুকাইয়া রাখে, কতক খায়, কতক বাহিরে কোথায় লইয়া যায়। সে পাতের কাছে একবার বসে মাত্র!

রান্নার বিরাট ব্যাপার দেখিয়া সর্বজয়া অবাক্ হইয়া যায়, এত বড় কাণ্ড কারখানার ধারণা কোনো দিন স্বপ্নেও তাহার ছিল না, বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবে,—দু'বেলায় তিন সের করে তেলের খরচ? রোজ একটা যজ্ঞির তেল-ঘি-এর খরচ!···পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছোট সংসারের অভিজ্ঞতা লইয়া সে এসব বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

একদিন সরু চালের ভাত রান্নার বড় ডেক্‌চিটা নামাইবার সময় মোক্ষদা বামনীকে ডাক দিয়া বলিল—ও মাসীমা, ডেক্‌চিটা একটুখানি ধর্‌বে?

মোক্ষদা শুনিয়াও শুনিল না।

এদিকে ভাত ধরিয়া যায় দেখিয়া নিজেই নামাইতে গিয়া ভারী ডেক্‌চিটা

কাত করিয়া ফেলিল, গরম ফেন পায়ের পাতায় পড়িয়া তখনি ফোস্কা পড়িয়া গেল। গৃহিণী সেই দিনই তাহাকে রুটীর ঘরে বদ্‌লি করিয়া বলিয়া দিলেন, পা না সারা পর্যন্ত তাহাকে কোনো কাজ করিতে হইবে না।

সর্বজয়া ছেলেকে লইয়া নীচের একটা ঘরে থাকে। ঘরটা পশ্চিমদিকের দালানের পাশেই। কিন্তু সেটা এত নীচু, আর মেঝে এত স্যাঁতসেঁতে এবং ঘরটাতে সব সময় এমন একটা গন্ধ বাহির হয় যে, কাশীর ঘরও এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। দেওয়ালের নীচের দিকটা নোনা-ধরা, রাঙা রাঙা বড় বড় ছোপ, প্রতিবার বাহির হইতে ঢুকিয়াই অপু বলে—উঃ, কিসের গন্ধ দেখচো মা, ঠিক যেন পুরোনো চা'লের কি কিসের গন্ধ বলো দিকি? নীচের এ ঘরগুলা কর্তৃপক্ষ মনুষ্যবাসের উপযুক্ত করিয়া তৈয়ারী করেন নাই, সেইজনাই এগুলিতে চাকর-বাকর রাঁধুনীরা থাকে।

উপরের দালানের সব ঘরগুলি অপু বাহির হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিয়াছে, বড় বড় জানালা দরজা। জানালায় সব কাচ বসানো। ঘরে ঘরে গদি-আঁটা বড় বড় চেয়ার, ঝক্‌ঝকে টেবিল, যেন মুখ দেখা যায়, এত ঝক্‌ঝক্ করে। অপুদের বাড়ীতে যেমন কার্পেটের পুরানো আসন ছিল, ঐ রকম কিন্তু ওর চেয়েও ঢের ভাল, পুরু ও প্রায় নতুন—কার্পেট মেঝেতে পাতা। দেওয়ালে আয়না টাঙানো, এত বড় বড় যে অপুর সমস্ত চেহারাখানা তাহাতে দেখা যায়, সে মনে মনে ভাবে—এত বড় বড় কাচ পায় কোথায়? জুড়ে জুড়ে করেচে বোধ হয়—

দোতলার বারান্দায় আর একটা বড় ঘর আছে—সেটা প্রায়ই বন্ধ থাকে, মাঝে মাঝে চাকরবাকরে আলো হাওয়া খাওয়াইবার জন্য খোলে। সেটার মধ্যে কি আছে জানিবার জন্য অপুর অদম্য কৌতূহল হয়। একদিন ঘরের দরজা খোলা দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াছিল। কি বড় বড় ছবি! পাথরের পুতুল। গদী আঁটা চেয়ার, আয়না,—সে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সব দেখিতেছে এমন সময় ছটু খানসামা তাহাকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া রুখিয়া আসিয়া বলিল—কোন্ বা···কাহে ইস্‌মে ঘুসা?

হয়তো সেদিন সে মারই খাইত, কিন্তু বাড়ীর একজন ঝি দালান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিয়া বলিল—এই ছটু, ছেড়ে দাও কিছু বলো না—ওর মা এখানে থাকে—দেখচে দেখুক না—

সকালে খাওয়া-দাওয়া সারা হইলে সর্বজয়া বেলা আড়াইটার সময় নিজের ঘরটিতে আসিয়া খানিকটা শোয়। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টা কেবল মায়ের সঙ্গে মন খুলিয়া কথা হয় বলিয়া মাঝে মাঝে অপু এসময় ঘরে আসে।

তাহার মা তাহাকে একবার করিয়া দিনের মধ্যে চায়। এ বাড়ীতে আসা পর্যন্ত অপু যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে। সারাদিন খাটুনি আর খাটুনি—ছেলের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে হয়। বহুরাত্রে কাজ সারিয়া আসিতে অপু ঘুমাইয়া পড়ে, কথা হয় না। এই দুপুরটার জন্য তাহার মন তৃষিত হইয়া থাকে।

দোরে পায়ের শব্দ হইল। সর্বজয়া বলিল—কে অপু! আয়—দোর ঠেলিয়া বামনী মাসী ঘরে ঢুকিল। সর্বজয়া বলিল—আসুন মাসীমা, বসুন। সঙ্গে সঙ্গে অপুও আসিল। বামুনী মাসী বাবুদের সম্পর্কে আত্মীয়া। কাজেই তাহাকে খাতির করিয়া বসাইল। বামুনী মাসীর মুখ ভারী ভারী। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—দেখলে তো আজ কাণ্ডখানা বড়-বৌমার? বলি কি দোষটা—তুমি তো বরাবরই রুটীর ঘরে ছিলে! মাছ, ঝি এসে চুপড়ীতে ক'রে রেখে গেল, আমি ভাবলাম বাঁধাকপিতে বুঝি—কি রকম অপমানটা দেখলে ত একবার? পোলোয়ার মাছ ত সে কথা ঝিকে দিয়ে ব'লে পাঠালে তো হতো? সদু ঝিও কি কম বদমায়েসের ধাড়ী নাকি? গিন্নিমার পেয়ারের ঝি কিনা? মাটি মাড়িয়ে চলে না, ওপরে গিয়ে সাতখানা ক'রে লাগায়—ওই তো ছিরিকণ্ঠ ঠাকুরও ছিল—বলুক দিকি?

গল্প করিতে করিতে বেলা যায়। মাসী বলে, যাই, জলখাবারের ময়দা মাখিগে—চারটে বাজলো—

মাসী চলিয়া গেল অপু মায়ের কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। তাহার মা আদর করিয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিল—কোথায় থাকিস্ দুপুরে বল্‌তো?

অপু হাসিয়া বলিল—ওপরের বৈঠকখানা ঘরে কলের গান বাজচে মা—শুন্‌ছিলাম—ঐ বারান্দাটা থেকে—

সর্বজয়া খুশি হইল।

—হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে বাবুদের ছেলেদের ভাব-সাব হয় নি?—তোকে ডেকে বসায়?—

—খু-উ-উব!

অপু এটা মিথ্যা বলিল। তাহাকে ডাকিয়া কেহ বসায় না। ওপরের বৈঠকখানাতে গ্রামোফোন বাজানোর শব্দ পাইলেই খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া পরে ভয়ে ভয়ে উপরে উঠিয়া যায় ও বৈঠকখানার দোরের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গান শোনে। প্রতি মুহূর্তেই তাহার ভয় হয় এইবার হয়তো উহারা তাহাকে বলিবে নীচে চলিয়া যাইতে। গান শেষ হইলে নীচে নামিবার সময় ভাবে—কেউ তো কিছু বকলে না? কেন বক্‌বে? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গান শুনি বাইরে, আমি তো বাবুদের ঘরের মধ্যে যাচ্ছি নে? এরা ভাল লোক খুব—

এ বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গেও তার মেলামেশা হইল না। তাহারা উহাকে আমলই দেয় নাই। সেদিন রমেন, টেবু, সমীর, সন্তু—ইহারা একটা চৌকি-পিঁড়ির মত তক্তা সামনে পাতিয়া কাঠের কালো কালো গুটি চালাইয়া এক রকম খেলা খেলিতেছিল, নাম নাকি ক্যারোম খেলা—সে খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলাটি দেখিতেছিল—তার চেয়ে বেগুনবিচি খেলা ঢের ভালো।

বৈশাখের প্রথমে বড়বাবুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। গয়া, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী নানাস্থান হইতে কুটুম্ব কুটুম্বিনীদের আগমন সুরু হইল। সকলেই বড়লোকের ঘরের মেয়ে ও বড়ঘরের বধূ, প্রত্যেকের সঙ্গে নিজেদের ঝি-চাকর আসিয়াছে। নীচের তলায় দালান-বারান্দা রাত্রে তাহারাই দখল করে। সারা রাত্রি হৈ চৈ।

সকালে সর্বজয়াকে ডাকিয়া গিন্নি বলিলেন—ও অপুর মা, তুমি এক কাজ করো, এখন দিন-দুই রান্নাঘরের কাজ তোমার থাকুক, নানান্ জায়গা থেকে তত্ত্ব আসচে, তুমি আর ছোট মোক্ষদা সে সবগুলো গুছিয়ে তোমাদের রুটির ঘরের ভাঁড়ারে তোলাপাড়া করো—মিষ্টি খাবার ওখানেই রেখো, ফলফুলুরী যা দেখ্‌বে পচ্‌বার মত, সদু ঝির হাতে পাঠিয়ে দেবে, নয়ত রেখে দিও, জলখাবারের সময় নিয়ে আস্‌বে বামনী মাসী—

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝি বেহারাদের মাথায় কত জায়গা হইতে যে কত তত্ত্ব আসিতে লাগিল সর্বজয়া গুণিয়া সংখ্যা করিতে পারে না। মিষ্টান্নের জায়গা দিতে পারা যায় না, ছোট ছোট রূপার চন্দনের বাটি জমিয়া গেল পনেরো যোলটা। আম এখনও উঠে নাই, তবুও একটা বড় ধামা আমে বোঝাই হইয়া গেল।

সর্বজয়া বাম্‌নী মাসীর হাতে খাবার তুলিয়া দিতে দিতে ভাবে—এই এত ভালমন্দ, এত কাণ্ড, তাই কি ছেলেটার জন্যে কিছু—আহা বাছা আমার সরকারদের খাবার ঘরের কোন্‌টায় কাঁচুমাচু হ'য়ে ব'সে দুটো ভাত খায়, না দিতে পারি পাতে দু'খানা ভালো দেখে মাছ, না একটু ভালো তরকারী, না এক হাতা দুধ—তখ্‌খুনি ঐ সদু হারামজাদী লাগাবে নিজের ছেলের পাতে বাবুদের হেঁসেল থেকে সব—

বিবাহের দিন খুব ভিড়। বরপক্ষ সকালের গাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়া শহরের অন্য এক বাড়ীতে ছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করিয়া বর আসিল।

বাহিরের উঠান নিমন্ত্রিতদের দলে ভরিয়া গিয়াছে, সারা উঠানটাতে সতরঞ্চি-

পাতা, এক কোণে চওড়া জরিপাড় লাল মখমলে মোড়া উঁচু বরাসন, জরির ঝালর-দোলানো নীল সাটিনের চাঁদোয়া, দুপাশে কিংখাপের তাকিয়া, বড় বড় বেলফুলের মালা তিনগাছা করিয়া চাঁদোয়ার খিলানে খিলানে টাঙানো! চারি পাশে বরযাত্রীগণের চেয়ার ও কৌচ। বিলাতী সেণ্ট ও গোলাপ জলের পিচকারী ঘন ঘন ছুটিতেছে।

অপু এ সমস্ত বিষয় কিছু দেখে নাই, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একবার মাত্র সে বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল, তখন স্ত্রী-আচার হইতেছে, রাত্রি অনেক। মাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না, উৎসবের ভিড়ে কে জানে কোথায় কি কাজে ব্যস্ত আছে। দামী বেনারসী শাড়ী-পরা মেয়েদের ভিড়ে উঠানের কোথাও এতটুকু স্থান ফাঁকা নাই। ছোটবাবুর মেয়ে অরুণা কাহাকে ডাকিয়া বাহিরের বৈঠকখানা হইতে বড় অর্গ্যানটা বাড়ীর ভিতরে আনিতে বলিতেছেন।

বিবাহের দিন-দুই পরে সখের থিয়েটার উপলক্ষ্যে আবার খুব হৈ চৈ। উঠানের এক কোণে স্টেজ বাঁধা হইয়াছে। গোলাপফুল ও অর্কিডে স্টেজটা খুব চমৎকার সাজানো। পাঁচশত ডালের প্রকাণ্ড ঝাড়টা স্টেজের মধ্যে খাটানো হইল। এ কয়দিনের ব্যাপারে তো একেই অপুর তাক্ লাগিয়াছে, আজকার থিয়েটার জিনিসটি কি সে আদৌ জানে না, আগ্রহ ও কৌতূহলের সহিত পূর্ব হইতেই ভাল জায়গাটি দখল করিয়া রাখিবার জন্য সে আসরের সামনের দিকে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া রহিল।

ক্রমে ক্রমে একে একে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসিতে লাগিলেন, চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বাড়ির দারোয়ানেরা জরির উর্দী পরিয়া আসরের বাহিরে ও দরজার কাছে দাঁড়াইল। সরকার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া কাজ দেখাইতে লাগিল। কনসার্ট আরম্ভ হইল। যখন ড্রপসিন উঠিবার আর বেশী দেরী নাই, বাড়ীর গোমস্তা গিরিশ সরকার তাহার কাছে আসিয়া নীচু হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল—কে? অপু মুখ উঁচু করিয়া চাহিয়া দেখিল কিন্তু মুখচোরা বলিয়া খানিকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। তাহাকে জবাব দিবার অবকাশ না দিয়াই গিরিশ সরকার বলিল—ওঠো, ওঠো এখানে বাবুরা বসবেন —ওঠো—গিরিশ সরকার আন্দাজে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল।

অপু পিছনে চাহিয়া বিপন্নমুখে নামতা পড়ার সুরে বলিল—আমি সন্দে থেকে এইখানটায় ব'সে আছি, পেছনে যে সব ভর্তি, কোথায় যাবো? তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে গিরিশ সরকার তাহার হাতের নড়া ধরিয়া জোরে ঝাঁকুনি দিয়া উঠাইয়া দিয়া বলিল—তোর না কিছু করেছে, জ্যাঠা ছোকরা কোথাকার, জ্ঞান নেই, একেবারে সামনে—বাবুরা বসবেন, উনি রাঁধুনীর ব্যাটা

এসেছেন মুখের কাছে বস্‌তে! কোথায় যাব ওঁকে ব'লে দাও—ফাজিল জ্যাঠা কোথাকার—যা এখান থেকে যা, ঐ থাম-টামের কাছে বসগে যা কোথাও—

পিছন হইতে দু'একজন কর্মকর্তা বলিলেন—কি হয়েচে, কি হয়েচে গিরিশ—কিসের গোল? কে ও?

—এই দেখুন না ম্যানেজারবাবু, এই জ্যাঠা ছোকরা বাবুদের এখানে এসে বসে আছে, একেবারে সামনে—চন্দননগরের ওঁরা এসেচেন, বসবার জায়গা নেই—উঠতে বল্‌চি, আবার মুখোমুখি তর্ক?

ম্যানেজারবাবু বলিলেন—দ্যাও না তুই থাপ্পড় বসিয়ে—

অপু জড়সড় হইয়া কোনো দিকে না চাহিয়া অভিভূতের মত আসরের বাহির হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল আসরের সকলের চোখ তাহার দিকে, সকলেই কৌতুহলের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রথমটা ভাবিল হঠাৎ এক দৌড় দিয়া সে এখনি এক আসর লোকের চোখের আড়ালে যে কোনো জায়গায় ছুটিয়া পালায়। তাহার পর সে গিয়া এক থামের আড়ালে দাড়াইল। তাহার গা ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল, ভয়ে অপমানে, লজ্জায়, তার সূক্ষ্ম অনুভূতির পর্দাগুলিতে হঠাৎ বেখাপ্পা গোছের কাঁপুনি লাগিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া থামের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল—কিন্তু চারিধারে চাকর বাকর, এপারের বারান্দায় টিনের আড়ালে মেয়েরা, ঝি-রাঁধুনিরাও নীচের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা তো সকলেই ব্যাপারটা দেখিয়াছে, কি মনে করিতেছে উহারা! না জানিয়া কি কাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে সে! সে তো জানে না ওটা বাবুদের জায়গা? সে বারবার মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল তাহাকে সম্ভবতঃ কেহ চিনিতে পারে নাই। কে না কে, কত তো বাইরের লোক আসিয়াছে—কে তাহাকে চিনিয়াছে!

তাহার পর থিয়েটার আরম্ভ হইয়া গেল। সেদিকে তাহার লক্ষ্যই রহিল না। সম্মুখের এই লোকের ভিড়, বদ্ধ বায়ু, আলোর মেলা, দারোয়ান চাকরের হৈ চৈ—কোনদিকে তাহার খেয়াল রহিল না। ছটু খানসামা একটা রূপার হাঁসের পানদান লইয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সারিতে পান বিলি করিতেছিল—সেইটার দিকে চাহিয়া অপুর গা যেন কেমন করিয়া উঠিল। উপরের বারান্দার দিকে চাহিয়া ভাবিল, ওদিকে মা নাই তো? যদি মা একথা জানিতে পারে! কিন্তু অপুর ভয় সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার মা তখন সে অঞ্চলেও ছিল না, এসব কথা তাহার কানেও যায় নাই।

পরের বাড়ী নিতান্ত পরাধীন অবস্থায় চোরের মত থাকা সর্বজয়ার জীবনে এই প্রথম। সুখে হৌক, দুঃখে হৌক, সে এতদিন একা ঘরের একটা গৃহিণী ছিল। দরিদ্র সংসারের রাজরাণী—সেখানে তাহার হুকুম এই এত বড় বাড়ীর গৃহিণী, বৌ-রাণীদের চেয়ে কম কার্যকরী ছিল না। এ যেন সর্বদা জুজু হইয়া থাকা, সর্বদা মন যোগাইয়া চলা আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়া পথ হাঁটা, পান থেকে চুন না খসে! ছোটর ছোট তস্য ছোট!—এ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। খাটিতে খাটিতে মুখে রক্ত ওঠে—কিন্তু এখানে খাটার মূল্য নাই। প্রাণপণে খাটো—কেহ নাম করিবার নাই। উহারা যখন দিবে তখন গর্বের সঙ্গে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে—তোমার খাটার মূল্য দিতেছে বলিয়া সামনে সামনে দিবে না। তোমাকে হাঁটু গাড়িয়াই লইতে হইবে।

এ ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু উপায় কি?—বাহিরে যাইবার সুবিধা কই? আশ্রয় কে দিবে? কোথায় দাঁড়াইবে?

চিরকাল এইরকম কাটিবে? যতদিন বাঁচিবে ততদিন? ঐ বামুনি মাসীর মত?—

বিবাহের উৎসবের জের এখনও মেটে নাই, আজ মেয়েদের প্রীতিভোজ। সন্ধ্যার পর হইতেই নিমন্ত্রিত মহিলাদের গাড়ী পেছনের গেটে আসিতে সুরু করিল। ভিতরের বড় দরজা পার হইয়া সম্মুখেই মেয়ে-মহলের দোতলার বারান্দায় উঠিবার চওড়া মার্বেলের সিঁড়িটা নীলফুলের কাজ-করা কার্পেট দিয়া মোড়া। সারা বারান্দাতে ও সিঁড়িতে গ্যাসের আলো, দোতলার বারান্দায় উঠিবার মুখে বড় গ্যাসের ঝাড় জ্বলিতেছে। দুই বৌ-রাণী ও বাড়ীর মেয়েরা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে উপরে পাঠাইয়া দিতেছিলেন। নিমন্ত্রিতা মেয়েরা কেহ মুচকি হাসিয়া, কেহ হাসির লহর তুলিয়া, কেহ ধীর, কেহ ক্ষিপ্র, কেহ সুন্দর, অপূর্ব গতি-ভঙ্গিতে, সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন।

অপু অনেকক্ষণ হইতে নীচের বারান্দায় একটা থামের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। এ ধরণের দৃশ্য জীবনে সে এই প্রথম দেখিল, সেদিন বিবাহের রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িবার দরুণ সে বিশেষ কিছু দেখে নাই। সকলের চেয়ে তাহার ভাল লাগিতেছিল এ বাড়ীর মেয়ে সুজাতাকে। সে কার্পেট-মোড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া এক একবার নামিয়া আসিতেছে,

নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে কাহারও দিকে হাসিমুখে বলিতেছে—বা বেশ তো মণি-দি ? একেবারে রাত আটটা কোরে ? বকুলবাগানের বৌদি এলেন না ? অভ্যর্থিতা সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—গাড়ী সাজিয়ে ব'সে আছি বেলা ছটা থেকে···বেরুনো তো সোজা নয় ভাই, সব তৈরী না হোলে তো···জানোই তো সব—

সুজাতা কাঞ্চনফুল রংএর দামী চায়না ক্রেপের হাতকাটা জামার ফাঁক দিয়া বাহির হওয়া শুভ্র, সুগোল, নিটোল বাহু দিয়া পিছন হইতে নিমন্ত্রিতাকে বেষ্টন করিয়া আদরের ধরণে তাঁহার ডান কাঁধে মুখ রাখিয়া একসঙ্গে উপরে উঠিতে লাগিল। বলিতে বলিতে চলিল—মা বল্‌ছিলেন বকুলবাগানের বৌদি নাকি সাম্‌নের মাসে যাবেন কলকাতা—বুধবারে মা গেছলেন যে—ঠিক কিছু হোল ?

সিঁড়ির উপরের ধাপে মেজ বৌ-রাণী দেখা দিলেন। বয়স একটু বেশী, বোধ হয় ত্রিশের উপর, অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর বেশের কোন বাহুল্য নাই, ফিকে চাঁপারঙের চাওড়া লালপাড় রেশমী শাড়ীর প্রান্ত মাথার চুলে হীরার ক্লিপ দিয়া আঁটা, সিঁড়ির বড় ঝাড়ের আলোয় গলার সরু সোনার চেন চিক্ চিক্ করিতেছে, সুন্দর গড়ন, একটু ধীর, গম্ভীর—এই বয়সেও দুধে-আলতা রংএর আভা অপূর্ব। মাস খানেক হইল উপযুক্ত ভাই মারা যাওয়াতে একটুখানি বিষাদের ছায়া পরিণত মুখের সৌন্দর্যকে একটি সংযত শ্রী দান করিয়াছে।

মণি-দি উঠিতে উঠিতে মেজ বৌ-রাণীকে সম্মুখে দেখিয়া সিঁড়ির উপরেই দাঁড়াইয়া গেলেন—মেজ বৌদির শরীর আজকাল কেমন আছে ? এই দেখুন না, একবার আস্‌বো আস্‌বো ক'রে—কাল ওঁরা এটোয়া থেকে সব এলেন, তাই নিয়ে অনেক রাত অবধি—

এত সুন্দর দেখিতে মানুষ হয়, অপুর এ ধারণা ছিল না। অপু ইঁহাকে এই প্রথম দেখিল কারণ ইনি এতদিন এখানে ছিলেন না, ভাইয়ের মৃত্যুর পর সবে দিনকয়েক হইল বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছেন—সে মুগ্ধ চোখে অপলক বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই আলো, চারিধারে সুন্দরীর মেলা, দামী পুষ্পসারের মৃদু মনমাতানো সৌরভ, বীণার ঝঙ্কারের মত সুর ও হাসির লহরীতে তাহার কেমন এক নেশা জমিয়া গেল। এই যদি সারাদিন চলে ?

মেজ বৌ-রাণী অনেকক্ষণ হইতেই দেখিতেছিলেন সিঁড়ির কোণে কে একজন অপরিচিত ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। সকলকে তিনি জানেন না—তাঁহার বাপও খুব বড় লোক, প্রায়ই বাপের বাড়ী থাকেন। দু-ধাপ নামিয়া আসিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—খোকা উঠে এস। দাঁড়িয়ে কেন ? তুমি কোত্থেকে আসছ ?

অপু অন্যদিকে চাহিয়া অন্য একদল আগন্তুকদের লক্ষ্য করিতেছিল—হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া তাহাকেই মেজ বৌ-রাণী ডাকিতেছেন দেখিয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল—যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। পরেই রাজ্যের লজ্জা আসিয়া জুটিতেই সে উপরে উঠিয়া যাইবে কি ছুটিয়া পলাইবে ভাবিতেছে—এমন সময় মেজ বৌ-রাণী নিজেই নামিয়া আসিলেন—কাছে আসিয়া বলিলেন—কোত্থেকে আস্‌চ খোকা!···

অতি কষ্টে অনেক চেষ্টায় অপুর মুখ দিয়া বাহির হইল—আমি—আমি—ঐ—আমার মা—এই বাড়ী থাকেন—সঙ্গে সঙ্গে তাহার অত্যন্ত ভয় হইল যে, এখানে সে দাঁড়াইয়া আছে—কোথাকার রাঁধুনীর ছেলে—একথা শুনিয়া এখনি হয়তো ইনি কাহাকেও ডাকিয়া বলিবেন—ইহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দাও এখান থেকে।···

মেজ বৌ-রাণী কিন্তু সে সব কিছুই কবিলেন না—তিনি বিস্মিত মুখে বলিলেন—এ বাড়ী থাকেন তোমার মা?···কে বল তো···কি করেন···কতদিন তোমরা এসেচ?—

অপু ভাঙা ভাঙা কথায় আবোলতাবোল ভাবে পরিচয় দিল। মেজ বৌ-রাণী বোধ হয় ইহাদেব কথা এবাব আসিয়া শুনিয়াছেন। বলিলেন—ও তোমরা কাশী থেকে এসেছ বুঝি?—কি নাম তোমার? তাহার সুন্দর, সরল চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বোধ হয় কেমন করুণা হইল। বলিলেন—এস না ওপরে দাঁড়াবে—এখানে কেন?—ওপরে এস—

অপু চোরের মত বৌ-রাণীর পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া কোণ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপরে মেয়েদের বড় মজলিস—সারা বারান্দাটা কার্পেট মোড়া। ধারে ধারে বড় বড় কাঁচকড়ার টবে গোলাপ গাছ, এরিকা পাম। কোণে বড় বৈঠকখানার অর্গ্যানটা। একটি মেয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধির পরে অর্গ্যানের ধারে ছোট গদি-আঁটা টুলে গিয়া বসিলেন ও দু-একবার হালকা হাতে চাবি টিপিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া হাসিমুখে গান ধরিলেন। মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী নয়, রংটা মাঝামাঝি, কিন্তু গানের গলা ভারি সুন্দর। তাহার পর আর একটি মেয়ে গান গাহিলেন, এ মেয়েটি দেখিতে তত ভাল নয়। মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা একটি হাসির কবিতা ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে আবৃত্তি করিয়া সকলকে খুব হাসাইল। ভারি সুন্দর মেয়ে, মায়ের মত সুশ্রী। আর কি মিষ্টি হাসি!

অপু ভাবিতেছিল এই সময় তাহার মা একবার উপরে আসিয়া দেখিল না

কেন? কোথায় রহিল মা কোন্ রান্নাঘরে পড়িয়া, হয়তো কাজ করিতেছে, এ সব মা আর কোথায় দেখিতে পাইবে?

মেয়েদের মজ্‌লিস্‌ চলিতেছে, এমন সময় নীচে এক হৈ-চৈ উঠিল। গিরিশ সরকারের গলাটা খুব শোনা যাইতেছিল।

মধু ঝি হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া বলিল—পোড়ানি!—কাণ্ড দ্যাখো—হি হি——বলে কিনা হুঁকোর মধ্যে হি হি—। দুইজন নিমন্ত্রিতা মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হয়েচে রে? কি?

—ঐ ঠিকে ঠাকুর একটা এসেছিল কোত্থেকে—লুচি ভাজতে গিয়েচে। সরকারদের খাবার ঘরের উঠোনে ব'সে লুচি ভাজচে, বলে আসি বাইরে থেকে, একবার হুঁকোর মধ্যে ঘি পুরে নিয়ে যাচ্ছে চুরি করে—আধসেরের ওপর—গোমস্তা মশায় ধরেচে—রামনিহোর সিং মার যা দিচ্চে—চুলের ঝুঁটি না ধরে—

সর্বজয়ার আজ সকাল হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। প্রায় দুই মণ মাছ ভাজার ভার তার একার উপর—সকাল আটটা হইতে সে মাছের ঘরে এই কাজেই লাগিয়া আছে। চেঁচামেচি শুনিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল এক উঠান লোকের মধ্যে একজন পঁচিশ ত্রিশ বছরের পাতলা, ময়লা রং-এর, ময়লা কাপড়-পরা বামুনের ছেলেকে দু'তিনজনে মিলিয়া কেহ কিল, কেহ চড় বর্ষণ করিতেছে—লোকটা ঠিকে রাঁধুনী, অদ্যকার কার্যের জন্যই বাহির হইতে আসিয়াছিল—সে নাকি হুঁকার ভিতর করিয়া ঘি চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার সে হুঁকাটি একদিকে ছিট্‌কাইয়া ঘিটুকু উঠানের একদিকে পড়িয়া গিয়াছে—মারের চোটে কাছা খুলিয়া গিয়াছে—লোকটা বিপন্নভাবে সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিতেছে এবং হুঁকার ভিতরে ঘৃত পাওয়া একটা যে খুব স্বাভাবিক এবং নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বা ইহার মধ্যে সন্দেহের বা আশ্চর্য হইবার কথা কিছুই নাই—এই কথা উন্মত্ত জনসঙ্ঘকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে। কথা শেষ না করিতে দিয়াই শম্ভুনাথ সিং দারোয়ান তাহাকে এমন এক ঠেলা মারিল যে, অস্ফুটস্বরে 'বাবা রে' বলিয়া দালানের কোণের দিকে ঘুরিয়া পড়িয়া গেল এবং থামের কোণে মাথাটা ঠক্ করিয়া জোরে লাগিয়া বোধহয় রক্তও বাহির হইল।

সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে ক্ষেমিমাসি। আহা ওরকম ক'রে মারে? বামুনের ছেলে—

ক্ষেমি বলিল—মারবে না? হাড় গুঁড়ো করে ছাড়বে, মারা'র হয়েছে কি এখনো, পুলিশে দেবে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—

ক্ষেমি ঝির মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

সে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই তটস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। সর্বজয়া চাহিয়া দেখিল একজন পঁয়ষট্টি-সত্তর বছরের বৃদ্ধা সিঁড়ি বাহিয়া নামিতেছেন, পাশাপাশি গৃহিণী, পিছনে দুই বৌ-রাণী ও এবাড়ীর মেয়ে অরুণা ও সুজাতা। সকল ঝি-চাকরের দল তটস্থ অবস্থায় সিঁড়ির নীচের বারান্দায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া—এ উহার পিঠে উঁকি মরিয়া দেখিতে লাগিল। সর্বজয়া ক্ষেমি ঝিকে চুপি চুপি বলিল, কে ক্ষেমিমাসি? ক্ষেমি ঝি ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল—কোথাকার রাণীমা—সর্বজয়া ভাল শুনিতে পাইল না। কিন্তু তাহার মনে হইল ঠিক এইরকম চেহারার মানুষ সে যেন কোথায় আগে দেখিয়াছে। গিন্নী কাহাকে বলিলেন—খিড়কীর ফটকে ইঁহার পাল্কী আসিয়াছে কিনা দেখিয়া আসিতে। বৃদ্ধার নিজের সঙ্গেও দুই তিনটি ঝি আসিয়াছে, তাহারা পিছনে পিছনে আছে। নানা বিদায়-আপ্যায়নের বিনিময় হইল, বহু বিনীত হাস্য বিস্তার লাভ করিল, হঠাৎ এবাড়ীর ঝি-চাকরের দল মাটিতে গড হইয়া প্রণাম করিয়া খানিকক্ষণ যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিল। সর্বজয়া মনে মনে ভাবিল—এরা এত বড় লোক, এরা যখন এত খাতির করচে, তখন তো যে সে নয়—! বৃদ্ধার যোল বেহারার প্রকাণ্ড পাল্কীটা খিড়কীর ফটকেই এতক্ষণ ছিল, বৃদ্ধাও পাল্কীতে উঠিলেন। তাঁহার দারোয়ানেরা পাল্কীর সামনে পিছনে দাঁড়াইল। তাঁহাকে বিদায় দিয়া গৃহিণী, অন্যান্য মেয়েরা উপরে উঠিয়া গেলেন।

মাসিমা রুটির ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—পয়সা রে বাপু, দেখলে তো পয়সার আদরটা? নিজেরই মস্ত জমিদারী, দুলাখ টাকা দান করেছেন বাঙলা দেশের কোথাকার কলেজের জন্যে,—পয়সারই আদর—আর এই তো আমিও আছি—ওদের তো আপনার লোক—গেরাজ্জি করে কেউ!

সর্বজয়ার কিন্তু সেদিকে মন ছিল না। এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এইরকম চেহারার ও এই রকম বয়সের—সেই তাহার বুড়ী ঠাকুরঝি ইন্দিরা ঠাকুরুণ, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা, ভাঙা পাথরে আমড়াভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাফলের জন্য কত অপমান, কেউ পোঁছে না, কেউ মানে না, দুপুর বেলায় সেই বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু—

সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।

মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বারবার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।

কয়েকদিন পরে অপু দালান দিয়া যাইতেছে, উপরের সিঁড়ি বাহিয়া মেজ বৌ-রাণীর মেয়ে লীলা নামিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—দাঁড়াও না? তোমার নামকি,—অপু নাকি?

অপু বলিল—অপু ব'লে মা ডাকে—ভাল নাম শ্রীঅপূর্বকুমার রায়···

সে একটু অবাক হইল। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কখনও ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই। লীলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কি সুন্দর মুখ! রাণুদি, অতসী-দি, অমলা-দি, সকলেই দেখিতে ভাল বটে কিন্তু তখন সে তাহাদের চেয়ে ভাল কাহাকেও দেখে নাই। এ বাড়ী আসিয়া পর্যন্ত তাহার পূর্বেকার ধারণা একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বিশেষ মেজবৌ-রাণীর মত সুন্দরী—সেদিন যখন লীলা মেয়েদের মজলিসে হাসির কবিতা বলিতেছিল, তখন অপু একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কবিতা সে ভাল শোনে নাই।

লীলা বলিল—তোমরা কতদিন এসেচ আমাদের বাড়ী? সে-বার এসে তো দেখিনি?

—আমরা ফাল্গুন মাসে এইচি, এই ফাল্গুনমাসে—

—কোত্থেকে এসেচ তোমরা?

—কাশী থেকে। আমার বাবা সেইখানে মারা গেলেন কিনা—তাই—

অপুব যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। সারা ঘটনাটা এখনও যেন অবাস্তব, অসম্ভব ঠেকিতেছিল। লালা, মেজবৌ-রাণীর মেয়ে লীলা তাহাকে ডাকিয়া যাচিয়া তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। খুশিতে তাহার সারা গা কেমন করিতে লাগিল!

লীলা বলিল—চল, আমার পড়ার ঘরে গিয়ে বসি, মাষ্টার মশায়ের আসবার সময় হয়েচে—এস—

অপু জিজ্ঞাসা করিল—আমি যাবো?

লীলা হাসিয়া বলিল—বা-রে বল্‌চি তো চল, তুমি তো ভারি লাজুক? এস—তুমি দেখোনি আমার পড়ার ঘর? ওই পশ্চিমের দালানের কোণে?···

ঘর বেশী বড় নয়, কিন্তু বেশ সাজানো। একটি ছোট পাথরের টেবিলের দু'পাশে দু'খানা চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার পাতা। একখানা বড় ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার। সবুজ কাঁচকড়ার খোলে একটা ছোট টাইমপিস্ ঘড়ি। একটা

বই রাখিবার ছোট দেরাজ। চারপাঁচখানা বাঁধানো ফটোগ্রাফ এ দেওয়ালে, ও দেওয়ালে। লীলা একটা চামড়ার এ্যাটাসি কেস্ খুলিয়া বলিল—এই ছাখো আমার জলছবি, মাষ্টার মশায় কিনে দিয়েচেন, ভাগ শিখ্‌লে আরও দেবেন, জলছবি ওঠাতে জানো ?

অপু বলিল—তুমি ভাগ জানো না ?

—তুমি জানো ? ভাগ করেছ ?

অপু তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—কবে !—

এই ভঙ্গীতে অপুর সুন্দর মুখ আরো সুন্দর দেখাইল।

লীলা হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুমি বেশ মজার কথা বলতে পারো তো ? পরে সে অপুর ঠোঁটের নীচে হাত দিয়া বলিল—এটা কি ? তিল ? বেশ দেখায় তোমার মুখে, তিলে বেশ মানিয়েচে, তোমার বয়স কত ? তেরো ? আমার এগারো—তোমার চেয়ে দু বছরের ছোটো—

অপু বলিল—তুমি সেদিন মুখস্থ বলেছিলে, সেই একটা হাসির ছড়া, বেশ লেগেচে আমার—

—তুমি জানো কবিতা ?

—জানি—বাবার একখানা বই আছে, তা থেকে শিখিছি—

—বলো দিকি ?

লীলার গলায় সুর কি মিষ্টি, এমন সুর সে কোনো মেয়ের এ পর্যন্ত শোনে নাই।

অপু ঘাড় দুলাইয়া বলিল—

যে জনের খড় পেতে খেজুর চেটায় ঘুমিয়ে কাল কাটে,
তাকে খাট পালঙ্ক খাসা মশারি খাটিয়ে দিলে কি খাটে ?

কথার শেষে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে। বলিল—দাশু রায়ের পাঁচালীর ছড়া, আমার কাছে বই আছে—

লীলা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি। বলিল—তুমি ভারি মজার কথা জানো তো, এমন হাসাতে পারো তুমি।—

লীলার মুখের প্রশংসায় অপুর মনে আহ্লাদ ধরে না। সে উৎসাহের সুরে বলিল—আর একটা বল্‌বো ? আমি আরও জানি—পরে সে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া একটুখানি ভাবিয়া লইয়া পরে আবার ঘাড় দুলাইয়া আরম্ভ করে—

মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা।
নিষ্কর্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিরেনব্বইএর ধাক্কা,
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকিরের চিন্তা মক্কা,

গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখতে চারি চালের ঠাট্‌টা।
শিশুর চিন্তা সদাই মাকে, পশুর চিন্তা পেট্‌টা।

এ ছড়ার সকল কথার অর্থ লীলা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবার যোগাড় করিল। বলিল, দাঁড়াও লিখে নেবো—

লীলা এ্যাটাসি কেস্ হইতে একটা কলম বাহির করিয়া বলিল—বলো দিকি?

অপু আবার বলিতে সুরু করিল। খানিকটা পরে একটু অবাক্ হইয়া বলিল—কালি নেওনি তো, লিখ্‌চো কেমন করে?

লীলা বলিল—এ তো ফাউণ্টেন পেন—কালি তো লাগে না, এর মধ্যে ভরা আছে—জানো না?

অপুব হাতে লীলা কলমটা তুলিয়া দিল। অপু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—এ তো বেশ, কালিতে মোটে ডোবাতে হয় না!

—তা নয়, কালি ভরা থাকে, ভরে নিতে হয়—এই ছাখো, দেখিয়ে দি—

—বাঃ, বেশ তো!—দেখি একবারটি—

লীলা কলমটা অপুর হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল—তোমায় দিয়ে দিলাম একেবারে—

অপু অবাক্ হইয়া লীলার দিকে চাহিল। পরে লজ্জিতমুখে বলিল—না আমি নেবো না—

লীলা বলিল—কেন?

—উঁহু—

—কেন?

—নাঃ!

লীলা একটু দুঃখিত হইল। বলিল—নাও না?...আমি আর একটা বাবার কাছ থেকে নেবো, নাও তুমি এটা, দেখি তোমার হাত? বাস! আর ফেরত দিতে পারবে না।

ব্যাপারটা অপুর সম্পূর্ণ অবাস্তব ঠেকিল। সে বলিল—কিন্তু তোমায় যদি কেউ বকে?

লীলা বলিল—ফাউণ্টেন পেন দেবার জন্যে? কেউ বকবে না, আমি মাকে বল্‌বো অপূর্বকে দিয়ে দিলাম—বাবার কাছ থেকে আর একটা নেবো—বাবার ফটো দেখবে?...ওই ক্যালেণ্ডারের পাশে টাঙানো—দাঁড়াও পাড়ি—

তাহার পর লীলা আরও দু'তিন খানি ফটো দেখাইল। আলমারি হইতে খানকতক বই বাহির করিয়া বলিল—মাষ্টার মশায় কিনে দিয়েচেন—তুমি কোন্ স্কুলে পড়ো?

অপু কাশীতে সেই যা দিনকতক স্কুলে পড়িয়াছিল, আর ঘটে নাই। বলিল—কাশীতে পড়তাম, এখন আর পড়ি নে—কথাটা বলিতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল বলিয়াই শেষের কথাটা এমন সুরে বলিল, যেন না পড়িয়া খুব একটা বাহাদুরী করিতেছে। একখানা বইয়ে অনেক ছবি! অপু বলিল—বইখানা পড়তে দেবে একবারটি? লীলা বলিল—নাও না! আমার আরও অনেক ছবির বই আছে, তিন বছরের বাঁধানো মুকুল আছে, মায়ের ঘরের আলমারীতে, এনে দেবো, পড়ো—

অপু বলিল—আমার কাছেও বই আছে, আনবো?

লীলা বলিল—চলো, তোমাদের ঘরে যাই—

লীলাকে নিজেদের ঘরে লইয়া যাইতে অপুর লজ্জা করিতে লাগিল। আসবাবপত্র কিছু নাই, ছেঁড়া বালিসের ওয়াড়, আল্‌নায় গায়ে দেওয়ার কাঁথা। লীলা তবুও গেল। অপু নিজের টিনের বাক্সটা খুলিয়া একখানা কি বই হাসি-হাসি মুখে দেখাইয়া গর্বের সুরে বলিল—আমার লেখা, এই ছাখো ছাপার অক্ষরে আছে আমার নাম—

লীলা তাড়াতাড়ি হাত হইতে লইয়া বলিল—দেখি দেখি?

সেই কাশীর স্কুলের ম্যাগাজিনটা। হরিহর ছেলের গল্প ছাপানো দেখিয়া যাইতে পারে নাই, তাহার মৃত্যুর তিন দিন পরে কাগজ বাহির হয়। লীলা পড়িতে লাগিল, অপু তাহার পাশে বসিয়া উৎফুল্ল মুখে লীলার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া পঠিত লাইনগুলি নিজেও মনে মনে একবার করিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। শেষ করিয়া লীলা প্রশংসমান চোখে অপুর মুখের দিকে খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—বেশ তো হয়েচে, আমি এখানা নিয়ে যাই, মাকে দেখাবো----

অপুর ভারি লজ্জা হইল। বলিল—না—

লীলা শুনিল না। কাগজখানা হাতে করিয়া রাখিল। বলিল—নিশ্চিন্দিপুর লেখা আছে, নিশ্চিন্দিপুর কোথায়?

নিশ্চিন্দিপুর যে আমাদের গাঁ—সেখানেই তো আমাদের আসল বাড়ী—কাশীতে তো মোটে বছর-খানেক হ'ল আমরা—

এমন সময় ছোট মোক্ষদা দুয়ারের কাছে আসিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া কহিল—ওমা দিদিমণি, তুমি এখানে ব'সে? আমার পোড়ানি! ওদিকে মাষ্টারবাবু ব'সে ব'সে হয়রান, আমি ওপর নিচে সব ঘরে খুঁজে খুঁজে—তা কে জানে তুমি এই এঁদো-পড়া কুঠুরিতে—এস এস—

লীলা বলিল—যা তুই, আমি যাচ্চি, যা—

ছোট মোক্ষদা বলিল—তা বসবার কি এই জায়গা নাকি? বলে আমাদেরই তাই মাথা ধরে—তাই কি ওই আস্তাবলের খোট্টা মিন্সেরা ঘোড়ার জায়গাগুলো ঝাঁট দেয়, না ধোয়? উহু-হু, কি গন্ধ আসচে ভ্যাখো—এস দিদিমণি, শিগ্‌গির—

লীলা বলিল—যাবো না যাঃ, আমি আজ পড়বো না, যা বল্‌গে যা, কে তোকে বলেছে এখানে বক্‌বক্‌ করতে? যা মাকে বল্‌গে যা—

ছোট মোক্ষদা থর্‌ থর্‌ করিয়া চলিয়া গেল। অপু বলিল—তোমার মা বক্‌বেন না? কেন ওকে ওরকম বল্লে?

পরদিন দুপুরে সে নিজের ঘরে ঘুমাইতেছিল। কাহার ঠেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়াই দেখিল—লীলা হাসিমুখে বিছানার পাশে। সে মেজেতে মাদুর পাতিয়া ঘুমাইতেছিল, লীলা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে ঠেলা মারিয়া উঠাইয়াছে, এখনও সেই ভাবেই কৌতুকপূর্ণ ডাগর চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে! হাসিমুখে বলিল—বেশ তো, দুপুর বেলায় বুঝি এমন ঘুমোয়? আমি বা'র থেকে ডাক দিলাম, এসে দেখি খুব ঘুম—

অপু কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বলিল—সকালবেলা পড়তে আসোনি? আমি তো পড়ার ঘর-টর খুঁজে দেখি কোথাও নেই—

লীলা অপুর স্কুলের সেই কাগজখানা অপুর হাতে দিয়া বলিল—মাকে প'ড়ে শোনালাম কাল রাত্রে, মা নিজেও প'ড়ে দেখ্‌লেন। অপুর সারা গা খুশিতে কেমন করিয়া উঠিল! অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইল। মেজ বৌ-রাণী তাহার লেখা পড়িয়াছেন!

লীলা বলিল—এসো আমার পড়ার ঘরে, 'সখা-সাথী' বাঁধানো এনে রেখেছি তোমার জন্যে—

অপু আল্‌নার দিকে চাহিল। তাহার ভাল কাপড়খানা এখনও শুকায় নাই, যেখানা পরিয়া আছে সেখানা পরিয়া বাহিরে যাওয়া যায় না। বলিল—এখন যাবো না—

লীলা বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কেন?

অপু ঠোঁট চাপিয়া সকৌতুক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। সে জানে না তাহার মুখ কি অপূর্ব সুন্দর দেখায় এই ভঙ্গীতে।

লীলা মিনতির স্বরে বলিল—এস এস—

অপু আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

—বাবা, কি একগুঁয়ে ছেলে যে তুমি! না বল্লে আর হাঁ হ'বার যো নেই বুঝি? আচ্ছা দাড়াও, বইটা এখানে—

অপু হাসি চাপিতে না পারিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

লীলা বলিল—অত হাসি কেন? কি হয়েচে বলো—না বল্‌তেই হবে—বলো ঠিক—

অপু আল্‌নার দিকে হাসি-ভরা চোখের ইঙ্গিত করিল মাত্র, কিছু বলিল না।

এবার লীলা বুঝিল। আল্‌নার কাছে গিয়া হাত দিয়া বলিল—একটুখানি শুকিয়েচে, তুমি বসো, আমি বইখানা আনি—ফাউণ্টেন পেনে লিখ্‌চো? কেমন, বেশ ভাল লেখা হয় তো?

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া লীলার আনা বই দু'জনে দেখিল। বই মাদুরে পাতিয়া দুইজনে পাশাপাশি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উপুড় হইয়া বইএর উপর ঝুঁকিয়া বই দেখিতেছিল। লীলার রেশমের মত চিকণ নরম চুলগুলি অপুর খোলা গায়ে লাগিয়া যেন গা সির্ সির্ করে। হঠাৎ লীলা বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি গান জানো?

অপু ঘাড় নাড়িল।

—তবে একটা গাও—

—তুমি জানো?

—একটু একটু, কেন বিয়ের দিন শোনোনি?

ছোট মোক্ষদা ঝি ঘরে উঁকি মারিয়া কহিল—এই যে দিদিমণি এখানে। আমিও ভেবেচি তাই, উপরে নেই, পড়ার ঘরে নেই, তবে ঠিক—এস দিকি, এই দুধটুকু খেয়ে যাও, জুড়িয়ে গেল—হাতে ক'রে খুঁজে খুঁজে হয়রান—

রূপার ছোট গ্লাসে এক গ্লাস দুধ। লীলা বলিল—রেখে যা—এসে এর পর গ্লাস নিয়ে যাস্—

ঝি চলিয়া গেল। আরও খানিকটা বইয়ের ছবি দেখা চলিল। এক ফাঁকে লীলা দুধের গ্লাস হাতে তুলিয়া বলিল—তুমি খেয়ে নাও আদ্দেকটা—

অপু লজ্জিত স্বরে বলিল—না।

—তোমাকে ভারি খোসামোদ কর্তে হয় সব তাতে—কেন ও রকম? আমাদের মুলতানী গরুর দুধ—খেয়ে নাও—ক্ষীরের মত দুধ, লক্ষ্মী ছেলে—

অপু চোখ কুঁচকাইয়া বলিল—ইঃ লক্ষ্মী ছেলে। ভারি ইয়ে কিনা? উনি আবার—

লীলা দুধের গ্লাস অপুর মুখে তুলিয়া দিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আর লজ্জায় কাজ নেই—আমি চোখ বুজে আছি, নাও—

অপু এক চুমুকে খানিকটা দুধ খাইয়া ফেলিয়া মুখ নামাইয়া লইল ও ঠোঁটের উপর দুধের দাগ তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে হাসিয়া ফেলিল।

লীলা গ্লাসে চুমুক দিয়া বাকী দুধটুকু শেষ করিল, পরে সেও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—বেশ মিষ্টি দুধ, না?

—আমার এঁটো খেলে কেন? খেতে আছে পরের এঁটো?

আমার ইচ্ছে—একটুখানি থামিয়া কহিল—তুমি বল্লে জলছবি তুলতে জানো, ছাই জানো, দাও তো আমায় ক'খানা জলছবি তুলে?

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সর্বজয়া চাহিয়া-চিন্তিয়া কোনো রকমে অপুর উপনয়নের ব্যবস্থা করিল। পরের বাড়ী, ঠাকুর-দালানের রোয়াকের কোণে ভয়ে ভয়ে কাজ সারিতে হইল। বামনী মাসী নাড়ু ভাজিতে সাহায্য করিল, দু'একজন রাঁধুনী বামুনঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল, বাহিরের সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বীরু গোমস্তা ও দীনু খাতাঞ্চি। উপনয়ন মিটিয়া যাওয়ার দিন-কতক পরে, অপু নিজের ঘরটিতে বসিয়া বসিয়া লীলার দেওয়া বাঁধানো 'মুকুল' পড়িতেছিল। খোলা দরজা দিয়া কে ঘরে ঢুকিল। অপু যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতেই পারিল না, তাহার পরই বলিয়া উঠিল—এ কি, বাঃ—কখন—

লীলা কৌতুক ও হাসিভরা চোখে দাঁড়াইয়া। অপু বলিল—বাঃ বেশ তো তুমি। ব'লে গেলে সোমবারে আসবো কল্‌কাতা থেকে, কত সোমবর হ'য়ে গেল—ফেরবার নামও নেই—

লীলা হাসিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িল। বলিল—আসবো কি ক'রে? স্কুলে ভর্তি হয়েছি, বাবা দিয়েচেন ভর্তি ক'রে, বাবার শরীর খারাপ, এখন আমরা কল্‌কাতার বাড়ীতেই থাকবো কিনা। এখন ক'দিন ছুটি আছে, তাই মা'র সঙ্গে এলাম—আবার বুধবারে যাবো।

অপুর মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বলিল—থাকবে না আর তোমরা এখানে?

লীলা বলিল—বাবার শরীর ভালো হ'লে আবার আসবো—

পরে সে হাসিমুখে বলিল—চোখ বুজে থাকো তো একটু? অপু বলিল—কেন?

—থাকো না?

অপু চক্ষু বুজিল ও সঙ্গে সঙ্গে হাতে কি একটা ভারী জিনিসের স্পর্শ অনুভব করিল। চোখ খুলিতেই লীলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটা কার্ড-বোর্ডের বাক্স তাহার কোলের উপর। বাক্সটা খুলিয়া ফেলিয়া লীলা দেখাইল ভাল দেশী ধুতি চাদর ও রাঙা সিল্কের একটা পাঞ্জাবী। লীলা হাসিমুখে বলিল—মা দিয়েচেন—কেমন হয়েচে? তোমার পৈতের জন্যে—

ধুতি চাদর বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবীটা দরের জিনিস, ব্যবহার করা দূরের কথা, এ বাড়ীতে পা দিবার পূর্বে অপু চক্ষেও কখনো দেখে নাই।

লীলা অপুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—এক মাসে তোমার মুখ বদলে গিয়েচে, আরও বড় দেখাচ্চে, দেখি নতুন বামুনের পৈতে?—তারপর কান বেঁধাতে লাগ্‌লো না? আমার ছোট মামাতো ভাইয়েরও পৈতে হোল কিনা, সে কেঁদে ফেলেছিল—

হঠাৎ অপু একখণ্ড 'মুকুল' দেখাইয়া বলিল—পড়েচো এ গল্পটা?

লীলা বলিল—কি দেখি?

অপু পড়িয়া শোনাইল। সমুদ্রের তলায় কোন্ স্থানে স্পেনদেশের এক ধনরত্ন-পূর্ণ জাহাজ দুই তিনশত বৎসর পূর্বে ডুবিয়া যায়—আজ পর্যন্ত অনেক খোঁজ করিয়াছে, কেহ স্থানটা নির্ণয় করিতে পারে নাই। গল্পটা এই মাত্র পড়িয়া সে ভারি খুশি হইয়াছে।

বলিল—কেউ বার করতে পারেনি—কত টাকা আছে জানো? একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ—পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডের সোনা রূপো···এক পাউণ্ড তের টাকা—গুণ করো দিকি? তাহার পর সে তাড়াতাড়ি একটু কাগজে আঁকটা কষিয়া দেখাইয়া বলিল—এই এত টাকা।···আগেও আঁকটা সে একবার কষিয়াছে। উজ্জ্বলমুখে বলিল—আমি বড় হোলে যাবো—দেখবো গিয়ে—ঠিক বার করবো দেখো—কেউ সন্ধান পায়নি, এখনও সেখেনে—

লীলা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল—তুমি যাবে? কোন্ জায়গায় আছে তুমি বার করবে কি করে?

—এই ছাখো, লিখেছে 'পোর্তো প্লাতার সন্নিহিত সমুদ্রগর্ভে'—খুঁজে বার করবো···

সে গল্পটি পড়িয়াই ভাবিয়াছে, ভালোই হইয়াছে কেহ বাহির করিতে পারে

নাই। সবাই সব বাহির করিয়া লইলে তাহার জন্য কি থাকিবে? সে বড় হইয়া তবে কি তুলিবে? এখন সে যাওয়া পর্যন্ত থাকিলে হয়!”...

লীলার বয়স কম হইলেও খুব বুদ্ধিমতী। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—ওদের মত জাহাজ পাবে কোথায়? তোমার একখানা আলাদা জাহাজ চাই—ওদের মতন—

—সে হয়ে যাবে, কিন্‌বো, বড় হ'লে আমার টাকা হবে না বুঝি?

এবার বোধ হয় লীলার অনেকটা বিশ্বাস হইল। সে এ লইয়া আর কোনও তর্ক উঠাইল না।

খানিকটা পরে বলিল—তুমি কল্‌কাতা গিয়েছ?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আমি দেখিনি কখ্‌খনো—খুব বড় শহর?—এর চেয়ে বড়?

লীলা হাসিয়া বলিল—ঢের ঢের—

—কাশীর চেয়েও বড়?

—কাশী আমি দেখিনি—

তারপর সে অপুকে নিজের পড়ার ঘরে লইয়া আসিল। একখানা খাতা দেখাইয়া বলিল—ছাখো তো কেমন ফুলগাছ এঁকেচি, কি রকম ড্রইংটা?

অপু খানিকটা পরে বলিল—আমি শুইগে, মাথাটা বড্ড ধরেচে—

লীলা বলিল—দাঁড়াও, আমি একটা মন্তর জানি মাথা-ধরা সারাবার—দেখি? পরে সে দু'হাতের আঙুল দিয়া কপাল এমন ভাবে টিপিয়া দিতে লাগিল যে, অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—উঃ, বড় সুড়্‌সুড়ি লাগ্‌চে!—লীলা হাসিয়া বলিল—আমার বড় মামাতো ভাইকে কুস্তি শেখায় একজন পালোয়ান আছে, তার কাছে শেখা—বেশ ভালো না? সেরেচে তো?

দিনকতক পরেই লীলারা পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেল।

অপু মাকে বলিয়া কহিয়া একটা ছোট স্কুলে যায়। যে বড় রাস্তার ধারে ইহাদের বাড়ী, সেখান হইতে কিছুদূর গিয়া বাঁ-ধারে ছোট্ট গলির মধ্যে একতলা বাড়ীতে স্কুল। জন পাঁচেক মাষ্টার, ভাঙা বেঞ্চি, হাতল-ভাঙা চেয়ার, তেলকালি-ওঠা ব্ল্যাকবোর্ড, পুরানো ম্যাপ খানকতক—ইহাই স্কুলের আসবাব। স্কুলের সামনেই খোলা ড্রেন অপুদের ক্লাস হইতে জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলে পাশের বাড়ীর চুন-বালির-কাজ-বিরহিত নগ্ন ইঁটের দেওয়াল নজরে পড়ে। সে স্কুলে যাইতে যাইতে দেখে ধাঙড়ে ড্রেন সাফ করিতে করিতে চলিয়াছে, স্থানে স্থানে ময়লা জড়ো করা। সারাদিন স্কুলের মধ্যে কেমন একটা বদ্ধ বাতাসের গন্ধ, পাশের এক হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা দুপুরের পর কয়লার আঁচ দেয়, কাঁচা কয়লার

ধোঁয়ার মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, অপুর মাথার মধ্যে কেমন করে, স্কুলের বাহিরে আসিয়াও যেন সেটা কাটিতে চায় না।

তাহার ভাল লাগে না, মোটেই ভাল লাগে না। শহরের এই সব ইট-সিমেণ্টের কাণ্ড কারখানায় তাহার হাঁফ ধরে, কেমন যেন দম আটকাইয়া আসে। কিসের অভাবে প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি করে, সে বুঝিতে পারে না কিসের অভাবে।

পথে ঘাস খুব কম, গাছপালা বেশী নাই, দু'একটা এখানে ওখানে। সুরকীর পথ, পাকা ড্রেন, দুই বাড়ীর মাঝখানের পথে আবর্জনা, ময়লা জল, ছেঁড়া কাপড়, কাগজ। একদিন সে এক সহপাঠীর সঙ্গে তাহার বাড়ীতে গিয়াছিল। একতলা খোলার ঘর। অপরিসর উঠানের চারিধারের ঘরগুলিতে এক-একঘরে গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে। দোরের গায়ে পুরানো চটের পর্দা। ঘরের মেঝে উঠান হইতে বিঘতের বেশী উঁচু নয়, কাজেই আর্দ্রতা কাটে না। ঘরের মধ্যে আলো হাওয়ার বালাই নাই। উঠান বিশ্রী নোংরা, সকল গৃহস্থই এক সঙ্গে কয়লার আঁচ দিয়াছে, আবার সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা। সবসুদ্ধ মিলিয়া অপুর অত্যন্ত খারাপ লাগে, মন ছোট এতটুকু হইয়া যায়, সেদিন তাহারা উহাকে বসিতে বলিলেও সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে নাই, সদর রাস্তায় আসিয়া তবুও অনেকটা স্বস্তি বোধ করিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়াও সেই বদ্ধতা। বরং যেন আরও বেশী। এখানে-সিমেণ্ট আর মার্বেল পাথরে চারিধার মায় উঠান পর্যন্ত বাঁধানো। অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না, এখানে যা মাটি আছে, তাও যেন অন্যরকম। যে মাটির সঙ্গে তার পরিচয়, এ যেন সে মাটি নয়। তাহা ছাড়া ইহাদের বাড়ী চলিবার ফিরিবার স্বাধীনতা কৈ? থাকিতে হয় ভয়ে ভয়ে চোরের মত। কে কি বলিবে, উঁচু গলায় কথা কওয়া যায় না, ভয় করে।

এক একদিন অপু দপ্তরখানায় গিয়া দেখিয়াছে বুড়া খাতাঞ্চি একটা লোহার সিক বসানো খাঁচার মত ঘরে অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া থাকে! অনেকগুলি খেরো-বাঁধানো হিসাবের খাতা একদিকে স্তূপীকৃত করা! ছোট্ট কাঠের হাতবাক্স সামনে করিয়া বুড়া সারাদিন ঠায় একটা ময়লা চিট তাকিয়া হেলান দিয়া আছে। ঘরে এত অন্ধকার যে, দিনমানেও মাঝে মাঝে ছোট্ট একটা রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলে। গিরীশ গোমস্তা জমা-সেরেস্তায় বসে। নিচু তক্তপোশের উপর ময়লা চাদর পাতা—চারিধারে দু'কোণে কাপড়ে বাঁধা রাশি রাশি দপ্তর। সে ঘরটা খাতাঞ্চিখানার মত অত অন্ধকার নয়, দু'তিনটা বড় বড় জানালাও আছে, কিন্তু তক্তপোশের নীচে রাশীকৃত তামাকের গুল ও ছেঁড়া কাগজ এবং

কড়িকাঠে মাকড়সার জাল ও কেরোসিন আলোর ঝুল। যখন বীরু মুহুরী হাঁকিয়া বলে—ওহে রামদয়াল দেখো তো, গত তৌজিতে বাস্তকর খাতে খরচ লেখা আছে?—তখনই কি জানি কেন অপুর মনে দারুণ বিতৃষ্ণা আবার জাগিয়া ওঠে।

সকালবেলা। অপু দেউড়ির কাছটায় আসিয়া দেখিল বাড়ীর ছেলেরা চেয়ার-গাড়ীটা ঠেলিয়া খেলিতেছে। গাড়ীটা নূতন তৈয়ারী হইয়া আসিয়াছে, ডাণ্ডা লাগানো লোহার চেয়ার, উপরে চামড়ার গদী, বড় বড় চাকা—ঝকঝকে দেখিতে। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, রমেন বলিল—এই, এসে ঠেল্‌ তো একবার আমাদের—

এই গাড়ীটা আসা অবধি অপুর মনে মনে ইহার উপর লোভ আছে, খুশি হইয়া বলিল—ঠেলচি, আমায় একবার চড়্‌তে দেবেন তো?

রমেন বলিল—আচ্ছা হবে, ঠেল্‌ তো—খুব জোরে দিবি—

খুব খানিকক্ষণ খেলা হইবার পর রমেন হঠাৎ বলিল—আচ্ছা খুব হয়েচে এবেলা—থাক্ আর নয়—। পরে গাড়ী লইয়া সকলে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অপু বলিল—আমি এট্টু চড়্‌বো না?

রমেন বলিল,—আচ্ছা যা যা, এ বেলা আর চড়ে না, বেশী চড়্‌লে আবার ভেঙে যাবে—দেখা যাবে ও বেলা—

ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিল। সে এতক্ষণ ধরিয়া আশায় আশায় ইহাদের সকলকে প্রাণপণে ঠেলিয়াছে।

বলিল—বা আপনি যে বললেন আমাকে একবার চড়তে দেবেন আমার পালায়? আমি সকলকে ঠেল্‌লাম—বেশ তো? সেদিনও ওইরকমই চড়ালেন না শেষকালে—

রমেন বলিল—ঠেল্‌লি কেন তুই, না ঠেল্‌লেই পাত্তিস্—যা—কে বলেচে তোকে চড়তে দেবে? গাড়ী কিন্‌তে পয়সা লাগে না?

সে বলিল—কেন, আপনি বল্লেন, ওই সন্তুও তো বল্লে—ঠেলে ঠেলে আমার হাত গিয়াছে—আর আমি বুঝি একবারটি—বেশ তো আপনি—

রমেন গরম হইয়া বলিল—আমি বলিনি যা—

সন্তু বলিল—ফু-র্‌-র্‌-র্‌-র্‌,—বক দেখেচ?

কোনও কিছু না, হঠাৎ বড়বাবুর ছেলে টেবু আসিয়া তাহার গলায় হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—যা যা—আমার চড়াবো না আমাদের খুশি—তোর নিজের ঘরের দিকে যা—এদিকে আসিস কেন খেলতে?

টেবু অপুর অপেক্ষা বয়সে ছোট বলিয়া তাহার কৃত অপমানের দরুনই হউক বা সকলের ঠাট্টা বিদ্রূপের জন্যই হউক অপুর মাথা কেন বেঠিক

হইয়া গেল—সে ঝাঁকুনি দিয়া ঘাড় ছিনাইয়া লইয়া টেবুকে এক ধাক্কা মারিতেই টেবু ঘুরিয়া গিয়া দেওয়ালের উপর পড়িয়া গেল—কপালটা দেওয়ালে লাগিয়া খানিকটা কাটিয়া রক্তপাত হইলে টেবু সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঝি-চাকর ছুটিয়া আসিল, খানসামা দারোয়ান ছুটিয়া আসিল—উপরের বৈঠকখানায় বড়বাবু সকালবেলা কাছারি করিতেছিলেন, তিনি সদলবলে নীচে নামিয়া আসিলেন। দশদিক হইতে দশঘটি জল…বাতাস…জলপটি, হৈ-চৈ কাণ্ড!

গোলমাল একটু কমিলে বড়বাবু বলিলেন—কৈ, কে মেরেচে দেখি?

রামনিহোরা সিং দারোয়ান পিছন হইতে ঠেলিয়া অপুকে বড়বাবুর সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া দিল। বড়বাবু বলিলেন—এ কে? ওই সে কাশীর বামুন-ঠাক্‌রুণের ছেলে না?

গিরিশ সরকার আগাইয়া আসিয়া বলিল ভারি বদ্‌ ছোক্‌রা—আবার জ্যাঠামি ওর যদি শোনেন বাবু, সেই সে-বার থিয়েটারের দিন, বসেছে একেবারে সকলের মুখের সামনে বাবুদের জায়গায়, স'রে বসতে বলেচি, মুখোমুখি তর্ক কি? সেদিন আবার দেখি ও শেঠেদের বাড়ীর মোড়ে রাস্তায় একটা লাল পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বার্ডসাই খেতে খেতে আসচে—এই বয়সেই তৈরী—

বড়বাবু রমেনকে বলিলেন, সকালে আজ তোমাদের মাস্টার আসেনি? পড়াশুনো ছিল না? এই, আমার বেতের ছড়িটা নিয়ে এসো তো কেউ! ওর সঙ্গে মিশে খেলা কর্ত্তে কে বলে দিয়েচে তোমাদের?

রমেন কাঁদো-কাঁদো মুখে বলিল—ওই তো আমাদের খেলার সময় আসে, আমরা কেন যাবো, জিজ্ঞেস করুন বরং সন্তুকে—আপনার সেই ছবিওয়ালা ইংরেজি ম্যাগাজিন্‌গুলোর ছবি দেখতে চায়—আবার বড় বৈঠকখানায় ঢুকে এটা সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে—

গিরিশ সরকার বলিল—দেখুন, সখটা দেখুন আবার—

এবার অপুর পালা। বড়বাবু বলিলেন—স'রে এসো এদিকে—টেবুকে মেরেছ কেন?

ভয়ে অপুর প্রাণ ইতিপূর্বে উড়িয়া গিয়াছিল, সে রাগের মাথায় ধাক্কা দিয়াছিল বটে কিন্তু এত কাণ্ডের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আড়ষ্ট জিহ্বা দ্বারা অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল—টেবু আমাকে আগে তো—আমাকে—

বড়বাবু কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—টেবুর বয়স কত আর

তোমার বয়স কত জান?

গুছাইয়া বলিতে জানিলে অপুর পক্ষ হইতেও একথা বলা চলিত যে টেবুর বয়স কিছু কম হইলেও কার্যে সে অপুর জেঠামশাই নীলমণি রায় অপেক্ষাও পাকা। বলা চলিতে পারিত যে, টেবু ও এ-বাড়ীর সব ছেলেই বিনা কারণে যখন তখন তাহাকে বাঙাল বলিয়া খেপায়, বক দেখায়, পিছন হইতে মাথায় ঠোকর মারে—সে না হয় একটু খেলা করিতে যায় এই তো তাহার অপরাধ! কিন্তু উঠানভরা লোকারণ্যের কৌতুহলী দৃষ্টির সম্মুখে, বিশেষ করিয়া বড়বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে জিহ্বা তাহার তালুর সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছিল—সে শুধু বলিল—টেবুও—আমাকে—শুধু শুধু—আমাকে এসে—

বড়বাবু গর্জন করিয়া বলিলেন—স্টুপিড, ডেঁপো ছোক্‌রা—কে তোমাকে ব'লে দিয়েচে এদিকে এসে এদের সঙ্গে মিশতে—এই দাও তো বেতটা—এগিয়ে এস—এস—

সপাং করিয়া এক ঘা সজোরে পিঠে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন বিস্ময়ের চোখে বড়বাবু ও পুনর্বার-উদ্যত বেতের ছড়িটার দিকে চাহিল—জীবনে সে কখনও ইহার পূবে মার খায় নাই, বাবার কাছেও নয়,—তাহার বিভ্রান্ত মন যেন প্রথমটা প্রহার খাওয়ার সত্যটাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না—পরে সে কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বেতটা ঠেকাইবার জন্য হাত দু'খানা উঠাইল। কিন্তু এবার আর তাহার দুঃখ করিবার কিছু রহিল না যে, সে তাহার পালার বেলা ফাঁকে পড়িল। বেতের সপাসপ শব্দে টেবুকেও কপালের ব্যথা ভুলিয়া চাহিয়া দেখিতে হইল। রাঁধুনীর ছেলের যাহাতে স্পর্ধা আর না হয় বড়বাবু এ বিষয়ে তাহাকে সুশিক্ষাই দিলেন। অন্য বেত হইলে ভাঙিয়া যাইত, এ বেতটা বোধ হয় খুব দামী।

বড়বাবু হাঁপ জিরাইয়া লইয়া বলিলেন—বুড়ো ধাড়ী বখাটে ছোক্‌রা কোথাকার, আজ থেকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, ফের যদি শুনি এ বাড়ীর কোনো ছেলের সঙ্গে মিশেচ, কান ধ'রে তক্ষুনি বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দেবো—পরে কাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—দেখুন না ধীরেনবাবু, বিধবা মা, সতীশবাবু ম্যানেজার কাশী থেকে আন্‌লেন, ভাবলাম জাতের মেয়ে থাকুক্—দেখুন কাণ্ড, মা ভাত রাঁধে—উনি পাঞ্জাবী গায়ে সিগারেট খেয়ে বেড়ান—

ধীরেনবাবু বলিলেন—ওসব ওই রকমই হয়ে থাকে—এর পর কোকেন খাবে—মা'র বাক্স ভাঙবে—ওর নিয়মই ওই—তার ওপর আবার কাশীর ছেলে—

বাড়ীর মধ্যে সকল কথা গিয়া পৌঁছায় না, অপুর মার খাওয়ার কথা কিন্তু সর্বজয়া শুনিল। একটু ভাল করিয়াই শুনিল। গৃহিণী বলিলেন—ওরকম

যদি গুণ্ডা ছেলে হয় তা হ'লে বাছা—ইত্যাদি। রুটির ঘর হইতে আসিয়া দেখিল অপু স্কুল গিয়াছে, মাকে কিছু বলে নাই, এসব কথা সে কখনো মাকে বলেও না। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সর্বজয়ার গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, সর্বাঙ্গ হইতে যেন ঝাল বাহির হইতে থাকিল, ঘরে না থাকিতে পারিয়া সে বাহিরের অপরিসর বারান্দাটাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার অপুর গায়ে হাত! সে যে এখনও বলে, মা সিঁড়ির ঘর দিয়ে যখন তুমি রান্নাবাড়ী থেকে আসবে, তখন রাত্রে তোমায় এমন ভয় দেখাবো? —তাহার কি কোনো বুদ্ধি আছে? কত লাগিয়াছিল, কে তাহাকে বুঝিয়াছে সেখানে, কে শুনিয়াছে তাহার কান্না?

সর্বজয়া বুক ফাটিয়া কান্না আসিল।··

ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর···আকাশে দু একটি পাখী সেই উঁচুতে উড়িয়া বেড়ায়—আস্তাবলের মাথায় আমলকী গাছের ডালে বাতাসে বাধে,···দালানের কোণের লোহার ফুটা চৌবাচ্চার পাশে বসিয়া কথাটা ভাবিতে কান্নার বেগে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—

.—ঠাকুর, ঠাকুর, ও আমার বড় আদরের ধন, তুমি তো জানো ও একদণ্ড চোখের আড়াল থেকে সরলে আমি থির্ থাকতে পারি নে, যা কিছু শাস্তি দেবার আমার ওপর দিয়ে দাও ঠাকুর, ওকে কিছু বোলো না, আমার বুক ফেটে যায় ঠাকুর, তা আমি সইতে পারবো না—

সকাল সকাল অপুদের স্কুলের ছুটি হইয়া গেল। তাহার ক্লাসের ছেলেরা ধরিল তাহাদের ফুটবল খেলায় অপুকে রেফারী হইতে হইবে। অপু ভারি খুশি হইল,। ফুটবল খেলা সে এ শহরে আসিবার পূর্বে কোনোদিন দেখে নাই, সে খুব ভাল খেলিতেও পারে না, তবুও কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা তাহাকেই সকলের চেয়ে পছন্দ করে, খেলার রেফারী হইতে প্রায়ই তাহার ডাক পড়ে।

সে বলিল—সেই বড় হুইসিলটা বাড়ী থেকে নিয়ে আসি ভাই, বাক্সে প'ড়ে রয়েচে, আমি ঠিক চারটের সময় মাঠে যাবো এখন—

পথে আসিতে আসিতে অপুর সকালের কথা মনে উঠিল। আজ সারা দিনটাই সে সে-কথা ভাবিয়াছে। বার্ডসাই খাইতে গিয়া সেদিন গিরিশ সরকারের সামনে পড়িয়া গিয়াছিল একথা ঠিক, কিন্তু বার্ডসাই কি সে রোজ খায়? সেদিন মেজ বৌ-রাণীর দেওয়া রাঙা পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাহার হঠাৎ সখ হইয়াছিল, এই রকম পাঞ্জাবী গায়ে দিয়া বাবুরা বার্ডসাই খায়, সেও একবার খাইবে। তাই খাবারের পয়সাটায় বার্ডসাই কিনিয়া সে ধরাইয়া খাইতেছিল, কিন্তু সেই একদিন নিশ্চিন্দিপুরে লুকাইয়া

খাইতে গিয়াও ভাল লাগে নাই, সেদিনও লাগিল না। তাহার মনে হইয়াছিল—দূর! এ না কিনে এক পয়সার ছোলা ভাজা কিন্‌লে বেশ হোত! এ যে কেন লোকে কিনে খায়; কিন্তু গিরিশ সরকার না জানিয়া শুনিয়া তাহাকে যা তা বলিল কেন?

ভাগ্যিস লীলা এখানে নাই! থাকিলে সে দেখিলে বড় লজ্জার কথা হইত। মাও বোধ হয় টের পায় নাই। পাছে মা টের পায় এই জন্যই তো সে এবেলা স্কুলে চলিয়া আসিয়াছিল।

লীলা কতদিন এখানে আসে নাই! সেই আর বছর গিয়াছে আর আসে নাই। এখন আসিলেই কি আর উহারা তাহার সহিত কথা কহিতে দিবে?

বাড়ী ফিরিতে দেউড়ির কাছটায় আসিয়া শুনিল উপরের বৈঠকখানায় কলের গান হইতেছে। শব্দটা কানে যাইতেই সে খুশি-ভরা উৎসুক চোখে মুখ উঁচু করিয়া দোতালার জানালার নীচে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া গেল! রাস্তা হইতে গানের কথা সব ভাল বোঝা যায় না। কিন্তু সুরটি ভারি চমৎকার, শুনিতে শুনিতে স্কুল, খেলা, রেফারীগিরি, ওবেলার মার-খাওয়া, মন হইতে সব একেবারে মুছিয়া গেল।

গানের সুরে তাহার মনটা আপনি আপনি কোথায় উড়িয়া যায়—সেই যখন তখন নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া কতদিন দেখিত, ওপারের উলুখড়ের মাঠে ছোট রাঙা ফুলে-ভরা শিমুল চারা, তাহাদের পিছনে কতদূরে নীল আকাশের পট—খড়ের মাঠ যেন আঁকা, রাঙা-ফুল শিমুল চারা যেন আঁকা, শুকনা ডালে কি পাখী বসিয়া থাকিত, সব যেন আঁকা। তাহাদের সকলের পিছনে সেই দেশটা, ব-হু-উ-দূরের দেশটা—কোন্ দেশ তাহার জানা নাই, মাত্র মনের খুশিতে যেটা ধরা দিত।

কে যেন ডাকে, কতদূর হইতে উচ্ছ্বসিত আনন্দভরা পরিচিত সুরের ডাক আসে—অপু—উ—উ—উ—উ—

মন খুশিতে ভরিয়া উঠিয়া সাড়া দেয়—যা-আ-আ-ই-ই-ই—

তাহাদের ছোট ঘরটাতে ফিরিতে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—সকাল সকাল এলি যে? সে বলিল—ওপর ক্লাসের ছেলেরা বল খেলায় জিতেছে তাই হাফ স্কুল—

তাহার মা বলিল—আয় বোস এখানে। খানিকক্ষণ পরে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—আজ তোকে ওরা কি জন্যে নাকি ডেকে নিয়ে নাকি—বকেচে?

—নাঃ, ওই টেবুর একটুখানি লেগেচে, তাই বড়বাবু ডেকে বলছিলেন কি হয়েচে—তাই—

—বকে টকে নি তো?

—নাঃ—

তাহার মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কথা ভাবচি, এখেন থেকে চ'লে যাবি?

সে আশ্চর্য হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। পরে হঠাৎ খুশি হইয়া বলিয়া উঠিল—কোথায় মা, নিশ্চিন্দিপুর? সেই বেশ তো, চলো, আমি সেখানে ঠাকুর পূজো করবো—পৈতেটা তো হয়ে গিয়েচে—নিজেদের দেশ, বেশ হবে—এখানে আর থাকবো না—

সর্বজয়া বলিল—সে কথাও তো ভাবচি আজ দু'বছর। সেখানে যাবি বলছিস্, কি আর আছে বল দিকি সেখানে? এক বাড়ীখানা, তাও আজ তিন বছর বর্ষার জল পাচ্চে, তার কিছু কি আছে অ্যাদ্দিন? মান্ধাতার আমলের পুরোনো বাড়ী—ছিল একটু ধানের জমি, তাও তো—গিয়ে মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও নেই—শত্তুর হাসাতে যাওয়া···

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—একটা কাজ কল্লে হয়, চল্ বরং—আচ্ছা কাশী যাবি?

বিশেষ কিছু ঠিক হইল না। তাহার মায়ের তখনও খাওয়া হয় নাই। স্নান সারিয়া পুনরায় রান্নাবাড়ী চলিয়া গেল। অপুর একটা কথা মনে হইল। তাহার গানের গলা আছে, দিদি বলিত, যাত্রাদলের বন্ধুও সে-বার বলিয়াছিল সে যদি কোনো যাত্রাদলে যায়, তাহাকে নেয় না? এখানে মা'র বড় কষ্ট। এখান হইতে সে মাকে লইয়া যাইবে।

উঃ কি গরম! রান্নাবাড়ীর নলের মুখে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে, কার্নিসের গায়ে রোদ···ঘরের ভিতরটা এরই মধ্যে অন্ধকার···আস্তাবলে মাতাবিয়া সহিস কি হিন্দি বুলি বলিতেছে···পাথর-বাঁধানো মেজেতে ঘোড়ার খুর ঠুকিবার খট্ খট্ আওয়াজ···ড্রেনের সেই গন্ধ···তাহার মাথাটা এমন ধরিয়াছে যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। সে ভাবিল এখন একটু শুয়ে নি,—এরপর উঠে খেলার মাঠে যাবো—মোটে তিনটে বেজেছে—এখন বড় রোদটা।

বিছানায় শুইয়া একটা কথাই বারবার তাহার মনে আসিতে লাগিল। এ কথাটা এতদিন এভাবে সে ভাবিয়া দেখে নাই। এতদিন যেন তাহার মনের কোন্ কোণে সব সময়েই স্পষ্টভাবে জাগিয়া থাকিত যে, এ সবের শেষে যেন তাহাদের গ্রাম অপেক্ষা করিয়া আছে—তাহাদের জন্য! যদিও সেখান হইতে চলিয়া আসিবার সময় ফিরিবার কোনো কথাই ছিল না—সে জানে, তবুও এ মোহটুকু তার একেবারে কাটে নাই।

কিন্তু আজকার সমুদয় ব্যাপারে, বিশেষ করিয়া মায়ের ও বড়বাবুর কথায় তাহাদের নিরাশ্রয়তা ও গৃহহীনতার দিকটা তাহার কাছে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আর কি কখনও সে তাহাদের গাঁয়ে ফিরিতে পাইবে না—? —কখনো না ?—কখনো না ?

এই বিদেশ, এই গিরিশ সরকার, এই চোর হইয়া থাকা—না হয় মায়ে-ছেলে হাত ধরিয়া ছন্নছাড়া পথে পথে চিরকাল—এরাই কি কায়েম হইতে আসিয়াছে ?

আস্তাবলে দুই সহিসে ঝগড়া বাধাইয়াছে, রান্নাবাড়ীর ছাদে কাকের দল ভাতের লোভে দলে দলে জুটিতেছে—একটু পরে তাহার মনে হইল, একই কি কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছে, একই কি কথা! আস্তাবলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে নাই—সে যেন মাটির ভিতর কোথায় সেঁধিয়া যাইতেছে—খুব —খুব মাটির ভিতর…নীচের দিকে কে যেন টানিতেছে…বেশ আরাম…মাথা ধরা নাই…বেশ আরাম!

উঃ—কি রোদটাই ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে! দিদির যা কাণ্ড—এত রোদ্দুরে চড়ুইভাতি! সে বলিতেছে—দিদি শুয়ে নে, এত রোদ্দুরে চড়ুইভাতি ?

রাণুদি কানের কাছে বসিয়া কি সব কথা, অনেক কি সব কথা বলিয়া যাইতেছে। রাণুদির ছলছলে ডাগর চোখ দুটি অভিমান-ভরা! সে কি করিবে? নিশ্চিন্দিপুরে তাদের চলে না যে! রাণুদি না লীলা?

হারাণ কাকা বাঁশের বাঁশি বেচিবার জন্য আনিয়া বাজাইতেছে…ভারি চমৎকার বাজায়। সে বাবাকে বলিল—এক পয়সার বাঁশের বাঁশি কিনবো বাবা একটা পয়সা দেবে ?

তাহার বাবা তাহার বড় বড় চুল কানের পাশে তুলিয়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিতেছে—বেশ হয়েচে তোর গল্পটা, ছাপিয়ে এলে আমায় দেখতে দিস্ খোকা ?

সে বলিতেছে—কোকেন কি বাবা ? গিরিশ সরকার বলেচে আমি নাকি কোকেন খাবো—

বাবার গলায় পদ্মবীজের মালা। সেই কথক ঠাকুরের মত।

তাহাদের মাঝেরপাড়ার ইষ্টিশান। কাঠের বড় তক্তাটায় লেখা আছে, মা-ঝে-র-পা-ড়া। সে আগে আগে ভারী বোঁচকাটা পিঠে, মা পিছনে পিছনে। তাহার গায়ে রাঙা পাঞ্জাবীটা। কেমন ছায়া সারাপথে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। পাকা বটফলের গন্ধভরা বাতাসটা।

নিশ্চিন্দিপুরের পথ যেন ফুরাইতেছে না…সে চলিয়াছে…চলিয়াছে…

চলিয়াছে···সে আর মা···এ পথে একা কখনো আসে নাই, পথ সে চিনিতে পারিতেছে না···ও কান্তে-হাতে-কাকা, শুন্‌চো, নিশ্চিন্দিপুরের পথটা এট্টু ব'লে ছাও না আমাদের? যশড়া-নিশ্চিন্দিপুর, বেত্রবতীর ওপারে?

তাহার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হ্যাঁরে, ওঠ্‌ ও অপু, বেলা যে আর নেই, বল্‌লি যে কোথায় খেল্‌তে যাবি? ওঠ্‌-ওঠ্‌।

সে মায়ের ডাকে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া চারদিকে চাহিল—উঃ কি বেলাই গিয়াছে!···রোদ একেবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে!

তাহার মা বলিল—বললি যে কোথায় খেলতে যাবি, তা গেলি কৈ? অবেলায় প'ড়ে প'ড়ে কি ঘুমটাই দিলি? দেবো তোর সেই বাঁশিটা বের করে?

তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া বাঁশিটা মা বিছানার কোণে রাখিয়া দিল বটে, সে কিন্তু রেফারীগিরি করিতে যাওয়ার কোন উৎসাহ দেখাইল না। ঘরের ভিতর এরই মধ্যে অন্ধকার। উঠিয়া আসিয়া জানালার কাছে অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। বেলা একেবারে নাই। কি অসহ্য গুমোট! আস্তাবলের ড্রেনের গন্ধটা যেন আরও বাড়িয়াছে। ফটকের পেটাঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া বোধ হয় ছ'টা বাজাইতেছে।

ওই আস্তাবলের মাথায় যে আকাশটা, ওরই ওপারে পূবদিকে বহুদূরে তাহাদের নিশ্চিন্দিপুর।

আজ কতদিন সে নিশ্চিন্দিপুর দেখে নাই। তি—ন বৎসর! কতকাল!

সে জানে নিশ্চিন্দিপুর তাহাকে দিনে রাতে সব সময় ডাকে, শাঁখারীপুকুর ডাক দেয়, বাঁশবনটা ডাক দেয়, সোনাডাঙার মাঠ ডাক দেয়, কদমতলার সায়েরের ঘাট ডাক দেয়, দেবী বিশালাক্ষী ডাক দেন।

পোড়ো ভিটার মিষ্ট লেবু-ফুলের গন্ধে সজ্‌নেতলার ছায়ায় ছায়ায় আবার কবে গতিবিধি? আবার কবে তাহাদের বাড়ীর ধারের শিরীষ সোঁদালি বনে পাখীর ডাক?

এতদিন তাহাদের সেখানে ইছামতীতে বর্ষার ঢল নামিয়াছে। ঘাটের পথে শিমুলতলায় জল উঠিয়াছে। ঝোপে ঝোপে নাটা-কাঁটা, বনকলমীর ফুল ধরিয়াছে। বন-অপরাজিতার নীল ফুলে বনের মাথা ছাওয়া।

তাহাদের গ্রামের ঘাটটাতে কুঁচ-ঝোপের পাশে রাজুকাকা হয়তো এতক্ষণ তাহার অভ্যাসমত অবেলায় স্নান করিতে নামিয়াছে, চালতে-পোতার বাঁকে নতুন কষাড় বনের ধারে ধারে অক্রুর মাঝি মাছ ধরিবার দোয়াড়ী পাতিতেছে,

আজ সেখানকার হাট-বার, ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই বটগাছটার পিছনে দিগন্তের কোলে রাঙা আগুনের ফেনার মত সূর্য অস্ত যাইতেছে, আর তাহারই তলাকার মেঠোপথ বাহিয়া গ্রামের ছেলে পটু, নীলু, তিনু, ভোলা সব হাট করিয়া ফিরিতেছে।

এতক্ষণে তাহাদের বনে-ঘেরা বাড়ীটার উঠানটাতে ঘন ছায়া পড়িয়া আসিতেছে, কিচ্ কিচ্ করিয়া পাখী ডাকিতেছে, সেই মিষ্ট, নিঃশব্দ, শান্ত বৈকাল—সেই হল্‌দে পাখীটা আজও আসিয়া পাঁচিলের উপরের কঞ্চির ডালটাতে সেই রকমই বসে, মায়ের হাতে পোঁতা লেবু চারাটাতে হয়তো এতদিন লেবু ফলিতেছে···

আরো কিছুক্ষণ পরে তাহাদের সে ভিটায় সন্ধ্যার অন্ধকার হইয়া যাইবে, কিন্তু সে সন্ধ্যায় সেখানে কেহ সাঁজ জ্বালিবে না, প্রদীপ দেখাইবে না, রূপকথা বলিবে না। জনহীন ভিটার উঠান-ভরা কালমেঘের জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিবে, গভীর রাত্রে পিছনের ঘন বনে জগ্‌ডুমুর গাছে লক্ষ্মীপেঁচার রব শোনা যাইবে।···কেহ কোন দিন সেদিক মাড়াইবে না, গভীর জঙ্গলে চাপা-পড়া মায়ের সে লেবুগাছটার সন্ধান কেহ কোনদিন জানিবে না, ওড়কলমীর ফুল ফুটিয়া আপনা-আপনি ঝরিয়া পড়িবে, কুল, নোনা মিথ্যাই পাকিবে, হল্‌দে ডানা তেড়ো পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিবে।

বনের ধারে সে অপূর্ব মায়াময় বৈকালগুলি মিছামিছিই নামিবে চিরদিন!

ওবেলা এক উঠান লোকের সম্মুখে বিনা বিচারে মার খাইয়াও তাহার চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হয় নাই, কিন্তু এখন নির্জন ঘরের জানালাটাতে একা-একা দাঁড়াইয়া হঠাৎ সে কাঁদিয়া আকুল হইল, উচ্ছ্বসিত চোখের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া তাহার সুন্দর কপোল ভাসাইয়া দিতেই চোখ মুছিতে হাত উঠাইয়া আকুল স্বরে মনে মনে বলিল—আমাদের যেন নিশ্চিন্দিপুর ফেরা হয় —ভগবান—তুমি এই কোরো, ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুর যাওয়া হয়—নৈলে বাঁচবো না—পায়ে পড়ি তোমার—

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামে বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়! তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে···দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে···

দিন রাত্রি পার হয়ে জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চ'লে যায়—তোমাদের মর্মর জীবনস্বপ্ন শেওলা-ছাতা দলে ভ'রে আসে, পথ আমার তখনও ফুরায় না···চলে···চলে···চলে···এগিয়েই চলে···

অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্তকাল আর অনন্ত আকাশ···

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া ক'রে এনেছি···

চল এগিয়ে যাই।

সমাপ্ত

অপু

দ্বিতীয় খণ্ড

অপরাজিত

মাতৃদেবীকে

দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে। রায়চৌধুরীদের বাড়ির বড় ফটকে রবিবাসরীয় ভিখারীদের ভিড় এখনও ভাঙে নাই। বীরু মুহুরীর উপর ভিখারীর চাউল দিবার ভার আছে, কিন্তু ভিখারীদের মধ্যে পর্যন্ত অনেকে সন্দেহ করে যে, জমাদাব শম্ভুনাথ সিংহের সঙ্গে যোগ-সাজসের ফলে তাহারা ন্যায্য প্রাপ্য হইতে প্রতিবারই বঞ্চিত হইতেছে। ইহা লইয়া তাহাদের ঝগড়া দ্বন্দ্ব কোনকালেই মেটে নাই। শেষ পর্যন্ত দারোয়ানেরা রাগিয়া ওঠে, রামনিহোরা সিং দু-চারজনকে গলাধাক্কা দিতে যায়। তখন হয় বুড়ো খাজাঞ্চি মহাশয়, নয়তো গিরীশ গোমস্তা আসিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দেয়। প্রায় কোন রবিবারই ভিখারী-বিদায় ব্যাপারটা বিনা গোলমালে নিষ্পন্ন হয় না।

রান্না-বাড়িতে কি একটা লইয়া এতক্ষণ রাঁধুনীদের মধ্যে বচসা চলিতেছিল। রাঁধুনী বাম্‌নী মোক্ষদা থালায় নিজের ভাত সাজাইয়া লইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সরিয়া পড়াতে সেখানকার গোলমালও একটু কমিল। রাঁধুনীদের মধ্যে সর্বজয়ার বয়স অপেক্ষাকৃত কম—বড়লোকের বাড়ি—শহর-বাজার জায়গা, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে বলিয়া ইহাদের এসব কথাবার্তায় সে বড় একটা থাকে না। তবুও মোক্ষদা বাম্‌নী তাহাকে মধ্যস্থ মানিয়া সদু-ঝিয়ের কি অবিচারের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিল। যখন যে দলে থাকে, তখন সে দলের মন যোগাইয়া কথা বলাটা সর্বজয়ার একটা অভ্যাস, এজন্য তাহার উপর কাহারও রাগ নাই। মোক্ষদা সরিয়া পড়ার পর সর্বজয়াও নিজের ভাত বাড়িয়া লইয়া তাহার থাকিবার ছোট ঘরটাতে ফিরিল। এ বাড়িতে প্রথম আসিয়া বছর-দুই ঠাকুরদালানের পাশের যে ঘরটাতে সে থাকিত, এ ঘরটা সেটা নয়; তাহারই সাম্‌নাসাম্‌নি পশ্চিমের বারান্দার কোণের ঘরটাতে সে এখন থাকে—সেই রকমই অন্ধকার, সেই ধরণেরই স্যাঁতসেঁতে মেজে, তবে সে ঘরটার মত ইহার পাশে আস্তাবল নাই, এই একটু সুবিধার কথা।

সর্বজয়া তখনও ভাল করিয়া ভাতের থালা ঘরের মেজেতে নামায় নাই, এমন সময় সদু-ঝি অগ্নিমূর্তি হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—বলি, মুখি বাম্‌নী কী পরুচেয় দিচ্ছিল তোমার কাছে শুনি? বদমায়েশ মাগী কোথাকার, আমার নামে যখন-তখন যার-তার কাছে লাগিয়ে করবে কি জিগ্যেস্ করি? ব'লে দেয় যেন বড় বৌরানীর কাছে—যায় যেন বলতে—

তুমিও দেখে নিও ব'লে দিচ্ছি বাছা, আমি যদি গিন্নিমার কাছে ব'লে ওকে এ বাড়ি থেকে না তাড়াই তবে আমি রামনিধি ভড়ের মেয়েই নই—নই—নই—এই তোমায় বলে দিলুম।

সর্বজয়া হাসিমুখে বলিল, না সদু-মাসী, সে বললেই অমনি আমি শুনবো কেন? তা ছাড়া ওর স্বভাব তো জানো—ওই রকম, ওর মনে কোন রাগ নেই, মুখে হাউ-হাউ ক'রে বকে—এমন তো কিছু বলেও নি—আর তা ছাড়া আমি আজ দু'মাস দশ মাস তো নয়, তোমায় দেখচি আজ তিন বছর—বল্লেই কি আর আমি শুনি? তিন বচ্ছর এ বাড়িতে ঢুকিচি, কৈ তোমার নামে—

সদু-ঝি একটু নরম হইয়া বলিল, অপু কোথায়, দেখচি নে—আজ তো রবিবার—ইস্কুল তো আজ বন্দ—

সর্বজয়া প্রতিদিন রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া তবে স্নান করে, তেলের বাটিতে বোতল হইতে নারিকেল তৈল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, কোথায় বেরিয়েচে। ওই শেঠেদের বাড়ির পাশে কোন এক বন্ধুর বাড়ি, সেখানে ছুটির দিন যায় বেড়াতে। তাই বুঝি বেরিয়েচে। ছেলে তো নয়, একটা পাগল—দুপুর রোদ্দুর রোজ মাথার ওপর দিয়ে যাওয়া চাই তার। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো না মাসী!

সদু বলিল, না, তুমি খাও, আর বসবো না—ভাবলুম যাই কথাটা গিয়ে শুনে আসি, তাই এলুম। বোলো ওবেলা মুখি বাম্নীকে, একটু বুঝিয়ে দিও—খোকাবাবুর ভাতে সেই দইয়ের হাঁড়ি বৈ-করা মনে নেই বুঝি? সদুর পেটে অনেক কথা আছে, বুঝলে? দেখতেই ভালমানুষটি, বোলো বুঝিয়ে—

সদু-ঝি চলিয়া গেলে সর্বজয়া তেল মাখিতে বসিল। একটু পরে দোরের কাছে পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ওঃ, রোদ্দুরে ঘুরে তোর মুখ যে একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েচে! বোস বোস্—আয়—ওমা আমার কি হবে!

অপু ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একেবারে সোজা বিছানায় গিয়া একটা বালিশ টানিয়া শুইয়া পড়িল। হাত-পাখাখানা সজোরে নাড়িয়া মিনিটখানেক বাতাস খাইয়া লইয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখনও নাও নি? বেলা তো দুটো—

সর্বজয়া বলিল, ভাত খাবি দুটো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—

—খা না দুটোখানি? ভাল ছানার ডালনা আছে, সকালে শুধু তো ডাল আর বেগুনভাজা দিয়ে খেয়ে গিইচিস্। ক্ষিদে পেয়েচে আবার এতক্ষণ—

অপু বলিল, দেখি কেমন?

পরে সে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মেজেতে ভাতের থালার ঢাকনি উঠাইতে গেল। সর্বজয়া বলিল, ছুঁস নে, ছুঁস নে—থাক এখন, নেয়ে এসে দেখাচ্চি।

অপু হাসিয়া বলিল, ছুঁস নে, ছুঁস নে কেন? কেন? আমি বুঝি মুচি? ব্রাহ্মণকে বুঝি অমনি বলতে আছে? পাপ হয় না?

—যা হয় হবে। ভারি আমার বামুন, সন্ধ্যে নেই, আহ্নিক নেই, বাচবিচের জ্ঞান নেই, এঁটো জ্ঞান নেই—ভারি আমার—

খানিকটা পরে সর্বজয়া স্নান সারিয়া আসিয়া ছেলেকে বলিল, আমার পাতে বসিস্ এখন।

অপু মুখে হাসি টিপিয়া বলিল, আমি কারুর পাতে বস্‌চি নে, ব্রাহ্মণের খেতে নেই কারুর এঁটো।

সবজয়া খাইতে বসিলে অপু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া স্বর নিচু করিয়া বলিল, আজ এক জায়গায় একটা চাকরির কথা বলেচে মা একজন। ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, গাড়ি যখন এসে লাগবে—লোকেদের কাছে নতুন পাঁজি বিক্রী করতে হবে। পাঁচ টাকা মাইনে আর জলখাবার। ইস্কুলে পড়তে পড়তেও হবে। একজন বলছিল।

ছেলে যে চাকুরির কথা একে ওকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায় সবজয়া একথা জানে। চাকুরি হইলে সে মন্দ কথা নয়, কিন্তু অপুর মুখে চাকুরির কথা তাহার মোটেই ভাল লাগে না। সে তো এমন কিছু বড় হয় নাই। তাহা ছাড়া রৌদ্র আছে, বৃষ্টি আছে। শহর-বাজার জায়গা, পথে ঘাটে গাড়িঘোড়া —কত বিপদ! অত বিপদের মুখে ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে সে রাজি নয়।

সবজয়া কথাটা তেমন গায়ে মাখিল না। ছেলেকে বলিল, আয় বোস্ পাতে—হয়েচে আমার। আয়—

অপু খাইতে বসিয়া বলিল, বেশ ভাল হয়, না মা? পাঁচ টাকা ক'রে মাইনে। তুমি জমিও। তারপর মাইনে বাড়াবে বলেচে। আমার বন্ধু সতীনদের বাড়ির পাশে খেলার ঘর ভাড়া আছে দু'টাকা মাসে। সেখানে আমরা যাবো—এদের বাড়ী তোমার যা খাটুনি! স্কুল থেকে অমনি চলে যাবো ইষ্টিশানে—খাবার সেখানেই খাবো। কেমন তো?

সর্বজয়া বলিল—রুটি ক'রে দেবো, বেঁধে নিয়ে যাস্।

দিন দশেক কাটিয়া গেল। আর কোন কথাবার্তা কোন পক্ষেই উঠিল না। তাহার পর বড়বাবু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত সঙ্গীন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার দিন-পনেরো কাটিল। বাড়িতে সকলের

মুখে, ঝি-চাকর-দারোয়ানদের মুখে বড়বাবুর অসুখের বিভিন্ন অবস্থার কথা ছাড়া আর অন্য কথা নাই।

বড়বাবু সামলাইয়া উঠিবার দিনকয়েক পর একদিন অপু আসিয়া হাসি হাসি মুখে মাকে বলিল, আজ মা, বুঝলে, একটা ঘুড়ির দোকানে বলেচে যদি আমি ব'সে ব'সে ঘুড়ি জুড়ে দি আঠা দিয়ে, তারা সাত টাকা ক'রে মাইনে আর রোজ দু'খানা করে ঘুড়ি দেবে। মস্ত ঘুড়ির দোকান, ঘুড়ি তৈরী ক'রে কলকাতায় চালান দেয়—সোমবারে যেতে বলেচে—

এ আশার দৃষ্টি, এ হাসি, এ সব জিনিস সর্বজয়ার অপরিচিত নয়। দেশে নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে থাকিতে কতদিন, দীর্ঘ পনেরো-ষোল বৎসর ধরিয়া মাঝে মাঝে কতবার স্বামীর মুখে এই ধরণের কথা সে শুনিয়াছে। এই সুর, এই কথার ভঙ্গি সে চেনে। এইবার একটা কিছু লাগিয়া যাইবে—এইবার ঘটিল, অল্পই দেরী। নিশ্চিন্দিপুরের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া পথে বাহির হওয়ার মূলেও সেই সুরেরই মোহ।

চারি বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই, এই দশা ইহার মধ্যে। কিন্তু সবজয়া চিনিয়াও চিনিল না। আজ বহুদিন ধরিয়া তাহার নিজের গৃহ বলিয়া কিছু নাই, অথচ নারীর অন্তর্নিহিত নীড় বাঁধিবার পিপাসাটুকু ভিতরে ভিতরে তাহাকে বড় পীড়া দেয়। অবলম্বন যতই তুচ্ছ ও ক্ষণভঙ্গুর হউক, মন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যায়, নিজেকে ভুলাইতে চেষ্টা করে।

তাহা ছাড়া' পুত্রের অনভিজ্ঞ মনের তরুণ উল্লাসকে পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার চাপে শ্বাসরোধ করিয়া মারিতে মায়াও হয়।

সে বলিল, তা যাস্ না সোমবারে! বেশ তো,—দেখে আসিস্। হ্যাঁ শুনিস নি, মেজ বৌরানী যে শীগ্‌গির আসচেন, আজ শুনছিলাম রান্না-বাড়িতে—

অপুর চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল, কবে মা কবে?

—এই মাসের মধ্যেই আসবেন। বড়বাবুর শরীর খারাপ, কাজ-টাজ দেখতে পারেন না, তা মেজবাবু এসে থাকবেন দিন কতক।

লীলা আসিবে কি-না একথা দুই-দুইবার মাকে বলি বলি করিয়াও কি জানি কেন সে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। বাহিরে যাইতে যাইতে মনে মনে ভাবিল, তাদের বাড়ির সবাই আসচে, মা বাবা আসচে, আর সে কি সেখানে পড়ে থাকবে? সে-ও আসবে—ঠিক আসবে।

পরদিন সে স্কুল হইতে ফিরিয়া তাহাদের ঘরটাতে ঢুকিতেই তাহার মা বলিল, অপু, আগে খাবার খেয়ে নে। আজ একখানা চিঠি এসেচে, দেখাচ্চি

অপু বিস্মিতমুখে বলিল, চিঠি? কোথায়? কে দিয়েচে মা?

কাশীতে তাহার বাবার মৃত্যুর পর হইতে এ পর্যন্ত আজ আড়াই বৎসরের উপর এ বাড়িতে তাহারা আসিয়াছে, কই, কেহ তো একখানা পোস্টকার্ডে একছত্র লিখিয়া তাহাদের খোঁজ করে নাই? লোকের যে পত্র আসে, একথা তাহারা তো ভুলিয়াই গিয়াছে।

সে বলিল, কই দেখি?

পত্র—তা আবার খামে! খামটার উপরে মায়ের নাম লেখা! সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খাম হইতে বাহির করিয়া অধীর আগ্রহের সহিত সেখানাকে পড়িতে লাগিল! পড়া শেষ করিয়া বুঝিতে-না-পারার দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ভবতারণ চক্রবর্তী কে মা?—পরে পত্রের উপরকার ঠিকানাটা আর একবার দেখিয়া বলিল, কাশী থেকে লিখেচে।

সর্বজয়া বলিল, তুই তো ওঁকে নিশ্চিন্দিপুরে দেখেচিস্! সেই সেবার গেলেন, দুগ্‌গাকে পুতুলের বাক্স কিনে দিয়ে গেলেন, তুই তখন সাত বছরের। মনে নেই তোর? তিনদিন ছিলেন আমাদের বাড়ি!

—জানি মা, দিদি বলতো তোমার জ্যাঠামশায় হন—না? তা এতদিন তো আর কোনও—

—আপন নয়, দূর সম্পর্কের। জ্যাঠামশায় তো দেশে বড়-একটা থাকতেন না, কাশী-গয়া ঠাকুর দেবতার জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, এখনও বেড়ান। ওঁদের দেশ হচ্চে মনসাপোতা, আড়ংঘাটার কাছে। সেখান থেকে ক্রোশ দুই—সেবার আড়ংঘাটায় যুগল দেখতে গিয়ে ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলাম দু'দিন। বাড়িতে মেয়ে-জামাই থাকত। সে মেয়ে-জামাই তো লিখেচেন মারা গিয়েচে—ছেলেপিলে কারুর নেই—

অপু বলিল, হ্যাঁ তাই তো লিখেচেন। নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে আমাদের খোঁজ করেচেন। সেখানে শুনেছেন কাশী গিইচি। তারপর কাশীতে গিয়ে আমাদের সব খবর জেনেচেন। এখানকার ঠিকানা নিয়েচেন বোধ হয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে।

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল—আমি দুপুরবেলা খেয়ে একটু বলি গড়াই—ক্ষেমি ঝি বললে তোমার একখানা চিঠি আছে। হাতে নিয়ে দেখি আমার নাম—আমি তো অবাক হয়ে গেলাম—তারপর খুলে পড়ে দেখি এই—নিতে আসবেন লিখেচেন শীগ্‌গির। ছাখ্‌ দিকি, কবে আসবেন লেখা আছে কিছু?

অপু বলিল, বেশ হয়, না মা? এদের এখানে একদণ্ডও ভাল লাগে না। তোমার খাটুনিটা কমে—সেই সকালে উঠে রান্না-বাড়ি ঢোকা, আর দুটো তিনটে—

ব্যাপারটা এখনও সর্বজয়া বিশ্বাস করে নাই। আবার গৃহ মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে, নিজের মনোমত ঘর গড়া চলিবে! বড়লোকের বাড়ির এ রাঁধুনীবৃত্তি—এ ছন্নছাড়া জীবনযাত্রার কি এতদিনে—বিশ্বাস হয় না। অদৃষ্ট তেমন নয় বলিয়া ভয় করে।

তাহার পর দু'জনে মিলিয়া নানা কথাবার্তা চলিল। জ্যাঠামশায় কি রকম লোক, সেখানে যাওয়া ঘটিলে কেমন হয়,—নানা কথা উঠিবার সময় অপু বলিল—শেঠেদের বাড়ির পাশে কাঠগোলায় পুতুলনাচ হবে একটু পরে। দেখে আসবো মা?

—সকাল সকাল ফিরবি, যেন ফটক বন্ধ ক'রে দেয় না,—দেখিস—

পথে যাইতে যাইতে খুশিতে তাহার গা কেমন করিতে লাগিল। মন যেন শোলার মত হাল্কা। মুক্তি, এতদিন পরে মুক্তি! কিন্তু লীলা যে আসিতেছে? পুতুলনাচের আসরে বসিয়া কেবলই লীলার কথা মনে হইতে লাগিল। লীলা আসিয়া তাহার সহিত মিশিবে তো? হয়ত এখন বড় হইয়াছে, হয়ত আর তাহার সঙ্গে আর কথা বলিবে না।

পুতুলনাচ আরম্ভ হইতে অনেক দেরি হইয়া গেল। না দেখিয়াও সে যাইতে পারিল না। অনেক রাত্রে যখন আসর ভাঙিয়া গেল, তখন তাহার মনে পড়িল, এত রাত্রে বাড়ি ঢোকা যাইবে না, ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে, বড়লোকের বাড়ির দারোয়ানরা কেহ তাহার জন্য গরজ করিয়া ফটক খুলিয়া দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বড় ভয়ও হইল। রাত্রিতে এ রকম একা সে বাড়ির বাহিরে কাটায় নাই। কোথায় এখন সে থাকে? মা-ই বা কি বলিবে?

আসরের লোক সব চলিয়া গেল। আসরের কোণে একটা পান-লেমনেডের দোকানে তখনও বেচা-কেনা চলিতেছে। সেখানে একটা কাঠের বাক্সের উপর সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না, ঘুম ভাঙিয়া দেখিল ভোর হইয়া গিয়াছে, পথে লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে।

সে একটু বেলা করিয়া বাড়ি ফিরিল। ফটকের কাছে বাড়ির গাড়ি দুইখানি তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেউড়িতে ঢুকিয়া খানিকটা আসিয়া দেখিল বাড়ির তিন-চার জন ছেলে সাজিয়া গুজিয়া কোথায় চলিয়াছে। নিজেদের ঘরের সামনে নিস্তারিণী ঝিকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাসীমা এত সকালে গাড়ি যাচ্ছে কোথায়? মেজবাবুরা কি আজকে আসবেন?

নিস্তারিণী বলিল, তাই তো শুনছি। কাল চিঠি এসেচে—শুধু মেজবাবু আর বৌরানা আসবেন, লীলা দিদিমণি এখন আসবেন না—ইস্কুলের এগ্‌জামিন।

সেই বড় দিনের সময় তবে আসবে। গিন্নীমা বলছিলেন বিকেলে—

অপুর মনটা এক মুহূর্তে দমিয়া গেল। লীলা আসিবে না। বড়দিনের ছুটিতে আসিলেই বা কি—সে তো তাহার আগে এখান হইতে চলিয়া যাইবে। যাইবার আগে একবার দেখা হইয়া যাইত এই সময় আসিলে! কতদিন সে আসে নাই।

তাহার মা বলিল, বেশ ছেলে তো, কোথায় ছিলি রাত্তিরে। আমার ভেবে সারারাত চোখের পাতা বোজে নি কাল।

অপু বলিল, রাত বেশী হয়ে গেল, ফটক বন্ধ ক'রে দেবে জানি, তাই আমার এক বন্ধু ছিল, আমার সঙ্গে পড়ে, তাদেরই বাড়িতে—। পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না মা, সেখানে পানের দোকানে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স পড়ে ছিল, তার উপর শুয়ে—

সর্বজয়া বলিল, ওমা, আমার কি হবে! এই সারারাত ঠাণ্ডায় সেখেনে—লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, যেও তুমি ফের কোনদিন সন্ধ্যের পর কোথাও—তোমার বড় ইয়ে হয়েচে, না?

অপু হাসিয়া বলিল—তা আমি কি ক'রে ঢুকবো বলো না? ফটক ভেঙে ঢুকবো?

রাগটা একটু কমিয়া আসিলে সর্বজয়া বলিল—তারপর জ্যাঠামশায় তো কাল এসেচেন। তুই বেরিয়ে গেলে একটু পরেই এলেন, তোর খোঁজ করলেন, আজ ওবেলা আবার আসবেন। বললেন, এখেনে কোথায় তাঁর জানাশুনো লোক আছে, তাদের বাড়ি থাকবেন। এদের বাড়ি থাকবার অসুবিধে—পরশু নিয়ে যেতে চাচ্চেন।

অপু বলিল, সত্যি? কি কি বল না মা, কি সব কথা হ'ল?

আগ্রহে অপু মায়ের পাশে চৌকির ধারে বসিয়া পড়িয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। ছ'জনে অনেক কথাবার্তা হইল। জ্যাঠামশায় বলিয়াছেন, তাঁহার আর কেহ নাই, ইহাদেরই উপর সব ভার দিয়া তিনি কাশী যাইবেন। অনেকদিন পরে সংসার পাতিবার আশায় সর্বজয়া আনন্দে উৎফুল্ল। ইহাদের বাড়ি হইতে নানা টুকটাক্ গহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিস নানা সময় সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। একটা বড় টিনের টেমি দেখাইয়া বলিল, সেখেনে রান্নাঘরে জালবো—কত বড় লম্পটা দেখেচিস্? ছ'পয়সার তেল ধরে।

•

ছপুরের পর সে মায়ের পাতে ভাত খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় ছুয়ারের সামনে কাহার ছায়া পড়িল। চাহিয়া দেখিয়া সে ভাতের গ্রাস আর মুখে তুলিতে পারিল না।

লীলা!

পরক্ষণেই লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল; কিন্তু অপুর দিকে চাহিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। অপুকে যেন আর চেনা যায় না—সে তো দেখিতে বরাবরই সুন্দর, কিন্তু এই দেড় বৎসরে কি হইয়া উঠিয়াছে সে? কি গায়ের রং, কি মুখের শ্রী, কি সুন্দর স্বপ্ন-মাখা চোখদুটি! লীলার যেন একটু লজ্জা হইল। বলিল, উঃ, আগের চেয়ে মাথাতে কত বড হয়ে গিয়েচে!

লীলার সম্বন্ধেও অপুর ঠিক সেই কথাই মনে হইল। এ যেন সে লীলা নয়, যাহার সঙ্গে সে দেড বৎসর পূর্বে অবাধে মিলিয়া মিশিয়া কত গল্প ও খেলা করিয়াছে। তাহাব তো মনে হয় না লীলার মত সুন্দরী মেয়ে সে কোথাও দেখিয়াছে—রাণুদিও নয়। খানিকক্ষণ সে যেন চোখ ফিরাইতে পারিল না।

দু'জনেই যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল।

অপু বলিল, তুমি কি ক'রে এলে? আমি আজ সকালেও জিজ্ঞেস করিচি! নিস্তারিণী মাসী বললে, তুমি আসবে না, এখন স্কুলের ছুটি নেই—সেই বডদিনের সময় নাকি আসবে?

লীলা বলিল, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

—না, তা কেন? তারপর এতদিন পরে বুঝি—বেশ—একেবারে ডুমুরের ফুল—

—ডুমুবের ফুল আমি, না তুমি? খোকামণির ভাতের সময় তোমাকে যাওয়ার জন্যে চিঠি লেখলাম ঠাকুরমায়ের কাছে, এ বাড়ির সবাই গেল, যাও নি কেন?

অপু এসব কথা কিছুই জানে না। তাহাকে কেহ বলে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, খোকামণি কে?

লীলা বলিল, বাঃ আমার ভাই! জানো না?···এই এক বছরের হলো।

লীলার জন্য অপুব মনে একটু দুঃখ হইল। লীলা জানে না যাহাকে সে এত আগ্রহ করিয়া ভাইয়ের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এ বাড়িতে তাহার স্থান কোথায় বা অবস্থা কি। সে বলিল—দেড বছর আসো নি—না? পডচ কোন ক্লাসে?

লীলা তক্তপোশের কোণে বসিয়া পডিল। বলিল, আমি আমার কথা কিছু বলবো না আগে—আগে তোমার কথা বলো। তোমার মা ভাল আছেন? তুমিও তো পডো—না?

—আমি এবারে মাইনর ক্লাসে উঠবো—পরে একটু গর্বিত মুখে বলিল, আর বছর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেচি, প্রাইজ দিয়েচে।

লীলা অপুর দিকে চাহিল। বেলা তিনটার কম নয়। এত বেলায় সে খাইতে বসিয়াছে? বিস্ময়ের স্বরে বলিল, এখন খেতে বসেচ, এত বেলায়?

অপুর লজ্জা হইল। সে সকালে সরকারদের ঘরে বসিয়া খাইয়া স্কুলে যায়—শুধু ডাল-ভাত,—তাও শ্রীকণ্ঠ ঠাকুর বেগার-শোধ ভাবে দিয়া যায়, খাইয়া পেট ভরে না, স্কুলেই ক্ষুধা পায়, সেখান হইতে ফিরিয়া মায়ের পাতে ভাত ঢাকা থাকে, বৈকালে তাহাই খায়। আজ ছুটির দিন বলিয়া সকালেই মায়ের পাতে খাইতে বসিয়াছে।

অপু ভাল কবিয়া উত্তর দিতে পারিল না বটে, কিন্তু লীলা ব্যাপারটা কতক না বুঝিল এমন নহে। ঘরের হান আসবাব পত্র, অপুর হীন বেশ—অবেলায় নিরুপকরণ ছ'টি ভাত সাগ্রহে খাওয়া—লীলার কেমন যেন মনে বড় বিঁধিল। সে কোন কথা বলিল না।

অপু বলিল, তোমার সব বই এনেচ এখানে? দেখাতে হবে আমাকে। ভাল গল্প কি ছবির বই নেই?

লীলা বলিল, তোমার জন্যে কিনে এনেচি আসবার সময়। তুমি গল্পের বই ভালোবাসো ব'লে একখানা 'সাগবের কথা' এনেচি, আর দু-তিনখানা এনেচি। আনচি, তুমি খেয়ে ওঠো।

অপুর খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছিল, খুশিতে বাকিটা কোনো রকমে শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। লীলা লক্ষ্য করিয়া দেখিল সে পাতের সবটা এমন করিয়া খাইতেছে, পাতে একটা দানাও পড়িয়া নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর লীলার কেমন একটা অপূর্ব মনের ভাব হইল—সে ধরণের অনুভূতি লীলার জীবনে এই প্রথম, আর কাহারও সম্পর্কে সে ধরণের কিছু তো কখনও হয় নাই।

একটু পরে লীলা অনেক বই আনিল। অপুর মনে হইল, লীলা কেমন করিয়া তাহার মনের কথাটি জানিয়া, সে যাহা পড়িতে জানিতে ভালবাসে সেই ধরণের বইগুলি আনিয়াছে। 'সাগরের কথা' বইখানিতে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। সাগরের তলায় বড বড পাহাড আছে, আগ্নেয়গিরি আছে, প্রবাল নামক এক প্রকার প্রাণী আছে, দেখিতে গাছপালার মত—কোথায় এক মহাদেশ নাকি সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া আছে—এই সব।

লীলা একখানা পুরাতন খাতা দেখাইল। তাহার ঝোঁক ছবি আঁকিবার দিকে; বলিল—সেই তোমায় একবার ফলগাছ এঁকে দেখতে দিলাম মনে আছে? তারপর কত এঁকেচি দেখবে?

অপুর মনে হইল লীলার হাতের আঁকা আগের চেয়ে এখন ভাল হইয়াছে। সে নিজে একটা রেখা কখনো সোজা করিয়া টানিতে পারে না—ড্রইংগুলি দেখিতে দেখিতে লীলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেশ এঁকেচো তো। তোমাদের ইস্কুলে করায়, না এমনি আঁকো ?

এতক্ষণ পরে অপুর মনে পড়িল লীলা স্কুলে পড়ে, কোন্ ক্লাসে পড়ে সে কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বলিল—তোমাদের কি ইস্কুল ? এবার কোন্ ক্লাসে পড়চো ?

—এবার মাইনর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেচি—গিরিন্দ্রমোহিনী গার্লস স্কুল—আমাদের বাড়ির পাশেই—

অপু বলিল, জিজ্ঞেস করবো ?

লীলা হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া চুপ করিয়া রহিল।

অপু বলিল, আচ্ছা বলো—চট্টগ্রাম কর্ণফুলির মোহনায়—কি ইংরেজি হবে ?

লীলা ভাবিয়া বলিল, চিট্টাগং ইজ্ অন্ দি মাউথ অফ্ দি কর্ণফুলি।

অপু বলিল, ক'জন মাস্টার তোমাদের সেখানে ?

—আটজন, হেড মিস্ট্রেস এণ্ট্রান্স পাশ, আমাদের গ্রামার পড়ান। পরে সে বলিল—মা'র সঙ্গে দেখা করবে না ?

—এখন যাবো, না একটু পরে যাবো ? বিকেলে যাবো এখন, সেই ভাল। —তাহার পরে সে একটু থামিয়া বলিল, তুমি শোন নি লীলা, আমরা যে এখান থেকে চলে যাচ্চি !

লীলা আশ্চর্য হইয়া অপুর দিকে চাহিল। বলিল—কোথায় ?

আমার এক দাদামশায় আছেন, তিনি এতদিন পরে আমাদের খোঁজ পেয়ে তাঁদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেচেন।

অপু সংক্ষেপে সব বলিল।

লীলা বলিয়া উঠিল --চলে যাবে ? বাঃ রে !

হয়তো সে কি আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, যাওয়া না-যাওয়াব উপর অপুর তো কোনও হাত নাই, কোনও কথাই এক্ষেত্রে বলা চলিতে পারে না।

খানিকক্ষণ কেহই কথা বলিল না।

লীলা বলিল, তুমি বেশ এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ো না কেন ? সেখানে কি ইস্কুল আছে ? পড়বে কোথায় ? সে তো পাড়াগাঁ।

—আমি থাকতে পারি কিন্তু মা তো আমায় এখানে রেখে থাকতে পারবে না, নইলে আর কি—

—না হয় এক কাজ কর না কেন? কল্‌কাতায় আমাদের বাড়ি থেকে পড়বে। আমি মাকে বলবো, অপূর্ব আমাদের বাড়িতে থাকবে; বেশ সুবিধে —আমাদের বাড়ির সামনে আজকাল ইলেকট্রিক ট্রাম হয়েছে—এঞ্জিন্‌ও নেই, ঘোড়াও নেই, এমনি চলে—তারের মধ্যে বিদ্যুৎ পোরা আছে, তাতে চলে।

—কি রকম গাড়ি? তারের ওপর দিয়ে চলে?

—একটা ডাণ্ডা আছে। তারে ঠেকে থাকে, তাতেই চলে। কলকাতা গেলে দেখবে এখন—ছ-সাত বছর হ'ল ইলেকট্রিক ট্রাম হয়েছে, আগে ঘোড়ায় টানতো—

আরও অনেকক্ষণ দু'জনে কথাবার্তা চলিল।

বৈকালে সর্বজয়ার জ্যাঠামশায় ভবতারণ চক্রবর্তী আসিলেন। অপুকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ঠিক করিলেন, দুইদিন পরে বুধবারের দিন লইয়া যাইবেন। অপু দু-একবার ভাবিল লীলার প্রস্তাবটা একবার মায়ের কাছে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা আর কার্যে পরিণত হইল না।

সকালের রৌদ্র ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই উলা স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে মনসাপোতা যাইবার সুবিধা। ভবতারণ চক্রবর্তী পূর্ব হইতেই পত্র দিয়া গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কাল রাত্রে একটু কষ্ট হইয়াছিল। এক্সপ্রেস্ ট্রেনখানা দেরিতে পৌছানোর জন্য ব্যাণ্ডেল হইতে নৈহাটির গাড়িখানা পাওয়া যায় নাই। ফলে বেশী রাত্রে নৈহাটিতে আসিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সারারাত্রি জাগরণের ফলে অপু কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানে না। চক্রবর্তী মহাশয়ের ডাকে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল একটা স্টেশনের প্লাটফর্মে গাড়ি লাগিয়াছে। সেখানেই তাদের নামিতে হইবে। কুলীরা ইতিমধ্যে তাহাদের কিছু জিনিসপত্র নামাইয়াছে।

গরুর গাড়ীতে উঠিয়া চক্রবর্তী মহাশয় অনবরত তামাক টানিতে লাগিলেন। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হইবে, একহারা পাতলা চেহারা, মুখে দাড়ি গোঁফ নাই, মাথার চুল সব পাকা। বলিলেন—জয়া, ঘুম পাচ্ছে না তো?

সর্বজয়া হাসিয়া বলিল, আমি তো নৈহাটিতে ঘুমিয়ে নিইচি আধঘণ্টা, অপুও ঘুমিয়েচে। আপনারই ঘুম হয় নি—

চক্রবর্তী মহাশয় খুব খানিকটা কাশিয়া লইয়া বলিলেন,—ওঃ, সোজা

খোঁজটা করেচি তোদের! আর-বছর বোশেখে মেয়েটা গেল মারা, হরিধন তো তার আগেই। এই বয়সে হাত পুড়িয়ে রেঁধেও খেতে হয়েচে,—কেউ নেই সংসারে। তাই ভাবলাম, হরিহর বাবাজীর তো নিশ্চিন্দপুর থেকে উঠে যাবার ইচ্ছে ছিল অনেকদিন থেকেই, যাই এখানেই নিয়ে আসি। একটু ধানের জমি আছে, গৃহদেবতার সেবাটাও হবে। গ্রামে ব্রাহ্মণ তেমন নেই,— আর আমি তো এখানে থাকব না। আমি একটু কিছু ঠিক ক'রে দিয়েই কাশী চলে যাবো। একরকম ক'রে হরিহর নেবেন চালিয়ে। তাই গেলাম নিশ্চিন্দপুরে—

সর্বজয়া বলিল, আপনি বুঝি আমাদের কাশী যাওয়ার কথা শোনেন নি?

—তা কি ক'রে শুনবো? তোমাদের দেশে গিয়ে শুনলাম, তোমরা নেই সেখানে। কেউ তোমাদের কথা বলতে পারে না—সবাই বলে তারা এখান থেকে বেচে-কিনে তিন-চার বছর হ'ল কাশী চলে গিয়েচে। তখন কাশী যাই। কাশীতে আমি আছি আজ দশ বছর। খুঁজতেই সব বেরিয়ে পড়লো। হিসেব ক'রে দেখলাম হরিহর যখন মারা যান, তখন আমিও কাশীতেই আছি, অথচ কখনো দেখাশুনো হয় নি, তা হলে কি আর—

অপু আগ্রহের সুরে বলিল, নিশ্চিন্দিপুরে আমাদের বাড়িটা কেমন আছে, দাদামশায়?

—সেদিকে আমি গেলাম কৈ! পথেই সব খবর পেলাম কি-না। আমি আর সেখানে দাঁড়াই নি। কেউ ঠিকানা দিতে পারলে না। ভুবন মুখুয্যে মশায় অবিশ্যি খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন, আর তোমার বাপের একশো নিন্দে—বুদ্ধি নেই, সাংসারিক জ্ঞান নেই—হেন তেন। যাক্ সে সব কথা, তোমরা এলে ভাল হল। যে ক'ঘর যজমান আছে তোমাদের বছর তাতে কেটে যাবে। পাশেই তেলিরা বেশ অবস্থাপন্ন, তাদের ঠাকুর প্রতিষ্ঠা আছে। আমি পূজোটুজো করতাম অবিশ্যি, সেটাও হাতে নিতে হবে ক্রমে। তোমাদের নিজেদের জিনিস দেখে শুনে নিতে হবে।

উলা গ্রামের মধ্যেও খুব বন, গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথেও বনঝোপ। সূর্য আকাশে অনেকখানি উঠিয়া গিয়াছে। চারিধারে প্রভাতী রৌদ্রের মেলা, পথের ধারে বনতুলসীর জঙ্গল, মাঠের ঘাসে এখনও স্থানে স্থানে শিশির জমিয়া আছে, কোন্ রূপকথার দেশের মাকড়সা যেন রূপালী জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে কিসের একটা গন্ধ, বিশেষ কোনো ফুলের গন্ধ নয় কিন্তু। শিশির-সিক্ত ঘাস, সকালের বাতাস, অড়হরের ক্ষেত, এখানে ওখানে বনজ গাছপালা, সবসুদ্ধ মিলাইয়া একটা সুন্দর সুগন্ধ।

অনেক দিন পরে এই সব গাছপালার প্রথম দর্শনে অপুর প্রাণে একটা উল্লাসের ঢেউ উঠিল। অপূর্ব, অদ্ভুত, সুতীব্র ; মিনমিনে ধরণের নয়, পান্‌সে পান্‌সে জোলো ধরণের নয়। অপুর মনে সে শ্রেণীরই নয় আদৌ, তাহা সেই শ্রেণীর যাহা জীবনের সকল আবেদনকে, ঐশ্বর্যকে প্রাণপণে নিংড়াইয়া চুষিয়া আঁটিসার করিয়া খাইবার ক্ষমতা রাখে। অল্পেই নাচিয়া ওঠে, অল্পে দমিয়াও যায়—যদিও পুনরায় নাচিয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব করে না।

মনসাপোতা গ্রামে যখন গাড়ি ঢুকিল তখন বেলা দুপুর। সর্বজয়া ছইয়ের পিছন দিকের ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতেছে তাহার নূতনতম জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবার স্থানটা কি রকম। তাহার মনে হইল গ্রামটাতে লোকের বাস একটু বেশী, একটু যেন বেশী ঠেসাঠেসি, ফাঁকা জায়গা বেশী নাই, গ্রামের মধ্যে বেশী বনজঙ্গলের বালাইও নাই। একটা কাহাদের বাড়ি, বাহির-বাটীর দাওয়ায় জনকয়েক লোক গল্প করিতেছিল, গোরুর গাড়িতে কাহারা আসিতেছে দেখিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। উঠানে বাঁশের আলনায় মাছ ধরিবার জাল শুকাইতে দিয়াছে। বোধ হয় গ্রামের জেলেপাড়া।

আরও খানিক গিয়া গাড়ি দাঁড়াইল। ছোট উঠানের সামনে একখানি মাঝারি গোছের চালা ঘর, দু'খানা ছোট্ট দোচালা ঘর, উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ও একপাশে একটা পাতকুয়া। বাড়ির পিছনে একটা তেঁতুল গাছ—তাহার ডালপালা বড় চালাঘরখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সামনের উঠানটা বাঁশের জাফরি দিয়া ঘেরা। চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি হইতে নামিলেন। অপু মা'কে হাত ধরিয়া নামাইল।

চক্রবর্তী মহাশয় আসিবার সময় যে তেলিবাড়ির উল্লেখ করিয়াছিলেন, বৈকালের দিকে তাহাদের বাড়ির সকলে দেখিতে আসিল। তেলি-গিন্নী খুব মোটা, রং বেজায় কালো। সঙ্গে চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, দু'টি পুত্রবধূ। প্রায় সকলেরই হাতে মোটা মোটা সোনার অনন্ত দেখিয়া সর্বজয়ার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল ; ঘরের ভিতর হইতে দু'খানা কুশাসন বাহির করিয়া আনিয়া সলজ্জভাবে বলিল, আসুন আসুন, বসুন।

তেলি-গিন্নী পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলে ছেলেমেয়ে ও পুত্রবধূরাও দেখাদেখি তাহাই করিল। তেলি-গিন্নি হাসিমুখে বলিল, দুপুরবেলা এলেন মা-ঠাকরুণ একবার বলি যাই। এই যে পাশেই বাড়ি, তা আসতে পেলাম না। মেজছেলে এল গোয়াড়ী থেকে—গোয়াড়ী দোকান আছে কি-না! মেজ বৌমার মেয়েটা ন্যাওটো, মা দেখতে ফুরসৎ পায় না, দুপুরবেলা আমাকে একেবারে পেয়ে বসে—ঘুম পাড়াতে বেলা দুটো। ঘুঙ্‌ড়ি কাশি,

গুপী কবরেজ বলেছে ময়ূরপুচ্ছ পুড়িয়ে মধু দিয়ে খাওয়াতে। তাই কি সোজাসুজি পুড়ুলে হবে মা, চৌষট্টি ফৈজৎ—কাঁসার ঘটির মধ্যে পোরো, তা ঘুঁটের জাল করো, তা ঢিমে আঁচে চড়াও। হ্যাঁরে হাজরী, ভোঁদা গোয়াড়ী থেকে কাল মধু এসেছে কি-না জানিস?

আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া কথার উত্তর দিবার পূর্বেই তেলি-গিন্নী তাহাকে দেখাইয়া বলিল, ওইটি আমার মেজ মেয়ে—বহরমপুরে বিয়ে দিয়েচি। জামাই বড়বাজারে এদের দোকানে কাজকর্ম করেন। নিজেদেরও গোলা, দোকান রয়েচে কালনা—বেয়াই সেখানে দেখেন শোনেন। কিন্তু হলে হবে কি মা—এমন কথা ভূভারতে কেউ কখনো শোনে নি। দুই ছেলে, নাতি নাতনী, বেয়ান মারা গেলেন ভাদ্দর মাসে, মাঘ মাসে বুড়ো আবার বিয়ে ক'রে আনলে। এখন ছেলেদের সব দিয়েচে ভেন্ন করে। জামাইয়ের মুশকিল, ছেলেমানুষ—তা উনি বলেচেন, তা এখন তুমি বাবা আমাদের দোকানেই থাকো, কাজ দেখা শোনা শেখো, ব্যবসাদারের ছেলে, তারপর একটা হিল্লে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

বড় পুত্রবধূ এতক্ষণ কথা বলে নাই। সে ইহাদের মত হুড্ বার্নিস নয়, বেশ টকটকে রং। বোধ হয় শহর অঞ্চলের মেয়ে। এ দলের মধ্যে সেই সুন্দরী, বয়স বাইশ-তেইশ হইবে। সে নীচের ঠোঁটের কেমন চমৎকার এক প্রকার ভঙ্গি করিয়া বলিল, এঁরা এসেচেন সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হয় নি, এঁদের আজকের সব ব্যবস্থা তো করে দিতে হবে? বেলাও তো গিয়েছে, এঁরা আবার রান্না করবেন।

এই সময় অপু বাড়ির উঠানে ঢুকিল। সে আসিয়াই গ্রামখানা বেড়াইয়া দেখিতে বাহিরে গিয়াছিল। তেলি গিন্নী বলিল—কে মা-ঠাকরুণ? ছেলে বুঝি? এই এক ছেলে? বাঃ, চেহারা যেন রাজপুত্তুর।

সকলেরই চোখ তাহার উপর পড়িল। অপু উঠানে ঢুকিয়াই এতগুলি অপরিচিতের সম্মুখে পড়িয়া কিছু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পাশ কাটাইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিতেছিল, তাহার মা বলিল, দাঁড়া না এখেনে। ভারি লাজুক ছেলে মা—এখন ওইটুকুতে দাঁড়িয়েছে—আর এক মেয়ে ছিল, তা—সর্বজয়ার গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল। গিন্নী ও বড় পুত্রবধূ একসঙ্গে বলিল, নেই, হ্যাঁ মা? সর্বজয়া বলিল, সে কি মেয়ে মা! আমায় ছলতে এসেছিল, কি চুল, কি চোখ, কি মিষ্টি কথা? বকো—ঝকো, গাল দাও, মা'র মুখে উঁচু কথাটি কেউ শোনে নি কোন দিন।

ছোটবৌ বলিল, কত বয়সে গেল মা?

—এই তেরোয় পড়েই—ভাদ্রমাসে তেরোয় পড়ল, আশ্বিন মাসের ৭ই—দেখতে দেখতে চার বছর হয়ে গেল।

তেলি-গিন্নী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—আহা মা, তা কি করবে বলো, সংসারে থাকতে গেলে সবই···তাই উনি বল্লেন—আমি বল্লাম আস্থন তাঁরা—চক্কত্তি মশায় পূজা-আচ্চা করেন—তা উনি মেয়েজামাই মারা যাওয়ার পর থেকে বড় থাকেন না। গাঁয়ে একঘর বামুন নেই—কাজকর্মে সেই গোয়াড়ী দৌড়তে হয়—থাকলে ভালো! বীরভূম না বাঁকুড়ো-জেলা থেকে সেবার এল কি চাটুয্যে। কি নামটা রে পাঁচী? বললে বাস করবো। বাড়ী থেকে চালডাল সিধে পাঠিয়ে দিই। তন মাস রইল, বলে আজ ছেলেপিলে আন্‌ব—কাল ছেলেপিলে আন্‌ব—ও মা এক মাগী গোয়ালার মেয়ে উঠোন ঝাঁট দিত আমাদের, তা বলি বামুন মানুষ এসেছে, ওঁরও কাজটা করে দিস। ঘেন্নার কথা শোনো মা, আর বছর শিবরাত্রির দিন—ত|কে নিয়ে—

বউ দু'টি ও মেয়েরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সর্বজয়া অবাক্ হইয়া বলিল, পালালো নাকি?

—পালালো কি এমন্ তেমন পালালো মা? সেই সঙ্গে আমাদের এক প্রস্ত বাসন। কিছুই জানি নে মা, সব নিজের ঘর থেকে···বলি আহা বামুন এসেছে—করুক, আছে বাড়তি। তা সেই বাসন সবসুদ্ধ নিয়ে দু'জন নিউদ্দিশ! যাক্ সে সব কথা মা, উঠি তাহলে আজ। রান্নার কি আছে মা-আছে বলো মা, সব দিই বন্দোবস্ত করে।

আট দশ দিন কাটিয়া গেল; সর্বজয়া ঘরবাড়ি মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে। দেওয়াল উঠান নিকাইয়া পুঁছিয়া লইয়াছে। নিজস্ব ঘরদোর অনেকদিন ছিল না, নিশ্চিন্দিপুব ছাড়িয়া অবধিই নাই—এতদিন পরে একটা সংসারেব সমস্ত ভাব হাতে পাইয়া সে গত চার বৎসরের সঞ্চিত সাধ মিটাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

জ্যাঠামশায় লোক মন্দ নহেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া দেখিল তিনি একটু বেশী কৃপণ। ক্রমে ইহাও বোঝা গেল—তিনি যে নিছক পরার্থপরতার ঝোঁকেই ইহাদের এখানে আনিয়াছেন তাহা নহে, অনেকটা আনিয়াছেন নিজের গরজে। তেলিদের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরটি পুজা না করিলে সংসার ভাল রূপ চলে না, তাহাদের বার্ষিক বৃত্তিও বন্ধ হইয়া যায়। এই বার্ষিক বৃত্তি সম্বল করিয়াই তিনি কাশী থাকেন। পাকা লোক, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে তিনি ইহাদের আনিয়া তুলিয়াছেন। সর্বজয়াকে প্রায়ই বলেন—জয়া,

তোর ছেলেকে বল কাজকর্ম সব দেখে নিতে। আমার মেয়াদ আর কত দিন ? ওদের বাড়ির কাজটা দিক না আরম্ভ ক'রে—সিধের চালেই তো মাস চলে যাবে।

সর্বজয়া তাহাতে খুব খুশী।

সকলের তাগিদে শীঘ্রই অপু পূজার কাজ আরম্ভ করিল—দু'টি একটি করিয়া কাজকর্ম আরম্ভ হইতে হইতে ক্রমে এপাড়ায় ওপাড়ায় অনেক বাড়ি হইতেই লক্ষ্মীপূজায় মাকাল পূজায় তাহার ডাক আসে। অপু মহা উৎসাহে প্রাতঃস্নান করিয়া উপনয়নের চেলীর কাপড় পরিয়া নিজের টিনের বাক্সের বাংলা নিত্যকর্মপদ্ধতিখানা হাতে লইয়া পূজা করিতে যায়। পূজা করিতে বসিয়া আনাড়ীর মত কোন্ অনুষ্ঠান করিতে কোন্ অনুষ্ঠান করে। পূজার কোন পদ্ধতি জানে না—বার বার বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে কি লেখা আছে—'বজ্রায় হুং' বলিবার পর শিবের মাথায় বজ্রের কি গতি করিতে হইবে—'ওঁ ব্রহ্মপৃষ্ঠ ঋষি সুতলছন্দঃ কুর্মো দেবতা' বলিয়া কোন্ মুদ্রায় আসনের কোণ কি ভাবে ধরিতে হইবে—কোন রকমে গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিবার মত পটুত্বও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, সুতরাং পদে পদে আনাড়ীপণাটুকু ধরা পড়ে।

একদিন সেটুকু বেশী করিয়া ধরা পড়িল ওপাড়ার সরকারদের বাড়ি। যে ব্রাহ্মণ তাহাদের বাড়িতে পূজা করিত, সে কিজন্য রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, গৃহদেবতার নারায়ণের পূজার জন্য তাহাদের লোক অপুকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বাড়ির বড় মেয়ে নিরুপমা পূজার যোগাড় করিয়া দিয়াছিল, চৌদ্দ বছরের ছেলেকে চেলী পরিয়া পুঁথি বগলে গম্ভীর মুখে আসিতে দেখিয়া সে একটু অবাক্ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পূজো করতে পারবে ? কি নাম তোমার ? চক্কত্তি মশায় তোমার কে হন ? মুখচোরা অপুর মুখে বেশী কথা যোগাইল না, লাজুক মুখে সে গিয়া আনাড়ীর মত আসনের উপর বসিল।

পূজা কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে নিরুপমার কাছে পূজারীর বিদ্যা ধরা পড়িয়া গেল। নিরুপমা হাসিয়া বলিল, ওকি ? ঠাকুর নামিয়ে আগে নাইয়ে নাও, তবে তো তুলসী দেবে ?—অপু থতমত খাইয়া ঠাকুর নামাইতে গেল।

নিরুপমা বসিয়া পড়িয়া বলিল—উঁহু, তাড়াতাড়ি ক'রো না। এই টাটে আগে ঠাকুর নামাও—আচ্ছা, এখন বড় তাম্রকুণ্ডুতে জল ঢালো—

অপু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বইয়ের পাতা উল্টাইয়া স্নানের মন্ত্র খুঁজিতে লাগিল। তুলসীপত্র পরাইয়া শালগ্রামকে সিংহাসনে উঠাইতে যাইতেছে, নিরুপমা বলিল, ওকি ? তুলসীপাতা উপুড় ক'রে পরাতে হয় বুঝি ? চিৎ ক'রে পরাও—

২

ঘামে রাঙামুখ হইয়া কোন রকমে পূজা সাঙ্গ করিয়া অপু চলিয়া আসিতেছিল, নিরুপমা ও বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে আসন পাতিয়া বসাইয়া ভোগের ফলমূল ও সন্দেশ জলযোগ করাইয়া তবে ছাড়িয়া দিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল!

অপুব কেমন মনে হয় নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব মায়ারূপ এখানকার কিছুতেই নাই। এই গ্রামে নদী নাই, মাঠ থাকিলেও সে মাঠ নাই, লোকজন বেশী, গ্রামের মধ্যেও লোকজন বেশী। নিশ্চিন্দিপুরের সেই উদার স্বপ্নমাখানো মাঠ, সে নদীতীর এখানে নাই, তাদের দেশের মত গাছপালা, অত ফুলফল, পাখি, নিশ্চিন্দিপুরের সে অপূর্ব বন-বৈচিত্র্য, কোথায় সে সব? কোথায় সে নিবিড় পুষ্পিত ছাতিম বন, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর ছড়ানো সন্ধ্যা?

সরকার বাড়ী হইতে আজকাল প্রায়ই পূজা করিবার ডাক আসে। শান্ত-স্বভাব ও সুন্দর চেহারার গুণে অপুকেই আগে চায়। বিশেষ বারব্রতের দিনে পূজাপত্র সারিয়া অনেক বেলায় সে ধামা করিয়া নানাবাড়ির পূজার নৈবেদ্য ও চাল-কলা বহিয়া বাড়ী আনে। সর্বজয়া হাসিমুখে বলে, ওঃ, আজ চাল তো অনেক হয়েচে!—দেখি! সন্দেশ কাদের বাড়ির নৈবিদ্যিতে দিলে রে!

অপু খুশীর সহিত দেখাইয়া বলে, কুণ্ডুবাড়ি থেকে কেমন একছড়া কলা দিয়েচে, দেখেচো মা?

সর্বজয়া বলে, এবার বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চেয়েচেন, এদের ধরে থাকা যাক্, গিন্নী লোক বড় ভালো। মেজছেলের শ্বশুরবাড়ির থেকে তত্ত্ব পাঠিয়েচে—অসময়ের আম—অমনি আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়েচে—খাস্ এখন দুধ দিয়ে।

এত নানারকমের ভাল জিনিস সর্বজয়া কখনো নিজের আয়ত্তের মধ্যে পায় নাই। তাহার কতকালের স্বপ্ন! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে, উঠানের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া বাঁশবনের পত্রস্পন্দনে, ঘুঘুর ডাকে, তাহার অবসন্ন অন্যমনস্ক মন যে অবাস্তব সচ্ছলতার ছবি আপন মনে ভাঙ্গিত গড়িত—হাতে খরচ নাই, কুটা বাড়িতে জল পড়ে বৃষ্টির রাত্রে, পড়ার মুখ পায় না, সকলে তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না—সে সব দিনের স্মৃতির সঙ্গে, আমরুল শাকের বনে পুরানো পাঁচিলের দীর্ঘছায়ার সঙ্গে যে সব দূরকালের দুরাশার রঙে রঙিন ভবিষ্যৎ জড়ানো ছিল—এই তো এতদিনে তাহারা পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে।

পূজার কাজে অপুর অত্যন্ত উৎসাহ। রোজ সকালে উঠিয়া সে কলুপাড়ার একটা গাছ হইতে রাশীকৃত কচি কচি বেলপাতা পাড়িয়া আনে। একটা খাতা

বাঁধিয়াছে, তাহাতে সর্বদা ব্যবহারের সুবিধার জন্য নানা দেবদেবীর স্তবের মন্ত্র, স্নানের মন্ত্র, তুলসীদান প্রণালী লিখিয়া লইয়াছে। পাড়ায় পূজা করিতে নিজের তোলা ফুল-বেলপাতা লইয়া যায়, পূজার সকল পদ্ধতি নিখুঁতভাবে জানা না থাকিলেও উৎসাহ ও একাগ্রতায় সে সকল অভাব পূরণ করিয়া লয়।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপু একদিন মাকে বলিল যে, সে স্কুলে পড়িতে যাইবে।

সর্বজয়া আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোন ইস্কুলে রে?

—কেন, এই তো আড়বোয়ালেতে বেশ ইস্কুল রয়েচে।

—সে তো এখেন থেকে যেতে-আসতে চার ক্রোশ পথ। সেখেনে যাবি হেঁটে পড়তে?

সর্বজয়া কথাটা তখনকার মত উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু ছেলের মুখে কয়েকদিন ধরিয়া বার বার কথাটা শুনিয়া সে শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, যা খুশি করো বাপু, আমি জানি নে। তোমরা কোনো কালে কারুর কথা তো শুনলে না? শুনবেও না—সেই একজন নিজের খেয়ালে সারাজন্ম কাটিয়ে গেল, তোমারও তো সে ধারা বজায় রাখা চাই! ইস্কুলে পড়বো! ইস্কুলে পড়বি তো এদিকে কি হবে? দিব্যি একটা যাহোক্ দাঁড়াবার পথ তবু হয়ে আসছে—এখন তুমি দাও ছেড়ে—তারপর ইদিকেও যাক্, ওদিকেও যাক্—

মায়ের কথায় সে চুপ করিয়া গেল। চক্রবর্তী মহাশয় গত পৌষ মাসে কাশী চলিয়া গিয়াছেন, আজকাল তাহাকেই সমস্ত দেখিতে শুনিতে হয়। সামান্য একটু জমি-জমা আছে, তাহার খাজনা আদায়, ধান কাটাইবার বন্দোবস্ত, দশকর্ম, গৃহদেবতার পূজা। গ্রামে ব্রাহ্মণ নাই, তাহারাই একঘর মোটে। চাষী কৈবর্ত ও অন্যান্য জাতির বাস, তাহা ছাড়া এ-পাড়ার কুণ্ডুরা ও ও-পাড়ার সরকারেরা। কাজে কর্মে ইহাদের সকলেরই বাড়ি অপুকে ষষ্ঠিপূজা মাকালপূজা করিয়া বেড়াইতে হয়। সবাই মানে, জিনিসপত্র দেয়।

সেদিন কি একটা তিথি উপলক্ষে সরকার-বাড়ি লক্ষ্মীপূজা সারিয়া খানিক রাত্রে জিনিসপত্র একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া সে পথ বাহিয়া বাড়ির দিকে আসিতেছিল; খুব জ্যোৎস্না, সরকার বাড়ির সামনে নারিকেল গাছে কাঠঠোক্‌রা শব্দ করিতেছে। শীত বেশ পড়িয়াছে; বাতাস খুব ঠাণ্ডা, পথে ক্ষেত্র কাপালির বেড়ায় আমড়া গাছে বকল ধরিয়াছে। কাপালিদের বাড়ির পিছনে বেগুনক্ষেতের উঁচুনিচু জমিতে এক জায়গায় জ্যোৎস্না পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে,—পাশের খাদটাতেই অন্ধকার। অপু মনে মনে কল্পনা করিতে

করিতে যাইতেছিল যে উঁচু জায়গাটা একটা ভালুক, নিচুটা জলের চৌবাচ্চা, তার পরের উঁচুটা নুনের ঢিবি। মনে মনে ভাবিল—কমলালেবু দিয়েচে, বাড়ি গিয়ে কমলালেবু খাবো। মনের সুখে শহরে-শেখা গানের একটা চরণ সে গুন্ গুন্ করিয়া ধরিল—

সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরী মালা—

অনেকদিনের স্বপ্ন যেন আবার ফিরিয়া আসে। নিশ্চিন্দিপুরে থাকিত ইচ্ছামতীর তীরের বনে, মাঠে কত ধূসর অপরাহ্নের, কত জ্যোৎস্না-রাতের সে সব স্বপ্ন! এই ছোট্ট চাষাগাঁয়ে চিরকালই এ রকম ষষ্ঠীপূজা, মাকালপূজা করিয়া কাটাইতে হইবে?

সারাদিনের রোদে-পোড়া মাটি নৈশ শিশিরে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে, এখন শীতের রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহারই সুগন্ধ।

অপুর মনে হইল রেলগাড়ির চাকায় চাকায় যেমন শব্দ হয়—ছোট্‌ঠাকুর-পো—বট্‌ঠাকুর-পো—ছোট্‌ঠাকুর-পো—বট্‌ঠাকুর-পো—

দুই-এক দিনের মধ্যে সে মায়ের কাছে কথাটা আবার তুলিল। একবার শুধু তোলা নয়, নিতান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িল। আড়বোয়ালের স্কুল দুই ক্রোশ দূরে, তাই কি? সে খুব হাঁটিতে পারিবে এটুকু। সে বুঝি চিরকাল এই রকম চাষাগাঁয়ে বসিয়া বসিয়া ঠাকুরপূজা করিবে? বাহিরে যাইতে পারিবে না বুঝি!

তবু আরও মাস দুই কাটিল। স্কুলের পড়াশোনা সর্বজয়া বোঝে না, সে যাহা বোঝে তাহা পাইয়াছে। তবে আবার ইস্কুলে পড়িয়া কি লাভ? বেশ তো সংসার গুছাইয়া উঠিতেছে। আর বছর কয়েক পরে ছেলের বিবাহ—তারপরই একঘর মানুষের মত মানুষ।

সর্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

কিন্তু অপুর তাহা হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না—শ্রাবণের প্রথমে সে আড়বোয়ালের মাইনর স্কুলে ভর্তি হইয়া যাতায়াত শুরু করিল।

এই পথের কথা সে জীবনে কোনোদিন ভোলে নাই—এই একটি বৎসর ধরিয়া কি অপরূপ আনন্দই পাইয়াছিল—প্রতিদিন সকালে-বিকালে এই পথ হাঁটিবার সময়টাতে।...নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া অবধি এত আনন্দ আর হয় নাই।

ক্রোশ দুই পথ। দুধারে বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ, মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ। স্কুলে বসিয়া অপুর মনে হইত সে যেন একা কত দূর বিদেশে আসিয়াছে, মন চঞ্চল হইয়া উঠিত—ছুটির পরে নির্জন পথে

বাহির হইয়া পড়িত।—বৈকালের ছায়ায় ঢ্যাঙা তাল-খেজুরগাছগুলা যেন দিগন্তের আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে—পিড়িং পিড়িং পাখির ডাক—হু-হু মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ আনিতেছে—সর্বত্র একটা মুক্তি, একটা আনন্দের বার্তা।···

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সে আনন্দ পাইত পথ-চল্‌তি লোকজনের সঙ্গে কথা কহিয়া। কত ধরণের লোকের সঙ্গে পথে দেখা হইত—কত দূর-গ্রামের লোক পথ দিয়া হাঁটিত, কত দেশের লোক কত দেশে যাইত। অপু সবেমাত্র একা পথে বাহির হইয়াছে, বাহিরের পৃথিবীটার সহিত নতুন ভাবে পরিচয় হইতেছে, পথে ঘাটে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদের কথা জানিতে তাহার প্রবল আগ্রহ। পথ চলিবার সময়টা এইজন্য বড় ভালো লাগে, সাগ্রহে সে ইহার প্রতীক্ষা করে, স্কুলের ছুটির পর পথে নামিয়াই ভাবে—এইবার গল্প শুনবো। পরে ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া আসিয়া কোনো অপরিচিত লোকের নাগল ধরিয়া ফেলে। প্রায়ই চাষালোক, হাতে হুঁকোকল্কে। অপু জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাচ্ছ, হ্যাঁ কাকা? চলো আমি মনসাপোতা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাবো। মামজোয়ান গিইছিলে? তোমাদের বাড়ি বুঝি? না? শিকৃড়ে? নাম শুনেচি, কোন্‌দিকে জানি নে। কি খেয়ে সকালে বেরিয়েচে, হ্যাঁ কাকা?···

তারপর সে নানা খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞাসা করে—কেমন সে গ্রাম, ক'ঘর লোকের বাস, কোন্ নদীর ধারে? ক'জন লোক তাদের বাড়ি, কত ছেলে-মেয়ে, তারা কি করে?···

কত গল্প, কত গ্রামের কিংবদন্তী, সেকাল-একালের কত কথা, পল্লীগৃহস্থের কত সুখদুঃখের কাহিনী—সে শুনিয়াছিল এই এক বৎসরে। সে চিরদিন গল্প-পাগলা, গল্প শুনিতে শুনিতে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়—যত সামান্য ঘটনাই হোক, তাহার ভাল লাগে। একটা ঘটনা মনে কি গভীর রেখাপাতই করিয়াছিল!

কোন্ গ্রামের এক ব্রাহ্মণবাড়ির বৌ এক বাগ্‌দীর সঙ্গে কুলের বাহির হইয়া গিয়াছিল—আজ অপুর সঙ্গীটি এইমাত্র শামুকপোতার বিলে গুগ্‌লি তুলিতে দেখিয়া আসিয়াছে। পরণে ছেঁড়া কাপড়, গায়ে গহনা নাই, ডাঙায় একটি ছোট ছেলে বসিয়া আছে, বোধ হয় তাহারই। অপু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার দেশের মেয়ে? তোমায় চিনতে পারলে?

হ্যাঁ, চিনিতে পারিয়াছিল। কত কাঁদিল, চোখের জল ফেলিল, বাপ-মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। অনুরোধ করিল যেন এসব কথা দেশে গিয়া সে না বলে। বাপ-মা শুনিয়া কষ্ট পাইবে। সে বেশ সুখে আছে। কপালে যাহা ছিল, তাহাই হইয়াছে।

সঙ্গীটি উপসংহারে বলিল, বামুন-বাড়ির বৌ, হর্তেলের মত গায়ের রঙ— যেন ঠাকুরুণের পিরতিমে!

দুর্গা-প্রতিমার মত রূপসী একটি গৃহস্থবধূ ছেঁড়া কাপড় পরণে শামুকপোতার বিলে হাঁটুজল ভাঙিয়া চুপড়ি হাতে গুগ্‌লি তুলিতেছে—কত কাল ছবিটা তাহার মনে ছিল!

সেদিন সে স্কুলে গিয়া দেখিল স্কুলসুদ্ধ লোক বেজায় সন্ত্রস্ত! মাস্টারেরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। স্কুল-ঘর সবই ফুলের মালা দিয়া সাজানো হইতেছে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় খামোকো একটা সুবৃহৎ সিঁড়িভাঙা ভগ্নাংশ কষিয়া নিজের ক্লাসের বোর্ড পুরাইয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ আজ স্কুল ঘরের বারান্দা ও কম্পাউণ্ড এত সাফ করিয়া রাখা হইয়াছে যে, যাহারা বারোমাস এস্থানের সহিত পরিচিত, তাহাদের বিস্মিত হইবার কথা। হেড-মাস্টার ফণীবাবু খাতাপত্র, এ্যাডমিশন বুক, শিক্ষকগণের হাজিরা বই লইয়া মহা ব্যস্ত। সেকেণ্ড পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন, ও অমূল্যবাবু, চৌঠো তারিখে খাতায় যে নাম সই করেন নি? আপনাকে ব'লে ব'লে আর পারা গেল না। দেরিতে এসেছিলেন তো খাতায় সই ক'রে ক্লাসে গেলেই হ'ত? সব মনে থাকে, এইটের বেলাতেই—

অপু শুনিল একটার সময় ইন্সপেক্টর আসিবেন স্কুল দেখিতে। ইন্সপেক্টর আসিলে কি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে হইবে, তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ক্লাশের ছেলেদের সে বিষয়ে তালিম দিতে লাগিলেন।

বারোটার কিছু পূর্বে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া স্কুলের সমনে থামিল। হেডমাস্টার তখনও ফাইল দুরস্ত শেষ করিয়া উঠিতে পারেন নাই বোধ হয়—তিনি এত সকালে ইন্সপেক্টর আসিয়া পড়াটা প্রত্যাশা করেন নাই, জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া গাড়ি দেখিতে পাইয়াই উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটিলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্ট ভেকের মত সজীব হইয়া উঠিয়া তারস্বরে ও মহা উৎসাহে (অন্যদিন এই সময়টাই তিনি ক্লাসে বসিয়া মধ্যাহ্নিক নিদ্রাটুকু উপভোগ করিয়া থাকেন) দ্রব পদার্থ কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। পাশের ঘরে সেকেণ্ড পণ্ডিত মহাশয়ের হুঁকোর শব্দ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল। শিক্ষক বলিলেন, মতি, তোমরা অবশ্যই কমলালেবু দেখিয়াছ, পৃথিবীর আকার—এই হরেন—কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার—

হেডমাস্টারের পিছনে পিছনে ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিলেন। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে, বেঁটে, গৌরবর্ণ, সাটিন জিনের লম্বা কোট গায়ে, সিল্কের

চাদর গলায়, পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের জুতা, চোখে চশমা। গলার স্বর ভারী। প্রথমে তিনি অফিস-ঘরে ঢুকিয়া খাতাপত্র অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখার পরে বাহির হইয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাসে গেলেন। অপুর বুক টিপ্ টিপ্ করিতেছিল। এইবার তাহাদের ক্লাসে আসিবার পালা। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় গলার সুর আর এক গ্রাম চড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকিয়া বোর্ডের দিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা কি ভগ্নাংশ ধরেছে? তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল দেখাইল; বলিলেন আজ্ঞে হ্যাঁ, দু' ক্লাসে আমিই অঙ্ক কষাই কি না। ও ক্লাসেই অনেকটা এগিয়ে দিই—সরল ভগ্নাংশটা শেষ করে ফেলি—

ইন্সপেক্টর এক এক করিয়া বাঙলা রিডিং পড়িতে বলিলেন। পড়িতে উঠিয়াই অপুর গলা কাঁপিতে লাগিল। শেষের দিকে তাহার পড়া বেশ ভাল হইতেছে বলিয়া তাহার নিজেরই কানে ঠেকিল। পরিষ্কার সতেজ বাঁশির মত গলা। রিনরিনে মিষ্টি।

—বেশ, বেশ রিডিং। কি নাম তোমার?

তিনি আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। তারপর সবগুলি ক্লাস একে একে ঘুরিয়া আসিয়া জলের ঘরে ডাব ও সন্দেশ খাইলেন। তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় অপুকে বলিলেন. তুই হাতে করে এই ছুটির দরখাস্তখানা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, তোকে খুব পছন্দ করেছেন, যেমন বাইরে আসবেন, অমনি দরখাস্তখানা হাতে দিবি—দু'দিন ছুটি চাইবি—তোর কথায় হয়ে যাবে—এগিয়ে যা।

ইন্সপেক্টর চলিয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ি কিছুদূর যাইতে না যাইতে ছেলেরা সমস্বরে কলরব করিতে করিতে স্কুল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। হেডমাস্টার ফণীবাবু অপুকে বলিলেন, ইন্সপেক্টরবাবু খুব সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছেন তোমার ওপর। বোর্ডের একজামিন দেওয়াবো তোমাকে দিয়ে—তৈরী হও, বুঝলে?

বোর্ডের পরীক্ষা দিতে মনোনীত হওয়ার জন্য যত না হউক ইন্সপেক্টরের পরিদর্শনের জন্য দু'দিন স্কুল বন্ধ থাকিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ির দিকে রওনা হইল। অন্য দিনের চেয়ে দেরি হইয়া গিয়াছে। অর্ধেক পথ চলিয়া আসিয়া পথের ধারে একটা সাঁকোর উপর বসিয়া মায়ের দেওয়া খাবারের পুঁটুলি খুলিয়া রুটি, নারিকেলকোরা ও গুড় বাহির করিল। এইখানটাতে বসিয়া রোজ সে স্কুল হইতে ফিরিবার পথে খাবার খায়। রাস্তার বাঁকের মুখে সাঁকোটা, হঠাৎ কোনো দিক হইতে দেখা যায় না, একটা বড় তুঁত-গাছের ডালপালা নত হইয়া ছায়া ও আশ্রয় দুই-ই যোগাইতেছে।

সাঁকোর নীচে আমরুল শাকের বনের ধারে একটু একটু জল বাধিয়াছে, মুখ বাড়াইলে জলে ছায়া পড়ে। অপুর কেমন একটা অস্পষ্ট ভিত্তিহীন ধারণা আছে যে, জলটা মাছে ভর্তি, তাই সে একটু একটু রুটির টুক্‌রা উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখে মাছ ঠোক্‌রাইতেছে কি না।

সাঁকোর নীচের জলে হাত মুখ ধুইতে নামিতে গিয়া হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল একজন ঝাঁকড়া চুল কালো-মত লোক রাস্তার ধারের মাঠে নামিয়া লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু কৌতুহলী হইয়া চাহিয়া রহিল। লোকটা খুব লম্বা নয়, বেঁটে ধরণের, শক্ত হাত পা, পিঠে একগাছা বড় ধনুক, একটা বড় বোঁচকা, মাথায় চুল লম্বা লম্বা, গলায় রাঙা ও সবুজ হিংলাজের মালা। সে অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া ডাকিয়া বলিল, ওখানে কি খুঁজচো। পরে লোকটির সঙ্গে তাহার আলাপ হইল। সে জাতিতে সাঁওতাল, অনেক দূরে কোথায় দুমকা জেলা আছে, সেখানে বাড়ি। অনেক দিন বর্ধমানে ছিল, বাঁকা বাঁকা বাংলা বলে, পায়ে হাঁটিয়া সেখান হইতে আসিতেছে। গন্তব্য স্থান অনির্দেশ্য—এরূপে যতদূর যাওয়া যায় যাইবে, সঙ্গে তীর ধনুক আছে, পথের ধারে বনে মাঠে যাহা শিকার মেলে—তাহাই খায়। সম্প্রতি একটা কি পাখি মারিয়াছে, মাঠের কোন ক্ষেত হইতে গোটাকয়েক বড় বড বেগুনও তুলিয়াছে—তাহাই পুড়াইয়া খাইবার যোগাড়ে শুক্‌নো লতা-কাঠি কুড়াইতেছে। অপু বলিল, কি পাখি দেখি? লোকটা ঝোলা হইতে বাহির করিয়া দেখাইল একটা বড় হরিয়াল ঘুঘু। সত্যিকারের তীর ধনুক—যাহাতে সতিকারের শিকার সম্ভব হয়—অপু কখনও দেখে নাই। বলিল, দেখি একগাছা তীর তোমার? পরে হাতে লইয়া দেখিল, মুখে শক্ত লোহার ফলা, পিছনে বুনোপাখির পালক বাঁধা—অদ্ভুত কৌতুহলপ্রদ ও মুগ্ধকর জিনিস!—

—আচ্ছা এতে পাখি মরে, আর কি মরে?

লোকটা উত্তর দিল, সবই মারা যায়—খরগোস, শিয়াল, বেঁজী, এমন কি বাঘ পর্যন্ত। তবে বাঘ মারিবার সময় তীরের ফলায় অন্য একটা লতার রস মাখাইয়া লইতে হয়।...তাহার পর সে তুঁত গাছতলায় শুক্‌না পাতা-লতার আগুন জ্বালিল। অপুর পা আর সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না—মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, লোকটা পাখিটার পালক ছাড়াইয়া আগুনে ঝলসাইতে দিল, বেগুনগুলাও পুড়াইতে দিল।

বেলা অত্যন্ত পড়িলে অপু বাড়ি রওনা হইল। আহার শেষ করিয়া লোকটা তখন তাহার বোঁচকা ও তীর ধনুক লইয়া রওনা হইয়াছে। এ রকম মানুষ সে তো কখনো দেখে নাই। বাঃ—যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে

খাওয়া—পথে পথে তীর ধনুক দিয়া শিকার করা, বনের লতাপাতা কুড়াইয়া গাছতলায় দিনের শেষে বেগুন পুড়াইয়া খাওয়া! গোটা আষ্টেক বড় বড় বেগুন সামান্য একটু নুনের ছিটা দিয়া গ্রাসের পর গ্রাস তুলিয়া কি করিয়াই নিমেষের মধ্যে সাবাড় করিয়া ফেলিল!…

মাস কয়েক কাটিয়া গেল। সকালবেলা স্কুলের ভাত চাহিতে গিয়া অপু দেখিল রান্না চড়ানো হয় নাই। সর্বজয়া বলিল, আজ যে কুলুইচণ্ডী পূজো—আজ স্কুলে যাবি কি ক'রে?…ওরা বলে গিয়েচে ওদের পূজোটা সেরে দেওয়ার জন্যে—পূজোবারে কি আর স্কুলে যেতে পারবি? বড্ড দেরী হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, তাই বৈ কি? আমি পূজো করতে গিয়ে স্কুল কামাই করি আর কি? আমি ওসব পারবো না, পূজোটুজো আমি আর করব কি ক'রে, রোজই তো পূজো লেগে থাকবে আর আমি বুঝি রোজ রোজ—তুমি ভাত নিয়ে এস, আমি ওসব শুনছিনে—

—লক্ষ্মী বাবা আমার। আচ্ছা, আজকের দিনটা পূজোটা সেরে নে। ওরা বলে গিয়েচে ওপাড়াসুদ্ধ পূজো হবে। চাল পাওয়া যাবে এক ধামার কম নয়, খানিক আমার কথা শোনো, শুনতে হয়।

অপু কোন মতেই কথা শুনিল না। অবশেষে না খাওয়াই স্কুলে চলিয়া গেল। সর্বজয়া ভাবে নাই যে, ছেলে সত্যসত্যই তাহার কথা ঠেলিয়া না খাইয়া স্কুলে চলিয়া যাইবে। যখন সত্যই বুঝিতে পারিল, তখন তাহার চোখের জল আর বাধা মানিল না। ইহা সে আশা করে নাই।

অপু স্কুলে পৌছিতেই হেডমাস্টার ফণীবাবু তাহাকে নিজের ঘরে ডাক দিলেন। ফণীবাবুর ঘরেই স্থানীয় ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস, ফণীবাবুই পোস্টমাস্টার। তিনি তখন ডাকঘরের কাজ করিতেছিলেন। বলিলেন, এসো অপূর্ব, তোমার নম্বর দেখবে? আজ ইন্সপেক্টর অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েচে—বোর্ডের এগ্‌জামিনে তুমি জেলায় প্রথম হয়েচে—পাঁচ টাকার একটা স্কলারশিপ পাবে যদি আরো পড়ো তবে। পড়বে তো?

এই সময় তৃতীয় পণ্ডিত মহাশয় ঘরে ঢুকিলেন। ফণীবাবু বলিলেন, ওকে সে কথা এখন বললাম পণ্ডিতমশাই। জিজ্ঞেস করচি আরও পড়বে তো?

তৃতীয় পণ্ডিত বলিলেন, পড়বে না, বাঃ। হীরের টুকরো ছেলে, স্কুলের নাম রেখেছে। ওরা যদি না পড়ে তো পড়বে কে, কেষ্ট তেলির বেটা গোবর্ধন? কিচ্ছু না, আপনি ইন্সপেক্টর অফিসে লিখে দিন যে, ও হাই স্কুলে পড়বে। ওর আবার জিজ্ঞেসটা কি?—ওঃ, সোজা পরিশ্রম করিচি মশাই ওকে ভগ্নাংশটা শেখাতে?

প্রথমটা অপু যেন ভাল করিয়া কথাটা বুঝিতে পারিল না। পরে যখন বুঝিল তখন তাহার মুখে কথা যোগাইল না। হেডমাস্টার একখানা কাগজ বাহির করিয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিলেন—এইখানে একটা নাম সই ক'রে দাও তো। আমি কিন্তু লিখে দিলাম যে, তুমি হাইস্কুলে পড়বে। আজই ইন্সপেক্টর অফিসে পাঠিয়ে দেবো।

সকাল সকাল ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে মায়ের করুণ মুখচ্ছবি বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল। পথের পাশে দুপুরের রৌদ্রভরা শ্যামল মাঠ, প্রাচীন তুঁত বটগাছের ছায়া, ঘন শালপত্রের অন্তরালে ঘুঘুব উদাস কণ্ঠ, সব যেন করুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে এই অপূর্ব করুণ ভাবটি বড় গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। আজিকার দুপুরটির কথা উত্তর জীবনে বড় মনে আসিত তাহার। কত—কতদিন পরে আবার এই শ্যামচ্ছায়াভরা বীথি, বাল্যের অপরূপ জীবনানন্দ, ঘুঘুর ডাক, মাযের মনের একদিনের দুঃখটি—অনন্তের মণিহারে গাঁথা দানাগুলির একটি, পশ্চিম দিগন্তে প্রতি সন্ধ্যায় ছিঁড়িয়া-পড়া, বহুবিস্মৃত মুক্তাবলীব মধ্যে কেমন করিয়া অক্ষয় হইয়াছিল।

বাড়িতে তাহার মাও আজ সারাদিন খায় নাই। ভাত চাহিয়া না পাইয়া ছেলে না খাইয়াই চলিয়া গিয়াছে স্কুলে—সর্বজয়া কি করিয়া খাবারের কাছে বসে? কুলুইচণ্ডার ফলার খাইয়া অপু বৈকালে বেড়াইতে গেল।

গ্রামের বাহিরে ধঞ্চেক্ষেতের ফসল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। চারি ধারে খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। আবার সেই সব রঙীন কল্পনা; সে পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছে! তার স্বপ্নের অতীত! মোটে এক বছর পড়িয়াই বৃত্তি পাইল।··· সুমুখের জীবনের কত ছবিই আবার মনে আসে! ঐ মাঠের পারে রক্ত আকাশটার মত রহস্যস্বপ্নভরা যে অজানা অকূল জীবন-মহাসমুদ্র!···পুলকে সারাদেহ শিহরিয়া উঠে। মাকে এখনও সব কথা বলা হয় নাই। মায়ের মনের বেদনার রঙে যেন মাঠ, ঘাট, অস্তদিগন্তের মেঘমালা রাঙানো। গভীর ছায়াভরা সন্ধ্যা মায়ের দুঃখভরা মনটার মত ঘুলি-ঘুলি অন্ধকার।

দালানের পাশের ঘরে মিটি মিটি প্রদীপ জলিতেছে। সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় ছেলেকে ওবেলার কুলুইচণ্ডী-ব্রতের চিঁড়ে-মুড়কির ফলার খাইতে দিল। নিকটে বসিয়া চাঁপাকলার খোসা ছাড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, ওরা কত দুঃখু করলে আজ। সরকার-বাড়ি থেকে বলে গেল তুই পুজো করবি—তারা খুঁজতে এলে আমি বললাম, সে স্কুলে চলে গিয়েছে। তখন তারা আবার ভৈরব চক্কত্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ওই অত বেলায়—তুই যদি যেতিস্—

আজ না গিয়ে ভাল করিচি মা। আজ হেডমাস্টার বলেচে আমি এগ্‌জামিনে

স্কলারশিপ পেইচি। বড় স্কুলে পড়লে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে পাবো। স্কুলে যেতেই হেডমাস্টার ডেকে বললে—

সর্বজয়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কোথায় পড়তে হবে?

—মহকুমার বড় স্কুলে।

—তা তুই কি বল্লি?

—আমি কিছু বলি নি। পাঁচটা করে টাকা মাসে মাসে দেবে, যদি না পড়ি তবে তো আর দেবে না। ওতে মাইনেও ফ্রি করে নেবে আর ওই পাঁচ টাকাতে বোর্ডিং-এ থাকবার খরচও কুলিয়ে যাবে।

সর্বজয়া আর কোন কথা বলিল না। কি কথা সে বলিবে? যুক্তি এতই অকাট্য যে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। ছেলে স্কলারশিপ পাইয়াছে, শহরে পড়িতে যাইবে, ইহাতে মা-বাপের ছেলেকে বাধা দিয়া বাড়ি বসাইয়া রাখিবার পদ্ধতি কোথায় চলিত আছে? এ যেন তাহার বিরুদ্ধে কোন্ দণ্ডী তার নির্মম অকাট্য দণ্ড উঠাইয়াছে, তাহার দুর্বল হাতের সাধ্য নাই যে ঠেকাইয়া রাখে। ছেলেও ঐদিকে ঝুঁকিয়াছে! আজকার দিনটিই যেন কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল সে। ভবিষ্যতের সহস্র সুখস্বপ্ন কুয়াসার মত অনন্তে বিলীন হইয়া যাইতেছে কেন আজকার দিনটিতে বিশেষ করিয়া?

মাসখানেক পরে বৃত্তি পাওয়ার খবর কাগজে পাওয়া গেল।

যাইবার পূর্বদিন বৈকালে সর্বজয়া ব্যস্তভাবে ছেলের জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। ছেলে কখনও একা বিদেশে বাহির হয় নাই, নিতান্ত আনাড়ী, ছেলে-মানুষ ছেলে। কত জিনিসের দরকার হইবে, কে থাকিবে তখন সেখানে যে মুখে মুখে সব অভাব যোগাইয়া ফিরিবে, সব জিনিস হাতে লইয়া বসিয়া থাকিবে? খুঁটিনাটি—একখানা কাঁথা পাতিবার, একখানি গায়ের—একটি জল খাইবার গ্লাস, ঘরের তৈরী এক শিশি সরের ঘি, এক পুঁটুলি নারিকেল নাড়ু, অপু ফুলকাটা একটা মাঝারি জামবাটিতে দুধ খাইতে ভালবাসে—সেই বাটিটা, ছোট একটা বোতলে মাখিবার চৈ-মিশানো নারিকেল তৈল, আরও কত কি। অপুর মাথার বালিশের পুরানো ওয়াড় বদলাইয়া নূতন ওয়াড় পরাইয়া দিল। দধি-যাত্রায় আবশ্যকীয় দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল। ছেলেকে কি করিয়া বিদেশে চলিতে হইবে সে বিষয়ে সহস্র উপদেশ দিয়াও তাহার মনে তৃপ্তি হইতেছিল না। ভাবিয়া দেখিয়া যেটি বাদ দিয়াছে মনে হয় সেটি তখনি আবার ডাকিয়া বলিয়া দিতেছিল।

—যদি কেউ মারে টারে, কত দুষ্টু ছেলে তো আছে, অমনি মাষ্টারকে বলে দিবি—বুঝলি? রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়িস নে যেন ভাত খাবার আগে! এ তো বাড়ি নয় যে কেউ তোকে ওঠাবে—খেয়ে তবে ঘুমুবি—নয়তো তাদের বল্‌বি, যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দাও—বুঝলি তো?

সন্ধ্যার পর সে কুণ্ডুদের বাড়ি মনসার ভাসান শুনিতে গেল। অধিকারী নিজে বেহুলা সাজিয়া পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে—বেশ গানের গলা। খানিকটা শুনিয়া তাহার ভাল লাগিল না। শুধু চড়া কাটা ও নাচ সে পছন্দ করে না,—যুদ্ধ নাই, তলোয়ার-খেলা নাই, যেন পান্‌সে-পান্‌সে।

তবুও আজিকার রাতটি বড় ভাল লাগিল তাহার। এই মনসা-ভাসানোর আসর, এই নতুন জায়গা, এই অচেনা গ্রাম্য বালকের দল, ফিরিবার পথে তাহাদের পাড়ার বাঁকে প্রস্ফুটিত হেনা ফুলের গন্ধ ভরা নৈশ বাতাস জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে কেমন মায়াময় মনে হয়।...

রাত্রে সে আরও দু-একটা জিনিস সঙ্গে লইল। বাবার হাতের লেখা একখানা গানের খাতা, বাবার উদ্ভট শ্লোকের খাতাখানা বড় পেঁটরাটা হইতে বাহির করিয়া রাখিল—বড় বড় গোটা গোটা ছাঁদের হাতের লেখাটা বাবার কথা মনে আনিয়া দেয়। গানগুলির সঙ্গে বাবার গলার সুর এমনভাবে জড়াইয়া আছে যে, সেগুলি পড়িয়া গেলেই বাবার সুর কানে বাজে। নিশ্চিন্দিপুরের কত ক্রীড়াক্লান্ত শান্ত সন্ধ্যা, মেঘমেদুর বর্ষামধ্যাহ্ন, কত জ্যোৎস্না-ভরা রহস্যময়ী রাত্রি বিদেশ-বিভুঁ-এর সেই দুঃখ-মাখানো দিনগুলির সঙ্গে এই গানের সুর যেন জড়াইয়া আছে—সেই দশাশ্বমেধ ঘাটের রাণা, কাশীর পরিচিত সেই বাঙাল কথকঠাকুর।

সর্বজয়ার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, হয়ত ছেলে শেষ পর্যন্ত বিদেশে যাইবার মত করিবে না। কিন্তু তাহার অপু যে পিছনের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। সে যে এত খাটিয়া, একে-ওকে বলিয়া কহিয়া তাহার সাধ্যমত যতটা কুলায়, ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন একটা খাড়া করিয়া দিয়াছিল—ছেলে তাহা পায়ে দলিয়া যাইতেছে—কি জানি কিসের টানে! কোথায়? তাহার স্নেহদুর্বল দৃষ্টি তাহাকে দেখিতে দিতেছিল না যে, ছেলের ডাক আসিয়াছে বাহিরের জগৎ হইতে। সে জগৎটা তাহার দাবী আদায় করিতে তো ছাড়িবে না—সাধ্য কি সর্বজয়ার যে চিরকাল ছেলেকে আঁচলে লুকাইয়া রাখে?

যাত্রার পূর্বে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের দধির কৌটা অপুর কপালে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল—বাড়ি আবার শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসবি কিন্তু, তোদের ইতুপুজোর ছুটি দেবে তো?

—হ্যাঁ, ইস্কুলে বুঝি ইতুপূজোয় ছুটি হয়? তাতে আবার বড ইস্কুল। সেই আবার আসবো গরমের ছুটিতে।

ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় উচ্ছ্বসিত চোখের জল বহু কষ্টে সর্বজয়া চাপিয়া রাখিল।

অপু মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া ভারী বোঁচকাটা পিঠে ঝুলাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

মাঘ মাসের সকাল। কাল একটু একটু মেঘ ছিল, আজ মেঘ-ভাঙা রাঙা রোদ কুণ্ডুবাড়ির দো-ফলা আম গাছেব মাথায় ঝলমল করিতেছে—বাড়ির সামনে বাঁশবনের তলায় চকচকে সবুজ পাতার আড়ালে বুনোআদার রঙীন ফুল যেন দূর ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের কত সকালের বুকে।

সবে ভোর হইয়াছে। দেওয়ানপুর গবর্নমেণ্ট মডেল ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছেলেদের বোর্ডিং-ঘরের সব দরজা এখনও খুলে নাই। কেবল স্কুলের মাঠে দুইজন শিক্ষক পায়চারী কবিতেছেন। সম্মুখের রাস্তা দিয়া এত ভোরেই গ্রাম হইতে গোয়ালারা বাজারে দুধ বেচিতে আসিতেছিল, একজন শিক্ষক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—দাঁড়াও, ও ঘোষের পো, কাল দুধ দিয়ে গেলে তো নিছক জল, আজ দেখি কেমন দুধটা!

অপর শিক্ষকটি পিছু পিছু আসিয়া বলিলেন, নেবেন না সত্যেনবাবু, একটু বেলা না গেলে ভাল দুধ পাওয়া যায় না। আপনি নতুন লোক, এসব জায়গার গতিক জানেন না, যার-তার কাছে দুধ নেবেন না—আমার জানা গোয়ালা আছে, কিনে দেবো বেলা হলে।

বোর্ডিং-বাড়ির কোণের ঘরে দরজা খুলিয়া একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল ও দূরের করোনেশন ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সত্যেনবাবুর সঙ্গী শিক্ষকটির নাম রামপদবাবু, তিনি ডাকিয়া বলিলেন—ওহে সমীর, ওই যে ছেলেটি এবার ডিষ্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেয়েছে, সে কাল রাত্রে এসেছে না?

ছেলেটি বলিল, এসেছে স্যার, ঘুমুচ্ছে এখনও। ডেকে দেবো?—পরে সে জানালার কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ব, ও অপূর্ব!

ছিপছিপে পাতলা চেহারা, চৌদ্দ পনেরো বৎসরের একটি খুব সুন্দর ছেলে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। রামপদবাবু বলিলেন, তোমার নাম অপূর্ব! ও!—এবার আড়বোয়ালের স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়েছে?—বাড়ি কোথায়? ও! বেশ বেশ, আচ্ছা, স্কুলে দেখা হবে।

সমীর জিজ্ঞাসা করিল, স্যার, অপূর্ব কোন্ ঘরে থাকবে এখনও সেকেন্ মাস্টার মশায় ঠিক করে দেন নি। আপনি একটু বলবেন?

রামপদবাবু বলিলেন, কেন তোর ঘরে তো সীট খালি রয়েছে—ওখানেই থাকবে। সমীর বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল, বলিল,—আপনি একটু বলবেন তাহলে সেকেন্—

রামপদবাবু চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? পরে পরিচয় শুনিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল। হয়ত বোর্ডিং-এর নিয়ম নাই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমানো, সে না জানিয়া প্রথম দিনটাতেই হয়ত একটা অপরাধের কাজ করিয়া বসিয়াছে।...

একটু বেলা হইলে সে স্কুল-বাড়ি দেখিতে গেল। কাল অনেক রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই। রাত্রের অন্ধকারে আবছায়া-দেখিতে-পাওয়া সাদা রং-এর প্রকাণ্ড স্কুল বাড়িটা তাহার মনে একটা আনন্দ ও রহস্যের সঞ্চার করিয়াছিল।

এই স্কুলে সে পড়িতে পাইবে!...কতদিন শহরে থাকিতে তাহাদের ছোট স্কুলটা হইতে বাহির হইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে দেখিতে পাইত—হাই স্কুলের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডে ছেলেরা সকলেই এক ধরণের পোশাক পরিয়া ফুটবল খেলিতেছে। তখন কতদিন মনে হইয়াছে এত বড় স্কুলে পড়িতে যাওয়া কি তাহার ঘটিবে কোন কালে—এসব বড়লোকের ছেলেদের জন্য। এতদিনে তাহার আশা পূর্ণ হইতে চলিল।

বেলা দশটার কিছু আগে বোর্ডিং-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিধুবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে কোন্ ঘরে আছে, নাম কি, বাড়ি কোথায়, নানা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বলিলেন, সমীর ছোকরা ভাল, একসঙ্গে থাকবে, বেশ পড়াশুনো হবে। এখানকার পুকুরের জলে নাইবে না কখনো—জল ভালো নয়, স্কুলের ইন্দারার জলে ছাড়া—আচ্ছা যাও, এদিকে আবার ঘণ্টা বাজবার সময় হ'ল।

সাড়ে দশটায় ক্লাস বসিল। প্রথম বই খাতা হাতে ক্লাস-রুমে ঢুকিবার সময় তাহার বুক আগ্রহের ঔৎসুক্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। বেশ বড় ঘর,

নীচু চৌকির উপর মাস্টারের চেয়ার পাতা—খুব বড় ব্ল্যাকবোর্ড। সব ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁতভাবে সাজানো। চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, ডেস্ক সব ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে, কোথাও একটু ময়লা বা দাগ নাই।

মাস্টার ক্লাসে ঢুকিলে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। এ নিয়ম পূর্বে সে যে সব স্কুলে পড়িত সেখানে দেখে নাই। কেউ স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলে উঠিয়া দাঁড়াইবার কথা মাস্টার শিখাইয়া দিতেন। সত্য সত্যই এতদিন পরে সে বড় স্কুলে পড়িতেছে বটে!...

জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল পাশের ক্লাস-রুমে একজন কোট-প্যাণ্টপরা মাস্টার বোর্ডে কি লিখিতে দিয়া ক্লাসের এদিক-ওদিক পায়চারী করিতেছেন—চোখে চশমা, আধপাকা দাড়ি বুকের উপর পড়িয়াছে, গম্ভীর চেহারা। সে পাশের ছেলেকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, উনি কোন্‌ মাস্টার ভাই?

ছেলেটি বলিল—উনি মিঃ দত্ত, হেডমাস্টার—ক্রিশ্চান, খুব ভাল ইংরেজি জানেন।

অপূর্ব শুনিয়া নিরাশ হইল যে তাহাদের ক্লাসে মিঃ দত্তের কোন ঘণ্টা নাই। থার্ড ক্লাসের নিচে কোন ক্লাসে তিনি নাকি নামেন না।

পাশেই স্কুলের লাইব্রেরী, ন্যাপ্‌থলিনের গন্ধ-ভরা পুরোনো বই-এর গন্ধ আসিতেছিল। ভাবিল এ ধরণের ভরপুর লাইব্রেরীর গন্ধ কি কখনো ছোটোখাটো স্কুলে পাওয়া যায়?

ঢং ঢং করিয়া ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ে—আড়বোয়ালের স্কুলের মত একখণ্ড রেলের পাটির লোহা বাজায় না, সত্যিকারের পেটা ঘড়ি—কি গম্ভীর আওয়াজটা।

টিফিনের পরে ঘণ্টায় সত্যেনবাবুর ক্লাস। চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক, বেশ বলিষ্ঠ গড়ন, ইঁহার মুখ দেখিয়া অপুর মনে হইল ইনি ভারী বিদ্বান বুদ্ধিমানও বটে। প্রথম দিনেই ইঁহার উপর কেমন এক ধরণের শ্রদ্ধা তাহার গড়িয়া উঠিল! সে শ্রদ্ধা আরও গভীর হইল ইঁহার মুখের ইংরিজি উচ্চারণে।

ছুটির পর স্কুলের মাঠে বোর্ডিং-এর ছেলেদের নানা ধরণের খেলা শুরু হইল। তাহাদের ক্লাসের ননী ও সমীর তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অন্য সকল ছেলেদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। সে ক্রিকেট খেলা জানে না, ননী তাহার হাতে নিজের ব্যাটখানা দিয়া তাহাকে বল মারিতে বলিল ও নিজে উইকেট্‌ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া খেলার আইনকানুন বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

খেলার অবসানে যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। খেলার মাঠে পশ্চিম কোণে একটা বড় বাদাম গাছ, অপু গিয়া তাহার তলায় বসিল। একটু দূরে

গবর্ণমেণ্টের দাতব্য ঔষধালয়। বৈকালেও সেখানে একদল রোগীর ভিড় হইয়াছে, তাহাদের নানা কলরবের মধ্যে একটি ছোট মেয়ের কান্নার সুর শোনা যাইতেছে। অপূর্ব কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সের মধ্যে এই আজ প্রথম দিন, যেদিনটি সে মায়ের নিকট হইতে বহুদূরে আত্মী-বন্ধুহীন প্রবাসে একা কাটাইতেছে। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে আজ তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কত কথা মনে ওঠে, এই সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরের জীবনে কি অপূর্ব বৈচিত্র্য, কি ঐশ্বর্য!

সমীর টেবিলে আলো জ্বালিয়াছে। অপুর কিছু ভালো লাগিতেছিল না—বিছানায় গিয়া শুইয়া রহিল। খানিকটা পরে সমীর পিছনে চাহিয়া তাহাকে সে অবস্থায় দেখিয়া বলিল, পড়বে না?

অপু বলিল, একটু পরে—এই উঠেচি।

—আলোটা জ্বালিয়ে রাখো, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখুনি দেখতে আসবে, শুয়ে আছ দেখলে বকবে।

অপু উঠিয়া আলো জ্বালিল। বলিল, রোজ আসেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট! সেকেণ্ড মাস্টার তো—না?

সমীরের কথা ঠিক। অপু আলো জ্বালিবার একটু পরেই বিধুবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম লাগলো আজ ক্লাসে? পড়াশুনো সব দেখে নিয়েচ তো? সমীর, ওকে একটু দেখিয়ে দিস্ তো কোথায় কিসের পড়া। ক্লাসের রুটিনটা ওকে দে বরং—সব বই কেনা হয়েচে তো তোমার? ...জিওমেট্রি নেই? আচ্ছা, আমার কাছে পাওয়া যাবে, এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা, কাল সকালে আমার ঘর থেকে গিয়ে নিয়ে এসো একখানা।

বিধুবাবু চলিয়া গেলে সমীর পড়িতে বসিল; কিন্তু পিছনে চাহিয়া পুনরায় অপূর্বকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে আসিয়া বলিল, বাড়ির জন্যে মন কেমন করচে—না?

তাহার পর সে খাটের ধারে বসিয়া তাহাকে বাড়ির সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিল, তোমার মা একা থাকেন বাড়িতে? আর কেউ না? তাঁর তো থাকতে কষ্ট হয়।

অপূর্ব বলিল, ও কিসের ঘণ্টা ভাই।

—বোর্ডিংএর খাওয়ার ঘণ্টা—চলো যাই।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুই-তিনজন ছেলে তাহাদের ঘরে আসিল। এই সময়টা আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভয় নাই, তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া

দিয়াছেন। শীতের রাত্রে আর বড় একটা বাহির হন না। ছেলেরা এই সময়ে এঘর-ওঘর বেড়াইয়া গল্পগুজবের অবকাশ পায়। সমীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, এসো নৃপেন, এই আমার খাটে বসো—শিশির যাও ওখানে—অপূর্ব জানো তাস খেলা?

নৃপেন বলিল, হেডমাস্টার আসবে না তো

শিশির বলিল, হ্যাঁ, এত রাত্তিরে আবার হেডমাস্টার—

অপূর্বও তাস খেলিতে আসিল বটে কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, মায়ের ও দিদির সঙ্গে কতকাল আগে খেলার সে বিদ্যা লইয়া এখানে তাসখেলা খাটিবে না। তাসখেলায় ইহারা সব ঘুণ, কোন্ হাতে কি তাস আছে সব ইহাদের নখদর্পণে। তাহা ছাড়া এতগুলি অপরিচিত ছেলের সম্মুখে তাহাকে তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগে পাইয়া বসিল; অনেক লোকের সামনে সে মোটেই স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলিতে পারে না। মনে হয়, কথা বলিলেই হয়ত ইহারা হাসিয়া উঠিবে। সে সমীরকে বলিল, তোমরা খেলো, আমি দেখি। শিশির ছাড়ে না। বলিল, তিনদিনে শিখিয়ে দোব, ধর দিকি তাস।

বাহিরে যেন কিসের শব্দ হইল। শিশির সঙ্গে সঙ্গে চুপ করিয়া গেল এবং হাতের তাস লুকাইয়া পরের পাঁচ মিনিট এমন অবস্থায় রহিল যে সেখানে একটা কাঠের পুতুল থাকিলে সেটাও তাহার অপেক্ষা বেশী নড়িত। সকলেরই সেই অবস্থা। সমীর টেবিলের আলোটা একটু কমাইয়া দিল। আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না। নৃপেন একবার দরজার ফাঁক দিয়া বাহিরের বারান্দাতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসিয়া নিজের তাস সমীরের তোশকের তলা হইতে বাহির করিয়া বলিল, ও কিছু না, এস এস—তোমার হাতের খেলা শিশির।

রাত এগারোটার সময় পা টিপিয়া টিপিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলে অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের রোজ এমনি হয় নাকি? কেউ টের পায় না? আচ্ছা, চুপ ক'রে বসেছিল, ও ছেলেটা কে?

ছেলেটাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। ঘরে ঢুকিবার পর হইতে সে বেশী কথা বলে নাই, তাহার খাটের কোণটিতে নীরবে বসিয়াছিল। বয়স তের-চৌদ্দ হইবে, বেশ চেহারা। ইহাদের দলে থাকিয়াও সে এতদিনে তাসখেলা শেখে নাই, ইহাদের কথাবার্তা হইতে অপূর্ব বুঝিয়াছিল।

পরদিন শনিবার। বোর্ডি-এর বেশীর ভাগ ছেলেই সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে ছুটি লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। অপূর্ব মোটে দুই দিন হইল আসিয়াছে; তাহা ছাড়া, যাতায়াতে খরচপত্রও আছে, কাজেই তাহার যাওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার মনে হইল, এই শনিবারে মাকে দেখিয়া

আসিলে মন্দ হইত না—সারা শনিবারের বৈকালটা কেমন খালি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছিল।

সন্ধ্যার সময় সে ঘরে আসিয়া আলো জ্বালিল। ঘরে সে একা, সমীর বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, এ রকম চুণকাম করা ঘরে একা থাকিবার সৌভাগ্য কখনও তাহার হয় নাই, সে খুশী হইয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজের খাটে বসিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, এইবার সমীরের মত একটা টেবিল আমার হয়? একটা টেবিলের দাম কত, সমীরকে জিজ্ঞাসা করবো।

পরে সে আলোটা লইয়া গিয়া সমীরের টেবিলে পড়িতে বসিল। রুটিনে লেখা আছে—সোমবারে পাটীগণিতের দিন। অঙ্ককে সে বাঘ বিবেচনা করে। বইখানা খুলিয়া সভয়ে প্রশ্নাবলীর অঙ্ক কয়েকটি দেখিতেছে, এমন সময় দরজা দিয়া ঘরে কে ঢুকিল। কাল রাত্রের সেই শান্ত ছেলেটি? অপু বলিল—এসো এসো ব'সো। ছেলেটি বলিল, আপনি বাড়ি যান নি?

অপু বলিল, না, আমি তো মোটে পরশু এলাম, বাড়িও দূরে। গিয়ে আবার সোমবার আসা যাবে না।

ছেলেটি অপুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অপু বলিল—বোর্ডিং-এ যে আজ একেবারেই ছেলে নেই, সব শনিবারেই কি এমনই হয়? তুমি বাড়ি যাও নি কেন? তোমার নামটা কি জানি নে ভাই।

—দেবব্রত বসু—আপনার মনে থাকে না। বাড়ি গেলাম না কি ইচ্ছে ক'রে? সেকেন মাস্টার ছুটি দিলে না। ছুটি চাইতে গেলাম, বললে, আর শনিবারে গেলে আবার এ শনিবারে কি? হবে না, যাও।

তাহার পর সে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প করিল। তাহার বাড়ি শহর হইতে মাইল বারো দূরে, ট্রেনে যাইতে হয়। সে শনিবারে বাড়ি না গিয়া থাকিতে পারে না, মন হাঁপাইয়া উঠে, অথচ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছুটি দিতে চায় না। তাহার কথাবার্তার ধরণে অপু বুঝিতে পারিল যে, বাড়ি না যাইতে পারিয়া মন আজ খুবই খারাপ, অনবরত বাড়ির কথা ছাড়া অন্য কথা সে বড় একটা বলিল না।

দেবব্রত খানিকটা বসিয়া থাকিয়া অপুর বালিশটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকটা আপন মনে বলিল, সামনের শনিবারে ছুটি দিতেই হবে, সেকেন্ মাস্টার না দেয়, হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে বলবো।

অপু এ ধরণের দূর প্রবাসে একা রাত্রিবাস করিতে আদৌ অভ্যস্ত নয়, চিরকাল মা-বাপের কাছে কাটাইয়াছে, আজকার রাত্রিটা তাহার সম্পূর্ণ উদাস ও নিঃসঙ্গ ঠেকিতেছিল।

দেবব্রত হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বলিল, আপনি দেখেন নি বুঝি? জানেন না? আসুন না আপনাকে দেখাই, আসুন উঠে।

পরে সে অপুর হাত ধরিয়া পিছনের দেওয়ালের বড় জানালাটার কাছে লইয়া গিয়া দেখাইল, সেটার পাশাপাশি দু'টি গরাদ তুলিয়া ফেলিয়া আবার বসানো চলে। একটা লোক অনায়াসে সেই ফাঁকটুকু দিয়া ঘরে যাতায়াত করিতে পারে। বলিল, শুধু সমীরদা আর গণেশ জানে, কাউকে যেন বলবেন না।

একটু পরে বোর্ডিং-এর খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল।

খাওয়ার আগে অপু বলিল, আচ্ছা ভাই, এ কথাটার মানে জানো?

এক খণ্ড ছাপা কাগজ সে দেবব্রতকে দেখিতে দিল। বড় বড় অক্ষরে কাগজখানাতে লেখা আছে—Literature. এত বড় কথা সে এ পর্যন্ত কমই পাইয়াছে, অর্থটা জানিবার খুব কৌতূহল। দেবব্রত জানে না, বলিল, চলুন, খাওয়ার সময় মণিদাকে জিজ্ঞেস করবো।

মণিমোহন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্র, দেবব্রত কাগজখানা দেখাইলে সে বলিল, এর মানে সাহিত্য। এ ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীর বইয়ের বিজ্ঞাপন, কোথায় পেলে?

অপু হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, ওই লাইব্রেরীর কোণটায় কুড়িয়ে পেয়েছি, লাইব্রেরীর ভেতর থেকে কেমন ক'রে উড়ে এসেছে বোধ হয়।

কাগজখানার আঘ্রাণ লইয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন ন্যাপ্‌থলিনের গন্ধটা!

কাগজখানা সে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল।

হেডমাস্টারকে অপু অত্যন্ত ভয় করে। প্রৌঢ় বয়স, বেশ লম্বা, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ—অনেকটা যাত্রার দলের মুনির মত। ভারী নাকি কড়া মেজাজের লোক, শিক্ষকেরা পর্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন। অপু এতদিন তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া আসিতেছিল। একদিন একটা বড় মজা হইল। সত্যেনবাবু ক্লাসে আসিয়া বাংলা হইতে ইংরেজি করিতে দিয়াছেন, এমন সময় হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। হেডমাস্টার বইখানা সত্যেনবাবুর হাত হইতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন—আচ্ছা, এই যে এতে ভিক্টর হিউগো কথাটা লেখা আছে, ভিক্টর হিউগো কে ছিলেন জানো?—ক্লাস নীরব। এ নাম কেহ জানে না। পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ফোর্থ ক্লাসের ছেলে, কেহ নামও শোনে নাই।—

কে বলতে পারো—তুমি—তুমি?

ক্লাসে স্থচ পড়িলে তাহার শব্দ শোনা যায়।

অপুর অস্পষ্ট মনে হইল নামটা—যেন তাহার নিতান্ত অপরিচিত নয়,

কোথাও যেন সে পাইয়াছে ইহার আগে। কিন্তু তাহার পালা আসিল ও চলিয়া গেল, তাহার মনে পড়িল না। ওদিকের বেঞ্চিটা ঘুরিয়া যখন প্রশ্নটা তাহার সম্মুখের বেঞ্চের ছেলেদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে সেই পুরাতন 'বঙ্গবাসী'গুলার মধ্যে কোথায় সে এ-কথাটা পড়িয়াছে—বোধ হয়, সেই 'বিলাত যাত্রীর চিঠি'র মধ্যে হইবে—তাহার মনে পড়িয়াছে! পরক্ষণেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ফরাসী দেশের লেখক, খুব বড় লেখক। প্যারিসে তাঁর পাথরের মূর্তি আছে, পথের ধারে।

হেডমাস্টার বোধ হয় এ ক্লাসের ছেলের নিকট এ ভাবের উত্তর আশা করেন নাই, তাহার দিকে চশমা-আঁটা জ্বলজ্বলে চোখে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই অপু অভিভূত ও সঙ্কুচিত অবস্থায় চোখ নামাইয়া লইল। হেডমাস্টার বলিলেন, আচ্ছা, বেশ। পথের ধারে নয়, বাগানের মধ্যে মূর্তিটা আছে—বসো, বসো সব।

সত্যেনবাবু তাহার উপর খুব সন্তুষ্ট হইলেন। ছুটির পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। ছোটখাটো বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একাই থাকেন। স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার করিয়া তাহাকে দিলেন, নিজেও খাইলেন। বলিলেন, আর একটু ভাল ক'রে গ্রামারটা পডবে—আমি তোমাকে দাগ দিয়ে দেখিয়ে দেবো।

অপুর লজ্জাটা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, সে আলমারিটার দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওতে আপনার অনেক বই আছে?

সত্যেনবাবু আলমারি খুলিয়া দেখাইলেন। বেশীর ভাগই আইনের বই, শীঘ্রই আইন পরীক্ষা দিবেন। একখানা বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এখানা তুমি পড়ো—বাংলা বই, ইতিহাসের গল্প।

অপুর আরও দু'একখানা বই নামাইয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না।

মাস দুই-তিনের মধ্যে বোর্ডিং-এর সকলের সঙ্গে তাহার খুব জানাশোনা হইয়া গেল।

হয়ত তাহা ঘটিত না, কারণ তাহার মত লাজুক ও মুখচোরা প্রকৃতির ছেলের পক্ষে সকলের সহিত মিশিয়া আলাপ করিয়া লওয়াটা একরূপ সম্ভবের বাহিরের ব্যাপার, কিন্তু প্রায় সকলেই তাহার সহিত যাচিয়া আসিয়া আলাপ

করিল। তাহাকে কে খুশী করিতে পারে—ইহা লইয়া দিনকতক যেন বোর্ডিং-এর ছেলেদের মধ্যে একটা পাল্লা দেওয়া চলিল। খাবার-ঘরে খাইতে বসিবার সময় সকলেরই ইচ্ছা—অপু তাহার কাছে বসে, এ তাড়াতাড়ি বড় পিঁড়িখানা পাতিয়া দিতেছে ও ঘি, খাইবার নিমন্ত্রণ করিতেছে। প্রথম প্রথম সে ইহাতে অস্বস্তি বোধ করিত, খাইতে বসিয়া তাহার ভাল করিয়া খাওয়া ঘটিত না, কোন রকমে খাওয়া সারিয়া উঠিয়া আসিত। কিন্তু যেদিন ফার্স্ট ক্লাসের রমাপতি পর্যন্ত তাহাকে নিজের পাতের লেবু তুলিয়া দিয়া গেল, সেদিন সে খুশী তো হইলেই, একটু গর্বও অনুভব করিল। রমাপতি বয়সে তাহার অপেক্ষা চার-পাঁচ বৎসরের বড়, ইংরেজি ভাল জানে বলিয়া হেডমাস্টারের প্রিয়পাত্র, মাস্টারেরা পর্যন্ত খাতির করিয়া চলেন, একটু গম্ভীর-প্রকৃতির ছেলেও বটে। খাওয়া শেষ করিয়া আসিতে আসিতে সে ভাবিল, আমি কি ওই শ্যামলালের মত? রমাপতিদা পর্যন্ত সেধে লেবু দিল! দেয় ওদের! কথাই বলে না।

দেবব্রত অন্ধকারের মধ্যে কাঁঠালতলাটায় তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। বলিল—আপনার ঘরে যাবো অপূবদা, একটা টাস্ক একটু বলে দেবেন?

পরে সে হাসিমুখে বলিল, আজ বুধবার, আর চারদিন পরেই বাড়ি যাবো। শনিবারটা ছেড়ে দিন, মধ্যে আর তিনটে দিন। আপনি বাড়ি যাবেন না, অপূর্বদা?

প্রথম কয়েকমাস কাটিয়া গেল। স্কুল-কম্পাউণ্ডের সেই পাতাবাহার ও চীনা-জবার ঝোপটা অপুর বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে রবিবারের শান্ত দুপুরের রৌদ্রে পিঠ দিয়া শুকনা পাতার রাশির মধ্যে বসিয়া বসিয়া বই পড়ে। ক্লাসের বই পড়িতে তাহার ভাল লাগে না, সে-সব বই-এর গল্পগুলি সে মাস-খানেকের মধ্যেই পড়িয়া শেষ করিয়াছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, স্কুল লাইব্রেরীতে ইংরেজি বই বেশী, যে বইগুলার বাঁধাই চিত্তাকর্ষক, ছবি বেশী, সেগুলা সবই ইংরেজি। ইংরেজি সে ভাল বুঝিতে পারে না, কেবল ছবির তলাকার বর্ণনাটা বোঝা মাত্র।

একদিন হেডমাস্টারের অফিসে তাহার ডাক পড়িল। হেডমাস্টার ডাকিতেছেন শুনিয়া তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ভয়ে ভয়ে অফিস ঘরের দুয়ারের কাছে গিয়া দেখিল, আর একজন সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া আছেন। হেডমাস্টারের ইঙ্গিতে সে ঘরে ঢুকিয়া দু'জনের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকটি ইংরেজিতে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও সামনের একখানা

পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি দেখিয়া লইয়া একখানি ইংরেজি বই তাহার হাতে দিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, এই বইখানা তুমি পডতে নিয়েছিলে ?

অপু দেখিল, বইখানা The world of Ice, মাসখানেক আগে লাইব্রেরী হইতে পড়িবার জন্য সে লইয়াছিল। সবটা ভাল বুঝিতে পারে নাই।

সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ইয়েস—

হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, ইয়েস স্যর।

অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিতেছিল, থতমত খাইয়া বলিল, ইয়েস স্যর—

ভদ্রলোকটি পুনরায় ইংরেজিতে বলিলেন, স্লেজ কাকে বলে ?

অপু ইহার আগে কখনও ইংরেজি বলিতে অভ্যাস করে নাই, ভাবিয়া ভাবিয়া ইংরেজিতে বানাইয়া বলিল, এক ধরণের গাড়ি কুকুরে টানে। বরফের উপর দিয়া যাওয়ার কথাটা মনে আসিলেও হঠাৎ সে ইংরেজি করিতে পারিল না।

—অন্য গাড়ির সঙ্গে স্লেজের পার্থক্য কি ?

অপু প্রথমে বলিল, স্লেজ হ্যাজ—তারপরই তাহার মনে পড়িল—আর্টিকৃল-সংক্রান্ত কোন গোলযোগ এখানে উঠিতে পারে। 'এ' বা 'দি' কোনটা বলিতে হইবে তাড়াতাড়ির মাথায় ভাবিবার সময় না পাইয়া সোজাসুজি বহুবচনে বলিল, স্লেজেস্ হ্যাভ নো হুইল্স—

—আরোরা বোরিয়ালিস কাহাকে বলে ?

অপুর চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাইল। মাত্র দিন কতক আগে সত্যেনবাবুর কি একখানা ইংরেজি বইতে সে ইহার ছবি দেখিয়াছিল। সে জায়গাটা পড়িয়া মানে না বুঝিলেও এ-কথাটা খুব গাল-ভরা বলিয়া সত্যেনবাবুর নিকট উচ্চারণ জানিয়া মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বলিল, অরোরা বোরিয়ালিস ইজ এ কাইণ্ড অব্ এ্যাটমোস্‌ফেরিক ইলেকট্রিসিটি—

ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিল, আগন্তুক ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, আন্-ইউজুয়াল ফর এ বয় অব্ ফোর্থ ক্লাস। কি নাম বললেন ? এ স্ট্রাইকিংলি হ্যাণ্ডসাম বয়—বেশ বেশ।

অপু পরে জানিয়াছিল তিনি স্কুল-বিভাগের বড় ইন্সপেক্টর, না বলিয়া হঠাৎ স্কুল দেখিতে আসিয়াছিলেন।

পরে সে রমাপতির ঘরে আঁক বুঝিতে যায়। রমাপতি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, নিজের সীট বেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে। টেবিলের উপর পাথরের দোয়াতদানি, নতুন নিব পরানো কলমগুলি সাফ করিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে,

বিছানাটি ধবধবে, বালিসের উপর তোয়ালে। অপুর সঙ্গে পড়া-শুনার কথা-বার্তা মিটিবার পর সে বলিল, এবার তোমায় সরস্বতী পুজোতে ছোট ছেলেদের লীডার হ'তে হবে, আর তো বেশী দেরিও নেই, এখন থেকেই চাঁদা আদায়ের কাজে বেরুনো চাই।

উঠিবার সময় ভাবিল, রমাপতিদার মত এই রকম একটা দোয়াতদানি হয় আমার? চমৎকার ফুলকাটা? লিখে আরাম আছে। হ্যাঁ, চাঁদা চাইতে যাবো বৈ কি? ওসব হবে না আমায় দিয়ে।—আসল কথা সে বেজায় মুখচোরা, কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেবব্রত সমীরের টেবিলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছে। অপু বলিল, কি দেবু বাড়ি যাও নি আজ?

দেবব্রত মাথা না তুলিয়াই বলিল, দেখুন না কাণ্ড সেকেন মাস্টারের, ছুটি দিলে না—ও শনিবারে বাড়ি যাই নি, আপনি তো জানেন অপূর্বদা! বললে, তুমি ফি শনিবারে বাড়ি যাও, তোমার ছুটি হবে না।

দেবব্রতর জন্য অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। বাড়ির জন্য তাহার মনটা সারা সপ্তাহ ধরিয়া কি রকল তৃষিত থাকে অপু সে সন্ধান রাখে। মনে ভাবিল, ওরই ওপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যত কড়াকড়ি। থাকতে পারে না, ছেলেমানুষ,—আচ্ছা লোক!

অপু বলিল, রমাপতিদাকে দিয়ে আমি একবার বিধুবাবুকে বলাবো?

দেবব্রত ম্লান হাসিয়া বলিল, কাকে বলাবেন? তিনি আছেন বুঝি? মেয়ের জন্যে নিধে বেহারাকে দিয়ে বাজার থেকে কমলালেবু আনালেন, কপি আনালেন। তিনি বাড়ি চলে গিয়েছেন কোন্ কালে, সে দুটোর ট্রেনে—আর এখন বলেই বা কি হবে, আমাদের লাইনের গাড়িও তো চলে গিয়েছে—আজ আর গাড়ি নেই।

অপু তাহাকে ভুলাইবার জন্য বলিল, এসো একটা খেলা করা যাক। তুমি হও চোর, একখানা বই চুরি ক'রে লুকিয়ে থাকো, আমি ডিটেকটিভ হবো, তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবো—কিংবা ওইটে যেন একটা নক্সা, তুমি ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পালাবে, আমি তোমাকে খুঁজে বার করবো—পড়ো নি 'নিহিলিস্ট রহস্য'? চমৎকার বই—উঃ কি সে কাণ্ড? প্রতুলের কাছে আছে, চেয়ে দেবো।

দেবব্রতের খেলাধূলা ভাল লাগিতেছিল না, তবুও অপুর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া মাথা তুলিয়া বসিল। বলিল, আমি লাইব্রেরীর ওই কোণটায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবো?

—লুকিয়ে থাকতে হবে না, এই কাগজখানা একটা দরকারী নক্সা, তুমি প্যাকেটের মধ্যে নিয়ে যেন রেলগাড়ীতে যাচ্ছো, আমি বার ক'রে দেখে নেবো, তুমি পিস্তল বার ক'রে গুলি করতে আসবে—

দেবব্রতকে লইয়া খেলা জমিল না, একে সে 'নিহিলিস্ট রহস্য' পড়ে নাই, তাহার উপর তাহার মন খারাপ। নতুন ধরণের যুদ্ধ-জাহাজের নক্সাখানা সে বিনা বাধায় ও এত সহজে বিপক্ষের গুপ্তচরকে চুরি করিতে দিল যে, তাহাকে এসব কার্যে নিযুক্ত করিলে রুশীয় সম্রাটকে পতনের অপেক্ষায় ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিদ্রোহের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। বোর্ডিং-এর পিছনে দেওয়ানী আদালতের কম্পাউণ্ডে অর্থী-প্রত্যর্থীর ভিড় কমিয়া গিয়াছে। দেবব্রত জানালার দিকে চাহিয়া বলিল, ক্লক-টাওয়ারের ঘড়িতে কটা বেজেচে দেখুন না একবার? কাউকে বলবেন না অপূর্বদা, আমি এখুনি বাড়ি যাবো।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, এখন যাবে কিসে? এই যে বললে ট্রেন নেই?

দেবব্রত স্বর নিচু করিয়া বলিল—এগারো মাইল তো রাস্তা মোটে, হেঁটে যাবো, একটু রাত যদি হ'য়ে পড়ে জ্যোৎস্না আছে, বেশ যাওয়া যাবে।

—এগারো মাইল রাস্তা এখন এই পড়ন্ত বেলায় হেঁটে যেতে যেতে কত রাত হবে জানো? রাস্তা কখনো হেঁটেচো তুমি? তা ছাড়া না ব'লে যাওয়া —যদি কেউ টের পায়?

কিন্তু দেবব্রতকে নিবৃত্ত করা গেল না। সে কখনও রাস্তা হাঁটে নাই তাহা ঠিক, রাত্রি হইবে তাহা ঠিক, বিধুবাবুর কানে কথাটা উঠিলে বিপদ আছে, সবই ঠিক, কিন্তু বাড়ি সে যাইবেই—সে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না—যাহা ঘটে ঘটিবে। অবশেষে অপু বলিল, তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

দেবব্রত বলিল, তা হ'লে সবাই টের পেয়ে যাবে, আপনি তিন-চার মাস বোর্ডিং ছেড়ে কোথাও যান নি, খাবার-ঘরে না দেখতে পেলে সবাই জানতে পারবে।

দেবব্রত চলিয়া গেলে অপু কাহারও নিকট সে কথা বলিল না বটে, কিন্তু পরদিন সকালে খাওয়ার-ঘরে দেখা গেল দেবব্রতের অনুপস্থিতি অনেকে লক্ষ্য করিয়াছে। রবিবার বৈকালে সমীর আসিলে তাহাকে সে কথাটা বলিল। পরদিন সোমবার দেবব্রত সকলের সম্মুখে কি করিয়া বোর্ডিং-এর কম্পাউণ্ডে ঢুকিবে বা ধরা পড়িলে কৃতকার্যের কি কৈফিয়ৎ দিবে এই লইয়াই দু'জনে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করিল।

কিন্তু সকালে উঠিয়া দেবব্রতকে সমীরের বিছানায় শুইয়া ঘুমাইতে দেখিয়া

সে বজ্রাহতবৎ অবাক হইয়া গেল। সমীর বাইরে মুখ ধুইতে গিয়াছিল, আসিলে জানা গেল যে, কাল অনেক রাত্রে দেবব্রত আসিয়া জানালায় শব্দ করিতে থাকে। পাছে কেউ টের পায় এজন্য পিছনের জানালার খোলা-গরাদটা তুলিয়া সমীর তাহাকে ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে।

অপু আগ্রহের সঙ্গে গল্প শুনিতে বসিল। কখন সে বাড়ি পৌঁছিল? রাত কত হইয়াছিল, তাহার মা তখন কি করিতেছিলেন?—ইত্যাদি।

রাত অনেক হইয়াছিল। বাড়িতে রাতের খাওয়া প্রায় শেষ হয় হয়। তাহার মা ছোট ভাইকে প্রদীপ ধরিয়া রান্নাঘর হইতে বড়ঘরের রোয়াকে পৌঁছাইয়া দিতেছেন এমন সময়—

অপু কতদিন নিজে বাড়ি যায় নাই। মাকে কতদিন সে দেখে নাই। ইহার মত হাঁটিয়া যাতায়াতের পথ হইলে এতদিনে কতবার যাইত। রেল-গাড়ি, গহনার নৌকা, আবার খানিকটা হাঁটা-পথও। যাতায়াতে দেড় টাকা খরচ, তাহার একমাসের জলখাবার। কোথায় পাইবে দেড় টাকা যে, প্রতি শনিবার তো দূরের কথা, মাসে অন্তত একবারও বাড়ি যাইবে? জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া আনা আষ্টেক পয়সা হইয়াছে, আর একটা টাকা হইলেই—বাড়ি! হয়ত এক টাকা জমিতে জমিতে গরমের ছুটিই বা আসিয়া যাইবে, কে জানে?

পরদিন সকালে হৈ হৈ ব্যাপার। দেবব্রত যে লুকাইয়া কাহাকেও না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল এবং রবিবারে রাত্রে লুকাইয়া বোর্ডিং-এ ঢুকিয়াছে, সে কথা কি করিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। বিধুবাবু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—সে কথা হেডমাস্টারের কানে তুলিয়াছেন। ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিয়া সমীরের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল, সে-ই যে জানালার ভাঙা গরাদ খুলিয়া দেবব্রতকে তাহাদের ঘরে ঢুকাইয়া লইয়াছে সে কথা হেডমাস্টার জানিতে পারিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? সমীর রমাপতির ঘরে গিয়া অবস্থাটা বুঝিয়া আসিল। দেবব্রত নিজেই সব স্বীকার করিয়াছে, সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, কিন্তু সমীরের জানালা খুলিয়া দেওয়ার কথা কিছুই বলে নাই। বলিয়াছে, সে সোমবার খুব ভোরে চুপি চুপি লুকাইয়া বোর্ডিংএ ঢুকিয়াছে, কেহ টের পায় নাই। স্কুল বসিলে ক্লাসে ক্লাসে হেডমাস্টারের সার্কুলার গেল যে, টিফিনের সময় স্কুলের হলে দেবব্রতকে বেত মারা হইবে, সকল ছাত্র ও টিচারদের সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকা চাই।

সমীর গিয়া রমাপতিকে বলিল, আপনি একবার বলুন না রমাপতিদা হেডমাস্টারকে, ছেলেমানুষ থাকতে পারে না বাড়ি না গিয়ে, আপনি তো

জানেন ও কি রকম home-sick ? মিথ্যে মিথ্যে ওকে তিন শনিবার ছুটি দিলেন না সেকেন্ মাস্টার, ওর কি দোষ ?

উপর ক্লাসের ছাত্রদের ডেপুটেশনকে হেডমাস্টার হাঁকাইয়া দিলেন। টিফিনের সময় সকলে একত্র হইলে দেবব্রতকে আনা হইল। ভয়ে তার মুখ শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। হেডমাস্টার বজ্র গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন যে, এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তিনি শুধু বেত মারিয়াই ছাড়িয়া দিতেছেন নতুবা স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতেন।—রীতিমত বেত চলিল। কয়েক ঘা বেত খাইবার পরই দেবব্রত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হেডমাস্টার গর্জন করিয়া বলিলেন, চুপ। bend this way, bend ! মার দেখিয়া, বিশেষ করিয়া দেবব্রতের কান্নায় অপুর চোখে জল আসিয়া গেল। মনে পড়িল, লীলাদের বাড়ি এই রকম মার একদিন সেও খাইয়াছিল বড়বাবুর কাছে, সেও, বিনা দোষে।

অপু উঠিয়া বারান্দায় গেল। ফিরিয়া আসিতে সমীর ধমক দিয়া চুপি চুপি বলিল, তুই ও-রকম কাঁদছিস্ কেন অপূর্ব ? থাম্ না—হেডমাস্টার বকবে—

সরস্বতী পূজার সময় তাহার আট আনা চাঁদা ধরাতে অপু বড় বিপদে পড়িল। মাসের শেষ, হাতেও পয়সা তেমন নাই, অথচ সে মুখে কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না, সরস্বতী পূজার চাঁদা দিয়া হাত একেবারে খালি হইয়া গেল। বৈকালে সমীর জিজ্ঞাসা করিল, খাবার খেতে গেলি নে অপূর্ব ?

সে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সমীর তাহার সব খবর রাখে, বলিল, আমি বরাবর দেখে আসছি অপূর্ব, হাতের পয়সা ভারী বে-আন্দাজি খরচ করিস্ তুই—বুঝেসুজে চললে এরকম হয় না—আট আনা চাঁদা কে দিতে বলেছে ?

অপু হাসিমুখে বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, যা তোকে আর শেখাতে হবে না—ভারী আমার গুরুঠাকুর—

সমীর বলিল, না হাসি নয়, সত্যি কথা বলছি। আর এই ননী, ভূলো, রাসবেহারী—ওদের ও রকম বাজারে নিয়ে গিয়ে খাবার খাওয়াস্ কেন ?

অপু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিল, যাঃ বকিস্ নে—ওরা ধরে খাওয়াবার জন্যে, তা করবো কি ?

সমীর রাগ করিয়া বলিল, খাওয়াতে বললেই অমনি খাওয়াতে হবে ? ওরাও তুখোড় ধাড়ি, তোকে পেয়েছে ওই রকম তাই। অন্য কারুর কাছে তো কই ঘেঁষে না। আড়ালে তোকে বোকা বলে তা জানিস ?

—হ্যাঁ বলে বৈকি !

—আমার মিথ্যে কথা বলে লাভ ? সেদিন মণিদার ঘরে তোর কথা হচ্ছিল ; ওই বদমায়েস রাসবেহারীটা বলছিল—ফাঁকি দিয়ে খেয়ে নেয়,—আর ও-সব লজেঞ্চুস কিনে এনে বিলিয়ে বাহাদুরি করতে কে বলেছে তোকে।

সমীর নিতান্ত মিথ্যা বলে নাই। জীবনে এই প্রথম নিজের খরচপত্র অপুকে নিজে বুঝিয়া করিতে হইতেছে, ইলার পূর্বে কখনও পয়সাকড়ি নিজের হাতের মধ্যে পাইয়া নাডাচাডা করে নাই—কাজেই সে টাকা-পয়সার ওজন বুঝিতে পারে না, স্কলারশিপের টাকা হইতে বোর্ডিং-এর খরচ মিটাইয়া টাকা-দুই হাতখরচের জন্য বাঁচে—এই দেড টাকা দু'টাকাকে টাকার হিসাবে না দেখিয়া সে পয়সার হিসাবে দেখিয়া থাকে। ইতিপূর্বে কখনও আটটা পয়সা একত্র হাতের মধ্যে পায় নাই—একশো কুড়িটা পয়সা তাহার কাছে কুবেরেব ধনভাণ্ডারের সমান অসীম মনে হয় ! মাসের প্রথমে ঠিক রাখিতে না পারিয়া সে দবাজ হাতে খরচ করে—বাঁধানো খাতা কেনে, কালি কেনে, খাবার খায়। প্রায়ই দু'চারজন ছেলে আসিয়া ধরে তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে। তাহারা খুব প্রশংসা করে, পডাশুনার তারিফ করে। অপু মনে মনে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করে, ভাবে—সোজা ভাল ছেলে আমি ! সবাই কি খাতির করে ! তবুও তো মোটে পাঁচ মাস এসেচি !

মহা খুশীর সহিত তাহাদিগকে বাজারে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়ায়। ইহাব উপর আবার কেহ কেহ ধাব করিতে আসে, অপু কাহাকেও 'না' বলিতে পারে না।

এরূপ করিলে কুবেরের ভাণ্ডার আর কিছু বেশী দিন টিকিতে পারে বটে, কিন্তু একশত কুড়িটা পয়সা দশদিনের মধ্যে নিঃশেষে উডিয়া যায়, মাসের বাকি দিনগুলিতে কষ্ট ও টানাটানির সীমা থাকে না। দু'দশটা পয়সা যে যাহা ধার লয়, মুখচোরা অপু কাহারও কাছে তাগাদা করিতে পারে না,—প্রায়ই তাহা আর আদায় হয় না।

সমীর ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট হাতে বাহির হইয়া গেল। অপু ভাবিল—বলুক বোকা, আমি তো আর বোকা নই ? পয়সা ধার নিয়েচে কেন দেবে না—সবাই দেবে।

পরে সে একখানা বই হাতে লইয়া তাহার প্রিয় গাছপালা ঘেরা সেই কোণটিতে বসিতে যায়। মনে পড়ে এতক্ষণ সেখানে ছায়া পড়িয়া গিয়াছে, চীনে জবা গাছে কচি পাতা ধরিয়াছে। যাইবার সময় ভাবে, দেখি আর

ক'টা লজেঞ্জুস আছে ?···পরে বোতল হইতে গোটাকতক বাহির করিয়া মুখে পুরিয়া দেয়। ভাবে, আসছে মাসের টাকা পেলে ঐ যে আনারসের একরকম আছে, তাই কিনে আনবো এক শিশি—কি চমৎকার এগুলো খেতে! এ ধরণের ফলের আস্বাদযুক্ত লজেঞ্জুস সে আর কখনও খায় নাই!

কম্পাউণ্ডে নামিয়া লাইব্রেরীর কোণটা দিয়া যাইতে সে হঠাৎ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। একজন বেঁটে-মত লোক ইঁদারার কাছে দাঁড়াইয়া স্কুলের কেরাণী ও বোর্ডিং-এর বাজার-সরকার গোপীনাথ দত্তের সঙ্গে আলাপ করিতেছে।

তাহার বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল···সে কিসের টানে যেন লোকটার দিকে পায়ে পায়ে আগাইয়া গেল···লোকটা এবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে—হাতটা কেমন বাঁকাইয়া আছে, তখনি কথা শেষ করিয়া সে ইঁদারার পাড়ের গায়ে ঠেস্-দেওয়ানো ছাতাটা হাতে লইয়া কম্পাউণ্ডের ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপু খানিকক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। লোকটাকে দেখিতে অবিকল তাহার বাবার মত।

কতদিন সে বাবার মুখ দেখে নাই। আজ চার বৎসর!

উদ্গত চোখের জল চাপিয়া জবাতলায় গিয়া যে গাছের ছায়ায় চুপ করিয়া বসিল।

অন্যমনস্কভাবে বইখানা সে উল্টাইয়া যায়। তাহার প্রিয় সেই তিন-রঙা ছবিটা বাহির করিল, পাশের পৃষ্ঠায় সেই পদ্যটা।

স্বদেশ হইতে বহুদূরে, আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে, আলজিরিয়ার কর্কশ, বন্ধুর, জলহীন মরুপ্রান্তে একজন মুমূর্ষু তরুণ সৈনিক বালুশয্যায় শায়িত। দেখিবার কেহ নাই। কেবল জনৈক সৈনিকবন্ধু পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া মুখে চামড়ার বোতল হইতে একটু জল দিতেছে। পৃথিবীর নিকট হইতে শেষ বিদায় লইবার সময় সম্মুখের এই অপরিচিত, ধূসর উঁচুনিচু বালিয়াড়ি, পিছনের আকাশে সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা, দূরে খর্জুরকুঞ্জ ও ঊর্ধ্বমুখ উষ্ট্রশ্রেণীর দিকে চোখ রাখিয়া মুমূর্ষু সৈনিকটির কেবলই মনে পড়িতেছে বহুদূরে রাইন নদীতীরবর্তী তাহার জন্মপল্লীর কথা···তাহার মা আছেন সেখানে। বন্ধু, তুমি আমার মায়ের কাছে খবরটা পৌছাইয়া দিও, ভুলিও না।···

For my home is in distant Bingen, Fair Bingen on the Rhine!···

মাকে অপু দেখে নাই আজ পাঁচ মাস!—সে আর থাকিতে পারে না···

বোর্ডিং তাহার ভাল লাগে না, স্কুল আর ভাল লাগে না, মাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না।

এই সব সময়ে এই নির্জন অপরাহ্নগুলিতে নিশ্চিন্দিপুরের কথা কেমন করিয়া তাহার মনে পড়িয়া যায়। সেই এইদিনের কথা মনে পড়ে।···

বাড়িতে পাশের পোড়ো ভিটার বনে অনেকগুলো ছাতারে পাখি কিচমিচ করিতেছিল, কি ভাবিয়া একটা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিতেই দলের মধ্যে ছোট একটা পাখি ঘাড় মোচড়াইয়া টুপ করিয়া ঝোপের নিচে পড়িয়া গেল, বাকীগুলো উড়িয়া পলাইল। তাহার ঢিলে পাখি সত্য সত্য মরিবে ইহা সে ভাবে নাই, দৌড়িয়া গিয়া মহা আগ্রহে দিদিকে ডাকিল, ওরে দিদি, শীগ্‌গির আয়রে, দেখবি একটা জিনিস, ছুটে আয়—

দুর্গা আসিয়া দেখিয়া বলিল, দেখি, দে-দিকি আমার হাতে! পরে সে নিজের হাতে পাখিটিকে লইয়া কৌতূহলের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। ঘাড ভাঙিয়া গিয়াছে, মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, দুর্গার আঙুলে রক্ত লাগিয়া গেল। দুর্গা তিরস্কারের সুরে বলিল, আহা কেন মারতে গেলি তুই?

অপুর বিজয়গর্বে উৎফুল্ল মন একটু দমিয়া গেল।

দুর্গা বলিল, আজ কি বার রে? সোমবার না? তুই তো বামুনের ছেলে —চল, তুই আর আমি একে নিয়ে গিয়ে গাঙের ধারে পুড়িয়ে আসি, এর গতি হয়ে যাবে।

তারপর দুর্গা কোথা হইতে একটা দেশলাই সংগ্রহ করিয়া আনিল, তেঁতুলতলার ঘাটের এক ঝোপের ধারে শুকনো পাতার আগুনে পাখিটাকে খানিক পুড়াইল, পরে আধ-ঝাল্‌সানো পাখিটা নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া সে ভক্তিভাবে বলিল—হরিবোল হরি, ঠাকুর ওর গতি করবেন, দেখিস্! আহা, কি ক'রে ঘাড়টা থেঁতলে দিয়েছিলি? কখ্‌খনো ওরকম করিস নে আর। বনে জঙ্গলে উড়ে বেড়ায়, কারুর কিছু করে না, মারতে আছে, ছিঃ—

নদী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দুর্গা চিতার জায়গাটা ধুইয়া দিল।

সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরিবার সময় কে জানে তাহারা কোন্ মুক্ত বিহঙ্গ আত্মার আশীর্বাদ লইয়া ফিরিয়াছিল!···

দেবব্রত বলিল, অপূর্বদা এখানে ব'সে আছেন? আমি ঠিক ভেবেছি আপনি এখানেই আছেন—কি কথা ভাবচেন—মুখ ভার ভার—

অপু হাসিয়া বলিল—ও কিছু না, এস ব'সো। কি? চলো দেখি রাসবেহারী কি করছে।

দেবব্রত বলিল, না, যাবেন না অপূর্বদা, কেন ওদের সঙ্গে মেশেন?

আপনার নামে লাগিয়েচে, ধোপার পয়সা দেয় না, পয়সা বাকী রাখে এই সব। যাবেন না ওদের ওখানে—

—কে বলেচে এসব কথা?

—ওই ওরাই বলে। বিনোদ ধোপাকে শিখিয়ে দিচ্ছিল আপনার কাছে পয়সা বাকি না রাখতে! বল্‌ছিল, ও আর দেবে না—তিন বারের পয়সা নাকি বাকি আছে?

অপু বলিল, বা রে, বেশ লোক তো সব! হাতে পয়সা ছিল না তাই দিই নি—এই সামনের মাসে প্রথমেই দিয়ে দেবো—তা আবার ধোপাকে শিখিয়ে দেওয়া—আচ্ছা তো সব।

দেবব্রত বলিল—আবার আপনি ওদের যান খাওয়াতে! আপনার সেই খাতাখানা নিয়ে ওই বদমাইস্ হিমাংশুটা আজ কত ঠাট্টা তামাসা করছিল—ওঁদের দেখান কেন ওসব?

অপূর্ব বলিল, এসব কথা আমি জানিনে, আমি লিখছিলাম, ননীমাধব এসে বলে—ওটা কি? তাই একটুখানি পড়ে শোনালাম। কি কি—কি বলছিল?

—আপনাকে পাগল বলে—যত রাজ্যির গাছপালার কথা নাকি শুধু শুধু খাতায় লেখা! আবোল-তাবোল শুধু তাতেই ভর্তি? ওরা তাই নিয়ে হাসে। আপনি চুপ ক'রে এইখানে মাঝে মাঝে এসে বসেন বলে কত কথা তুলেছে—

অপুর রাগ হইল, একটু লজ্জাও হইল। ভাবিল খাতাখানা না দেখালেই হ'ত সেদিন! দেখতে চাইলে তাই তো দেখালাম, নইলে আমি সেধে তো আর—

মাঝে মাঝে তাহার মনে কেমন একটা অস্থিরতা আসে, এসব দিনে বোর্ডিং-এর ঘরে আবদ্ধ থাকিতে মন চাহে না। কোথায় কোন মাঠ বৈকালের রোদে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ছায়াভরা নদীজলে কোথায় নববধূর নাকছাবির মত পানকলস শেওলার কুচা কুচা শাদা ফুল ফুটিয়া নদীজল আলো করিয়া রাখিয়াছে, মাঠের মাঝে উঁচু ডাঙায় কোথায় ঘেঁটুফুলের বন···এই সবের স্বপ্নে সে বিভোর থাকে, মুক্ত আকাশ, মুক্ত মাঠ, গাছপালার জন্য মন কেমন করে। গাছপালা না দেখিয়া বেশীদিন থাকা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব! মনে বেশী কষ্ট হইলে একখানা খাতায় সে বসিয়া বসিয়া যত রাজ্যের গাছের ও লতাপাতার নাম লেখে এবং যে ধরণের ভূমিশ্রীর জন্য মনটা তৃষিত থাকে, তাহারই একটা কল্পিত বর্ণনায় খাতা ভরাইয়া তোলে। সেখানে নদীর পাশেই থাকে মাঠ, বাবলা বন, নানা বনজ গাছ, পাখিডাকা সকাল বিকালের রোদ··· ফুল! ফুলের সংখ্যা থাকে ন ঘরটায় আবদ্ধ থাকিয়াও মনে

মনে সে নানা অজানা মাঠে বনে নদীতীরে বেড়াইয়া আসে। একখানা বাঁধা খাতাই সে এভাবে লিখিয়া পুরাইয়া ফেলিয়াছে!

অপু ভাবিল, বলুক গে, আর কখ্‌খনো কিছু দেখাচ্ছি নে। ওদের সঙ্গে এই আমার হয়ে গেল। দেবো আবার কখনো ক্লাসের ট্রানশ্লেসন বলে।

ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতেই স্কুল-কম্পাউণ্ডের চারিপাশে গাছপালার নতুন পাতা গজাইল। ক্রিকেট খেলার মাঠে বড় বাদাম গাছটার রক্তাভ কচি সবুজ পাতা সকালের রৌদ্রে দেখিতে হইল চমৎকার, শীত একেবারে নাই বলিলেই হয়।

বোর্ডিং-এর রাসবিহারীর দল পরামর্শ করিল মাম্‌জোয়ানে দোলের মেলা দেখিতে যাইতে হইবে। মাম্‌জোয়ানের মেলা এ অঞ্চলের বিখ্যাত মেলা।

অপু খুশীর সহিত রাসবিহারীদের দলে ভিড়িল। মাম্‌জোয়ানের মেলার কথা অনেক দিন হইতে সে শুনিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া পর্যন্ত কোথাও মেলা বা বারোয়ারি আর কখনও দেখা ঘটে নাই।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিধুবাবু দু'দিনের ছুটি দিলেন। অপু অনেকদিন পরে যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ক্রোশ তিনেক পথ—মাঠ ও কাঁচা মাটির রাস্তা। ছোট ছোট গ্রাম, কুমোরেরা চাক ঘুরাইয়া কলসী গড়িতেছে। পথের ধারের ছোট দোকানে দোকানদার রেড়ির ফলের বীজ ওজন করিয়া লইতেছে—সজিনা গাছ সব ফুলে ভর্তি—এমন চমৎকার লাগে।···ছুটি-ছাটা ও শনি-রবিবারে সীমাবদ্ধ না হইয়া এই যে জীবনধারা পথের দুই পাশে, দিনে রাত্রে, শত দুঃখে সুখে আশাশ বাতাসের তলে, নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া চঞ্চল আনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে,—এই জীবন-ধারার সহিত সে নিজেকে পরিচিত করিতে চায়।

মাঠে কাহারা শুকনো খেজুর ডালের আগুনে রস জ্বাল দিতেছে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল—সে তাহাদের কাছে গিয়া খানিকক্ষণ রস জ্বাল দেওয়া দেখিবে, বসিয়া বসিয়া শুনিবে উহারা কি কথাবার্তা বলিতেছে।

ননী বলিল, তোকে পাগল বলি কি আর সাধে? দূর, দূর,—আর কি

দেখবি ওখানে ? অপু অপ্রতিভ মুখে বলিল, আয় না ওরা কি বলছে শুনি ? ওরা কত গল্প জানে, জানিস ? আয় না—

রাজু রায়ের পাঠশালার সেই দিনগুলি হইতে বয়স্ক লোকের গল্পের ও কথাবার্তার প্রতি তাহাব প্রবল মোহ আছে—একটা বিস্তৃততর, অপরিচিত জীবনের কথা ইহাদের মুখে শোনা যায়। অপু ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়—বাসবিহারীর দল অগত্যা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোকের ছেলে দেখিয়া মুচিরা খুব খাতির করিল। খেজুর-বস খাইতে আসিয়াছে ভাবিয়া মাটির নতুন ভাঁড় ধুইয়া জিরান কাঠের টাটকা রস লইয়া আসিল। ইহাদের কাছে অপু আদৌ মুখচোরা নয়। ঘণ্টাখানেকের উপব সে তাহাদের সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গুড় জ্বাল দেওয়া দেখিল।

মামজোয়ানের মেলায় পৌছিতে তাহার হইয়া গেল বেলা বারোটা। প্রকাণ্ড মেলা. ভয়ানক ভিড ; রৌদ্রে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মুখ রাঙা হইয়া গিয়াছে, সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই-ই পাইয়াছে, ভাল খাবার খাইবার পয়সা নাই, একটা দোকান হইতে সামান্য কিছু খাইয়া এক ঘটি জল খাইল। তাহার পর একটা পাখীর খেলার তাঁবুব ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—ভিতরে কি খেলা হইতেছে। একজন পশ্চিমা লোক হটাইয়া দিতে আসিল।

অপু বলিল, কত ক'বে নেবে খেলা দেখতে ?···দু'পয়সা দেব—দেখাবে ?

লোকটি বলিল, এখন খেলা শুরু হইয়া গিয়াছে, আধঘণ্টা পরে আসিতে।

একটা পানের দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাত্রা কবে বসবে জানো ?

বৈকালে লোকের ভিড খুব বাড়িল। দোকানে দোকানে, বিশেষ কবিয়া পানেব দোকানগুলিতে খুব ভিড। খেলা ও ম্যাজিকেব তাঁবুগুলিব সামনে খুব ঘণ্টা ও জয়ঢাক বাজিতেছে। অপু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—একটা বড তাঁবুর বাহিরে আলকাতারা-মাখা জন দুই লোক বাঁশেব মাচাব উপব দাঁড়াইয়া কৌতূহলী জনতার সম্মুখে খেলার অত্যাশ্চযতা ও অভিনবত্বেব নমুনা স্বরূপ একটা লম্বা লাল-নীল কাগজেব মালা নানা অঙ্গভঙ্গিসহকারে মুখ হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে।

সে পাশেব একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিল, এ খেলা ক'পয়সা জানো ?

নিশ্চিন্দপুরে থাকিতে বাবার বইয়ের দপ্তরে একখানা পুরাতন বই ছিল, তাহার মনে আছে, বইখানার নাম 'রহস্য-লহরী'। রুমাল উড়াইয়া দেওয়া কাটামুণ্ডুকে কথা-বলানো, এক ঘণ্টার মধ্যে আম-চারায় ফল-ধরানো প্রভৃতি

নানা ম্যাজিকের প্রক্রিয়া বইখানাতে ছিল। অপু বই দেখিয়া দু-একবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু নানা বিলাতী ঔষধের ফর্দ ও উপকরণের তালিকা দেখিয়া বিশেষ করিয়া "নিশাদল" দ্রব্যটি কি বা তাহা কোথায় পাওয়া যায় ঠিক করিতে না পারিয়া, অবশেষে ছাড়িয়া দেয়।

সে মনে মনে ভাবিল—ওই সব দেখেই তো ওরা শেখে! বাবার সেই বইখানাতে কত ম্যাজিকের কথা লেখা ছিল।—নিশ্চিন্দিপুর থেকে আসবার সময় কোথায় যে গেল বইখানা!

চারিধারে বাজনার শব্দ, লোকজনের হাসি-খুশি, খেলো সিগারেটের ধোঁয়া, ভিড়, আলো, সাজানো দোকানের সারি, তাহার মন উৎসাহের নেশায় মাতিয়া উঠিল।

একদল ছেলেমেয়ে একখানা গোরুর গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে কৌতূহল ও আগ্রহে মুখ বাড়াইয়া ম্যাজিকের তাঁবুর জীবন্ত বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে যাইতেছে। সকল লোককেই সিগারেট খাইতে দেখিয়া তাহার ইচ্ছা হইল সেও খায়—একটা পানের দোকানে ক্রেতার ভিড়ের পিছনে খানিকটা দাঁড়াইয়া অবশেষে একটা কাঠের বাক্সের উপর উঠিয়া একজনের কাঁধের উপর দিয়া হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এক পয়সার দাও তো? এই যে এইদিকে—এক পয়সার সিগারেট—ভাল দেখে দিও—যা ভালো।

একটা গাছের তলায় বইয়ের দোকান দেখিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। চটের থলের উপর বই বিছানো, দোকানী খুব বুড়া, চোখে সুতা-বাঁধা চশমা। একখানা ছবিওয়ালা চটি আরব্য উপন্যাস অপুর পছন্দ হইল—সে পড়ে নাই—কিন্তু দোকানী দাম বলিল আট আনা! হাতে পয়সা থাকিলে সে কিনিত।

বইখানা আর একবার দেখিতে গিয়া হঠাৎ সম্মুখের দিকে চোখ পড়াতে সে অবাক হইয়া গেল। সম্মুখের একটা দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া আছে··· পটু! তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যসঙ্গী পটু!

অপু তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া গায়ে হাত দিতেই পটু মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল—প্রথমটা যেন চিনিতে পারিল না—পরে প্রায় চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, অপুদা,···এখানে কি ক'রে, কোথা থেকে অপুদা?···

অপু বলিল, তুই কোথা থেকে?

—আমার তো দিদির বিয়ে হয়েচে এই লাউখালি। এইখেন থেকে দু-কোশ। তাই মেলা দেখতে এলাম—তুই কি ক'রে কাশী থেকে?—

অপু সব বলিল। বাবার মৃত্যু, বড়লোকের বাড়ি, মনসাপোতা স্কুল। জিজ্ঞাসা করিল, বিনিদির বিয়ে হয়েছে মামজোয়ানের কাছে? বেশ তো—

অপুর মনে পড়িল, অনেকদিন আগে দিদির চড়ুইভাতিতে বিনিদির ভয়ে ভয়ে আসিয়া যোগ দেওয়া। গরীব অগ্রদানী বামুনের মেয়ে, সমাজে নিচু স্থান, নম্র ও ভীরু চোখ দু'টি সর্বদাই নামানো, অল্পেই সন্তুষ্ট।

দু'জনেই খুব খুশী হইয়াছিল। অপু বলিল—মেলার মধ্যে বড্ড ভিড় ভাই, চল্‌ কোথাও একটু ফাঁকা জায়গাতে গিয়ে বসি—অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।

বাহিরের একটা গাছতলায় দু'জনে গিয়া বসিল—তাহাদের বাড়িটা কিভাবে আছে?...রাণুদি কেমন?... নেড়া, পটল, নীলু, সতুদা ইহারা?...ইছামতী নদীটা? পটু সব কথার উত্তর দিতে পারিল না, পটুও আজ অনেকদিন গ্রাম ছাড়া। পটুর আপন মা নাই, সৎমা। অপুরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সে সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়াছিল, দিদির বিবাহের পরে বাড়িতে একেবারেই মন টিকিল না। কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল পড়াশুনার চেষ্টায়। কোথাও সুবিধা হয় নাই। দিদির বাড়ি মাঝে মাঝে আসে, এখানে থাকিয়া যদি পড়াশুনার সুযোগ হয়, সেই চেষ্টায় আছে। অনেকদিন গ্রাম ছাড়া, সেখানকার বিশেষ কিছু খবর জানে না। তবে শুনিয়া আসিয়াছিল—শীঘ্রই রাণীদির বিবাহ হইবে, সে তিন বছর আগেকার কথা, এতদিন নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে।

পটু কথা বলিতে বলিতে অপুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

রূপকথার রাজপুত্রের মত চেহারা হইয়া উঠিয়াছে অপুদার।...কি সুন্দর মুখ...অপুদার কাপড়চোপড়ের ধরণও একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

অপু তাহাকে একটা খাবারের দোকানে লইয়া গিয়া খাবার খাওয়াইল, বাহিরে আসিয়া বলিল, সিগারেট খাবি? তাহাকে ম্যাজিকের তাঁবুর সামনে আনিয়া বলিল, ম্যাজিক দেখিস নি তুই? আয় তোকে দেখাই—পরে সে আট পয়সার দুইখানা টিকিট কাটিয়া উৎসুক মুখে পটুকে লইয়া ম্যাজিকের তাঁবুতে ঢুকিল।

ম্যাজিক দেখিতে দেখিতে অপু জিজ্ঞাসা করিল, হাঁরে, আমরা চলে এলে রাণুদি বলতো নাকি কিছু আমাদের—আমার কথা? নাঃ—

খুব বলিত। পটুর কাছে কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে অপু তাহাকে কোন পত্র লিখিয়াছে কি না, তাহাদের কাশীর ঠিকানা কি? পটু বলিতে পারে নাই। শেষে পটু বলিল, বুড়ো নরোত্তম বাবাজী তোর কথা ভারী বলতো।

অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তাহার বোষ্টম দাদু এখনো বাঁচিয়া আছে?—এখনও তাহার কথা ভুলিয়া যায় নাই। মধুর প্রভাতের পদ্মফুলের মত ছিল দিনগুলা—আকাশ ছিল নির্মল, বাতাস কি শান্ত, নবীন উৎসাহ ভরা

মধুচ্ছন্দ! মধুর নিশ্চিন্দিপুর। মধুর ইছামতীর কলমর্মর!...মধুর তাহার দুঃখী দিদি দুর্গার স্নেহভরা ডাগর চোখের স্মৃতি!...কতদূর, ক—ত দূরে চলিয়া গিয়াছে সে দিনের জীবন। খেলাঘরের দোকানে নোনা-পাতার পান বিক্রী, সেই সতুদার মাকাল ফল চুরি করিয়া দৌড় দেওয়া!...

একবার একখানা বইতে সে পড়িয়াছিল দেবতার মায়ায় একটা লোক স্নানের সময় জলে ডুব দিয়া পুনরায় উঠিবার যে সামান্য ফাঁকটুকু তাহারই মধ্যে ষাট বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনের সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিল—যেন তাহার বিবাহ হইল, ছেলেমেয়ে হইল, তাহারা সব মানুষ হইল, কতক বা মরিয়া গেল, বাকীগুলির বিবাহ হইল, নিজেও সে বৃদ্ধ হইয়া গেল—হঠাৎ জল হইতে মাথা তুলিয়া দেখে—কোথাও কিছু নয়, সে যেখানে সেখানেই আছে, কোথায় বা ঘরবাড়ি, বা ছেলেমেয়ে!...

গল্পটা পড়িয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে সে ভাবে তাহারও ওরকম হয় না? এক-এক সময় তাহার মনে হয় হয়ত বা তাহার হইয়াছে। এ সব কিছু না—স্বপ্ন। বাবার মৃত্যু, এই বিদেশ, এই স্কুলে পড়া—সব স্বপ্ন। কবে একদিন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিবে সে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে তাহাদের সেই বনের ধারের ঘরটাতে আষাঢ়ের পড়ন্ত বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—সন্ধ্যার দিকে পাখির কলরবে জাগিয়া উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছে, কি সব হিজিবিজি অর্থহীন স্বপ্নই না সে দেখিয়াছে ঘুমের ঘোরে!...বেশ মজা হয়, আবার তাহার দিদি ফিরিয়া আসে, তাহার বাবা, তাহাদের বাড়িটা।

একদিন ক্লাসে সত্যেনবাবু একটা ইংরেজি কবিতা পড়াইতেছিলেন, নামটা গ্রেভস্ অফ এ হাউস্‌হোল্ড। নির্জনে বসিয়া সেটা আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার চোখ দিয়া জল পড়ে। ভাইবোনেরা একসঙ্গে মানুষ, এক মায়ের কোলেপিঠে, এক ছেঁড়া কাথার তলে। বড় হইয়া জীবনের ডাকে কে কোথায় গেল চলিয়া—কাহারও সমাধি সমুদ্রে, কাহারও কোন্ অজানা দেশের অপরিচিত আকাশের তলে, কাহারও বা ফুল-ফোটা কোন্ গ্রাম্য বনের ধারে।

আপনা-আপনি পথ চলিতে চলিতে এই সব স্বপ্নে সে বিভোর হইয়া যায়। কত কথা যেন মনে ওঠে! যত লোকের দুঃখের দুর্দশার কাহিনী। নিশ্চিন্দি-পুরের জানালার ধারে বসিয়া বাল্যের সে ছবি দেখা—সেই—সেই বিপন্ন কর্ণ, নির্বাসিতা সীতা, দরিদ্র বালক অশ্বত্থামা, পরাজিত রাজা দুর্যোধন, পল্লীবালিকা জোয়ান। বুঝাইয়া বলিবার বয়স তাহার এখনও হয় নাই, ভাবকে সে ভাষা দিতে জানে না—অল্পদিনের জীবনে অধীত সমুদয় পত্র ও কাহিনী অবলম্বন করিয়া সে যেভাবে জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছে—অনাবিল তরুণ মনের তাহা

প্রথম কাব্য—তার কাঁচা জীবনে সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায় গাঁথা বনফুলের হার।—প্রথম উচ্চারিত ঋক্‌মন্ত্রের কারণ ছিল যে বিস্ময় যে আনন্দ—তাহাদেরই সগোত্র, তাহাদেরই মত ঋদ্ধিশীল ও অবাচ্য সৌন্দর্যময়।

রাগরক্ত সন্ধ্যার আকাশে সত্যের প্রথম শুকতারা।

কে জানে ওর মনের সে-সব গহন গভীর গোপন রহস্য? কে বোঝে?

ম্যাজিকের তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দু'জনে মেলার মধ্যে ঢুকিল। বোর্ডিং-এর একটি ছেলের সঙ্গেও তাহার দেখা হইল না, কিন্তু তাহার আমোদের তৃষ্ণা এখনও মেটে নাই, এখনও ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার ইচ্ছা। বলিল—চল পটু, দেখে আসি যাত্রা বসবে কখন—যাত্রা না দেখে যাস্ নে যেন।

পটু বলিল, অপুদা কোন্ ক্লাসে পড়িস তুই?...

অপু অন্যমনস্কভাবে বলিল, ঐ যে ম্যাজিক দেখলি, ও আমার বাবার একখানা বই ছিল, তাতে সব লেখা ছিল, কি ক'রে করা যায়—জিনিস পেলে আমিও করতে পারি—

—কোন্ ক্লাসে তুই—

—ফোর্থ ক্লাসে। একদিন আমাদের স্কুলে চল্, দেখে আসবি—দেখবি কত বড় স্কুল—রাত্রে আমাদের কাছে থাকবি এখন—একটু থামিয়া বলিল—সত্যি এত জায়গায় তো গেলাম, নিশ্চিন্দিপুরের মত আর কিছু লাগে না—কোথাও ভাল লাগে না—

—তোরা যাবি নে আর সেখানে? সেখানে তোদের জন্যে সবাই দুঃখ করে, তোর কথা তো সবাই বলে—পরে সে হাসিয়া বলিল, অপুদা, তোর কাপড় পরবার ধরণ পর্যন্ত বদলে গেছে, তুই আর সেই নিশ্চিন্দিপুরের পাড়াগেঁয়ে ছেলে নেই—

অপু খুব খুশী হইল। গর্বের সহিত গায়ের শার্টটা দেখাইয়া বলিল, কেমন রংটা, না? ফার্স্ট ক্লাসের রমাপতিদার গায়ে আছে, তাই দেখে এটা কিনেছি—দেড় টাকা দাম।

সে একথা বলিল না যে শার্টটা সে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া অপরের দেখাদেখি দরজির দোকান হইতে ধারে কিনিয়াছে, দরজির অনবরত তাগাদা সত্ত্বেও এখনও দাম দিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

বেলা বেশ পড়িয়া আসিয়াছে। আল্‌কাতরা-মাখা জীবন্ত বিজ্ঞাপনটি বিকট চিৎকার করিয়া লোক জড়ো করিতেছে।

পটু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দিদির বাড়ির দিকে রওনা হইল। অপুর সহিত এতকাল পরে দেখা হওয়াতে সে খুব খুশী হইয়াছে। কোথা হইতে অপুদা কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! তবুও স্রোতের তৃণের মত ভাসিতে ভাসিতে অপুদা আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছে, কিন্তু এই তিন বৎসরকাল সে-ও তো ভাসিয়া বেড়াইতেছে এক রকম, তাহার কি কোন উপায় হইবে না?

সন্ধ্যার পর বাড়ি পৌঁছিল। তাহার দিদি বিনির বিবাহ বিশেষ অবস্থাপন্ন ঘরে হয় নাই, মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, খানদুই-তিন ঘর। পশ্চিমের ভিটায় পুরানো আমলের কোঠা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে, তাহারই একটা ঘরে বর্তমানে রান্নাঘর, ছাদ নাই, আপাততঃ খড়ের ছাউনি একখানা চাল ইটের দেওয়ালের গায়ে কাৎভাবে বসানো।

বিনি ভাইকে খাবার খাইতে দিল। বলিল—কি রকম দেখলি মেলা?··· সে এখন আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে, বিশেষ মোটাসোটা হয় নাই, সেই রকমই আছে। গলার স্বর শুধু বদলাইয়া গিয়াছে।

পটু হাসিমুখে বলিল আজ কি হয়েচে জানিস দিদি, অপুর সঙ্গে দেখা হয়েচে—মেলায়।

বিনি বিস্ময়ের সুরে বলিল, অপু! সে কি ক'রে—কোথা থেকে—

পরে পটুর মুখে সব শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে—আহা সঙ্গে ক'রে আন্‌লি নে কেন?···দেখতে বড় হয়েচে?···

—সে অপুই আর নেই। দেখলে চেনা যায় না। আরও সুন্দর হয়েচে দেখতে—তবে সেই রকম পাগলা আছে এখনো—ভারী সুন্দর লাগে—এমন হয়েচে!···এতকাল পরে দেখা হয়ে আমার মেলায় যাওয়াই আজ সার্থক হয়েচে। খুড়িমা মনসাপোতা থাকে বললে।

—সে এখেন থেকে কত দূর?

—সে অনেক, রেলে যেতে হয়। মাম্‌জোয়ান থেকে ন'-দশ কোশ হবে।

বিনি বলিল, আহা একদিন নিয়ে আসিস না অপুকে, একবার দেখতে ইচ্ছে করে—

ছাদ-ভাঙা রান্না-বাড়ির রোয়াকে পটু খাইতে বসিল। বিনি বলিল, তোর চক্কত্তি মশায়কে একবার বলে দেখিস দিকি কাল? বলিস বছর তিনেক থাকতে দ্যাও, তার পর নিজের চেষ্টা নিজে করবো—

পটু বলিল, বছর তিনেকের মধ্যে পড়া শেষ হয়ে যাবে না—ছ'সাত বছরের কমে কি পাশ দিতে পারব? অপুদা বাড়িতে পড়ে কত লেখাপড়া জানত—আমি তো তাও পড়ি নি, তুমি একবার চক্কত্তি মশায়কে বলো না দিদি?

বিনি বলিল—আমিও বলবো এখন। বড্ড ভয় করে—পাছে আবার বট্‌ ঠাকুরঝি হাত-পা নেড়ে ওঠে—বট্‌ ঠাকুরঝিকে একবার ধরতে পারিস্‌ ?—আমি কথা কইলে তো কেউ শুনবে না, ও যদি বলে তবে হয়—

পটু যে তাহা বোঝে না এমন নয়। অর্থাভাবে দিদিকে ভাল পাত্রের হাতে দিতে পারা যায় নাই, দোজবর, বয়সও বেশি। ও-পক্ষের গুটিকতক ছেলেমেয়ের আছে, দুই বিধবা ননদ বর্তমান, ইহারা সকলেই তাহার দিদির প্রভু। ভালমানুষ বলিয়া সকলেই তাহার উপর দিয়া ষোল আনা প্রভুত্ব চালাইয়া থাকে। উদয়াস্ত খাটিতে হয়, বাড়ির প্রত্যেকেই বিবেচনা করে তাহাকে দিয়া ব্যক্তিগত ফরমাইশ খাটাইবার অধিকার উহাদের প্রত্যেকেরই আছে, কাজেই তাহাকে কেহ দয়া করে না।

অনেক রাত্রে বিনির স্বামী অর্জুন চক্রবর্তী বাড়ি ফিরিল। মাম্‌জোয়ানের বাজারে তাহার খাবারের দোকান আছে, আজকাল মেলার সময় বলিয়া রাত্রে একবার আহার করিতে আসে মাত্র। খাওয়াই আবার চলিয়া যায়, রাত্রেও কেনা-বেচা হয়। লোকটি ভারি কৃপণ, বিনি রোজই আশা করে—ছোট ভাইটা এখানে কয়দিন হইল আসিয়াছে, এ পর্যন্ত কোন দিন একটা রসগোল্লাও তাহার জন্য হাতে করিয়া বাড়ি আনে নাই, অথচ নিজেরই তো খাবারের দোকান। এ রকম লোকের কাছে ভাইয়ের সম্বন্ধে কি কথাই বা সে বলিবে।

তবুও বিনি বলিল। স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া সে সামনে বসিল, ননদেরা কেহ রান্নাঘরে নাই, এ ছাড়া আর সুযোগ ঘটিবে না। অর্জুন চক্রবর্তী বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটল ? এখানে থাকবে ?

বিনি মরীয়া হইয়া বলিল—ওই ওর সমান অপূর্ব ব'লে ছেলে—আমাদের গাঁয়ের, সেও পড়ছে। এখেনে যদি থাকে তবে এই মাম্‌জোয়ান ইস্কুলে গিয়ে পড়তে পারে—একটা হিল্লে হয়—

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—ওসব এখন হবে-টবে না, দোকানের অবস্থা ভাল নয়, দোলের বাজারে খাজনা বেড়ে গিয়েছে দুনো, অথচ দোকানে আয় নেই। মাম্‌জোয়ানে খটি খুলে চার আনা সের ছানা—তাই বিকুচ্ছে দশ আনায়, তা লাভ করবো, না খাজনা দোবো, না মহাজন মেটাবো ? মেলা দেখে বাড়ি চলে যাক্‌ —ও সব ঝক্কি এখন নেওয়া বল্‌লেই নেওয়া—!

বিনি খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বোশেখ মাসের দিকে আসতে বলবো ?

অর্জুন চক্রবর্তী বলিল—বোশেখ মাসের বাকীটা আর কি—আর মাস দেড়েক বৈ তো নয় !···ওসব এখন হবে না, ওসব নিয়ে এখন দিক্‌ ক'রো না

—ভাল লাগে না, সারাদিন খাটুনির পর—বলে নিজের জ্বালায় তাই বাঁচি নে তা আবার—হুঁ—

বিনি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। মনে খুব কষ্ট হইল—ভাইটা আশা করিয়া আসিয়াছিল—দিদির বাড়ি থাকিয়া পড়িতে পাইবে। বলিল —আচ্ছা, অপু কেমন ক'রে পড়চে রে?

পটু বলিল—সে হে এস্কলারশিপ পেয়েচে—তাতেই খরচ চলে যায়।

বিনি বলিল—তুই তা পাস নে? তাবলে তোর তো—

পটু হাসিয়া বলিল—না পড়েই এস্কলারশিপ পাবো—বা তো—পাশ দিলে তবে পাওয়া যাবে, সে সব আমার হবে না, অপুদা ভাল ছেলে—ও কি আর আমার হবে?...

বিনি বলিল—তুই অপুকে একবার ব'লে দেখবি? ও ঠিক একটা কিছু তোকে জোগাড় ক'রে দিতে পারে।

দু'জনে পরামর্শ করিয়া তাহাই অবশেষে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

সর্বজয়া পিছু পিছু উঠিয়া বড়ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিতে আসিল, সম্মুখের উঠানে নামিয়া বলিল মাঝে মাঝে এস বৌমা, বাড়ি আগলে পড়ে থাকতে হয়, নইলে দুপুর বেলা একবার ভাবি তোমাদের ওখানে একটু বেড়িয়ে আসি। সেদিন বাপু গয়লাপাড়ায় চুরি হ'য়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফেলে যেতে ভরসা পাই নে।

তেলি বাড়ির বড় বধূ বেড়াইতে আসিয়াছিল, তিন বৎসরের ছোট মেয়েটির হাত ধরিয়া হাসিমুখে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ সর্বজয়া বেশ ছিল। ইহারা সব দুপুরের পর আসিয়াছিল, গল্পগুজবে সময়টা তবুও এরকম কাটিল। কিন্তু একা একা সে তো আর থাকিতে পারে না। শুধুই, সব সময়ই, দিন নাই রাত্রি নাই,—অপুর কথা মনে পড়ে। অপুর কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই তাহার মনে স্থান পায় না।

আজ সে গিয়াছে এই পাঁচ মাস হইল। কত শনিবার কত ছুটির দিন চলিয়া গিয়াছে এই পাঁচমাসের মধ্যে। সর্বজয়া সকালে উঠিয়া ভাবিয়াছে— আজ দুপুরে আসিবে! দুপুর চলিয়া গেলে ভাবিয়াছে বৈকাল আসিবে। অপু আসে নাই!

অপুর কত জিনিস ঘরে পড়িয়া আছে, কত স্থান হইতে কত কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে—অবোধ পাগল ছেলে!...শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া সর্বজয়া হাঁপায়, অপুর মুখ মনে আনিবার চেষ্টা করে। এক একবার

তাহার মনে হয় অপুর মুখ সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। যতই জোর করিয়া মনে আনিবার চেষ্টা করে ততই সে মুখ অস্পষ্ট হইয়া যায়···অপুর মুখের আদলটা আনিলেও ঠোঁটের ভঙ্গিটা ঠিক মনে পড়ে না, চোখের চাহনিটা মনে পড়ে না···সর্বজয়া একেবারে পাগলের মত হইয়া ওঠে—অপুর, তাহার অপুর মখ সে ভুলিয়া যাইতেছে!

কেবলই অপুর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। অপু কথা বলিতে জানিত না, কোন্ কথার কি মানে হয় বুঝিত না। মনে আছে···নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে থাকিতে একবার রান্নাবাড়ির দাওয়ায় কাঁঠাল ভাঙিয়া ছেলেমেয়েকে দিতেছিল। দুর্গা বাটি পাতিয়া আগ্রহের সহিত কাঁঠাল-ভাঙা দেখিতেছে, অপু দুর্গার বাটিটা দেখাইয়া হাসিমুখে বলিয়া উঠিল—দিদি কাঁঠালের বড় প্রভু, না মা? সর্বজয়া প্রথমটা বুঝিতে পারে নাই, শেষে বুঝিয়াছিল, 'দিদি কাঁঠালের বড ভক্ত' এ কথাটি বুঝাইতে 'ভক্ত' কথাটার স্থানে 'প্রভু' ব্যবহার কবিয়াছে। তখন অপুব বয়স নয় বৎসরের কম নয় অথচ তখনও সে কাজে—কথায় নিতান্ত ছেলেমানুষ।

একবার নতুন পরণের কাপড কোথা হইতে ছিঁড়িয়া আসিবার জন্য অপু মার খাইয়াছিল। কতদিনের কথা, তবুও ঠিক মনে আছে। হাঁড়িতে আমসত্ত্ব কুলচুর রাখিবার জো ছিল না, অপু কোন্ ফাঁকে ঢাকনি খুলিয়া চুরি করিয়া খাইবেই। এই অবস্থায় একদিন ধরা পড়িয়া যায়, তখনকার সেই ভয়ে ছোট-হইয়া যাওয়া রাঙা মুখখানি মনে পড়ে। বিদেশে একা কত কষ্টই হইতেছে, কে তাহাকে সেখানে বুঝিতেছে!

আর একদিনের কথা সে কখনো ভুলিবে না। অপুর বয়স যখন তিন বৎসর, তখন সে একবার হারাইয়া যায়। খানিকটা আগে সম্মুখের উঠানের কাঁঠাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে তাহাকে দেখা গিয়াছে, ইহারই মধ্যে কোথায় গেল!—পাড়ায় কাহারও বাড়িতে নাই, পিছনের বাঁশবনেও নাই—চারিধারে খুঁজিয়া কোথাও অপুকে পাইল না। সর্বজয়া কাঁদিয়া আকুল হইল—কিন্তু যখন হরিহর বাড়ির পাশের বাঁশতলার ডোবাটা খুঁজিবার জন্য ও-পাড়া হইতে জেলেদের ডাকিয়া আনাইল, তখন তাহার আর কান্নাকাটি রহিল না। সে কেমন কাঠের মত হইয়া ডোবার পাড়ে দাঁড়াইয়া জেলেদের জাল-ফেলা দেখিতে লাগিল। পাড়াশুদ্ধ লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—ডোবার পারে। অক্রুর জেলে টানাজালের বাঁধন খুলিতেছিল, সর্বজয়া ভাবিল অক্রুর মাঝিকে চিরকাল সে নিরীহ বলিয়া জানে, ভালমানুষের মত কতবার মাছ বেচিয়া গিয়াছে তাহাদের বাড়ি—সে সাক্ষাৎ যমের বাহন হইয়া আসিল কি করিয়া? শুধু অক্রুর মাঝি

নয়, সবাই যেন যমদূত, অন্য অন্য লোকেরা, যাহারা মজা দেখিতে ছুটিয়াছে, তাহারা—এমন কি তাহার স্বামী পর্যন্ত। সে-ই তো গিয়া ইহাদের ডাকিয়া আনিয়াছে। সর্বজয়ার মনে হইতেছিল যে, ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে—কোন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র।

ঠিক সেই সময়ে দুর্গা অপুকে খুঁজিয়া আনিয়া হাজির করিল। অপু নাকি নদীর ধারের পথ দিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া একা একা সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইতেছিল, অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ফিরিতে গিয়া বোধহয় পথ চিনিতে পারে নাই। বাড়ির কাঁঠালতলায় বসিয়া খেলা করিতে করিতে কখন কোন্ ফাঁকে বাহির হইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না।

যখন সকলে যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল, তখন সর্বজয়া স্বামীকে বলিল —এ ছেলে কোনদিন সংসারী হবে না, দেখে নিও—

হরিহর বলিল—কেন ?···তা ও-রকম হয়, ছেলেমানুষে গিয়েই থাকে—

সর্বজয়া বলিল—তুমি পাগল হয়েছ !···তিন বছর বয়সে অন্য ছেলে বাড়ির বাইরে পা দেয় না, আর ও কিনা গাঁ ছেড়ে, মাঠ ভেঙ্গে গিয়েছে সেই সোনা-ডাঙার মাঠের রাস্তায়। তাও ফেরবার নাম নেই—হন্ হন্ ক'রে হেঁটেই চলেছে। কখ্‌খনো সংসারে মন দেবে না, তোমাকে ব'লে দিলাম—এ আমার কপালেই লেখা আছে !

কত কথা সব মনে পড়ে—নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির কথা, দুর্গার কথা। এ জায়গা ভাল লাগে না, এখন মনে হয়, আবার যদি নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত! একদিন যে-নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসিতে উৎসাহের অবধি ছিল না, এখন তাহাই যেন রূপকথার রাজ্যের মত সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপরকার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে ! ভাবিতে ভাবিতে প্রথম বসন্তের পুষ্পসুবাসমধুর বৈকাল বহিয়া যায়, অলস অস্ত-আকাশে কত রং ফুটিয়া আবার মিলাইয়া যায়, গাছপালায় পাখি ডাকে। এ রকম একদিন নয়, কতদিন হইয়াছে।

কোন কিছু ভালমন্দ জিনিস পাইলেই সেটুকু সর্বজয়া ছেলের জন্য তুলিয়া রাখে। কুণ্ডুদের বাড়ির বিবাহের তত্ত্বে সন্দেশ আসিলে সর্বজয়া প্রাণ ধরিয়া তাহার একটা খাইতে পারে নাই। ছেলের জন্য তুলিয়া রাখিয়া রাখিয়া অবশেষে যখন হাঁড়ির ভিতর পচিয়া উঠিল তখন ফেলিয়া দিতে হইল। পৌষ-পার্বণের সময় হয়ত অপু বাড়ি আসিবে, পিঠে খাইতে ভালবাসে, নিশ্চয় আসিবে। সর্বজয়া চাল কুটিয়া সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিয়া বসিয়া রহিল—কোথায় অপু ?

এক সময় তাহার মনে হয়, অপু আর সে অপু নাই। সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছে, কই অনেকদিন তো সে মাকে হুঁ-উ-উ করিয়া ভয় দেখায় নাই, অকারণে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে নাই, একোণে ওকোণে লুকাইয়া দুষ্টুমি ভরা হাসিমুখে উঁকি মারে নাই, যাহা তাহা বলিয়া কথা ঢাকিতে যায় নাই! ভাবিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে—এসব সর্বজয়া পছন্দ করে না। অপুর ছেলে-মানুষির জন্য সবজয়ার মন তৃষিত হইয়া থাকে, অপু না বাড়ুক, সে সব সময় তাহাদের উপরে একান্ত নির্ভরশীল ছোট্ট খোকাটি হইয়া থাকুক—সর্বজয়া যেন মনে মনে ইহাই চায়। কিন্তু তাহার অপু যে একেবারে বদলাইয়া যাইতেছে।···

অপুর উপর মাঝে মাঝে তাহার অত্যন্ত রাগ হয়। সে কি জানে না—তাহার মা কি রকম ছটফট করিতেছে বাড়িতে! একবারটি কি এতদিনের মধ্যে আসিতে নাই? ছেলেবেলায় সন্ধ্যার পর এ-ঘর হইতে ও-ঘরে যাইতে হইলে মায়ের দরকার হইত, মা খাওয়াইয়া না দিলে খাওয়া হইত না—এই সেদিনও তো। এখন আর মাকে দরকার হয় না—না? বেশ—তাহারও ভাবিবার দায় পড়িয়া গিয়াছে, সে আর ভাবিবে না। বয়স হইয়া আসিল, এখন ইহচিন্তা করিয়া কাল কাটাইবার সময়, ছেলে হইয়া স্বর্গে ধ্বজা তুলিবে কি না!

কিন্তু শীঘ্রই সর্বজয়া অবিষ্কার করিল—ছেলের কথা না ভাবিয়া সে একদণ্ডও থাকিতে পারে না। এতদিন সে ছেলের কথা প্রতিদিনের প্রতি-মুহূর্তে ভাবিয়া আসিয়াছে। অপুর সহিত অসহযোগ করিলে জীবনটাই যেন ফাঁকা অর্থহীন, অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়ে—তাহার জীবনে আর কিছুই নাই—এক অপু ছাড়া!···

এক একদিন নির্জন দুপুর বেলা ঘরে বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদে।

সে দিন বৈকালে সে ঘরে বসিয়া কার্পাস তুলার বীজ ছড়াইতেছিল, হঠাৎ সম্মুখের ছোট ঘুলঘুলি জানালার ফাঁক দিয়া বাড়ির সামনের পথের দিকে তাহার চোখ পড়িল। পথ দিয়া কে যেন যাইতেছে—মাথার চুল ঠিক যেন অপুর মত, ঘন কালো, বড় বড় ঢেউ খেলানো, সর্বজয়ার মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল—এ অঞ্চলের মধ্যে এ রকম চুল তো কখনও কারও দেখি নি কোনদিন—সেই শত্তুরের মত চুল অবিকল!···

তাহার মনটা কেমন উদাস অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তুলার বীজ ছাড়াইতে আর আগ্রহ থাকে না।

হঠাৎ ঘরের দরজায় কে যেন টোকা দিল। তখনি আবার মৃদু টোকা। সর্বজয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোর খুলিয়া ফেলে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারে না।

অপু দুষ্টুমি-ভরা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে। নিচু হইয়া প্রণাম করিবার আগেই সর্বজয়া পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ছেলেকে জড়াইয়া ধরিল।

অপু হাসিয়া বলিল--টের পাওনি তুমি, না মা? আমি ভাবলাম আস্তে আস্তে উঠে দরজায় টোকা দেবো।

সে মাম্‌জোয়ানের মেলা দেখিতে আসিয়া একবার বাড়িতে না আসিয়া থাকিতে পারে নাই। এত নিকটে আসিয়া মা'র সঙ্গে দেখা হইবে না! পুলিনের নিকট রেলভাড়া ধার লইয়া তবে আসিয়াছে। একটা পুঁটুলি খুলিয়া বলিল, তোমার জন্যে ছুঁচ আর গুলিসুতো এনেচি—আর এই দ্যাখো কেমন কাঁচা পাঁপর এনেছি মুগের ডালের—সেই কাশীতে তুমি ভেজে দিতে!

অপুর চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। অন্য ধরণের জামা গায়ে—কী সুন্দর মানাইয়াছে! সবজয়া বলে, বেশ জামাটা—এবার বুঝি কিনেচিস?

মা'র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া অপু খুব খুশী। জামাটা ভাল করিয়া দেখাইয়া বলিল—সবাই বলে জামাটার রং চমৎকার হয়েচে—চাঁপাফুলের মত হবে ধুয়ে এলে—এই তো মোটে কোরা।

বোর্ডিংএ গিয়া অপু এই কয় মাস মাস্টার ও ছাত্রদের মধ্যে যাহাকেই মনে মনে প্রশংসা করে, কতকটা নিজের জ্ঞাতসারে কতকটা অজ্ঞাতসারে তাহারই হাবভাব, কথা বলিবার ভঙ্গি নকল করিয়াছে। সত্যেনবাবুর, রমাপতির, দেবব্রতের, নতুন আঁকের মাস্টারের। সবজয়ার যেন অপুকে নতুন নতুন ঠেকে। পুরাতন অপু যেন আর নাই। অপু তো এ রকম মাথা পিছনের দিকে হেলাইয়া কথা বলিত না? সে তো পকেটে হাত পুরিয়া এ ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইত না?

সন্ধ্যার সময় মায়ের রাঁধিবার স্থানটিতে অপু পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গল্প করে। সবজয়া আজ অনেকদিন পরে রাত্রে রাঁধিতে বসিয়াছে।—সেখানে কত ছেলে একসঙ্গে থাকে? এক ঘরে ক'জন? দু'বেলাতেই মাছ দেয়? পেট ভরিয়া ভাত দেয় তো? কি খাবার খায় সে বৈকালে? কাপড় নিজে কাচিতে হয়? সে তাহা পারে তো!—পড়াশুনার কথা সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিতে জানে না, শুধু খাওয়ার কথাই জিজ্ঞাসা করে। অপুর হাসিতে, ঘাড় দুলুনিতে, হাত-পা নাড়াতে, ঠোঁটের নিচের ভঙ্গিতে সর্বজয়া আবার পুরানো অপু, চিরপরিচিত অপুকে ফিরিয়া পায়। বুকে চাপিতে ইচ্ছা করে। সে অপুর গল্প শোনে না, শুধু মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে।

—হাতে পায়ে বল পেলাম মা, এক এক সময় মনে হ'ত—অপু ব'লে কেউ

ছিল না, ও যেন স্বপ্ন দেখিচি, আবার ভাবতাম—না, সেই চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মুখের তিল—স্বপ্ন নয়, সত্যিই তো—রাঁধতে বসেও কেবল মনে হয় মা, অপুর আসা স্বপ্ন হয় তো, সব মিথ্যে—তাই কেবল ওর মুখেই চেয়ে ঠাউরে দেখি—

অপু চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে সর্বজয়া তেলিগিন্নির কাছে গল্প করিয়াছিল।

পরদিনটাও অপু বাড়ি রহিল।

যাইবার সময় মাকে বলিল—মা, আমাকে একটা টাকা দাও না? কতকগুলো ধার আছে এ মাসে, শোধ করব, দেবে?

সর্বজয়ার কাছে টাকা ছিল না, বিশেষ কখনও থাকে না। তেলিরা ও কুণ্ডুরা জিনিসপত্রটা, কাপড়খানা, সিধাটা—এই রকমই দিয়া সাহায্য করে। নগদ টাকাকড়ি কেহ দেয় না! তবু ছেলের পাছে কষ্ট হয় এজন্য সে তেলিগিন্নির নিকট হইতে একটা টাকা ধার করিয়া আনিয়া ছেলের হাতে দিল।

সন্ধ্যাব আগে অপু চলিয়া গেল, ক্রোশ দুই দূরে স্টেশন, সন্ধ্যার পরেই ট্রেন।

বৎসর দুই কোথা দিয়া কাটিয়া গেল।

অপু ক্রমেই বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে, খরচে আয়ে কিছুতেই আর কুলাইতে পারে না। নানাদিকে দেনা—কতভাবে হুঁশিয়ার হইয়াও কিছু হয় না। এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দুই বেলা খাইল, নিজে সাবান দিয়া কাপড় কাচিল, লজেঞ্চুস্ ভুলিয়া গেল।

পরদিনই আবার বোর্ডিং-এর ছেলেদের দল চাঁদা করিয়া হালুয়া খাইবে। অপু হাসিমুখে সমীরকে বলিল—দু' আনা ধার দিবি সমীর, হালুয়া খাবো? —দু' আনা ক'রে চাঁদা—ওই ওরা ওখানে করছে—কিসমিস দিয়ে বেশ ভাল ক'রে করচে—

সমীরের কাছে অপুর দেনা অনেক। সমীর পয়সা দিল না।

প্রতিবার বাড়ি হইতে আসিবার সময় সে মায়ের যৎসামান্য আয় হইতে টাকাটা আধুলিটা প্রায়ই চাহিয়া আনে—মা না দিতে চাহিলে রাগ করে, অভিমান করে, সর্বজয়াকে দিতেই হয়।

ইহার মধ্যে আবার পটু মাঝে মাঝে আসিয়া ভাগ বসাইয়া থাকে। সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই পড়াশুনার। নানাস্থানে ঘুরিয়াছে, ভগ্নীপতি অর্জুন চক্রবর্তী তো তাহাকে বাড়ি ঢুকিতে দেয় না। বিনিকে এ সব লইয়া কম গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই বা কম চোখের জল ফেলিতে হয় নাই; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পটু নিরাশ্রয় ও নিরবলম্ব অবস্থায় পথে পথেই ঘোরে, যদিও পড়াশুনার আশা সে এখনও অবধি ছাড়ে নাই। অপু তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সুবিধা করিতে পারে নাই। দু'তিন মাস হয়ত দেখা নাই, হঠাৎ একদিন কোথা হইতে পুঁটলি বগলে করিয়া আসিয়া হাজির হয়, অপু তাহাকে যত্ন করিয়া রাখে, তিন-চারদিন ছাড়ে না, সে না চাহিলেও যখন যাহা পারে হাতে গুঁজিয়া দেয়—টাকা পারে না, সিকিটা, দুয়ানিটা। পটু নিশ্চিন্দিপুরে আর যায় না—তাহার বাবা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন—সৎমা দেশের বাড়িতে তাঁহার দুই মেয়ে লইয়া থাকেন, সেখানে ভাই বোন কেহই আর যায় না। পটুকে দেখিল অপুর ভারি একটা সহানুভূতি হয়, কিন্তু ভাল করিবার তাহার হাতে আর কি ক্ষমতা আছে?

একদিন রাসবিহারী আসিয়া দু'আনা পয়সা ধার চাহিল। রাসবিহারী গরীবের ছেলে, তাহা ছাড়া পড়াশুনায় ভাল নয় বলিয়া বোর্ডিং-এ খাতিরও পায় না। অপুকে সবাই দলে নেয়, পয়সা দিতে না পারিলেও নেয়। কিন্তু তাহাকে পৌছেও না। অপু এ সব জানিত বলিয়াই তাহার উপর কেমন একটা করুণা। কিন্তু আজ সে নানা কারণে রাসবিহারীর প্রতি সন্তুষ্টই ছিল না। বলিল, আমি কোথায় পাবো পয়সা? আমি কি টাকার গাছ?—দিতে পারবো না যাও।—রাসবিহারী পীড়াপীড়ি শুরু করিল। কিন্তু অপু একেবারে বাঁকিয়া বসিল।—বলিল, কখনো দেবো না তোমায়—যা পারো করো।

রমাপতির কাছে ছেলেদের একখানা মাসিক পত্র আসে তাহাতে সে একদিন 'ছায়াপথ' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িল। 'ছায়াপথ' কাহাকে বলে ইহার আগে জানিত না—এতবড় বিশাল কোন জিনিসের ধারণাও কখনো করে নাই—নক্ষত্রের সম্বন্ধেও কিছু জানা ছিল না। শরতের আকাশ রাত্রে মেঘমুক্ত—বোর্ডিং-এর পিছনে খেলার কম্পাউণ্ডে রাত্রে দাঁড়াইয়া ছায়াপথটা প্রথম দেখিয়া সে কী আনন্দ! জলজলে সাদা ছায়াপথটা কালো আকাশের বুক চিরিয়া কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে শুধু নক্ষত্রে ভরা!...

কাঁঠাল-তলাটায় দাঁড়াইয়া সে কতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—নবজাগ্রত মনের প্রথম বিস্ময়!...

পৌষ মাসের প্রথমে অপুর নিজের একটু সুবিধা ঘটিল। নতুন ডেপুটিবাবুর বাসাতে ছেলেদের জন্য একজন পড়াইবার লোক চাই। হেডপণ্ডিত তাহাকে ঠিক করিয়া দিলেন। দু'টি ছেলে পড়ানো, থাকা ও খাওয়া।

দুই-তিনদিনের মধ্যেই বোর্ডিং হইতে বাসা উঠাইয়া অপু সেখানে গেল। বোর্ডিং-এ অনেক বাকী পড়িয়াছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তলে তলে হেডমাস্টারের কাছে এসব কথা রিপোর্ট করিয়াছেন, যদিও অপু তাহা জানে না।

বাহিরের ঘরে থাকিবার জায়গা স্থির হইল। বিছানা-পত্র গুছাইয়া পাতিয়া লইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া রাঁধুনি ঠাকুরের ডাকে বাড়ির মধ্যে খাইতে গেল। দালানে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল—একজন কে পাশের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ হইতে তাহার খাওয়া দেখিতেছেন। একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে তিনি সরিয়া আসিলেন। খুব সুন্দরী মহিলা, তাহার মায়ের অপেক্ষাও বয়স অনেক—অনেক কম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাড়ি কোথায়?

অপু ঘাড় না তুলিয়া বলিল, মনসাপোতা—অনেক দূর এখেন থেকে—

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—শুধু মা আছেন, আর কেউ না।

—তোমার বাবা বুঝি...ভাই বোন ক'টি তোমরা?

—এখন আমি একা। আমার দিদি ছিল—সে সাত-আট বছর হ'ল মারা গিয়েচে।—

কোনো রকমে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া সে উঠিয়া আসিল। শীতকালেও সে যেন ঘামিয়া উঠিয়াছে!

পরদিন সকালে অপু বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া আসিয়া দেখিল, বছর তেরো বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে ছোট্ট একটি খোকার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে দাঁড়াইয়া আছে। অপু বুঝিল—সে কাল রাত্রের পরিচিতা মহিলাটির মেয়ে। অপু আপন মনে বই গুছাইয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, মেয়েটি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ অপুর ইচ্ছা হইল, মেয়েটির সামনে কিছু পৌরুষ দেখাইবে—কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই, শিখায় নাই, আপনা আপনি তাহার মনে হইল। হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া সে নিজের অঙ্কের ইনস্ট্রুমেন্ট বাক্সটা বিনা কারণে খুলিয়া প্রোটেক্টর, সেট্‌স্কোয়ার,

কম্পাসগুলোকে বিছানার উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া পুনরায় সেগুলি বাক্সে সাজাইতে লাগিল। কি জানি কেন অপুর মনে হইল, এই ব্যাপারেই তাহার চরম পৌরুষ দেখানো হইবে। মেয়েটি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, কোনো কথা বলিল না, অপুও কোনো কথা বলিল না।

আলাপ হইল সেদিন সন্ধ্যায়। সে স্কুল হইতে আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছে, মেয়েটি আসিয়া লাজুক চোখে বলিল—আপনাকে মা খাবার খেতে ডাকচেন।

আসন পাতা—পরোটা, বেগুন ভাজা, আলু চচ্চড়ি, চিনি। অপু চিনি পছন্দ করে না, গুড়ের মত জিনিস নাই, কেন ইহারা এমন সুন্দর গরম গরম পরোটা চিনি দিয়া খায়?···

মেয়েটি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল—মাকে বলব আর দিতে?

—না; তোমরা চিনি খাও কেন? গুড় তো ভাল—

মেয়েটি বিস্মিতমুখে বলিল—কেন, আপনি চিনি খান না?

ভালবাসি নে—রুগীর খাবার—খেজুর গুড়ের মত কি আর খেতে ভাল? মেয়েটির সামনে তাহার আদৌ লজ্জা ছিল না, কিন্তু এই সময়ে মহিলাটি ঘরে ঢোকাতে অপুর লম্বা লম্বা কথা বন্ধ হইয়া গেল। মহিলাটি বলিলেন—ওকে দাদা ব'লে ডাকবি নির্মলা, কাছে ব'সে খাওয়াতে হবে রোজ। ও দেখছি যে-রকম লাজুক, এ পর্যন্ত তো আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না—না দেখলে আধপেটা খেয়ে উঠে যাবে।

অপু লজ্জিত হইল। মনে মনে ভাবিল ইঁহাকে সে মা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু লজ্জায় পারিল না, সুযোগ কোথায়? এমনি খামোকা মা বলিয়া ডাকা—সে বড়—সে তাহা পারিবে না।

মাসখানেক ইঁহাদের বাড়ি থাকিতে থাকিতে অপুর কতকগুলি নতুন বিষয়ে জ্ঞান হইল। সবাই ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আটপৌরে পোশাক-পরিচ্ছদও সুদৃশ্য ও সুরুচিসম্মত। মেয়েদের শাড়ি পরিবার ধরণটি বেশ লাগে, একে সবাই দেখিতে সুশ্রী, তাহার উপর সুদৃশ্য শাড়ি-সেমিজে আরও সুন্দর দেখায়। এই জিনিসটি অপু কখনও জানিত না, বড়লোকের বাড়ি থাকিবার সময়েও নহে, কারণ সেখানে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে তাহার অনভ্যস্ত চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল—সহজ গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারের পর্যায়ে তাহাকে সে ফেলিতে পারে নাই।

অপু যে-সমাজ, যে-আবহাওয়ায় মানুষ—সেখানকার কেহ এ ধরণের সহজ সৌন্দর্যময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়। নানা জায়গায় বেড়াইয়া নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহার আজকাল চোখ ফুটিয়াছে, সে আজকাল বুঝিতে

পারে নিশ্চিন্দিপুরে তাহাদের গৃহস্থালী ছিল দবিদ্রের, অতি দরিদ্রের গৃহস্থালী। শিল্প নয়, শ্রী ছাঁদ নয়, সৌন্দর্য নয়, শুধু খাওয়া আব থাকা।

নির্মলা আসিয়া কাছে বসিল। অপু অ্যালজেব্রাব শক্ত আঁক কষিতেছিল, নির্মলা নিজেব বইখানা খুলিয়া বলিল—আমায় ইংরেজিটা একটু ব'লে দেবেন দাদা? অপু বলিল—এসে জুটলে? এখন ওসব হবে না, ভারী মুশকিল, একটা আঁকও সকাল থেকে মিললো না।

নির্মলা নিজে বসিয়া পডিতে লাগিল। সে বেশ ইংরেজি জানে, তাহাব বাবা যত্ন করিয়া শিখাইয়াছেন, বাংলাও খুব ভাল জানে।

একটু পডিয়াই সে বইখানা বন্ধ করিয়া অপুর আঁক কষা দেখিতে লাগিল। খানিকটা আপন মনে চুপ কবিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর আর একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া অপুব কাঁধে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিল—এদিকে ফিরুন দাদা, আচ্ছা এই পদ্যটা মিলিয়ে—

অপু বলিল—যাও। আমি জানি নে, ওই তো তোমার দোষ নির্মলা, আঁক মিলচে না, এখন তোমাব পদ্য মেলাবাব সময়—আচ্ছা লোক—

নির্মলা মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—এ পদ্যটা আর মেলাতে হয় না আপনাব —বলুন দিকি—সেই গাছ গাছ নয়, যাতে নেই ফল—

অপু আঁক-কষা ছাডিয়া বলিল—মিলবে না? আচ্ছা ছাখো—পরে খানিকটা আপন মনে ভাবিয়া বলিল—সেই লোক লোক নয় যার নেই বল—হল না?

নির্মলা লাইন দু'টি আপন মনে আবৃত্তি করিয়া বুঝিয়া দেখিল কোথাও কানে বাধিতেছে কি না। ঘাড নাডিয়া বলিল, আচ্ছা এবার বলুন তো আব একটা—

—আমি আর বলব না—তুমি ওরকম দুষ্টুমি কর কেন? আমি আঁকগুলো কষে নিই, তারপর যত ইচ্ছা পদ্য মিলিয়ে দেবো—

—আচ্ছা এই একটা—সেই ফুল ফুল নয়, যার—

—মাকে এখুনি উঠে গিয়ে ব'লে আসবো, নির্মলা—ঠিক বলছি, ওরকম যদি—

নির্মলা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ওবেলা কে খাবার ব'য়ে আনে বাইরের ঘরে দেখবো···

এরকম প্রায়ই হয়, অপু ইহাতে ভয় পায় না। বেশ লাগে নির্মলাকে।

পূজার পর নির্মলার এক মামা বেড়াইতে আসিলেন। অপু শুনিল, তিনি নাকি বিলাৎফেরৎ—নির্মলার ছোট ভাই নন্তুর নিকট কথাটা শুনিল। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়, রোগা শ্যামবর্ণ। এ লোক বিলাতফেরৎ।

বাল্যে নদীর ছায়াময় বৈকালে পুরাতন 'বঙ্গবাসী'তে পড়া সেই বিলাতযাত্রীর চিঠির মধ্যে পঠিত আনন্দভরা পুরাতন পথ বাহিয়া মরুভূমির পার্শ্বের সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া, নীল ভূমধ্যসাগরমধ্যস্থ দ্রাক্ষাকুঞ্জ-বেষ্টিত কর্সিকা দূরে ফেলিয়া সেই মধুর স্বপ্নমাখা পথ-যাত্রা।

এই লোকটা সেখানে গিয়াছিল? এই নিতান্ত সাধারণ ধরণের মানুষটা—যে দিব্য নিরীহমুখে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মোচার ঘণ্ট দিয়া ভাত খাইতেছে!

দু'এক দিনেই নির্মলার মামা অমরবাবুর সহিত তাহার খুব আলাপ হইয়া গেল।

বিলাতের কত কথা সে জানিতে চায়। পথের ধারে সেখানে কি সব গাছপালা? আমাদের দেশের পরিচিত কোন গাছ সেখানে আছে? প্যারিস খুব বড শহর? অমরবাবু নেপোলিয়নের সমাধি দেখিয়াছেন? ডোভারের খড়ির পাহাড? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নাকি নানা অদ্ভুত জিনিস আছে—কি কি? আর ভেনিস?—ইতালির আকাশ নাকি দেখিতে অপূর্ব?

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ছেলে, এত সব কথা জানিবার কৌতূহল হইল কি করিয়া অমরবাবু বুঝিতে পারেন না। এত আগ্রহ করিয়া শুনিবার মত জিনিস সেখানে কি আর আছে! একঘেয়ে—ধোঁয়া—বৃষ্টি—শীত। তিনি পয়সা খরচ করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন সাবান-প্রস্তুত প্রণালী শিখিবার জন্য, পথের ধারের গাছপালা দেখিতে যান নাই বা ইতালির আকাশের রং লক্ষ্য করিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময়ের প্রাচুর্যও তাঁর ছিল না।

নির্মলাকে অপুর ভাল লাগে, কিন্তু সে তাহা দেখাইতে জানে না। পরের বাড়ি বলিয়াই হউক, বা একটু লাজুক প্রকৃতির বলিয়াই হউক, সে বাহিরের ঘরে শান্তভাবে বাস করে—কি তাহার অভাব, কোন্‌টা তাহার দরকার, সে কথা কাহাকেও জানায় না। অপুর এই উদাসীনতা নির্মলার বড় বাজে, তবুও সে না চাহিতেই নির্মলা তাহার ময়লা বালিশের ওয়াড় সাবান দিয়া নিজে কাচিয়া দিয়া যায়, গামছা পরিষ্কার করিয়া দেয়, ছেঁড়া কাপড় বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া মাকে দিয়া সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আনিয়া দেয়। নির্মলা চায় অপূর্ব-দাদা তাহাকে ফাই ফরমাশ করে, তাহার প্রতি হুকুমজারি করে; কিন্তু অপু কাহারও উপর কোন হুকুম কোনোদিন করিতে জানে না—এক মা ছাড়া। দিদি ও মায়ের সেবায় সে অভ্যস্ত বটে, তাও সে সেবা অযাচিত ভাবে পাওয়া যাইত তাই। নইলে অপু কখনও হুকুম করিয়া সেবা আদায় করিতে শিখে নাই। তা ছাড়া সে সমাজের যে স্তরের মধ্যে মানুষ, ডেপুটিবাবুরা

সেখানকার চোখে ব্রহ্মলোকবাসী দেবতার সমকক্ষ জীব। নির্মলা ডেপুটিবাবুর বড় মেয়ে—রূপে, বেশভূষায়, পড়াশুনায়, কথাবার্তায় একমাত্র লীলা ছাড়া সে এ পর্যন্ত যত মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কি করিয়া নির্মলার উপর হুকুমজারি করিবে? নির্মলা তাহা বোঝে না—সে দাদা বলিয়া ডাকে, অপুর প্রতি একটা আন্তরিক টানের পরিচয় তাহার প্রতি কাজে—কেন অপূর্ব-দাদা তাহাকে প্রাণপণে খাটাইয়া লয় না, নিষ্ঠুরভাবে অযথা ফাই-ফরমাস করে না? তাহা হইলে সে খুশী হইত।

চৈত্র মাসের শেষে একদিন ফুটবল খেলিতে খেলিতে অপুর হাঁটুটা কি ভাবে মচ্‌কাইয়া গিয়া সে মাঠে পড়িয়া গেল। সঙ্গীরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া ডেপুটিবাবুর বাসায় দিয়া গেল। নির্মলার মা ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরে আসিলেন, কাছে গিয়া বলিলেন—দেখি দেখি, কি হয়েছে? অপুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর মুখ ঘামে ও যন্ত্রণায় রাঙা হইয়া গিয়াছে, ডান পা-খানা সোজা করিতে পারিতেছে না। মনিয়া চাকর নির্মলার মা'র স্লিপ লইয়া ডাক্তারখানায় ছুটিল। নির্মলা বাড়ি ছিল না, ভাইবোনদের লইয়া গাড়ি করিয়া মুন্সেফবাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিল। একটু পরে সরকারী ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সন্ধ্যার আগে নির্মলা আসিল। সব শুনিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল—কই দেখি, বেশ হয়েছে—দস্যিবৃত্তি করার ফল হবে না? ভারী খুশী হয়েছি আমি—

নির্মলা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। অপু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল—যাক না, আর কখনও যদি কথা কই—

আধ ঘণ্টা পরেই নির্মলা আসিয়া হাজির। কৌতুকের সুরে বলিল -পায়ের ব্যথা-ট্যথা জানি নে, গরম জল আনতে ব'লে দিয়ে এলাম, এমন ক'রে সেঁক দেবো—লাগে তো লাগ্‌বে—দুষ্টুমি করার বাহাদুরি বেরিয়ে যাবে—কমলা লেবু খাবেন একটা—না, তাও না?

মনিয়া চাকর গরম জল আনিলে নির্মলা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ব্যথার উপর সেঁক দিল; নির্মলার ভাইবোনেরা সব দেখিতে আসিয়া ধরিল—ও দাদা, এইবার একটা গল্প বলুন না। অপুর মুখে গল্প শুনিতে সবাই ভালবাসে।

নির্মলা বলিল—হাঁ্যা, দাদা এখন পাশ ফিরে শুতে পারছেন না—এখন গল্প না বললে চলবে কেন?···চুপ ক'রে ব'সে থাকো সব—নয়তো বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দেব।

পরদিন সকালটা নির্মলা আসিল না। দুপুরের পর আসিয়া বৈকাল পর্যন্ত বসিয়া নানা গল্প করিল, বই পড়িয়া শুনাইল। বাড়ির ভিতর হইতে

থালায় করিয়া আখ ও শাঁখ-আলু কাটিয়া লইয়া আসিল। তাহার পর তাহাদের পদ্যমেলানোর আর অন্ত নাই। নির্মলার পদটি মিলাইয়া দিয়াই অপু তাহাকে আর একটা পদ মিলাইতে বলে—নির্মলাও অল্প কয়েক মিনিটে তাহার জবাব দিয়া অন্য একটি প্রশ্ন করে।···কেহ কাহাকেও ঠকাইতে পারে না।

ডেপুটিবাবুর স্ত্রী একবার বাহিরের ঘরে আসিতে আসিতে শুনিয়া বলিলেন —বেশ হয়েছে, আর ভাবনা নেই—এখন তোমরা ছ্'ভাইবোনে একটা কবির দল খুলে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াও গিয়ে—

অপু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ডেপুটিবাবুর স্ত্রীর বড় সাধ অপু তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। সে আড়ালে তাঁহাকে মা বলে, তাহা তিনি জানেন—কিন্তু সামনাসামনি অপু কখনো তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে নাই, এজন্য ডেপুটিবাবুর স্ত্রী খুব দুঃখিত।

অপু যে ইচ্ছা করিয়া করে না তাহা নহে। ডেপুটিবাবুর বাসায় থাকিবার কথা এবার সে বাড়িতে গিয়া মায়ের কাছে গল্প করাতে সর্বজয়া ভারী খুশী হইয়াছিল। ডেপুটিবাবুর বাড়ি! কম কথা নয়।···সেখানে কি করিয়া থাকিতে হইবে, চলিতে হইবে সে বিষয়ে ছেলেকে নানা উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিল—ডেপুটিবাবুর বউকে মা ব'লে ডাকবি—আর ডেপুটিবাবুকে বাবা ব'লে ডাকবি—

অপু লজ্জিত মুখে বলিয়াছিল—হ্যাঁ, আমি ওসব পারবো না—

সর্বজয়া বলিয়াছিল—তাতে দোষ কি?—বলিস, তাঁরা খুশী হবেন—কম একটা বড়লোকের আশ্রয় তো নয়!—তাহার কাছে সবাই বড় মানুষ।

অপু তখন মায়ের নিকট রাজী হইয়া আসিলেও এখানে তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। মুখে কেমন বাধে, লজ্জা করে।

একদিন—অপু তখন একমাস হইল সারিয়া উঠিয়াছে—নির্মলা বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া কি বই পড়িতেছিল, ঘোর বর্ষা সারা দিনটা, বেলা বেশী নাই—বৃষ্টি একটু কমিয়াছে। অপু বিনা ছাতায় কোথা হইতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিতেই নির্মলা বই মুড়িয়া বলিয়া উঠিল—এঃ, আপনি যে দাদা ভিজে একেবারে—

অপুর মনে যে জন্যেই হউক খুব স্ফূর্তি ছিল—তাহার দিকে চাহিয়া বলিল —চট্ ক'রে চা আর খাবার—তিন মিনিটে—

নির্মলা বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এ রকম তো কখনও হুকুমের সুরে অপূর্বদা বলে না! সে হাসিমুখে মুখ টিপিয়া বলিল—পারবো না তিন মিনিটে—ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিনা একেবারে!

অপু হাসিয়া বলিল—আর তো বেশীদিন না—আর তিনটি মাস তোমাদের জ্বালাবো, তারপর চলে যাচ্ছি—

নির্মলার মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোথায় যাবেন!

—তিন মাস পরেই এগ্‌জামিন—দিয়েই চলে যাবো, কলকাতায় পড়বো পাশ হলে—

নির্মলা এতদিন সম্ভবত এটা ভাবিয়া দেখে নাই, বলিল—আর এখানে থাকবেন না?

অপু ঘাড় নাড়িল। খানিকটা থামিয়া কৌতুকের সুরে বলিল—তুমি তো বাঁচো, যে খাটুনি—তোমার তো ভাল—ওকি? বা রে—কি হলো—শোন নির্মলা—

হঠাৎ নির্মলা উঠিয়া গেল কেন—চোখে কি কথায় তাহার এত জল আসিয়া পড়িল, বুঝিতে না পারিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত হইল। আপন মনে বলিল—আর ওকে ক্ষ্যাপাবো না—ভারী পাগল—আহা, ওকে সব সময় খোঁচা দিই—সোজা খেটেছে ও, যখন পা ভেঙ্গে পড়ে ছিলাম পনেরো দিন ধরে, জানতে দেয় নি যে আমি নিজের বাড়িতে নেই—

ইহার মধ্যে আবার একদিন পটু আসিল। ডেপুটিবাবুর বাসাতে অপু উঠিয়া আসিবার পর সে কখনও আসে নাই। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বাসায় ঢুকিল। এক-পা ধুলা, রুক্ষ চুল, হাতে পুঁটুলি। সে কোন সুবিধা খুঁজিতে আসে নাই, এদিকে আসিলে অপুর সঙ্গে দেখা না করিয়া সে যাইতে পারে না। পটুর মুখে অনেকদিন পর সে রাণুদির খবর পাইল। পাড়াগাঁয়ের নিঃসহায় নিরুপায় ছেলেদের অভ্যাসমত সে গ্রামের যত মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো শুরু করিয়াছে। বাপের বাড়ির লোক, অনেকের হয়ত বা খেলার সঙ্গী, মেয়েরা আগ্রহ করিয়া রাখে, ছাড়িয়া দিতে চাহে না, যে কয়টা দিন থাকে খাওয়া সম্বন্ধে নির্ভাবনা। কোন স্থানে দু'দিন, কোথাও পাঁচদিন —মেয়েরা আবার আসিতে বলে, যাবার সময় খাবার তৈয়ারী করিয়া সঙ্গে দেয়। এ এক ব্যবসা পটু ধরিয়াছে মন্দ নয়—ইহার মধ্যে সে তাহাদের পাড়ার সব মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে দু-চার বার ঘুরিয়া আসিয়াছে।

এইভাবেই একদিন রাণুদির শ্বশুরবাড়ি সে গিয়াছে—সে গল্প করিল। রাণুদির শ্বশুরবাড়ি রাণাঘাটের কাছে—তাঁহারা পশ্চিমে কোথায় চাকুরী উপলক্ষ্যে থাকেন—পূজার সময় বাড়ি আসিয়াছিলেন, সপ্তমী পূজার দিন অনাহূতভাবে পটু গিয়া হাজির। সেখানে আট দিন ছিল। রাণুদির যত্ন

কি। তাহার দুরবস্থা শুনিয়া গোপনে তিনটা টাকা দিয়াছিল, আসিবার সময় নতুন ধুতি চাদর, এক পুঁটুলি বাসি লুচি সন্দেশ।

অপু বলিল—আমার কথা কিছু বললে না।

—শুধুই তোর কথা। যে কয়দিন ছিলাম, সকালে সন্ধ্যাতে তোর কথা। তারা আবার একাদশীর দিনই পশ্চিমে চলে যাবে, আমাকে রাণুদি বললে, ভাড়ার টাকা দিচ্ছি, তাকে একবার নিয়ে আয় এখানে—ছ'বচ্ছর দেখা হয় নি —তা আমার আবার জ্বর হ'ল—দিদির বাড়ি এসে দশ-বারো দিন পড়ে রইলাম —তোর ওখানে আর যাওয়া হ'ল না—ওরাও চলে গেল পশ্চিমে—

—ভাড়ার টাকা দেয় নি?

পটু লজ্জিত মুখে বলিল—হ্যাঁ, তোর আর আমার যাতায়াতের ভাড়া হিসেব ক'রে—সেও খরচ হয়ে গেল, দিদি কোথায় আর পাবে, আমার সেই ভাড়াব টাকা থেকে নেবু ডালিম ওষুধ—সব হ'ল। রাণুদির মতন অমন মেয়ে দেখি নি অপুদা, তোর কথা বলতে তার চোখে জল পড়ে—

হঠাৎ অপুর গলা যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—সে তাড়াতাড়ি কি দেখিবার ভান করিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিল।

—শুধু রাণুদি না, যত মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গেলাম, রাণীদি, আশালতা, ওপাড়ার সুনয়নীদি—সবাই তোর কথা আগে জিজ্ঞেস করে—

ঘণ্টা দুই থাকিয়া পটু চলিয়া গেল।

দেওয়ানপুর স্কুলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়। খরচ-পত্র করিয়া কোথাও যাইতে হইল না। পরীক্ষার পর হেডমাস্টার মিঃ দত্ত অপুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—বাড়ি যাবে কবে?

এই কয় বৎসরে হেডমাস্টারের সঙ্গে তাহার কেমন একটা নিবিড় সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, দু'জনের কেহই এতদিনে জানিতে পাবে নাই সে বন্ধন কতটা দৃঢ়।

অপু বলিল—সামনের বুধবারে যাব ভাবছি।

—পাশ হলে কি করবে ভাবছো? কলেজে পড়বে তো?

—কলেজে পডবার খুব ইচ্ছে, স্যর।

—যদি স্কলারশিপ না পাও?

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে।

—ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, বাইবেলের একটা জায়গা পড়ে শোনাই তোমাকে—

মিঃ দত্ত খ্রীষ্টান। ক্লাসে কতদিন বাইবেল খুলিয়া চমৎকার চমৎকার উক্তি

তাহাদের পড়িয়া শুনাইয়াছেন, অপুর তরুণ মনে বুদ্ধদেবের পীতবাসধারী সৌম্যমূর্তির পাশে, তাহাদের গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালক্ষীর পাশে, বোষ্টমদাদু নরোত্তম দাসের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পাশে, দীর্ঘদেহ শান্তনয়ন যীশুর মূর্তি কোন্ কালে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল—তাহাব মন যীশুকে বর্জন করে নাই, কাঁটার মুকুট পরা, লাঞ্ছিত, অপমানিত এক দেবোন্মাদ যুবককে মনে প্রাণে বরণ কবিতে শিখিয়াছিল।

মিঃ দত্ত বলিলেন—কলকাতাতেই পড়ো—অনেক জিনিস দেখবার শেখবার আছে—কোন কোন পাড়াগাঁয়ের কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কলকাতাকেই ভাল বলি।

অপু অনেকদিন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কলেজে পড়িবে এবং কলিকাতার কলেজেই পড়িবে।

মিঃ দত্ত বলিলেন—স্কুল লাইব্রেরীর 'লে মিজারেব্ল্'-খানা তুমি খুব ভালবাসতে—ওখানা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, আমি আর একখানা কিনে নেবো।

অপু বেশী কথা বলিতে জানে না—এখনও পারিল না—মুখচোরার মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হেডমাস্টারের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হেডমাস্টারের মনে হইল—তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের শিক্ষক-জীবনে এ রকম আর কোন ছেলের সংস্পর্শে তিনি কখনও আসেন নাই।—ভাবময় স্বপ্নদর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন! হয়ত একটু নির্বোধ, একটু অপরিণামদর্শী—কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, জ্ঞান-পিপাসু ও জিজ্ঞাসু। মনে মনে তিনি বালকটিকে বড় ভালবাসিয়াছিলেন।

তাঁহার জাবনে এই একটি আসিয়াছিল, চলিয়া গেল। ক্লাসে পড়াইবার সময় ইহার কৌতূহলী ডাগর চোখ ও আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজীর ঘণ্টায় কত নতুন কথা, কত গল্প, ইতিহাসের কাহিনী বলিয়া যাইতেন—ইহার নীরব, জিজ্ঞাসু চোখ দু'টি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ জোর করিয়া পাঠ আদায় করিয়া লইয়াছে, সেরূপ আর কেহ পারে নাই, সে প্রেরণা সহজ লভ্য নয়, তিনি তাহা জানেন।

গত চার বৎসরের স্মৃতি-জড়ানো দেওয়ানপুর হইতে বিদায় লইবার সময়ে অপুর মন ভাল ছিল না। দেবব্রত বলিল—তুমি চলে গেলে, অপূর্বদা এবার পড়া ছেড়ে দেবো।

নির্মলার সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা। ফাল্গুন মাসের অপূর্ব অদ্ভুত দিনগুলি। বাতাসে কিসের যেন মৃদু স্নিগ্ধ, অনির্দেশ্য সুগন্ধ। আমের বউলের সুবাস

সকালের রৌদ্রকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অপুর আনন্দ সে-সব হইতে আসে নাই—গত কয়েকদিন ধরিয়া সে রাইডার হ্যাগার্ডের 'ক্লিওপেট্রা' পড়িতেছিল। তাহার তরুণ কল্পনাকে অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়াছে বইখানা! কোথায় এই হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন সমাধি—জ্যোৎস্নাভরা নীলনদ, বিস্মৃত 'রা' দেবের মন্দির!—ঔপন্যাসিক হ্যাগার্ডের স্থান সমালোচকের মতে যেখানেই নির্দিষ্ট হউক তাহাতে আসে যায় না—তাহার নবীন, অবিকৃত মন একদিন যে গভীর আনন্দ পাইয়াছিল বইখানা হইতে—এইটাই বড় কথা তাহার কাছে।

নির্মলার সহিত দেখা অপুর মনের সেই অবস্থায়,—অপ্রকৃতিস্থ, মত্ত, রঙীন —সে তখন শুধু একটা সুপ্রাচীন রহস্যময়, অধুনালুপ্ত জাতির দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্লিওপেট্রা? হউন তিনি সুন্দরী—তাঁহাকে সে গ্রাহ্য করে না। পিরামিডের অন্ধকার গর্ভগৃহে বহু হাজার বৎসরের সুপ্তি ভাঙিয়া সম্রাট মেঙ্কাউরা গ্রানাইট পাথরের সমাধি-সিন্দুকে যখন রোষে পার্শ্বপরিবর্তন করেন—মনুষ্য সৃষ্টির পূবেকার জনহীন আদিম পৃথিবীর নীরবতার মধ্যে শুধু সিহোর নদী লিবিয়া মরুভূমির বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়—অপূর্ব রহস্যে ভরা মিশর। অদ্ভুত নিয়তির অকাট্য লিপি। তাহার মন সারা দুপুর আর কিছু ভাবিতে চায় না।

গরম বাতাসে দমকা ধূলাবালি উড়াইয়া আনিতেছিল বলিয়া অপু দরজা ভেজাইয়া বসিয়াছিল, নির্মলা দরজা ঠেলিয়া ঘরে আসিল। অপু বলিল—এস এস, আজ সকালে তো তোমাদের স্কুলে প্রাইজ হ'ল—কে প্রাইজ দিলেন, মুন্সেফবাবুর স্ত্রী, না? ঐ মোটা-মত যিনি গাড়ি থেকে নামলেন, উনিই তো?

—আপনি বুঝি ওদিকে ছিলেন তখন? মাগো, কি মোটা?—আমি তো কখনো—পরে হঠাৎ যেন পড়িল এইভাবে বলিল, তারপর আপনি তো যাবেন আজ, না দাদা?

—হ্যাঁ, দুটোর গাড়িতে যাবো—রামধারিয়াকে একটু ডেকে নিয়ে এস তো —জিনিসপত্তরগুলো একটু বেঁধে দেবে।

—রামধারিয়া কি আপনার চিরকাল ক'রে দিয়ে এসেছে নাকি? কই কি জিনিস আগে বলুন না।

দুইজনে মিলিয়া বইয়ের ধূলা ঝাড়িয়া গোছানো, বিছানা বাঁধা চলিল। নির্মলা অপুর ছোট টিনের তোরঙ্গটা খুলিয়া বলিল—মাগো! কি ক'রে রেখেছেন বাক্সটা! কাপড়ে, কাগজে, বইয়ে হাণ্ডুল পাণ্ডুল—আচ্ছা এত বাক্সে কাগজ কি হবে দাদা? ফেলে দেবো?···

অপু বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ—না না—ওসব ফেলো না।

সে আজ দুই-তিন বছরের চিঠি, নানা সময়ে নানা কথা লেখা কাগজের টুকরা সব জমাইয়া রাখিয়াছে। অনেক স্মৃতি জড়ানো সেগুলির সঙ্গে, পুরাতন সময়কে আবার ফিরাইয়া আনে—সেগুলি প্রাণ ধরিয়া অপু ফেলিয়া দিতে পারে না। কবে কোন্ কালে তাহার দিদি দুর্গা নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে আদর করিয়া তাহাকে কোন্ বন হইতে একটা পাখীর বাসা আনিয়া দিয়াছিল, কতকালের কথা,—বাসাটা আজও বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে—বাবার হাতের লেখা একখানা কাগজ—আরও কত কি।

নির্মলা বলিল—এ কি! আপনার মোটে দুখানা কাপড, আর জামা নেই?

অপু হাসিয়া বলিল—পয়সাই নেই হাতে তা জামা! নইলে ইচ্ছা তো আছে সুকুমারের মত একটা জামা করাবো—ওতে আমাকে যা মানায়—ওর রংটাতে—

নির্মলা ঘাড নাড়িয়া বলিল—থাক থাক, আর বাহাদুরি করতে হবে না। এই রইল চাবি, এখুনি হারিয়ে ফেলবেন না যেন আবার। আমি মিশির ঠাকুরকে বলে দিয়েছি, এখুনি লুচি ভেজে আনবে—দাঁডান, দেখি গিয়ে আপনার গাডির কত দেরি?

—এখনও ঘণ্টা দুই। মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে যাবো, আবার হয়ত কত দিন পরে আসবো তার ঠিক কি?

—আসবেনই না। আপনাকে আমি বুঝি নি ভাবছেন? এখান থেকে চলে গেলে আপনি আবার এ-মুখো হবেন?—কখ্খনো না।

অপু কি প্রতিবাদ করিতে গেল, নির্মলা বাধা দিয়া বলিল—সে আমি জানি! এই দু'বছর আপনাকে দেখে আসছি দাদা, আমার বুঝতে বাকী নেই, আপনার শরীরে দয়া মায়া কম।

—কম?—বা রে—এ তো তুমি—আমি বুঝি—

—দাঁডান, দেখি গিয়ে মিশির ঠাকুর কি করছে—তাডা না দিলে সেকি আর—

নির্মলার মা যাইবার সময় চোখের জল ফেলিলেন। কিন্তু নির্মলা বাডির মধ্যে কি কাজে ব্যস্ত ছিল, মায়ের বহু ডাকাডাকিতেও সে কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিতে পারিল না। অপু স্টেশনের পথে যাইতে যাইতে ভাবিল—নির্মলা আচ্ছা তো! একবার বার হ'ল না—যাবার সময়টা দেখা হ'ত—আচ্ছা খামখেয়ালি!

যখন তখন রেলগাডিতে চড়াটা ঘটে না বলিয়াই রেলে চড়িলেই তাহার

একটা অপূর্ব আনন্দ হয়। ছোট্ট তোরঙ্গ ও বিছানাটার মোট লইয়া জানালার ধারে বসিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কত কথা মনে আসিতেছিল। এখন সে কত বড় হইয়াছে—একা একা ট্রেনে চড়িয়া বেড়াইতেছে। তারপর এমনি একদিন হয়ত নীল নদের তীরে, ক্লিওপেট্রার দেশে—এক জ্যোৎস্না রাতে শত শত প্রাচীন সমাধির বুকের উপর দিয়া অজানা সে যাত্রা।

স্টেশনে নামিয়া বাড়ি যাইবার পথে একটা গাছতলা দিয়া যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে কেমন একটা সুগন্ধ—মাটির, ঝরা পাতার কোন্ ফুলের। ফাল্গুনের তপ্ত রৌদ্র গাছে গাছে পাতা ঝরাইয়া দিতেছে, মাঠের ধারে অনেক গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে—পলাশের ডালে রাঙা রাঙা নতুন ফোটা ফুল যেন আরতির পঞ্চপ্রদীপের ঊর্ধ্বমুখী শিখার মত জ্বলিতেছে। অপুর মন যেন আনন্দে শিহরিয়া ওঠে—যদিও সে ট্রেনে আজ সারা পথ শুধু নির্মলা আর দেবব্রতের কথা ভাবিয়াছে···কখনো শুধুই নির্মলা, কখনো শুধুই দেবব্রত—তাহার স্কুল-জীবনে এই দুইটি বন্ধু যতটা তাহার প্রাণের কাছাকাছি আসিয়াছিল, অতটা নিকটে অমনভাবে আর কেহ আসিতে পারে নাই, তবুও তাহার মনে হয় আজকের আনন্দের সঙ্গে নির্মলার সম্পর্ক নাই, দেবব্রতের নাই—আছে তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যজীবনের স্নিগ্ধস্পর্শ, আর বহুদূর-বিসর্পিত, রহস্যময় কোন্ অন্তরের ইঙ্গিত—সে মনে বালক হইলেও এ-কথা বোঝে।

প্রথম যৌবনের শুরু, বয়ঃসন্ধিকালের রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে,—এই ছায়া, বকুলের গন্ধ, বনান্তরে অবসন্ন ফাল্গুনদিনে পাখির ডাক, ময়ূরকণ্ঠী রং-এর আকাশটা—রক্তে যেন এদের নেশা লাগে—গর্ব, উৎসাহ, নবীন জীবনের আনন্দভরা প্রথম পদক্ষেপ। নির্মলা তুচ্ছ! আর এক দিক হইতে ডাক আসে—অপু আশায় আশায় থাকে।

নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির এ আহ্বান, রোমান্সের আহ্বান—তার রক্তে মেশানো, এ আসিয়াছে তাহার বাবার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে—বন্ধনমুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হওয়া, মন কি চায় না-বুঝিয়াই তাহার পিছু পিছু দৌড়ানো, এ তাহার নিরীহ শান্ত-প্রকৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পিতামহ রামহরি তর্কালঙ্কারের দান নয়—যদিও সে তাঁর নিস্পৃহ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়ন-প্রিয়তাকে লাভ, করিয়াছে বটে। কে জানে পূর্ব-পুরুষ ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত আছে কি-না—

তাই তাহার মনে হয় কি যেন একটা ঘটিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় থাকে।

অপূর্ব গন্ধে-ভরা বাতাসে, নবীন বসন্তের শ্যামলশ্রীতে, অস্তসূর্যের রক্ত আভায় সে রোমান্সের বার্তা যেন লেখা থাকে।

বাড়িতে অপু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিল। কলিকাতায় যদি পড়িতে যায় স্কলারশিপ না পাইলে কি কোন সুবিধা হইবে? সর্বজয়া কখনও জীবনে কলিকাতা দেখে নাই—সে কিছু জানে না। পড়া তো অনেক হইয়াছে আর পড়ার দরকার কি?—অপুর মনে কলেজে পড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কলেজে পড়িলে মানুষ বিদ্যার জাহাজ হয়। সবাই বলিবে কলেজের ছেলে।

মাকে বলিল—না-ই যদি স্কলারশিপ পাই, তাই বা কি? এরকম ক'রে হয়ে যাবে—রমাপতিদা বলে, কত গরীবের ছেলে কলকাতায় পড়চে, গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই নাকি সুবিধা হলে যাবে, ও আমি ক'রে নেবো মা—

কলিকাতায় যাইবার পূর্বদিন রাত্রে আগ্রহে উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইল না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করে, বুকের মধ্যেও। গলায় যেন কি আটকাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্য সে কাল এমন সময় কলিকাতায় বসিয়া আছে।··· কলিকাতায়!···কলিকাতা সম্বন্ধে কত গল্প, কত কি সে শুনিয়াছে। অতবড় শহর আর নাই। কত কি অদ্ভুত জিনিস দেখিবার আছে, বড় বড় লাইব্রেরী আছে সে শুনিয়াছে, বই চাহিলেই সেখানে বসিয়া পড়িতে দেয়।

বিছানায় শুইয়া সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। বাড়ির পিছনের তেঁতুল গাছের ডালপালা অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে, ভোর আর কিছুতেই হয় না। হয়ত তাহার কলিকাতা যাওয়া ঘটিবে না, কলেজে পড়া ঘটিবে না, কত লোক হঠাৎ মারা গিয়াছে, এমনি হয়ত সেও মরিয়া যাইতে পারে। কলকাতা না দেখিয়া, কলেজে অন্তত কিছুদিন পড়ার আগে যেন সে না মরে!—দোহাই ভগবান।

কলিকাতায় সে কাহাকেও চেনে না, কোথায় গিয়ে উঠিবে ঠিক জানা নাই, পথঘাটও জানা নাই। মাসকতক আগে দেবব্রত তাহাকে নিজের এক মেসোমশাইয়ের কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিল, দরকার হইলে এই ঠিকানায় গিয়া তাহার নাম করিলেই তিনি আদর করিয়া থাকিবার স্থান দিবেন। ট্রেনে উঠিবার সময় অপু সে-কাগজখানা বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। রেলের পুরানো টাইমটেবলের পিছন হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা কলিকাতা শহরের নক্সা তাহার টিনের তোরঙ্গটার মধ্যে অনেকদিন আগে ছিল, সেখানাও বাহির করিয়া বসিল।

ইহার পূর্বেও অপু শহর দেখিয়াছে, তবুও ট্রেন হইতে নামিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের সম্মুখে বড় রাস্তায় একবার আসিয়া দাঁড়াইতেই সে অবাক হইয়া গেল। এরকম কাণ্ড সে কোথায় দেখিয়াছে? ট্রামগাড়ি ইহার নাম? আর এক রকমের গাড়ি নিঃশব্দে দৌড়াইয়া চলিয়াছে, অপু কখনও না দেখিলেও মনে মনে আন্দাজ করিল, ইহারই নাম মোটর গাড়ি। সে বিস্ময়ের সহিত দু-একখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল; স্টেশনের অফিস ঘরে সে মাথার উপর একটা কি চাকার মত জিনিস বন্ বন্ বেগে ঘুরিতে দেখিয়াছে, সে আন্দাজ করিল উহাই ইলেকৃট্রিক পাখা।

যে-ঠিকানা বন্ধু দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে এক মহা মুশকিলের ব্যাপার, পকেটে রেলের টাইমটেবলের মোড়ক হইতে সংগ্রহ করা কলিকাতার যে নক্সা ছিল তাহা মিলাইয়া হ্যারিসন রোড খুঁজিয়া বাহির করিল। জিনিসপত্র তাহার এমন বেশী কিছু নহে, বগলে ছোট বিছানাটি ও ডান হাতে ভারী পুঁটুলিটা ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে সামনে পাওয়া গেল আমহার্স্ট ষ্ট্রীট। তাহার পর আরও খানিক ঘুরিয়া সে পঞ্চানন দাসের গলি বাহির করিল।

অখিলবাবু সন্ধ্যার আগে আসিলেন, কালো নাদুস নুদুস চেহারা, অপুর পরিচয় ও উদ্দেশ্য শুনিয়া খুশী হইলেন ও খুব উৎসাহ দিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া তখনই খাবার আনাইয়া অপুকে খাইতে দিলেন, সারাদিন খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিজের সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য আসনখানি মেসের ছাদে পাতিয়াও আহ্নিক করিতে ভুলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সে মেসের ছাদে শুইয়া পড়িল। সারাদিন বেড়াইয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

'সে তো কলিকাতায় আসিয়াছে—মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ দেখিতে পাইবে তো?...বায়োস্কোপ দেখিবে...এখানে খুব বড় বায়োস্কোপ আছে সে জানে। তাহাদের দেওয়ানপুরের স্কুলে একবার একটা ভ্রমণকারী বায়োস্কোপের দল গিয়াছিল, তাহাতেই সে জানে বায়োস্কোপ কি অদ্ভুত দেখিতে। তবে এখানে নাকি বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখায়। সেখানে তাহা ছিল না—রেলগাড়ি দৌড়াইতেছে, একটা লোক হাত পা নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া লোক হাসাইতেছে —এই সব। এখানে বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখিতে চায়। অখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, বায়োস্কোপ যেখানে হয়, এখান থেকে কত দূর?

অখিলবাবুর মেসে থাইয়া অপু ইহার পরামর্শমত নানাস্থানে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, কোথাও বা থাকিবার স্থানের জন্য, কোথাও বা ছেলে পড়াইবার সুবিধার জন্য, কাহারও কাছে বা কলেজে বিনা বেতনে ভর্তি হইবার যোগা-

যোগের জন্য। এদিকে কলেজে ভর্তি হইবার সময়ও চলিয়া যায়, সঙ্গে যে কয়টা টাকা ছিল তাহা পকেটে লইয়া একদিন সে ভর্তি হইতে বাহির হইল। প্রেসিডেন্সী কলেজের দিকে সে ইচ্ছা করিয়াই ঘেঁসিল না, সেখানে সবদিকেই খরচ অত্যন্ত বেশী। মেট্রোপলিটান কলেজ গলির ভিতর, বিশেষতঃ পুরানো ধরণের বলিয়া সেখানেও ভর্তি হইতে ইচ্ছা হইল না। মিশনারীদের কলেজ হইতে একদল ছেলে বাহির হইয়া সিটি কলেজে ভর্তি হইতে চলিয়াছিল, তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়া কেরানীর নিকট হইতে কাগজ চাহিয়া নাম লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটার গড়ন ও আকৃতি তাহার কাছে এত খারাপ ঠেকিল যে, কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অবশেষে রিপন কলেজের বাড়ি তাহার কাছে বেশ ভাল ও উঁচু মনে হইল। ভর্তি হইয়া সে আর একটি ছেলের সঙ্গে ক্লাস-রুমগুলি দেখিতে গেল। ক্লাসে ইলেকট্রিক পাখা। কি করিয়া খুলিতে হয়? তাহার সঙ্গী দেখাইয়া দিল। সে খুশীর সহিত তাহার নীচে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, এত হাতের কাছে ইলেকট্রিক পাখা পাইয়া বার বার পাখা খুলিয়া বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

অখিলবাবুদের মেসে থাকা ও পড়াশুনা দুইয়েরই ঘোর অসুবিধা। এক একঘরের মেজেতে তিনটি ট্রাঙ্ক, কতকগুলি জুতার বাক্স, কালি বুরুশ, তিনটি হুঁকা। ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নাই, রাত্রে আলো সবদিন জ্বলে না। ঘর দেখিয়া মনে হয় ইহার অধিবাসীগণের জীবনে মাত্র দুইটি উদ্দেশ্য আছে— অফিসে চাকরি করা ও মেসে আসিয়া খাওয়া ও ঘুমানো। এক এক ঘরে যে তিনটি বাবু থাকেন তাঁহারা ছ'টার সময় অফিস হইতে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া যে যাঁর বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে থাকেন, একটু আধটু গল্পগুজব যা হয়, প্রায়ই অফিস সংক্রান্ত; তারপরেই আহারাদি সারিয়া নিদ্রা। অখিলবাবু কোথায় ছেলে পড়ান, অফিসের পর সেখান হইতে ফিরিতে দেরি হইয়া যায়। তিনিও সারাদিন খাটুনির পর মেসে আসিয়া শুইয়া পড়েন।

অপু এ রকম ঘরে এতগুলি লোকের সহিত এক বিছানায় কখনও শুইতে অভ্যস্ত নয়, রাত্রে তাহার যেন হাঁপ ধরে, ভাল ঘুম হয় না। কিন্তু অন্য কোথাও কোনরকম সুবিধা না হইলে সে যাইবে কোথায়? তাহা ছাড়া অপুর আর এক ভাবনা মায়ের জন্য। স্কলারশিপ পাইলে সেই টাকা হইতে মাকে কিছু কিছু পাঠাইবার আশ্বাস সে আসিবার সময় দিয়া আসিয়াছে কিন্তু কোথায় বা স্কলারশিপ, কোথায় বা কি। মা'র কিরূপে চলিতেছে, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনাই তাহার আরও প্রবল হইল।

মাসের শেষে অখিলবাবু অপুর জন্য একটা ছেলে পড়ানো ঠিক করিয়া দিলেন, দুইবেলা একটা ছোট ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে, মাসে পনেরো টাকা।

অখিলবাবুর মেসে পরের বিছানায় শুইয়া থাকা তাহার পছন্দ হয় না। কিন্তু কলেজ হইতে ফিরিয়া পথে কয়েকটি মেসে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, পনেরো টাকা মাত্র আয়ে কোনো মেসে থাকা চলে না। তাহার ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিলিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত, নিজেরাই রাঁধিয়া খাইত, অপুকে তাহারা লইতে রাজী হইল।

যে তিনটি ছেলে একসঙ্গে ঘর ভাড়া করিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইহাদের মধ্যে সুরেশ্বরের আয় কিছু বেশী, এম-এ ক্লাসের ছাত্র, চল্লিশ টাকার টিউশনি আছে। জানকী যেন কোথায় ছেলে পড়াইয়া কুড়ি টাকা পায়। নির্মলের আয় আরও কম। সকলের আয় একত্র করিয়া যে মাসে যাহা অকুলান হয়, সুরেশ্বর নিজেই তাহা দিয়া দেয়, কাহাকেও বলে না। অপু প্রথমে তাহা জানিত না, মাস দুই থাকিবার পর তাহার সন্দেহ হইল প্রতিমাসে সুরেশ্বর পঁচিশ-ত্রিশটাকা দোকানের দেনা শোধ করে, অথচ কাহারও নিকট চায় না কেন? সুরেশ্বরের কাছে একদিন কথাটা তুলিলে, সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বেশী এমন কিছু দেয় না, যদিই বা দেয়—তাহাতেই বা কি? তাহাদের যখন আয় বাড়িবে তখন তাহারাও অনায়াসে দিতে পারিবে, কেহ বাধা দিবে না তখন।

নির্মল রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে খুব শক্তি, সুগঠিত মাংসপেশী, চওড়া বুক। অপুর মতই বয়স। হাতের ভিতর একটা কাগজের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল—নতুন মটরশুঁটি লঙ্কা দিয়ে ভেজে—

অপু হাত হইতে ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখি? পরে হাসিমুখে বলিল—সুরেশ্বরদা, স্টোভ ধরিয়ে নিন—আমি মুড়ি আনি—ক'পয়সার আনবো? এক-দুই-তিন-চার—

—আমার দিকে আঙুল দিয়ে গুণো না ওরকম—

অপু হাসিয়া নির্মলের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—তোমার দিকেই আঙুল বেশী ক'রে দেখাবো—তিন-তিন-তিন—

নির্মল তাহাকে ধরিতে যাইবার পূর্বে সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল—একরাশ বই এনেছে কলেজের লাইব্রেরী

থেকে—এতেও পড়তে পারে—মায় মমসেনের রোমের হিস্ট্রি এক ভল্যুম—

অপুর গলা মিষ্টি বলিয়া সন্ধ্যার পর সবাই গান গাওয়ার জন্য ধরে। কিন্তু পুরাতন লাজুকপনা তাহার এখনও যায় নাই, অনেক সাধ্যসাধনার পর একটি বা দুটি গান গাহিয়া থাকে, আর কিছুতেই গাওয়ানো যায় না। কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতার সে বড় ভক্ত, নির্মলের চেয়েও। যখন কেহ ঘরে থাকে না, নির্জনে হাত-পা নাড়িয়া আবৃত্তি করে—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত

মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে,

একদা ছিলেন সুপ্ত।

ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে অপুর সবচেয়ে ভাল লাগে। সবদিন তাঁহার ক্লাস থাকে না—কলেজের পড়ায় কোন উৎসাহ থাকে না সেদিন। কালো রিবন-ঝোলানো পাঁশ-নে চশমা পরিয়া উজ্জ্বলচক্ষু মিঃ বসু ক্লাসরুমে ঢুকিলেই সে নড়িয়া চড়িয়া সংযত হইয়া বসে, বক্তৃতার প্রত্যেক কথা মন দিয়া শোনে। এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। অপুর ধারণায় মহাপণ্ডিত।—গিবন বা মমসেন বা লর্ড ব্রাইস্ জাতীয়। মানবজাতীর সমগ্র ইতিহাস—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উত্থানপতনের কাহিনী তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ছবির মত পড়িয়া আছে।

ইতিহাসের পরে লজিকের ঘণ্টা। হাজিরা ডাকিয়া অধ্যাপক পড়ানো শুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে কমিতে শুরু করিল। অপু এ ঘণ্টায় পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া লাইব্রেরী হইতে লওয়া ইতিহাস, উপন্যাস বা কবিতার বই পড়ে, অধ্যাপকের কথার দিকে এতটুকু মন দেয় না, শুনিতে ভাল লাগে না। সেদিন একমনে অন্য বই পড়িতেছে হঠাৎ অধ্যাপক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটা সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু ক্লাস হঠাৎ নীরব হইয়া যাওয়াতে তাহার চমক ভাঙ্গিল, চাহিয়া দেখিল সকলেরই চোখ তাহার দিকে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অধ্যাপক বলিলেন—তোমার হাতে একখানা লজিকের বই?

অপু বলিল—না স্যার, প্যালগ্রেভের গোলডেন ট্রেজারি—

—তোমাকে যদি আমার ঘণ্টায় পার্সেণ্টেজ না দিই? পড়া শোনো না কেন?

অপু চুপ করিয়া রহিল। অধ্যাপক তাহাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। জানকী চিম্‌টি কাটিয়া বলিল—হ'ল তো? রোজ রোজ বলি লজিকের ঘণ্টায় আমাদের সঙ্গে পালাতে—তা শোনা হয় না—আয় চলে—

দেড়শত ছেলের ক্লাস। পিছনের বেঞ্চের সামনের দরজাটি ছেলেরা ইচ্ছা

করিয়া খুলিয়া রাখে পলাইবার সুবিধার জন্য। জানকী এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পরে বিরাজ। অপুও মহাজনদের পথ ধরিল। নীচে আসিলে লাইব্রেরীয়ান বলিল—কি রায় মশায়, আমাদেব পার্বণীটা কি পাব না ?

অপু খুব খুশী হয়। কে তাহাকে চিনিত পাঁচ মাস আগে! এতবড কলিকাতা শহর, এতবড কলেজ, এত ছেলে। এখানেও তাহাকে রায় মশায় বলিয়া খাতির করিতেছে, তাহার কাছে পার্বণী চাহিতেছে! হাসিয়া বলে—কাল এনে দোব ঠিক সত্যবাবু, আজ ভুলে গেছি—আপনি এক ভল্যুম গিবন্ দেবেন কিন্তু আজ—

উৎসাহে পডিয়া গিবন্ বাডি লইয়া যায় বটে কি ভাল লাগে না। এত খুঁটিনাটি বিরক্তিকর মনে হয়। পরদিন সেখানা ফেরত দিয়া অন্য ইতিহাস লইযা গেল।

পূজার কিছু পূর্বে অপুদের বাসা উঠিয়া গেল। খরচে আয়ে অনেকদিন হইতেই কুলাইতেছিল না, সুরেশ্বরের ভাল টিউশনিটা হঠাৎ হাতছাডা হইল—কে বাডিতে খরচ চালায় ? নির্মল ও জানকী অন্য কোথাও চলিয়া গেল, সুবেশ্বব গিয়া মেসে উঠিল। অপুব যে মাসিক আয়, কলেজের মাহিনা দিয়া তাহা হইতে বারো টাকা বাঁচে—কলিকাতা শহরে বারো টাকায় যে কিছুতেই চলিতে পারে না, অপুর সে জ্ঞান এতদিনেও হয় নাই। সুতরাং সে ভাবিল বাবো টাকাতেই চলিবে, খুব চলিবে। বারো টাকা কি কম টাকা।

কিন্তু বারো টাকা আয়ও বেশীদিন রহিল না, একদিন পডাইতে গিয়া শুনিল, ছেলেব শরীর খারাপ বলিয়া ডাক্তার হাওয়া বদলাইতে বলিয়াছে, পডাশুনা এখন বন্ধ থাকিবে। এক মাসের মাহিনা তাহারা বাডতি দিয়া জবাব দিল।

টাকা কয়টি পকেটে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া অপু আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ফুটপাথ বাহিয়া চলিল। সুরেশ্বরের মেসে সে জিনিসপত্র বাখিয়া দিয়াছে, সেইখানেই গেস্ট-চার্জ দিয়া খায়, রাত্রে মেসের বারান্দাতে শুইয়া থাকে। টাকা যাহা আছে, মেসের দেনা মিটাইতে যাইবে। সামান্য কিছু হাতে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার পর ?

সুবেশ্বরের মেসে আসিয়া নিজের নামের একখানি পত্র ডাকবাক্সে দেখিল। হাতের লেখাটা সে চেনে না—খুলিয়া দেখিল চিঠিখানা মায়ের, কিন্তু অপরের হাতের লেখা। হাতে ব্যথা হইয়া মা বড কষ্ট পাইতেছেন, অপু কি তিনটি টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে ? মা কখনো কিছু চান না, মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ

সহ্য করেন, সে-ই বরং দেওয়ানপুরে থাকিতে নানা ছল-ছুতায় মাঝে মাঝে কত টাকা মায়ের কাছ হইতে লইয়াছে। হাতে না থাকিলেও তেলিবাড়ি হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া মা যোগাড় করিয়া দিতেন। খুব কষ্ট না হইলে কখনো মা তাহাকে টাকার জন্য লেখেন নাই।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিয়া দেখিল সাতাশটি টাকা আছে। মেসের দেনা সাড়ে পনেরো টাকা বাদে সাড়ে এগারো টাকা থাকে। মাকে কত টাকা পাঠানো যায়? মনে মনে ভাবিল—তিনটে টাকা তো চেয়েছেন, আমি দশ টাকা পাঠিয়ে দিই, মনিঅর্ডার পিওন যখন টাকা নিয়ে যাবে, মা ভাববেন, বুঝি তিন টাকা কিংবা হয়তো দুটাকার অনিঅর্ডার—জিজ্ঞেস করবেন, কত টাকা? পিওন যেই বলবে দশ টাকা, মা অবাক্ হয়ে যাবেন। মাকে তাক লাগিয়ে দেবো—ভারী মজা, বাড়িতে গেলে মা শুধু সেই গল্পই করবেন দিনরাত—

অপ্রত্যাশিত টাকা প্রাপ্তিতে মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা কল্পনা করিয়া অপু ভারী খুশী হইল। বৌবাজার পোস্টাফিস হইতে টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া সে ভাবিল—বেশ হ'ল। আহা, মাকে কেউ কখনো দশ টাকার অনিঅর্ডার এক সঙ্গে পাঠায় নি—টাকা পেয়ে খুশী হবেন। আমার তো এখন রইল দেড় টাকা, তারপর একটা কিছু ঠিক হয়ে যাবেই।

কলেজের একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরীব ছাত্র, ঢাকা জেলায় বাড়ি, নাম প্রণব মুখার্জি। খুব লম্বা, গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। কলেজ-লাইব্রেরীতে এক সঙ্গে বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে দু'জনের আলাপ। এমন সব বই দু'জনে লইয়া যায়, যাহা সাধারণ ছাত্রেরা পড়ে না, নামও জানে না। ফার্স্ট-ইয়ারের ছেলেকে মম্‌সেন লইতে দেখিয়া প্রণব তাহার দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

অপু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, প্রণবের পড়াশুনা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। অনেক গ্রন্থকারের নামও সে কখনও শোনে নাই—নীট্‌শে, এমার্সন, টুর্গেনিভ, ব্রেস্টেড্—প্রণবের কথায় সে উহাদের বই পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই উৎসাহে সে পুনরায় ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সহিত গিবন্ শুরু করিল, ইলিয়াডের অনুবাদ পড়িল।

অপুর পড়াশুনার কোনও বাঁধাবাঁধি রীতি নাই। যখন যাহা ভাল লাগে, কখনও ইতিহাস, কখনও নাটক, কখনও কবিতা, কখনও প্রবন্ধ, কখনও বিজ্ঞান। প্রণব নিজে অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়। সে বলিল, ওতে কিছু হবে না, ওরকম পড় কেন?

অপু চেষ্টা করিয়াও পড়াশুনায় শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না। লাইব্রেরী-

ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড় বড় বইয়ে ভরা আলমারির দৃশ্য তাহাকে দিশাহারা করিয়া দেয়। সকল বই খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়,—Gases of the Atmosphere—স্যার উইলিয়াম র‍্যামজের। সে পড়িয়া দেখিবে কি কি গ্যাস! Extinet Animals—ই. রে. ল্যান্‌কাস্টার, জানিবার তার ভয়ানক আগ্রহ! Worlds Around Us—প্রক্টর! উঃ, বইখানা না পড়িলে রাত্রে ঘুম হইবে না। প্রণব হাসিয়া বলে—দূর! ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া পড়া খেলা—

এত বড় লাইব্রেরী, এত বই! নক্ষত্রজগৎ হইতে শুরু করিয়া পৃথিবীর জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, আনুবীক্ষণিক, প্রাণিকুল, ইতিহাস, সব সংক্রান্ত বই। তাহার অধীর উৎসুক মন চায় এই বিশ্বের সব কথা জানিতে। বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক—একবার বইগুলি খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়! লুপ্ত প্রাণীকুল সম্বন্ধে খানকতক ভাল বই পড়িল—অলিভার লজের Pioneers ot Science—বড় বড় নীহারিকাদের ফটো দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নীট্‌শে ভাল বুঝিতে না পারিলেও দু-তিনখানা বই পড়িল। টুর্গেনেভ একেবারে শেষ করিয়া ফেলিল, বারোখানা না ষোলখানা বই। চোখের সামনে টুর্গেনেভ এক নতুন জগৎ খুলিয়া দিযা গেল—কি অপূর্ব হাসি-অশ্রুমাখানো কল্পলোক।

প্রণবের কাছেই সে সন্ধান পাইল, শ্যামবাজারে এক বড়লোকের বাড়ি দরিদ্র ছাত্রদের খাইতে দেওয়া হয়। প্রণবের পরামর্শে সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল। এ পর্যন্ত কখনও কিছু সে চায় নাই, কাহারও কাছে চাহিতে পারে না; আত্মমর্যাদাবোধের জন্য নহে, লাজুকতা ও আনাড়ীপনার জন্য। এতদিন সে-সবের দরকারও হয় নাই, কিন্তু আর যে চলে না।

খুব বড়লোকের বাড়ি; দারোয়ান বলিল—কি চাই?

অপু বলিল, এখানে গরীব ছেলেদের খেতে দেয়, তাই জানতে—কাকে বলবো জানো?

দারোয়ান তাহাকে পাশের দিকে একটা ছোট ঘরে লইয়া গেল।

ইলেকট্রিক পাখার তলায় একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন—এখানে কি দরকার আপনার?

অপু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—এখানে কি পুওর ষ্টুডেন্টদের খেতে দেওয়া হয়? তাই আমি—

—আপনি দরখাস্ত করেছিলেন?

কিসের দরখাস্ত অপু জানে না।

—জুন মাসে দরখাস্ত করতে হয়, আমাদের নাম্বার লিমিটেড কিনা, এখন

আর খালি নেই! আবার আসছে বছর—তাছাড়া, আমরা ভাবছি ওটা উঠিয়ে দেবো, এস্টেট রিসিভারের হাতে যাচ্ছে, ও-সব আর সুবিধে হবে না।

ফিরিবার সময় গেটের বাহিরে আসিয়া অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। কখনও সে কাহারও নিকট কিছু চায় নাই, চাহিয়া বিমুখ হইবার দুঃখ কখনও ভোগ করে নাই, চোখে তাহার প্রায় জল আসিল।

পকেটে মাত্র আনা দুই পয়সা অবশিষ্ট আছে—এই বিশাল কলিকাতা শহরে তাহাই শেষ অবলম্বন। কাহাকেই বা সে এখানে চেনে, কাহার কাছে যাইবে? অখিলবাবুর মেসে দুই মাস সে প্রথম খাইয়াছে, সেখানে যাইতে লজ্জা করে। সুরেশ্বরের নিজেরই চলে না; তাহার উপর সে কখনও জুলুম করতে পারিবে না।

আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল! কোনদিন সুরেশ্বরের মেসে এক বেলা খাইয়া, কোনদিন বা জানকীর কাছে কাটাইয়া চলিতেছিল। একদিন সারাদিন না খাওয়ার পর সে নিরুপায় হইয়া অখিলবাবুর মেসে সন্ধ্যার পর গেল। অখিলবাবু অনেকদিন পর তাহাকে পাইয়া খুশী হইলেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিলেন। বলি বলি করিয়াও অপু নিজের দুর্দশার কথা অখিলবাবুকে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে হয়তো তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না, সেখানে থাকিতে বাধ্য করিবেন। সে জুলুম করা হয় অনর্থক।

কিন্তু এদিকে আর চলে না। এক জায়গায় বই, এক জায়গায় বিছানা। কোথায় কখন রাত কাটাইবে কিছু ঠিক নাই—ইহাতে পড়াশুনা হয় না। পরীক্ষাও নিকটবর্তী। না খাইয়াই বা কয় দিন চলে!

অখিলবাবুর মেস হইতে ফিরিবার পথে একটা খুব বড় বাড়ি। ফটকের কাছে মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। এই বাড়ির লোকে যদি ইচ্ছা করে তবে এখনি তাহার কলিকাতায় থাকার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। সাহস করিয়া যদি সে বলতে পারে, তবে হয়তো এখনি হয়। একবার সে বলিয়া দেখিবে?

কোথাও কিছু সুবিধা না হইলে, তাহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিতে হইবে। এই লাইব্রেরী, এত বই, বন্ধুবান্ধব, কলেজ—সব ফেলিয়া হয়তো মনসাপোতায় গিয়া আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পড়াশুনা তাহার কাছে একটা রোমান্স, একটা অজানা বিচিত্র জগৎ দিনে দিনে চোখের সামনে খুলিয়া যাওয়া, ইহাকে সে চায়, ইহাই এতদিন চাহিয়া আসিয়াছে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাকরি,

অর্থোপার্জন—এসব কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যে কোন-দিন এসব সাংসারিক কথা ঢোকে নাই—সে চায় এই অজানার রোমান্স—এই বিচিত্র ভাবধারার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। প্রাচীন দিনের জগৎ অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল শূন্যের দৃশ্য, অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্ররাজি, ফরাসী বিদ্রোহ—নানা কথা। এই সব ছাড়িয়া শালগ্রাম হাতে মনসাপোতায় বাড়ি-বাড়ি ঠাকুর পূজা··· ।

অপুর মনে হইল—এই রকমই বড় বাড়ি আছে লীলাদের, কলিকাতারই কোন জায়গায়। অনেকদিন আগে লীলা তাহাকে বলিয়াছিল, কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে থাকিয়া পড়িতে। সে ঠিকানা জানে না—কোথায় লীলাদের বাড়ি, কে-ই বা এখানে তাহাকে বলিয়া দিবে, তাহা ছাড়া সে-সব আজ ছয় সাত বছরের কথা হইয়া গেল, এতদিন কি-আর লীলা তাহার কথা মনে রাখিয়াছে? কোন্ কালে ভুলিয়া গিয়াছে।

অপু ভাবিল—ঠিকানা জানলেই কি আর আমি সেখানে যেতে পারতাম, না, গিয়ে কিছু বলতে—সে আমার কাজ নয়—তার ওপর এই অবস্থায়! দূর তা কখনও হয়? তাছাড়া লীলার বিয়ে-থাওয়া হয়ে এতদিন সে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছে। সে-সব কি আর আজকের কথা?

ক্লাসে জানকী একদিন একটা সুবিধার কথা বলিল। সে ঝামাপুকুর কোন্ ঠাকুরবাড়িতে রাত্রে খায় না। সকালে কোথায় ছেলে পড়াইয়া একবেলা তাহাদের সেখানে খায়। সম্প্রতি সে বোনের বিবাহে বাড়ি যাইতেছে, ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপু রাত্রে ঠাকুরবাড়িতে তাহার বদলে খাইতে পারে। বাড়ি যাইবার পূর্বে ঠাকুরবাড়ির সেবাইতকে বলিয়া কহিয়া সে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবে এখন! অপু রাজী আছে?

রাজী? হাতে স্বর্গ পাওয়া নিতান্ত গল্পকথা নয় তাহা হইলে।

ঠাকুরবাড়ির খাওয়া নিতান্ত মন্দ নয়। অপুর কাছে তাহা খুব ভাল লাগে। আলোচালের ভাত, টক, কোনও কোনও দিন ভোগের পায়েস ও পাওয়া যায়, তবে মাছ-মাংসের সম্পর্ক নাই, নিরামিষ।

কিন্তু এ তো আর দু'বেলা নয়; শুধু রাত্রে। দিনমানটাতে বড় কষ্ট হয়। দুই পয়সার মুড়ি ও কলের জল। তবুও তো পেটটা ভরে! কলেজ হইতে বাহির হইয়া বৈকালে তাহার এত ক্ষুধা পায় যে গা ঝিম্ ঝিম করে, পেটে যেন এক ঝাঁক বোলতা হুল ফুটাইতেছে—পয়সা জুটাইতে পারিলে অপু এ সময়টা পথের ধারের দোকান হইতে এক পয়সার ছোলাভাজা কিনিয়া খায়।

সব দিন পয়সা থাকে না, সেদিন সন্ধ্যার পরেই ঠাকুরবাড়ি চলিয়া যায়,

কিন্তু ঠাকুরের আরতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে খাইতে দিবার নিয়ম নাই—তাও একবার নয়, দুইবার দুটি ঠাকুরের আরতি। আরতির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই, সেবাইত ঠাকুরের মর্জি ও সুবিধামত রাত আটটাতেও হয়, ন'টাতেও হয়, দশটাতেও হয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যার পরেই হয়।

কলেজে যাইতে সেদিন মুরারী বলিল—সি. সি. বি-র ক্লাসে কেউ যেও না—আমরা সব স্ট্রাইক করেছি।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল, কেন, কি হয়েছে সি. সি বি.?

মুরারী হাসিয়া বলিল,—করে নি কিছু, পড়া জিজ্ঞেস করবে বলেছে রোমের হিস্ট্রির। একপাতাও পড়ি নি, না পারলে বকুনি দেবে কি রকম জানো তো?

গজেন বলিল—আমার তো আরও মুশকিল! রোমের হিস্ট্রির বই-ই যে আমি কিনি নি!

মন্মথ আগে সেণ্ট্ জেভিয়ারে পড়িত, সে বিলাতী নাচের ভঙ্গিতে হাত লম্বা করিয়া বার কয়েক পাশ খাইয়া একটা ইংরাজি গানের চরণ বার দুই গাহিল। অপু বলিল—কিন্তু পার্সেণ্টেজ যাবে যে?

প্রতুল বলিল—ভারী একদিনের পার্সেণ্টেজ। তা আমি ক্লাসে নাম প্রেজেণ্ট ক'রেও পালিয়ে আসতে পারি—সে তো আর তুমি পারবে না?

অপু বলিল—খুব পারি। পারবো না কেন?

প্রতুল বলিল—সে তোমার কাজ নয়, সি. সি. বি-র চোখ ভারী হঁয়ে—আমরা বলে তাই এক একদিন সরষে ফুল দেখি, তা তুমি! পারো পালিয়ে আসতে?

—এখ্খুনি। ছ্যাখো সবাই দাঁড়িয়ে—পারি কি না পারি, কিন্তু যদি পারি খাওয়াতে হবে ব'লে দিলাম—

অপু উৎসাহে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া গেল। গজেন বলিল—কেন ওকে আবার ওসব শেখাচ্ছিস্?

—শেখাচ্ছি মানে? ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না—ভারী সাধু!

মুরারী বলিল—না, না, তোমরা জানো না, অপূর্ব ভারী Pure spirit! সেদিন—

হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি, ও-রকম সুন্দর চেহারা থাকলে আমাদেরও কত সার্টিফিকেট আসতো—বাবা, বঙ্কিমবাবু কি আর সাধে সুন্দর মুখের গুণ গেয়ে গেছেন?

—কি বাজে বক্‌ছিস প্রতুল? দিন দিন ভারী ইতর হয়ে উঠ্‌ছিস্ কিন্তু—

প্রিন্সিপ্যালের গাড়ি কলেজের সামনে আসিয়া লাগাতে যে যেদিকে সুবিধা পাইল সরিয়া পড়িল।

মিঃ বসুর ক্লাসে নামটা প্রেজেণ্ট করিয়াই আজ অপু পালাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। বাঁ দিকের দরজাটা একদম খোলা, প্রোফেসারের চোখ অন্যদিকে। সুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রোফেসারের চোখ আবার তাহার দিকে পড়িল, কাজেই খানিকক্ষণ ভালমানুষের মত নিরীহ-মুখে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। এইবার একবার অন্য দিকে চোখ পড়িলেই হয়! হঠাৎ প্রোফেসার তাহাকেই প্রশ্ন করিলেন,—Was Merius justified in his action?

সর্বনাশ! মেরিয়াস কে! একদিনও সে যে রোমের ইতিহাসের লেক্‌চার শোনে নাই!

উত্তর না পাইয়া প্রোফেসার অন্য একটা প্রশ্ন করিলেন—What do you think of Sulla's—

অপু বিষন্নমুখে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাস্কেল মণিলালটা মুখে কাপড় গুঁজিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে!

প্রোফেসার বিরক্ত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

—You, You there—you behind the pillar—

এবার মনিলালের পালা। সে থামের আড়ালে সরিয়া বসিবার বৃথা চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল সুল্লা বা মেরিয়াসের সম্বন্ধে অপুর সহিত তাহার মতের কোন পার্থক্য নাই, সমানই নির্বিকার। মণিলালেব দুর্গতিতে অপু খুব খুশী হইয়া পাশের ছেলেকে আঙুলের খোঁচা দিয়া ফিস্ ফিস করিয়া বলিল—Rightly served! ভারি হাসি হচ্ছিল—

—চুপ চুপ—এখুনি আবার এদিকে চাইবে সি সি. বি. কথা শুনবে—

—এবার আমি সোজা—

পিছন হইতে নৃপেন ব্যস্তস্বরে বলিল—এইবার আমায় জিজ্ঞেস্ করবে—ডেটটা ভাই দে না শীগ্‌গির ব'লে—শীগ্‌গির—

অপুর পাশের ছেলেটি বলিল—কে কাকে ডেট বলে দাদা—মেরিভেল পুলারের বইয়ের রং কেমন এখনও চাক্ষুষ দেখি নি—কেটে পড়ো না সোজা—

অপু খানিকক্ষণ হইতেই প্রোফেসারের দৃষ্টির গতি এক মনে লক্ষ্য করিতেছিল, সে বুঝিতে পারিল ও-কোণ হইতে একবার এদিকে ফিরিলে পালানো অসম্ভব হইবে, কারণ এদিকে এখনও অনেক ছেলেকে প্রশ্ন করিতে বাকী। এই সুবর্ণসুযোগ। বিলম্ব করিলে...।

দু'একবার উসখুস করিয়া একবার এদিক ওদিক চাহিয়া অপু সাঁ করিয়া খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পিছু পিছু হরিদাস—অল্প পরেই নৃপেন।···

তিনজনেই উপরের বারান্দাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে একতলায় নামিয়া আসিল।

অপু পিছন ফিরিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—হি-হি-হি—উঃ —আর একটু হলেই—

নৃপেন বলিল—আমাকে তো—মিনিট দুই দেরি—কাল হয়েছে কি বুঝলে?—

অপু বলিল—যাক, এখানে আর দাঁড়িয়ে খোশগল্প করার কোনও দরকার দেখছি নে। এখুনি প্রিন্সিপ্যাল নেমে আসবেন, গাড়ি লাগিয়াছে দরজায়—কমনরুমে বরং এস—

একটু পরে সকলে বাহির হইয়া পড়িল। আজ আর ক্লাস ছিল না। কে গ্রাহ্য করে বুড়ো সি. সি বি. ও তাঁহার রোমের ইতিহাসের যত বাজে প্রশ্ন?

অপু কিন্তু কিছু নিরাশ হইল। ক্লাস হইতে পালাইতে পারিলে প্রতুলের দল খাওয়াইবে বলিয়াছিল। কিন্তু লাইব্রেরীয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, তাহারা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে।—কোন্ সকালে দুই পয়সার মুড়ি ও একবার ফুলুরি খাইয়া বাহির হইয়াছে—পেট যেন দাউ দাউ জ্বলিতেছিল, কিছু খাইতে পারিলে হইত। ক্লাসে এতক্ষণ বেশ ছিল, বুঝিতে পারে নাই, বাহিরে আসিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে পকেটে একটাও পয়সা নাই। সে ভাবিল—ওরা আচ্ছা তো? বললে খাওয়াবো, তাই তো আমি পালাতে গেলাম, নিজেরা এদিকে সরে পড়েছে কোন্ কালে!···এখন কিছু খেলে তবুও রাত অবধি থাকা যেতো—আজ সোমবার, আটটার মধ্যেই আরতি হয়ে যাবে—উঃ ক্ষিদে যা পেয়েছে!—

এ ধরণের কষ্ট করিতে অপু কখনও অভ্যস্ত নয়। বাড়ির এক ছেলে, চিরকাল বাপ-মায়ের আদরে কাটাইয়াছে। শহরে বড়লোকের বাড়িতে অন্য কষ্ট থাকিলেও খাওয়ার কষ্টটা অন্ততঃ ছিল না। তাছাড়া সেখানে মাথার উপর

ছিল মা, সকল আপদবিপদে সর্বজয়া ডানা মেলিয়া ছেলেকে আড়াল করিয়া রাখিতে প্রাণপণ করিত, কোনও কিছুর আঁচ লাগিতে দিত না। দেওয়ানপুরে স্কলারশিপের টাকার বালক-বুদ্ধিতে যথেষ্ট শৌখিনতা করিয়াছে—খাইয়াছে, খাওয়াইয়াছে, ভাল ভাল জামা কাপড় পরিয়াছে,—তখন সে সব জিনিস সস্তাও ছিল।

কিন্তু শীঘ্রই অপু বুঝিল—কলিকাতা দেওয়ানপুর নয়। এখানে কেহ কাহাকেও পোঁছে না। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গত কয়েক মাসের মধ্যে কাপড়ের দাম এত চড়িয়াছে যে, কাপড আর কেনা যায় না। ভাল কাপড় তাহার মোটে আছে একখানা, একটি টুইল শার্ট সম্বল। ছেলেবেলা হইতেই ময়লা কাপড় পরিতে সে ভালবাসে না, দু তিনদিন অন্তর সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া শুকাইলে, তাহাই পরিয়া বাহির হইতে পারে। সবদিন কাপড় ঠিক সময়ে শুকায় না, কাপড কাচিবার পরিশ্রমে এক-একদিন আবার ক্ষুধা এত বেশী পায় যে, মাত্র দু'পয়সার খাবারে কিছুই হয় না—ক্লাসে লেকচার শুনিতে বসিয়া মাথা যেন হঠাৎ শোলার মত হালকা বোধ হয়।

এদিকে থাকার কষ্টও খুব। সুরেশ্বর এম-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহার মেসে আর থাকিবার সুবিধা নাই। যাইবার আগে সুরেশ্বর একটা ঔষধের কারখানার উপরে একটা ছোট ঘরে তাহার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিয়া গিয়াছে। ঐ কারখানায় সুরেশ্বরের জানাশোনা একজন লোক কাজ করে ও রাত্রে ওপরের ঘরটাতে থাকে। ঠিক হইয়াছে, যতদিন কিছু একটা সুবিধা না হইতেছে, ততদিন অপু ওই ঘরটাতে লোকটার সঙ্গে থাকিবে। ঘরটা একে ছোট, তাহার উপর অর্ধেকটা ভর্তি ঔষধ-বোঝাই প্যাকবাক্সে। রাশিকৃত জঞ্জাল বাক্সগুলির পিছনে জমানো, কেমন একটা গন্ধ! নেংটি ইঁদুরের উৎপাতে কাপডচোপড় রাখিবার জো নাই, অপুর একমাত্র টুইল শার্টটার দু' জায়গায় কাটিয়া ফুটা করিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘরময় আরসোলার উৎপাত। ঘরের সে লোকটা যেমন নোংরা তেমনই তামাকপ্রিয়, রাত্রে উঠিয়া অন্ততঃ তিনবার তামাক সাজিয়া খায়। তাহার কাশির শব্দে ঘুম হওয়া দায়। ঘরের কোণে তামাকের গুল রাশিকৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। অপু নিজে বার দুই পরিষ্কার করিয়াছিল। এক টুকরা রবারের ফিতার মতই ঘরের নোংরামিটা স্থিতিস্থাপক—পূর্বাবস্থায় ফিরিতে একটুকু দেরি হয় না। খাওয়া-পরা থাকিবার কষ্ট অপু কখনও করে নাই, বিশেষ করিয়া একলা যুঝিতে হইতেছে বলিয়া কষ্ট আরও বেশী।

অন্যমনস্কভাবে যাইতে যাইতে সে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির মোড়ে আসিল।

যুদ্ধের নূতন খবর বাহির হইয়াছে বলিয়া কাগজওয়ালা হাঁকিতেছে। শেয়ালদার একটা ট্রাম হইতে লোকজন নামা-ওঠা করিতেছে। একটি চোখে-চশমা তরুণ যুবকের দিকে একবার চাহিয়াই মনে হইল—চেনা-চেনা মুখ! একটু পরে সেও অপুর দিকে চাহিতে দুইজনে চোখাচোখি হইল। এবার অপু চিনিয়াছে—সুরেশদা! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের সেই পোড়ো ভিটার মালিক নীলমণি জ্যাঠামশায়ের ছেলে সুরেশ!

সুরেশও চিনিয়াছিল। অপু তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া হাসিমুখে বলিল, সুরেশদা যে!

যেবার দুর্গা মারা যায়, সে বৎসর শীতকালে ইহারা যা কয়েক মাসের জন্য দেশে গিয়াছিল, তাহার পর আর কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। সুরেশ আকৃতিতে যুবক হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ দেহ, সুগঠিত হাত পা। বাল্যের সে চেহারাব অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

সুরেশ সহজ সুরেই বলিল—আরে অপূর্ব? এখানে কোথা থেকে?

সুরেশের খাঁটি শহুরে গলার সুরে ও উচ্চারণ-ভঙ্গিতে অপু একটু ভয় খাইয়া গেল।

সুরেশ বলিল—তারপর এখানে কি চাকরি-টাকরি করা হচ্ছে?

—না—আমি যে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে রিপনে—

—তাই নাকি? তা এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

অপু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, জ্যেঠিমা কোথায়?

—এখানেই, শ্যামবাজারে। আমাদের বাড়ি কেনা হয়েছে সেখানে—

সুরেশের সহিত সাক্ষাতে অপু ভারী খুশী হইয়াছিল। তাহাদের বাড়ির পাশের যে পোড়ো ভিটার বনঝোপের সহিত তাহার ও দিদি দুর্গার আবাল্য অতিমধুর পরিচয়, সেই ভিটারই লোক ইহারা। যদিও কখনও সেখানে ইহারা বাস করে নাই, শহরে শহরেই ঘোরে, তবুও তো সে ভিটারই লোক, তাহা ছাড়া দশ রাত্রির জ্ঞাতি, অতি আপনার জন।

অপু বলিল—অতসীদি এখানে আছে? সুনীল? সুনীল কি পড়ে?

—এবার সেকেন ক্লাসে উঠেছে—আচ্ছা, যাই তাহ'লে, আমার ট্রাম আসছে—

সুরেশের সুরে কোনও আগ্রহ বা আন্তরিকতা ছিল না, সে এমন সহজ সুরে কথা বলিতেছিল, যেন অপুর সঙ্গে তাহার দুইবেলা দেখা হয়। অপু কিন্তু নিজের আগ্রহ লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে, সুরেশের কথাবার্তার সে-দিকটা তাহার কাছে ধরা পড়িল না।

—আপনি কি করেন সুরেশদা ?

—মেডিকেল কলেজে পড়ি, এবার থার্ডইয়ার—

—আপনাদের ওখানে একদিন যাব সুরেশদা—জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো—

সুরেশ ট্রামের পা-দানিতে পা দিয়া উঠিতে উঠিতে অনাসক্ত সুরে বলিল, বেশ বেশ, আমি আসি এখন—

এতদিন পরে সুরেশদার সহিত দেখা হওয়াতে অপুর মনে এমন বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল, যে ট্রামটা ছাড়িয়া দিলে তাহার মনে পড়িল—সুরেশদাব বাড়ির ঠিকানাটা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

সে চলন্ত ট্রামের পাশে ছুটিতে ছুটিতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদেব বাডির ঠিকানাটা—ও সুবেশদা, ঠিকানাটা যে—

সুরেশ মুখ বাডাইয়া বলিল—চব্বিশ-এর দুই সি, বিশ্বকোষ লেন, শ্যামবাজার—

পরের রবিবার সকালে স্নান করিয়া অপু শ্যামবাজারে সুরেশদার ওখানে যাইবার জন্য বাহির হইল। আগের দিন টুইল শার্টটা ও কাপডখানা সাবান দিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লইয়াছিল, জুতার শোচনীয় দুরবস্থা ঢাকিবার জন্য একটি পরিচিত মেসে এক সহপাঠীর নিকট হইতে জুতার কালি চাহিয়া নিজে বুরুশ করিয়া লইল। সেখানে অতসীদি ইত্যাদি রহিয়াছেন, দীনহীন বেশে কি যাওয়া চলে ?

ঠিকানা খুঁজিয়া বাহিব করিতে দেরি হইল না। ছোট-খাটো দোতালা বাড়ি, আধুনিক ধরণে তৈয়ারী। ইলেকট্রিক লাইট আছে, বাহিরে বৈঠকখানা, পাশেই দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। সুরেশ বাড়ি ছিল না, ঝিয়ের কাছে সে পরিচয় দিতে পারিল না, বৈঠকখানায় তাহাকে বসাইয়া ঝি চলিয়া গেল! ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার, একটা পুরনো রোল-টপ ডেস্ক, খানকতক চেয়ার। ভারী সুন্দর বাড়ী তো! এত আপনার জনের কলকাতায় এরকম বাড়ি আছে, ইহাতে অপু মনে মনে একটু গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিল। টেবিলে একখানা সেদিনের অমৃতবাজার পড়িয়া ছিল, উল্টাইয়া যুদ্ধের খবর পডিতে লাগিল।

অনেক বেলায় সুরেশ আসিল।

তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে অপূর্ব, কখন এলে ?

অপু হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আসুন সুরেশদা—আমি, আমি অনেকক্ষণ ধরে—বেশ বাড়িটা তো আপনাদের !—

—এটা আমার বড়মামা—যিনি পাটনার উকিল, তিনি কিনেছেন ; তাঁরা তো কেউ থাকেন না, আমরাই থাকি। বসো, আমি আসি বাড়ির মধ্যে থেকে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এবার সুরেশদা বাড়ির ভিতর গিয়ে বললেই জ্যেঠিমা ডেকে পাঠাবে, এখানে খেতে বলবে—

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুরেশ বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইল না। সে যখন পুনরায় আসিল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্তসুরে বলিল, তারপর ?···বলিয়াই খবরের কাগজখানা হাতে তুলিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। অপু দেখিল সুরেশ পান চিবাইতেছে! খাওয়ার আগে এত বেলায় পান খাওয়া অভ্যাস, না-কি খাওয়া হইয়া গেল।

দুই চারিটা প্রশ্নের জবাব দিতে ও খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে একটা বাজিল। সুরেশের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিতেছিল। সে হঠাৎ কাগজখানা টেবিলে রাখিয়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি না হয় বসে কাগজ পড়ো, আমি একটুখানি শুয়ে নি। একটা ডাব খাবে ?—

ডাব খাইবে কি রকম, এত বেলায়, এ অবস্থায় ? অপু ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ডাব ? না থাক, এত বেলায়—ইয়ে—না।

সেই যে সুরেশ বাড়ি ঢুকিল—একটা—দুইটা—আড়াইটা, আর দেখা নাই। ইহারা কত বেলায় খায়! রবিবার বলিয়া বুঝি এত দেরি ? কিন্তু যখন তিনটা বাজিয়া গেল, তখন অপুর মনে হইল, কোথাও কিছু ভুল হইয়াছে নিশ্চয়। হয় সে-ই ভুল বুঝিয়াছে, না হয় উহারা ভুল করিয়াছে! তাহার এত ক্ষুধা পাইয়াছিল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না। উঠিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় সুরেশের ছোট ভাই সুনীল বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। অপু ডাকিবার পূর্বেই সে সাইকেল লইয়া বাড়ির বাহিরে চলিয়া গেল।

সেই সুনীল—যাহাকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে ছাঁদা বাঁধিবার দরুণ জ্যেঠিমা তাহাকে ফরালে-বামুনের ছেলে বলিয়াছিলেন। ইহাদের যে এতদিন পর আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা যেন অপু ভাবে নাই। সুনীলকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হইল। এ যেন কেমন একটা ঠিক বুঝানো যায় না—

ইহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার মূলে অপুর কোন স্বার্থসিদ্ধি বা সুযোগ-সন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল না, বা ইহা যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার মত দেখাইতেছে—একবারও সেকথা তাহার মনে উদয় হয় নাই! এখানে তাহার আসিবার মূলে সেই বিস্ময়ের ভাব—যাহা তাহার জন্মগত। কে আবার জানিত, খাস কলিকাতা শহরে এতদিন পরে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ির পাশের পোড়ো ভিটাটার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। এই

ঘটনাটুকু তাহাকে মুগ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এ যেন জীবনের কোন্ অপরিচিত বাঁকে পত্রপুষ্পে সজ্জিত অজানা কোন্ কুঞ্জবন—বাঁকের মোড়ে ইহাদের অস্তিত্ব যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

বিস্ময় মনের অতি উচ্চভাব এবং উচ্চ বলিয়াই সহজলভ্য নয়। সত্যকার বিস্ময়ের স্থান অনেক উপরে—বুদ্ধি যার খুব প্রশস্ত ও উদার, মন সব সময় সতর্ক—নূতন ছবি, নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখে—সে-ই প্রকৃত বিস্ময়-রসকে ভোগ করিতে পারে। যাদের মনের যন্ত্র অলস, মিনমিনে—পরিপূর্ণ, উদার বিস্ময়ের মত উচ্চ মনোভাব তাদের অপরিচিত থাকিয়া যায়।

বিস্ময়কে যাঁহারা বলিয়াছেন Mother of Philosophy তাঁহারা একটু কম বলেন। বিস্ময়ই আসল Philosophy, বাকীটা তাহার অর্থসঙ্গতি মাত্র।

তিনটার পর সুরেশ বাহির হইয়া আসিল। সে হাই তুলিয়া বলিল—কাল রাত্রে ছিল নাইট-ডিউটি, চোখ মোটে বোজে নি—তাই একটু গড়িয়ে নিলাম—চল, মাঠে ক্যালকাটা টিমের হকি খেলা আছে—একটু দেখে আসা যাক্--

অপু মনে মনে সুরেশদাকে ঘুমের জন্য অপরাধী ঠাওর করিবার জন্য লজ্জিত হইল। সারারাত কাল বেচারী ঘুমায় নাই—তাহার ঘুম আসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই তো।···

সে বলিল—আমি মাঠে যাবো না সুরেশদা, কাল এগজামিন আছে, পড়া তৈরী হয় নি মোটে—আমি যাই—ইয়ে—জ্যেঠিমার সঙ্গে একবার দেখা ক'বে গেলে হতো —

সুরেশ বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—বেশ তো—এসো না—

অপু সুরেশের সঙ্গে সঙ্কুচিত ভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। সুরেশের মা ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন—সুরেশ গিয়া বলিল—এই সেই অপূর্ব মা—নিশ্চিন্দিপুরের হরিকাকার ছেলে—তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—

অপূর্ব পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল—সুরেশের কথায় ভাবে তাহার মনে হইল, সে যে এতক্ষণ আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে সে কথা সুরেশদা বাড়ির মধ্যে আদৌ বলে নাই।

জ্যেঠিমার মাথার চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে বলিয়া অপুর মনে হইল। অপুর প্রণামের উত্তরে তিনি বলিলেন, এস—এস—থাক্, থাক্—কলকাতায় কি করো?

অপু ইতিপূর্বে কখনো জ্যেঠিমার সম্মুখে কথা বলিতে পারিত না। গম্ভীর ও গর্বিত (যেটুকু সে ধরিতে পারিত না) চালচলনের জন্য জ্যেঠিমাকে সে ভয় করিত। আনাড়ী ও অগোছালো সুরে বলিল, এই এখানে পড়ি, কলেজে পড়ি।

জ্যোঠিমা যেন একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, কলেজে পড়? ম্যাট্রিক পাশ দিয়েছ?

—আর বছর ম্যাট্রিক পাশ করেছি—

—তোমার বাবা কোথায়?—তোমরা তো সেই কাশী চলে গিয়েছিলে, না?

—বাবা তো নেই—তিনি তো কাশীতেই···

তারপর অপু সংক্ষেপে বলিল সব কথা। এই সময়ে পাশের ঘর হইতে একটি বাইশ তেইশ বছরের তরুণী এ ঘরে ঢুকিতেই অপু বলিয়া উঠিল, অতসীদি না?···

অতসী অনেক বড হইয়াছে, তাহাকে চেনা যায় না। সে অপুকে চিনিতে পারিল, বলিল, অপূব কখন এলে?

আর একটি মেয়ে ও-ঘর হইতে আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইল। পনেরো যোল বৎসর বয়স হইবে, বেশ সুশ্রী, বড় বড় চোখ। কথা বলিতে বলিতে সেদিকে চোখ পড়াতে অপু দেখিল, মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। খানিকটা পরে অতসী বলিল—মণি, দেখে এসো তো দিদি, কুশিকাঁটাগুলো ও-ঘরের বিছানায় ফেলে এসেছি কি না?

মেয়েটি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই আবার দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—না বডদি দেখলাম না তো?

জ্যেঠিমা অল্প দুই চারটি কথার পরই কোথায় উঠিয়া গেলেন। অতসী অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। তারপর সেও চলিয়া গেল। অপু ভাবিতেছিল, এবার সে উঠিবে কিনা। কেহই ঘরে নাই, এ সময় ওঠাটা কি উচিত হইবে?—ক্ষুধা একবার উঠিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এখন ক্ষুধা আর নাই, তবে গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। যাওয়ার কথা কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়া যাইবে?···

দোরের কাছে গিয়া সে দেখিল সেই মেয়েটি বারান্দা দিয়া ও ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছে—আর কেহ কোথাও নাই, তাহাকেই না বলিলে চলে না। উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল—এই গিয়ে—আমি যাচ্ছি, আমার আবার কাজ—

মেয়েটি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—চলে যাবেন? দাঁড়ান, পিসিমাকে ডাকি—চা খেয়েছেন?

অপু বলিল—চা, তা—থাক্, বরং অন্য একদিন—

মেয়েটি বলিল—বসুন, বসুন—দাঁড়ান চা আনি—পিসিমাকে ডাকি দাঁড়ান।

কিন্তু খানিকটা পরে মেয়েটিই এক পেয়ালা চা ও একটা প্লেটে কিছু

হালুয়া আনিয়া তাহার সামনে বসিল। অপু ক্ষুধার মুখে হালুয়াটুকু গো-গ্রাসে গিলিল। গরম চা খাইতে গিয়া প্রথম চুমুকে মুখ পুড়াইয়া ফেলিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল—আপনি বুঝি ওদের খুড়তুতো ভাই? থাক্ প্লেটটা এইখানেই—আর একটু হালুয়া আন্‌ব?

—হালুয়া?···নাঃ—ইয়ে তেমন খিদে নেই—হ্যাঁ, সুরেশদার বাবা আমার জ্যাঠামশাই হতেন, জ্ঞাতি সম্পর্ক—

এই সময় অতসী ঘরে ঢোকাতে মেয়েটি চায়ের বাটি ও প্লেট লইয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়িতে খাইয়া অনেক রাত্রে সে নিজের থাকিবার স্থানে ফিরিয়া দেখিল আজও একজন লোক সেখানে রাত্রের জন্য আশ্রয় লইয়াছে। মাঝে মাঝে এরকম আসে, কারখানার লোকের দু-একজন আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে আসে ও দু-চারদিন থাকিয়া যায়। একে ছোট ঘর, থাকিবার কষ্ট, তাহাতে লোক বাড়িলে এইটুকু ঘরের মধ্যে তিষ্ঠানো দায় হইয়া ওঠে। পরণের কাপড় এমন ময়লা যে, ঘরের বাতাসে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। অপু সব সহ্য করিতে পারে, এক ঘরে এ ধরণের নোংরা স্বভাবের লোকের ভিড়ের মধ্যে শুইতে পারে না, জীবনে সে তা কখনো করে নাই—ইহা তাহার অসহ্য! কোথায় রাত্রে আসিয়া নির্জনে একটু পড়াশুনা করিবে—না ইহাদের বক্‌বকের চোটে সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নতুন লোকটি বড়বাজারের আলু-পোস্তায় আলুর চালান লইয়া আসে—হুগলী জেলার কোন জায়গা হইতে, অপু জানে, আরও একবার আসিয়াছিল। লোকটি বলিল, কোথায় যান ও মশায়? আবার বেরোন না-কি?

অপু বলিল, এইখানটাতে দাঁড়িয়ে—বেজায় গরম আজ—

একটু পরে লোকটা বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিছানাটা কি মহাশয়ের? আসুন আসুন, সরিয়ে ন্যান্ একটু—এঃ—হুঁকোর জলটা গেল গড়িয়ে পড়ে—দুত্তোর—না—

অপু বিছানা সরাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিল। সে কি বলিবে? এখানে তাহার কি জোর খাটে? উহারাই উপরোধে পড়িয়া দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছে এখানে। মুখে কিছু না বলিলেও অপু অন্যদিন হয়তো মনে মনে বিরক্ত হইত, কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিল। বাহিরের বারান্দায় জীর্ণ কাঠের রেলিং ধরিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—সুরেশদার কেমন চমৎকার বাড়ি কলকাতায়। ইলেক্‌ট্রিক পাখা, আলো, ঘরগুলি কেমন

সাজানো, মেয়েটির কেমন সুন্দর কাপড় পরণে। চারটা না বাজিতে চা, জলখাবার, চারিদিকে যেন লক্ষ্মীশ্রী, কিছুরই অভাব নাই।

তাহাদেরই যে কি হইয়াছে, কোথায় মা আছে, একটেরে পড়িয়া, কলিকাতা শহরে এই রকম ছন্নছাড়া অবস্থায় সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পেট পুরিয়া আহার জোটে না, পরণে নাই কাপড়!…

দিন তিনেক পরে জগদ্ধাত্রী পূজা। কলিকাতায় এত উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজায়, তা সে জানিত না। দেশে কখনও এ পূজা কোথাও হইত না—কোথাও দেখে নাই। গলিতে গলিতে, সর্বত্র উৎসবের নহবৎ বাজিতেছে, কত দুয়ারের পাশে কলাগাছ বসানো, দেবদারু পাতার মালা টাঙানো।

কাঠের কারখানার পাশের গলিটার মধ্যে একজন বড়লোকের বাড়িতে পূজা। সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সারি বাঁধিয়া বাড়িটার মধ্যে ঢুকিতেছে—অপু ভাবিল, সেও যদি যায়!…কতকাল নিমন্ত্রণ খায় নাই। কে তাহাকে চিনিবে?…খুব লোভও হইল, ভয়ও হইল।

শীতকালে দিকে একদিন কলেজ ইউনিয়নে প্রণব একটা প্রবন্ধ পাঠ করিল। ইংরেজীতে লেখা, বিষয়—'আমাদের সামাজিক সমস্যা'; বাছিয়া বাছিয়া শক্ত ইংরেজীতে সে নানা সমস্যার উল্লেখ করিয়াছে; বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। সে প্রত্যেক সমস্যাটি নিজের দিক হইতে দেখিতে চাহিয়াছে এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সনাতন প্রথার স্বপক্ষেই মত দিয়াছে। প্রণবের উচ্চারণ ও বলিবার ভঙ্গি খুব ভাল, যুক্তির ওজন অনুসারে সে কখনও ডান হাতে ঘুসি পাকাইয়া, কখনও মুঠাদ্বারা বাতাস আঁকড়াইয়া, কখনও বা সম্মুখের টেবিলে সশব্দে চাপড় মারিয়া বাল্য বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও স্ত্রীশিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিয়া দিল। প্রণবের বন্ধুদলের ঘন ঘন করতালিতে প্রতিপক্ষের কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল।

অপর পক্ষে উঠিল মন্মথ—সেই যে-ছেলেটি পূর্বে সেণ্ট জেভিয়ারে পড়িত। লাটিন জানে বলিয়া ক্লাসে সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে, তাহার সামনে

কেহ ভয়ে ইংরেজী বলে না, পাছে ইংরেজীর ভুল হইলে তাহার বিদ্রূপ শুনিতে হয়। সাহেবদের চাল-চলন, ডিনারের এটিকেট, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ক্লাসের মধ্যে সে অথরিটি—তাহার উপর কারুর কথা খাটে না। ক্লাসের এক হতভাগ্য ছাত্র সাহেবপাড়ার কোন রেস্তোরাঁতে তাহার সহিত খাইতে গিয়া ডান হাতে কাঁটা ধরিবার অপরাধে এক সপ্তাহকাল ক্লাসে সকলের সামনে মন্মথর টিট্‌কারি সহ্য করে। মন্মথর ইংরেজী আরও চোখা, কম আড়ষ্ট, উচ্চারণও সাহেবী ধরণের! কিন্তু একেই তাহার উপর ক্লাসের অনেকের রাগ আছে, এদিকে আবার সে বিদেশী বুলি আওড়াইয়া সনাতন হিন্দুধর্মের চিরাচরিত প্রথার নিন্দাবাদ করিতেছে; ইহাতে একদল ছেলে খুব চটিয়া উঠিল—চারিদিক হইতে 'shame, shame,—withdraw, withdraw', রব উঠিল—তাহার নিজের বন্ধুদল প্রশংসাসূচক হাততালি দিতে লাগিল—ফলে এত গোলমালের সৃষ্টি হইয়া উঠিল যে, মন্মথ বক্তৃতার শেষের দিকে কি বলিল সভার কেহই তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

প্রণবের দলই ভারী। তাহারা প্রণবকে আকাশে তুলিল, মন্মথকে স্বধর্মবিরোধী নাস্তিক বলিয়া গালি দিল, সে যে হিন্দুশাস্ত্র একছত্রও না পড়িয়া কোন স্পর্ধায় বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় কথা বলিতে সাহস করিল, তাহাতে কেহ কেহ আশ্চর্য হইয়া গেল। লাটিন ভাষার সহিত তাহার পরিচয়ের সততা লইয়াও দু'একজন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল (লাটিন জানে বলিয়া অনেকের রাগ ছিল তাহার উপর)। একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, —প্রতিপক্ষের বক্তার সংস্কৃতে যেমন অধিকার, যদি তাঁহার লাটিন ভাষার অধিকারও সেই ধরণের—

আক্রমণ ক্রমেই ব্যক্তিগত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সভাপতি—অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ দে বলিয়া উঠিলেন—'Come, come, Manmatha has never said that he is a Seneca or a Lucretius—have the goodness to come to the point.'

অপু এই প্রথম এ-রকম ধরণের সভায় যোগ দিল—স্কুলে এ সব ছিল না, যদিও হেডমাস্টার প্রতিবারই হইবার আশ্বাস দিতেন। এখানে এদিনকার ব্যাপারটা তাহার কাছে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ঠেকিল। ওসব মামুলি কথা মামুলিভাবে বলিয়া লাভ কি? সামনের অধিবেশনে সে নিজে একটা প্রবন্ধ পড়িবে। সে দেখাইয়া দিবে ওসব একঘেয়ে মামুলি বুলি না আওড়াইয়া কি ভাবে প্রবন্ধ লেখা যায়। একেবারে নূতন এমন বিষয় লইয়া সে লিখিবে, যাহা লইয়া কখনও কেহ আলোচনা করে নাই।

এক সপ্তাহ খাটিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। নাম—'নূতনের আহ্বান'। সকল বিষয়ে পুরাতনকে ছাঁটিয়া একেবারে বাদ। কি আচার-ব্যবহার, কি সাহিত্য, কি দেখিবার ভঙ্গি—সব বিষয়েই নূতনকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অপু মনে মনে অনুভব করে, তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা খুব বড, খুব সুন্দর। তাহার উনিশ বৎসরের জীবনের প্রতিদিনের সুখদুঃখ, পথের যে-ছেলেটি অসহায় ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, কবে এক অপরাহ্নের ম্লান আলোয় যে পাখিটা তাহাদের দেশের বনের ধারে বসিয়া দোল খাইত, দিদির চোখেব মমতা ভরা দৃষ্টি, লীলার বন্ধুত্ব, রাণুদিদি, নির্মলা, দেবব্রত, রৌদ্রদীপ্ত নীলাকাশ, জ্যোৎস্না বাত্রি—নানা কল্পনার টুকরা, কত কি আশা-নিরাশার লুকোচুরি—সবসুদ্ধ লইয়া এই যে উনিশটি বৎসর—ইহা তাহার বৃথা যায় নাই—কোটি কোটি যোজন দূর শূন্যপার হইতে সূর্যের আলো যেমন নিঃশব্দ জ্যোতির অবদানে শীর্ণ শিশু-চারাকে পত্রপুষ্পফলে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে, এই উনিশ বৎসরের জীবনের মধ্য দিয়া শাশ্বত অনন্ত তেমনি ওর প্রবর্ধমান তরুণ প্রাণে তাহার বাণী পৌছাইয়া দিয়াছে—ছায়ান্ধকার তৃণভূমির গন্ধে, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর-মাখানো অপরূপ সন্ধ্যায়; উদার কল্পনায় ভরপুর নিঃশব্দ জীবনমায়ায়।—সে একটা অপূর্ব শক্তি অনুভব করে নিজের মধ্যে—এটা যেন বাইবে প্রকাশ করবার জিনিস—মনে মনে ধরিয়া রাখার নয়। কোথায় থাকিবে প্রণব আর মন্মথ?...সবাই মামুলি কথা বলে। সকল বিষয়ে এই মামুলি ধরণ যেন তাহাদের দেশের একচেটে হইয়া উঠিতেছে—যে মন গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া সারা পৃথিবীটার রস-ভাণ্ডার গ্রাস করিতে ছুটিতেছে, সে তীব্র আগ্রহ-ভরা পিপাসার্ত নবীন মনের সকল কল্পনা তাহাতে তৃপ্ত হয় না। ইহারই বিরুদ্ধে, ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে, সব ওলট পালট করিয়া দিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে তাহাদিগকে এবং সে-ই হইবে তাহার অগ্রণী।

দিন কতক ধরিয়া অপু ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধরণে গর্ব করিয়া বেড়াইল যে, এমন প্রবন্ধ পড়িবে যাহা কেহ কোনদিন লিখিবার কল্পনা করে নাই, কেহ কখনও শোনে নাই ইত্যাদি। লজিকের ছোকরা প্রোফেসার ইউনিয়নের সেক্রেটারী, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ব'লে নোটিশ দেবো তোমার প্রবন্ধের হে, বিষয়টা কি?

পরে নাম শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ! নামটা বেশ দিয়েছ—but why not 'পুরাতনের বাণী'?—অপু হাসি মুখে চুপ করিয়া রহিল। নির্দিষ্ট দিনে যদিও ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের সভাপতি হইবার কথা নোটিশে ছিল, তিনি

কার্যবশতঃ আসিতে পারিলেন না। ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে সভাপতির আসনে বসিতে সকলে অনুরোধ করিল। ভিড খুব হইয়াছে, প্রকাণ্ড সভায় অনেক লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু করা অপুর এই প্রথম। প্রথমটা তাহার পা কাঁপিল, গলাও খুব কাঁপিল, কিন্তু ক্রমে বেশ সহজ হইয়া আসিল। প্রবন্ধ খুব সতেজ—এ বয়সে যাহা দোষ থাকে—উচ্ছ্বাস, অনভিজ্ঞ আইডিয়ালিজ্‌ম্, ভাল মন্দ নির্বিশেষে পুরাতনকে ছাঁটিয়া ফেলিবার দম্ভ—বেপরোয়া সমালোচনা, তাহার প্রবন্ধে কোনটাই বাদ যায় নাই। প্রবন্ধ পড়িবার পরে খুব হৈ-চৈ হইল। খুব তীব্র সমালোচনা হইল। প্রতিপক্ষ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। কিন্তু অপু দেখিল অধিকাংশ সমালোচকই ফাঁকা আওয়াজ করিতেছে। সে যাহা লইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও কিছু অভিজ্ঞতাও নাই, বলিবার বিষয়ও নাই, তাহারা তাহাকে মন্মথর শ্রেণীতে ফেলিয়া দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী বলিয়া গালাগালি দিতে শুরু করিয়াছে।

অপু মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। হয়ত সে আরও পরিস্ফুট করিয়া লিখিলে ভাল করিত। জিনিষটা কি পরিষ্কার হয় নাই। এত বড সভার মধ্যে তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু'একজন বন্ধু ছাড়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে,—টিটকারি গালাগালির অংশের জন্য মন্মথকে হিংসা করার তাহার কিছুই নাই। শেষে সভাপতি তাহাকে প্রতিবাদের উত্তর দিবার অধিকার দেওয়াতে সে উঠিয়া ব্যাপারটা আরও খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিল। দু'চারজন সমালোচক—যাহাদের প্রতিবাদ সে বসিয়া নোট করিয়া লইয়াছিল, তাহাদিগকে উত্তর দিতে গিয়া যুক্তির খেই হারাইয়া ফেলিল। অপুর পক্ষ এই অবসরে আর এক পালা হাসিয়া লইতে ছাড়িল না। অপু রাগিয়া গিয়াছিল, এইবার যুক্তির পথ না ধরিয়া উচ্ছ্বাসের পথ ধরিল। সকলকে সংকীর্ণমনা বলিয়া গালি দিল, একটা বিদ্রূপাত্মক গল্প বলিয়া অবশেষে টেবিলের উপর একটা কিল মারিয়া এমার্সনের একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বক্তৃতার উপসংহার করিল।

ছেলেদের দল খুব গোলমাল করিতে করিতে হলের বাহির হইয়া গেল। বেশীর ভাগ ছেলে তাহাকে যা-তা বলিতেছিল—নিছক বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা ছাড়া তাহার প্রবন্ধ যে অন্য কিছুই নহে ইহাও অনেকের মুখে শোনা যাইতেছে। সে শেষের দিকে এমার্সনের এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিল—

'I am the owner of the sphere
Of the seven stars and the solar year'

তাহাতেই অনেকে তাহাকে দাম্ভিক ঠাওরাইয়া নানারূপ বিদ্রূপ ও টিটকারি দিতেও ছাড়িল না। কিন্তু অপু ও কবিতাটায় নিজেকে আদৌ উদ্দেশ্য করে নাই, যদিও তাহার নিজেকে জাহির করার স্পৃহাও কিছু কম ছিল না বা মিথ্যা গর্ব প্রকাশে সে ক্লাসের কাহারও অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী।

তাহার নিজের দলের কেহ কেহ তাহাকে ঘিরিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিল। ভিড় একটু কমিয়া গেলে সে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলেজ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, গেটের কাছে একটি সতেরো আঠারো বছরের লাজুক প্রকৃতির ছেলে তাহাকে বলিল—একটুখানি দাঁড়াবেন?

অপু ছেলেটিকে চেনে না, কখনও দেখে নাই। একহারা, বেশ সুশ্রী, পাতলা সিল্কের জামা গায়ে, পায়ে জরির নাগরা জুতা।

ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—আপনার প্রবন্ধটা আমায় একটু পড়তে দেবেন? কাল আবার আপনাকে ফেরত দেব।

অপুর আহত আত্মাভিমান পুনরায় হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। খাতাখানা ছেলেটির হাতে দিয়া বলিল,—দেখবেন কাইগুলি, যেন হারিয়ে না যায়—আপনি বুঝি—সায়েন্স?—ও!

পরদিন কলেজ বসিবার সময়ে ছেলেটি গেটেই দাঁড়াইয়াছিল—অপুর হাতে খাতাখানা ফিরাইয়া দিয়া ছোট একটি নমস্কার করিয়াই ভিড়ের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। অন্যমনস্ক ভাবে ক্লাসে বসিয়া অপু খাতাখানা উল্টাইতেছিল, একখানা কি কাগজ খাতাখানার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইলেকট্রিক পাখার হাওয়ায় খানিকটা উড়িয়া গেল। পাশের ছেলেটি সেখানা কুড়াইয়া তাহার হাতে দিলে সে পড়িয়া দেখিল, পেন্সিলে লেখা একটি কবিতা—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া:—

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার রায়

কবকমলেষু—

বাঙ্গালী সমাজ যেন পঙ্কময় বদ্ধ জলাশয়
নাহি আলো স্বাস্থ্যভরা, বহে হেথা বায়ু বিষময়
জীবন-কোরকগুলি, অকালে শুকায়ে পড়ে ঝরি
বাঁচাবার নাহি কেহ, সকলেই আছে যেন মরি।
নাহি চিন্তা, নাহি বুদ্ধি, নাহি ইচ্ছা, নাহি উচ্চ আশা,
সুখদুঃখ হীন এক জড়পিণ্ড, নাহি মুখে ভাষা।
এর মাঝে দেখি যবে কোনো মুখ উজ্জ্বল সরস,
নয়নে আশার দৃষ্টি, ওষ্ঠপ্রান্তে জীবন হরষ—

অধরে ললাটে ভ্রূতে প্রতিভার সুন্দর বিকাশ,
স্থির দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ প্রকাশ,
সম্ভ্রমে হৃদয় পুরে, আনন্দ ও আশা জাগে প্রাণে,
সম্ভাষিতে চাহে হিয়া বিমল প্রীতির অর্ঘ্যদানে।
তাই এই ক্ষীণ-ভাষা ছন্দে গাঁথি দীন উপহার
লজ্জাহীন অসঙ্কোচে আনিয়াছি সম্মুখে তোমার,
উচ্চ লক্ষ্য, উচ্চ আশা বাঙ্গালায় এনে দাও বীর
সুযোগ্য সন্তান যে রে তোরা সবে বঙ্গ জননীর।

গুণমুগ্ধ
শ্রী—

ফার্স্ট ইয়ার, সায়েন্স, সেক্‌সন বি।

অপু বিস্মিত হইল। আগ্রহের ও ঔৎসুক্যের সহিত আর একবার পড়িল—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একে চায় তো অন্যে পায়,—একেই নিজের কথা পরকে জাঁক করিয়া বেড়াইতে সে অদ্বিতীয়, তাহার উপর তাহারই উদ্দেশে লিখিত এক অপরিচিত ছাত্রের এই পত্র পাইয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে সে ভুলিয়া গেল যে ক্লাসে স্বয়ং মিঃ বসু ইতিহাসের বক্তৃতায় কোন এক রোমান সম্রাটের অমানুষিক ঔদারিকতার কাহিনী সবিস্তারে বলিতেছেন। সে পাশের ছেলেকে ডাকিয়া পত্রখানা দেখাইতে যাইতেই জানকী খোঁচা দিয়া বলিল,—এই! সি, সি, বি, এখুনি বকে উঠবে—তোর দিকে তাকাচ্ছে, সামনে চা—এই!

আঃ—কতক্ষণে সি, সি, বি,-র এই বাজে বকুনি শেষ হইবে!—বাহিরে গিয়া সকলকে চিঠিখানা দেখাইতে পারিলে যে সে বাঁচে!—ছেলেটিকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

ছুটির পর গেটের কাছেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হইল। বোধ হয় সে তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কলেজের মধ্যে এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্ত পাইয়া অপু মনে মনে গর্ব অনুভব করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগ! তবে তাহার পক্ষে একটু সাহসের বিষয় এই দাঁড়াইল যে, ছেলেটি তাহার অপেক্ষাও লাজুক। অপু গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহার হাত ধরিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল। কেহই কাগজে লেখা পদ্যটার কোনও উল্লেখ করিল না, যদিও দুজনেই বুঝিল যে, তাহাদের আলাপের মূলে কালকের সেই চিঠিখানা। কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বলিল,—চলুন কোথাও বেড়াতে যাই, কলকাতার বাইরে

কোথাও মাঠে—শহরের মধ্যে হাঁপ ধরে—কোথাও একটা ঘাস দেখবার জো নেই—

কথাটা শুনিয়াই অপুর মনে হইল, এ ছেলেটি তো সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। ঘাস না দেখিয়া কষ্ট হয় এমন কথা তো আজ প্রায় একবৎসর কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কলেজের কোন বন্ধুর মুখে শোনে নাই।

সাউথ সেকশনেব ট্রেনে গোটাচারেক স্টেশন পবে তাহারা নামিল। অপু কখনও এদিকে আসে নাই। ফাঁকা মাঠ, কেয়া ঝোপ, মাঝে মাঝে হোগলা বন। সরু মেঠো পথ ধবিয়া দুজনে হাঁটিয়া চলিতেছিল—ট্রেনের অল্প আধঘণ্টার আলাপেই দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় পরিচয় জমিয়া উঠিল। মাঠের মধ্যে একটা গাছের তলায় দুজনে গিয়া বসিল।

ছেলেটি নিজের ইতিহাস বলিতেছিল—

হাজারিবাগ জেলায় তাহাদেব এক অভ্রের খনি ছিল, ছেলেবেলায় সে সেখানেই মানুষ। জায়গাটাব নাম বডবনী, চারিধারে পাহাড় আর শাল-পলাশের বন, কিছু দূবে দারুকেশ্বব নদী।• নিকটে পাহাডের গায়ে একটা ঝর্ণা।...পডন্ত বেলায় শালবনের পিছনের আকাশটা কত কি রঙে রঞ্জিত হইত—প্রথম বৈশাখে শাল-কুসুমের ঘন সুগন্ধ দুপুরের রৌদ্রকে মাতাইত, পলাশবনে বসন্তের দিনে যেন ডালে ডালে আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিত—সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বাঘেরা আসিত ঝর্ণার জল পান করিতে—বাংলো হইতে একটু দূরে বালির উপর কতদিন সকালে বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ দেখা গিযাছে।

সেখানকার জ্যোৎস্না রাত্রি! সে রাত্রির বর্ণনা নাই, ভাষা যোগায় না। স্বর্গ যেন দূরের নৈশকুয়াসাচ্ছন্ন অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণীর ওপারে—ছায়াহীন, সীমাহীন, অনন্তরস-ক্ষরা জ্যোৎস্না যেন দিক্‌চক্রবালে তাহারই ইঙ্গিত দিত।

এক-আধদিন নয়, শৈশবের দশ দশটি বৎসর সেখানে কাটিয়াছে। সে অন্য জগৎ, পৃথিবীর মুক্ত প্রসারতার রূপ সেখানে চোখে কি মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে,---কোথাও আর ভাল লাগে না! অভ্রের খনিতে লোকসান হইতে লাগিল, খনি অপরে কিনিয়া লইল, তাহার পর হইতেই কলকাতায়। মন হাঁপাইয়া ওঠে—খাঁচার পাখির মত ছট্‌ফট্ করে। বাল্যের সে অপূর্ব আনন্দ মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

অপু এ ধরণের কথা কাহারও মুখে এ পর্যন্ত শোনে নাই—এ যে তাহারই অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি। গাছপালা, নদী, মাঠ ভালোবাসে বলিয়া দেওয়ানপুরে তাহাকে সবাই বলিত পাগল। একবার মাঘমাসের শেষে পথে

কোন গাছের গায়ে আলোকলতা দেখিয়া রমাপতিকে বলিয়াছিল,—কেমন সুন্দর! দেখুন দেখুন রমাপতিদা—

রমাপতি মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিয়াছিল মনে আছে—ওসব যার মাথায় ঢুকেছে তার পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে।

পরকালটা কি জন্যে যে ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে, একথা সে বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু ভাবিয়াছিল রমাপতিদা স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র অবশ্যই তাহার অপেক্ষা ভাল জানে। এ পর্যন্ত কাহারও নিকট হইতেই সে ইহার সায় পায় নাই, এতদিন পরে ইহাকে ছাড়া। তাহা হইলে তাহার মত লোকও আছে।...সে একেবারে সৃষ্টিছাড়া নয়!

অনিল বলিল—দেখুন, এই এত ছেলে কলেজে পড়ে, অনেকের সঙ্গে আলাপ ক'রে দেখেছি—ভাল লাগে না—dull unimaginative mind; পড়তে হয় পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ কোন বিষয়ে কৌতূহলও নেই, জানবার একটা সত্যিকার আগ্রহও নেই। তাছাড়া, এত ছোট কথা নিয়ে থাকে যে, মন মোটে—মানে, কেমন যেন,—যেন মাটির উপর hop ক'রে বেড়ায়! প্রথম সেদিন আপনার কথা শুনে মনে হ'ল, এই একজন অন্য ধরণের, এ দলের নয়।

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। এসব সেও নিজের মনের মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিয়াছে, অপরের সঙ্গে নিজের এ পার্থক্য মাঝে মাঝে তাহার কাছে ধরা পড়িলেও সে নিজের সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয় বলিয়া এ জিনিসটা বুঝিতে পারিত না। তাহা ছাড়া অপুর প্রকৃতি আরও শান্ত, উগ্রতাশূন্য ও উদার,—পরের তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের ধাতই নাই তাহার একেবারে!—কিন্তু তাহার একটা মহৎ দোষ এই যে, নিজের বিষয়ে কথা একবার পাড়িলে সে আর ছাড়িতে চায় না—অপরেও যে নিজের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতে পারে, তরুণ বয়সের অনাবিল আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং সে নিজের বিষয়ে একটানা কথা বলিয়া যায়—নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্খা, নিজের ভালমন্দ লাগা, নিজের পড়াশুনা। নিজের কোন দুঃখদুর্দশার কথা বলে না, কোন ব্যথা-বেদনার কথা তোলে না—জলের উপরকার দাগের মত সে-সব কথা তাহার মনে মোটেই স্থান পায় না—আনকোরা তাজা নবীন চোখের দৃষ্টি শুধুই সম্মুখের দিকে, সম্মুখের বহুদূর দিক্‌চক্রবাল রেখারও ওপারে—আনন্দ ও আশায় ভরা এক অপূর্ব রাজ্যের দিকে।

সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়া চিম্‌নি-ভাঙা পুরনো হিঙ্কসের লণ্ঠনটা জ্বালিয়া সে পকেট হইতে অনিলের চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িতে বসিল।

আমায় যে ভাল বলে, সে আমার পরম বন্ধু, আমার মহৎ উপকার করে, আমার আত্মপ্রত্যয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে, আমার মনের গভীর গোপন কোনও লুকানো রত্নকে দিনের আলোয় মুখ দেখাইতে সাহস দেয়।

পড়িতে পড়িতে পাশের বিছানার দিকে চাহিয়া মনে পড়ে—আজ আবার তাহার ঘরের অপর লোকটির এক আত্মীয় কাঁচরাপাড়া হইতে আসিয়াছে এবং এই ঘরেই শুইবে। সে আত্মীয়টির বয়স বছর ত্রিশেক হইবে ; কাঁচরাপাড়া লোকো অফিসে চাকরি করে, বেশী লেখাপড়া না জানিলেও অনবরত যা তা ইংরেজী বলে, হরদম সিগারেট খায়, অত্যন্ত বকে, অকারণে গায়ে পড়িয়া ভাই ভাই বলিয়া কথা বলে. তাহার মধ্যে বারো আনা থিয়েটারের গল্প, অমুক য্যাকট্রেস তাবাবাঈ-এর ভূমিকায় যে-রকম অভিনয় করে, অমুক থিয়েটারের বিধুমুখীর মত গান—বিশেষ ক'রে 'হীরার ফুল' প্রহসনে বেদেনীর ভূমিকায়, নয়ন জলের ফাঁদ পেতেছি' নামক সেই বিখ্যাত গানখানি সে যেমন গায়, তেমন আর কোথায়, কে গাহিতে পারে?—তিনি এজন্য বাজি ফেলিতে প্রস্তুত আছেন।

এসব কথা অপুর ভাল লাগে না, থিয়েটারের কথা শুনিতে তাহার কোনও কৌতূহল হয় না। এ লোকটির চেয়ে আলুর ব্যবসাদারটি অনেক ভাল। সে পাড়াগাঁয়ের লোক, অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির, আর এত বাজে কথা বলে না, অন্তত তাহার সঙ্গে তো নয়ই। এ ব্যক্তিটির যত গল্প তাহার সঙ্গে।

মনে মনে ভাবে—একটু ইচ্ছে করে—বেশ একা একটি ঘর হয়, একা বসে পড়াশুনো করি, টেবিল থাকে একটা, বেশ ফুল কিনে এনে গ্লাসের জলে দিয়ে সাজিয়ে রাখি। এ ঘরটার না আছে জানলা, পড়তে পড়তে একটু খোলা আকাশ দেখবার জো নাই, তামাকের গুল রোজ পরিষ্কার করি, আর রোজ ওরা এই রকম নোংরা করবে—মা ওয়াড ক'রে দিয়েছিল, ছিঁড়ে গিয়েচে, কি বিশ্রী তেল চিটচিটে বালিশটা হয়েছে—! এবার হাতে পয়সা হ'লে একটা ওয়াড করাবো।

অনিলের সঙ্গে পরদিন বৈকালে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেল। চাঁদপাল ঘাটে, প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটে বড় বড় জাহাজ নোঙর করিয়া আছে, অপু পড়িয়া দেখিল: কোনটার নাম 'বম্বে', কোনটার নাম 'ইদজু মারু'। সেদিন বৈকালে নতুন ধরণের রং-করা একখানা বড় জাহাজ দেখিয়াছিল, নাম লেখা আছে 'শেনানডোয়া'। অনিল বলিল, আমেরিকান মাল জাহাজ,—জাপানের পথে আমেরিকা যায়। অপু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া জাহাজখানা দেখিল। নীল পোষাক-পরা একটা লস্কর রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলের মধ্যে কি

দেখিতেছে। লোকটি কি সুখী! কত দেশবিদেশে বেড়ায়, কত সমুদ্রে পাড়ি দেয়, চীন সমুদ্রে টাইফুনে পড়িয়াছে, পিনাং-এর নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় কত দুপুর কাটাইয়াছে, কত ঝড়বৃষ্টির রাত্রে এই সকল রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাত্যাক্ষুব্ধ, উত্তাল, উন্মত্ত মহাসমুদ্রের রূপ দেখিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা বোঝে কি? কিছুই না। ও কি দূর হইতে ফুজিয়ামা দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে? দক্ষিণ আমেরিকার কোনও বন্দরে নামিয়া পথের ধারে কি গাছপালা আছে তাহা নিবিষ্ট মনে সাগ্রহে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে? হয়ত জাপানের পথের ধারে বাংলা দেশের পরিচিত কোনও ফুল আছে, ও লোকটি জানে না, হয়ত কালিফোর্ণিয়ার শহরবন্দর হইতে দূরে নির্জন Sierra-র ঢালুতে বনঝোপের নানা অচেনা ফুলের সঙ্গে তাহাদের দেশের সন্ধ্যামণি ফুলও ফুটিয়া থাকে, ও লোকটা কি কখনও সেখানে সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় বড় একখণ্ড পাথরের উপর আপন মনে বসিয়া নীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে?

অথচ ও লোকটারই অদৃষ্টে ঘটিতেছে দেশ বিদেশে ভ্রমণ, সমুদ্রে-সমুদ্রে বেড়ানো—যাহার চোখ নাই, দেখিতে জানে না; আর সে যে শৈশব হইতে শত সাধ পুষিয়া রাখিয়া আসিতেছে মনের কোণে, তাহার কি কিছুই হইবে না? কবে যে সে যাইবে!...কলিকাতার শীতের রাত্রের এ ধোঁয়া তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। চোখ জ্বালা করে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, কিছু দেখা যায় না, মন তাহার একেবারে পাগল হইয়া উঠে—এ এক অপ্রত্যাশিত উপদ্রব? কে জানিত শীতকালে কলিকাতার এ চেহারা হয়!

ওই লোকটার মত জাহাজের খালাসী হইতে পারিলেও সুখ ছিল।

Ship ahoy!...কোথাকার জাহাজ?...

কলিকাতা হইতে পোর্ট মর্সবি, অষ্ট্রেলেশিয়া,

ওটা কি উঁচু মত দূরে?

প্রবালের বড় বাঁধ—The Great Barrier Reef—

এই সমুদ্রের ঠিক এই স্থানে, প্রাচীন নাবিক টাস্‌ম্যান ঘোর তুফানে পড়িয়া মাস্তল ভাঙা পালছেঁড়া ডুবু ডুবু অবস্থায় অকূলে ভাসিতে ভাসিতে বারো দিনের দিন কূল দেখিতে পান—সেইটাই—সেকালে ভ্যান ডিমেন্‌স্‌ল্যাণ্ড, বর্তমানে টাস্‌মেনিয়া!...কেমন দূরে নীল চক্রবালরেখা!...উড়ন্ত সিন্ধুশকুনদলের মাতামাতি, প্রবালের বাঁধের উপর বড় বড় ঢেউয়ের সবেগে আছড়াইয়া পড়ার গম্ভীর আওয়াজ।

উপকূলরেখার অনেক পিছনে যে পাহাড়টা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওটা হয়ত জলহীন দিক-দিশাহীন ধূ ধূ নির্জন মরুর মধ্যে...শুধুই বালি আর

শুকনা বাবুল গাছের বন,···শত শত ক্রোশ দূরে ওর অজানা অধিত্যকায় লুকানো আছে সোনার খনি, কালো ওপ্যালের খনি···এই খর, জলন্ত, মরু-রৌদ্রে খনির সন্ধানে বাহির হইয়া কত লোক ওদিকে গিয়াছিল, আর ফেরে নাই, মরুদেশের নানা স্থানে তাদের হাড়গুলা রৌদ্রে বৃষ্টিতে ক্রমে সাদা হইয়া আসিল।

অনিল বলিল, চলুন, আজ সন্ধ্যে হয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখে আর কি হবে?···

অপু সমুদ্র সংক্রান্ত বহু বই কলেজ-লাইব্রেরী হইতে পড়িয়া ফেলিয়াছে। কেমন একটা নেশা, কখনও কোন ছাত্র যাহা পড়ে না, এমন সব বই। বহু প্রাচীন নাবিক ও তাহাদের জলযাত্রার বৃত্তান্ত, নানা দেশ আবিষ্কারের কথা, সিবাষ্টিয়ান ক্যাবট, এরিক্‌সন, কর্টেজ ও পিজারো কর্তৃক মেক্সিকো ও পেরু বিজয়ের কথা। দুর্ধর্ষ স্পেনীয় বীর পিজারো ব্রেজিলের জঙ্গলে রূপার পাহাড়ের অনুসন্ধানে গিয়া কি করিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া বেঘোরে অনাহারে সসৈন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল—আর কত কি।

পরদিন কলেজ পালাইয়া দু'জনে দুপুরবেলা ষ্ট্রাণ্ড রোডের সমস্ত ষ্টীমার কোম্পানীর অফিসগুলি ঘুরিয়া বেড়াইল। প্রথমে 'পি-এণ্ড-ও'। টিফিনের সময় কেরানীবাবুরা নীচের জলখাবার ঘরে বসিয়া চা খাইতেছেন, কেহ বিড়ি টানিতেছেন। অপু পিছনে রহিল, অনিল আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আজ্ঞে, আমরা জাহাজে চাকরি খুঁজ্‌ছি, এখানে খালি আছে জানেন?

একজন টাক-পড়া রোগা চেহারার বাবু বলিলেন,—চাকরি?—জাহাজে··· কোন জাহাজে?

—যে কোন জাহাজে—

অপুর বুক উত্তেজনায় ও কৌতূহলে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতেছিল, কি বুঝি হয়।

বাবুটি বলিলেন, জাহাজের চাকরিতে তোমাদের চলবে না হে ছোকরা, —গ্যাখো, একবার ওপরে মেরিন্ মাস্টারের ঘরে খোঁজ করো।

কিছুই হইল না। 'বি-আই-এস্-এন্' তথৈবচ! 'নিপন-ইউশেন কাইশা'ও তাই। টার্ণার মরিসনের অফিসে তাহাদের সহিত কেহ কথাও কহিল না। বড় বড় বাড়ি, সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা-নামা করিতে করিতে শীতকালেও ঘাম দেখা দিল। অবশেষে মরীয়া হইয়া অপু গ্লাডস্টোন ওয়াইলির অফিসে চারতলায় উঠিয়া মেরিন্ মাস্টারের কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। খুব দীর্ঘদেহ, অত বড় গোঁফ সে কখনও কাহারও দেখে নাই। সাহেব বিরক্ত হইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কাহাকে ডাক দিল। অপুর কথা কানেও তুলিল না। একজন প্রৌঢ় বয়সের বাঙালীবাবু ঘরে ঢুকিয়া ইহাদের দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—এ ঘরে কি? এসো,

এসো, বাইরে এসো।

বাহিরে গিয়া অনিলের মুখে আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন, কেন হে ছোকরা? বাড়ি থেকে রাগ ক'রে পালাচ্ছ?

অনিল বলিল,—না, রাগ ক'রে কেন পালাব?

—রাগ ক'রে পালাচ্ছ না তো এ মতি হ'ল কেন? জাহাজে চাকরি খুঁজছো —কোন্ চাকরি হবে জানো? খালাসীর চাকরি···এক বছরের এগ্রিমেণ্টে জাহাজে উঠতে হবে। বাঙালীর খাওয়া জাহাজে পাবে না···কষ্টের একশেষ হবে, গোরা লস্করগুলো অত্যন্ত বদমায়েস, তোমাদের সঙ্গে বনবে না। আরও নানা কষ্ট—স্টোকারের কাজ পাবে, কয়লা দিতে দিতে জান হয়রান হবে—সে সব কি তোমাদের কাজ?

—এখন কোনও জাহাজ ছাড়ছে নাকি?

—জাহাজ তো ছাড়ছে 'গোলকুণ্ডা'—আর সাতদিন পরে মঙ্গলবারে ছাড়বে মাল জাহাজ—কলম্বো হয়ে ডারবান যাবে—

ছু'জনেই মহা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। তাহাদের কোনও কষ্ট হইবে না. কষ্ট করা তাহাদের অভ্যাস আছে। দয়া করিয়া তিনি যদি কোন ব্যবস্থা করেন! অপু প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—তা হোক, দিন আপনি জোগাড় ক'রে—ওসব কিছু কষ্ট না—দিন আপনি—গোরা লস্করে কি করবে আমাদের? কয়লা খুব দিতে পারবো—

কেরানীবাবুটি হাসিয়া বলিলেন,—একি ছেলেখেলা হে ছোকরা! কয়লা দেবে তোমরা! বুঝতে তো পারছো না সেখানকার কাণ্ডকারখানা! বয়লারের গরম, হাওয়া নেই, দম বন্ধ হয়ে আসবে—চার শভেল্ কয়লা দিতে না দিতে হাতের শিরা দড়ির মত ফুলে উঠবে—আর তাতে ওই ডেলিকেট্ হাত—হাঁপ জিরুতে দেবে না, দাঁড়াতে দেখলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মারবে চাবুক—দশ হাজার ঘোড়ার জোরের এঞ্জিনের ষ্টিম বজায় রাখতে হবে সব সময়, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাবে না—আর গরম কি সোজা! কুম্ভীপাক নরকের গরম ফার্ণেশের মুখে? সে তোমাদের কাজ?—

তবুও ছুজনে ছাড়ে না।

ইহারা যে বাড়ি হইতে পালাইয়া যাইতেছে, সে ধারণা বাবুটির আরও দৃঢ় হইল। বলিলেন—নাম ঠিকানা দিয়ে যাও তো তোমাদের বাড়ির। দেখি তোমাদের বাড়িতে না হয় নিজে একবার যাব।

কোনো রকমেই তাঁহাকে রাজী করাইতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা চলিয়া আসিল।

একদিন অপু দুপুরবেলা কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গায়ের জামা খুলিতেছে, এমন সময় পাশের বাড়ির জানালাটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়িতে সে আর চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না। জানালাটির গায়ে খড়ি দিয়া মাঝারি অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।' অপু অবাক হইয়া খানিকটা সেদিকে চাহিয়া রহিল এবং পরক্ষণেই কৌতুকের আবেগে হাতের নোটখাতাখানা মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আপন মনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পাশের বাড়ি—তাহার ঘর হইতে জানালাটা হাত পাঁচ ছয় দূরে—মধ্যে একটা সরু গলি। অনেকদিন সে দেখিয়াছে, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে জানালার গরাদ ধরিয়া এদিকে চাহিয়া আছে, বয়স চৌদ্দ-পনেরো! রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, বেশ মুখখানা, যদিও তাহাকে সুন্দরী বলিয়া কোনদিনও অপুর মনে হয় নাই। তাহার কলেজ হইতে আসিবার সময় হইলে প্রায়ই সে মেয়েটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিত। ক্রমে শুধু দাঁড়ানো নয়, মেয়েটি তাহাকে দেখিলেই হঠাৎ হাসিয়া জানালার আড়ালে মুখ লুকায়, কখনও বা জানালার খড়খড়ি বারকতক খুলিয়া বন্ধ করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, দিনের মধ্যে দুবার, তিনবার, চারবার কাপড় বদ্‌লাইয়া ঘরটার মধ্যে অকারণে ঘোরাফেরা করে এবং ছুতানাতায় জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। কতদিন এ-রকম হয়, অপু মনে মনে ভাবে—মেয়েটা আচ্ছা বেহায়া তো। কিন্তু আজকাল এ ব্যাপারে একেবারে অপ্রত্যাশিত।

আজ ও-বেলা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে খাইতে গিয়া সে দেখিয়াছিল সুন্দর ঠাকুর মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। দুই-তিনমাসের টাকা বাকী, সামান্য পুঁজির হোটেল, অপূর্ববাবু ইহার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?—আর কতদিন এ ভাবে সে বাকী টানিয়া যাইবে ?—সুন্দর ঠাকুরের কথায় তাহার মনে যে দুর্ভাবনার মেঘ জমিয়াছিল, সেটা কৌতুকের হাওয়ায় এক মুহূর্তে কাটিয়া গেল! আচ্ছা তো মেয়েটা ? ছাখো কি লিখে রেখেছে—ওদের—হো-হো—আচ্ছা—হি-হি—

সেদিন আর মেয়েটাকে দেখা গেল না, যদিও সন্ধ্যার সময় একবার ঘরে ফিরিয়া সে দেখিল, জানালায় সে খড়ির লেখা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। পরদিন সকালে ঘরের মধ্যে মাদুর বিছাইয়া পড়িতে পড়িতে মুখ তুলিতেই অপু দেখিতে পাইল, মেয়েটি জানালার ধারে দাড়াইয়া আছে। কলেজে যাইবার কিছু আগে মেয়েটি আর একবার আসিয়া দাঁডাইল। সবে স্নান সারিয়া আসিয়াছে, লালপাড শাড়ি পরণে, ভিজে চুল পিঠের উপর ফেলা, সোনার বালা পরা নিটোল ডান হাতটি দিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া আছে। অল্পক্ষণের জন্য—

কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে কলেজে গেল। সেখানে অনেকের কাছে ব্যাপারটা গল্প করিল। প্রণব তো শুনিয়া হাসিয়া খুন, জানকীও তাই। সবাই আসিয়া দেখিতে চায়—এ যে একেবারে সত্যিকার জানালা-কাব্য। সত্যেন বলিল, নভেল ও মাসিকের পাতায় পড়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে এ-রকম যে ঘটে তা তো জানা ছিল না!···নানা হাসি তামাশা চলিল, সকলেই যে ভদ্রতাসঙ্গত কথা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

তারপর দিনচারেক বেশ কাটিল, হঠাৎ একদিন আবার জানালায় লেখা—‘হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।’ জানালার খড়খড়ির গায়ে এমনভাবে লেখা যে, জানালা খুলিয়া লম্বা কব্জাটা মুড়িয়া ফেলিলে লেখাটা শুধু তাহার ঘর হইতেই দেখা যায়, অন্য কারুর চোখে পড়িবার কথা নহে। প্রণবটা যদি এ সময় এখানে থাকিত! তারপর আবার দিন-দুই সব ঠাণ্ডা।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল—সকালে কয়েক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দুপুরের পরই আবার খুব মেঘ করিয়া আসিল। কারখানার উঠানে মাল-বোঝাই মোটর লরীগুলার শব্দ একটু থামিলেও দুপুরের ‘শিফ্‌ট’-এ মিস্ত্রীদের প্যাক্‌বাক্সের গায়ের লোহার বেড় পরাইবার দুম্‌দাম আওয়াজ বেজায়। এই বিকট আওয়াজের জন্য দুপুরবেলা এখানে তিষ্ঠানো দায়।

অপু ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল, মেয়েটি জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পক্ষণের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল! মেয়েটি অন্য অন্য দিনের মত আজও হাসিয়া ফেলিল। অপুর মাথায় দুষ্টুমি চাপিয়া গেল। সেও আগাইয়া গিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইল—তারপর সে নিজেও হাসিল। মেয়েটি একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল কেহ আসিতেছে কিনা—পরে সেও আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল! অপু কৌতুকের স্বরে বলিল,—কিগো হেমলতা, আমায় বিয়ে করবে?

মেয়েটি বলিল—করবো। কথা শেষ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

অপু বলিল,—কি জাত তোমরা—বামুন?—আমি কিন্তু বামুন।

মেয়েটি খোঁপায় হাত দিয়া একটা কাঁটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল—আমরাও বামুন।—পরে হাসিয়া বলিল—আমার নাম তো জেনেছেন, আপনার নাম কি?

অপু বলিল, ভাল নাম অপূর্ব, আমরা বাঙ্গাল দেশের লোক—শহরের মেয়ে তোমরা—আমাদের তো দু'চোখে দেখতেই পারো না—তাই না? তোমায় একটা কথা বলি শোন্,…ওরকম লিখো না জানালার গায়ে—যদি কেউ টের পায়?

মেয়েটি আর একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, কে টের পাবে? কেউ দেখতে পায় না ওদিক থেকে—আমি যাই, কাকীমা আসবে ঠাকুরঘর থেকে। আপনি বিকেলে রোজ থাকেন?

মেয়েটি চলিয়া গেলে অপুর হাসি পাইল। পাগল না তো? ঠিক—এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই…মেয়েটি পাগল। মেয়েটির চোখে তাই কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের দৃষ্টি। কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর করুণা ও অনুকম্পায় তাহার সারা মন ভরিয়া গেল। মেয়ের বাপকে সে মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখে—প্রৌঢ়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোন অফিসের কেরানী বোধ হয়। সে কলেজে যাইবার সময় রোজ ভদ্রলোক ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকেন। হয়ত মেয়েটির বাবাই, নয়ত কাকা বা জ্যাঠামশায়, কি মামা—মোটের উপর তিনিই একমাত্র অভিভাবক। খুব বেশী অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয় না। হয়ত তাহাকে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে—এ-রকম তো হয়!

তাহার ইচ্ছা হইল, একবার মেয়েটিকে দেখিতে পাইলে তাহাকে দু'টা মিষ্টি কথা, দু'টা সান্ত্বনার কথা বলিবে। কেহ কিছু মনে করিবে? যদি নিতাইবাবু টের পায়?—পায় পাইবে।

খবরের কাগজে সে মাঝে মাঝে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিত, একদিন দেখিল কোন একজন ডাক্তারের বাড়ির জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর দরকার। গেল সে সেখানে। দোতলা বড় বাড়ি, নিচে বৈঠকখানা কিন্তু সেখানে বড় কেহ বসে না, ডাক্তারবাবুর কনসাল্‌টিং রুম দোতলার কোণের, কামরায় সেখানেই রোগীর ভিড়। অপু গিয়া দেখিল, নিচের ঘরটাতে অন্যূন জন-পনেরো নানা বয়সের লোক তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া বসিয়া—সেও গিয়া

একপাশে বসিয়া গেল। তাহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ঐ বিজ্ঞাপন শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে—এত সকাল, অত ছোট ছোট অক্ষরের এককোণে লেখা বিজ্ঞাপনটা—সেও ভাবিয়াছিল—উঃ—এ যে ভিড় দেখা যায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

কাহাকে পড়াইতে হইবে, কোন্ ক্লাসের ছেলে, কত বড়, কেহই জানে না। পাশের একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল—মশাই জানেন কিছু, কোন্ ক্লাসের—

অপু বলিল, সেও কিছুই জানে না। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছোকরার সঙ্গে অপুর আলাপ হইল। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া হোমিওপ্যাথি পড়ে, টিউশনির নিতান্ত দরকার, না হইলেই চলিবে না। সে না কি কালও একবার আসিয়াছিল, নিজের দুরবস্থার কথা সব কর্তাকে জানাইয়া গিয়াছে, তাহার হইলেও হইতে পারে। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অপু দেখিতেছিল, কাঠের সিঁড়িটা বাহিয়া এক-একজন লোক উপরের ঘরে উঠিতেছে এবং নামিবার সময় মুখ অন্ধকার করিয়া পাশের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। যদি তাহারও না হয়। পড়া বন্ধ করিয়া মনসাপোতা—কিন্তু সেখানেই বা চলিবে কিসে?

চাকর আসিয়া জানাইল, আজ বেলা হইয়া গিয়াছে, ডাক্তারবাবু কাহারও সঙ্গে এখন আর দেখা করিবেন না। এক-একখানা কাগজে সকলে নিজের নিজের নামধাম ও যোগ্যতা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, প্রয়োজন বুঝিলে জানানো যাইবে।

ছেঁদো কথা। সকলেই একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল—প্রত্যেকেরই মনে মনে বিশ্বাস—একবার গৃহস্বামী তাহাকে চাক্ষুস দেখিয়া তাহার গুণ শুনিলে আর চাকুরি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। অপুও ভাবিল সে উপরে যাইতে পারিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত।—তবে সে নিজের দুরবস্থার কথা কাহারও কাছে বলিতে পারিবে না। তাহার লজ্জা করে, দৈন্যের কাঁদুনি গাহিয়া পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা—অসম্ভব! লোকে কি করিয়া যে করে! প্রথম প্রথম সে কলিকাতায় আসিয়া ভাবিয়াছিল, কত বড়লোকের বাড়ি আছে কলিকাতায়, চাহিলে একজন দরিদ্র ছাত্রের উপায় করিয়া দিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। কত পয়সা তো তাদের কত দিকে যায়? কিন্তু তখন সে নিজেকে ভুল বুঝিয়াছিল, চাহিবার প্রবৃত্তি, পরের চোখে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি, এ-সব তাহার মধ্যে নাই। তাহার আছে—সে যাহা নয় তাহা হইতেও নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিবার, বাহাদুরি করিবার, মিথ্যা গর্ব করিয়া বেড়াইবার একটা

কু-অভ্যাস। তাহার মায়ের নির্বুদ্ধিতা এইদিক দিয়া ছেলেতে বর্তাইয়াছে, একেবারে হুবহু—অবিকল। এই কলিকাতা শহরে মহা কষ্ট পাইলেও সে নিতান্ত অন্তরঙ্গ এক-আধজন ছাড়া কখনও কাহাকে—তাও নিজের মুখে কখনও কিছু বলে না। পাছে ভাবে গরীব!

ইতস্ততঃ করিয়া সেও অপরের দেখাদেখি কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে গেল। নিচের উঠান হইতে চাকর হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আরে কাহে আপ্‌লোক উপরমে যাতে হেঁ···বাত্‌ নেহি মান্‌তে হেঁ, এ বড়া মুশ্‌কিল—। অপু সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সের একটি ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া হোমিওপ্যাথি-পড়া ছোকরাটির সঙ্গে কি তর্ক চলিতেছে বাহির হইতে বুঝা গেল—ছোকরাটি কি বলিতেছে, ভদ্রলোকটি কি বুঝাইতেছেন। সে ছোকরা একেবারে নাছোড়বান্দা, টিউশনি তার চাই-ই। ভদ্রলোকটি বলিতেছেন, ম্যাট্রিকুলেশন-ফেল টিউটর দিয়া তিনি কি করবেন? ক্রমে সকলে একে একে বাহিরে আসিয়া চলিয়া গেল। অপু ঘরেয় মধ্যে ঢুকিয়া সসঙ্কোচে বলিল—আপনাদের কি একজন পড়াবার লোক দরকার—আজ সকালের কাগজে বেরিয়েছে—

যেন সে এত লোকের ভিড়, উপরে উঠার নিষেধাজ্ঞা, কাগজে নামধাম লিখিয়া রাখিবার উপদেশ কিছুই জানে না! আসলে সে, ইচ্ছা করিয়া এরূপ ভালমানুষ সাজে নাই—পরিচিত স্থানে আসিয়া অপরিচিত লোকের সহিত কথা কহিতে গিয়া আনাড়ীপনার দরুন কথার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা ন্যাকা সুর আসিয়া গেল।

ভদ্রলোক একবার আপদমস্তক তাহাকে দেখিয়া লইলেন, তারপর একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, বসুন। আপনি কি পাশ?—ও. আই-এ পড়ছেন.—দেশ কোথায়?···ও।···এখানে থাকেন কোথায়?—হুঁ!

তিনি আরও যেন খানিকক্ষণ তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মিনিট পনেরো পরে—অপু বসিয়াই আছে—ডাক্তারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—, দেখুন, পড়ানো মানে—আমার একটি মেয়ে—তাকেই পড়াতে হবে। যাকে তাকে তো নিতে পারি নে—কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে—ওরে শোন্‌—তোর দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয় তো—বল্‌গে আমি ডাকছি—

একটু পরে মেয়েটি আসিল। বছর পনেরো বয়স, তন্বী, সুন্দরী, বড় বড় চোখ, আঙুলের গড়ন ভারি সুন্দর, রেশমী জামা গায়ে, চওড়া পাড় শাড়ি, গলায় সোনার সরু চেন, হাতে প্লেন বালা। মাথায় চুল এত ঘন যে, দু'ধারের কান যেন ঢাকিয়া গিয়াছে— জাপানী মেয়েদের মত ফাঁপানো খোঁপা!

…এইটি আমার মেয়ে, নাম প্রীতিবালা। বেথুন স্কুলে পড়ে, এই সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে। ইনি তোমার মাস্টার খুকি—আজ বাদ দিয়ে কাল থেকে উনি আসবেন—হ্যাঁ, এঁর মুখ দেখেই আমার মনে হয়েছে ইনিই ঠিক হবেন। বয়স আপনার আর কত হবে—এই উনিশ-কুড়ি, মুখ দেখেই তো মনে হয় ছেলে-মানুষ, তাছাড়া একটা distinction-এর ছাপ রয়েছে। খুকি বসো মা—

টিউশনি জোটার আনন্দ যত হোক না হোক, ভদ্রলোক যে বলিয়াছেন তাহার মুখে একটা distinction-এর ছাপ আছে—এই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সে সারাটা দিন কাটাইল ও ক্লাসে, পথে, বাসায়, হোটেলে—সর্বত্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাটা লইয়া নির্বোধের মত জাঁক করিয়া বেড়াইল। মাহিনা যত নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বলিল, মেয়েটির সৌন্দর্য-ব্যাখ্যা অনেক বাড়াইয়া করিল।

কিন্তু পরদিন পড়াইতে গিয়া দেখিল—মেয়েটি দেওয়ানপুরের নির্মলা নয়। সেরকম সরলা, স্নেহময়ী, হাস্যমুখী নয়—অল্প কথা কয়, খাটাইয়া লইতে জানে, একটু যেন গর্বিত। কথাবার্তা বলে হুকুমের ভাবে। অমুক অঙ্কটা কাল বুঝিয়ে দেবেন, অমুকটা কাল ক'রে আনবেন, আজ আরও একঘণ্টা বেশী পড়াবেন, পরীক্ষা আছে—ইত্যাদি। একদিন কোন কারণে আসিতে না পারিলে পরদিন কৈফিয়ৎ তলব করিবার সুরে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপু মনে মনে বড় ভয় খাইয়া গেল, যে রকম মেয়ে, কোন্ দিন পড়ানোর কোন ত্রুটির কথা বাবাকে লাগাইবে, চাকরির দফা গয়া—পথে বসা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকিবে না। ছাত্রীর উপর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়াই মাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল। বৌবাজার ডাকঘর হইতে টাকাটা পাঠাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সঙ্গের বন্ধুটি বলিল, এসো তো ভাই একটু চোরাবাজারে, একটা ভাল অপেরাগ্লাস কাল দর ক'রে রেখে এসেছি—নিয়ে আসি।

চোরাবাজারের নামও কখনও অপু শোনে নাই। ঢুকিয়া দেখিয়াই সে অবাক হইয়া গেল। নানা ধরণের জিনিসপত্র, খেলনা, আসবাবপত্র, ছবি, ঘড়ি, জুতা, কলের গান বই, বিছানা, সাবান, কৌচ, কেদারা—সবই পুরানো মাল। অপুর মনে হইল—বেশ সস্তা দরে বিকাইতেছে। একটা ফুলের টব, দর বলিল, ছ'আনা। একটা ভাল দোয়াতদান দশ আনা। এগারো টাকায় কলের গান সুদ্ধ রেকর্ড! এত দিন কলিকাতায় আছে, এত সস্তায় এখানে জিনিসপত্র বেচা-কেনা হয়, তা তো সে জানে না। এত শৌখিন জিনিসের এত কম-দাম।

তাহার মাথায় এক খেয়াল আসিয়া গেল। পরদিন সে বাকী টাকা হাতে বৈকালে আসিয়া চোরাবাজারে ঢুকিল। মনে ভাবিল—এইবার একটু ভাল ভাবে থাকবো, ওরকম গোয়াল ঘরে থাকতে পারি নে—যেমন নোংরা তেমনি অন্ধকার। প্রথমেই সে ফুলদানিজোড়া কিনিল। দোয়াতদানের উপর অনেকদিন হইতে ঝোঁক, সেটিও কিনিল। একটা জাপানী পর্দা, খানচারেক ছবি, খানকতক প্লেট, একটা আয়না, ঝুটা পাথর-বসানো ছোট্ট একটা আংটি। ছেলেমানুষের মত আনন্দে শুধু জিনিষগুলিকে দখলে আনিবার ঝোঁকে যাহাই চোখে ভাল লাগিল, তাহাই কিনিল। দাঁও বুঝিয়া দু'একজন দোকানদার বেশ ঠকাইয়াও লইল। ডবল-উইকের একটা পিতলের টেবিলল্যাম্প পছন্দ হওয়াতে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল,—এটার দাম কত? দোকানী বলিল,—সাড়ে তিন টাকা। অপুর বিশ্বাস এ-রকম আলোর দাম পনেরো ষোল টাকা। এরূপ মনে হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, অনেকদিন আগে লীলাদের বাড়ি থাকিবার সময় সে এই ধরণের আলো লীলার পড়িবার ঘরে টেবিলে জ্বলিতে দেখিয়াছিল। সে বেশী দর কষিতে ভরসা করিল না, চার আনা মাত্র কমাইয়া তিন টাকা চার আনা মূল্যে সেই মান্ধাতার আমলের টেবিল ল্যাম্পটা মহা খুশীর সহিত কিনিয়া ফেলিল! মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া সে সোৎসাহে ও সাগ্রহে সব বাসায় আনিয়া হাজির করিল ও সারাদিন খাটিয়া ঘরদোর ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ছবিগুলি দেওয়ালে টাঙাইল, সস্তা জাপানী পর্দাটা দরজায় ঝুলাইল, আয়নাটাকে গজাল আঁটিয়া বসাইল, ফুলদানির জন্য ফুল কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সেগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া আপাততঃ জানালার ধারে রাখিয়া দিল, দোয়াতদানটা তেঁতুল দিয়া মাজিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিল। বাহিরে অনেকদিনের একটা খালি প্যাকবাক্স পড়িয়াছিল সেটা ঝাড়িয়া মুছিয়া টেবিলে পরিণত করিয়া সন্ধ্যার পর টেবিল ল্যাম্পটা সেটার উপর রাখিয়া পড়িতে বসিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে ঘন ঘন ঘরের চারিদিকে খুশীর সহিত চাহিয়া দেখিতেছিল—ঠিক একেবারে যেন বড়লোকদের সাজানো ঘর। ছবি, পর্দা, ফুলদানি, টেবিল-ল্যাম্প সব!—এতদিন পয়সা ছিল না, হয় নাই। কিন্তু এইবার কেন সে মহিষের মত বিলের কাদায় লুটাইয়া পড়িয়া থাকিতে যাইবে?

বাহাদুরি করিবার ঝোঁকে পরদিন সে ক্লাসের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজের ঘরে খাওয়াইল—প্রণব, জানকী, সতীশ, অনিল এমন কি সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের সেই ভূতপূর্ব ছাত্র চালবাজ মন্মথকে পর্যন্ত।

মন্মথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হুররে!—আরে আমাদের অপূর্ব এসব করেছে

কি! কোথেকে বাজে রাবিশ এক পুরানো পর্দা জুটিয়েছে ছাখো। এত খাবার কে খাবে?

অপু নীচের কারখানার হেড মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহাদের বড লোহার চায়ের কেটলিটা ও একটা পলিতা-বসানো সেকেলে লোহার স্টোভ ধার করিয়া আনিয়া চা চড়াইয়াছে, একরাশ কমলালেবু, সিঙ্গাড়া কচুরী, পানতুয়া, কলা ও কাঁচা পাঁপর কিনিয়া আনিয়াছে—সবাই দেখিতে দেখিতে খাবার অর্ধেকের উপর কমাইয়া আনিল। কথায় কথায় অপু তাহাদের দেশের বাড়ির কথা তুলিল—মস্তদোতলা বাড়ি নদীর ধারে, এখনও পূজার দালানটা দেখিলে তাক্ লাগে, দেশে এখনও খুব নাম—দেনার দায়ে মস্ত জমিদারী হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই আজ এ অবস্থা—নহিলে ইত্যাদি।

প্রণব চা পরিবেশন করিতে গিয়া খানিকটা জানকীর পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ঘরসুদ্ধ সবাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সতীশ আসিয়াই সটান্ শুইয়া পড়িয়াছিল অপুর বিছানায়, বলিল,—ওহে তোমরা কেউ আমার গালে একটা পানতুয়া ফেলে দাও তো!—হাঁ ক'রে আছি—

সতীশ বলিল, হাঁ হে—ভাল কথা মনে পড়েছে! তোমার সেই জানালা কাব্যের নায়িকা কোন্ দিকে থাকেন? এই জানালাটি নাকি?···

অনিল বাদে আর সকলেই হাসি ও কলরবের সঙ্গে সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে গেল—অপু লজ্জামিশ্রিত সুরে বলিল—না না ভাই, ওদিকে যেও না—সে কিছু না, সব বানানো কথা আমার—ওসব কিছু না—

মেয়েটি পাগল এই ধারণা হওয়া পর্যন্ত তাহার কথা মনে উঠিলেই অপুর মন করুণার্দ্র হইয়া ওঠে। তাহাকে লইয়া এই হাসি-ঠাট্টা তাহার মনে বড় বিঁধিল। কথার সুর ফিরাইবার জন্য সে নতুন-কেনা পর্দাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরে হঠাৎ মনে পড়াতে সে সেই ঝুটা পাথরের আংটিটা বাহির করিয়া খুশীর সহিত বলিল,—এটা ছাখো তো কেমন হয়েছে? কত দাম হবে? মন্মথ দেখিয়া বলিল—এ কোথাকার একটা বাজে পাথর বসানো আংটি, কেমিকেল সোনার, এর আবার দামটা কি···দূর!

অনিলের এ কথাটা ভাল লাগিল না। মন্মথ ইতিপূর্বে অপুর পর্দাটা দেখিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে, ইহাও তাহার ভাল লাগে নাই। সে বলিল—তুমি তো জহুরী নও, সব তাতেই চাল দিতে আস কেন? চেনো এ পাথর?

—জহুরী হবার দরকারটা কি শুনি—এটা কি এমারেল্ড, না হীরে, না—

শুধু এমারেল্ড আর হীরের নাম শুনে রেখেছ বৈ ত নয়? এটা কর্নেলিয়ান—চেনো কর্নেলিয়ান্? অভ্রের খনিতে পাওয়া যায়, আমাদের ছিল, আমি

খুব ভাল জানি।

অনিল খুব ভালোই জানে অপুর আংটির পাথরটা কর্নেলিয়ান্ নয়, কিছুই নয়—শুধু মন্মথর কথার প্রতিবাদ করিয়া মন্মথর চালিয়াতি কথাবার্তায় অপুর মনে কোনও ঘা না লাগে সেই চেষ্টায় কর্নেলিয়ান্ ও টোপাজ পাথরের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল। তার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে মন্মথ সাহস কবিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না।

তাহার পর প্রণব একটা গান ধরাতে উভয়ের তর্ক থামিয়া গেল। আরও অনেকক্ষণ ধবিয়া হাসিখুশী, কথাবার্তা ও আরও বার-দুই চা খাইবার পর অন্য সকলে বিদায় লইল কেবল অনিল থাকিয়া গেল, অপুও তাহাকে থাকিতে অনুবোধ করিল।

সকলে চলিয়া যাইবার কিছু পবে অনিল ভৎ‍র্সনার সুরে বলিল—আচ্ছা, এসব আপনাব কি কাণ্ড? (সে এতদিনেব আলাপে এখনও অপুকে 'তুমি' বলে না) কেন এসব কিনেছেন মিছে পয়সা খরচ ক'রে?

অপু হাসিয়া বলিল,—কেন তাতে কি? এসব তো—ভাল থাকতে কি ইচ্ছে যায় না?

—খেতে পান না এদিকে. আর মিথ্যে এই সব—সে যাক্, এই দামে পুবানো বইয়েব দোকানের সে গিবনেব সেটটা যে হয়ে যেতো। আপনার মত লোকও যদি এই ভুয়ো মালের পেছনে পয়সা খরচ করেন তবে অন্য ছেলের কথা কি? একটা পুরানো দূরবীন যে এই দামে হয়ে যেতো। আমার সন্ধানে একটা আছে ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের এক জায়গায়—একটা সাহেবের ছিল—স্যাটার্নের রিং চমৎকার দেখা যায়—কম টাকায় হ'ত, মেম বিক্রী ক'রে ফেল্‌ছে অভাবে—আপনি কিছু দিতেন, আমি কিছু দিতাম. দু'জনে কিনে বাখলে ঢেব বেশী বুদ্ধির কাজ হ'ত—

অপু অপ্রতিভের হাসি হাসিল। দূরবীনের উপর তাহার লোভ আছে অনেকদিন হইতে। এতক্ষণে তাহার মনে হইল—এ টাকার ইহা অপেক্ষাও সস্তায় হইতে পারিত বটে। কিন্তু সে যে ভাল থাকিতে চায়, ভাল ঘরে সুদৃশ্য সুরুচিসম্মত আসবাবপত্র রাখিতে চায়—সেটাও তো তার কাছে বড় সত্য—তাহাকেই বা সে মনে মনে অস্বীকার করে কি করিয়া?

অনিল আর কিছু বলিল না। পুরানো বাজারের এ-সব সস্তা খেলো মালকে তাহার বন্ধু যে এত খুশীর সহিত ঘরে আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে, ইহাতেই সে মনে মনে চটিয়াছিল—শুধু অপুর মনে আর বেশী আঘাত দিতে ইচ্ছা না থাকায় সে বিরক্তি চাপিয়া গেল।

অপু বলিল—হুল্লোড়ে প'ড়ে তোমার খাওয়া হ'ল না অনিল, আর খানকতক কাঁচা পাঁপর ভাজবো ?

অনিল আর খাইতে চাহিল না। অপু বলিল—তবে চলো, কোথাও বেরুই —গড়ের মাঠে কি গঙ্গার ধারে।

অনিলও তাই চায়, বলিল, দেখুন অপূর্ববাবু, উনিশ কুড়ি একুশ বছর থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সের লোক, পর্যন্ত কি রকম গলির মধ্যে বাড়ির সামনেকার ছোট্ট রোয়াকটুকুতে বসে আড্ডা দিচ্ছে—এমন চমৎকার বিকেল, কোথাও বেরুনো নেই, শরীরের বা মনের কোনও অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই, আসনপিঁড়ি হয়ে সব ষষ্ঠি বুড়ি সেজে ঘরের কোণের কথা, পাড়ার গুজব, কি দরে কে ওবেলা বাজারে ইলিশ মাছ কিনেছে সেই সব—ওঃ হাউ আই হেট দেম। আপনি জানেন না, এই সব র‍্যাঙ্ক স্টুপিডিটি দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে—বরদাস্ত করতে পারিনে মোটে—গা যেন কেমন—

—কিন্তু ভাই, তোমার গড়ের মাঠে আমার মন ভোলে না—মোটরের শব্দ, মোটর বাইকের ফট্ ফট্ আওয়াজ, পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি —নামেই ভাই মাঠ, গঙ্গার কথা আর না-ই বা তুললাম !

—কাল আপনাকে নিয়ে যাব এক যায়গায় ! বুঝতে পারবেন একটা জিনিস—একটা ছেলে—আমার এক বন্ধুর বন্ধু—ছেলেটা সাউথ আফ্রিকায় মানুষ হয়েছে, সেইখানেই জন্ম—সেখান থেকে তার বাবা তাদের নিয়ে চলে এসেছে কলকাতায়, ফিয়ার্স লেনে থাকে। তার মুখের কথা শুনে এমন আনন্দ হয়। এমন মন ! এখানে থেকে মরে যাচ্ছে—শুনবেন তার মুখে সেখানকার জীবনের বর্ণনা—হিংসে হয়, সত্যি !

অপু এখনি যাইতে চায়। অনিল বলিল, আজ থাক, কাল ঠিক যাব দু'জনে দেখুন অপূর্ববাবু, কিছু যেন মনে করবেন না, আপনাকে তখন কি সব বললাম ব'লে। আপনারা কি জন্যে তৈরী হচ্ছেন জানেন ? ওসব চিপ ফাইনারীর খদ্দের আপনারা কেন হবেন ? দেখুন, এ পুরুষ তো কেটে গেল, এ সময়ের কবি, বৈজ্ঞানিক, দাতা, লেখক, ডাক্তার, দেশসেবক—এঁরা তো কিছুদিন পরে সব ফৌত হবেন, তাঁদের হাত থেকে কাজ তুলে নিতে হবে কাদের, না, যারা এখন উঠছে। একদল তো চাই এই জেনারেশনের হাত থেকে সেই সব কাজ নেবার ? সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, আর্টে, দেশসেবায়, গানে—সব কিছুতে, নতুন দল যারা উঠছে, বিশেষ ক'রে যাদের মধ্যে গিফ্‌ট্ আছে, তাদের কি হুল্লোড় ক'রে কাটাবার সময় ?

অপু মুখে হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভারী খুশী

হইল—কথার মধ্যে তাহারও যে দিবার কিছু আছে বা থাকিতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করা হইতেছে বুঝিয়া।

পরে দু'জনে বেড়াইতে বাহির হইল।

ছাত্রীকে পড়াইতে যাইবার সময় অপুর গায়ে যেন জ্বর আসে, ছুটি-ছাটার দিনটা না যাইতে হইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। অদ্ভুত মেয়ে! এমন কারণে-অকারণে প্রভুত্ব জাহির করিবার চেষ্টা, এমন তাচ্ছিল্যের ভাব—এই রকম সে একমাত্র অতসীদি'তে দেখিয়াছে।

একদিন সে ছাত্রীর একটা রূপা-বাঁধানো পেন্সিল হারাইয়া ফেলিল। পকেটে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোথায় ফেলিয়াছে, তারপর আর কিছু খেয়াল ছিল না, পরদিন প্রীতি সেটা চাহিতেই তাহার তো চক্ষুস্থির! সঙ্কুচিতভাবে বলিল—কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম—কাল বরং একটা কিনে—

প্রীতি অপ্রসন্ন মুখে বলিল, ওটা আমার দাদুমণির দেওয়া বার্থ-ডে গিফ্‌ট ছিল—

ইহার পর আর কিনিয়া আনার প্রস্তাবটা উত্থাপিত করা যায় না, মনে মনে ভাবিল, কাল থেকে ছেড়ে দেবো।—এখানে আর চলবে না।

কি একটা ছুটির পরদিন সে পড়াইতে গিয়াছে, প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল, কাল যে আসেন নি?

অপু বলিল, কাল ছিল ছুটির দিনটা—তাই আর আসিনি।

প্রীতি ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল—কেন, কাল তো আমাদের সরকার, বাইরের দু'জন চাকর, ড্রাইভার সব এসেছিল? আমার পড়াশুনো কিছু হ'ল না, আজ ডিটেন ক'রে রাখলে পাঁচটা অবধি।

অপুর হঠাৎ বড় রাগ হইল, দুঃখও হইল! খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমাদের সরকার কি রাঁধুনীঠাকুর তো নই, প্রীতি! কাল স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, এজন্য ভাবলাম আজ যাব না। আমার যদি ভুলই হয়ে থাকে—তোমার সেই রকম মাস্টার রেখো যিনি এখানে বাজার-সরকারের মত থাকবেন। আমি কাল থেকে আর আসব না বলে যাচ্ছি।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া মনে হইল—দেওয়ানপুরের নির্মলাদের কথা। তাহারাও তো অবস্থাপন্ন, তাহাদের বাড়িতেও সে প্রাইভেট মাস্টার ছিল

কিন্তু সেখানে সে ছিল বাড়ির ছেলের মত—নির্মলার মা দেখিতেন ছেলের চোখে, নির্মলা দেখিত ভাইয়ের চোখে—সে স্নেহ কি পথেঘাটে সুলভ? নির্মলার মত মমতাময়ীকে তখন সে চিনিয়াও চেনে নাই, আজ নতুন করিয়া তাহাকে আর চিনিয়া লাভ কি? আর লীলা? সে কথা ভাবিতেই বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—যাক্ সে সব কথা।

হাতের টাকায় কিছুদিন চলিল। ইতিমধ্যে কলেজে একটা বড ঘটনা হইয়া গেল, প্রণব লেখাপড়া ছাড়িয়া কি নাকি দেশের কাজ করিতে চলিয়া গেল। সকলে বলিল, সে এনার্কিস্ট দলে যোগ দিয়াছে।

প্রণব চলিয়া যাওয়ার মাসখানেক পর একদিন অপু হোটেলে খাইতে গিয়া দেখিল, সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার মুখ ভার ভার। দু'তিন মাসের টাকা বাকী, পাওনাদার আর কতদিন শোনে! আজ সে স্পষ্ট জানাইল, দেনা শোধ না করিলে আর খাইতে পাইবে না। বলিল বাবু, অন্য খদ্দের হলে মাসের পয়লাটি খেতে দিই নে—ওই কুণ্টোবাবু খায়, ওদের পাটের কলের হপ্তাটি পেলে দিয়ে দেয়···তুমি বলে আমি কিছু বলছি না—দু'মাসের ওপর আজ নিয়ে সাত দিন। যাক্ আর পারবো না, আপুনি আর আসবেন না—আমার ভাত একজন ভদ্দরলোকের ছেলে খেয়েছে ভাববো, আর কি করব?

কথাগুলি খুব ন্যায্য এবং আদৌ অসঙ্গত নয়, কিন্তু খাইতে গিয়া এরূপ রূঢ় প্রত্যাখানে অপুর চোখে জল আসিল। তাহার তো একদিনও ইচ্ছা ছিল না যে, ঠাকুরকে সে ফাঁকি দিবে, কিন্তু সেই প্রীতির টিউশনিটা ছাড়িয়া দেওয়ার পর আজ দু তিনমাস একেবারে নিরুপায় অবস্থায় ঘুরিতেছে যে!

বিপদের উপর বিপদ। দিন-দুই পরে কলেজে গিয়া দেখিল নোটিশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়াছে, যাহাদের মাহিনা বাকী আছে, এক সপ্তাহের মধ্যে শোধ না করিলে কাহাকেও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। অপু চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রায় গোটা এক বৎসরের মাহিনাই যে তাহার বাকী!—মাত্র মাস ছয়েক মাহিনা দেওয়া আছে—সেই প্রথম দিকে একবার, আর প্রীতির টিউশনির টাকা হইতে একবার—তাহার পর হইতে খাওয়াই জোটে না তো কলেজের মাহিনা। দশ মাসের বেতন ছ'টাকা হিসাবে ষাট টাকা বাকী। কোন দিক হইতে একটা কলঙ্কধরা নিকেলের সিকিও আসিবার সুবিধাও নাই যাহার, ষাট টাকা সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোথা হইতে যোগাড় করিবে? হয়ত তাহাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, গ্রীষ্মের ছুটির পর সেকেণ্ড ইয়ারে উঠিতে দিবে না, সারা বছরের কষ্ট ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ নিরর্থক হইয়া যাইবে।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সে হাত-খরচের পয়সা

হইতে চাউল ও আলু কিনিয়া আনিয়া থাকিবার ঘরের সামনে বারান্দাতে রান্নার যোগাড় করিল। হোটেলে খাওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে আজ কয়দিন নিজে রাঁধিয়া খাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছে ইহাতে খুব সস্তায় হয়, কাঠ কিনিতে হয় না। নিচের কারখানার ছুতার মিস্ত্রীদের ঘর হইতে কাঠের চোঁচ ও টুক্‌রা কুড়াইয়া আনে, পাঁচ-ছয় পয়সায় খাওয়া দাওয়া হয়। আলুভাতে ডিমভাতে আর ভাত। ভাত চড়াইয়া ডাক দিল—ও বহু—বহু·· নিয়ে এসো, আমার হয়ে গেল বলে—ছোট কাঁসিটাও এনো।

কারখানার দারোয়ান শম্ভু দত্ত তেওয়ারীর বৌ একখানা বড় পিতলের থালা ও কাঁসি লইয়া উপরে আসিল—এক লোটা জল ও গোটাকতক কাঁচা লঙ্কাও আনিল।

থালা বাসন নাই বলিয়া সে-ই দুই বেলা থালা আনিয়া দেয়। হাসিমুখে বলিল,—মছ্‌লিকা তরকারী হম্ নেহি ছুঁয়ে গা বাবুজি—

—কোথায় তোমার মছ্‌লি?—ও শুধু আলু—একটু হলুদবাটা এনে দাও না বহু। রোজ রোজ আলুভাতে ভালো লাগে না—

বহুকে ভাল বলিতে হইবে, রোজ উচ্ছিষ্ট থালা নামাইয়া লইয়া যায়, নিজে মাজিয়া লয়—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ যাহা কখনও করে না—অপু বাধা দিয়াছিল, বহু বলে, তুম তো হামারে লেড়কাকে বরাবর হোগে বাবুজী—ইস্‌মে ক্যা হ্যায়—

দিনকতক পর মায়ের একটা চিঠি আসিল, হঠাৎ পিছলাইয়া পড়িয়া সর্বজয়ার পায়ে বড় লাগিয়াছে, পয়সার কষ্ট যাইতেছে। মায়ের অভাবের খবর পাইলে অপু বড় ব্যস্ত হইয়া ওঠে, মায়ের নানা কাল্পনিক দুঃখের চিন্তায় তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে, হয়ত আজ পয়সার অভাবে মায়ের খাওয়া হইল না, হয়ত কেহ দেখিতেছে না, মা আজ দু'দিন উপবাস করিয়া আছে, এই সব নানা ভাবনা আসিয়া জোটে, নিজের আলুভাতে ভাতও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

এদিকে আর এক গোলমাল—কারখানার ম্যানেজার ইতিপূর্বে তাহাকে বার দুই ডাকাইয়া বলিয়াছেন, উপরে সে যে ঘরে আছে তার সমস্তটাই ঔষধের গুদাম করা হইবে—সে যেন অন্যত্র বাসা দেখিয়া লয়—বলিয়াছেন আজ মাস তিনেক আগে, তাহার পর আর কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই—অপুও থাকিবার স্থানের জন্য কোথাও কি ভাবে কাহার কাছে গিয়া চেষ্টা করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ নিশ্চেষ্টই ছিল এবং নিশ্চিন্ত ভাবে দিন যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল, ও-কথা হয়ত আর উঠিবে না—কিন্তু এইবার যেন সময় পাইয়াই ম্যানেজার বেশী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অপু এত সাধ করিয়া কেনা শখের আসবাবগুলি বেচিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে গেল প্লেটগুলি—তাও কেহই কিনিতে চায় না—অবশেষে চোদ্দ আনায় এক পুরানো দোকানদারের কাছে বেচিয়া দিল। সেই দোকানদারই ফুলদানিটা আট আনায় কিনিল, দু'খানা ছবি দশ আনায়। তবু শেষ পর্যন্ত সে স্যাণ্ডোর ডাম্বেলটা ও জাপানী পদাটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল।

সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল—ছাতু জিনিসটার অসীম গুণ—সস্তার দিক হইতে বটে, অল্প খরচে পেট ভরাইবার দিক হইতেও বটে। আগে আগে চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহার মা নতুন যবের ছাতু কুটিয়া তাহাদের খাইতে দিতেন—তখন ছাতু ছিল বৎসরের মধ্যে একবার পাল-পার্বণে শখ করিয়া খাইবার জিনিস, তাহাই এখন হইয়া পড়িল প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। আগে একটু আধটু গুড়ে তাহার ছাতু খাওয়া হইত না, গুড় আরও বেশী করিয়া দিবার জন্য মাকে কত বিরক্ত করিয়াছে, এখন খরচ বাঁচাইবার জন্য শুধু নুন ও তেওয়ারীবহুর নিকট হইতে কাঁচা লঙ্কা আনাইয়া তাই দিয়া খায়। অভ্যাস নাই, খাইতে ভাল লাগে না।

কিন্তু ছাতু খুব সুস্বাদু না হউক, তাহাও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। অপু বুঝিতেছিল—টানাটানি করিয়া আর বড়-জোর দিনদশেক—তারপর কূলকিনারা হীন অজানা মহাসমুদ্র!...তখন কি উপায়?

সে রোজ সকালে উঠিয়া নিকটবর্তী এক লাইব্রেরীতে গিয়া দৈনিক ইংরেজী বাংলা কাগজে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া দেখে। গ্যাসপোস্টের গায়েও অনেক সময় এই ধরণের বিজ্ঞাপন মারা থাকে—চলিতে চলিতে গ্যাস পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়ানো তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইল! প্রায়ই বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন।—আলো ও হাওয়াযুক্ত ভদ্রপরিবারের থাকিবার উপযোগী দুইখানি কামরা ও রান্নাঘর, ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালেভদ্রে এক আধটা ছেলে-পড়াবার বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, তার ঠিকানাটা আগে কেহ ছিঁড়িয়া দিয়াছে। কাপড় ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারীর স্ত্রী একদিন সোডা সাবান দিয়া নিজেদের কাপড় সিদ্ধ করিতে বসিয়াছে, অপু নিজের ময়লা শার্ট ও ধুতিখানা লইয়া গিয়া বলিল, বহু, তোমার সাবাদের বোল একটু দেবে, আমি এ দুটোয় মাখিয়ে রেখে দি—তারপর ওবেলা কলেজ থেকে এসে কলে জল এলে কেচে নেবো—দেবে?...

তেওয়ারী বধূ বলিল, দে দিজিয়ে না বাবুজী, হাম্ হাড়ি মে ডাল দেগা।

অপু ভাবে—আহা, বছ কি ভালো লোক! যদি কখনও পয়সা হয় ওর উপকার করবো—

এক একবার তাহার মনে হয়, যদি কিছু না জোটে, তবে এবার হয়ত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মনসাপোতা ফিরিতে হইবে—কিন্তু সেখানেও আর চলিবার কোনও উপায় নাই, তেলি ও কুণ্ডুরা পূজার জন্য অন্যস্থান হইতে পূজারী-বামুন আনাইয়া জায়গা-জমি দিয়া বাস করাইয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল মায়ের পত্রে সে-খবর জানিয়াছে, এখন তাহার মাকেও আর তেলিরা সাহায্য করে না, দেখে-শোনে না। মায়ের একাই চলে না—তার মধ্যে সে আবার কোথায় গিয়া জুটিবে?—তাহা ছাড়া পড়াশুনা ছাড়া? অসম্ভব!

সে নিজে বেশ বুঝিতে পারে, এই এক বৎসরে তাহার মনের প্রসারতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, এমন একটা নতুনভাবে সে জগৎটাকে জীবনটাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—যা' কিনা দশ বৎসর মনসাপোতা কি দেওয়ানপুরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সে এটুকু বেশ বোঝে, কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনও প্রফেসারের বক্তৃতাতেও না—যাহা কিছু হইয়াছে, এই বড় আলমারীভরা লাইব্রেরীটার কাছে সে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ।

যতক্ষণ সে লাইব্রেরীতে থাকে, ততক্ষণ তাহার খাওয়া-দাওয়ার কথা তত মনে থাকে না। এই সময়টা একটা খেয়ালের ঘোরে কাটে। খেয়ালমত এক একটা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে মনে, তাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বিকারের রোগীর মত অদম্য পিপাসায় সে সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায় হাতের কাছে—পড়িতে চেষ্টা করে। কখনও খেয়াল—নক্ষত্র জগৎ···কখনও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত একটা নিবিড় পরিচয়ের ইচ্ছা—কখনও কীট্‌স্, কখনও হল্যাণ্ড রোজের নেপোলিয়ন। কোন খেয়াল থাকে দু'দিন, কোনোটা আবার একমাস! তার কল্পনা সব সময়ই বড় একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে চায়—বড় ছবি, জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, চাঁদের দেশের পাহাড়শ্রেণী, বর্তমান মহাযুদ্ধ, কোন বড়-লোকের জীবনী।

কারখানায় ম্যানেজার আর একদিন তাগিদ দিলেন। খুব সুখের বাসা ছিল না বটে, কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? হাতে কিছু না থাকায় সে এবার পর্দাটা একদিন বেচিতে লইয়া গেল। এটা তাহার বড় শখের জিনিস ছিল। পর্দাটাতে একটা জাপানী ছবি আঁকা—ফুলে ভরা চেরী গাছ, একটু জলরেখা, মাঝ-জলে বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে, ওপারে ঢেউখেলানো কাঠের ছাদওয়ালা একটা দেবমন্দির, দূরে ফুজিসানের তুষারাবৃত শিখর একটু একটু নজরে পড়ে। এই ছবিখানার জন্যই সে পর্দাটা কিনিয়াছিল, এইজন্যই

এত দিন হাতছাড়া করিতে পারে নাই—কিন্তু উপায় কি? সাড়ে তিন টাকা দিয়া কেনা ছিল, বহু দোকান ঘুরিয়া তাহার দাম হইল এক টাকা তিন আনা।

পর্দা বেচিয়া অনেকদিন পর সে ভাত রাঁধিবার ব্যবস্থা করিল। ছাতু খাইয়া খাইয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, বাজার হইতে এক পয়সার কলমী শাকও কিনিয়া আনিল। মনে পড়িল সে কলমী শাক ভাজা খাইতে ভালবাসিত বলিয়া ছেলেবেলায় দিদি যখন-তখন গড়ের কুর হইতে কত কলমী তুলিয়া আনিত। দিন সাতেক পর্দা-বেচা পয়সায় চলিল মন্দ নয়, তারপরই যে-কে সেই! আর পর্দা নাই, কিছুই নাই, একেবারে কানাকড়িটা হাতে নাই।

কলেজ যাইতে হইল না-খাইয়া। বৈকালে কলেজ হইতে বাহির হইয়া সত্যই মাথা ঘুরিতে লাগিল, পরে সেই মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা, পা নড়িতে না চাওয়া। মুশকিল এই যে, ক্লাসে মিথ্যা গর্ব ও বাহাদুরির ফলে সকলেই জানে, সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, কাহারও কাছে বলিবার মুখও তো নাই। দু'-একজন যাহারা জানে যেমন জানকী—তাহাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ।

সারাদিন না খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়াই শুইয়া পড়িল। রাত আটটার পরে আর না থাকিতে পারিয়া তেওয়ারী-বধূকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল —ছোলা কি অড়হরের ডাল আছে, বহু? আজ আর খিদে নেই তেমন, রাঁধবো না আর, ভিজিয়ে খেতাম।

সকালে উঠিয়াই প্রথমে তাহার মনে আসিল যে, আজ সে একেবারে কপর্দকশূন্য। আজও কালকার মত না খাইয়া কলেজে যাইতে হইবে। কতদিন এভাবে চালাইবে সে? না খাইয়া থাকার কষ্ট ভয়ানক—কাল লজিকের ঘণ্টার শেষে সেটা সে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল—বিকালের দিকে ক্ষুধাটা পড়িয়া যাওয়াতে তত কষ্ট বোঝা যায় নাই—কিন্তু সেই বেলা দুটোর সময়টা!…পেটে ঠিক যেন বোলতার ঝাঁক হুল ফুটাইতেছে—বার দুই জল খাইবার ঘরে গিয়া গ্লাস-কতক জল খাইয়া কাল যন্ত্রণাটা অনেকখানি নিবারণ হইয়াছিল। আজ আবার সেই কষ্ট সম্মুখে!

হাতমুখ ধুইয়া বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্যন্ত সে আবার নানা গ্যাস-পোস্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইল, তাহার পর বাসায় না ফিরিয়া সোজা কলেজে গেল। অন্য কেহ কিছু লক্ষ্য না করিলেও অনিল দু'তিনবার জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছে? মুখ শুকনো কেন? অপু অন্য কথা পাড়িয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বই লইয়া আজ সে কলেজে আসে নাই, খালি হাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল, মা আজ দিন-বারো আগে টাকা চাহিয়া পত্র পাঠাইয়াছিলেন—টাকাও দেওয়া হয় নাই, পত্রের জবাবও না।

কথাটা ভাবিতেই সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল—না-খাওয়ার কষ্ট সে ভাল বুঝিয়াছে—মায়েরও হয়ত বা এতদিন না খাওয়া শুরু হইয়াছে, কে জানে? তাহা ছাড়া মায়ের স্বভাবও সে ভাল বোঝে, নিজের কষ্টের বেলা মা কাহাকেও বলিবে না বা জানাইবে না, মুখ বুজিয়া সমুদ্র গিলিবে।

অপু অস্থির হইয়া পড়িল। এখন কি করে সে! জ্যাঠাইমাদের বাড়ি গিয়া সব খুলিয়া বলিবে?—গোটাকতক টাকা যদি এখন ধার পাওয়া যায় সেখানে, মাকে তো আপাততঃ পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে এখন।—কিন্তু খানিকটা ভাবিয়া দেখিল, সেখানে গিয়া সে টাকার কথা তুলিতেই পারিবে না—জ্যাঠাইমাকে সে মনে মনে ভয় করে। অখিলবাবু? সামান্য মাহিনা পায়, সেখানে গিয়া টাকা চাহিতে বাধে। তাহার এক সহপাঠীর কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, খুব বেশী আলাপ নাই, কিন্তু শুনিয়াছে বড়লোকের ছেলে—একবার যাইয়া দেখিবে কি? ছেলেটির বাড়ি বৌবাজারের একটা গলিতে, কলকাতার বনেদি ঘর, বড় তেতলা বাড়ি, পূজার দালান, সামনে বড় বড় সেকেলে ধরণের থাম, কার্নিসে একঝাঁক পায়রার বাসা; বাহিরের ফ্লোরের খোপটা একজন হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা ভাড়া লইয়া ছাতুর দোকান খুলিয়াছে। একটু পরেই অপুর সহপাঠী ছেলেটি বাহিরে আসিয়া বলিল—কৈ, কে ডাকছে -ও—তুমি?—রোল টুএল্‌ভ; এক্সকিউজ মি—তোমার নামটা জানি নে ভাই—sorry—এস, এস, ভেতরে এস।

খানিকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব হইল। খানিকক্ষণ গল্প করিতে করিতে অপু বুঝিল, এখানে টাকার কথা তোলাটা তাহার পক্ষে কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার।—অসম্ভব—তাহা কি কখনও হয়? কি বলিয়া টাকা ধার চাহিবে সে এখানে? এই আমাকে এই—গোটাকতক টাকা ধার দিতে পার ক'দিনের জন্যে? কথাটা কি বিশ্রী শোনাইবে! ভাবিতেও যেন লজ্জা ও সঙ্কোচে তাহার মুখ ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটি বলিল—বা রে এখুনি উঠবে কি?—না না, বোসো, চা খাও—দাঁড়াও, আমি আসছি—

ঘিয়ে ভাজা চিঁড়ে নিমকি, পেঁপে-কাটা, সন্দেশ ও চা। অপু ক্ষুধার মুখে লোভীর মত সেগুলি ব্যগ্রভাবে গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা কয়েক চুমুক খাইতে শরীরের ঝিম্ ঝিম্ ভাবটা কাটিয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরিয়া আসিল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে টাকা ধার চাওয়াটা যে কতদূর অসম্ভব সেটাও বুঝিল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিল—ভাগ্যিস্—হাউ য়্যাব্‌সার্ড। তা কি কখনও আমি—দূর!

রাত্রিতে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল, আগামীকাল নববর্ষের প্রথম দিন! কাল কলেজের ছুটি আছে। কাল একবার শ্যামবাজারে জ্যাঠাই-মাদের বাড়িতে যাইবে, নববর্ষের দিনটা জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিয়া আসাও হইবে—সেটাও একটা কর্তব্য, তাহা ছাড়া—

মনে মনে ভাবিল—কাল গেলে জেঠিমা কি আর না খাইয়ে ছেড়ে দেবে? বছরকাবের দিনটা—সেদিন সুরেশদা তো আর বাড়ির মধ্যে বলে নি—বললে কি আর খেতে বলত না? সুরেশদা ওই রকম ভুলো মানুষ!—

ভুল কাহার, পরদিন অপুর বুঝিতে দেরি হইল না। সকালে ন'টার সময় সুরেশদেব বাড়ি গিয়া প্রথমে কাহাকেও পাইল না। বলা না, কওয়া না, হুপ্ করিয়া কি বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া যাইবে? কি সমাচার, না নববর্ষের দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছি—ছুতাটা যে বড়ই দুর্বল! সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে খানিকক্ষণ পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একেবারে জ্যাঠাইমাকে পাইল দরজার সামনের রোয়াকে। প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল, জ্যাঠাই-মার মুখে যে বিশেষ প্রীতি বিকশিত হইল না, তাহা অপু ছাড়া যে-কেহ বুঝিতে পারিত। তাহার সংবাদ লইবার জন্য তিনি বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, সে-ই নিজের সঙ্কোচ ঢাকিবার জন্য অতসীদি কবে শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, সুনীল বুঝি কোথায় বাহির হইয়াছে প্রভৃতি ধরণের মামুলি প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর জ্যাঠাইমা কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ বাড়ি নাই, সে দালানের একটি বেঞ্চিতে বসিয়া একখানা এল্, রায়ের ক্যাটালগ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ভান করিল। বইখানার মধ্যে একখানা বিবাহের প্রীতি-উপহার, হাতে লইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল—সেখানে সুরেশের বিবাহের। সে দুঃখিতও হইল, আশ্চর্যও হইল, মাত্র মাসখানেক আগে বিবাহ হইয়াছে, সুরেশদা তাহার ঠিকানা জানে, সবই জানে, অথচ কি জ্যাঠাইমা, কি সুরেশদা, কেহই তাহাকে জানায় নাই।

'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সে জ্যাঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল; জ্যাঠাইমা নির্লিপ্ত, অন্যমনস্ক সুরে বলিল—আচ্ছা তা' এসো—থাক্ থাক্—আচ্ছা।

ফুটপাতে নামিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল—সুরেশদার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ফাল্গুন মাসে, একবার বললেও না!—অথচ আমাদের আপনার লোক—আজ দ্যাখো না নববর্ষের দিনটা খেতেও বললে না—

খানিকদূর আসিতে আসিতে তাহার কেমন হাসিও পাইল। আচ্ছা বদ্ধি

বলতাম, জ্যেঠিমা আমি এখানে এবেলা খাবো তাহলে—হি-হি—তাহলে কি হতো!

বাসার কাছে পথে সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা। দু-দু'বার নাকি সে অপুর বাসায় গিয়াছে, পায় নাই, আজ পয়লা বৈশাখ, হোটেলের নতুন খাতা—টাকা দেওয়া চাই-ই। সুন্দর-ঠাকুর চিৎকারের সুরে বলিল—ভাতের তো এক পয়সা দিলে না—আবার লুচি খেলে বাবু ন'দিন—সাত আনা হিসাবে সাত নং তেষট্টি আনা—তিন টাকা পনেরো আনা—আজ তিন মাস ঘোরাচ্চেন আজ খাতা মহরৎ—না দিলে হবেই না বলে দিচ্ছি।

অপুর দোষ—লোভে পড়িয়া সে কোথা হইতে শোধ দিবে না ভাবিয়াই ধারে আট-নয় দিন লুচি খাইয়াছিল। সুন্দর-ঠাকুরের চড়া চড়া কথায় পথে লোক জুটিয়া গেল—পথে দাঁড়াইয়া অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সে কোথা হইতে দিবে বিন্দু-বিসর্গ না ভাবিয়াই বলিল, বৈকালে নিশ্চয়ই সব শোধ করিয়া দিবে।

বৈকালে একটা বিজ্ঞাপনে দেখিল কোন্ স্কুলে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা শিক্ষক দরকার, টাটকা মারিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও কেহ ছেঁড়ে নাই। খুঁজিয়া তখনই বাহির করিল, মেছুয়াবাজারের একটা গলির মধ্যে কাহাদের ভাড়া বাড়ির বাহিরের ঘরে স্কুল—আপার প্রাইমারী পাঠশালা। জনকতক বৃদ্ধ বসিয়া দাবা খেলিতেছেন, একজন তাহার মধ্যে নাকি স্কুলের হেডমাস্টার। অঙ্কের শিক্ষক—দশ টাকা মাহিনা—ইত্যাদি। বাজার যা তাতে ইহাই যথেষ্ট।

অপুর মন বেজায় দমিয়া গেল। এই অন্ধকার স্কুলঘরটা, দারিদ্র্য, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বৃদ্ধগণের মুখের একটা বুদ্ধিহীন সন্তোষের ভাব ও মনের স্থবিরত্ব, ইহাদের সাহচর্য হইতে তাহাকে দূরে হটাইয়া লইতে চাহিল। যাহা জীবনের বিরোধী, আনন্দের বিরোধী, সর্বোপরি—তাহার অস্থিমজ্জাগত যে রোমাঞ্চের তৃষ্ণা—তাহার বিরোধী, অপুও সেখানে একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারে না। ইহারা বৃদ্ধ বলিয়া যে এমন ভাব হইল অপুর, তাহা নয়, ইহাদের অপেক্ষাও বৃদ্ধ ছিলেন, শৈশবের সঙ্গী নরোত্তম দাস বাবাজী। কিন্তু সেখানে সদাসর্বদা একটা মুক্তির হাওয়া বহিত, কাশীর কথকঠাকুরকেও এইজন্যই ভাল লাগিয়াছিল। অসহায়, দরিদ্র বৃদ্ধ একটা আশাভরা আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মনে—যেদিন জিনিষপত্র বাঁধিয়া হাসিমুখে নতুন সংসার বাঁধিবার উৎসাহে রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া দেশে রওনা হইয়াছিলেন।

স্কুল হইতে যখন সে বাহির হইল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহার কেমন একটা ভয় হইল—এ ভয়টা এতদিন হয় নাই। না খাইয়া থাকিবার বাস্তবতা ইতিপূর্বে এভাবে কখনও নিজের জীবনে সে অনুভব করে নাই—বিশেষ করিয়া

যখন এখানে খাইতে-পাওয়া নির্ভর করিতেছে নিজের কিছু একটা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাফল্যের উপর। কিন্তু তাহার সকলের চেয়ে দুর্ভাবনা মায়ের জন্য। 'একটা পয়সা সে মাকে পাঠাইতে পারিল না, আজ এতদিন মা পত্র দিয়াছেন—কি করিয়া চলিতেছে মায়ের!···

কিন্তু এখানে তো কোনও কিছুই আশা দেখা যায় না—এত বড় কলিকাতা শহরে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহায় নাই, চেনাশোনা নাই, সে কোথায় যাইবে—কি করিবে?

পথে একটা মাড়োয়ারীর বাড়িতে বোধ হয় বিবাহ। সন্ধ্যার তখনও সামান্য বিলম্ব আছে, কিন্তু এরই মধ্যে সামনের লাল-নীল ইলেকট্রিক আলোর মালা জ্বালাইয়া দিয়াছে, দু'চারখানা মোটর ও জুড়ি গাড়ি আসিতে শুরু করিয়াছে। লুচি-ভাজার মন-মাতানো সুগন্ধে বাড়ির সামনেটা ভরপুর। হঠাৎ অপু দাঁড়াইয়া গেল। ভাবিল—যদি গিয়া বলি আমি একজন পুওর স্টুডেণ্ট—সারাদিন খাই নি—তবে খেতে দেবে না?—ঠিক দেবে—এত বড় লোকের বাড়ি, কত লোক তো খাবে—বলতে দোষ কি? কে-ই বা চিনবে আমায় এখানে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিল না। সে বেশ বুঝিল, মনে ষোল আনা ইচ্ছা থাকিলেও মুখ দিয়া একথা সে বলিতে পারিবে না কাহারও কাছে—লজ্জা করিবে! লজ্জা না করিলে সে যাইত। মুখচোরা হওয়ার অসুবিধা সে জীবনে পদে পদে দেখিয়া আসিতেছে।

কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাপোতা ফিরিবে। কথাটা সে ভাবিতে পারে না—প্রত্যেক রক্তবিন্দু বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহার জীবন-সন্ধানী মন তাহাকে বলিয়া দেয় এখানে জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা—সেখানে অন্ধকার, দৈন্য, নিভিয়া যাওয়া। কিন্তু উপায় কি তাহার হাতে? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। সব দিকেই গোলমাল। কলেজের মাহিনা না দিলে, আপাততঃ পরীক্ষা দিতে দিলেও, বেতন শোধ না করিলে প্রমোশন বন্ধ। থাকিবার স্থানের এই দশা, দু'বেলা ওষুধের কারখানার ম্যানেজার উঠিয়া যাইবার তাগিদ দেয়, আহার তথৈবচ, সুন্দর-ঠাকুরের দেনা, মায়ের কষ্ট—একেই তো সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির—কিসে কি সুবিধা হয় এমনিই বোঝে না—তাহাতে এই কয় দিনের ব্যাপার তাহাকে একেবারে দিশেহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বাসায় আসিয়া ছাদের উপর বসিল। একখানা খাপরা কুড়াইয়া আনিয়া ভাবিল—আচ্ছা, দেখি দিকি কোন্ পিঠটা পড়ে? পরে নিশ্চিন্দিপুরে বাল্যে দিদির কাছে যেমন শিখিয়াছিল, সেইভাবে চোখ বুজিয়া খাপ্‌রাটা ছুঁড়িয়া

ফেলিয়া দেখিল—একবার—দু'বার—কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার দিকটাই পড়ে। তৃতীয় বার ফেলিয়া দেখিতে তাহার সাহস হইল না।

বাল্যকাল হইতে নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষী দেবীর উপর তাহার অসীম শ্রদ্ধা। করুণাময়ী দেবীর কথা কত সে শুনিয়াছে, সে তো তাঁর গ্রামের ছেলে—কলিকাতায় কি তাঁর শক্তি খাটে না?

পরীক্ষা হইবার দিনকয়েক পরে একদিন অনিল তাহাকে জানাইল, সায়েন্স সেক্শনের মধ্যে সে গণিত ও বস্তু-বিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছে, প্রফেসরের বাড়ি গিয়া নম্বর জানিয়া আসিয়াছে। অপু শুনিয়া আন্তরিক সুখী হইল, অনিলকে সে ভারী ভালবাসে, সত্যিকার চরিত্রবান্ বুদ্ধিমান ও উদারমতি ছাত্র। অনিলের যে জিনিসটা তাহার ভাল লাগে না, সেটা তাহার অপরকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করিবার একটা দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন তুচ্ছ কাজে বা জিনিসে অপু তাহার আসক্তি দেখে নাই—কোনও ছোট কথা, কি সুবিধার কথা, কি বাজে খোসগল্প তাহার মুখে শোনে নাই।

অপু দেখিয়াছে সব সময় অনিলের মনে একটা চাঞ্চল্য, একটা অতৃপ্তি—তাহার অধীর মন মহাভারতের বকরূপী ধর্মরাজের মত সব সময়ই কাঁদিয়া বসিয়া আছে—কা চ বার্তা?

অপুর সহিত এই জন্যেই অনিলের মিলিয়াছিল ভাল। দুজনের আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি এক ধরণের। অপুর বাংলা ও ইংরেজী লেখা খুব ভাল, কবিতা-প্রবন্ধ, মায় একখানা উপন্যাস পর্যন্ত লিখিয়াছে। দু'তিনখানা বাঁধানো খাতা ভর্তি—লেখা এমন কিছু নয়, গল্পগুলি ছেলেমানুষি ধরণের উচ্ছ্বাসে ভরা, কবিতা রবিঠাকুরের নকল, উপন্যাসখানাতে—জলদস্যুর দল, প্রেম, আত্মদান কিছুই বাদ যায় নাই—কিন্তু এইগুলি পড়িয়াই অনিল সম্প্রতি অপুর আরও ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তাহের শেষে দুজনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইতে গেল। একটা ঝিলের ধারে ঘন সবুজ লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বসিয়া অনিল বন্ধুকে একটা সুসংবাদ দিল। বাগানে আসিয়া গাছের ছায়ায় এইভাবে বসিয়া বলিবে বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল। তাহার বাবার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভালবাসেন, বড়বনীর অভ্রের খনির তিনি ছিলেন একজন অংশীদার, তিনি গত পরীক্ষার ফলে অনিলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজের খরচে বিদেশে পাঠাইতে চাহিয়াছেন, আই, এস্‌সি-টা পাশ দিলেই সোজা বিলাত বা ফ্রান্স।

—কেম্‌ব্রিজে কি ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজিতে

পড়বো, রাদারফোর্ড আছেন, টম্‌সন্ আছেন—এঁদের সব দু'বেলা দেখতে পাওয়া একটা পুণ্য—যুদ্ধ থামলে জার্মানীতে যাব, মস্ত জাত—বিরাট ভাইটালিটি—গয়টে, অস্টওয়াল্‌ডের দেশ—ওখানে কি আর না যাব?

অনিল অপুর বিদেশে যাইবার টান জানে—বলিল, আপনাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবো। না-হয় দু'জনে আমেরিকায় চলে যাব—আমি সব ঠিক করব দেখবেন।

অনিলের প্রভাব যেমন অপুর জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপুর চরিত্রের পবিত্রতা, মনের ছেলেমানুষি ও ভাবগ্রাহিতা অনিলের কঠোর সমালোচনা ও অযথা আক্রমণ-প্রবৃত্তিকে অনেকটা সংযত করিয়া তুলিতেছিল। দূরের পিপাসা অপুর আরও অনেক বেশী, অনেক উদ্দাম—কলিকাতার ধোঁয়া-ভরা, সঙ্কীর্ণ, ভ্যাপ্‌সা-গন্ধ সিওয়ার্ড ডিচের ভিতর হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ যেন একটা উদার-প্রান্তর, জ্যোৎস্না-মাখা মুক্ত আকাশ, পাখিদের আনন্দভরা পক্ষ-সঙ্গীতের, একটা বন-প্রান্তের রহস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অপুর কথার সুরে, জীবন-পিপাসু নবীন চোখের দৃষ্টিতে, অন্ততঃ অনিলের তো মনে হয়।

কোন্ পথে যাওয়া হইবে সে কথা উঠিল। অপু উৎসাহে অনিলের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল—এসো একটা প্যাক্ট করি—দেখি হাত? এসো, আমরা কখ্‌খনো কেরানী'গিরি করব না, পয়সা পয়সা করব না কখ্‌খনো—সামান্য জিনিসে ভুলব না কখনও—ব্যাস্!···পরে মাটিতে একটা ঘুসি মারিয়া বলিল—খুব বড় কাজ কিছু একটা করব জীবনে।

অনিল সাধারণতঃ অপুর মত নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠে না, তবুও আজ উৎসাহের মুখে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল, বিলাতে পড়া শেষ করিয়া সে আমেরিকায় যাইবে, জাপান হইয়া দেশে ফিরিবে। বিদেশ হইতে ফিরিয়া সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াই থাকিবে।

অপু বলিল—যখন দেশে ছিলাম, তখন আমার একখানা 'প্রাকৃতিক ভূগোল' ব'লে ছেঁড়া, পুরনো বই ছিল—তাতে লেখা ছিল এমন সব নক্ষত্র আছে যাদের আলো আজও এসে পৃথিবীতে পৌঁছয় নি, সে-সব এত দূরে—মনে আছে, সন্ধ্যের সময় একটা নদীতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে নৌকার ওপর বসে সে কথা ভাবতাম, ওপারে একটা কদম গাছ ছিল, তার মাথাতে একটা তারা উঠত সকলের আগে, তারাটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—কি যে একটা ভাব হ'ত মনে! একটা mystery, একটা uplift-এর ভাব—ছেলে-মানুষ তখন সে-সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে দুঃখ হয়েছে, কি কোনও ছোট কাজে মন গিয়েছে, তখনই আকাশের নক্ষত্রদের দিকে চাইলেই

আবার ছেলেবেলার সেই uplift-এর ভাবটা, একটা joy বুঝলে? একটা অদ্ভুত transcendental joy—সে ভাই মুখে তোমাকে—

বেলা পড়িলে দু'জনে স্টীমারে কলিকাতায় ফিরিল।

পরদিন কলেজের কমন-রুমে অনেকক্ষণ আবার সেই কথা।

কলেজ হইতে উৎফুল্ল মনে বাহির হইয়া অনিল প্রথমে দোকানে এক কাপ চা খাইল, পরে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া একটুখানি ভাবিল, কালীঘাটে মাসীর বাড়ি যাওয়ার কথা আছে, এখন যাইবে কিনা। একখানা বই কিনিবার জন্য একবার কলেজ স্ট্রীটেও যাওয়া দরকার। কোথায় আগে যায়? অপূর্ব একমাত্র ছেলে, যার কথা তার সব সময় মনে হয়। যে কোনরূপে হউক অপূর্বকে সে নিশ্চয়ই বিদেশ দেখাইবে।

তলপেটে অনেকক্ষণ হইতে একটা কী বেদনা বোধ হইতেছিল, এইবার যেন একটু বাড়িয়াছে, হাঁটিয়া চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা আর না যাওয়াই ভাল। সম্মুখেই ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম, সে ভাবিল—পরেরটাতে যাব, বেজায় ভিড়, ততক্ষণ বরং চিঠিখানা ডাকে ফেলে আসি।

নিকটেই লাল রংয়ের গোল ডাকবাক্স ফুটপাথের ধারে, ডাকবাক্সটার গা ঘেঁষিয়া একজন মুসলমান ফেরিওয়ালা পাকা কাঁচকলা বিক্রী করিতেছে, তাহার বাজরায় পা না লাগে এই জন্য এক পায়ে ভর করিয়া অন্য পা-খানা একটু অস্বাভাবিক রকমে পিছনে বাঁকাভাবে পাতিয়া সে সবে চিঠিখানা ডাকবাক্সের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে—এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে যেন কে তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়া তাহার দেহটা এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিল, এক নিমিষে অনিল সেটাতে হাত দিয়া সামলাইতেও যেন অবকাশ পাইল না।...হঠাৎ যেন পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া গেল...চোখে অন্ধকার—কাঁচকলার বাজরার কানাটা মাথায় লাগিতেই মাথাটায় একটা বেদনা—মুসলমানটি কি বলিয়া উঠিল—হৈ হৈ, বহু লোক...কি হয়েছে মশায়? কি হ'ল মশায়?...সরো সরো—বাতাস করো... বরফ নিয়ে এসো...এই যে আমার রুমাল নিন না...

অনিলের দু'টি মাত্র কথা শুধু মনে ছিল—একবার সে অতিকষ্টে গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল—রি—রিপন কলেজ—অপূর্ব রায়—রিপন—

আর মনে ছিল সামনের একটা সাইন বোর্ড—গনেশচন্দ্র দাঁ এণ্ড কোং—কারবাইডের মশলা, তারপরেই সেই তীক্ষ্ণ বর্শাটা পুনরায় কে যেন সজোরে তলপেটে ঢুকাইয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার—

কতক্ষণ পরে সে জানে না, তাহার জ্ঞান হইল। একটা বাক্স বা ঘরের মধ্যে সে শুইয়া আছে, ঘরটা বেজায় দুলিতেছে—পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা—কাহারা কি বলিতেছে, অনেক মোটরগাড়ির ভেঁপুর শব্দ—আবার ধোঁয়া ধোঁয়া…

পুনরায় যখন অনিলের জ্ঞান হইল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল একটা বড় সাদা দেওয়ালের পাশে একখানা খাটে সে শুইয়া আছে। পাশে তাহার বাবা ও ছোট কাকা বসিয়া, আরও তিনজন অপরিচিত লোক। নার্সের পোশাক-পরা দু'জন মেম। এটা হাসপাতাল? কোন্ হাসপাতাল? কি হইয়াছে তাহার? তলপেটের যন্ত্রণা তখনও সমান, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, সারা দেহ যেন অবশ।

পরদিন বেলা দশটার সময় অপু গেল। সে-ই কাল খবর পাইয়া তখনি ছুটিয়া শিয়ালদহের মোড়ে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল সত্যেন ও চার-পাঁচজন ছেলে। টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আনাইয়া তখনি সকলে মিলিয়া তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনা হয় ও বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন হার্নিয়া…স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া, তখনি অস্ত্র করা হইয়াছে।…

বৈকালেও সে গেল। কেবিন ভাড়া করা হইয়াছে, অনিলের মা বসিয়াছিলেন, অপু গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। অনিল এখন অনেকটা ভাল আছে, অস্ত্র করার পরে বেজায় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সারারাত ও সারাদিন—দুপুরের পর সেটা একটু কম। তাহার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। সে হাসিয়া অপুর হাত ধরিয়া কাছে বসাইল, বলিল—স্বাস্থ্যের মতন জিনিস আর নেই, যতই বলুন—এই তিনটে দিন যেন একেবারে মুছে গিয়েছে জীবন থেকে।

অপু বলিল—বেশী কথা বলো না, যন্ত্রণা কেমন এখন?

অনিলের মা বলিলেন,—তোমার কথা সব শুনেছি, ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা সেদিন!

অনিল বলিল,—দেখবেন মজা, ঘণ্টা নাড়লেই নার্স এখুনি ছুটে আসবে—বাজাব দেখবেন?—সে হাসিয়া একটা হাত-ঘণ্টা বাজাইতেই লম্বা একজন নার্স আসিয়া হাজির। সে চলিয়া গেলে অনিলের মা বলিলেন—কি যে করিস্ মিছিমিছি? ছিঃ—

দুজনেই খুব হাসিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া অপু সবে আলোটি জ্বালিয়াছে, এমন সময় সত্যেন ও অনিলের পিসতুতো ভাই ফণী—অপু তাহাকে হাসপাতালে প্রথম দেখিয়াছে, সেখানেই প্রথম আলাপ—ব্যস্ত সমস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিল। সত্যেন বলিল—ওঃ, তোমাকে দু'বার এর আগে খুঁজে গেছি—এখুনি হাসপাতালে এস—জান না?

অপু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহাদের মুখের দিকে চাহিতেই ফণী বলিল—অনিল মারা গিয়েছে এই সাড়ে ছটার সময়—হঠাৎ।

সকলে ছুটিতে ছুটিতে হাসপাতালে গেল। অনিলের মৃতদেহ খাট হইতে নামাইয়া সাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া মেঝেতে রাখিয়াছে। বহু আত্মীয়স্বজনে কেবিন ভরিয়া গিয়াছে, ক্লাসের অনেক ছেলে উপস্থিত, একদল ছেলে এইমাত্র এসেন্স ও ফুলের তোড়া লইয়া কেবিনে ঢুকিল। অল্পপরেই মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইল।

সব কাজ শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

অন্য সকলে গঙ্গাস্নান করিতে লাগিল। অপু বলিল, তোমরা নাও, আমি গঙ্গায় নাইব না, কলের জলে সকালবেলা নাইবো। কতকাতার গঙ্গায় নাইতে আমার মন যায় না।

অনিলের বাবার মত লোক সে কখনও দেখে নাই। এত বিপদেও তিনি সারারাত বাঁধানো চাতালে বসিয়া ধীরভাবে কাঠের নল বসানো সট্‌কাতে তামাক টানিতেছেন। অপুকে বার দুই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বাবা তোমার ঘুম লাগে নি তো?···কোনও কষ্ট হয় তো বলো বাবা।

অপু শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারে নাই।

সুনীল সিগারেট কেসটা তাহার জিম্মায় রাখিয়া জলে নামিলে সে ঘাটের ধাপের উপর বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য জ্বলজ্বলে নক্ষত্র, রাত্রিশেষের আকাশে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল ওপারে জেসপ কোম্পানীর কারখানার মাথায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, পূর্ব-আকাশে চিত্রা প্রত্যাসন্ন দিবালোকের মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। অপুর মনের মধ্যে কোনও শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না—কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে কোম্পানীর বাগানে বসিয়া যেমন অনিলেব সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার দিনগুলির মত এক অপূর্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল—কেমন মনে হইতে লাগিল, কি একটা অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্বাক নক্ষত্রজগৎটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে।

অনিলের মৃত্যুর পর অপু বড় মুসড়াইয়া পড়িল! কেমন এক ধরণের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে, কোনো কাজে উৎসাহ আসে না, হাত-পা উঠে না।

বৈকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলেজ-স্কোয়ারের একখানা বেঞ্চির উপর

বসিল। এতদিন তো এখানে রহিল, কিছুই স্থির হইল না, এভাবে আর কতদিন চলে? ভাবিল, না হয় অ্যাম্বুলেন্সে যেতাম, কলেজের অনেকে তো যাচ্ছে, কিন্তু মা কি তা যেতে দেবে?

পরে ভাবিল—বাড়ি চলে যাই, মাসখানেক অর্ডারলি রিট্রিট্ করা যাক।

পাশে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়াছিলেন। মধ্যবয়সী লোক, চেখে চশমা, হাতের শিরগুলি দড়ির মত মোটা। তিনি জিজ্ঞাসা করিালন, সাঁতারের ম্যাচ কবে হবে জানেন?

অপু জানে না, বলিতে পারিল না। ক্রমে দু-চার কথায় আলাপ জমিল। সাঁতারেরই গল্প। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল—তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থান ঘুরিয়াছেন। অপু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক—

অনেকদিনের একটা কথা অপুর মনে পড়িয়া গেল, সে সোজা হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি আপনাকে চিনি, আপনি অনেকদিন আগে বঙ্গবাসীতে 'বিলাত যাত্রীর চিঠি' লিখতেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঠিক, সে দশ এগারো বছর আগেকার কথা—তুমি কি ক'রে জানলে! পড়তে না কি?

—ওঃ, শুধু পড়তাম না, হাঁ ক'রে বসে থাকতাম কাগজখানার জন্যে—তখন আমার বয়েস বছর দশ। পাড়াগাঁয়ে থাকতাম—কি inspiration যে পেতাম আপনার লেখা থেকে।···

ভদ্রলোকটি ভারী খুশী হইলেন। সে কি করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বলিলেন,—ছ্যাখো কোথায় ব'সে কে লেখে আর কোথায় গিয়ে তার বীজ উড়ে পড়ে—বিলেতে হ্যাম্পস্টেডের একটা বোর্ডিং-এ ব'সে লিখতাম, আর বাংলায় এক obscure পাড়াগাঁয়ের এক ছোট ছেলে আমার লেখা পড়ে—বাঃ-বাঃ—

ভদ্রলোকটির ব্যবসা-বাণিজ্য খুব উৎসাহ দেখা গেল। মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে জমি লইয়াছেন, নারিকেল ও ভ্যানিলার চাষ করিবেন। নিঃসম্বল তেরো বৎসরের নিগ্রো বালককে ইউরোপে আসিয়া নিজের উপার্জন নিজে করিতে দেখিয়াছেন—দেশের যুবকদের চাষবাস করিতে উপদেশ দেন।

ভদ্রলোকটিকে আর অপুর অপরিচিত মনে হইল না। তাহার বাল্যজীবনের কতকগুলি অবর্ণনীয়, আনন্দ-মুহূর্তের জন্য এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দায়ী, ইহারই লেখার ভিতর দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে সেই আনন্দ-ভরা প্রথম পরিচয়—

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উৎসাহ লইয়া সে ফিরিল। কে জানিত বঙ্গবাসীর সে লেখকের সঙ্গে এভাবে দেখা হইয়া যাইবে!···শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমার অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে—সে যে করিয়া হউক বাঁচিবে।

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেলি-বাড়ির বড় বৌ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল, দূর হইতে অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—কে আসছে বলুন তো মা-ঠাকুরুণ?—সর্বজয়ার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অপু নয় তো—অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। সর্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতাটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোট, দুর্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপঃকৃশ শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু, অধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলী এখনও অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবারে মায়ের চুল পাকিয়াছে, কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহু-বেষ্টনে, সরলা, চিরদুঃখিনী মাকে সংসারের সহস্র দুঃখ-বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এ ভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল, ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই।

বড়-বৌ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সর্বজয়া বলিল,—এবার ও এসেছে বৌমা, এবার কালই কিন্তু।

অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি খুড়ীমা, কাল কি?

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল,—দেখো কাল,—আজ বলবো না তো!

খিচুড়ী খাইতে ভালবাসে বলিয়া সর্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ী রাঁধিয়া দিল; পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল, এই সাত-আটদিন পর আজ মায়ের কাছে। সর্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হ্যাঁ রে সেখানে খিচুড়ী খেতে পাস?

অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারণার আবরণে নগ্নদারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিত, এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল—হুঁ, বাদলা হলেই খিচুড়ী হয়।

—কি ডালের করে?

—মুগের বেশী, মসুরীরও করে, খাঁড়ি মসুরী।

.—সকালে জলখাবার খেতে দেয় কি কি ?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, এক-একদিন লুচিও দেয়। খাওয়ার বেশ সুবিধা!

প্রীতির টুইশানি কোনকালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সেকথা মাকে জানায় নাই; সর্বজয়া বলিল—হ্যাঁরে, তুই যে সে মেয়েটিকে পড়াস—তাকে কি ব'লে ডাকিস? খুব বড়লোকের মেয়ে, না?

—তার নাম ধরেই ডাকি—

—দেখতে-শুনতে বেশ ভাল?

—বেশ দেখতে—

—হ্যাঁ রে তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না? বেশ হয় তা হ'লে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল,—হ্যাঁ—তারা হ'ল বড়লোক—আমার সঙ্গে—তা কি কখনও—তোমার যেমন কথা!

সর্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস অপুর মত ছেলে পাইলে লোকে এখুনি লুফিয়া লইবে। অপু ভাবে, তবুও তো মা আসল কথা কিছুই জানে না। প্রীতির টুইশানি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায়?

অপু দেখিল—সে যে টাকা পাঠায় নাই, মা একটিবারও সে-কথা উত্থাপন করিল না, শুধুই তাহার কলিকাতায় অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহ-ভরা প্রশ্ন। নিজেকে এমনভাবে সর্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মত সে আর কাহাকেও এ পর্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত বাড়ি গেলে এ লইয়া মা কোন কথা তুলিবে না।

সর্বজয়া একটা এনামেলের বাটি ও গ্লাস ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া হাসিমুখে বলিল,—এই গ্যাখ, এই দু'খানা ছেঁড়া কাপড় বদলে তোর জন্যে নিইচি—বেশ ভালো, না?···কত বড় বাটিটা গ্যাখ।

অপু ভাবিল, মা যা গ্যাখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো, যদি আমার সেই পুরানো-দোকানে কেনা প্লেটগুলো মা দেখত!

কলিকাতায় সে দুরূহ জীবন-সংগ্রামের পর এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে। রাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলেমানুষের মত মনে করে—বলে, সেই গানটা কি মা, ছেলেবেলায় তুমি আর আমি শুয়ে শুয়ে রাত্রে গাইতাম—এক-একদিন দিদিও—সেই 'চিরদিন কখনও সমান না যায়—কভু বনে বনে রাখালেরি সনে, কভু বা রাজত্ব পায়।—

পরে আবদারের সুরে বলে—গাও না মা, গানটা ?

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—হাঁা, এখন কি আর গলা আছে—দূর—

—এসো দু'জনে গাই···এসো না মা—খুব হবে, এসো—

সর্বজয়ার মনে আছে—অপু যখন ছোট ছিল তখন কোনও কোনও মেয়ে-মজলিসে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান হয়ত হইত, অপুর গলা ছিল খুব মিষ্টি কিন্তু তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান-গাওয়ানো যাইত না—অথচ যেদিন তাহার গাহিবার ইচ্ছা হইত, সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বার বার বলিত, আমি কিন্তু আজ গান গাইবো না, গাইতে বলো না। অর্থাৎ সেদিন তাকে একআধবার বলিলেই সে গাহিবে। সর্বজয়া ছেলের মন বুঝিয়া অমনি বলিত—তা অপু এবার কেন একটা গান কর্ না ?···দু' একবার লাজুক মুখে অস্বীকার করার পর অমনি অপু গান শুরু করিয়া দিত।

সেই অপু এখন একজন মানুষের মত মানুষ। এত রূপ এ অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে ? একহারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত-পা। কি মাথার চুল, কি ডাগর চোখের নিষ্পাপ পবিত্র দৃষ্টি ; রাঙা ঠোঁটের দু'পাশে বাল্যের সে সুকুমার ভঙ্গী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু সর্বজয়াই তাহা ধরিতে পারে।

অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই। প্রায় সবই বদলাইয়া গিয়াছে, সে অপুর হাসি, সে ছেলেমানুষী, সে কথায় কথায় মান অভিমান, আবদার, গলার সে রিণ্‌রিণে মিষ্টি সুর—এখনও অপুর স্বর খুবই মিষ্টি—তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য—পাগলামি—সে সবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। সরলতায়, দুষ্টামিতে, রূপে, ভাবুকতায়—দেবশিশুর মত! এক ছেলে ছিল তাই কি, শত ছেলেতে কি হয় ? সর্বজয়া মনে মনে বলে—বেশী চাই নে, দশটা পাঁচটা চাইনে ঠাকুর, ওকেই আর জন্মে আবার কোলজোড়া ক'রে দিও।

সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার দুঃখ-ভরা জীবন-পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না।

কোনও কোনও দিন রাত্রে অপু মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায়। সর্বজয়া বলে—তুই তো কত ইংরেজী বই পড়িস, কত কি—তুই একটা গল্প বল না বরং শুনি। অপু গল্প করে। দু'জনে নানা পরামর্শ করে, সর্বজয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে! কাঁটাদহের সাণ্ডাল বাড়ি নাকি ভালো মেয়ে আছে সে শুনিয়াছে, অপু পাশটা দিলেই এইবার···

তারপর অপু বলিল,—ভালো কথা মা—আজকাল জ্যেঠিমারা কলকাতায় বাড়ি পেয়েছে যে! সেদিন তাদের বাড়ি গেছলাম—

সর্বজয়া বলে,—তাই নাকি?…তোকে খুব যত্নটত্ন করলে?—কি খেতে দিলে—

অপু নানা কথা সাজাইয়া বানাইয়া বলে—সর্বজয়া বলে—আমায় একবার নিয়ে যাবি—কলকাতা কখনও দেখি নি, বটঠাকুরদের বাড়ি দুদিন থেকে মা-কালীর চরণ দর্শন ক'রে আসি তা হ'লে?…

অপু বলে,—বেশ তো মা, নিয়ে যাব, যেও সেই পূজোর সময়।

সর্বজয়া বলে—একটা সাধ আছে অপু, বটঠাকুরদের দরুন নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস ভুবন মুখুয্যেদের কাছ থেকে, তবে—

সামান্য সাধ, সামান্য আশা। কিন্তু যার সাধ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটও নয়, সামান্যও নয়। মায়ের ব্যথা কোন্‌খানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা, সে অপু জানে। সর্বজয়া বলে,—তুই মানুষ হ'লে, তোর একটা ভাল চাকরি হ'লে তোর বৌ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করবো। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস—বড় ইচ্ছে হয়।

অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশীদিন বাঁচিবে না। মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবার, কেবল অসুখে ভুগিতেছে। মুখে যত সান্ত্বনা দেওয়া, যত আশার কথা বলা—সব বলে। জানালার ধারে তক্তপোশে দুপুরের পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে, অনেক বেলা পড়িয়া যায়। অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে,—গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি?

সর্বজয়া সে-সব কথা উড়াইয়া দেয়। এ-গল্প ও-গল্প করে। বলে হ্যাঁরে, অতসীর মা আমার কথা-টথা কিছু বলে?

অপু মনে মনে ভাবে—মা আর বাঁচবে না—বেশী দিন। কেমন যেন—কেমন—কি ক'রে থাকব মা মারা গেলে?

অনেক বেলা পড়িয়া যায়—

জানালার পাশেই একটা আতা গাছ। আতা ফুলের মিষ্টি ভুরভুরে গন্ধ বৈকালের বাতাসে! একটু পোড়ো জমি। এক ঢিবি সুরকি। একটা চারা জামরুল গাছ। পুরনো বাড়ির দেয়ালের ধারে ধারে বনমূলার গাছ। কণ্টিকারীর ঝাড়। একটা জায়গায় কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া সর্বজয়া শাকের ক্ষেত

করিয়াছে।

একটা অদ্ভুত ধরণের মনের ভাব হয় অপুর। কেমন এক ধরণের গভীর বিষাদ···মায়ের এই সব ছোটখাটো আশা, তুচ্ছ সাধ—কত নিস্ফল।···মা কি ওই শাকের ক্ষেতের শাক খাইতে পারিবে? কালীঘাটের কালীদর্শন করিবে জ্যাঠাইমার বাসায় থাকিয়া!···নিশ্চিন্দপুরের আমবাগান।

এক ধরণের নির্জনতা···সঙ্গীহীনতার ভাব···মায়ের উপর গভীর করুণা··· রাঙা রোদ মিলাইতেছে চারা জামরুল গাছটাতে···সন্ধ্যা ঘনাইতেছে। ছাতারে ও শালিক পাখির দল কিচ্-মিচ ও ঝটাপটি করিতেছে।···

অপুর চোখে জল আসিল···কি অদ্ভুত নির্জনতা-মাখানো সন্ধ্যাটা! মুখে হাসিয়া সস্নেহে মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—আচ্ছা, মা, বড় বোয়ের সঙ্গে বাজি রেখেছিলে কি নিয়ে—বলে না—বললে না তো সেদিন?···

ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ি হইতে রওনা হইল।

স্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না, গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরি হইয়াছে, ট্রেন আধ ঘণ্টা পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সবজয়া ছেলের বাড়ি হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের ওয়াড় সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে—সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বাড়ির দাওয়ায় জিনিসপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল,···মা!···

সর্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতে কাপড় সিদ্ধ লইয়া ব্যস্ত আছে, চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ-মিশ্রিত স্বরে বলে,—তুই!—যাওয়া হ'ল না?

অপু হাসিমুখে বলে,—গাড়ি পাওয়া গেল না—এসো বাড়ি—

বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু কোনও দিন তাহা দেখে নাই—বহুকাল পর্যন্ত মায়ের এ মুখখানা তাহার মনে ছিল। সেদিন রাত্রে দু'জনে নানা কথা। অপু আবার ছেলেবেলাকার গল্প শুনিতে চায় মা'র মুখে—সর্বজয়া লজ্জিতস্বরে বলে—হ্যাঁ, আমার আবার গল্প! সে সব ছেলেবয়সের গল্প—তা বুঝি এখনো শুনে তোর ভাল লাগবে। অপুকে আর সর্বজয়া বুঝিতে পারে না—এ সে ছোট্ট অপু নয়, যে ঠোঁট ফুলাইলেই সর্বজয়া বুঝিত ছেলে কি চাহিতেছে এ কলেজের ছেলে, তরুণ অপু, এর মন, মতিগতি, আশা আকাজ্ক্ষা—সর্বজয়ার অভিজ্ঞতার বাহিরে···অপু বলে,—না মা, তুমি সেই ছেলেবেলার শ্যামলঙ্কার গল্পটা করো। সর্বজয়া বলে,—তা আবার কি শুনিব—তুই বরং তোর বইয়ের একটা গল্প বল্

—কত ভালো গল্প তো পড়িস !···

পরদিন সে কলকাতায় ফিরিল।

কলেজ সেইদিনই প্রথম খুলিয়াছে, প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটিশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড—সে অধীব আগ্রহে ভিড় ঠেলিযা নিজেব নামটা আছে কিনা দেখিতে গেল।

আছে। ছু'তিনবার বেশ ভাল করিয়া দেখিল? আরও আশ্চর্য এই যে পাশেই যে সব ছেলে পাশ করিয়াছে অথচ বেতন বাকী থাকার দরুণ প্রমোশন পায় নাই, তাহাদেব একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অপুব নাম নাই, অথচ অপু জানে তাহাবই সর্বাপেক্ষা বেশী বেতন বাকি।··

সে ব্যাপাবটা বুঝিতে না পারিয়া ভিড়ের বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

ছু-তিনদিন পবে তাহার এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়াব কাবণ জানিতে অফিস-ঘবে কেরানীব কাছে গেল, সে-ও গেল সঙ্গে। হেড ক্লার্ক বলিল—একি ছেলেব হাতেব মোয়া হে ছোকবা। কত বোল?···পবে একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই ছ্যাখো রোল টেন—লাল কালিব মার্কা মারা রয়েছে—ছু'মাসের মাইনে বাকী—মাইনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, প্রিন্সিপালের কাছে যাও, আমি আব কি কববো?

অপু তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পডিয়া দেখিতে গেল—তাহার রোল নম্বব কুড়ি—একই পাতায়। দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে সঙ্গে কালিতে 'ডি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার—মাহিনা দেয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে নামেব উল্টাদিকে মন্তব্যেব ঘরে কোন্ কোন্ মাসের মাহিনা বাকী তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহার নামটাতে কোন কিছু দাগ বা আঁচড় নাই—একেবাবে পরিষ্কাব মুক্তার মত হাতের লেখা জলজল করিতেছে—রায় অপূর্বকুমার—লাল কালির একটা বিন্দু পর্যন্ত নাই,···

ঘটনা হয়ত খুব সামান্য, কিছুই না—হয়ত এটা সম্পূর্ণ কলমের ভুল, না হয় কেরানীর হিসাবের ভুল, কিন্তু অপুব মনে ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করিল।

মনে আছে—অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় তাহার দিদি যেবার মারা গিয়াছিল, সেবার শীতের দিনে বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভাবিত, দিদি কি নরকে গিয়াছে? সেখানকার বর্ণনা সে মহাভারতে পড়িয়াছিল, ঘোর

অন্ধকার নরকে শত শত বিকটাকার পাখী ও তাহাদের চেয়েও বিকটাকার যমদূতের হাতে পড়িয়া তাহার দিদির কি অবস্থা হইতেছে! কথাটা মনে আসিতেই বুকের কাছটায় কি একটা আটকাইয়া যেন গলা বন্ধ হইয়া আসিত —চোখের জলে কাশবন শিমূলগাছ ঝাপসা হইয়া আসিত, কি জানি কেন, সে তাহার হাস্যমুখী দিদির সঙ্গে মহাভারতোক্ত নরকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেন কোন মতেই খাপ খাওয়াইতে পারিত না। তাহার মন বলিত, না—না —দিদি সেখানে নাই—সে জায়গা দিদির জন্য নয়।

তারপর ওখানে কাশবনে ম্লান সন্ধ্যার রাঙা আলো যেন অপূর্ব রহস্য মাখানো মনে হইত—আপনা আপনি তাহার শিশুমন কোন অদৃশ্য শক্তির নিকট হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিত—আমার দিদিকে তোমরা কোন কষ্ট দিও না —সে অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে তোমাদের পায়ে পড়ি, তাকে কিছু বলো না—

ছেলেবেলার সে সহজ নির্ভরতার ভাব সে এখনও হারায় নাই। এই সেদিনও কলিকাতায় পড়িতে আসিবার সময়ও তাহার মনে হইয়াছিল—যাই না, আমি তো একটা ভাল কাজে যাচ্ছি—কত লোক তো কত চায়, আমি বিদ্যে চাইছি—আমায় এর উপায় ভগবান ঠিক ক'রে দেবেন। তাহার এ নির্ভরতা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন দেওয়ানপুরের হেডমাস্টার মিঃ দত্ত। তিনি ছিলেন—ভক্ত ও বিশ্বাসী খৃষ্টান। তিনি তাহাকে যে-সব কথা বলিতেন অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে সে ভাবের কথা বলিতেন না। শুধু গ্রামার এ্যালজেব্রা নয়—কত উপদেশের কথা, গভীর বিশ্বাসের কথা, ঈশ্বর, পরলোক, অন্তরতম অন্তরের নানা গোপন বাণী। হয়ত বা তাঁহার মনে হইয়াছিল, এ বালকের মনের ক্ষেত্রে এসকল উপদেশ সময়ে অঙ্কুরিত হইবে।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি, রাস্তায় ফেরিওয়ালা হাঁকিতেছে, 'পেয়ারাফুলি আম', 'ল্যাংড়া আম'—দিনরাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি. পথঘাটে জল কাদা। এই সময়টার সঙ্গে অপুর কেমন একটা নিরাশ্রয়তা ও নিঃসম্বলতার ভাব জড়িত হইয়া আছে, আর-বছর ঠিক এই সময়টিতে কলিকাতায় নূতন আসিয়া অবলম্বন-শূন্য অবস্থায় পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছিল, কি না জানি হয়, কোথায় না জানি কি সুবিধা জুটিবে—এবারও তাই।

ঔষধের কারখানায় এবার আর স্থান হয় নাই। এক বন্ধুর মেসে দিনকতক উঠিয়াছিল, এখন আবার অন্য একটি বন্ধুর মেসে আছে। নানাস্থানে

ছেলেপড়ানোর চেষ্টা করিয়া কিছুই জুটিল না। পরের মেসেই বা চলে কি করিয়া? তাহা ছাড়া এই বন্ধুর ব্যবহার তত ভাল নয়, কেমন যেন বিরক্তির ভাব সর্বদাই—তাহার অবস্থা সবই জানে অথচ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, সে মেস খুঁজিয়া লইতে এত দেরি কেন করিতেছে—এ মাসটার পরে আর কোথাও সিট খালি পাওয়া যাইবে? অপু মনে বড় আহত হইল! একদিন তাহার হঠাৎ মনে হইল খবরের কাগজ বিক্রয় করিলে কেমন হয়? কলিকাতার খরচ চলে না? মাকেও তো···

অপু সব সন্ধান লইল। তিন পয়সা দিয়া নগদ কিনিয়া আনিতে হয় খবরের কাগজের অফিস হইতে, চার পয়সায় বিক্রী, এক পয়সা লাভ কাগজ পিছু; কিন্তু মূলধন তো চাই; কাহারও কাছে হাত পাতিতে লজ্জা করে, দিবেই বা কে? এই কলিকাতা শহরে এমন একজনও নাই যে তাহাকে টাকা দেয়? সে সুদ দিতে রাজী আছে। সমীরের কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সে ভাল করিয়া কথা কয় না! ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে কারখানার তেওয়ারী-বৌয়ের কাছে গিয়া সব বলিল। তেওয়ারী-বৌ সুদ লইবে না। লুকাইয়া দু'টা মাত্র টাকা বাহির করিয়া দিল, তবে আশ্বিন মাসে তাহারা দেশে যাইবে, তাহার পূর্বে টাকাটা দেওয়া চাই।

ফিরিবার পথে অপু ভাবিল···বহুর পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে, মায়ের মত ছাখে, আহা কি ভালো লোক!

পরদিন সকালে সে ছুটিল অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে। সেখানে কাগজ-বিক্রেতাদের মারামারি, সবাই আগে কাগজ চায়! অপু ভিড়ের মধ্যে ঢুকিতে পারিল না—কাগজ পাইতে বেলা হইয়া গেল। তাহার পর আর এক নূতন বিপদ—অন্য কাগজওয়াদের মত কাগজ হাঁকিতে পারা তো দূরের কথা, লোকে তাহার দিকে চাহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, গলা দিয়া কোনও কথা বাহির হয় না! সকলেই তাহার দিকে চায়, সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলে কাগজ বিক্রিয় করিতেছে, এ দৃশ্য তখনকার সময়ে কেহ দেখে নাই—অপু ভাবে—বা রে, আমি কি চড়কের নতুন সঙ্ নাকি? খানিক দূরে আর একটা জায়গায় চলিয়া যায়। কাহাকেও বিনীতভাবে মুখের দিকে না চাহিয়া বলে—একখানা খবরের কাগজ নেবেন? অমৃতবাজার?

কলেজে যাইবার পূর্বে মাত্র আঠারোখানি বিক্রয় হইল। বাকীগুলি এক খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা তিন পয়সা দরে কিনিয়া লইল। পরদিন লজ্জাটা অনেকটা কমিল, ট্রামে অনেকগুলি কাগজ কাটিল, বোধ হয় বাঙালী ভদ্র-লোকের ছেলে বলিয়াই তাহার নিকট হইতে অনেকে কাগজ লইল।

মাসের শেষে একদিন কলেজে হৈ-চৈ উঠিল। গিয়া দেখে কোথাকার এক ছেলে লাইব্রেরীর একখানা বই চুরি করিয়া পলাইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে —তাহারই গোলমাল। অপু তাহাকে চিনিল—একদিন আর বছব সে ঠাকুর-বাড়িতে খাইতে যাইতেছিল। ওই ছেলেটিও বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটেব দত্তবাড়ি দরিদ্র ছাত্র হিসাবে খাইতে যাইতেছিল। শীতের রাত্রি, খুব বৃষ্টি আসাতে দু'জনে এক গাড়ী-বারান্দার নীচে ঝাড়া দু'ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। ছেলেটি অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া অতদূর খাইতে যায় শুনিয়া অপুর মনে বড দয়া হয়। সে নামও জানিত, মেট্রোপলিটন কলেজে থার্ড ইয়ারেব ছেলে তাহাও জানিত, কিন্তু কোনও কথা প্রকাশ করিল না। কলেজ সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিশেব হাতে দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, দর্শনের অধ্যাপক বৃদ্ধ প্রসাদদাস মিত্র মধ্যস্থতা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

অপুর মনে আঘাত লাগিল—সে পিছু পিছু গিয়া অখিল মিস্ত্রি লেনের মোড়ে ছেলেটিকে ধরিল। ছেলেটির নাম হরেন। সে দিশাহারার মত হাঁটিতেছিল, অপুকে চিনিতে পারিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল! দত্তবাড়ি আর খাইতে দেয় না—বর্ধমান জেলায় দেশ, এখানে কোনও আত্মীয়স্বজন নাই। অপু মির্জাপুর পার্কে একখানা বেঞ্চিতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইল, ছেলেটার মুখে বসন্তের দাগ, রং কালো, চুল রুক্ষ, গায়ের শার্ট কব্জির অনেকটা উপর পর্যন্ত ছেঁড়া। অপুব চোখে জল আসিতেছিল, বলিল—তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো—খবরের কাগজ বিক্রি করবে? বাদামভাজা খাওয়া যাক এসো—এই বাদামভাজা—

পূজা পর্যন্ত দুজনের বেশ চলিল। পূজার পরই পুনর্মূষিক—তেওয়ারী বৌয়ের দেনা শোধ কবিয়া যাহা থাকিল, তাহাতে মাসিক খরচের কিছু অংশ কুলান হয় বটে, বেশীটাই হয় না। সেকেণ্ড ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষাও হইয়া গেল, এইবারই গোলমাল—সারা বছবের মাহিনা ও পরীক্ষার ফী দিতে হইবে অল্পদিন পরেই।

উপায় কিছুই নাই। সে কাহারও কাছে কিছু চাহিতে পারিবে না। হয়ত পরীক্ষা দেওয়াই হইবে না। সত্যই তো, এত টাকা—এ তো আর ছেলেখেলা নয়? মন্মথকে একদিন হাসিয়া সব খুলিয়া বলে। মন্মথ শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল—এসব কথা আগে জানাতে হয় আনাকে। মন্মথ সত্যই খুব খাটিল। নিজের দেশের বার লাইব্রেরীতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দিল, কলেজে প্রফেসারদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ফেলিল, অল্পদিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি টাকা আসিতে দেখিয়া অপু নিজেই আশ্চর্য

হইয়া গেল। কিন্তু বাকী বেতন একরূপ শোধ হইলেও তখনও পরীক্ষার ফি-এর এক পয়সাও জোগাড় হয় নাই, মন্মথ ও বৌবাজারের সেই ছেলেটি বিশ্বনাথ—দু'জনে মিলিয়া ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে গিয়া ধরিল, অপূর্বকে কলেজের বাকী বেতন কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এদিকে ঔষধের কারখানায় থাকিবার সুবিধার জন্য অপু পুনরায় কারখানায় ম্যানেজারেব নিকটে গেল। এই মাস তিনেক যদি সেখানে থাকিবাব সুবিধা পায়, তবে পরীক্ষার পডাটা করিতে পারে। এর ওর তার মেসে সারা বছর অস্থিতপঞ্চকভাবে থাকিয়া তেমন পডাশুনা হয় নাই। কারখানার আর সকলে অপুকে চিনিত, পছন্দও করিত, তাহারা বলিল—ওহে, তুমি একবার মিঃ লাহিডীব কাছে যেতে পার? ওব কাছে বলাই ভুল—মিঃ লাহিড়ী কারখানার একজন ডিরেক্টর, তাঁব চিঠি যদি আনতে পার, ও সুড় সুড় ক'রে রাজী হবে এখন। ঠিকানা লইয়া অপু উপবি উপরি তিন চারদিন ভবানীপুরে মিঃ লাহিডীর বাডিতে গেল, দেখা পাইল না,—বডলোকের গাডী বারান্দার ধারে বেঞ্চের উপর বসিয়া চলিয়া আসে। দিনকতক কাটিল।

সেদিন রবিবার। ভাবিল, আজ আর দেখা না করিয়া আসিবে না। মিঃ লাহিড়ী বাড়ী নাই বটে, তবে বেলা এগারোটার মধ্যে আসিবেন। খানিকক্ষণ বসিয়া আছে, এমন সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল—আপনাকে দিদিমণি ডাকছেন—

অপু আশ্চর্য হইয়া গেল। কোন্ দিদিমণি তাহাকে ডাকিবেন এখানে? সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমাকে? না—আমি তো—

ঝি ভুল করে নাই, তাহাকেই। ডানধারে একটা বড় কামরা, অনেকগুলো বড় বড় আলমারী, প্রকাণ্ড বনাত-মোড়া টেবিল, চামডার গদি-আঁটা আরাম চেয়ার ও বসিবার চেয়ার। সরু বারান্দা পার হইয়া একটা চকমিলানো ছোট পাথর-বাঁধানো উঠান। পাশের ছোট ঘরটায় হাতল-হীন চেয়ারে একটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের তরুণী বসিয়া টেবিলে বই কাগজ ছড়াইয়া কি লিখিতেছে, পরণে সাদাসিদে আটপৌরে লালপাড় শাড়ি, ব্লাউজ, ঢিলে-খোঁপা, গলায় সরু চেন, হাতে প্লেন বালা—অপরূপ সুন্দরী। সে ঘরে ঢুকিতেই মেয়েটি হাসিমুখে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপু স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? সকালে সে আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে।...নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিয়াও করা যায় না—আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—লীলা।

লীলা মৃদু মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। বলিল—চিনতে

পেরেছেন তো দেখছি ? আপনাকে কিন্তু চেনা যায় না—ওঃ কতকাল পর – আট বছর খুব হবে—না ?

অপু এতক্ষণ পর কথা ফিরিয়া পাইল। সম্মুখের এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী লীলাও বটে, না-ও বটে। কেবল হাসির ভঙ্গি ও এক ধরণের হাত রাখিবার ভঙ্গিটা পরিচিত পুরানো।

সে বলিল, আট বছর—হ্যাঁ তা—তো—তোমাকেও দেখলে' চেনা যায় না।' অপু 'আপনি' বলিতে পারিল না, মুখে বাধিল, লীলার সম্বোধনে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনাকে দু'দিন দেখেছি, পরশু কলেজে যাবার সময় গাড়িতে উঠছি, দেখি কে একজন গাড়ী-বারান্দার ধারে বেঞ্চিতে ব'সে—দেখে মনে হ'ল কোথায় দেখছি যেন—আবার কালও দেখি ব'সে—আজ সকালে বাইরের ঘরে খবরের কাগজখানা এসেছে কিনা দেখতে জানালা দিয়ে দেখি আজও ব'সে—তখন হঠাৎ মনে হ'ল আপনি···তখনই মাকে বলেছি, মা আসছেন– কি করছেন কলকাতায় ? বিপনে ?—বাঃ, তা এতদিন আছেন, একদিন এখানে আসতে নেই ?

বাল্যের সেই লীলা!—একজন অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত আপনার লোক যেন দূরে চলিয়া গিয়া পর হইয়া পড়িয়াছে। 'আপনি' বলিবে না ' তুমি' বলিবে, দিশাহারা অপু তাহা ঠাওর করিতে পারিল না। বলিল,—কি ক'রে আসব ? আমি কি ঠিকানা জানি ?

লীলা বলিল—ভাল কথা, আজ এখানে হঠাৎ কি করে এসে পড়লেন ?

অপু লজ্জায় বলিতে পারিল না যে, সে এখানে থকিবার স্থানের সুপারিশ করাইতে আসিয়াছে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল—মা ভাল আছেন ? বেশ— আপনার বুঝি সেকেণ্ড ইয়ার ? আমার ফার্স্ট ইয়ার আর্টস্।

একটি মহিলা ঘরে ঢুকিলেন। অপু চিনিল, বিস্মিতও হইল। লীলার মা মেজ-বৌরাণী, কিন্তু বিধবার বেশ। আট দশ বৎসর পূর্বের সে অতুলনীয় রূপরাশি এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না। অপু পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। মেজ-বৌরাণী বলিলেন—এসো বাবা এসো, লীলা কালও বলেছে, কে একজন বসে আছে মা, ঠিক বর্ধমানের সেই অপূর্বের মত—আজ আমাকে গিয়ে বললে, আর কেউ নয় ঠিক অপূর্ব— তখন আমি ঝিকে দিয়ে ডাকতে পাঠালাম—বসো, দাঁড়িয়ে কেন বাবা ? ভাল আছ বেশ ? তোমার মা কোথায় ?

অপু সঙ্কুচিতভাবে কথার উত্তর দিয়া গেল। মেজ-বৌরাণীর কথায় কি

আন্তরিকতার সুর। যেন কত কালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়তার আবহাওয়া। অপু কি করিতেছে, কোথায় থাকে, মা কোথায় থাকেন, কি করিয়া চলে, এবার পরীক্ষা দিয়া পুনরায় পড়িবে কি না, নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন। তারপর তিনি চা ও খাবারের বন্দোবস্ত করিতে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলে অপু বলিল—ইয়ে, তোমার বাবা কি—

লীলা ধরা' গলায় বলিল—বাবা তো, এই তিন বছর হ'ল—এটা মামার বাড়ি—

অপু বলিল—ও! তাই ঝি বললে দিদিমণি ডাকছেন।—মানে উনি—না?···মিঃ লাহিড়ী কে হন তোমার?

—দাদামশায়—উনি ব্যারিস্টার, তবে আজকাল আর প্রাক্‌টিশ করেন না—বড় মামা হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন। ও-বছর বিলেত থেকে এসেছেন।

চা ও খাবার খাইয়া অপু বিদায় লইল। লীলা বলিল—বড় মামার মেয়ের নেম্‌-ডে পার্টি, সামনের বুধবারে। এখানে বিকেলে আসবেন অবিশ্যি অপূর্ব্ববাবু—ভুলবেন না যেন—ঠিক কিন্তু, ভুলবেন না।

পথে আসিয়া অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। 'অপূর্ব্ববাবু'!—

লীলাই বটে, কিন্তু ঠিক কি সেই এগারো বছরের কৌতুকময়ী সরলা স্নেহময়ী লীলা?···সে লীলা কি তাহাকে 'অপূর্ব্ববাবু' বলিয়া ডাকিত? তবুও কি আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা!—আর নিজের আপনার লোক জ্যাঠাইমাও তো কলিকাতায় আছেন—মেজ বৌরাণী সম্পূর্ণ পর হইয়া আজ তাহার বিষয়ে যত খুঁটিনাটি আন্তরিক আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, জ্যাঠাইমা কোনও দিন তাহা করিয়াছেন?···

বাসায় ফিরিয়া কেবলই লীলার কথা ভাবিল। তাহার মনে যে স্থান লীলা দখল করিয়া আছে ঠিক সে স্থানটিতে আর কেহই তো নাই? কিন্তু সে এ লীলা নয়। সে লীলা স্বপ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহার দেখা মিলিবে কোনও কালে? সে ঠিক বুঝিতে পারিল না—আজকার সাক্ষাতে সে আনন্দিত হইয়াছে কি ব্যথিত হইয়াছে।

বুধবারে পার্টির জন্য সে টুইল শার্টটা সাবান দিয়া কাচিয়া লইল। ভাবিল, নিজের যাহা আছে তাহাই পরিয়া যাইবে, চাহিবার চিন্তিবার আবশ্যক নাই। তবুও যেন বড় হীনবেশ মনে হইল। মনে মনে ভাবিল, হাতে যখন পয়সা ছিল, তখন লীলার সঙ্গে দেখা হ'ল না—আর এখন একেবারে এই দশা, এখন কিনা—!

লীলার দাদামশায় মিঃ লাহিড়ী খুব মিশুক লোক। অপুকে বৈঠকখানায়

বসাইয়া খানিকটা গল্পগুজব করিলেন। লীলা আসিল, সে ভারি ব্যস্ত, একবার দু-চার কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। কোনও পার্টিতে কেহ কখনও তাহাকে নিমন্ত্রণ করে নাই। যখন এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অপু খুব খুশী হইল। কলিকাতা শহরে এ রকম ধনী উচ্চশিক্ষিত পরিবারে মিশিবার সুযোগ—এ বুঝি সকলের হয়? মাকে গিয়া গল্প করিবার মত একটা জিনিস পাইয়াছে এতদিন পরে! মা শুনিয়া কি খুশীই হইবেন!

বৈঠকখানায় অনেক সুবেশ যুবকের ভিড়, প্রায় সকলেই বড়লোকের ছেলে, কেহ বা নতুন ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ডাক্তার, বেশীর ভাগ বিলাত-ফেরত। কি লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক হইতেছিল। কর্পোরেশন ইলেক্‌শন লইয়া কথা কাটাকাটি। অপু এ বিষয়ে কিছু জানে না, সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাড়াগাঁয়ের কোন একটা মিউনিসিপ্যালিটির কথায় সেখানকার নানা অসুবিধার কথাও উঠিল।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে সোনা-বাঁধানো চশমা, একটু টানিয়া টানিয়া কথা বলিবার অভ্যাস, মাঝে মাঝে মোটা চুরুটে টান দিয়া কথা বলিতেছেন—দেখুন মিঃ সেন, এগ্রিকালচারের কথা যে বলছেন, ও শখের ব্যাপার নয়—ও কাজ আপনার আমার নয়, ইট্ মাস্ট বি ব্রেড্ ইন্ দি বোন্—জন্মগত একটা ধাত গড়ে না উঠলে শুধু কলের লাঙ্গল কিনলেও হয় না—

প্রতিপক্ষ একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, সাহেবী পোশাক-পরা, বেশ সবল ও সুস্থকায়। তিনি অধীরভাবে সামনে ঝুঁকিয়া বলিলেন—মাপ করবেন রমেশবাবু, কিন্তু একথার কোনও ভিত্তি আছে ব'লে আমার মনে হয় না। আপনি কি বলতে চান তা হলে এডুকেশন, অর্গ্যানিজেশন, ক্যাপিটাল—এসবের মূল্য নেই এগ্রিকালচারে? এই যে—

—আছে, সেকেণ্ডারী—

—তবে চাষার ছেলে ভিন্ন কোনও শিক্ষিত লোক কখনও ওসবে যাবে না?...কারণ ইট্ ইজ্ নট ব্রেড্ ইন্ হিজ বোন্? অদ্ভুত কথা আপনার—আমার সঙ্গে কেম্‌ব্রিজে একজন আইরিশ ছাত্র পড়ত—লম্বা লম্বা চুল মাথায়, সুন্দর চেহারা, ধরণধারণে ট্রু পোয়েট। হয়ত সারারাত জেগে হল্লা করছে, একটা বেহালা নিয়ে বাজাচ্ছে—আবার হয়ত দেখুন সারাদিন পড়ছে, ব'সে কি লিখছে—নয় তো ভাবছে—ডিগ্রী নিয়ে চলে গেল বেরিয়ে ক্যানাডায়—গবর্ণমেণ্ট হোমস্টেড্ ল্যাণ্ডে জংলী জমি নিলে—ছোট্ট একটা কাঠের কুঁড়েঘরে

সেই দুর্ধর্ষ শীতের মধ্যে তিন-চার বৎসর কাটালে—হোমস্টেড্ ল্যাণ্ডের নিয়ম হচ্ছে টাইটল হবার আগে পাঁচ বৎসর জমির ওপর বাস করা চাই—থেকে জমি পরিষ্কার করিলে, নিজের হাতে রোজ জমি সাফ করে—লোকজন নেই, দুশো একর জমি, ভাবুন কতদিনে—

ওদিকে একদলের মধ্যে আলোচনা বেশ ঘনাইয়া আসিল। একজন কে বলিয়া উঠিল—ওসব মর‍্যালিটি, আপনি যা বলছেন, সেকেলে হয়ে পড়েছে—এটা তো মানেন যে, ওসব তৈরি হয়েছে বিশেষ কোনও সামাজিক অবস্থায়, সমাজকে বা ইন্‌ডিভিডুয়ালকে প্রোটেকশান দেবার জন্য, সুতরাং—

—বটে, তাহ'লে সবাই সুবিধাবাদী আপনারা। নর্ম্যাটিভ ভ্যালু ব'লে কোনও কিছুর স্থান নেই দুনিয়ায়?…ধরুন যদি—

অপু খুব খুশী হইল। কলিকাতার বড়লোকের বাড়ির পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ছাড়া শিক্ষিত বিলাত ফেরত দলের মধ্যে এভাবে। নাটক-নভেলে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা কখনও হয় নাই। সে অতীব খুশীর সহিত চারিধারে চাহিয়া একবার দেখিল—মার্বেলের বড় ইলেকট্রিক ল্যাম্প কড়ি হইতে ঝুলিতেছে, সুন্দর ফুলকাটা ছিটের কাপড়ে ঢাকা কৌচ, সোফা, দামী আয়না—বড় বড় গোলাপ, মোরাদাবাদের পিতলের গোলাপদানী। নিজের বসিবার কৌচখানা সে দু-একবার অপরের অলক্ষিতে টিপিয়া দেখিল। তাহা ছাড়া এ-ধরণের কথাবার্তা—এই তো সে চায়। কোথায় সে ছিল পাড়াগাঁয়েব গরীব ঘরের ছেলে—তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মামুজোয়ানের স্কুলে পড়িতে যাইত, সে এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে! এ-ধরণের একটা উৎসবেব মধ্যে তাহার উপস্থিতি ও পাঁচজনেব একজন হইয়া বসিবার আত্মপ্রসাদে ঘরের তাবৎ উপকরণ ও অনুষ্ঠানকে যেন সে সারা দেহমন দ্বারা উপভোগ করিতেছিল।

কৃষিকার্যে উৎসাহী ভদ্রলোকটি অন্য কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু অপুর দক্ষিণ ধারের দলটি পূর্ব আলোচনাই চালাইতেছেন এখনও। অপুর মনে হইল সে-ও এ-আলোচনায় যোগদান করিবে, আর হয়ত এ-ধরণের সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ জীবনে কখনও ঘটিবে না। এই সময় দু-এক কথা এখানে বলিলে সে-ও একটা আত্মপ্রসাদ। ভবিষ্যতে ভাবিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে। পাঁস-নে চশমা-পরা যুবকটির নাম হীরক সেন। নতুন পাশ-করা ব্যারিস্টার। মুখে বেশ বুদ্ধির ছাপ—কি কথায় সে বলিল—ওসব মানি নে বিমলবাবু, দেহ একটা এঞ্জিন—এঞ্জিনের যতক্ষণ স্টিম থাকে, চলে—যেই কলকব্জা বিগড়ে যায়,… সব বন্ধ—

অপু অবসর খুঁজিতেছিল, এই সময় তাহার মনে হইল এ-বিষয়ে সে কিছু কথা বলিতে পারে। সে দু একবার চেষ্টা করিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কতকটা আনাড়ী, কতকটা মরীয়ার মত আরক্তমুখে বলিল—দেখুন মাপ করবেন, আমি আপনার মতে ঠিক মত দিতে পারি নে—দেহটাকে এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি বলেন দেহ ছাড়া আর কিছু নেই—

ঘরের সকলেই তাহার দিকে যে কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতুকের সহিত চাহিতেছে, সেটুকু সে বুঝিতে পারিল—তাহাতে সে আর অভিভূত হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু চাপিবার চেষ্টায় আরও মরীয়া হইয়া উঠিল।

একজন বাধা দিয়া বলিল—মশায় কি করেন, জানতে পারি কি?

—আমি এবার আই-এ দেবো।

পাঁস-নে চশমা-পরা যে যুবকটি এঞ্জিনের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল,—ইউনিভার্সিটির আরও দু-এক ক্লাস পড়ে এ তর্কগুলো করলে ভাল হয় না?

সে এমন অতিরিক্ত শান্তভাবে কথাগুলি বলিল যে, ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপুর মুখ দাড়িমের মত লাল হইয়া উঠিল।

যদি সে পূর্ব হইতেই ধারণা করিয়া না লইত যে, সে এ-সভায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং উহারা দয়া করিয়া তাহার এখানে উপস্থিতি সহ্য করিতেছে—তাহা হইলে এমন উগ্র ও অভদ্রভাবের প্রত্যুত্তরে হয়ত তাহার রাগ হইত—কিন্তু সে তো কোনও কিছুতেই এদের সমকক্ষ নয়!—রাগ করিবার মত ভরসা সে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার অত্যন্ত লজ্জা হইল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঢাকিবার জন্য সে আরও মরীয়ার সুরে বলিল—ইউনিভার্সিটির ক্লাসে না পড়লে যে কিছু জানা যায় না, একথা আমি বিশ্বাস করি নে—আমি একথা বলতে পারি কোনও ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র যে-কোনও কলেজের, হিষ্ট্রিতে কি ইংলিশ পোইট্রিতে—কিংবা জেনারেল নলেজে পারবে না আমার সঙ্গে।

নিতান্ত অপটু ধরণের কথা—সকলে আরও একদফা হাসিয়া উঠিল।

তারপর তাহারা নিজেদের মধ্যে অন্য কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হইল। অপু আধঘণ্টা থাকিলে তাহার অস্তিত্বই যেন সকলে ভুলিয়া গেল। উঠিবার সময় তাহারা নিজেদের মধ্যে করমর্দন ও পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।

যেভাবে সকলে তাহাকে উড়াইয়া দিল বা মানুষের মধ্যে গণ্য করিল না, তাহাতে সত্যই অপু অপমান ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পাশ কাটাইয়া সকলে চলিয়া গেল—কেহ একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোন কৌতূহলও দেখাইল না। অপু মনে মনে ভাবিল—বেশ, না

বলুক কথা—আমি কি জানি না-জানি, তার খবর ওরা কি জানে? সে জানত অনিল…

সে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় লীলা আসিয়া তাহাকে নিজে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। বলিল,—মা, অপুর্ববাবু না খেয়েই চুপি চুপি পালাচ্ছিলেন!

লীলা বৈঠকখানার ব্যাপারটা না জানিতে পারে…

একটি ছোট আট-নয় বৎসরের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—একে চেনেন অপূর্ববাবু? এ সেই খোকামণি, আমার ছোট ভাই, এর অন্নপ্রাশনেই আপনাকে একবার আসতে বলেছিলুম, মনে নেই?

লীলার কয়েকটি সহপাঠিনী সেখানে উপস্থিত, সে সকলকে বলিল—তোমরা জান না, অপূর্ববাবুর গলা খুব ভাল, তবে গান গাইবেন কিনা জানি নে, মানে বেজায় লাজুক, আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, একটা অনুরোধ রাখবেন অপূর্ববাবু?

অপু অনেকের অনুরোধ-উপরোধে অবশেষে বলিল—আমি বাজাতে জানি নে—কেউ যদি বরং বাজান।—

খাওয়াটা ভালই হইল। তবুও রাত্রে বাসায় ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইতেছিল—আর কখনও এখানে সে আসিবে না। বড়লোকের সঙ্গে তাহার কিসের খাতির—দরকার কি আসিবার? দারুণ অতৃপ্তি।

যেদিন অপুর পরীক্ষা আরম্ভ হইবে তাহার দিন-পাঁচেক আগে অপু পত্রে জানিল মায়ের অসুখ, হস্তাক্ষর তেলি বাড়ির বড বৌয়ের।

সন্ধ্যার সময় অপু বাড়ি পৌছিল।

সর্বজয়া কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয়। অপুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। অনেক দিন হইতেই অসুখে ভুগিতেছে, পরীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত হওয়ার ভয়ে খবর দেয় নাই, সেদিন তেলি-বৌ জোর করিয়া নিজে পত্র দিয়াছে। এমন যে কিছু শয্যাগত অবস্থা তাহা নয়, খায়-দায়, কাজকর্ম করে। আবার অসুখও হয়। সন্ধ্যা হইলেই শয্যা আশ্রয় করে, আবার সকালে উঠিয়া গৃহকর্ম শুরু করে। চিরদিনের গৃহিনীপনা এ অসুস্থ শরীরেও ত্যাগ করে নাই।

অপু বলিল—উঠো না বিছানা থেকে মা—শুয়ে থাকো—দেখি গা।

—তুই আয় বোস—ও কিছু না—একটু জর হয়, খাই-দাই—ও এমন সময়ে হয়েই থাকে। বোশেখ মাসের দিকে সেরে যাবে—তুই যে মেয়েকে পড়াস, সে ভাল আছে তো?

সর্বজয়ার রোগশীর্ণ মুখের হাসিতে অপুর চোখে জল আসিল। সে পুঁটুলি খুলিয়া গোটাকতক কমলালেবু, বেদানা, আপেল বাহির করিয়া দেখাইল। জিনিসপত্র সস্তায় কিনিতে পারিলে সর্বজয়া ভারি খুশী হয়। অপু জানে মাকে আমোদ দিবার এটা একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। কমলালেবু দেখাইয়া বলে কত সস্তায় কলকাতায় জিনিসপত্র পাওয়া যায় ছাখো—লেবুগুলো দশপয়সা—

প্রকৃতপক্ষে লেবু-ক'টির দাম ছ' আনা।

সর্বজয়া আগ্রহের সহিত বলিল—দেখি? ওমা, এখানে যে ওগুলোর দাম বারো আনার কম নয়—এখানে সব ডাকাত।

চার পয়সায় এক তাড়া পান দেখাইয়া বলিল—বৈঠকখানা বাজার থেকে দু' পয়সায়—ছাখো মা।···

সর্বজয়া ভাবে—এবার ছেলের সংসারী হইবার দিকে মন গিয়াছে, হিসাব করিয়া সে চলিতে শিখিয়াছে।

অপু ইচ্ছা করিয়াই লীলার সহিত সাক্ষাতের কথাটা উঠায় না। ভাবে, মা মনে মনে দুরাশা পোষণ করে, হয়ত এখনি বলিয়া বসিবে—লীলার সঙ্গে তোর বিয়ে হয় না?···দরকার কি, অসুস্থ মায়ের মনে সে-সব দুরাশার ঢেউ তুলিয়া?

এমন সব কথা কখনও অপু মায়ের সামনে বলে না, যাহা কিনা, মা বুঝিবে না। জগৎ সংসারটাকে মায়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপযোগী করিয়াই সে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করে। দিন-তিনেক সে বাড়ি রহিল। রোজ দুপুরে জানালার ধারে বিছানাটিতে সর্বজয়া শুইয়া থাকে, পাশে সে বসিয়া নানা গল্প করে। ক্রমে বেলা যায়, রোদ প্রথমে ওঠে রান্নাঘরের চালায়, পরে বেড়ার ধারের পাল্‌তেমাদার গাছটার মাথায়, ক্রমে বাঁশঝাড়ের ডগায়। ছায়া পড়িয়া যায়—বৈকালের ঘন ছায়ায় অপুর মনে আবার একটা বিপুল নির্জনতা ও সঙ্গহীনতার ভাব আনে—গত গ্রীষ্মের ছুটির দিনের মত।

সর্বজয়া হাসিয়া বলে—পাশটা হ'লে এবার তোর বিয়ের ঠিক করেছি এক জায়গায়। মেয়ের দিদিমা এসেছিল এখানে, বেশ লোক—

ঘরের কোণে একটা তাকে সংসারের জিনিসপত্র সর্বজয়া রাখিয়া দেয়—একটা হাঁড়িতে আমসত্ত্ব, একটা পাত্রে আচার। অপু চিরকালের অভ্যাস অনুসারে মাঝে মাঝে ভাঁড় হাঁড়ি খুঁজিয়া-পাতিয়া মাকে লুকাইয়া এটা-ওটা চুরি করিয়া খায়! এ কয়দিনও খাইয়াছে। সর্বজয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকে, টের পায় না—সেদিন দুপুরে অপু জানালাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে—গায়ে মায়ের গামছাখানা। হঠাৎ সর্বজয়া চোখ চাহিয়া বলিল—আমার গামছাখানা আবার পিরচো কেন?—ওখানা তিলে বড়ি দেবো ব'লে

রেখে দিইচি—কুণ্ডুদের বাড়ির গামছা ওখানা, ভারি টন্‌কো—আর সরে সরে তাকটার ধারে যাচ্ছ কেন?—ছুঁসনে তাক—তুমি এমন দুষ্টু হয়েচো, বাসি কাপড়ে ছুঁয়ে দিলে তাকটা?

কথাটা অপুর বুকে কেমন বিঁধিল—মা সেরে উঠে তিলে বড়ি দেবে? তা দিয়েছে! মা আর উঠছে না—হঠাৎ তাহার মনে হইল, এই সেদিনও তো সে তাক হইতে আমসত্ত্ব চুরি করিয়াছে···মা, অসহায় মা বিছানায় জ্বরের ঘোরে পড়িয়া ছিল···একুশ বৎসর ধরিয়া মায়ের যে শাসন চলিয়াছিল আজ তাহা শিথিল হইয়া পড়িতেছে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, নিজের অধিকার আর বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না কখনও···

অপু চতুর্থ দিন সকালে চলিয়া গেল, কালই পরীক্ষা। চুকিয়া গেলেই আবার আসিবে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শোনে, সর্বজয়া রান্নাঘরে ইতিমধ্যে কখন ঘুম হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছেলের সঙ্গে গরম পরোটা দেওয়া যাইবে।

সর্বজয়ার এরকম কোনও দিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বৈকালে তাহার এত মন হু হু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস অবস্থা। কত কথা, সারা জীবনের কত ঘটনা, কত আনন্দ ও অশ্রুর ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত একমাস ধরিয়া এসব কথা মনে হইতেছে। নির্জনে বসিলেই বিশেষ করিয়া···। ছেলেবেলায় বুধী বলিয়া গাই ছিল বাড়িতে···বাল্যসঙ্গিনী হিমিদি···দুজনে একসঙ্গে দো-পেটে গাঁদাগাছ পুঁতিয়া জল দিত। একদিন হিমিদি ও সে বন্যার জলে মাঠে ঘড়া বুকে সাঁতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিল আর একটু হইলেই—

বিবাহ···মনে আছে সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ছোট ভাই তখন বাঁচিয়া, লুকাইয়া তাহাকে নাড়ু দিয়া গিয়াছিল হাতের মুঠায়। ছোট্ট ছেলেবেলার অপু···কাচের পুতুলের মত রূপ···প্রথম স্পষ্ট কথা শিখিল, কি জানি কি করিয়া শিখিল 'ভিজে'। একদিন অপুকে কদমা হাতে বসাইয়া রাখিয়াছিল।—কেমন খেলি ও খোকা?

অপু দন্তহীন মুখে কদমা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মত মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—'ভিজে'। হি-হি—ভাবিলে এখনও সর্বজয়ার হাসি পায়।

সেদিন দুপুর হইতেই বুকে মাঝে মাঝে ফিক্-ধরা বেদনা হইতে লাগিল। তেলি-বৌ আসিয়া তেল গরম করিয়া দিয়া গেল। দু'তিনবার দেখিয়াও গেল। সন্ধ্যার পর কেহ কোথাও নাই। একা নির্জন বাড়ি। জ্বরও আসিল।

রাত্রে খুব পরিষ্কার আকাশে ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সর্বজয়ার একা থাকিতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। খানিক রাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে, নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক-গা ঘামিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু?—সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল—ইহার আগে কখনও তো এমন হয় নাই! পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাহার আর একদফা ভয় হইল। ভয় কিসের? না—না—মৃত্যু, সে এরকম নয়। ও কিছু না।

কত চুরি, কত পাপ…চুরিই যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে? ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমুকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমুকের গাছের শসাটা লুকাইয়া রাখিত তক্তপোশের তলায়—ভুবন মুখুয্যেদের বাড়ি হইতে একবার দশ পলা তেল ধার করিয়া আনিয়া ভালমানুষ রাণুর মার কাছে পাঁচ পলা শোধ দিয়া আসিয়াছিল, মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল—পাঁচ পলাই তো নিয়ে গিছলাম ন'দি—বোলো সেজ ঠাকুরঝিকে। সারাজীবন ধরিয়া শুধু দুঃখ ও অপমান। কেন আজ এসব কথা মনে উঠিতেছে?

ঘর অন্ধকার।…খাটের তলায় নেংটি ইঁদুর ছুটাছুটি করিতেছে। সর্বজয়া ভাবিল, ওদের বাড়ির কলটা না আন্‌লে আর চলে না—নতুন মুগগুলো সব খেয়ে ফেললে। কিন্তু নেংটি ইঁদুরের শব্দ তো?—সর্বজয়ার আবার সেই ভয়টা আসিল, দুর্দমনীয় ভয়…সারা শরীর যেন ধীরে ধীরে অসাড় হইয়া আসিতেছে ভয়ে…পায়ের দিক হইতে ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে, যতটা উঠিতেছে, ততটা অসাড় করিয়া দিতেছে…না—পায়ের দিক হইতে না—হাতের আঙুলের দিক হইতে…কিন্তু তাহার সন্দেহ হইতেছে কেন? ইঁদুরের শব্দ নয় কেন? কিসের শব্দ? কখনও তো এমন সন্দেহ হয় না?… হঠাৎ সর্বজয়ার মনে হইল, না পায়ের ও হাতের দিক হইতে সুড়সুড়ি কাটিয়া যাহা উপরের দিকে উঠিতেছে তাহা ভয় নয়…তাহা মৃত্যু। মৃত্যু? ভীষণ ভয়ে সর্বজয়া ধড়মড় করিয়া আবার বিছানা হইতে উঠিতে গেল, চীৎকার করিতে গেল…খুব…খুব চীৎকার; আকাশফাটা চীৎকার—অনেকক্ষণ চীৎকার করিয়াছে, আর সে চেঁচাইতে পারে না…গলা ভাঙিয়া আসিয়াছে…কেউ

আসিল না তো?...কিন্তু সে তো বিছানা হইতে... বিছানা হইতে উঠিল কখন?...সে তো উঠে নাই—ভয়টা সুড়সুড়ি কাটিয়া সারা দেহ ছাইয়া ফেলিয়াছে, যেন খুব বড় একটা কালো মাকড়সা...শুঁড়ের বিষে দেহ অবশ... অসাড়...হাতও নাড়ানো যায় না...পা-ও না...সে চীৎকার করে নাই...ভুল।...

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে...একজনের কথাই মনে হয়...অপু...অপু...

অপুকে ফেলিয়া সে থাকিতে পারিতেছে না...অসম্ভব।...বিস্ময়ের সহিত দেখিল...সে নিজে অনেকক্ষণ কাঁদিতেছে!—এতক্ষণ তো টের পায় নাই।... আশ্চর্য...চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে যে!...

জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না...কেমন একটা আনন্দ...আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে...টুপ...টুপ...টুপ...টাপ...। আবার কান্না পায় ...জ্যোৎস্নার আলোয় জানালার গরাদে ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে? সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানালার দিকে...নিবদ্ধ হইল...বিস্ময়ে, আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল অপু দাঁড়াইয়া আছে।...এ অপু নয়...সেই ছেলেবেলাকার...ছোট্ট অপু...এতটুকু অপু...নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র-জ্যোৎস্না-রাতে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িত যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মত কচি মুখে সেই অপু...ওর ছেলেমানুষ খঞ্জন পাখির মত ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি চুল কোঁকড়া কোঁকড়া...মুখচোরা, ভালমানুষ...লাজুক বোকা জগতের ঘোরপ্যাচ কিছুই একেবারে বোঝে না...কোথায় যেন সে যায়...নীল আকাশ বাহিয়া বহু দূরে... বহু দূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে...যায়...যায় যায়...যায়... মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায়...

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে।...কিন্তু তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে...এতই সুন্দর...

কি হাসি! কি মিষ্টি হাসি ওর খে!...

পরদিন সকালে তেলি বাড়ির বড়-বৌ আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া হয় নাই, খোলাই আছে, বড-বৌ আপন মনে বলিল—রাত্রে দেখছি মা-ঠাকুরুণের অসুখ খুব বেড়েছে, খিলটাও দিতে পারেন নি।

বিছানার উপর সর্বজয়া যেন ঘুমাইতেছেন। তেলি-বৌ একবার ভাবিল—ডাকিবে না—কিন্তু পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে

গেল। সর্বজয়া কোনও সাড়া দিলেন না, নড়িলেনও না। বড়-বৌ আরও দু-একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিল।

পরক্ষণেই সে সব বুঝিল।

সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত—এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলি-বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিশ্বাস···একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস··· অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবনপথের বাধা?—কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন—। তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না। মাকে এত ভালবাসিত তো, কিন্তু মায়ের মৃত্যু-সংবাদটা প্রথমে যে, একটা উল্লাসের স্পর্শ মনে আনিয়াছিল—ইহা সত্য—সত্য—তাহাকে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। তাহার পর সে বাড়ি রওনা হইল। উলা স্টেশনে নামিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। এই প্রথম এ পথে সে যাইতেছে—যেদিন মা নাই। গ্রামে ঢুকিবার কিছু আগে আধমজা কোদলা নদী, এ সময়ে হাঁটিয়া পার হওয়া যায় —এরই তীরে কাল মাকে সবাই দাহ করিয়া গিয়াছে! বাড়ি পৌঁছিল বৈকালে। এই সেদিন বাড়ি হইতে গিয়াছে, মা তখনও ছিলেন···ঘরে তালা দেওয়া, চাবি কাহাদের কাছে? বোধ হয় তেলি-বাড়ির ওরা লইয়া গিয়াছে। ঘরের পৈঠায় অপু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উঠানের বাহিরে আগড়ের কাছে এক জায়গায় পোড়া খড় জড়ো করা। সেদিকে চোখ পড়িতেই অপু শিহরিয়া উঠিল—সে বুঝিয়াছে—মাকে যাহারা সৎকার করিতে গিয়াছিল, দাহ অন্তে তাহারা কাল এখানে আগুন ছুঁইয়া নিমপাতা খাইয়া শুদ্ধ হইয়াছে—প্রথাটা অপু জানে···মা মারা গিয়াছেন এখনও অপুর বিশ্বাস হয় নাই···একুশ বৎসরের বন্ধন, মন এক মুহূর্তে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে নাই ··কিন্তু পোড়া খড়গুলাতে নগ্ন, রূঢ়, নিষ্ঠুর সত্যটা···মা নাই! মা নাই! ··বৈকালের কি রূপটা! নির্জন, নিরালা, কোনও দিকে কেহ নাই। উদাস পৃথিবী, নিস্তব্ধ বিবাগী রাঙা রোদভরা আকাশটা।···অপু অর্থহীন দৃষ্টিতে পোড়া খড়গুলার দিকে চাহিয়া রহিল।···

কিন্তু মায়ের গায়ের কাঁথাখানা উঠানের আলনায় মেলিয়া দেওয়া কেন? কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল···সঙ্গেই তো যাওয়ার কথা। অনেক দিনের নিশ্চিন্দিপুরের আমলের, মায়ের হাতে সেলাই করা, কল্কা-কাটা রাঙা সুতার কাজ।··কতক্ষণ সে বসিয়া ছিল জানে না, রোদ প্রায় পড়িয়া আসিল। তেলি-বাড়ির বড় ছেলে নাডুর ডাকে চমক ভাঙিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লান হাসিয়া বলিল—এই যে আমার ঘরের চাবিটা তোমাদের বাড়ি?··

নাডু বলিল—কখন এলে, এখানে ব'সে একলাটি—বেশ তো দাদাঠাকুর—এসো আমাদের বাড়ি। অপু বলিল, না ভাই, তুমি চাবিটা নিয়ে এসো—ঘরের মধ্যে দেখি জিনিসগুলোর কি ব্যবস্থা! চাবি দিয়া নাডু চলিয়া গেল।—ঘর খুলে ছ্যাখো, আমি আসছি এখুনি। অপু ঘরে ঢুকিল। তক্তপোশের উপর বিছানা নাই, বালিশ, মাদুর কিছু নাই—তক্তপোশটা পড়িয়া আছে—তক্তপোশের তলায় একটা পাথরের খোরায় কি ভিজানো—খোরাটা হাতে তুলিয়া দেখিল। চিরতা না নিমছাল কি ভিজানো—মায়ের ওষুধ।

বাহির পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে বলিল—ঘরের মধ্যে কে?—অপু খোরাটা তক্তপোশের কোণে নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে দাওয়ায় আসিল। নিরুপমা দিদি—নিরুপমাও অবাক—গালে আঙুল দিয়া বলিল—তুমি! কখন এলে ভাই?— কৈ কেউ তো বলে নি!···

অপু বলিল—না, এই তো এলাম,—এই এখনও আধঘণ্টা হয় নি।

নিরুপমা বলিল—আমি বলি রোদ পড়ে গিয়েছে, কাঁথাটা কেচে মেলে দিয়ে এসেছি বাইরে, যাই কাঁথাখানা তুলে রেখে আসি কুণ্ডুদের বাড়ি। তাই আসছি—

অপু বলিল—কাঁথাখানা মায়ের গায়ে ছিল, না নিরুদি?

—কোথায়?···পরশু রাতে তো তাঁর—পরশু বিকেলে বড় বৌকে বলেছেন কাঁথাখানা সরিয়ে রাখো মা—ও আমার অপুর জন্যে, বর্ষাকালে কলকাতা পাঠাতে হবে—সেই পুরানো তুলোজমানো কালো কম্বলটা ছিল···সেইখানে গায়ে দিয়েছিলেন—তিনি আবার প্রাণ ধ'রে তোমার কাঁথা নষ্ট করবেন?···তাই কাল যখন ওরা তাঁকে নিয়ে-থুয়ে গেল তখন ভাবলাম রুগীর বিছানায় তো ছিল কাঁথাখানা, জলকাচা ক'রে রোদে দিই—কাল আর পারি নি—আজ সকালে ধুয়ে আলনায় দিয়ে গেলাম—তা এসো—আমাদের বাড়ি—ওসব শুনবে না—মুখ শুকনো—হবিষ্যি হয় নি? এসো—

নিরুপমার আগে আগে সে কলের পুতুলের মত তাদের বাড়ি গেল। সরকার মহাশয় কাছে ডাকিয়া বসাইয়া অনেক সান্ত্বনার কথা বলিলেন। ৮

নিরুদি কি করিয়া মুখ দেখিয়া বুঝিল খাওয়া হয় নাই? নাড়ুও তো ছিল—কৈ কোনও কথা তো বলে নাই?

সন্ধ্যার পর নিরুপমা একখানা রেকাবীতে আখ ও ফলমূল কাটিয়া আনিল। একটা কাঁসার বাটিতে কাঁচামুগের ডাল-ভিজা, কলা ও আখের গুড় নিয়া নিজে একসঙ্গে মাখিয়া আনিয়াছে। অপু কারুর হাতে চটকানো জিনিস খায় না, ঘেন্না ঘেন্না করে···প্রথমটা মুখে তুলিতে একটুখানি গা-কেমন করিতেছিল। তারপর দুই-এক গ্রাস খাইয়া মনে হইল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আস্বাদই তো!·· নিজের হাতে বা মায়ের হাতে মাখিলে যা হইত—তাই। পরদিন হবিষ্যির সময় নিরুপমা গোয়ালে সব যোগাড়যন্ত্র করিয়া অপুকে ডাক দিল। উনুনে ফুঁ পাড়িয়া কাঠ ধরাইয়া দিল ফুটিয়া উঠিলে বলিল—এইবার নামিয়ে ফ্যালো, ভাই।

অপু বলিল—আর একটু না—নিরুদি?

নিরুপমা বলিল—নামাও দেখি, ও হয়ে গিয়েছে। ডালবাটাটা জুড়োতে দাও—

সব মিটিয়া গেলে সে কলিকাতায় ফিরিবার উদ্যোগ করিল। সর্বজয়ার জাঁতিখানা, সর্বজয়ার হাতে সই-করা খানদুই মনিঅর্ডারের রসিদ চালের বাতায় গোঁজা ছিল—সেগুলি, সর্বজয়ার নখ কাটিবার নরুণটা পুঁটলির মধ্যে বাঁধিয়া লইল। দোরের পাশে ঘরের কোণে সেই তাকটা—আসিবার সময় সেদিকে নজর পড়িল। আচারভরা ভাঁড়, আমসত্ত্বের হাঁড়িটা, কুলচুর, মায়ের গঙ্গাজলের পিতলের ঘটি, সবই পড়িয়া আছে···সে যত ইচ্ছা খুশী খাইতে পারে যাহা খুশী ছুঁইতে পারে, কেহ বকিবার নাই, বাধা দিবার নাই! তাহার প্রাণ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে মুক্তি চায় না···অবাধ অধিকার চায় না—তুমি এসে শাসন করো, এসব ছুঁতে দিও না, হাত দিতে দিও না—ফিরে এসো মা···ফিরে এসো···

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, একটি তীব্র ঔদাসীন্য সব বিষয়ে, সকল কাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়ানক নির্জনতার ভাবটা। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় থাকিতে একদণ্ডও ইচ্ছা হয় না···মন পাগল হইয়া উঠে, কেমন যেন পালাই-পালাই ভাব হয় সর্বদা, অথচ পালাইবার স্থান নাই, জগতে সে একেবারে একাকী—সত্যসত্যই একাকী!

এই ভয়ানক নির্জনতার ভাব এক এক সময় অপুর বুকে পাথরের মত

চাপিয়া বসে, কিছুতেই সেটা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না, ঘরে থাকা তাহার পক্ষে তখন আর সম্ভব হয় না। গলিটার বাহিরে বড় রাস্তা, সামনে গোলদীঘি, বৈকালে গাড়ি, মোটর, লোকজন ছেলেমেয়ে। বড় মোটর-গাড়িতে কোনও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়েরা বাড়ির ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, অপুর মনে হয় কেমন সুখী পরিবার!—ভাই, বোন, ঠাকুরমা, পিসিমা, রাঙ্গাদি, বড়দা, ছোট কাকা। যাহাদের থাকে তাহাদের কি সব দিক দিয়াই এমন করিয়া ভগবান দিয়া দেন! অন্যমনস্ক হইবার জন্য এক-একদিন সে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরীতে গিয়া বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইয়া থাকে। কিন্তু কোথাও বেশীক্ষণ বসিবার ইচ্ছা হয় না, শুধুই কেবল এখানে-ওখানে, ফুটপাথ হইতে বাসায়। বাসা হইতে ফুটপাথে। এক জায়গায় বসিলেই শুধু মায়ের কথা মনে আসে, উঠিয়া ভাবে গোলদীঘিতে আজ সাঁতারের ম্যাচের কি হ'ল দেখে আসি ববং—কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় বাহিরে কোথাও চলিয়া গেলে শান্তি পাওয়া যাইত—যে কোনও জায়গায়, যে কোন জায়গায়—পাহাড়ে, জঙ্গলে, হরিদ্বারে, কেদার-বদরীর পথে—মাঝে মাঝে ঝরণা, নির্জন অধিত্যকায় কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প, দেওদার ও পাইন বনের ঘন ছায়া, সাধু-সন্ন্যাসী, দেবমন্দির, রামচটি, শ্যামচটি কত বর্ণনা তো সে বইয়ে পড়ে, একা বাহির হইয়া পড়া মন্দ কি?—কি হইবে এখানে শহরের ঘিঞ্জি ও ধোঁয়ার বেড়াজালের মধ্যে?

কিন্তু পয়সা কৈ? তাও তো পয়সা দরকার। তেলিরা কুড়ি টাকা দিয়াছিল মাতৃশ্রাদ্ধের দরুণ, নিরুপমা নিজে হইতে পনেরো, বড়-বৌ আলাদা দশ। অপু সে টাকার এক পয়সাও রাখে নাই, অনেক লোকজন খাওয়াইয়াছে। তবু তো সামান্যভাবে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ!

দশপিণ্ড দানের দিন সে কি তীব্র বেদনা! পুরোহিত বলিতেছেন—প্রেতা শ্রীসর্বজয়া দেবী—অপু ভাবে কাহাকে প্রেত বলিতেছে? সর্বজয়া দেবী প্রেত? তাহার মা, প্রীতি আনন্দ ও দুঃখ-মুহূর্তের সঙ্গিনী,...এত আশাময়ী, হাস্যময়ী, এত জীবন্ত যে ছিল কিছুদিন আগেও, সে প্রেত? সে আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূত-নিরাশ্রয়ঃ?

তারপরই মধুর আশার বাণী—আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক, পথের ধূলি মধুময় হউক, ওষধি সকল মধুময় হউক, বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষস্থিত আমাদের পিতা মধুময় হউন।

সারাদিনব্যাপী উপবাস, অবসাদ, শোকের পর এ মন্ত্র অপুর মনে সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করিয়াছিল, চোখের জল সে রাখিতে পারে নাই। হে আকাশের

দেবতা, বাতাসের দেবতা, তাই কর, মা আমার অনেক কষ্ট ক'রে গিয়েছেন, তাঁর প্রাণে তোমাদের উদার আশীর্বাদের অমৃতধারা বর্ষণ কর।

এই অবস্থায় শুধুই ইচ্ছা করে যারা আপনার লোক, যারা তাহাকে জানে ও মাকে জানিত, তাহাদের কাছে যাইতে। এক জ্যাঠাইমারা আছেন—কিন্তু তাঁহাদের সহানুভূতি নাই, তবু সেখানেই যাইতে ইচ্ছা করে। তবুও মনে হয়, হয়ত জ্যাঠাইমা মায়ের সম্বন্ধে দু'-পাঁচটা কথা বলিবেন এখন, দুটা সহানুভূতির কথা হয়ত বলিবেন—

মাস-তিনেক এভাবে কাটিল। এ তিন মাসের কাহিনী তাহার জীবনের ইতিহাসে একটা একটানা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী। ভবিষ্যৎ জীবনে অপু এ গলিটার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারে একবার বড় রাস্তা হইতে গলির মোড়ে চাহিয়া দেখিত, আর কখনও সে ইহার মধ্যে ঢোকে নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একদিন খবরের কাগজে দেখিল—যুদ্ধের জন্য লোক লওয়া হইয়াছে, পার্ক স্ট্রীটে তাহার অফিস। দুপুরে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গেল পার্ক স্ট্রীটে।

টেবিলে একরাশ ছাপানো ফর্ম পড়িয়া ছিল, অপু একখানা তুলিয়া পড়িয়া রিক্রুটিং অফিসারকে বলিল—কোথাকার জন্যে লোক নেওয়া হবে?

—মেসোপটেমিয়া, রেলওয়ে ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগের জন্য। তুমি কি টেলিগ্রাফ জানো—না মোটর মিস্ত্রী?

অপু বলিল—সে কিছুই নহে। ও-সব কাজ জানে না, তবে অন্য যে-কোন কাজ...কি কেরানীগিরি—

সাহেব বলিল—না, দুঃখিত। আমরা শুধু কাজ জানা লোক নিচ্ছি—বেশীর ভাগ মোটর ড্রাইভার, সিগন্যালার, স্টেশন মাস্টার সব।

এই অবস্থায় একদিন লীলার সঙ্গে দেখা। ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ডালহাউসি স্কোয়ারের মোড়ে সে রাস্তা পার হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সামনে একখানা হল্‌দে রঙের বড় মিনার্ভা গাড়ি ট্রাফিক পুলিসে দাঁড় করাইয়াছিল—হঠাৎ গাড়িখানার দিক হইতে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল।

সে গাড়ির কাছে গিয়া দেখিল, লীলা ও আর দুই-তিনটি অপরিচিত মেয়ে। লীলার ছোটভাই ড্রাইভারের পাশে বসিয়া। লীলা আগ্রহের সুরে বলিল—আপনি আচ্ছা তো অপূর্ববাবু? তিন-চার মাসের মধ্যে দেখা করলেন না, কেন বলুন তো? মা সেদিন আপনার কথা—

অপুর আকৃতিতে একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনার কি হয়েছে ? অসুখ থেকে উঠেছেন নাকি, শরীর—মাথাব চুল অমন ছোট-ছোট, কি হয়েছে বলুন তো ?

অপু হাসিয়া বলিল—কই না, কি হবে—কিছু তো হয় নি ?

—মা কেমন আছেন ?

—মা ? তা মা—মা তো নেই ! ফাগুন মাসে মাবা গিয়েছেন।

কথা শেষ কবিয়া অপু আর এক দফা পাগলের মত হাসিল।

হয়ত বাল্যের সে প্রীতি নানা ঘটনায়, বহু বৎসরের চাপে লীলার মনে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, হয়ত ঐশ্বর্যের আঁচ লাগিয়া সে মধুর বাল্যমন অন্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ধীরে-ধীরে, অপুর মুখেব এই অর্থহীন হাসিটা যেন একখানা তীক্ষ্ণ ছুরির মত গিয়া তাহার মনের কোন্ গোপন মণিমঞ্জুষার রুদ্ধ ঢাকনির ফাঁকটাতে হঠাৎ একটা সজোবে চাড়া দিল, এক মুহূর্ত্তে অপুর সমস্ত ছবিটা তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল—সহায়হীন, মাতৃহীন, আশ্রয়হীন, পথে-পথে বেড়াইতেছে—কে মুখের দিকে চাহিবাব আছে ?

লীলাব গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—আপনি আমাদের ওখানে কবে আসবেন বলুন—না, ও-বকম বললে হবে না। এ-কথা আমাদের জানানো আপনার উচিত ছিল না ? অন্ততঃ মাকেও বলা তো—কাল সকালে আসুন—ঠিক বলুন আসবেন ? কেমন ঠিক তো—সেবারকার মত করবেন না কিন্তু—ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা বলুন তো কি—ভুলবেন না কিন্তু—।

গাড়ি চলিয়া গেল

বাসায় ফিরিয়া অপু মনের মধ্যে অনেক তোলপাড় করিল। লীলার মুখে সে একটা কিসের ছাপ দেখিয়াছে, বর্তমান অবস্থার মত তাহার এই আন্তরিকতার স্নেহস্পর্শটুকুরই কাঙাল বটে—কিন্তু এই বেশে কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না, এই জামায়, এই কাপড়ে, এই ভাবে। থাক বরং।

তিনদিন পর নিজের নামে একখানা পত্র আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল—মা ছাড়া আব তো কাহারও পত্র সে পায় নাই। কে পত্র দিল ? পত্র খুলিয়া পড়িল :

অপূর্ববাবু,

আপনার এখানে আসবার কথা ছিল সোমবারে, কিন্তু আজ শুক্রবার হয়ে গেল আপনি এলেন না। আপনাকে মা একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আসতে

বলেছেন, না এলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় আপনার আসা চাই-ই। নমস্কার নেবেন।

লীলা

কথাটা লইয়া মনের মধ্যে সে অনেক বোঝাপড়া করিল। কি লাভ গিয়া? ওরা বড়মানুষ, কোন্ বিষয়ে সে ওদের সঙ্গে সমান যে, ওদের বাড়ি যখন তখন যাইবে? মেজ-বৌরানী যে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই কথাটা তাহার মনে অনেকবার যাওয়া-আসা করিল—সেইটা, আর লীলার আন্তরিকতা। কিন্তু মেজ-বৌরানী কি আর তার মায়ের অভাব দূর করিতে পারিবেন? তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বধূ! তাহার মায়েব আসন হৃদয়ের যে স্থানটিতে, সে শুধু তাহার দুঃখিনী মা অর্জন করিয়াছে তাহার বেদনা, ব্যর্থতা, দৈন্য-দুঃখ শত অপমান দ্বারা—ছয় সিলিণ্ডারের মিনার্ভা গাড়ি চড়িরা কোনও ধনীবধূ—হউন তিনি স্নেহময়ী, হউন তিনি মহিমাময়ী—তাঁহার সেখানে প্রবেশিকার কোথায়?

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রথম বিভাগের প্রথম সতের জনের মধ্যে তাহার নাম, বাংলাতে সকলের মধ্যে প্রথম হইয়াছে, এজন্য একটা সোনার মেডেল পাইবে। এমন কেহ নাই যাহার কাছে খবরটা বলিয়া বাহাদুরি করা যাইতে পারে। কোনও পরিচিত বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত এখানে নাই,—ছুটিতে সব দেশে গিয়াছে। জ্যাঠাইমার কাছে যাইবে?...গিয়া জানাইবে জ্যাঠাইমাকে?...কি লাভ, হয়ত তিনি বিরক্ত হইবেন, দরকার নাই যাওয়ার।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সব কলেজ খুলিয়া গেল, অপু কোনও কলেজে ভর্তি হইল না। অধ্যাপক মিঃ বসু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইতিহাসে অনার্স কোর্স লওয়াইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। অপু ভাবিল—কি হবে আর কলেজে পড়ে? সে সময়টা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাটাব, বি, এ-র ইতিহাসে এমন কোন নতুন কথা নেই যা আমি জানি নে। ও দু'বছর মিছিমিছি নষ্ট, লাইব্রেরীতে তার চেয়ে অনেক পড়ে ফেলতে পারব এখন? এ ছাড়া ভর্তির টাকা, মাইনে, এ সব পাই বা কোথায়?

একটা কিছু চাকুরি না খুঁজিলে চলে না। খবরের কাগজ বিক্রয়ের পুঁজি

অনেকদিন ফুরাইয়া গিয়াছে, মায়ের মৃত্যুর পর সে কাজে আর উৎসাহ নাই। একটা ছোট ছেলে পড়ানো আছে, তাতে শুধু দুটো ভাত খাওয়া চলে দু'বেলা —কোন মতে ইকমিক্ কুকারে আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ও ভাত। মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, তরকারী তো অনেকদিন আগে-দেখা স্বপ্নের মত মনে হয়—যাক্ সে সব, কিন্তু ঘরভাড়া, কাপড়জামা, জলখাবার, এসব চলে কিসে? তাহা ছাড়া অপুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কলিকাতার ছেলে পড়ানো বাবার মুখে শৈশবে শেখা উদ্ভট শ্লোকের পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত চপল, আজ যদি যাই কাল দাঁড়াইবার স্থান নাই!

কয়েকদিন ধরিয়া খবরের কাগজ দেখিয়া পাইওনিয়ার ড্রাগ স্টোর্সে একটা কাজ খালি দেখা গেল দিন কতক পরে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে বড় দোকান, পিছনে কারখানা, তখনও ভিড় জমিতে শুরু হয় নাই, অপু ঢুকিয়াই এক স্থূলকায় আধাবয়সী ভদ্রলোকের একেবারে সামনে পড়িল। ভদ্রলোক বলিলেন, কাকে চান?

অপু লাজুক মুখে বলিল—আজ্ঞে, চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে—তাই—

ও—! আপনি ম্যাট্রিক পাশ?

—আমি এবার আই-এ…

ভদ্রলোক পুনরায় তাকিয়ায় ভর দিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার সুরে বলিলেন —ও আই-এ পাশ নিয়ে আমরা কি করব, আমাদের লেবেলিং ও মাল বটলিং করার জন্য লোক চাই! খাটুনিও খুব, সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা, মধ্যে দেড় ঘণ্টা খাবার ছুটি, আবার বারোটা থেকে পাঁচটা, কাজের চাপ পড়লে রাত আটটাও বাজবে—

—মাইনে কত?

—আপাতত পনেরো, ওভারটাইম খাটলে দু'আনা জলখাবার—সে-সব আপনাদের কলেজের ছোকরাব কাজ নয় মশায়…আমরা এমনি মোটামুটি লোক চাই!

ইহার দিনকতক পর আর একটা চাকুরি খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়ে গেল ক্লাইভ স্ট্রীটে। দেখিল, সেটা একটা লোহা-লক্করের দোকান বাঙালীফার্ম। একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের, অত্যন্ত চুল-ফাঁপানো, টেরি-কাটা লোক ইস্ত্রি-করা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছে, মুখের নিচের দিকে গড়নে একটা কর্কশ ও স্থূলভাব, এমন ধরণের চোখের ভাবকে সে মাতাল ও কুচরিত্র লোকের সঙ্গে মনে মনে জড়িত করিয়া থাকে। লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বলিল—কি, কি এখানে?

অপু নিজেকেই অত্যন্ত ছোট বোধ হইল নিজের কাছে। সে সঙ্কুচিত স্বরে বলিল—এখানে চাকুরি খালি শুনে আসছি।

লোকটার চেহারা বড়লোকের বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল, অসচ্চরিত্র, বড় ছেলের মত। পূর্বে এ ধরণের চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, লীলাদের বাড়ি বর্ধমানে থাকিতে। এ টাইপটা সে চেনে।

লোকটা কর্কশ স্বরে বলিল—কি কর তুমি?

—আমি আই-এ পাশ—করি নে কিছু—আপনাদের এখানে—

টাইপ রাইটিং জান? না? যাও যাও, এখানে না—ও কলেজ-টলেজ এখানে চলবে না—যাও—

সেদিনকার ব্যাপারটা বাসায় আসিয়া গল্প করাতে ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্রটির এক কাকা বলিলেন—ওদের আজকাল ভারি দেমাক, যুদ্ধের বাজারে লোহার দোকানদার সব লাল হয়ে যাচ্ছে, দালালেরা পর্যন্ত দু-পয়সা ক'রে নিলে।

অপু বলিল—দালাল আমি হ'তে পারি নে?

—কেন পারবেন না, শক্তটা কি? আমার শ্বশুর একজন বড় দালাল, আপনাকে নিয়ে যাব একদিন—সব শিখিয়ে দেবেন, আপনার মত শিক্ষিত ছেলে তো আরও ভাল কাজ করবে—

মহা-উৎসাহে ক্লাইভ স্ট্রিট অঞ্চলের লোহার বাজারে দালালি করতে বাহির হইয়া প্রথম দিন-চার পাঁচ ঘোরাঘুরিই সার হইল; কেহ ভাল করিয়া কথাও বলে না, একদিন একজন বড় দোকানী জিজ্ঞাসা করিল,—বোল্টু আছে? পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ? অপু বোল্টু কাহাকে বলে জানে না, কোন্ দিকের মাপ পাঁচ জ-তাহাও বুঝিতে পারিল না। নোটবুকে টুকিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল, একটা অর্ডার তো পাইয়াছে, খুঁজিবার মতও একটা কিছু জুটিয়াছে এতদিন পরে।

পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ বোল্টু এ-দোকান ও দোকান দিন-চারেক বৃথা খোঁজা-খুঁজির পর তাহার ধারণা পৌছিল যে জিনিসটা বাজারে সুলভপ্রাপ্য নয় বলিয়াই দোকানী এত সহজে তাহাকে অর্ডার দিয়াছিল। একদিন একজন দালাল বলিল—মশাই সওয়া ইঞ্চি ঘেরের সীসের পাইপ দিতে পারেন যোগাড় ক'রে আড়াই শো ফুট? যান না অর্ডারটা নিয়ে আসুন এই পাশেই ইউনাইটেড মেশিনারী কোম্পানীর অফিস থেকে।

পাশেই খুব বড় বাড়ি। অফিসের লোকে প্রথমে তাহাকে অর্ডার দিতে চায় না, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল···মাল আমাদের এখানে ডেলিভারি দিতে পারবেন তো?···

এ কথার মানে ঠিক না বুঝিয়াই সে বলিল—হ্যাঁ তা দিতে পারব।

বহু খুঁজিয়া কলেজ স্ট্রীটের যে দোকান হইতে মাল বাহির হইল, তাহারা মাল নিজের খরচে কোথাও ডেলিভারি দিতে রাজী নয় অপু নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি লইয়া গরুর গাড়িতে সীসার পাইপ বোঝাই দেওয়াইল—রাজা উডমাণ্ড স্ট্রীটে দুপুর রৌদ্রে মাল আনিয়া হাজিরও করিল। ইউনাইটেড মেশিনারি কিন্তু গাড়ির ভাড়া দিতে একদম অস্বীকার করিল। মাল তো এখানে ডেলিভারী দিবার কথা ছিল, তবে গাড়ি-ভাড়া কিসের? অপু ভাবিল, না হয় নিজের দালালির টাকা হইতে গাড়ি ভাড়াটা মিটাইয়া দিবে এখন। এখন কাজে নামিয়া অভিজ্ঞতাই আসল, না-ই বা হইল বেশী লাভ।

সে বলিল—আমার ব্রোকারেজটা?

—সে কি মশাই, আপনি সাড়ে পাঁচ আনার ফুটে দর দিয়েছেন, আপনার দালালি নেন নি? তা কখনও হয়!—

অপু জানে না যে, প্রথম দর দিবার সময় তাহার মধ্যে দালালি ধরিয়া দিবার নিয়ম, সবাই তাহা দিয়া থাকে, সে যেও তাহা দেয় নাই, একথা কেহই বিশ্বাস করিল না। বার-বার সেই কথা তাহাদের বুঝাতেই গিয়া নিজের আনাড়ীপনাই বিশেষ করিয়া ধরা পড়িল। সীসার পাইপওয়ালা গোমস্তা তাহাদের বিল বুঝিয়া পাইয়া চলিয়া গেল—তিনদিন ধরিয়া রৌদ্রে ছুটাছুটি ও পরিশ্রম সার হইল, একটি পয়সাও তাহাকে দিল না কোন পক্ষই। খোট্টা গাড়োয়ান পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—হামারা ভাড়া কৌন দেগা?

একজন বৃদ্ধ মুসলমান দালানের একপাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, অপু অফিস হইতে বাহিরে আসিলেই সে বলিল, বাবু আপনি কত দিন এ কাজে নেমেছেন…কাজতো কিছুই জানেন না দেখছি—

অপুকে সে-কথা স্বীকার করিতে হইল। লোকটি বলিল—আপনি লেখাপড়া জানেন, ও-সব খুচরো কাজ ক'রে আপনার পোষাবে না। আপনি আমার সঙ্গে কাজে নামবেন?—বড় মেশিনারির দালালি, ইঞ্জিন, বয়লার এই সব। এক-একবারে পাঁচ-শো, সাত-শো, টাকা রোজগার হবে—বাবু ইংরেজি জানি নে ভাই, তা যদি জানতাম, এ বাজারে এতদিন গুছিয়ে…নামবেন আমার সঙ্গে?

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। গাড়োয়ানকে ভাড়াটা দণ্ড দিতে হইল, আনন্দের আতিশয্যে সেটাও গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না। মুসলমানটির সঙ্গে তাহার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল—অপু নিজের বাসার ঠিকানা দিয়া দিল। স্থির হইল, কাল সকাল দশটার সময় এইখানে লোকটি তাহার অপেক্ষা করিবে।

অপু রাত্রে শুইয়া মনে মনে ভাবিল—এতদিন পরে একটা সুবিধে জুটেছে, —এইবার হয়ত পয়সার মুখ দেখব।

কিন্তু মাসখানেক কিছুই হইল না···একদিন দালালটি তাহাকে বলিল—ছুটোর পর আর বাজারে থাকেন না, এতে কি হয় কখনও বাবু? যান কোথায়?

অপু বলিল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যাই—ছুটো—থেকে সাতটা পর্যন্ত থাকি। একদিন যেও, দেখাবো কত বড় লাইব্রেরী।

লাইব্রেরীতে ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে, কোন এক দরিদ্র ঘরের ছোট ছেলের কাহিনী পড়িতে বড় ইচ্ছা যায় সংসারে দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ—তাহাদের জীবনের অতিঘনিষ্ঠ ধরণের সংবাদ জানিতে মন যায়।

মানুষের সত্যকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁঝে, সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমক, দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাহাদের পুটুলিবাঁধা ছাতু কবে ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট হইতে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলে তাহার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল—ছ' হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নাই—থাকিলেও বড় কম—রাজা যযাতি কি সম্রাট অশোকের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প সবাই শৈশব হইতে মুখস্থ করে—কিন্তু ভারতবর্ষের, গ্রীসের, রোমের যব, গম ক্ষেতের ধারে, ওলিভ, বন্যদ্রাক্ষা মার্টল ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে প্রতিদিনের জীবন, হাজার হাজার বছর ধরিয়া প্রতি সকালে সন্ধ্যায় যাপিত হইয়াছে··তাহাদের সুখ-দুঃখ আশানিরাশার গল্প, তাহাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস সে জানিতে চায়।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ঐতিহাসিকাদর লেখা পাতায় সম্মিলিখিত সৈন্যব্যূহের এই আড়ালটা সরিয়া যায়, সারি বাঁধা বর্শার অরণ্যের ফাঁকে দূর অতীতের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ি নজরে আসে। অজ্ঞাতনামা কোন লেখকের জীবন-কথা, কি কালের স্রোতে কূলে-লাগা একটুকরা পত্র, প্রাচীন মিশরের কোন্ কৃষক পুত্রকে শস্য কাটিবার কি আয়োজন করিতে লিখিয়াছিল, ··বহু হাজার বছর পর তাদের টুকরা ভূগর্ভে প্রোথিত মৃণ্ময়-পাত্রের মত দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ ধরণের, আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চায় সে। মানুষ, মানুষের বুকের কথা জানিতে চায়। আজ যা তুচ্ছ, হাজার বছর পরে তা মহাসম্পদ। ভবিষ্যতের সত্যকার ইতিহাস হইবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস।

আজ একটা দিক তাহার চোখে পড়ে। একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কাছে—মহাকালের এই মিছিল। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস, গিবন ভ্রমশূন্য লিখিয়াছিলেন, কি অন্য কেহ ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে তাহার তত কৌতূহল নাই, সে শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের এই বিরাট মিছিলে। হাজার যুগ আগেকার কত রাজা, রাণী, সম্রাট, মন্ত্রী, খোজা, সেনাপতি, বালক, যুবা, কত অশ্রুনয়না তরুণী, কত অর্থলিপ্সু রাজপুরুষ—যাহারা অর্থের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা বোধ করে নাই—অনন্তকাল-সমুদ্রে ইহাদের ভাসিয়া যাওয়ার, বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাওয়ার দিক্‌টা। কোথায় তাহাদের বৃথা শ্রমের পুরস্কার, তাদের অর্থলিপ্সার সার্থকতা ?

এদিকে ছুটাছুটিই সার হইতেছে—কাজে কিছুই হয় না। সে তো চায়-না বড়মানুষ হইতে—খাওয়া-পরা চলিয়া গেলেই সে খুশী—পড়াশুনা করার সে সময় পায় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু তাও তো হয় না, টুইশানি না থাকিলে একবেলা আহারও জুটিত না যে। তা ছাড়া এ জায়গার আবহাওয়াই তাহার ভাল লাগে না আদৌ। চারিধারে অত্যন্ত হুঁশিয়ারী, দর-কষাকষি,...শুধু টাকা...টাকা...টাকা সংক্রান্ত কথাবার্তা—লোকজনের মুখে ও চোখের ভাব ইতর ও অশোভন লোভ যেন উগ্রভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে—এদের পাকা বৈষয়িক কথাবার্তায় ও চালচলনে অপু ভয় খাইয়া গেল। লাইব্রেরীর পরিচিত জগতে আসিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে প্রতিদিন।

একদিন মুসলমান দালালটি বাজারে তাহার কাছে দুইটি টাকা ধার চাহিল। বড় কষ্ট যাইতেছে, পরে সপ্তাহেই দিয়া দিবে এখন। অপু ভাবিল—হয়ত বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, রোজগার নাই এক পয়সা। অর্থাভাবের কষ্ট যে কি সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে এই বৎসরে—নিজের বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্যে না থাকিলেও একটি টাকা বাসা হইতে আনিয়া পরদিন বাজারে লোকটাকে দিল।

ইহার দিন সাতেক পর অপু সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ঘরের দোরে কাহার ধাক্কার শব্দ পাইল, দোর খুলিয়া দেখিল—মুসলমান দালালটি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া।

—এসো, এসো আবদুল, তারপর খবর কি ?

—আদাব বাবু, চলুন, ঘরের মধ্যে বলি। এ-ঘরে আপনি একলা থাকেন, না আর কেউ—ওঃ—বেশ ঘর তো বাবু।

—এসো বসো। চা খাবে?

চা-পানের পর আবদুল আসিবার উদ্দেশ্যে বলিল। বারাকপুরে একটা বড বয়লারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ধরণের বয়লারেরই আবার এদিকে একটা খরিদ্দার জুটিয়া গিয়াছে, কাজটা লাগাইতে পারিলে তিনশো টাকার কম নয়—একটা বড দাঁও। কিন্তু মুশকিল দাঁড়াইয়াছে এই যে, এখনই বারাকপুরে গিয়া বয়লারটি দেখিয়া আসা দরকার এবং কিছু বায়না দিবারও প্রয়োজন আছে—অথচ তাহার হাতে একটা পয়সাও নাই। এখন কি করা?

অপু বলিল—খদ্দের মাল ইন্‌স্পেক্‌শনে যাবে না?

—আগে আমরা দেখি, তবে তো খদ্দেরকে নিয়ে যাব?—দেড পার্সেণ্ট ক'রে ধরলেও সাড়ে চারশো। টাকা থাকবে আমাদের—খদ্দের হাতের মুঠোয় রয়েছে—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন—এখন টাকার কি করি?

অপু পূর্বদিন টুইশনির টাকা পাইয়াছিল, বলিল—কত টাকার দরকার? আমি তো ছেলে পড়ানোর মাইনে পেয়েছি—কত তোমার লাগবে বলো।

হিসাবপত্র করিয়া আট টাকা পড়িবে দেখা গেল। ঠিক হইল—আবদুল এবেলা বয়লার দেখিয়া আসিয়া ওবেলা বাজারে অপুকে সব খবর দিবে। অপু বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া আবদুলের হাতে দিল।

বৈকালে সে পাটের এক্সচেঞ্জের বারান্দাতে বেলা পাচটা পর্যন্ত আগ্রহের সহিত আবদুলের আগমন প্রতীক্ষা করিল। আবদুল সেদিন আসিল না পরদিনও তাহার দেখা নাই। ক্রমে ক্রমে একে একে সাত আটদিন কাটিয়া গেল —কোথায় আবদুল? সারা বাজার ও রাজা উডমাণ্ড ষ্ট্রীটের লোহার দোকান আগাগোড়া খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান মিলিল না। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একজন দোকানদার শুনিয়া বলিল—কত টাকা নিয়েছে আপনার মশাই! আবদুল তো? মশাই জোচ্চোরের ধাড়ী—আর টাকা পেয়েছেন···টাকা নিয়ে সে দেশে পালিয়েছে—আপনি যেমন!···

প্রথম সে বিশ্বাস করিল না। আবদুল সে রকম মানুষ নয়, তাহা ছাড়া এত লোক থাকিতে তাহাকে কেন ঠকাইতে যাইবে?

কিন্তু এ ধারণা বেশীদিন টিকিল না। ক্রমে জানা গেল আবদুল দেশে যাইবে বলিয়া যাহার কাছে সামান্য কিছু পাওনা ছিল, সব আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে দিন-সাতেক আগে। কাঁটাপেরেকের দোকানের বৃদ্ধ বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—আশ্চর্য্যি কথা মশাই, সবাই জানে আবদুলের কাণ্ডকারখানা আর আপনি তাকে চেনেন নি দু-তিনমাসেও? রাধে-কৃষ্ট! ব্যাটা জুয়াচোরের ধাড়ী হার্ডাওয়ারের বাজারে সবাই চিনে ফেলেছে, এখানে

আর সুবিধে হয় না, তাই গিয়ে আজকাল জুটেছে মেশিনারির বাজারে। কোনও দোকানে তো আপনার একবার জিজ্ঞেস করাও উচিত ছিল। হার্ডওয়ারের দালালি কথা কি আপনার মত ভালোমানুষের কাজ মশাই? আপনার অল্প বয়স; অন্য কাজ কিছু দেখে নিন গে। এখানে কথা বেচে খেতে হবে, সে আপনার কর্ম নয়, তবু ভাল যে আটটা টাকার ওপর দিয়ে গিয়েছে—

আট টাকা বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে যতই তুচ্ছ হউক অপুর কাছে তাহা নয়। ব্যাপার বুঝিয়া চোখে অন্ধকার দেখিল—গোটা মাসের ছেলে পড়ানোর দরুণ সব টাকাটাই যে সে তুলিয়া দিয়াছে আবদুলের হাতে। এখন সারা মাস চলিবে কিসে। বাড়ি ভাড়ার দেনা, গত মাসের শেষে বন্ধুর কাছে ধার—এ সবের উপায়?

দিশাহারা ভাবে পথ চলিতে চলিতে সে ক্লাইভ স্ট্রীটে শেষে মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল। দালাল ও ক্রেতাদের চিৎকার, মাড়োয়ারীদের ভিড ও ঠেলাঠেলি, থর্নিক্রফ্‌ট ছ' আনা, থর্নিক্রফ্‌ট আনা, নাগবমল্‌ সাড়ে পাঁচ আনা—বেজায় ভিড, বেজায় হৈ-চৈ, লালদীঘির পাশ কাটাইয়া লাটসাহেবের বাড়ির সম্মুখ দিয়া সে একেবারে গড়ের মাঠের মধ্যে কেল্লার দক্ষিণে একটা নির্জন স্থানে একটা বড় বাদাম গাছের ছায়ায় আসিয়া বসিল।

আজই সকালে বাড়িওয়ালা একবার তাগাদা দিয়াছে, কাপড একেবারে নাই, না কুলাইলেও ছেলে পড়ানোর টাকা হইতে কাপড কিনিবে ঠিক করিয়াছিল, রুম-মেট তো নিত্য ধারের জন্য তাগাদা করিতেছে। আবদুল শেষকালে এভাবে ঠকাইল তাহাকে? চোখে তাহার জল আসিয়া পড়িল—দুঃখদিনের সাথী বলিয়া কত বিশ্বাস যে করিত সে আবদুলকে।

অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দুপুর, বেলা দেড়টা আন্দাজ। কেহ কোন দিকে নাই, আকাশ মেঘযুক্ত, দূরপ্রসারী নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত চিল উড়িয়া চলিয়াছে···দূর হইতে দূরে সেই ছেলেবেলার মত ছোট হইতে ক্রমে মিলাইয়া চলিয়াছে। একজন ঘেসেড়া বর্ষার লম্বা লম্বা ঘাস কাটিতেছে। ছোট একটি খোট্টাদের মেয়ে ঝুড়িতে ঘুঁটে কুড়াইতেছে।···দূরে খিদিরপুরের ট্রাম যাইতেছে···গঙ্গার দিকে বড় একটা জাহাজের চোঙ—ফোর্টের বেতারের মাস্তল—এক···দুই—তিন—চার—আকাশ কি ঘন নীল!—এই তো চারিধারের মুক্ত সৌন্দর্য এই কম্পমান শ্রাবণ দুপুরের খররৌদ্র—বিদ্যুৎ—সূর্য—রাত্রির তারা—প্রেম—মা—দিদি—অনিল—মাথার উপরে নিঃসীম নীল আকাশ—মৃত্যুপারের দেশ—চিররাত্রির

অন্ধকার যেখানে সাঁই সাঁই রবে ধূমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ দুলাইয়া উড়িয়া চলে—গ্রহ ছোটে, চন্দ্রসূর্য লাটিমের মত আপনার বেগে আপনি ঘুরিয়া বেড়ায় —তুহিন শীতল ব্যোমকেশ দূরে দূরে দেবলোকের মেরু-পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে তারারা মিট মিট করে—এই পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে জন্ম লইয়া আটটা টাকা··· তুচ্ছ আট টাকা—এ কোন্ বিচিত্র !—কিসের খনিক্রফ্‌ট আর নাগরমল ?

কখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, কখন একটু দূরে একটা ফুটবল টিমের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল—একটা বল ডুম্ করিয়া তাহার একেবারে সামনে আসিয়া পড়াতে তাহার চমক ভাঙিল। উঠিয়া সে বলটা দু'হাতে ধরিয়া সজোরে একটা লাথি মারিয়া সেটাকে ধাবমান লাইন্‌স্‌ম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

একদিন পথে হঠাৎ প্রণবের সঙ্গে দেখা। দুইজনেই ভারী খুশী হইল। সে কলিকাতায় আসিয়া পর্যন্ত অপুকে কত জায়গায় খুঁজিয়াছে, প্রথমটা সন্ধান পায় নাই, পরে জানিতে পারে অপূর্ব পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চাকুরিতে ঢুকিয়াছে। প্রণব রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বৎসর খানেক হাজতভোগের পর সম্প্রতি খালাস হইয়াছে. হাসিয়া বলিল—কিছুদিন গভর্ণমেণ্টের অতিথি হয়ে এলুম রে, এসেই তোর কত খোঁজ করেছি—তারপর, কোথায় চাকরি করিস্ মাইনে কত ?

অপু হাসিমুখে বলিল—খবরের কাগজের অফিসে, মাইনে সত্তর টাকা !

সর্বৈব মিথ্যা। টাকা চল্লিশেক মাইনে পায়, কি একটা ফণ্ড বাবদ কিছু কাটিয়া লওয়ার পর হাতে পৌঁছায় তেত্রিশ টাকা ক' আনা। একটু গর্বের সুরে বলিল, চাকরি সোজা নয়, রয়টারের বাংলা করার ভার আমার ওপর —বুধবারের কাগজে 'আর্ট ও ধর্ম বলে' লেখাটা আমার, দেখিস পড়ে।

প্রণব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুই ধর্মের সম্বন্ধে লিখতে গেলি কি নিয়ে রে ! কি জিনিস তুই—

—ওখানেই তোমার গোলমাল। ধর্ম মানে তুই যা বলতে চাইছিস, সেটা হচ্ছে collective ধর্ম, আমি বলি ওটার প্রয়োজনীয়তা ছিল আদিম মানুষের সমাজে, আর একটা ধর্ম আছে, যা কিনা নিজের নিজের, আমার ধর্ম আমার, তোমার ধর্ম তোমার, এইটের কথাই আমি—যে ধর্ম আমার নিজের তা যে আর কারো নয়, তা আমার চেয়ে কে ভাল বোঝে ?

—বৌবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা হবে না, আয় গোলদীঘিতে লেকচার দিবি।

—শুনবি তুই? চল্ তবে—

গোলদীঘিতে আসিয়া দুজনে একটা নির্জন কোণ বাছিয়া লইল। প্রণব বলিল—বেঞ্চের উপর দাঁড়া উঠে।

অপু বলিল—দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু লোক জমবে না তো? তা হ'লে কিন্তু আর একটা কথাও বলব না।

তারপর আধঘণ্টাটাক অপু বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃত দিয়া গেল। সে নিষ্কপট ও উদার—যা মুখে বলে মনে মনে তারা বিশ্বাস করে। প্রণব শেষ পর্যন্ত শুনিবার পর ভাবিল—এসব কথা নিয়ে খুব তো নাড়াচাড়া করেছে মনের মধ্যে? একটু পাগলামির ছিট্ আছে, কিন্তু ওকে ঐজন্যেই এত ভালবাসি।

অপু বেঞ্চ হইতে নামিয়া বলিল—কেমন লাগ্‌ল?—

—তুমি খুব sincere, যদিও একটু ছিট্‌গ্রস্ত—

অপু লজ্জামিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিল—যাঃ

প্রণব বলিল—কিন্তু কলেজটা ছেড়ে ভাল কাজ করিস নি, যদিও আমি জানি, তাই' সেদিন বিনয়কে বল্‌ছিলাম যে অপূর্ব কলেজে না গিয়েও যা পড়াশুনা করবে, তোমরা দু'বেলা কলেজের সিমেণ্ট ঘষে ঘষে উঠিয়ে ফেললেও তা হবে না! ওর মধ্যে একটা সত্যিকার পিপাসা রয়েছে যে—

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অপু খুব খুশী—বালকের মত খুশী। উজ্জ্বলমুখে বলিল—অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, চল তোকে কিছু খাওয়াইগে—কলেজমেট্‌দের আর কারুর দেখা পাইনে—আমোদ করা হয় নি কতদিন যে—মা মারা যাওয়ার পর থেকে তো···

প্রণব বিস্ময়ের সুরে বলিল—মা মারা গিয়েছেন!

—ওঃ, সে কথা বুঝি বলি নি? সে তো প্রায় এক বছর হ'তে চলল—

সামনেই একটা চায়ের দোকান। অপু প্রণবের হাত ধরিয়া সেখানে ঢুকিল। প্রণবের ভারি ভাল লাগিল অপুর এই অত্যন্ত খাঁটি ও অকৃত্রিম, আগ্রহভরা হাত ধরিয়া টানা। সে মনে মনে ভাবিল—এরকম warmth আর sincerity ক'জনের মধ্যে পাওয়া যায়? বন্ধু তো মুখে অনেকেই আছে—অপু একটা জুয়েল।

অপু বলিল—খাবি বল?···এই বেয়ারা, কি আছে ভাল?

খাইতে খাইতে প্রণব বলিল—তারপর চাকরির কথা বল—যে বাজার—কি ক'রে জোটালি?

অপু প্রথমে লোহার বাজারের দালালির গল্প করিল। হাসিয়া বলিল—

তারপর আবদুলের মহানিষ্ক্রমণের পরে হার্ডওয়ার আর জমলো না—ঘুরে ঘুরে বেড়াই চাকরি খুঁজে বুঝলি—একদিন একজন বললে, বি-এন-আর অফিসে অনেক নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—গেলুম সেখানে। খুব লোকের ভিড়, চাকরি অনেক খালি আছে, ইংরিজি লিখতে পড়তে পারলেই চাকরি হচ্ছে। ব্যাপার কি, শুনলাম মাস-দুই হ'ল স্ট্রাইক চল্‌ছে—তাদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হচ্ছে—

প্রণব চায়ে চুমুক দিয়া বলিল—চাকরি পেলি ?

—শোন্ না, চাকরি তখুনি হয়ে গেল, প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটটাই কাজের হ'ল, তখুনি ছাপানো ফর্মে য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়ে দিলে, বাইরে এসে ভারি আনন্দ হল মনটাতে। চল্লিশ টাকা মাইনে, যেতে হবে গঞ্জাম জেলায়, অনেকদূর, যা ঠিক চাই তাই—বেণ্টিক স্ট্রীটের মোড়ে একটা চায়ের দোকানে বসে মনের খুশীতে উপরি উপরি চার কাপ চা খেয়ে ফেললাম—ভাবলাম এতদিন পর পয়সার কষ্টটা তো ঘুচ্‌ল ? আর কি খাবি ? এই বেয়ারা আর দুটো ডিম ভাজা—না-না খা—

—দু'দিন চাকরি হয়েছে বলে বুঝি—তোর সেই পুরানো রোগ আজও—হাঁ। তারপর ?

—তারপর বাড়ি এসে রাতে শুয়ে শুয়ে মনটাতে ভাল বললে না—ভাবলাম, ওরা একটা সুবিধে আদায় করবার জন্য স্ট্রাইক করেছে, দু'মাস তাদেরও ছেলে-মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের মুখের ভাতের থালা কেড়ে খাব শেষকালে ?—আবার ভাবি যাই চলে, অতদূর কখনো দেখি নি, তা ছাড়া মা মারা যাওয়ার পর কলকাতা আর ভাল লাগে না, যাইগে--কিন্তু শেষ পর্যন্ত—ফের ওদের অফিসে গেলাম—ছাপানো ফর্মখানা ফেরত দিয়ে এলাম, বলে এলাম আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না—

প্রণব বলিল—তোর মুখ আর চোখ look full of music and poetry. —প্রথম থেকে আমি জানি এ একজন আইডিয়ালিস্ট ছোকরা—তোদের দিয়েই তো এসব হবে···তোর এ খবরের কাগজে কাজ কখন ?

—রাত ন'টার পর যেতে হয়, রাত তিনটের পর ছুটি। ভারি ঘুম পায়, এখনও রাত জাগা অভ্যেস হয় নি, তবে সুবিধে আছে, সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নি, সারাদিন লাইব্রেরীতে কাটাতে পারি—

খাওয়া-দাওয়া ভালই হইল। অপু বলিল—জল খাস নে—চল্ কলেজ স্কোয়ারে শরবৎ খাব—বেশ মিষ্টি লাগে খেতে। লেমন স্কোয়াস খেয়েছিস—আয়,—

কলেজের অত ছেলের মধ্যে এক অনিল ও প্রণব ছাড়া সে আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, অনেকদিন পরে মন খুলিয়া আলাপের লোক পাইয়া তাহার গল্প আর ফুরাইতে ছিল না। বলিল, গাছপালা যে কতদিন দেখি নি, ইট আর সিমেণ্ট অসহ্য হয়ে পড়েছে। আমাদের অফিসে একজন কাজ করে, তার বাড়ি হাওড়া জেলা, সেদিন বলছে, বাড়ির বাগানে আগাছা বেড়ে উঠেছে, তাই সাফ করছে রবিবারে-রবিবারে। আমি তাকে বলি, কি গাছ মিস্ত্রির মশাই? সে বলে—কিছু না, ঝুপি গাছ। আমি বলি—বলুন না, কি কি গাছ? রোজ সোমবারে সে বাড়ি থেকে এলে তাকে এই কথা জিগ্যেস করি—সে হয় ভাবে, আচ্ছা পাগল! রাত্রে, ভাই, সারারাত প্রেসের ঘড়-ঘড়ানি, গরম, প্রিণ্টারের তাগাদার মধ্যে আমার কেবল মিস্ত্রির মশায়ের বাড়ির সেই ঝুপি বনের কথা মনে হয়—ভাবি কি কি না জানি গাছ। এদিকে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে, রাত একটার পর শরীর এলিয়ে পড়তে চায়, শরীরের বাঁধন যেন ক্রমে আলগা হয়ে আসে, কুঁজোর জল চোখে মুখে ঝাপ্‌টা দিয়ে ফুলো-ফুলো রাঙা-রাঙা, জ্বালা-করা চোখে আবার কাজ করতে বসি—ইলেক্‌ট্রিক বাতিতে যেন চোখে ছুঁচ বেঁধে—আর এত গরমও ঘরটাতে!

পরে সে আগ্রহের স্বরে বলিল—একদিন রবিবারে চল তুই আর আমি কোনও পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাঠে, বনের ধারে ধারে সারাদিন বেড়িয়ে কাটাব—বেশ সেখানেই লতা-কাঠি কুড়িয়ে আমরা রাঁধব—বিকেল হবে—পাখীর ডাক যে কতকাল শুনি নি! দোয়েল কি বৌ-কথা-কও, এদের ডাক তো ভুলেই গিয়েছি, রবিবার দিনটা ছুটি, চল্ যাবি—এখন কত ফুল ফোটারও সময়—আমি অনেক বনের ফুলের নাম জানি, দেখিস্ চিনিয়ে দেব। যাবি প্রণব চল আজ থিয়েটার দেখি? স্টারে 'সধবার একাদশী' আছে—যাবি?

নিজেই দু'খানা গ্যালারির টিকিট কিনিল—থিয়াটার ভাঙিলে অনেক রাত্রিতে ফিরিবার পথে অপু বলিল—কি হবে বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে; আজ বসে গল্প ক'রে রাত কাটাই। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারের কাছে আসিয়া অপু বন্ধুর হাত ধরিয়া রেলিং টপকাইয়া স্কোয়ারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল—আয় আয় এই বেঞ্চিটাতে বসি, আমি নিমচাঁদের পার্ট প্লে করব, দেখবি—

প্রণব হাসিয়া বলিল—তোর মাথা খারাপ আছে—এত রাতে বেশী চেঁচাস্ নি—পুলিশ এসে তাড়িয়ে দেবে—কিন্তু খানিকটা পর প্রণবও মাতিয়া উঠিল। দু'জনে হাসিয়া আবোল-তাবোল বকিয়া আরও ঘণ্টাখানেক কাটাইল। অপু একটা বেঞ্চির উপরে গড়াগড়ি দিতেছিল ও মুখে নিমচাঁদের অনুকরণে ইংরাজি কি কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—প্রণবের ভয়সূচক স্বরে উঠিয়া বসিয়া চাহিয়া

দেখিল ফুটপাথের উপর একজন পাহারাওয়ালা। অমনি সে বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—Hail, Holy Light! Heaven's First born!—পরে দু'জনেই ডাফ্‌ স্ট্রীটের দিকের রেলিং টপকাইয়া সোজা দৌড় দিল।

রাত্রি আর বেশী নাই। আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা বড় লাল বাড়ির পৈঠায় অপু গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—কোথায় আর যাবো—আয় বোস্ এখানে—

প্রণব বলিল—একটা গান ধর তবে—

অপু বলিল—বাড়ির লোকে দোর খুলে বেরিয়ে আসবে—কোন রকমে পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি—

—কেমন পাহারাওয়ালাটাকে চেঁচিয়ে বললুম—Hail, Holy Light! —হি-হি—টেরও পায় নি? কোথা দিয়ে পালালুম—নিমচাঁদের মত হয় নি? —হি-হি—

প্রণব বলিল—তোর মাথায় ছিট আছে—যাঃ সারা রাতটা ঘুম হ'ল না তোর পাল্লায় পড়ে—গা একটা গানই গা—আস্তে আস্তে ধর—আবার হাসে, যাঃ—

ইহার দিন-পনেরো পরে একদিন প্রণব আসিয়া বলিল—তোকে নিয়ে যাব বলে এলাম—আমার মামাতো বোনের বিয়ে হবে সোমবারে, শুক্রবার রাত্রে আমরা যাব, খুলনা থেকে স্টীমারে যেতে হয়, অনেকদিন কোথাও যাস নি, চল আমার সঙ্গে, দিন-চার-পাঁচের ছুটি পাবি নে?

ছুটি মিলিল। ট্রেনে উঠিবার সময় তাহার ভারি আনন্দ। অনেকদিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, অনেকদিন রেলেও চড়ে নাই। সকালবেলা স্টীমারে উঠিবার সময় ভৈরবের ওপার হইতে তরুণ সূর্য ওঠার দৃশ্যটা তাহাকে মুগ্ধ করিল। নদী খুব বড় ও চওড়া, প্রণবের মামার বাড়ির ঘাটে ধরে না, পাশের গ্রামে নামিয়া নৌকায় যাইতে হয়। অপু এ অঞ্চলে কখনও আসে নাই, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, নদীর ধারে সুপারির সারি, বাঁশ, বেত-বন, অসংখ্য নারিকেল গাছ। টিনের চালাওয়ালা গোলা গঞ্জ। অদ্ভুত ধরণের নাম স্বরূপকাটি, যশাইকাটি।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ও খাড়া পশ্চিম, দু'দিক হইতে প্রকাণ্ড দু'টা নদী আসিয়া পরস্পরকে ছুঁইয়া অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানটাতে জলের রং ঈষৎ সবুজ এবং এই সঙ্গমস্থানেরই ও-পারে আধ মাইলের মধ্যে প্রণবের মামার বাড়ির গ্রাম গঙ্গানন্দকাটি।

নদীর ঘাট হইতে বাড়িটা অতি অল্প দূরে! এ গ্রামের মধ্যে ইহারাই অবস্থাপন্ন সম্রান্ত গৃহস্থ!

অনেকবার অপু এ ধরণের বাড়ির ছবি কল্পনা করিয়াছে, এই ধরণের বড় নদীর ধারে, শহর-বাজারের ছোঁয়াচ ও আবহাওয়া হইতে বহু দূরে, কোন এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে সম্ভ্রান্ত গৃহ, আগে অবস্থা ভাল ছিল, অথচ এখন নাই, নাট মন্দির, পূজার দালান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, সবই থাকিবে, অথচ সে-সব হইবে ভাঙা, শ্রীহীন—আর থাকিবে প্রাচীন ধনীবংশের শান্ত মর্যাদা-বোধ, মান সম্মান, উদারতা! প্রণবের মামার বাড়ির সঙ্গে যেন হুবহু মিলিয়া গেল।

ঘাট হইতে দুই সারি নারিকেল গাছ সোজা একেবারে বাড়ির দেউড়িতে গিয়া শেষ হইয়াছে, বাঁয়ে প্রকাণ্ড পূজার দালান, ডাইনে হলুদ রঙের কলসী বসানো ফটক ও ফুলবাগান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, নাটমন্দির। খুব জৌলুস নাই কোনটারই, কার্নিস খসিয়া পড়িতেছে, একরাশ গোলাপায়রা নাটমন্দিরের মেজেতে চরিয়া বেড়াইতেছে, এক-আধটা ঝটাপট করিয়া ছাদে উড়িয়া পালাইতেছে, একখানা গোল-বেহারার সেকেলে হাঙরমুখো পালসি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে! দেখিয়া মনে হয়—এক সময় ইহাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, বর্তমানে পসারহীন ডাক্তারের দ্রাবসংযুক্ত অনাদৃত পিতলের পাতের মত শ্রীহীন ও মলিন।

'পুলু এসেছে, পুলু এসেছে'—'এই যে পুলু'—'এটি কে সঙ্গে?' 'ও! বেশ বেশ, স্টীমার কি আজ লেট?···ওরে নিবারণকে ডাক, ব্যাগটা বাড়ির মধ্যে নিয়ে যা, আহা থাক্ এসো এসো দীর্ঘজীবী হও।'

প্রণব তাহাকে একেবারে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। অপু অপরিচিত বাড়ির মধ্যে অন্দরমহলে যথারীতি অত্যন্ত লাজুক মুখে ও সঙ্কোচের সহিত ঢুকিল। প্রণবের বড় মামীমা আসিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন—এ ছেলেটিকে কোত্থেকে আনলি পুলু? এ মুখ যেন—

প্রণব হাসিয়া বলিল—কি ক'রে চিনবেন মামীমা? ও কি আর বাঙ্গাল দেশের মানুষ?

প্রণবের মামীমা বলিলেন—তা নয় রে, কতবার পটে আঁকা ছবি দেখেছি, ঠাকুরদেবতার মুখের মত মুখ—এসো এসো দীর্ঘজীবী হও—

প্রণবের দেখাদেখি অপুও পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

—এসো এসো, বাবা আমার এসো—কি সুন্দর মুখ—দেশ কোথায় বাবা?

সন্ধ্যার পর সারাদিনের গরমটা একটু কমিল। দেউড়ির বাহিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, চারিদিকে শাঁখ বাজিল। উপরের খোলাছাদে

শীতলপাটি পাতিয়া অপু একা বসিয়া ছিল, প্রণব ঘুম হইতে সন্ধ্যার কিছু আগে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। কেমন একটা নতুন ধরণের অনুভূতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—কি সেটা? কে জানে, হয়ত শাঁখের রব বা আরতির বাজনার দরুণ—কিংবা হয়ত…

মোটের উপর এ এক অপরিচিত জগৎ। কলিকাতার কর্মব্যস্ত, কোলাহল-মুখর ধূমধূলিপূর্ণ আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভিন্ন জীবনধারার জগৎ।

নারিকেলশ্রেণীর পত্রশীর্ষে নবমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, এইমাত্র ফুটিল, অপু লক্ষ্য করে নাই। কি কথা যেন সব মনে আসে। অনেকদিনের কথা।

পিছন হইতে প্রণব বলিল—কেমন, গাছপালা গাছপালা ক'রে পাগল দেখলি তো গাছপালা নদীতে আসতে? কি রকম লাগল বল শুনি—

অপু বলিল—সে যা লাগল তা লাগল—এখন কি মনে হচ্ছে জানিস্ এই আরতি শুনে? ছেলেবেলায়, আমার দাদু ছিল ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁর মুখে শুনতাম, 'বংশী বটতট কদম্ব নিকট, কালিন্দী ধীর সমীর'—যেন—

সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রণব ডাকিয়া বলিল—কে রে? মেনী? শোন্—

একটি তেরো-চৌদ্দ বছরের বালিকা হাসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—কে, কে রে? মেয়েটি পিছন ফিরিয়া কাহাদের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—সবাই আছে, ননী-দি, দাসী-দি, মেজ-দি, সরলা—তাস খেলব চিলেকোঠার ঘরে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এ বাড়ির মেয়ে-ছেলে সবাই দেখতে ভারি সুন্দর, তো?

প্রণব বলিল—এটি মামার ছোট মেয়ে, এরই মেজ বোনের বিয়ে। ক' বোনের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে সুশ্রী—মেনী ডাক তো একবার অপর্ণাকে?

মেনী সিঁড়িতে গিয়া কি বলিতেই একটা সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল, অল্পক্ষণ পরেই একটি ষোল-সতেরো বছরের নতমুখী সুন্দরী মেয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—ও আমার বন্ধু, তোরও সুবাদে দাদা—লজ্জা কাকে এখানে রে? মামার মেজ মেয়ে অর্পণা—এরই—

মেয়েটি চপলা নয়, মৃদু হাসিয়া তখনই সরিয়া গেল, কি সুন্দর এক ঢাল চুল! কিছু দিন আগে পড়া একটা ইংরাজী উপন্যাসের একটা লাইন বার বার তাহার মনে আসিতে লাগিল—Do they breed goddesses at Slocum Magna? Do…they…breed…goddesses at Slocum Magna?

এ রাতটার কথা অপুর চিরকাল মনে ছিল।

পরদিন প্রণবের সঙ্গে অপু তাহার মামার বাড়ির সবটা ঘুরিয়া দেখিল। প্রাচীন ধনীবংশ বটে। বাড়ির উত্তর দিকে পুরাতন আমলের আবাস-বাটি ও প্রকাণ্ড সাতদুয়ারী পূজার দালান ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ওপারে অন্যতম শরীক রামদুর্লভ বাঁড়ুয্যের বাড়ি। পুরাতন আমলের বসতবাটি বর্তমানে পরিত্যক্ত, রামদুর্লভের ছোট ভাই সেখানে বাস করিতেন। কি কারণে তাঁহার একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা বেচিয়া-কিনিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন।

এ সব কথা প্রণবের মুখেই ক্রমে ক্রমে শোনা গেল।

স্নানের সময়ে সে নদীতে স্নান করিতে চাহিলে সকলেই বারণ করিল—এখানকার নদীতে এ সময়ে কুমীরের উৎপাত খুব বেশী, পুকুরে স্নান করাই নিরাপদ?

বৈকালে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাছারী-বাড়ির বারান্দাতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, দিন-পনেরো পূর্বে নিকটস্থ কোন গ্রামের জনৈক তাঁতির ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, সম্প্রতি তাহাকে বায়মঙ্গলের এক নির্জন চরে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছেলেটি বলে, তাহাকে নাকি পরীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রমাণস্বরূপ সে আঁচলের খুঁট খুলিয়া কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ ও জায়ফল বাহির করিয়া দেখাইয়াছে, এ-অঞ্চলের ত্রিসীমানায় এ সকলের গাছ নাই—পরী কোথা হইতে আনিয়া উপহার দিয়াছে।

প্রণবের মামীমা দুপুরে কাছে বসিয়া দুজনকে খাওয়াইলেন, অনেকদিন অপুর অদৃষ্টে এত যত্ন আদর বা এত ভাল খাওয়া-দাওয়া জোটে নাই। চিনি, ক্ষীর, মশলা, কর্পূর, ঘৃত, জীবনে কখনও তাহাদের দরিদ্র গৃহস্থালীতে এ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। মায়ের সংসারে চালের গুঁড়া, গুড় ও সরিষার তৈলের কারবার ছিল বেশী।

অপরাজিত — একাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বিবাহ। সকাল হইতে নানা কাজে সে বাড়ির ছেলের মত খাটিতে লাগিল। নাটমন্দিরে বরাসন সাজানোর ভার পড়িল তাহার উপর। প্রাচীন

আমলের বড় জাজিম ও সতরঞ্চির উপর সাদা চাদর পাতিয়া ফরাস বিছানো, কাচের সেজ ও বাতির ডুম টাঙ্গানো, দেবদারু পাতার ফটক বাঁধা, কাগজ কাটিয়া দম্পতির উদ্দেশ্যে আশীষবাণী রচনা, সকাল আটটা হইতে বেলা তিনটা পর্যন্ত এসব কাজে কাটিল।

সন্ধ্যার সময় বর আসিবে। বরের গ্রাম এ নদীরই ধারে, তবে দশ বারো ক্রোশ দূরে, নদীপথেই আসিতে হইবে। বরের পিতা ও-অঞ্চলের নাকি বড গাঁতিদার, তাহা ছাড়া বিস্তৃত মহাজনী কারবারও আছে।

বরের নৌকা আসিতে একটু বিলম্ব হইতে পারে, প্রথম লগ্নে বিবাহ যদি না হয় রাত্রি দশটার লগ্ন বাদ যাইবে না।

ব্যাপার বুঝিয়া অপু বলিল—রাত তো আজ জাগতেই হবে দেখছি, আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নি ভাই, বর এলে আমাকে ডেকে তুলো এখন।

প্রণব তাহাকে তেতলার চিলে-কোঠার ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—এখানে হৈ-চৈ কম, এখানে ঘুম হবে এখন, আমি ঘণ্টা দুই পরে ডাকবো।

ঘরটা ছোট, কিন্তু খুব হাওয়া, দিনের শ্রান্তিতে সে শুইতে না শুইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সে ঠিক জানে না, কাহাদের ডাকাডাকিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বর এসেছে বুঝি? উঃ, রাত অনেক হয়েছে তো! কিন্তু প্রণবের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল—একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। সে বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কি—কি—প্রণব—কিছু হয়েছে নাকি?

উত্তরের পরিবর্তে প্রণব তাহার বিছানার পাশে বসিয়া পড়িয়া কাতর মুখে তাহার দিকে চাহিল, পরে ছল্-ছল্ চোখে তাহার হাত দু'টি ধরিয়া বলিল—ভাই আমাদের মান রক্ষার ভার তোমার হাতে আজ রাত্রে, অপর্ণাকে এখুনি তোমায় বিয়ে করতে হবে, আর সময় বেশী নেই, রাত খুব অল্প আছে, আমাদের মান রাখো ভাই।

আকাশ হইতে পড়িলেও অপু এত অবাক্ হইত না।

প্রণব বলে কি? প্রণবের মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি? না—কি সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে!

এই সময়ে দুজন গ্রামের লোকও ঘরে ঢুকিলেন, একজন বলিলেন—আপনার সঙ্গে যদিও আমার পরিচয় হয় নি, তবুও আপনার [illegible] পরের

মুখে শুনেছি—এদের আজ বড় বিপদ, সব বলছি আপনাকে, আপনি না বাঁচালে আর কোন উপায় নেই—

ততক্ষণ অপু ঘুমের ঘোরটা অনেকখানি কাটাইয়া উঠিয়াছে, সে না-বুঝিতে পারার দৃষ্টিতে একবার প্রণবের, একবার লোক দুটির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি।

ব্যাপার অনেক।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পর বরপক্ষের নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগে। লোক-জনের ভিড় খুব, দু-তিনখানা গ্রামের প্রজাপত্র উৎসব দেখিতে আসিয়াছে। বরকে গাঙ্গরমুখো সেকেলে বড় পাল্‌কিতে উঠাইয়া বাজনা-বাদ্য ও ধুমধামের সহিত মহা সমাদরে ঘাট হইতে নাটমন্দিরে বরাসনে আনা হইতেছিল—এমন সময় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। বাড়ির উঠানে পাল্‌কিখানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, হঠাৎ বর নাকি পাল্‌কি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া বলিতে থাকে—হুক্কা বোলাও, হুক্কা বোলাও।

সে কি বেজায় চীৎকার!

একমুহূর্তে সব গোলমাল হইয়া গেল। চীৎকার হঠাৎ থামে না, বরকর্তা স্বয়ং দৌড়িয়া গেলেন, বর পক্ষের প্রবীণ লোকেরা ছুটিয়া গেলেন,—চারিদিকে সকলে অবাক, প্রজারা অবাক, গ্রামসুদ্ধ লোক অবাক্! সে এক কাণ্ড। চোখে না দেখিলে, বুঝানো কঠিন—আর কি যে লজ্জা, সারা উঠান জুড়িয়া প্রজা, প্রতিবেশী, আত্মীয়কুটুম্ব, পাড়ার ও গ্রামের ছোট বড় সকলে উপস্থিত, সকলের সামনে—বাঁড়ুয্যে বাড়ির মেয়ের বিবাহে এ ভাবের ঘটনা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নাতীত, এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বর যে প্রকৃতিস্থ নয়, একথা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

বরপক্ষ যদিও নানাভাবে কথাটা ঢাকিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কেহ বলিলেন, গরমে ও সারাদিনের উপবাসের কষ্টে—ও কিছু নয়, ও-রকম হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে চাপা দেওয়া গেল না, ক্রমে ক্রমে নাকি প্রকাশ হইতে লাগিল যে, বরের একটু সামান্য ছিট আছে বটে,—কিংবা ছিল বটে, তবে সেটা সব সময় যে থাকে তা নয়, আজকার গরমে, বিশেষ উৎসবের উত্তেজনায়—ইত্যাদি। ব্যাপারটা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিতেছিল, নানা পক্ষের বোঝানোতে আবার সোজা হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল, মেয়ের বাপ শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যেও মন হইতে সমস্তটা ঝাড়িয়া ফেলিতে প্রস্তুত ছিলেন—তাহা ছাড়া উপায়ও অবশ্য ছিল না—কিন্তু এদিকে মেয়ের মা অর্থাৎ প্রণবের বড় মামীমা মেয়ের হাত ধরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়াছেন,—তিনি

বলেন, জানিয়া-শুনিয়া তাঁহার সোনার প্রতিমা মেয়েকে তিনি ও-পাগলের হাতে কখনই তুলিয়া দিতে পারিবেন না, যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে। সকলের বহু অনুনয় বিনয়েও এই তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে তিনি আর ঘরের দরজা খোলেন নাই, নাকি তেমন তেমন বুঝিলে মেয়েকে রাম-দা দিয়া কাটিয়া নিজের গলায় দা বসাইয়া দিবেন এমনও শাসাইয়াছেন, সুতরাং কেহ দরজা ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই! অপর্ণাও এমনি মেয়ে, সবাই জানে, মা তাহার গলায় যদি সত্যই রাম-দা বসাইয়া দেয়ও, সে প্রতিবাদে মুখে কখনও টঁ শব্দটি উচ্চারণ করিবে না, মায়ের ব্যবস্থা শান্ত-ভাবেই মানিয়া লইবে।

পিছনের ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি না রক্ষা করলে আর কেউ নেই, হয় এদিকে একটা খুনোখুনি হবে, না হয় সকাল হলেই ও-মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে—এ সব দিকের গতি তো জানেন না, দো-পড়া হ'লে কি আর ও মেয়ের বিয়ে হবে মশাই?…আহা, অমন সোনার পুতুল মেয়ে, এত বড় ঘর ওরই অদৃষ্টে শেষে কিনা এই কেলেঙ্কারী! এ রাত্রের মধ্যে আপনি ছাড়া আর এ অঞ্চলে ও-মেয়ের উপযুক্ত পাত্র কেউ নেই—বাঁচান আপনি—

অপুর মাথায় যেন কিসের দাপাদাপি মাতামাতি…মাথার মধ্যে যেন চৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তন শুরু হইয়াছে!…এ কি সঙ্কটে তাহাকে ভগবান ফেলিলেন। সকল প্রকার বন্ধনকে সে ভয় করে, তাহার উপর বিবাহের মত বন্ধন! …এই তো সেদিন মা তাহাকে মুক্তি দিয়া গেলেন…আবার এক বৎসর ঘুরিতেই—একি!

মেয়েটির মুখ মনে হইল…আজই সকালে নিচের ঘরে তাহাকে দেখিয়াছে …কি শান্ত, সুন্দর গতিভঙ্গি। সোনার প্রতিমাই বটে, তাহার অদৃষ্টে উৎসবের দিনে এই ব্যাপার!…তাহা ছাড়া রাম-দা-এর কাণ্ডটা…কি করে সে এখন?

কিন্তু ভাবিবার অবসর কোথায়? পিছনে প্রণব দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে, সেই ভদ্রলোক দু'টি তার হাত ধরিয়াছে—তাহাও সে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিত—কিন্তু মেয়েটিও যেন শান্ত ডাগর চোখ দু'টি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সেই যে কাল সন্ধ্যায় প্রণবের আহ্বানে ছাদের উপরে যেমন তাহার পানে চাহিয়াছিল—তেমনি অপরূপ স্নিগ্ধ চাহনিতে নির্বাক মিনতির দৃষ্টিতে সেও যেন তাহার উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে।

সে বলিল, চল ভাই, যা করতে বলবে, আমি তাই করব, এসো।

নিচে কোথাও কোন শব্দ নাই, উৎসব কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, বরপক্ষ এ বাড়ি হইতে সদলবলে উঠিয়া গিয়া ইহাদের শরিক রামদুর্লভ বাঁড়ুয্যের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইয়াছেন, এ-বাড়ির ঘরে-ঘরে খিল বন্ধ। কেবল নাটমন্দিরে

উত্তর বারান্দার স্থানে স্থানে দুচারজন জটলা করিয়া কি বলাবলি করিতেছে, আশ্চর্য এই যে, সম্প্রদান-সভায় পুরোহিত মহাশয় এত গোলমালের মধ্যেও ঠিক নিজের কুশাসনখানির উপর বসিয়া আছেন, তিনি নাকি সেই সন্ধ্যার সময় আসনে বসিয়াছিলেন আর উঠেন নাই

সকলে মিলিয়া লইয়া গিয়া অপুকে বরাসনে বসাইয়া দিল।

এসব ঘটনাগুলি পরবর্তী জীবনে অপুর তত মনে ছিল না, বাংলা খবরের কাগজের ছবির মত অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকিত। তাহার মন তখন এত দিশাহারা ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিল, চারিধারে কি হইতেছে, তাহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

আবার দু-একটা যাহা লক্ষ্য করিতেছে, যতই তুচ্ছ হোক্ গভীরভাবে মনে আঁকিয়া গিয়াছিল, যেমন—সামিয়ানার কোণের দিকে কে একজন ডাব কাটিতেছিল, ডাবটা গোল ও রাঙা, কাটারির বাঁশের—অনেকদিন পর্যন্ত মনে ছিল।

রেশম-চেলী-পরা সালঙ্কারা কন্যাকে সভায় আনা হইল, বাড়ির মধ্যে হঠাৎ শাঁখ বাজিয়া উঠিল, উলুধ্বনি শোনা গেল, লোকে ভিড় করিয়া সম্প্রদান-সভার চারিদিকে গোল হইয়া দাঁড়াইল। পুরোহিতের কথায় অপু চেলী পরিল, নতুন উপবীত-ধারণ করিল, কলের পুতুলের মত মন্ত্রপাঠ করিয়া গেল। স্ত্রী-আচারের সময় আসিল, তখনও সে অন্যমনস্ক, নববধূর মত সে-ও ঘাড় গুঁজিয়া আছে, যে ব্যাপারটা ঘটিতেছে চারিধারে তখনও যে সে সম্যক ধারণা করিতে পারে নাই—কানের পাশ দিয়া কি একটা যেন শির্-শির্ করিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে—না—ঠিক উপরের দিকে নয়, যেন নিচের দিকে নামিতেছে।

প্রণবের বড় মামীমা কাঁদিতেছিলেন তাহা মনে আছে, তিনিই আবার গরদের শাড়ির আঁচল দিয়া তাহার মুখের ঘাম মুছাইয়া দিলেন, তাহারও মনে ছিল। কে একজন মহিলা বলিলেন—মেয়ের শিবপূজোর জোর ছিল বড়বৌ তাই এমন বর মিললো! ভাঙা দালান যে রূপে আলো করেছে!

শুভদৃষ্টির সময় সে এক অপূর্ব ব্যাপার! মেয়েটি লজ্জায় ডাগর চোখ দু'টি নত করিয়া আছে, অপু কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিল, ভাল করিয়াই দেখিল, যতক্ষণ কাপড়ের ঢাকাটা ছিল, ততক্ষণ সে মেয়েটির মুখ ছাড়া অন্যদিকে চাহে নাই—চিবুকের গঠন-ভঙ্গিটি এক চমক দেখিয়াই সুঠাম ও সুন্দর মনে হইল। প্রতিমার মত রূপই বটে, চূর্ণ অলকের দু-এক গাছ কানের আশে-পাশে পড়িয়াছে, হিঙ্গুল রঙের ললাটে ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কানে সোনার দুলে আলো পড়িয়া জ্বলিতেছে!

বাসর হইল খুব অল্পক্ষণ, রাত্রি অল্পই ছিল। মেয়েদের ভিড়ে বাসর ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিবাহ ভাঙিয়া যাইতে নিজের নিজের বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলেন, কোথা হইতে একজনকে ধরিয়া আনিয়া অপর্ণার বিবাহ দেওয়া হইতেছে শুনিয়া তাঁহারা পুনরায় ব্যাপারটা দেখিতে আসিলেন। একরাত্রে এত মজা এ অঞ্চলের অধিবাসীর ভাগ্যে কখনও জোটে নাই—কিন্তু পথ-হইতে-ধরিয়া-আনা বরকে দেখিয়া সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন—এইবার অপর্ণার উপযুক্ত বর হইয়াছে বটে।

প্রণবের বড মামীমা তেজস্বিনী মহিলা, তিনি বাঁকিয়া না বসিলে ওই বায়ু-রোগগ্রস্ত পাত্রটির সহিতই আজ তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইত নিশ্চয়ই। এমন কি তাঁহার অমন রাশ-ভারী স্বামী শশীনারায়ণ বাঁড়ুর্য্যে যখন নিজে বদ্ধ-দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—বডবৌ, কি কর পাগলের মত, দোর খোলো, আমার মুখ রাখো—ছিঃ—তখনও তিনি অচল ছিলেন। তিনি বলিলেন—মা, যখনই একে পুলুর সঙ্গে দেখেছি, তখনই আমার মন যেন বলেছে এ আমার আপনার লোক—ছেলে তো আরও অনেক পুলুর সঙ্গে এসেছে গিয়েছে কিন্তু এত মায়া কারোর উপর হয়নি কখনও—ভেবে ত্যাখো মা, এ মুখ আর লোকালয়ে দেখাবো না ভেবেছিলাম—ও ছেলে যদি আজ পুলুর সঙ্গে এ বাডি না আস্‌তো—

পূর্বের সেই প্রৌঢ়া বাধা দিয়া বলিলেন—তা কি ক'রে হবে মা, ওই যে তোমার অপর্ণার স্বামী, তুমি আমি কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ঠিক করতে গেলে কি হবে, ভগবান যে ওদের দুজনের জন্যে দুজনকে গড়েছেন ও ছেলেকে যে আজ এখানে আসতেই হবে মা—

প্রণবের মামীমা বলিলেন—আবার যে এমন করে কথা বলব তা আজ দু'ঘণ্টা আগেও ভাবিনি—এখন আপনারা পাঁচজনে আশীর্বাদ করুন, যাতে —যাতে—

চোখের জলে তাঁহার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল। উপস্থিত কাহারো চোখ শুষ্ক ছিল না, অপুও অতি কষ্টে উদ্গত অশ্রু চাপিয়া রহিল। প্রণবের মামীমার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাহার মন···মায়ের পরই বোধ হয় এখন আর কাহারও উপর···কেবল আর একজন আছেন—মেজ বৌ-রাণী—তিনি লীলার মা—

তা ছাড়া মায়ের উপর তাহার মনোভাব, শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নয়, তাহা আরও অনেক ঘনিষ্ঠ, অনেক গভীর, অনেক আপন—বত্রিশ নাড়ীর বাঁধনের সঙ্গে সেখানের যেন যোগ—সে-সব কথা বুঝাইয়া বলা যায় না···যাক সে কথা।

বিশ্বাসঘাতক প্রণব কোথা হইতে আসিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে নূতন জামাই খুব ভাল গান গাহিতে পারে। অপর্ণার মা তখনই বাসর হইতে চলিয়া গেলেন ; বালিকা ও তরুণীর দল একে চায় তো আরো পায়, এদিকে অপু ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। না সে পারে ভালো করিয়া কাহারো দিকে চাহিতে, না মুখ দিয়া বাহির হয় না কোন কথা। নিতান্ত পীড়াপীড়িতে একটা রবিবাবুর গান গাহিল, তারপর আর কেহ ছাড়িতে চায় না—সুতরাং আর একটা। মেয়েরাও গাহিলেন, একটি বধূর কণ্ঠস্বর ভারী সুমিষ্ট। প্রৌঢ়া ঠানদি নববধূর গা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—ওরে ও নাত্‌নি, তোর বর ভেবেছে ও বাঙাল দেশে এসে নিজেই গান গেয়ে আসর মাতিয়ে দেবে—শুনিয়ে দে না তোর গলা—জারিজুরি একবারে দে না ভেঙে—

অপু মনে মনে ভাবে—কার বর ?···সে আবার কার বর ?···এই সুসজ্জিতা সুন্দরী নতমুখী মেয়েটি তাহার পাশে বসিয়া, এ তার কে হয় ?··· স্ত্রী···তাহারই স্ত্রী ?

পরদিন সকালে পূর্বতন বরপক্ষের সহিত তুমুল কাণ্ড বাধিল। উভয় পক্ষে বিস্তার তর্ক, ঝগড়া শাপাশাপি, মামলার ভয় প্রদর্শনের পর কেনারাম মুখুয্যে দলবলসহ নৌকা করিয়া স্বগ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন। প্রণব বড়মামাকে বলিল—ওসব বড় লোকের মুখ্যু জড়ভরত ছেলের চেয়ে আমি যে অপূর্বকে কত বড় মনে করি।· একা কলকাতা শহরে সহায়হীন অবস্থায় ওকে যা দুঃখের সঙ্গের লড়াই করতে দেখেছি আজ তিন বছর ধ'রে, ওকে একটা সত্যিকার মানুষ ব'লে ভাবি।

অপুর ঘর-বাড়ি নাই, ফুলশয্যা এখানেই হইল। রাত্রে অপু ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের চারিধার ফুল ও ফুলের মালায় সাজানো, পালঙ্কের উপর বিছানায় মেয়েরা একরাশ বৈশাখী চাঁপাফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে, ঘরের বাতাসে পুষ্পসারের মৃদু সৌরভ। অপু সাগ্রহে নববধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাসর রাত্রের পর আর মেয়েটির সহিত দেখা হয় নাই বা এ পর্যন্ত তাহার সঙ্গে কথাবার্তা হয় নাই আদৌ—আচ্ছা ব্যাপারটা কি রকম ঘটিবে ? অপুর বুক কৌতূহলে ও আগ্রহে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতেছিল।

খানিক রাত্রে নববধূ ঘরে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে আর একদফা একটা অবাস্তবতার ভাব জাগিয়া উঠিল। এ মেয়েটি তাহারই স্ত্রী ? স্ত্রী বলিতে যাহা বোঝায় অপুর ধারণা ছিল, তা যেন এ নয়···কিংবা হয়ত স্ত্রী বলিতে ইহাই বোঝায়, তাহার ধারণা ভুল ছিল। মেয়েটি দোরের কাছে ন যযৌ ন তস্থৌ, অবস্থায় দাঁড়াইয়া ঘামিতেছিল—অপু অতিকষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—(

আপনি—তু—তুমি দাঁড়িয়ে কেন ? এখানে এসে ব'স—

বাহিরে বহু বালিকাকণ্ঠের একটা সম্মিলিত কলহাস্যধ্বনি উঠিল। মেয়েটিও মৃদু হাসিয়া পালঙ্কের একধারে বসিল—লজ্জায় অপুর নিকট হইতে দূরে বসিল। এই সময় প্রণবের ছোট মামীমা আসিয়া বালিকার দলকে বকিয়া-ঝকিয়া নিচে নামাইয়া লইয়া যাইতে অপু খানিকটা স্বস্তি বোধ করিল। মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার নাম কি ?

মেয়েটি মৃদুস্বরে নতমুখে বলিল—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী—সঙ্গে সঙ্গে সে অল্প একটু হাসিল। যেমন সুন্দর মুখ তেমনি সুন্দর মুখের হাসিটা—কি রং ! ...কি গ্রীবার ভঙ্গি ! চিবুকের গঠনটি কি অপরূপ—মুখের দিকে চাহিয়া উজ্জ্বল বাতির আলোয় অপুর যেন কিসের নেশা লাগিয়া গেল।

দু'জনেই খানিকক্ষণ চুপ। অপুর গলা শুকাইয়া আসিযাছিল। কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া এক গ্লাস জলই সে খাইয়া ফেলিল। কি কথা বলিবে—সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিল—আচ্ছা আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তোমার মনে খুব কষ্ট হয়েছে—না ?

বধূ মৃদু হাসিল।

—বুঝতে পেরেছি ভারী কষ্ট হয়েছে—তা আমার—

—যান্—

এই প্রথম কথা, তাহাকে এই প্রথম সম্বোধন ! অপুর সারাদেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, অনেক মেয়ে তো ইতিপূর্বে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াছে, এ রকম তো কখনও হয় নাই ?...

দক্ষিণের জানালা দিয়া মিঠা হাওয়া বহিতেছিল, চাঁপাফুলের সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভরপুর।

অপু বলিল—রাত দুটো বাজে, শোবে না ? ইয়ে—এখানেই তো শোবে ?

মা ও দিদির সঙ্গে ভিন্ন কখনও অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় সে শোয় নাই, একা একঘরে এতবড় অনাত্মীয়, নিঃসম্পর্কীয় মেয়ের পাশে এক বিছানায় শোওয়া—সেটা ভাল দেখাইবে ? কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। একবার তাহার হাতখানা মেয়েটির গায়ে অসাবধানতাবশত ঠেকিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে সারা গা শিহরিয়া উঠিল। কৌতূহলে ও ব্যাপারের অভিনবতায় তাহার শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল—ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অপুর সুন্দর মুখ রাঙা ও একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিসম্পন্ন দেখাইতেছিল।

হঠাৎ সে কিসের টানে পাশ ফিরিয়া মেয়েটির গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত-

তুলিয়া দিল। বলিল—সেদিন যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হ'ল, তুমি কি ভেবেছিলে ?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া তাহার হাতখানা আস্তে আস্তে সরাইয়া দিয়া বলিল—আপনি কি ভেবেছিলেন আগে বলুন ?···সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের সুঠাম, পুষ্পপেলব হাতখানি বাতির আলোয় তুলিয়া ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—এই দেখুন কাঁটা দিয়েছে—কেন বলুন না ?—কথা শেষ করিয়া সে আবার মৃদু হাসিল।

এতগুলি কথা একসঙ্গে এই প্রথম ? কি অপূর্ব রোমান্স এ! ইহার অপেক্ষা কোন্ রোমান্স আছে আর এ জগতে, না চিনিয়া, না বুঝিয়া সে এতদিন কি হিজিবিজি ভাবিয়া বেডাইয়াছে !···জীবনের জগতের সঙ্গে এ কি অপূর্ব ঘনিষ্ঠ পরিচয়! তাহার মাথার মধ্যে কেমন যেন করিতেছে, মদ খাইলে বোধ হয় এরকম নেশা হয়···ঘরের হাওয়া যেন ঘবের মধ্যে যেন আর থাকা যায় না···বেজায় গরম। সে বলিল—একটু বাইরের ছাদে বেড়িয়ে আসি, খুব গরম না ? আসছি এখুনি—

বৈশাখের জ্যোৎস্না রাত্রি—রাত্রি বেশী হইলেও বাড়ির লোক এখনও ঘুমায় নাই, কাল এখানে বৌভাত হইবে, নিচে তাহারই উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। দালানের পাশে বড় রোয়াকে ঝিয়েরা কচু শাক কুটিতেছে, রান্না-কোঁঠার পিছনে নতুন খড়ের চালা বাঁধা হইয়াছে, সেখানে এত রাত্রে পানতুয়ার ভিয়ান হইতেছে—সে ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিল।

ছাদে কেহ নাই, দূরের নদীর দিকে হইতে একটা ঝির্‌ঝির হাওয়া বহিতেছে। যে কি ঘটিয়াছে তাহা যেন সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারে নাই—আজ বুঝিয়াছে কয়েকদিন পূর্বেও সে ছিল সহায়শূন্য, বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, আত্মীয়শূন্য জগতে সম্পূর্ণ একাকী, মুখের দিকে চাহিবার ছিল না কেহই। কিন্তু আজ তো তাহা নয়, আজ ওই মেয়েটি যে কোথা হইতে আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে, মনে হইতেছে যেন ও জীবনের পরম বন্ধু।

মা এ-সময় কোথায় ? মায়ের যে বড় সাধ ছিল মনসাপোতার বাড়িতে শুইয়া শুইয়া কত রাত্রে সে-সব কত সাধ, কত আশার গল্প মায়ের সোনার দেহ কোদ্‌লাতীরের শ্মশানে চিতাগ্নিতে পুড়িবার রাত্রি হইতে সে আশা-আকাঙ্ক্ষার তো সমাধি হইয়াছিল মাকে বাদ দিয়া জীবনের কোন উৎসব···

তপ্ত আকুল চোখের জলে চারিদিকে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী রাত্রির জ্যোৎস্না যেন তাহার পরলোকগত দুঃখিনী

মায়ের আশীর্বাদের মত তাহার বিভ্রান্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া সরল শুভ্র মহিমায় স্বর্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

কলিকাতার কর্মকঠোর, কোলাহল-মুখর, বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গত কয়েকদিনের জীবনকে নিতান্ত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল অপুর। একথা কি সত্য—সত্য শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমার শেষরাত্রে সে অনেক দূরের নদী তীরবর্তী এক অজানা গ্রামের অজানা গৃহস্থবাটীর রূপসী মেয়েকে বলিয়াছিল—আমি এ বছর যদি আর না আসি অপর্ণা ?

প্রথমবার মেয়েটি একটু হাসিয়া মুখ নিচু করিয়াছিল, কথা বলে নাই!

অপু আবার বলিয়াছিল—চুপ ক'রে থাকলে হবে না, তুমি যদি বলো আসব, নৈলে আসব না, সত্যি অপর্ণা। বলো কি বলবে ?

মেয়েটি লজ্জারক্ত মুখে বলিয়াছিল—বা রে, আমি কে ? মা রয়েছেন বাবা রয়েছেন, ওঁদের—আপনি ভারী—

—বেশ আসব না তবে। তোমার নিজের ইচ্ছে না থাকে—

—আমি কি সে কথা বলেছি ?

—তা হলে ?

—আপনার ইচ্ছে যদি হয় আসতে, আসবেন—না হয় আসবেন না, আমার কথায় কি হবে ?

ও-কথা ইহার বেশী আর অগ্রসর হয় নাই, অন্য সময় এ ক্ষেত্রে হয়ত অপুর অত্যন্ত অভিমান হইত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কৌতূহলটাই তাহার মনের অন্য সব প্রবৃত্তিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভালবাসার চোখে মেয়েটিকে সে এখনও দেখিতে পারে নাই, যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে অভিমানও নাই।

সেদিন বৈকালে গোলদীঘির মোড়ে একজন ফেরিওয়ালা চাঁপাফুল বেচিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত গিয়া ফুল কিনিল। ফুলটা আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনের মধ্যে একটা বেদনা সে সুস্পষ্ট অনুভব করিল, একটা কিছু পাইয়া হারাইবার বেদনা, একটা শূন্যতা, একটা খালি-খালি ভাব···মেয়েটির মাথায় চুলের সে গন্ধটাও যেন আবার পাওয়া যায়।

অন্যমনস্কভাবে গোলদীঘির এক কোণে ঘাসের উপর অনেকক্ষণ একা বসিয়া বসিয়া সেদিনের সেই রাতটি আবার সে মনে আনিবার চেষ্টা করিল। মেয়েটির

মুখখানি কি রকম যেন? ভারী সুন্দর মুখ··কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সব যেন মুছিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—মেয়েটির মুখ মনে আনিবার ও ধরিয়া রাখিবার যত বেশী চেষ্টা করিতেছে সে, ততই সে-মুখ দ্রুত অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। শুধু নতপল্লব কৃষ্ণতারা-চোখ-দু'টির ভঙ্গি অল্প অল্প মনে আসে, আর মনে আসে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সে স্নিগ্ধ হাসিটুকু। প্রথমে ললাটে লজ্জা ঘনাইয়া আসে, ললাট হইতে নামে ডাগর দু'টি চোখে পরে কপোলে···তারপরই যেন সারা মুখখানি অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকার হইয়া আসে···ভারী সুন্দর দেখায় সে সময়। তারপরই আসে সেই অপূর্ব হাসিটি, ওরকম হাসি আর কারও মুখে অপু কখনও দেখে নাই। কিন্তু মুখের সব আদলটা তো মনে আসে না—সেটা মনে আনিবার জন্য সে ঘাসের উপর শুইয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, অনেকক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিল না কিছুতেই মনে আসে না—কিংবা হয়ত আগে অতি অল্পক্ষণের জন্য, আবার তখনই অস্পষ্ট হইয়া যায় অপর্ণা—কেমন নামটি?

জ্যৈষ্ঠ মাসেব মাঝামাঝি প্রণব কলিকাতায় আসিল। বিবাহের পর এই তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা। সে আসিয়া গল্প করিল, অপর্ণার মা বলিয়াছেন—তাঁহার কোন্ পুণ্যে এরকম তরুণ দেবতার মত রূপবান জামাই পাইয়াছেন জানেন না—তাহার কেহ কোথাও নাই শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারেন নাই।

অপু খুশী হইল, হাসিয়া বলিল—তবু তো একটা ভাল জামা গায়ে দিতে পারলাম না, সাদা পাঞ্জাবী গায়ে বিয়ে হ'ল—দূব! না খেয়ে-দেয়ে একটা সিল্কের জামা করালুম, সেটা গেল ছিঁড়ে-ছুটে, তখন তুমি এলে তোমার মামার বাড়িতে নিয়ে যেতে, তার আগে আসতে পারলে না—আচ্ছা সিল্কের জামাটাতে আমায় কেমন দেখাতো?

—ওঃ—সাক্ষাৎ য়্যাপোলো বেল্‌ভেডিয়ার! ঢের ঢের হামবাগ দেখেছি, কিন্তু তোর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার—বুঝলি?

না—কিন্তু একটা কথা। অপর্ণার মা কি বলেন তাহা জানিতে অপুর তত কৌতূহল নাই—অপর্ণা কি বলিয়াছে—অপর্ণা? অপর্ণা কিছু বলে নাই!··· হয়ত কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে বিবাহ না হওয়াতে মনে মনে দুঃখিত হইয়াছে—না?

প্রণবের মামা এ বিবাহে তত সন্তুষ্ট হন নাই, স্ত্রীর উপরে মনে মনে চটিয়াছেন এবং তার মনে ধারণা—প্রণবই তাহার মামীমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের বন্ধুর সঙ্গে বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছে। নাম নাই, বংশ নাই,

চালচুলা নাই—চেহারা লইয়া কি মানুষ ধুইয়া খাইবে···কিন্তু এসব কথা প্রণব অপুকে কিছু বলিল না।

একটা কথা শুনিয়া সে দুঃখিত হইল।—কেনারাম মুখুয্যের ছেলেটি নিজে দেখিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়াছিল। অপর্ণাকে বিবাহ করিবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল তাহার—কিন্তু হঠাৎ বিবাহ-সভায় আসিয়া কি যেন গোলমাল হইয়া গেল, সারারাত্রি কোথা দিয়া কাটিল, সকালবেলা যখন হুঁশ হইল, তখন সে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দাদা, আমার বিয়ে হ'ল না ?

এখনও তাহার অবশ্য ঘোর কাটে নাই···বাড়ি ফিরিবার পথেও তাহার মুখে ওই কথা—এখনও নাকি সে বদ্ধ উন্মাদ ! ঘরে তালা দিয়া রাখা হইয়াছে।

অপু বলিল—হাসিস্ কেন, হাসবার কি আছে ? পাগল তো নিজের ইচ্ছেয় হয় নি, সে বেচারির আর দোষ কি ? ও নিয়ে হাসি ভাল লাগে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হয় না—কেবলই অপর্ণার কথা মনে আসে। প্রণব এ কি করিয়া দিল তাহাকে ? সে যে বেশ ছিল, এ কোন সোনার শিকল তাহার মুক্ত বন্ধনহীন হাতে-পায়ে অদৃশ্য নাগপাশের মত দিন দিন জড়াইয়া পড়িতেছে ? লাইব্রেরীতে বসিয়া কেবল আজকাল বাংলা উপন্যাস পড়ে—দেখিল, তাহার মত বিবাহ নভেলে অনেক ঘটিয়াছে, অভাব নাই।

পূজার সময় শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিল না। একে তো অর্থাভাবে সে নিজের ভাল জামা-কাপড় কিনিতে পারিল না, শ্বশুরবাড়ি হইতে পূজার তত্ত্বে যাহা পাওয়া গেল, তাহা পরিয়া সেখানে যাইতে তাহার ভারী বাধবাধ ঠেকিল। তাহা ছাড়া অপর্ণার মা চিঠির উপর চিঠি দিলে কি হইবে, তাহার বাবার দিক হইতে জামাইকে পূজার সময় লইয়া যাইবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না বরং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশপূর্ণ পত্র পাওয়া গেল যে, একটা ভাল চাকুরি-বাকুরি যেন সে শীঘ্র দেখিয়া লয়, এখন অল্প বয়স, এই তো অর্থ উপার্জনের সময়, এখন আলস্য ও ব্যসনে কাটাইলে···এমনি ধরণের নানা কথা। এখানে বলা আবশ্যক, এ বিবাহে তিনি অপুকে একেবারে ফাঁকি দিয়াছিলেন, কেনারাম মুখুয্যের ছেলেকে যাহা দিবার কথা ছিল তাহার সিকিও এ জামাইকে দেন নাই।

ছুটি পাওয়া গেল পুনরায় বৈশাখ মাসে। পূর্বদিন রাত্রে তাহার কিছুতেই ঘুম আসে না, কি রকম চুল ছাঁটা হইয়াছে, আয়নায় দশবার দেখিল। ওই সাদা পাঞ্জাবীতে তাহাকে ভাল মানায়—না, এই তসরের কোটটাতে ?

অপর্ণার মা তাহাকে পাইয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলেন। সেদিনটা খুব বৃষ্টি, অপু নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ির বাহিরের উঠানে পা দিতেই, কে

পূজার দালানে বসিয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া বাড়ির মধ্যে খবর দিল। এক মুহূর্তে বাড়ির উপরের নিচের সব জানালা খুলিয়া গেল, বাড়িতে ঝি-বৌয়ের সংখ্যা নাই, সকলে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—মুষলধারায় বৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করিয়া অপর্ণার মা উঠানে তাহাকে লইতে ছুটিয়া আসিলেন, সারা বাড়িতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

ফুলশয্যার সেই ঘরে, সেই পালঙ্কেই রাত্রে শুইয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় রহিল।

এক বৎসরে অপর্ণার এ কি পরিবর্তন! তখন ছিল বালিকা—এখন ইহাকে দেখিলে যেন আর চেনা যায় না! লীলার মত চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য ইহার নাই বটে, কিন্তু অপর্ণার যাহা আছে, তাহা উহাদের কাহারও নাই। অপুর মনে হইল দু-একখানা প্রাচীন পটে আঁকা তরুণী-দেবীমূর্তির, কি দশমহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্তির মুখে এ-ধরণের অনুপম, মহিমময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য সে দেখিয়াছে। একটু সেকেলে, একটু প্রাচীন ধরণের সৌন্দর্য সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। যেন মনে হয় এ খাঁটি বাংলার জিনিস, এই দূর পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছাড়িয়া ও মুখ গড়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার পল্লীর চুত-বকুল-বীথির ছায়ায় ছায়ায় কত অপরাহ্ণে নদীঘাটের যাওয়া-আসার পথে এই উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, রূপসী তরুণী বধূদের লক্ষ্মীর মত আলতা-রাঙা পদচিহ্ন কতবার পড়িয়াছে, মুছিয়াছে, আবার পড়িয়াছে—ইহাদেরই স্নেহ-প্রেমের, দুঃখসুখের কাহিনী, বেহুলা লখিন্দরের গানে, ফুল্লরার বারোমাস্যায়, সুবচনীর ব্রতকথায়, বাংলার বৈষ্ণব-কবিদের রাধিকার-রূপবর্ণনায়, পাড়াগাঁয়ের ছড়ায়, উপকথায় সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্পে!

অপু বলিল—তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি, সারা বছরে একখানা চিঠি দিলে না কেন?—

অপর্ণা সলজ্জ মৃদু একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর একবার ডাগর চোখদু'টি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল। খুব মৃদুস্বরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল— আর আমার বুঝি রাগ হতে নেই?

অপু দেখিল—এতদিন কলিকাতায় সে জারুল কাঠের তক্তপোশে শুইয়া অপর্ণার যে মুখ ভাবিত—আসল মুখ একেবারেই তাহা নহে—ঠিক এই অনুপম মুখই সে দেখিয়াছিল বটে ফুলশয্যার রাত্রে, এমন ভুলও হয়!

—পূজোর সময় আসিনি তাই?—তুমি ভাবতে কি না?—ও-সব মুখের কথা, ছাই ভাবতে!—

—না গো না, মা বললেন, তুমি আসবে ষষ্ঠীর দিন, ষষ্ঠী গেল, পূজো গেল, তখনও মা বললেন তুমি একাদশীর পর আসবে—আমি—

অপর্ণা হঠাৎ থামিয়া গেল, অল্প একটু চাহিয়া চোখ নিচু করিল।

অপু আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি কি, বললে না ?

অপর্ণা বলিল—আমি জানি নে, বলব না—

অপু বলিল—আমি জানি আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তুমি মনে মনে—

অপর্ণা স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের সুরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল আবার ওই কথা ? —ও-সব কথা বলতে আছে ?—ছিঃ—বলো না—

—তা কৈ, তুমি খুশী হয়েছ, একথা তো তোমার মুখে শুনি নি অপর্ণা—

অপর্ণা হাসিমুখে বলিল—তারপর কতদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে গো শুনি ?—সেই আর-বছর বোশেখ আর এ বোশেখ—

—আচ্ছা বেশ, এখন তো দেখা হ'ল, এখন আমার কথার উত্তর দাও ?

অপর্ণা কি-একটা হঠাৎ মনে পড়িবার ভঙ্গিতে তাহার দিকে চাহিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি নাকি যুদ্ধে যাচ্ছিলে, পুলুদা বলছিল, সত্যি ?—

—যাই নি, এবার ভাবছি যাবো—এখান থেকে গিয়েই যাবো—

অপর্ণা ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক্ গো, আর রাগ করতে হবে না, আচ্চা তোমার কথার কি উত্তর দেব বলো তো ?—ওসব আমি মুখে বলতে পারব না—

—আচ্ছা, যুদ্ধ কাদের মধ্যে বেধেছে, জানো ?

—ইংরেজের সঙ্গে আর জার্মানির সঙ্গে—আমাদের বাড়িতে বাংলা কাগজ আসে। আমি পড়ি যে।

অপর্ণা রূপার ডিবাতে পান আনিয়াছিল, খুলিয়া বলিল—পান খাবে না ?

বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। এতটুকু গরম নাই, ঠাণ্ডা রাতটির ভিজা মাটির সুগন্ধে ঝির্‌ঝিরে দক্ষিণ হাওয়া ভরপুর, একটু পরে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল।

অপু বলিল—আচ্ছা অপর্ণা, চাঁপাফুল পাওয়া যায় তো কাউকে কাল বলো না, বিছানায় রেখে দেবে ? আছে চাঁপাগাছ কোথাও ?

—আমাদের বাগানেই আছে। আমি কাউকে বলতে পারব না কিন্তু—তুমি বলো কাল সকালে ওই নৃপেনকে, কি অনাদিকে—কি আমার ছোট বোনকে বলো—

—আচ্ছা কেন বল তো চাঁপাফুলের কথা তুললাম ?

অপর্ণা সলজ্জ হাসিল। অপুর বুঝিতে দেরী হইল না যে, অপর্ণা তাহার

মনের কথা ঠিক ধরিয়াছে। তাহার হাসিবার ভঙ্গিতে অপু একথা বুঝিল। বেশ বুদ্ধিমতী তো অপর্ণা!···

সে বলিল—হ্যাঁ একটা কথা অপর্ণা, তোমাকে এবার কিন্তু নিয়ে যাব দেশে, যাবে তো?

অপর্ণা বলিল—মাকে বলো, আমার কথায় তো হবে না—

—তুমি রাজী কি না বলো আগে—সেখানে কিন্তু কষ্ট হবে। অপু একবার ভাবিল—সত্য কথাটা খুলিয়াই বলে। কিন্তু সেই পুরাতন গর্ব ও বাহাদুরির ঝোঁক!—বলিল—অবিশ্যি একদিন আমাদেরও সবই ছিল। সেখানে থাকতুম—আমার পৈতৃক দেশ—এখন তো দোতলা মস্ত বাড়ি—মানে সবই—তবে শরিকানী মামলা আর মানে ম্যালেরিয়ার—বুঝলে না? এখন যেখানে থাকি, সেখানে দু'খানা মেটে চালাঘর, তাও মা মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যাই নি, তোমাদের মত ঝি-চাকর নেই, নিজের হাতে সব করতে হবে—তা আগে থেকেই ব'লে রাখি। তুমি হলে জমিদারের মেয়ে—

অপর্ণা কৌতুকের সুরে বলিল—আছিই তো জমিদারের মেয়ে। হিংসে হচ্ছে বুঝি? একটু থামিয়া শান্ত সুরে বলিল—কেন একশ'বার ওকথা বলো? ···তুমি কাল মাকে বাবাকে বলে রাজী করাও, আমি তোমার সঙ্গে যেখানে নিয়ে যাবে যাবো, গাছ-তলাতেও যাবো, আমি তোমার সব কথা জানি, পুলুদা মায়ের কাছে বলছিল, আমি সব শুনেছি? যেখানে নিয়ে যাবে, নিয়ে চল, তোমার ইচ্ছে আমার তাতে মতামত কি?

রাত্রে দুজনে কেহ ঘুমাইল না।

বধূকে লইয়া সে রওনা হইল। শ্বশুর প্রথমটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন—নিয়ে তো যেতে চাইছ বাবাজী, কিন্তু এখন নিয়ে গিয়ে তুলবে কোথায়? চাকরি-বাকরি ভাল কর, ঘর-দোর ওঠাও নিয়ে যাবার এত তাড়াতাড়িটা কি?

সিঁড়ির ঘরে অপর্ণার মা স্বামীকে বলিলেন—হ্যাঁগা, তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে যাচ্ছে দিন দিন—না কি? জামাইকে ও-সব কথা বলেছ? আজকালকার ছেলেমেয়েদের ধারণা আলাদা, তুমি জান না। ছেলেমানুষ জামাই, টাকাকড়ি, চাকরিবাকরি ভগবান যখন দেবেন তখন হবে। আজকালের মেয়েরা ও-সব বোঝে না, বিশেষ ক'রে তোমার মেয়ে সে ধরণেরই নয়, ওর মন আমি খুব ভাল বুঝি। দাও গিয়ে পাঠিয়ে ওকে জামাইয়ের সঙ্গে—ওদের সুখ নিয়েই সুখ।

উৎসাহে অপুর রাত্রে ঘুম হয় না এমন অবস্থা, কাল সারাদিন অপর্ণাকে

লইয়া রেল স্টিমারে কাটানো—উঃ!—শুধু সে, আর কেউ না। রাত্রে অস্পষ্ট আলোকে অপর্ণাকে ভাল করিয়া দেখিবারই সুযোগ হয় না, দিনে দেখা হওয়া এ বাড়িতে অসম্ভব—কিন্তু কাল সকালটি হইতে তাহারা দুজনে—মাঝে আর কোন বাধা ব্যবধান থাকিবে না!

কিন্তু স্টিমারে অপর্ণা রহিল মেয়েদের জায়গায়। তিন ঘণ্টা কাল সেভাবে কাটিল। তার পরেই রেল।

এইখানেই অপু সর্বপ্রথম গৃহস্থলী পাতিল স্ত্রীর সঙ্গে। ট্রেনের তখনও অনেক দেরি। যাত্রীদের রান্না-খাওয়ার জন্যে স্টেশন হইতে একটু দূরে ভৈরবের ধারে ছোট ছোট খড়ের ঘর অনেকগুলি—তারই একটা চার আনায় ভাড়া পাওয়া গেল। অপু দোকানে খাবার কিনিতে যাইতেছে দেখিয়া বধূ বলিল—তা কেন? এই তো এখানে উনুন আছে, যাত্রীরা সব রেঁধে খায়, এখনও তো তিন-চার ঘণ্টা দেরি গাড়ির, আমি রাঁধব।

অপু ভারী খুশী। সে ভারী মজা হইবে! এ কথাটা এতক্ষণ তাহার মনে আসে নাই। মহা উৎসাহে বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে ইতিমধ্যেই কখন বধূ স্নান সারিয়া ভিজা চুলটি পিঠের উপর ফেলিয়া, কপালে সিন্দুরের টিপ্ দিয়া লাল-জরিপাড় মটকার শাড়ি পরিয়া ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় এটা-ওটা ঠিক করিতেছে। হাসিমুখে বলিল—বাড়িওয়ালী জিগ্যেস করেছে উনি তোমার ভাই বুঝি? আমি হেসে ফেলতেই বুঝতে পেরেছে, বলেছে—জামাই! তাই তো বলি!—আরও কি বলিতে গিয়া অপর্ণা লজ্জায় কথা শেষ করিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অপু মুগ্ধনেত্রে বধূর দিকে চাহিয়াছিল। কিশোরীর তনুদেহটি বেড়িয়া স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কি অপূর্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সুন্দর নিটোল গৌর বাহু দুটি, চুলের খোঁপার ভঙ্গিটি কি অপরূপ! গভীর রাত্রে শোবার ঘরে এ পর্যন্ত দেখাশোনা, দিনের আলোর স্নানের পরে এ অবস্থায় তাহার স্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই—আজ দেখিয়া মনে হইল অপর্ণা সত্যই সুন্দরী বটে।

কাঁচা কাঠ কিছুতেই ধরে না, প্রথমে বধূ, পরে সে নিজে, ফুঁ দিয়া চোখ লাল করিয়া ফেলিল। প্রৌঢ়া বাড়িওয়ালী ইহাদের জন্য নিজের ঘরে বাটনা বাটিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দু'জনের দুর্দশা দেখিয়া বলিল—ওগো মেয়ে, সরো বাছা, জামাইকে যেতে বলো। তোমাদের কি ও কাজ মা? সরো আমি দি ধরিয়ে।

বধূ তাগিদা দিয়া অপুকে স্নানে পাঠাইল। নদী হইতে ফিরিয়া সে দেখিল—

ইহার মধ্যে কখন বধূ বাড়িওয়ালীকে দিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা ও ছানা আনাইয়াছে, রেকাবিতে পেঁপে কাটা, খাবার ও গ্লাসে নেবুর রস মিশানো চিনির শরবৎ। অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, ভারী গিন্নীপনা যে!—আচ্ছা তরকারীতে নুন দেওয়ার সময় গিন্নীপনার দৌড়টা একবার দেখা যাবে।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা গো দেখো—পরে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলাইয়া বলিল—ঠিক হ'লে কিন্তু···আমায় কি দেবে?

অপু কৌতুকের সুরে বলিল,—ঠিক হলে যা দেব, তা এখুনি পেতে চাও?

—যাও, আচ্ছা দুষ্টু তো!

একবার সে রন্ধনরত বধূর পিছনে আসিয়া চুপি-চুপি দাঁড়াইল। দৃশ্যটা এত নতুন, এত অভিনব ঠেকিতেছিল তাহার কাছে। এই সুঠাম, সুন্দরী পরের মেয়েটি তাহার নিতান্ত আপনার জন—একমাত্র পৃথিবীতে আপনার জন। পরে সে সন্তর্পণে নিচু হইয়া পিঠের উপরে এলানো চুলের গিঠটা ধরিয়া অতর্কিতে এক টান দিতেই বধূ পিছনে চাহিয়া কৃত্রিম কোপের সুরে বলিল—উঃ! আমার লাগে না বুঝি?—ভারি দুষ্টু তো···রান্না পড়ে থাকবে ব'লে দিচ্ছি যদি আমার চুল ধরে টানবে—

অপু ভাবে, মা ঠিক এই ধরণের কথা বলিত—এই ধরণেই স্নেহ-প্রীতি-ঝরা চোখ। সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রাণুদি, কি লীলা, কি অপর্ণা—সকলেরই মধ্যে মা যেন অল্পবিস্তর মিশিয়া আছেন—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায় ইহারা একই ধরণের কথা বলে, চোখে-মুখে একই ধরণের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।

একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে প্লাটফর্মে পায়চারী করিতেছিলেন। ট্রেনে উঠিবার কিছু পূর্বে অপু তাঁহাকে চিনিতে পারিল, দেওয়ানপুরের মাস্টার সেই সত্যেনবাবু। অপু থার্ডক্লাসে পড়িবার সময়ই ইনি আইন পাশ করিয়া স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনও দেখা হয় নাই। পুরাতন ছাত্রকে দেখিয়া খুশী হইলেন, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে কে কি করিতেছে শুনিবার আগ্রহ দেখাইলেন।

তিনি আজকাল পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, চালচলন দেখিয়া অপুর মনে হইল—বেশ দু'পয়সা উপার্জন করেন। তবুও বলিলেন, পুরানো দিনই ছিল ভাল, দেওয়ানপুরের কথা মনে হইলে কষ্ট হয়। ট্রেন আসিলে তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন।

অপর্ণাকে সব ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া অপু একখানা ফিটন গাড়ি ভাড়া করিয়া খানিকটা ঘুরিল।

অপু একটা জিনিস লক্ষ্য করিল; অপর্ণা কখনও কিছু দেখে নাই বটে,

কিন্তু কোনও বিষয়ে কোনও অশোভন ব্যগ্রতা দেখায় না। ধীর, স্থির সংযত, বুদ্ধিমতী—এই বয়সেই চরিত্রগত একটা কেমন সহজ গাম্ভীর্য—যাহার পরিণতি স দেখিয়াছে ইহারই মায়ের মধ্যে ; উছলিয়া-পড়া মাতৃত্বের সঙ্গে চরিত্রের সে ক দৃঢ় অটলতা।

মনসাপোতা পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অপু বাড়িঘরের বিশেষ কিছু ঠিক করে নাই। কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই, কিছু না—অথচ হঠাৎ স্ত্রীকে আনিয়া হাজির করিয়াছে। বিবাহের পর মাত্র একবার এখানে দুদিনের জন্য আসিয়াছিল, বাড়িঘর অপরিষ্কার, রাত্রিবাসের অনুপযুক্ত, উঠানে ঢুকিয়া পেয়ারা গাছটার তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বধূ দাঁড়াইয়া রহিল, অপু গরুর গাড়ি হইতে তোরঙ্গ ও কাঠের হাতবাক্সটা নামাইতে গেল। উঠানের পাশের জঙ্গলে নানা পতঙ্গ কুস্বর করিয়া ডাকিতেছে, ঝোপে-ঝোপে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে।

কেহ কোথাও নাই, কেহ তরুণ দম্পতিকে সাদরে বরণ ও অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে তুলিয়া লইতে ছুটিয়া আসিল না, তাহারাই দুজনে টানাটানি করিয়া নিজেদের পেটরা-তোরঙ্গ মাত্র দেশলাইয়ের কাঠির আলোর সাহায্যে ঘরের দাওয়ায় তুলিতে লাগিল। সে আজ কাহাকেও ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই, ভাবিয়াছিল—মা যখন বরণ করে নিতে পারলেন না আমার বৌকে, কত সাধ ছিল মার—তখন আর কাউকে বরণ করতে হবে না, ও অধিকার আর কাউকে বুঝি দেব ?

অপর্ণা জানিত তাহার স্বামী দরিদ্র—কিন্তু এ রকম দরিদ্র তাহা সে ভাবে নাই। তাহাদের পাড়ার নাপিত-বাড়ির মত নিচু, ছোট চালাঘর। দাওয়ার একধারে গরু বাছুর উঠিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে···ছাঁচতলায় কাঁই-বীচি ফুটিয়া বর্ষার জলে চারা বাহির হইয়াছে··একস্থানে খড় উড়িয়া চালের বাখারি ঝুলিয়া পড়িয়াছে ··বাড়ির চারিধারে কি পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছে···এরকম ঘরে তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে ?···অপর্ণার মন দমিয়া গেল। কি করিয়া থাকিবে সে এখানে ? মায়ের কথা মনে হইল···খুড়ীমাদের কথা মনে হইল··· ছোট ভাই মিনুর কথা মনে হইল···কান্না ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল ···সে মরিয়া যাইবে এখানে থাকিলে···

অপু খুঁজিয়া পাতিয়া একটা লণ্ঠন জ্বালিল। ঘরের মাটির মেঝেতে পোকায় খুঁড়িয়া মাটি জড় করিয়াছে। তক্তপোশের একটা পাশ ঝাড়িয়া তাহার উপর অপর্ণাকে বসাইল···সবে অপর্ণাকে অন্ধকার ঘরে বসাইয়া লণ্ঠন হাতে বাহিরে হাতবাক্সটা আনিতে গেল···অপর্ণার গা ছম ছম করিয়া উঠিল অন্ধকারে···

পরক্ষণেই অপু নিজের ভুল বুঝিয়া আলো হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—ছাখো কাণ্ড, তোমাকে একা অন্ধকারে বসিয়ে রেখে—থাক্ লণ্ঠনটা এখানে—

অপর্ণার কান্না আসিতেছিল—

আধঘণ্টা ধরিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঘরটা একরকম রাত্রি কাটানোর মত দাঁড়াইল। কি খাওয়া যায় রাত্রে?—রান্নাঘর ব্যবহারের উপযোগী নাই তো বটেই, তা ছাড়া চাল, ডাল, কাঠ কিছুই নাই। অপর্ণা তোরঙ্গ খুলিয়া একটা পুঁটুলি বার করিয়া বলিল—ভুলে গিয়েছিলাম তখন, মা নাড়ু দিয়েছিলেন এতে বেঁধে—অনেক আছে—এই খাও।

অপু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। সংসার কখনও করে নাই—এই নতুন—নিতান্ত আনাড়ী—অপর্ণাকে এ অবস্থায় এখানে আনা ভাল হয় নাই, সে এতক্ষণে বুঝিয়াছে। অপ্রতিভের সুরে বলিল—রাণাঘাট থেকে কিছু খাবার নিলেই হ'ত—তোমাকে একলা বসিয়ে রেখে যাই কি ক'রে—নৈলে ক্ষেত্র কাপালীর বাড়ী থেকে চিঁড়ে আর দুধ—যাব?···

অপর্ণা ঘাড় নাড়িয়া বারণ করিল।

তেলিদের বাড়িতে কেউ ছিল না, তিন-চারি মাস হইতে তাহারা কলিকাতায় আছে, বাড়ি তালাবন্ধ, নতুবা কাল রাত্রে ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সে বাড়ির লোক আসিত। সকালে সংবাদ পাইয়া ও-পাড়া হইতে নিরুপমা ছুটিয়া আসিল। অপু কৌতুকের সুরে বলিল—এসো, এসো নিরুদিদি এখন মা নেই, তোমরা কোথায় বরণ ক'রে ঘরে তুলবে, দুধে-আলতার পাথরে দাঁড করাবে, তা না তুমি সকালে পান চিবুতে চিবুতে এলে। বেশ যা হোক্।

নিরুপমা অনুযোগ করিয়া বলিল—তুমি ভাই সেই চোদ্দ-বছরে যেমন পাগলটি ছিলে, এখনও ঠিক সেই আছ। বৌ নিয়ে আসছো তা' একটা খবর না, কিছু না। কি ক'রে জানব তুমি এ অবস্থায় একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে এই ভাঙা-ঘরে হুপ্ করে এনে তুলবে? ছি ছি, ছাখ তো কাণ্ডখানা? রাত্রে যে রইলে কি ক'রে এখানে, সে কেবল তুমিই পার।

নিরুপমা গিনি দিয়া বৌ-এর মুখ দেখিল।

অপু বলিল—তোমাদের ভরসাতেই কিন্তু ওকে এখানে রেখে যাব নিরুদি। আমাকে সোমবার চাকরিতে যেতেই হবে। নিরুপমা বৌ দেখিয়া খুব খুশী, বলিল—আমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেব বৌকে, এখানে থাকতে দেব না। অপু বলিল—তা হবে না, আমার মায়ের ভিটেতে সন্ধ্যে দেবে কে তাহলে? রাত্রে তোমাদের ওখানে শোবার জন্তে নিয়ে যেও। নিরুপমা তাতেই

রাজী। চৌদ্দ বছরের ছেলে যখন প্রথম চেলী পরিয়া তাহাদের বাড়ি পূজা করিতে গিয়াছিল, তখন হইতে অপুকে সে সত্য-সত্য স্নেহ করে তাহার দিকে টানে। অপু ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় সে মনে মনে খুব দুঃখিত হইয়াছিল। মেয়েরা গতিকে বোঝে না, বাহিরকে বিশ্বাস করে না, মানুষের উদ্দাম ছুটিবার বহির্মুখী আকাঙ্খাকে শান্ত সংযত করিয়া তাহাকে গৃহস্থালী পাতাইয়া, বাঁসা বাধাইবার প্রবৃত্তি নারীমনের সহজাত ধর্ম, তাহাদের সকল মাধুর্য, স্নেহ, প্রেমের প্রয়োগ-নৈপুন্য এখানে। সে শক্তিও এত বিশাল যে খুব কম পুরুষই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জয়ী হইবার আশা করিতে পারে। অপু বাড়ি ফিরিয়া নীড় বাঁধাতে নিরুপমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া অপুর আর কিছু ভাল লাগে না, কেবল শনিবারের অপেক্ষায় দিন গুণিতে থাকে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাহারা নব-বিবাহিত তাহাদের সঙ্গে কেবল বিবাহিত জীবনের গল্প করিতে ও শুনিতে ভাল লাগে। কোনও রকমে একসপ্তাহ কাটাইয়া শনিবার দিন সে বাড়ি গেল। অপর্ণার গৃহিণীপনায় সে মনে মনে আশ্চর্য না হইয়া পারিল না। এই সাত-আট দিনের মধ্যেই অপর্ণা বাড়ির চেহারা একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছে। তেলি-বাড়ির বুড়ী ঝিকে দিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে ঘরের দেওয়াল লেপিয়া ঠিক করাইয়াছে। দাওয়ায় মাটি ধরাইয়া দিয়াছে, রাঙা এলামাটি আনিয়া চারিধারে রঙ করাইয়াছে, নিজের হাতে এখানে তাক, ওখনে কুলুঙ্গি গাঁথিয়াছে, তক্তপোষের তলাকার রাশীকৃত ইঁদুরের মাটি নিজেই উঠাইয়া বাহিরে ফেলিয়া গোবর-মাটি লেপিয়া দিয়াছে। সারা বাড়ি যেন ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতেছে। অথচ অর্পণা জীবনে এই প্রথম মাটির ঘরে পা দিল। পূর্ব গৌরব যতই ক্ষুণ্ণ হউক, তবুও সে ধনীবংশের মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরে লালিত, বাড়ি থাকিতে নিজের হাতে তাকে কখনও বিশেষ কিছু করিতে হইত না।

মাসখানেক ধরিয়া প্রতি শনিবারে বাড়ি যাতায়াত করিবার পর অপু দেখিল তাহার যাহা আয় ফি শনিবারে বাড়ি যাওয়ার খরচ তাহাতে কুলায় না। সংসারে দশ-বারো টাকার বেশী মাসে এ পর্যন্ত দিতে পারে নাই। সে বোঝে—ইহাতে সংসার চালাইতে অপর্ণাকে দস্তুরমত বেগ পাইতে হয়। অতএব ঘন ঘন বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিল।

ডাকপিয়নের খাকির পোশাক যে বুকের মধ্যে হঠাৎ এরূপ ঢেউ তুলিতে পারে, ব্যগ্র আশার আশ্বাস দিয়াই পরমুহূর্তে নিরাশা ও দুঃখের অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে, পনেরো টাকা বেতনের আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাফিসের পিওন যে একদিন তাহার দুঃখ-সুখের বিধাতা হইবে, এ কথা

কবে ভাবিয়াছিল? পূর্বে কালে-ভদ্রে মায়ের চিঠি আসিত, তাহার জন্য এরূপ ব্যগ্র প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। পরে মায়ের মৃত্যুর পর বৎসরখানেক তাহাকে একখানি পত্রও কেহ দেয় নাই! উঃ, কি দিনই গিয়াছে সেই এক বৎসর। মনে আছে, তখন রোজ সকালে চিঠির বাক্স বৃথা আশায় একবার করিয়া খোঁজ করিয়া হাসিমুখে পাশের ঘরের বন্ধুদের উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত—আরে, বীরেন বোসের জন্যে তো এ বাসায় আর থাকা চলে না দেখছি?—রোজ রোজ যত চিঠি আসে তার অর্ধেক বীরেন বোসের নামে।

বন্ধু হাসিয়া বলিত—ওহে পাঁচজন থাকলেই চিঠিপত্তর আসে পাঁচদিক থেকে। তোমার নেই কোন চুলোয় কেউ, দেবে কে চিঠি?

বোধ হয় কথাটা রূঢ় সত্য বলিয়াই অপুর মনে আঘাত লাগিত কথাটায়। বীরেন বোসের নানা ছাঁদের চিঠিগুলো লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—সাদা খাম, সবুজ খাম, হলদে খাম, মেয়েলি হাতের লেখা পোস্টকার্ড, এক একবার হাতে তুলিয়া লোভ দমন করিতে না পারিয়া দেখিয়াছেও—ইতি তোমার দিদি, ইতি তোমার মা, আপনার স্নেহের ছোট বোন সুশী, ইত্যাদি। বীরেন বোস মিথ্যা বলে নাই, চারিদিকে আত্মীয় বন্ধু থাকিলেই রোজ পত্র আসে—তাহার চিঠি তো আর আকাশ হইতে পড়িবে না? আজকাল আর সে দিন নাই। পত্র লিখিবার লোক হইয়াছে এতদিনে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা, কিন্তু দিনগুলো মাসের মত দীর্ঘ।

অবশেষে জন্মাষ্টমীর ছুটি আসিয়া গেল। এডিটারকে বলিয়া বেলা তিনটার সময় অফিস হইতে বাহির হইয়া সে স্টেশনে আসিল। পথে নব-বিবাহিত বন্ধু অনাথবাবু বৈঠকখানা বাজার হইতে আম কিনিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রাম ধরিতে ছুটিতেছেন। অপুর কথার উত্তরে বলিলেন—সময় নেই, তিনটে পনেরো ফেল করলে আবার সেই চারটে পঁচিশ, দু'ঘণ্টা দেরী হয়ে যাবে পৌঁছতে—আচ্ছা আসি, নমস্কার!

দাড়িটা ঠিক কামানো হইয়াছে তো?

মুখ রৌদ্রে ধূলায় ও ঘামে যে বিবর্ণ হইয়া যাইবে তাহার কি? কী গাধাবোট-গাড়িখানা, এতক্ষণে মোটে নৈহাটি? বাড়ি পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইতে পারে। খুশির সহিত ভাবিল, চিঠি লিখে তো যাচ্ছি নে, হঠাৎ দেখে অপর্ণা একেবারে অবাক হয়ে যাবে এখন—

বাড়ি যখন পৌঁছিল, তখনও সন্ধ্যার কিছু দেরি। বধূ বাড়ি নাই, বোধ হয় নিরুপমাদের বাড়ি কি পুকুরের ঘাটে গিয়াছে। কেহ কোথাও নাই। অপু

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পুঁটলি নামাইয়া রাখিয়া সাবানখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া আগে হাত মুখ ও মাথা ধুইয়া ফেলিয়া তাকের আয়না ও চিরুনীর সাহায্যে টেরী কাটিল। পরে নিজের আগমনের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

আধঘণ্টা পরেই সে ফিরিল। বধূ ঘরের মধ্যে প্রদীপের সামনে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কি বই পড়িতেছে। অপু পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। এটা অপুর পুরনো রোগ; মায়ের সঙ্গে কতবার এরকম করিয়াছে। হঠাৎ কি একটা শব্দে বধূ পিছন ফিরিয়া চাহিয়া ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে অপু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বধূ অপ্রতিভের স্বরে বলিল—ওমা তুমি! কখন—কৈ—তোমার তো—

অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন জব্দ! আচ্ছা তো ভীতু।

বধূ ততক্ষণে সামলাইয়া হাসি মুখে বলিল—বা রে, ওই রকম ক'রে বুঝি আচমকা ভয় দেখাতে আছে? ক'টার গাড়িতে এলে এখন—তাই বুঝি আজ ছ-সাত দিন চিঠি দেওয়া হয় নি—আমি ভাবছি—

অপু বলিল···তারপর, তুমি কি রকম আছ, বল? মায়ের চিঠিপত্র পেয়েছ?

—তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গিয়েছ, অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বুঝি?

—আমার এবারকার চিঠির কাগজটা কেমন? ভালো না? তোমার জন্যে এনেছি পঁচিশখানা। তারপর রাত্রে কি খাওয়াবে বল?

—কি খাবে বলো? ঘি এনেছি, আলুপটলের ডালনা করি—আর দুধ আছে—

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু দেখিয়া অবাক হইল, বাড়ির পিছনের উঠানে অর্পণা ছোট ছোট বেড়া দিয়া শাকের ক্ষেত, বেগুনের ক্ষেত করিয়াছে। দাওয়ার ধারে ধারে গাঁদার চারা বসাইয়াছে। রান্নাঘরের চালায় পুঁইলতা, লাউলতা উঠাইয়া দিয়াছে। দেখাইয়া বলিল,—আজ পুঁই-শাক খাওয়াব আমার গাছের! ওই দোপাটীগুলো দ্যাখো? কত বড়, না? নিরুপমা দিদি বীজ দিয়েছেন। আর একটা জিনিস দ্যাখো নি? এসো দেখাব—

অপুর সারা শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ বহিল। অর্পণা যেন তাহার মনের গোপন কথাটি জানিয়া বুঝিয়াই কোথা হইতে একটা ছোট চাঁপা গাছের ডাল আনিয়া মাটিতে পুঁতিয়াছে, দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো কেমন—হবে না এখানে?

—হবে না আর কেন? আচ্ছা, এত ফুল থাকতে চাঁপা ফুলের ডাল যে পুঁততে গেলে?

অর্পণা সলজ্জমুখে বলিল—জানি নে—যাও।

অপু তো লেখে নাই, পত্রে তো একথা অপর্ণাকে জানায় নাই যে, মিত্তির বাড়ির কম্পাউণ্ডের চাঁপাফুল গাছটা তাহাকে কি কষ্টই না দিয়াছে, এই দু'মাস! চাঁপা ফুল যে হঠাৎ তাহার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, একথাটি মনে মনে অনুমান করিবার জন্য এই কর্মব্যস্ত, সাদা-হাসিমুখ মেয়েটির উপর তাহার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

অপর্ণা বলিল—এখানে একটু বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে? মাগো, কি ছাগলের উৎপাতই তোমাদের দেশে! চারাগাছ থাকতে দেয় না, রোজ খেয়েদেয়ে সারা দুপুর কঞ্চি হাতে দাওয়ায় ব'সে ছাগল তাড়াই আর বই পড়ি—দুপুরে রোজ নিরুদি আসেন, ও-বাড়ির মেয়েরা আসে, ভারী ভাল মেয়ে কিন্তু নিরুদিদি।

আজ সারাদিন ছিল বর্ষা। সন্ধ্যার পর একটানা বৃষ্টি নামিয়াছে, হয়ত বা সারাদিন রাত্রি ধরিয়া বর্ষা চলিবে। বাহিরে কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকারে মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। বধূ বলিল—রান্নাঘরে এসে বসবে? গরম গরম সেঁকে দি—। অপু বলিল—তা হবে না, আজ এসো আমরা দুজনে এক পাতে খাবো! অর্পণা প্রথমটা রাজী হইল না, অবশেষে স্বামীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া একটা থালায় রুটি সাজাইয়া খাবার ঠাঁই করিল।

অপু দেখিয়া বলিল,—ও হবে না, তুমি আমার পাশে বসো, ও-রকম বসলে চলবে না। আরও একটু—আরও—পরে সে বাঁ-হাতে অপর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এবার এসো দু'জনে খাই—

বধূ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তোমার বদ্‌খেয়ালও মাথায় আসে, মাগো মা! দেখতে তো খুব ভালমানুষটি!

লাভের মধ্যে বধূর একরূপ খাওয়াই হইল না সেরাত্রে। অন্যমনস্ক অপু গল্প করিতে করিতে থালায় রুটি উঠাইতে উঠাইতে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল—পাছে স্বামীর কম পড়িয়া যায় এই ভয়ে সে বেচারী খান-তিনের বেশী নিজের জন্য লইতে পারিল না। খাওয়ার পর অর্পণা বলিল—কই, কি বই এনেছ বললে, দেখি?

দু'জনেই কৌতুকপ্রিয় সমবয়সী সুস্থ মন, বালকবালিকার মত আমোদ করিতে, গল্প করিতে, সারারাত জাগিতে, অকারণে অর্থহীন বকিতে দুজনেরই সমান আগ্রহ, সমান উৎসাহ। অপু একখানা নতুন-আনা বই খুলিয়া বলিল—পড়ো তো এই পদ্যটা?

অর্পণা প্রদীপের সলতেটা চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়া উস্কাইয়া দিয়া

পিলসুজটা আরও নিকটে টানিয়া আনিল। পরে সে লজ্জা করিতেছে দেখিয়া অপু উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—পড়ো না, কই দেখি ?

অপর্ণা যে কবিতা এত সুন্দর পড়িতে পারে অপুর তাহা জানা ছিল না। সে ঈষৎ লজ্জাজড়িত স্বরে পড়িতেছিল—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা—

অপু পড়ার প্রশংসা করিতেই অপর্ণা বই মুড়িয়া বন্ধ করিল। স্বামীর দিকে উজ্জ্বলমুখে চাহিয়া কৌতুকের ভঙ্গিতে বলিল—থাকগে পড়া, একটা গান করো না !

অপু বলিল, একটা টিপ পরো না খুকী ! ভারী সুন্দর মানাবে তোমার কপালে—

অপর্ণা সলজ্জ হাসিয়া বলিল···যাও—

—সত্যি বলছি অপর্ণা, আছে টিপ ?—

—আমার বয়সে বুঝি টিপ পরে ? আমার ছোট বোন শান্তির এখন টিপ পরবার বয়স তো—

কিন্তু শেষে তাহাকে টিপ পরিতেই হইল। সত্যই ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল, প্রতিমার চোখের মত টানা, আয়ত সুন্দর চোখ দুটির উপর দীর্ঘ, ঘনকালো, জোড়াভুরুর মাঝখানটিতে টিপ মানাইয়াছে কি সুন্দর। অপুর মনে হইল—এই মুখের জন্যই জগতের টিপ সৃষ্টি হইয়াছে—প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় এই টিপ-পরা মুখখানি বার-বার সতৃষ্ণ চোখে চাহিয়া দেখিবার জন্যই।

অপর্ণা বলে—ছাই দেখাচ্ছে, এ বয়েসে কি টিপ মানায় ? কি—করি পরের ছেলে, বললে তো আর কথা শুনবে না তুমি ! ভারী দুষ্টু—এত জ্বালাতনও তুমি করতে পার !···

অপু বলিল—আচ্ছা, আমায় দেখতে কেমন দেখায় বলো—না সত্যি —কেমন মুখ আমার ? ভাল, না পেঁচার মত ?

অপর্ণার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল দেখাইল—নাক সিঁটকাইয়া বলিল—বিশ্রী, পেঁচার মত।

অপু কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিল—আর তোমার মুখ তো ভাল, তা হলেই হয়ে গেল। যাই, শুইগে যাই—রাত কম হয় নি—কাল ভোরে আবার—

বধূ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই রাত্রিটা গভীর দাগ দিয়া গিয়াছিল অপুর মনে। মাটির ঘরের আনাচে-কানাচে, গাছপালায় বাঁশবনে, ঝিম্-ঝিম্ নিশীথের একটানা বর্ষার

ধারা। চারিধারই নিস্তব্ধ। পূর্বদিকের জানালা দিয়া বর্ষার জল বাদল রাতের দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে আসে—মাটির প্রদীপের আলোতে, খড়ের ঘরের মেজেতে মাদুর বিছাইয়া সে ও অপর্ণা।

অপু বলিল—দ্যাখো আজ রাত্রে মায়ের কথা মনে হয়—মা যদি আজ থাকতেন?

অপর্ণা শান্ত স্বরে বলিল—মা সবই জানেন,—যেখানে গিয়েছেন, সেখান থেকেই সবই দেখছেন। পরে সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দ্যাখো, আমি মাকে দেখেছি।

অপু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল। অপর্ণার মুখ শান্ত, স্থির বিশ্বাস ও সরল পবিত্রতা ছাড়া আর কিছু নাই।

অপর্ণা বলিল—শোন, একদিন কি মাসটায়, তোমার সেদিন চিঠি এল দুপুর বেলা। বিকেলে আঁচল পেতে পান্‌চালার সিঁড়িতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—সেদিন সকালে উঠোনের ঐ লাউগাছটাকে পুঁতেছি, কঞ্চি কেটে তাকে উঠিয়েছি, খেতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, বুঝলে? স্বপ্নে দেখছি—একজন কে দেখতে বেশ সুন্দর, লালপেড়ে শাড়ি-পরা, কপালে সিঁদুর, তোমার মুখের মত আদল, আমায় আদর ক'রে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন—ও আবাগীর মেয়ে, অবেলায় শুয়ো না, ওঠো, অসুক-বিসুক হবে আবার! তারপর তিনি তাঁর হাতের সিঁদুরের কৌটো থেকে আমার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিতেই আমি চমকে জেগে উঠলাম—এমন স্পষ্ট আর সত্যি বলে মনে হ'ল যে, তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম সিঁদুর লেগে আছে কি না—দেখি কিছুই না—বুক ধড়াস ক'রে উঠল—চারদিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে—বাড়িতে কেউ নেই—খানিকক্ষণ না পারি কিছু করতে—হাত পা যেন অবশ—তারপর মনে হ'ল, এ মা—আর কেউ না, ঠিক মা। মা এসেছিলেন এয়োতির সিঁদুর পরিয়ে দিতে। কাউকে বলি নি, আজ বললাম তোমায়।

বাহিরের বর্ষাধারার অবিশ্রান্ত রিম্‌ঝিম্ শব্দ একটা কি পতঙ্গ বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে পূবে-হাওয়ার দমকা, অপর্ণার মাথার চুলের গন্ধ। জীবনের এই সব মুহূর্ত বড অদ্ভুত। অনভিজ্ঞ হইলেও অপু তাহা বুঝিল। হঠাৎ ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকে যেন অন্ধকার পথের অনেকখানি নজরে পড়ে। এমন সব চিন্তা মনে আসে, সাধারণ অবস্থায়, সুস্থ মনে সারাজীবনেও সে-সব চিন্তা মনে আসিত না। কেমন একটা রহস্য —আত্মার অদৃষ্টলিপি···একটা বিরাট অসীমতা···

কিন্তু পরক্ষণেই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কোনও কথা বলিল না। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না, কেহই কোন কথা বলিল না।

খানিকটা পরে সে বলিল, আর একটা কবিতা পড়ো—শুনি বরং—

অপর্ণা বলিল—তুমি একটা গান করো—

অপু রবিঠাকুরের গান গাহিল একটা, দুইটা, তিনটা। তারপর আবার কথা, আবার গল্প। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আর রাত নেই কিন্তু—ফর্সা হয়ে এল—

—ঘুম পাচ্ছে ?

—না। তুমি একটা কাজ করো না ? কাল আর যেও না—

—আফিস কামাই করব ? তা কি কখনো চলে ?

ভোর হইয়া গেল। অপর্ণা উঠিতে যাইতেছিল, অপু কোন্ সময় ইতিমধ্যে তাহার আঁচলের সঙ্গে নিজের কাপড়ের সঙ্গে গিঁট বাঁধিয়া রাখিয়াছে, উঠিতে গিয়া টান পড়িল। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ওমা তুমি কি! আচ্ছা দুষ্টু তো—এখুনি হারাণের মা কাজ করতে আসবে—বুড়ী কী ভাববে বল দিকি ? ভাববে, এত বেলা অবধি ঘরের মধ্যে—মাগো মা, লজ্জা করে—ছিঃ।

অপু ততক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

—ছাড়ো, ছাড়ো, লক্ষ্মী—ছিঃ—এখুনি এল বলে বুড়ী, পায়ে পড়ি তোমার ছাড়ো—

অপু নির্বিকার।

এমন সময়ে বাহিরে হারাণের মায়ের শোনা গেল। অপর্ণা ব্যস্তভাবে মিনতির স্বরে বলিল—ওই এসেছে বুড়ী—ছাড়ো ছিঃ—লক্ষ্মীটি—ওরকম দুষ্টুমি করে না—লক্ষ্মী—

হারাণের মা কপাটের গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—ও বৌমা, ভোর হয়ে গিয়েছে। ওঠো, ওঠো, ঘড়া ঘটিগুলো বার ক'রে দেবে না ?

অপু হাসিয়া উঠিয়া আঁচলের গিঁট খুলিয়া দিল।

আফিস কামাই করিয়া সে-দিনটা অপু বাড়িতেই রহিয়া গেল।

অপরাজিত — **ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ**

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী উপলক্ষে খুব ভিড়। অপু অনেক দিন হইতে ইন্‌স্টিটিউটের সভ্য, তাহাদের জনকয়েকের উপর শিশুমঙ্গল ও খাদ্য

বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার আছে। দুপুর হইতে সে এই কাজে লাগিয়া আছে। মন্মথ বি-এ পাশ করিয়া এটর্নির আর্টিক্‌ল্‌ড্‌-ক্লার্ক হইয়াছে। তাহার সহিত একদিন ইন্‌স্টিটিউটের বসিবার ঘরে ঘোর তর্ক। অপুর দৃঢ় বিশ্বাস—যুদ্ধেব পব ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে। বিলাতে লয়েড জর্জ বলিয়াছেন, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে আমরা আর পদানত করিয়া রাখিব না। ভারতকে দিয়া আব ক্রীতদাসের কার্য করাইয়া লইলে চলিবে না। Indians must not remain as hewers of wood and drawers of water

এই সময়েই একদিন ইন্‌স্টিউটের লাইব্রেরিতে কাগজ খুলিয়া একটা সংবাদ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। জোয়ান অব্‌ আর্ককে রোমান্‌ ক্যাথলিক যাজক-শক্তি তাঁহাদেব ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুর তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

তার শৈশবের আনন্দ-মুহূর্তের সঙ্গিনী সেই পল্লীবালিকা জোয়ান—ইছামতীর ধাবে শান্ত বাব্‌লা-বনের ছায়ায় বসিয়া শৈশবের সে স্বপ্নভবা দিনগুলিতে যাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়! ইহার পর সে একদিন সিনেমাতে জোয়ান অব্‌ আর্কের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব দেখিল! ডম্‌রেমির নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ফ্রান্সের সকল প্রদেশ হইতে লোকজন জড়ো হইয়াছে—পৃথিবীব বিভিন্ন স্থান হইতে কত নরনাবী আসিয়াছে···সামরিক পোশাকে সজ্জিত ফবাসী সৈনিক কর্মচারীর দল সবসুদ্ধ মিলিয়া একমাইল দীর্ঘ বিরাট শোভাযাত্রা। জোয়ানের সঙ্গে তার নাড়ীর কি যেন যোগ—জোয়ানের সম্মানে তার নিজেব বুক যেন গর্বে ফুলিয়া উঠিতেছিল। শৈশবের স্বপ্নেব সে-মোহ অপু এখনও কাটাইতে উঠিতে পারে নাই।

বড হইয়া অবধি সে এই মেয়েটিকে কি শ্রদ্ধার চোখে ভক্তির চোখে দেখিয়া আসিয়াছে এতদিন, সে-কথা জানিত এক অনিল—নতুবা কল্পনা যাহাদের পঙ্গু, মন মিনমিনে, পান্‌সে—তাহাদের কাছে সে-কথা তুলিয়া লাভ কি? কলেজে পড়িবার সময় সে বড ইতিহাসে, জোয়ানের বিস্তৃত বিবরণ পড়িয়াছে—অতীত শতাব্দীব সেই অবুঝ নিষ্ঠুরতা ধর্মমতের গোঁড়ামি, খুঁটিতে বাঁধিয়া হৃদয়হীন দাহন—সূর্যদেবের রথচক্রের দ্রুত আবর্তনে অসীম আকাশে যেমন দুপুর হয় বৈকাল, বৈকাল হয় রাত্রি, রাত্রি হয় প্রভাত—মহাকালের রথচক্রের আবর্তনে এক অন্ধকার শতাব্দীর অন্ধকারপুঞ্জ তেমনি পরের শতাব্দীতে দূরীভূত হইয়া যাইতেছে। সত্যের শুকতারা একদিন যে প্রকাশ হইবেই, জীবনের দুঃখদৈন্যের অন্ধকার শুধু যে প্রভাতেরই অগ্রদূত—কাল-কাকলিময়, ফুল-ফোটা অমৃত-ঝরা প্রভাত।

অন্যমনস্ক মনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে খাদ্য-বিভাগের ঘরে ঢুকিতে,

যাইতেছে, কে তাহাকে ডাকিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া প্রথমটা চিনিতে পারিল না—পরে বিস্ময়ের স্বরে বলিল—প্রীতি, না? এগ্‌জিবিশন দেখতে এসেছিলে বুঝি? ভাল আছ?

প্রীতি অনেক বড় হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিল, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে সঙ্গিনী একটি প্রৌঢ়া মহিলাকে ডাকিয়া বলিল—মা, আমার মাস্টার মশায় অপূর্ববাবু—সেই অপূর্ববাবু।

অপু প্রণাম করিল। প্রীতি বলিল—আচ্ছা আপনার রাগ তো? এক কথায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, দেখুন! কত ছোট ছিলুম, বুঝতুম কি কিছু? তারপর আপনাকে কত খোঁজ করেছিলুম, আর কোনও সন্ধানই কেউ বলতে পারলে না। আপনি আজকাল কি করছেন মাস্টার মশায়?

—ছেলেও পড়াই, রাত্রে খবরের কাগজের আফিসে চাকরিও করি—

—আচ্ছা মাস্টার মশাই, আপনাকে যদি বলি, আমাদের বাড়ি কি আপনি আর যাবেন না?

অপুর মনে পূর্বতন ছাত্রীর উপর কেমন একটা স্নেহ আসিল। কথা গুছাইয়া বলিতে জানিত না, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল সে সময়—তাহারও অত সহজে রাগ করা ঠিক হয় নাই। সে বলিল,—তুমি অত অপ্রতিভ ভাবে কথা বলছ কেন প্রীতি! দোষ আমারই, তুমি না হয় ছেলেমানুষ ছিলে, আমার রাগ করা উচিত হয় নি—

ঠিকানা বিনিময়ের পর প্রীতি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

আবার অপুর এ-কথা মনে না হইয়া পারিল না—কাল, মহাকাল, সবারই মধ্যে পরিবর্তন আনিয়া দিবে···তোমার বিচারের অধিকার কি?

আরও মাস দুই কোন রকমে কাটাইয়া অপু পূজার সময় দেশে গেল। সেদিন ষষ্ঠী, বাড়ির উঠানে পা দিয়া দেখিল পাড়ার একদল মেয়ে ঘরের দাওয়ায়, মাদুর পাতিয়া বসিয়া হাসি কলরব করিতেছে—অপু উপস্থিত হইতে অপর্ণা ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল! পাড়ার মেয়েদের সে আজ ষষ্ঠী উপলক্ষে বৈকালিক জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের হাতে সকলকে আল্‌তা সিঁদুর পরাইয়াছে। হাসিয়া বলিল,—ভাগ্যিস্ এলে! ভাবছিলাম এমন কলার বড়াটা আজ ভাজলাম—

—সত্যি, কৈ দেখি?

—বা রে, হাত মুখ ধোও—ঠাণ্ডা—অমন পেটুক কেন তুমি?···পেটুক গোপাল কোথাকার!

পরে সে রেকাবিতে খাবার আনিয়া বলিল,—এগুলো খেয়ে ফেলো, তারপর

আরও দেব—দ্যাখো তো খেয়ে, মিষ্টি হয় নি তো?—তোমার তো আবার একটুখানি গুড়ে হবে না।

খাইতে খাইতে অপু ভাবিল—বেশ তো শিখেছে করতে। বেশ—

পরে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়াতে বলিল,—বাঃ ও-রকম আলপনা দিয়েছে কে? ভারী সুন্দর তো! অপর্ণা মৃদু হাসিল,—ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজোতে তো এলে না! আমি বাড়িতে পূজো করলাম,—মা করতেন, সিঁদুরমাখা কাঠা দেখি তোলা রয়েছে, তাতে নতুন ধান পেতে—বামুন খাওয়ালাম। তুমি এলেও দু'টি খেতে পেতে গো—তারই ঐ আল্‌পনা—

—তাই তো! তুমি ভারী গিন্নী হয়ে উঠেছ দেখছি! লক্ষ্মীপূজো, লোক খাওয়ানো—আমার কিন্তু এসব ভারী ভাল লাগে অপর্ণা—সত্যি, মাও খুব ভালবাসতেন—একবার তখন আমরা এখানে নতুন এসেছি—একজন বুড়োমত লোক আমাদের উঠোনের ধারে এসে দাঁড়িয়ে বললে,—খোকা ক্ষিদে পেয়েছে, দুটো মুড়ি খাওয়াতে পারো?—আমি মাকে গিয়ে বললাম, মা একজন মুড়ি খেতে চাচ্ছে, ওকে খানকতক রুটি করে খাওয়ালে ভারী খুশী হবে,—খাওয়াবে মা? মা কি করলেন বলো তো?

—রুটি তৈরী ক'রে বুঝি—

—তা নয়। মা একটু ক'রে সরের ঘি ক'রে রাখতেন, আমি বোর্ডিং থেকে বাড়িটাড়ি এলে পাতে দিতেন। আমায় খুশী করবার জন্য মা সেই ঘি দিয়ে আট-দশখানা পরোটা ভেজে লোকটাকে ডেকে, দাওয়ার কোলে পিঁড়ি পেতে খেতে দিলেন। লোকটা তো অবাক, তার মুখের এমন ভাব হ'ল!

রাত্রে অপর্ণা বলিল—দ্যাখো, মা চিঠি লিখেছেন,—পূজোর পর মুরারি-দা আসবেন নিতে, পাঁচ-ছমাস যাই নি, তুমি যাবে আমাদের ওখানে?

অপুর বড় অভিমান হইল। সে এত আশা করিয়া পূজার সময় বাড়ি আসিল, আর একদিকে কিনা অপর্ণা বাপের বাড়ি যাইবার জন্য পা বাড়াইয়া আছে। সে-ই তাহা হইলে ভাবিয়া মরে, অপর্ণার কাছে বাপের বাড়ি যাওয়াটাই অধিকতর লোভনীয়!

অপু উদার সুরে বলিল—বেশ, যাও। আমার যাওয়া ঘটবে না, ছুটি নেই এখন। কথাটা শেষ করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বই পড়িতে লাগিল। অপর্ণা খানিকক্ষণ পরে বলিল—এবার যে বইগুলো এনেছ আমার জন্যে, ওর মধ্যে একখানা 'চয়নিকা' তো আনলে না? সেই যে সে-বার বলে গেলে জন্মাষ্টমীর সময়? এক-আধ কথার জবাব পাইয়া ভাবিল সারা দিনের কষ্টে স্বামীর হয়ত ঘুম আসিতেছে। তখন সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

দশমীর পরদিনই মুরারি আসিয়া হাজির। জামাইকেও যাইতে হইবে, অপর্ণার মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি নানা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। অপু বলিল—পাগল! ছুটি কোথায় যে যাব আমি? বোনকে নিতে এসেছ, বোনকেই নিয়ে যাও ভাই—আমরা গরীব চাকুরে লোক, তোমাদের মত জমিদার নই—আমাদের কি গেলে চলে?

অপর্ণা বুঝিয়াছিল স্বামী চটিয়াছে, এ অবস্থায় তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না আদৌ, কিন্তু বড় ভাই লইতে আসিয়াছে সে কি করিয়াই বা 'না' বলে? দো-টানার মধ্যে সে বড় মুশকিলে পড়িল। স্বামীকে বলিল—ত্যাখো আমি যেতাম না। কিন্তু মুরারি-দা এসেছেন, আমি কি কিছু বলতে পারি?… রাগ কবো না লক্ষ্মীটি, তুমি এখন না যাও, কালীপূজোর ছুটিতে অবিশ্যি ক'রে যেও—ভুলো না যেন।

অপর্ণা চলিয়া যাইবার পর মনসাপোতা আর একদিনও ভাল লাগিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়া সে রাত্রিটা সেখানে কাটাইতে হইল, কারণ অপর্ণারা গেল বৈকালের ট্রেনে। কোনদিন লুচি হয় না কিন্তু দাদার কাছে স্বামীকে ছোট হইতে না হয়, এই ভাবিয়া অপর্ণা দুইদিনই রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়াছিল—আজও স্বামীর খাবার আলাদা করিয়া ঘরের কোণে ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। লুচি ক'খানা খাইয়াই অপু উদাস মনে জানালার কাছে আসিয়া বসিল। খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, বাড়ির উঠানের গাছে গাছে এখনও কি পাখি ডাকিতেছে, শূন্য ঘর, শূন্য শয্যাপ্রান্ত—অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। অপর্ণা সব বুঝিয়া তাহাকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া গেল। বড়লোকের মেয়ে কিনা?…আচ্ছা বেশ।…অভিমানের মুখে সে একথা ভুলিয়া গেল যে, অপর্ণা আজ দু'মাস এই শূন্য বাড়িতে শূন্য শয্যায় তাহারই মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে!

পরদিন প্রত্যুষে অপু কলকাতা রওনা হইল। সেখানে দিনচারেক পরেই অপর্ণার এক পত্র আসিল,—অপু সে পত্রের কোনও জবাব দিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে অপর্ণার আর একখানা চিঠি। উত্তর না পাইয়া ব্যস্ত আছে, শরীর ভাল আছে তো? অসুখ-বিসুখের সময়, কেমন আছে পত্রপাঠ যেন জানায়, নতুবা বড় দুর্ভাবনার মধ্যে থাকিতে হইতেছে। তাহারও কোন জবাব গেল না।

মাসখানেক কাটিল।

কার্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন একখানা দীর্ঘ পত্র আসিল। অপর্ণা লিখিয়াছে—ওগো, আমার বুকে এমন পাষাণ চাপিয়ে আর কতদিন রাখবে,

আমি এত কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে? আজ একমাসের ওপর হ'ল তোমার একছত্র লেখা পাই নি, কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি, তা কাকে জানাব? দ্যাখো, যদি কোন দোষই ক'রে থাকি, তুমি যদি আমার উপর রাগ করবে তবে ত্রিভুবনে আর কার কাছে দাঁড়াই বল তো?

অপু ভাবিল,—বেশ জব্দ, কেন যাও বাপের বাড়ি?...আমাকে চাইবার দরকার কি, কে আমি? সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব পুলকের ভাব মনের কোণে দেখা দিল—পথে, ট্রামে, আফিসে, বাসায়, সব-সময়, সকল অবস্থাতেই মনে না হইয়া পারিল না যে পৃথিবীতে একজন কেহ আছে, যে সর্বদা তাহার জন্য ভাবিতেছে, তাহারই চিঠি না পাইলে সে-জনের দিন কাটিতে চাহে না, জীবন বিস্বাদ লাগে। সে যে হঠাৎ এক সুন্দরী তরুণীর নিকট এতটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে—এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অভিনব ও অদ্ভুত তাহার কাছে। অতএব তাহাকে আরও ভাবাও, আরও কষ্ট দাও, তাহার রজনী আরও বিনিদ্র করিয়া তোল।

সুতরাং অপর্ণার মিনতি বৃথা হইল। অপু চিঠির জবাব দিল না।

একদিকে অপুদের অফিসের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া আসিল। কাগজ উঠিয়া যাইবার যোগাড়, একদিন সত্বাধিকারী তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কি করা উচিত সে-সম্বন্ধে পরামর্শ। কথাবার্তার গতিকে বুঝিল কাগজের পরমায়ু আর বেশী দিন নয়। তাহার একজন সহকর্মী বাহিরে আসিয়া বলিল—এ বাজারে চাকরিটুকু গেলে মশাই দাঁড়াবার যো নেই একেবারে—বোনের বিয়েতে টাকা ধার, সুদে-আসলে অনেক দাঁড়িয়েছে, সুদটা দিয়ে থামিয়ে রাখার উপায় যদি না থাকে, মহাজন বাড়ি ক্রোক দেবে মশাই, কি যে করি!

ইতিমধ্যে সে একদিন লীলাদের বাড়ি গেল। যাওয়া সেখানে ঘটে নাই প্রায় বছর দুই, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে দেখিয়া লীলা আনন্দ ও বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—একি আপনি! আজ নিতান্তই পথ ভুলে বুঝি এদিকে এসে পড়লেন? অপু যে শুধু অপ্রতিভ হইল তাহা নয়, কোথায় যেন সে নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিল। একটুখানি আনাড়ীর মত হাসি ছাড়া লীলার কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। লীলা বলিল—এবার না হয় আপনার। পরীক্ষার বছর, তার আগে তো অনায়াসেই আসতে পারতেন? অপু মৃদু হাসিয়া বলিল—কিসের পরীক্ষা? সে সব তো আজ বছর দুই ছেড়ে দিয়েছি। এখন খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি।

লীলা প্রথমটা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথাটা যেন বিশ্বাস করিল না, পরে দুঃখিতভাবে বলিল,—কি জন্য ছাড়লেন পড়া, শুনি? আ-প-নি পড়া ছেড়েছেন!

লীলার চোখের এই দৃষ্টিটা অপুর প্রাণে কেমন একটা বেদনার সৃষ্টি করিল, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার দৃষ্টি, তবুও সে হাসিমুখে কৌতুকের সুরে বলিল—এমনি দিলুম ছেড়ে, ভাল লাগে না আর, কি হবে পড়ে? তাহার এই হাল্‌কা কৌতুকের সুরে লীলা মনে আঘাত পাইল, অপূর্ব কি ঠিক সেই পুরানো দিনের অপূর্বই আছে? না যেন?

অপু বলিল—তুমি তো পড়ছ, না?

লীলা নিজের সম্বন্ধে কোন কথা হঠাৎ বলিতে চায় না, অপুর প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবে বলিল—এবার আই-এ পাশ করেছি, থার্ড ইয়ারে পড়ছি। আপনি আজকাল পুরোনো বাসায় থাকেন, না, আর কোথাও উঠে গিয়েছেন?

লীলার মা ও মাসীমা আসিলেন! লীলা নিজের আঁকা ছবি দেখাইল। বলিল—এবার আপনার মুখে 'স্বর্গ হইতে বিদায়'টা শুনব, মা আর মাসীমা সেই জন্য এসেছেন।

আরও খানিক পরে অপু বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল, লীলা বৈঠকখানা দোর পর্যন্ত সঙ্গে আসিল, অপু হাসিয়া বলিল,—লীলা, আচ্ছা, ছেলেবেলায় তোমাদের বাড়িতে কোন বিয়েতে তুমি একটা হাসির কবিতা বলেছিলে মনে আছে? মনে আছে সে কবিতাটা?

উঃ? সে আপনি মনে ক'রে রেখেছেন এতদিন! সে সব কি আজকের কথা?

অপু অনেকটা আপন-মনেই অন্যমনস্কভাবে বলিল—আর একবার তুমি তোমার জন্যে-আনা দুধ অর্ধেকটা খাওয়ালে আমায় জোর ক'রে, শুনলে না কিছুতেই—ওঃ, দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল!

বলিয়া সে হাসিল, কিন্তু লীলা কোনও কথা বলিল না। অপু একবার পিছন দিকে চাহিল লীলা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন দেখিতেছে।

ফিরিবার পথে একটা কথা তাহার বার বার মনে আসিতেছিল। অপর্ণা সুন্দরী বটে, কিন্তু লীলার সঙ্গে এ-পর্য্যন্ত দেখা কোন মেয়ের তুলনা হয় না, হওয়া অসম্ভব। লীলার রূপ মানুষের মত নয় যেন, দেবীর মত রূপ, মুখের অনুপম শ্রীতে, চোখের ও ভ্রূর ভঙ্গিতে, গায়ের রং-এ, গলার সুরে, গতির ছন্দে।

অপু বুঝিল সে লীলাকে ভালবাসে, গভীর ভাবে ভালবাসে, কিন্তু তা আবেগহীন, শান্ত, ধীর ভালবাসা! মনে তৃপ্তি আনে, স্নিগ্ধ আনন্দ আনে, কিন্তু শিরায় উপশিরায় রক্তের তাণ্ডব নর্ত্তন তোলে না! লীলা তাহার বাল্যের

সাথী, তাহার উপর মায়ের পেটের বোনের মত একটা মমতা, স্নেহ ও অনুকম্পা, একটা মাধুর্যভরা ভালবাসা।

দিন কয়েক পরে, একদিন লীলার দাদামশায়ের এক দারোয়ান আসিয়া তাহাকে একখানা পত্র দিল, উপরে লীলার হাতের ঠিকানা লেখা। পত্রখানা সে খুলিয়া পড়িল। দু-লাইনের পত্র, একবার বিশেষ প্রয়োজনে আজ বা কাল ভবানীপুরের বাড়িতে যাইতে লিখিয়াছে

লীলা সাদাসিধা লালপাড় শাড়ি পরিয়া মাঝের ছোট ঘরে তাহার সঙ্গে দেখা করিল। যাহাই সে পরে, তাহাতেই তাহাকে কি সুন্দর না মানায়! সকাল আটটা, লীলা বোধ হয় বেশীক্ষণ ঘুম হইতে উঠে নাই, রাত্রির নিদ্রালুতা এখনও যেন ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, মাথার চুল অবিন্যস্ত, ঘাড়ের দিকে ঈষৎ এলাইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের পদ্মের মত মুখের পাশে চূর্ণকুন্তলের দু-এক গাছা। অপু হাসিমুখে বলিল—থার্ড ইয়ার ব'লে বুঝি লেখাপড়া ঘুচেছে! আটটার সময় ঘুম ভাঙল? না এখনও ঠিক ভাঙেনি?

লীলা যে কত পছন্দ করে অপুকে তাহার এই সহজ আনন্দ, খুশী ও হাল্‌কা হাসির আবহাওয়ার জন্য! ছেলেবেলাতেও সে দেখিয়াছে, শত দুঃখের মধ্যেও অপুর আনন্দ, উজ্জ্বলতা ও কৌতুকপ্রবণ মনের খুশী কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিত না, এখনও তাই, একরাশ বাহিরের আলো ও তারুণ্যের সজীব জীবনানন্দ সে সঙ্গে করিয়া আনে যেন, যখনই আসে—আপনা-আপনিই এসব কথা লীলার মনে হইল। তাহার মনে পড়িল, মায়ের মৃত্যুর খবরটা সে এই রকম হাসিমুখেই দিয়াছিল লালদীঘির মোড়ে।

—আসুন, বসুন, বসুন। কুড়েমি ক'রে ঘুমুই নি, কাল রাত্রে বড় মামীমার সঙ্গে বায়োস্কোপে গিয়েছিলাম সাড়ে-ন'টার শো'তে। ফিরতে হয়ে গেল পৌনে বারো, ঘুম আসতে দেড়টা। বসুন, চা আনি।

জাপানি গালার সুদৃশ্য চায়ের বাসনে সে চা আনিল। সঙ্গে পাঁউরুটী-টোষ্ট খোলাসুদ্ধ ডিম, কি একপ্রকার শাক, আধখানা ভাঙা আলু—সব সিদ্ধ, ধোঁয়া উড়িতেছে! অপু বলিল—এসব সাহেবী বন্দোবস্ত বোধ হয় তোমার দাদা-মশায়ের, লীলা? ডিম তা আবার খোলাসুদ্ধ, এ শাকটা কি?

লীলা হাসিমুখে বলিল—ওটা লেটুস্? দাঁড়ান ডিম ছাড়িয়ে দি। আপনার দাড়ির কাছে ও কাটা দাগটা কিসের? কামাবার সময় কেটে ফেলেছেন বুঝি?

অপু বলিল,—ও কিছু না, এমনি কিসের। ব'সো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তুমি চা খাবে না?

লীলার ছোটভাই ঘরে ঢুকিয়া অপুর দিকে চাহিয়া হাসিল, নাম বিমলেন্দু,

দশ এগারো বছরের সুশ্রী বালক। লীলা তাহাকে চা ঢালিয়া দিল, পরে তিনজনে নানা গল্প করিল। লীলা নিজের আঁকা কতকগুলি ছবি দেখাইল, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিল! সে এম এ. পাশ করিবে, নয় তো বি এ. পাশ করিয়া বিদেশে যাইতে চায়, দাদামশায়কে রাজী করাইয়া লইবে, ইউরোপের বড় আর্ট গ্যালারিগুলির ছবি দেখিবে, ফিরিয়া আসিয়া অজন্তা দেখিতে যাইবে, তার আগে নয়। একটা আলমারী দেখাইয়া বলিল—দেখুন না এই বইগুলো?…ভ্যাসারির লাইভস্…এডিশনটা কেমন?…ছবিগুলো দেখুন—সেণ্ট্ এ্যাণ্টনির ছবিটা আমার বড় ভাল লাগে, কেমন একটা তপস্যাস্তব্ধ ভাব, না?—ইন্স্টলমেণ্ট সিস্টেমে এগুলো কিনেছি—আপনি কিনবেন কিছু? ওদের ক্যান্‌ভাসার আমাদের বাড়ি আসে, তা হলে ব'লে দি—

অপু বলিল—কত ক'রে মাসে?…ভ্যাসারির এডিশনটা তা'হলে না হয়—

—এটা কেন কিনবেন? এটা তো আমার কাছেই রয়েছে—আপনার যখন দরকার হবে, নেবেন—আমার কাছে যা যা আছে, তা আপনাকে কিনতে হবে কেন?—দাঁড়ান, আর একটা বইয়ের একখানা ছবি দেখাই—

অপু ছবিটার দিক হইতে আর একবার লীলার দিকে চাহিয়া দেখিল—বতিচেলির প্রিন্সেস্ দেস্ত খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু বতিচেলির বা দ্য-ভিঞ্চির প্রতিভা লইয়া যদি লীলার এই অপূর্ব সুন্দর মুখ, যৌবন-পুষ্পিত দেহলতা ফুটাইয়া তুলিতে পারিত কেউ!—

কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল—আমি কি ভাবছি বলব লীলা? আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম, তোমাকে মডেল ক'রে ছবি আঁকতাম—

লীলা সে কথার কোন জবাব না দিয়া হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, আচ্ছা, অপূর্ববাবু একটা ভাল চাকরি যদি কোথাও পাওয়া যায়, তো করেন?

অপু বলিল—কেন করব না; কিসের চাকরি?

লীলা বিবরণটা বলিয়া গেল! তাহার দাদামশায় একটা বড় স্টেটের এটর্নি, তাদের অফিসে একজন সেক্রেটারী দরকার—মাইনে দেড় শো টাকা, চাকরীটা দাদামশায়ের হাতে, লীলা বলিলে এখনই হইয়া যায়, সেই জন্যই আজ তাহাকে ডাকিয়া আনা!

অপুর মনে পড়িল, সেদিন কথায় কথায় সে লীলার কাছে নিজের বর্তমান চাকুরির দুরবস্থা ও খবরের কাগজখানা উঠিয়া যাওয়ার কথাটা অন্য কি সম্পর্কে একবারটি তুলিয়াছিল।

লীলা বলিল—সেদিন রাত্রে আমি তাঁর মুখে কথাটা শুনলাম, আজ সকালেই আপনাকে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি রাজী আছেন তো? বলুন,

দাদামশায়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যাই, ওঁর একখানা চিঠিতে হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতায় অপুর মন ভরিয়া গেল। এত কথার মধ্যে লীলা চাকুরী যাওয়ার কথাটাই কি ভাবে মনে ধরিয়া বসিয়াছিল।—

লীলা বলিল—আপনি আজ দুপুরে এখানে না খেয়ে যাবেন না! আসুন —পাখাটা দয়া ক'রে টিপে দিন না।

কিন্তু চাকুরি হইল না। এসব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা না থাকায় লীলা একটু ভুল করিয়াছিল, দাদামশায়কে বলিয়া রাখে নাই অপুর কথা। দিন দুই আগে লোক লওয়া হইয়া গিয়াছে। সে খুব দুঃখিত হইল, একটু অপ্রতিভও হইল। অপু দুঃখিত হইল লীলার জন্য। বেচারী লীলা! সংসারের কোন অভিজ্ঞতা তাহার কি আছে? একটা চাকুরি খালি থাকিলে যে কতখানা উমেদারীর দরখাস্ত পড়ে, বড়লোকের মেয়ে, তাহাব খবর কি করিয়া জানিবে।

লীলা বলিল—আপনি এক কাজ করুন না, আমার কথা রাখতে হবে কিন্তু, ছেলেবেলার মত একগুঁয়ে হলে কিন্তু চলবে না—প্রাইভেটে বি. এ-টা দিয়ে দিন। আপনাব পক্ষে সেটা কঠিন না কিছু।

অপু বলিল—বেশ দেব।

লীলা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—ঠিক? অনার ব্রাইট?

—অনার ব্রাইট!

শীতের অনেক দেরী, কিন্তু এরই মধ্যে লীলাদের গাড়িবারান্দার পাশে জাফরিতে ওঠানো মার্শালনীলের লতায় ফুল দেখা দিয়েছে, বারান্দার সিঁড়ির দু'পাশের টবে বড় বড় পল নিরোন ও ব্ল্যাক প্রিন্স ফুটিয়াছে। বর্ষাশেষে চাইনিজ ফ্যান্ পামের পাতাগুলো ঘন সবুজ।

পদ্মপুকুর রোডে পা দিয়াই অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। লীলা ছেলেমানুষ লীলা—সে কি জানে সংসারের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠুর সঙ্ঘর্ষের কাহিনী? আজ তাহার মনে হইল, লীলার পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে সেটা তুলিয়া দিবার জন্য সে নিজের সুখ শান্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিতে পারে।

বিবাহের পর লীলার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, কিন্তু দু-একবার বলি বলি করিয়াও অপু বিবাহের কথা বলিতে পারিল না, অথচ সে নিজে ভালই বোঝে যে, না বলিতে পারিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় পূজার বিলম্ব অতি সামান্যই।

শনিবার। অনেক আফিস আজ বন্ধ হইবে, অনেকগুলি সম্মুখের মঙ্গলবারে বন্ধ। দোকানে দোকানে খুব ভিড—ঘণ্টাখানেক পথে হাঁটিলে হ্যাণ্ডবিল হাত পাতিয়া লইতে লইতে ঝুড়িখানেক হইয়া উঠে। একটা নতুন স্বদেশী দেশলাইয়ের একখানা পথে পথে জাঁকাল বিজ্ঞাপন মারিয়াছে।

আমড়াতলা গলির বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার নকুলেশ্বর শীলের প্রাসাদোপম সুবৃহৎ অট্টালিকার নিম্নতলেই ইহাদের অফিস। অনেকগুলি ঘর ও দুটা বড হল কর্মচারীতে ভর্তি! দিনমানেও ঘরগুলির মধ্যে ভালো আলো যায় না বলিয়া বেলা চারটা না বাজিতেই ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে।

ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেন সন্তর্পণে পর্দা ঠেলিয়া ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিল। ম্যানেজার নকুলেশ্বর শীলের বড জামাই দেবেন্দ্রবাবু। ভারী কড়া মেজাজের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়াছে, দোহারা ধরণের চেহারা। বেশ ফর্সা, মাথায় টাক। এক কলমের খোঁচায় লোকের চাকরি খাইতে এমন পারদর্শী লোক খুব অল্পই দেখা যায়। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন—কি হে নৃপেন?

নৃপেন ভূমিকাস্বরূপ দুইখানা টাইপ-ছাপা কি কাগজ মঞ্জুর করাইবার ছলে তাঁহার টেবিলের উপর রাখিল।

সহি শেষ হইলে নৃপেন একটু উশখুশ করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আরক্ত-মুখে বলিল—আমি—এই—আজ বাড়ি যাব—একটু সকালে, চারটেতে গাড়ি কি না? সাড়ে তিনটেতে না গেলে—

—তুমি এই সেদিন তো বাড়ি গেলে মঙ্গলবারে। রোজ রোজ সকালে ছেড়ে দিতে গেলে অফিস চলবে কেমন ক'রে? এখনও তো একখানা চিঠি টাইপ কর নি দেখছি—

এ আফিসে শনিবারে সকালে ছুটির নিয়ম নেই। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পূর্বে কোনদিন অফিসের ছুটি নাই। কি শনিবার, কি অন্যদিন। কোনও পাল-পার্বণে ছুটি নাই, কেবল পূজার সময় এক সপ্তাহ, শ্যামাপূজার একদিন ও সরস্বতী পূজায় একদিন। অবশ্য রবিবারগুলি বাদ। ইহাদের বন্দোবস্ত এইরূপ—চাকরি করিতে হয় কর, নতুবা যাও চলিয়া। এ ভয়ানক বেকার সমস্যার দিনে কর্মচারিগণ নবমীর পাঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে চাণক্যশ্লোকের

উপদেশ মত চারিদিকে পুরোভাগে বজায় ও ছুটিছাটা, অপমান অসুবিধাকে পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করতঃ কায়ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।

নৃপেন কি বলিতে যাইতেছিল—দেবেনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—মল্লিক য়্যাণ্ড্ চৌধুরীদেব মর্টগেজখানা টাইপ করেছিলে?

নৃপেন কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আজ্ঞে, কই ওদের অফিস থেকে তো পাঠিয়ে দেয় নি এখনও?

—পাঠিয়ে দেয় নি তো ফোন কর নি কেন? আজ সাতদিন থেকে বলছি—কচি খোকা তো নও? যা আমি না দেখব তাই হবে না?

নৃপেনের ছুটির কথা চাপা পড়িয়া গেল এবং সে বেচারী পুনরায় সাহস করিয়া সে-কথা উঠাইতেও পারিল না।

সন্ধ্যার অল্প পূর্বে ক্যাশ ও ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের কেরানীরা বাহির হইল—অন্য অন্য কেরানীগণ আরও ঘণ্টাখানেক থাকিবে। অত্যন্ত কম বেতনের কেরানী বলিয়া কেহই তাহাদেব মুখের দিকে চায় না, বা তাহারা নিজেরাও আপত্তি উঠাইতে ভয় পায়।

দেউড়ীতে দারোয়ানেরা বসিয়া খৈনী খাইতেছে, ম্যানেজার ও সুপারিণ্টে-ণ্ডেন্টেব যাতায়াতের সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৌজের কায়দায় সেলাম করে, ইহাদিগকে পোঁছেও না।

ফুটপাথে পা দিয়া নৃপেন বলিল—দেখলেন অপূর্ববাবু, ম্যানেজার বাবুর ব্যাপার? একদিন সাড়ে তিনটের সময় ছুটি চাইলাম, তা দিলে না—অন্য সব অফিস দেখুন গিয়ে চুটোতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাবা সব এতক্ষণ ট্রেনে যে যার বাড়ি পৌঁছে চা খাচ্ছে আব আমরা এই বেরুলাম—কি অত্যাচাবটা বলুন দিকি?

প্রবোধ মুহুরী বলিল—অত্যাচাব ব'লে মনে কব ভায়া, কাল থেকে এস না, মিটে গেল। কেউ তো অত্যাচাব পোয়াতে বলে নি। ওঃ ক্ষিদে যা পেয়েছে ভায়া, একটা মানুষ পেলে ধরে খাই এমন অবস্থা। রোজ রোজ এমনি—হার্টের রোগ জন্মে গেল ভায়া, শুধু না খেয়ে খেয়ে—

অপু হাসিয়া বলিল—দেখবেন প্রবোধ দা, আমি পাশে আছি, এ যাত্রা আমাকে না হয় রেহাই দিন। ধরে খেতে হয় রাস্তার লোকের ওপর দিয়ে আজকের ক্ষিদেটা শান্ত করুন। আমি আজ তৈরি হয়ে আসি নি। দোহাই দাদা!

তাহার দুঃখের কথা লইয়া এরূপ ঠাট্টা করিতে প্রবোধ মুহুরী খুব খুশী হইল না। বিরক্তমুখে বলিল, তোমাদের তো সব তাতেই হাসি আর ঠাট্টা।

ছেলেছোকরার কাছে কি কোন কথা বলতে আছে—আমি যাই, তাই বলি!'
হাসি সোজা ভাই, কই দাও দিকি ম্যানেজারকে ব'লে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে? হুঁ, তার বেলা—

অপুকে হাঁটিতে হয় রোজ অনেকটা। তার বাসা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে গোলদীঘির কাছে। তের টাকা ভাড়াতে নীচু একতলা ঘর, ছোট রান্নাঘর। সামান্য বেতনে দু'জায়গায় সংসার চালানো অসম্ভব বলিয়া আজ বছরখানেক হইল সে অপর্ণাকে কলিকাতায় আনিয়া বাসা করিয়াছে। তবু এখানে চাকরিটি জুটিয়াছিল তাই রক্ষা!—

শৈশবের স্বপ্ন এ ভাবেই প্রায় পর্যবসিত হয়। অনভিজ্ঞ তরুণ মনের উচ্ছ্বাস, উৎসাহ—মাধুর্যভরা রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্ন—স্বপ্ন থাকিয়া যায়। যে ভাবে বড় সওদাগর হইবে, দেশে দেশে বাণিজ্যের কুঠি খুলিবে, তাহাকে হইতে হয় পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার, যে ভাবে ওকালতি পাস করিয়া রাসবিহারী ঘোষ হইবে, তাহাকে হইতে হয় কয়লার দোকানী, যাহার আশা থাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইবে, কি দ্বিতীয় কলম্বস হইবে, তাহাকে হইতে হয় চল্লিশ টাকা বেতনের স্কুলমাস্টার।

শতকরা নিরানব্বই জনের বেলা যা হয়, অপুর বেলাও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যথানিয়মে সংসার-যাত্রা, গৃহস্থালী, কেরানীগিরি, ভাড়া বাড়ি, মেলিন্স্ ফুড ও ওয়েলক্লথ। তবে তাহার শেষোক্ত দুটির এখনও আবশ্যক হয় নাই—এই যা।

অপর্ণা ঘরের দোরের কাছে বঁটি পাতিয়া কুটনা কাটিতেছে, স্বামীকে দেখিয়া বলিল—আজ এত সকাল সকাল যে। তারপর সে বঁটিখানা ও তরকারীর চুপড়ি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপু বলিল, খুব সকাল আর কৈ, সাতটা বেজেছে, তবে অন্য দিনের তুলনায় সকাল বটে। হ্যাঁ, তেলওয়ালা আর আসে নি তো?

—এসেছিল একবার দুপুরে, ব'লে দিয়েছি বুধবারে মাইনে হ'লে আসতে, তোমার আসবার দেরি হবে ভেবে এখনও আমি চায়ের জল চড়াই নি।

কলের কাছে অন্য ভাড়াটেদের ঝি-বৌয়েরা এ সময় থাকে বলিয়া অপর্ণা স্বামীর হাত-মুখ ধুইবার জল বারান্দার কোণে তুলিয়া রাখে। অপু মুখ ধুইতে গিয়া বলিল, রজনীগন্ধা গাছটা হেলে পড়েছে কেন বল তো? একটু বেঁধে দিও।

চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময়ে কলের কাছে কোন প্রৌঢ়া-কণ্ঠের কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল—তা হলে বাবু একশো টাকা বাড়িভাড়া দিয়ে সাহেব

পাড়ায় থাক গে। আজ আমার মাথা ধরেছে, কাল আমার ছেলের সর্দি লেগেছে—পালার দিন হলেই যত ছুতো। নাও না, সারা ওপরটাই তোমবা ভাড়া নাও না; দাও না পঁয়ষট্টি টাকা—আমরা না হয় আর কোথাও উঠে যাই, রোজ রোজ হাঙ্গামা কে সহ্যি করে বাপু!

অপু বলিল—আবার বুঝি আজ বেধেছে গাঙ্গুলী-গিন্নীর সঙ্গে?

অর্পণা বলিল—নতুন করে বাধবে কি, বেধেই তো আছে। গাঙ্গুলী-গিন্নীরও মুখ বড খারাপ, হালদারের বৌটা ছেলেমানুষ, কোলের মেয়ে নিয়ে পেরে ওঠে না, সংসারে তো আর মানুষ নেই, তবুও আমি এক একদিন গিয়ে বাটনা বেটে দিয়ে আসি।

সিঁড়ি ও রোয়াক ধুইবার পালা লইয়া উপরে ভাড়াটেদের মধ্যে এ রেষারেষি, দ্বন্দ্ব—অপু আসিযা অবধি এই এক বৎসরের মধ্যে মিটিল না। সকলেব অপেক্ষা তাহার খারাপ লাগে ইহাদের এই সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা। কট্ কট কবিয়া শক্ত কথা শুনাইয়া দেয়—বাঁচিয়া বাঁচাইয়া কথা বলে না, কোন্ কথায় লোকের মনে আঘাত লাগে, সে কথা ভাবিয়াও দেখে না।

বাড়িটাতে হাওয়া খেলে না, বারান্দাটাতে বসিলে হয়ত একটু পাওয়া যায়, কিন্তু একটু দূরেই ঝাঁঝরি-ড্রেন, সেখানে সারা বাসার তরকারীর খোসা, মাছের আঁশ, আবর্জনা, বাসি ভাত-তরকারী পচিতেছে, বর্ষার দিনে বাড়িময় ময়লা ও আধময়লা কাপড শুকাইতেছে, এখানে তোবড়ানো টিনেব বাক্স, ওখানে কয়লার ঝুড়ি। ছেলেমেয়েগুলা অপরিষ্কার, ময়লা পেনী বা ফ্রক পবা। অপুদেব নিজেদের দিকটা ওরই মধ্যে পরিষ্কার-পবিচ্ছন্ন থাকিলে কি হয়, এই ছোট্ট বারান্দার টবে দু-চারটে বজনীগন্ধা, বিদ্যাপাতার গাছ রাখিলে কি হয়, এই এক বৎসর সেখানে আসিয়া অপু বুঝিয়াছে, জীবনের সকল সৌন্দর্য, পবিত্রতা, মাধুর্য এখানে পলে পলে নষ্ট কবিয়া দেয়, এই আবহাওয়াব বিষাক্ত বাষ্পে মনের আনন্দকে গলা টিপিয়া মারে! চোখে পীড়া দেয় যে অসুন্দব, তা ইহাদের অঙ্গের আভরণ। থাকিতে জানে না, বাস করিতে জানে না, শূকরপালের মত খায় আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়া মহা আনন্দে দিন কাটায়। এত কুশ্রী বেষ্টনীর মধ্যে দিন দিন যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু উপায় নাই, মনসাপোতা থাকিলেও আর কুলায় না, অথচ তের টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল ঘর শহরে কোথাও মেলে না। তবুও অর্পণা এই আলো-হাওয়াবিহীন স্থানেও শ্রীছাঁদ আনিয়াছে, ঘরটা নিজের হাতে সাজাইয়াছে, বাক্সপেটরাতে নিজের হাতে বোনা ঘেরাটোপ, জানলায় ছিটের পর্দা, বালিশ মশারী সব ধপ ধপ করিতেছে, দিনে দু-তিনবার ঘর ঝাঁট দেয়।

এই বাড়ির উপরের তলার ভাড়াটে গাঙ্গুলীদের একজন দেশস্থ আত্মীয় পীড়িত অবস্থায় এখানে আসিয়া দু-তিন মাস আছেন। আত্মীয়টি প্রৌঢ়, সঙ্গে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় অতি দরিদ্র, বড়লোক আত্মীয়ের আশ্রয়ে এখানে রোগ সারাইতে আসিয়াছেন ও চোরের মত একপাশে পড়িয়া আছেন। বৌটি যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ,—ইতিপূর্বে কখনও কলিকাতায় আসে নাই—দিনরাত জুজুর মত হইয়া আছে। সারাদিন সংসারের খাটুনি খাটে, সময় পাইলেই, রুগ্ণ স্বামীর মুখের দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার উপর গাঙ্গুলী-বৌয়ের ঝঙ্কার, বিরক্তি প্রদর্শন, মধুবর্ষণ তো আছেই। অত্যন্ত গরীব, অপু রোগী দেখিতে যাইবার ছলে মাঝে মাঝে বেদানা, আঙ্গুর, লেবু দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও বড় ছেলেটিকে জামা কিনিয়া দিয়াছে।

এদিকে তাহারও চলে না। এ সামান্য আয়ে সংসার চালানো একরূপ অসম্ভব। অর্পণা অন্যদিকে ভাল গৃহিণী হইলেও পয়সা-কড়ির ব্যাপারটা ভাল বোঝে না—দুজনে মিলিয়া মহা আমোদে মাসের প্রথম দিকটা খুব খরচ করিয়া ফলে—শেষের দিকে কষ্ট পায়।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছে আফিসের এই ভূতগত খাটুনি। ছুটি বলিয়া কোনও জিনিস নাই এখানে। ছোট ঘরটিতে টেবিলের সামনে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকা সকাল এগারোটা হইতে বৈকাল সাতটা পর্যন্ত। আজ দেড় বৎসর ধরিয়া এই চলিতেছে, এই দেড় বৎসরের মধ্যে সে শহরের বাহিরে কোথাও যায় নাই। আফিস আর বাসা, বাসা আর আফিস। শীলবাবুদের দমদমার বাগান-বাড়িতে সে একবার গিয়াছিল, সেই হইতে তাহার মনের সাধ নিজের মনের মত গাছ-পালায় সাজানো বাগান-বাড়িতে বাস করা। আফিসে যখন কাজ থাকে না, তখন একখানা কাগজে কাল্পনিক বাগান-বাড়ির নক্সা আঁকে। বাড়িটা যেমন তেমন হউক, গাছপালার বৈচিত্র্যই থাকিবে বেশী। গেটের দু'ধারে দুটো চীনা বাঁশের ঝাড় থাকুক। রাঙা সুরকীর পথের ধারে ধারে রজনীগন্ধা ল্যাভেণ্ডার ঘাসের পাড় বসানো বকুল ও কৃষ্ণচূড়ার ছায়া।

বাড়িতে ফিরিয়া চা ও খাবার খাইয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে—হ্যাঁ, তারপর কাঁটালি চাঁপার পারগোলাটা কোন্ দিকে হবে বলো তো?

অর্পণা স্বামীকে এই দেড় বছরে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। স্বামীর এই সব ছেলেমানুষিতে সেও সোৎসাহে যোগ দেয়। বলে,—শুধু কাঁটালি চাঁপা? আর কি কি থাকবে, জানলার জাফরিতে কি উঠিয়ে দেব বল তো?

যে আমড়াতলার গলির ভিতর দিয়া সে আফিস যায় তাহার মত নোংরা স্থান আর আছে কি-না সন্দেহ। ঢুকিতেই শুঁটকী চিংড়ি মাছের আড়ত সারি সারি দশ-পনেরোটা। চড়া রৌদ্রের দিনে যেমন যেমন, বৃষ্টির দিনে কার সাধ্য সেখানে দিয়া যায়? স্থানে স্থানে মাড়োয়ারীদের গরু ষাঁড় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া—পিচপিচে কাদা, গোবর, পচা আপেলের খোলা।

নিত্য দু'বেলা আজ দেড় বৎসর এই পথে যাতায়াত।

তা ছাড়া রোজ বেলা এগারটা হইতে সাতটা পর্যন্ত এই দারুণ বদ্ধতা। আফিসে অন্য যাহারা আছে, তাহাদের ইহাতে তত কষ্ট হয় না। তাহারা প্রবীণ, বহুকাল ধরিয়া তাহাদের খাগের কলম শীলবাবুদের সেরেস্তায় অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাদের গর্বও এইখানে। রোকড়-নবীশ রামধনবাবু বলেন—হেঁ—হে, কেউ পারবে না মশাই, আজ এক কলমে বাইশ বছর হ'ল বাবুদের এখানে—কোন ব্যাটার ফুঁ খাটবে না বলে দিও—চার সালের ভূমিকম্প মনে আছে? তখন কর্তা বেঁচে, গদী থেকে বেরুচ্ছি, ওপর থেকে কর্তা হেঁকে বললেন, ওহে রামধন, পোস্তা থেকে ল্যাংড়া আমের দরটা জেনে এসো দিকি চট ক'রে। বেরুতে যাবো মশাই—আর যেন মা বাসুকি একেবারে চৌদ্দ হাজার ফণা নাড়া দিয়ে উঠলেন—সে কি কাণ্ড মশাই? হেঁ হেঁ আজকের লোক নই—

কষ্ট হয় অপুর ও ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেনের। সে বেচারী উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসে ম্যানেজার বসিয়া আছে কিনা। অপুর কাছে টুলের উপর বসিয়া বলে, এখনও ম্যানেজার হাইকোর্ট থেকে ফেরেন নি বুঝি, অপূর্ববাবু—ছটা বাজে ছুটি সেই সাতটায়—

অপু বলে, ও-কথা আর মনে করিয়ে দেবেন না, নৃপেনবাবু। বিকেল এত ভালবাসি, সেই বিকেল দেখি নি যে আজ কত দিন। দেখুন তো বাইরে চেয়ে, এমন চমৎকার বিকেলটি আর এই অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে ঠায় বসে আছি সেই সকাল দশটা থেকে।

মাটির সঙ্গে যোগ অনেকদিনই তো হারাইয়াছে, সে সব বৈকাল তো এখন দূরের স্মৃতি মাত্র। কিন্তু কলিকাতা শহরের যে সাধারণ বৈকালগুলি তাও তো সে হারাইয়াছে প্রতিদিন। বেলা পাঁচটা বাজিলে এক-একদিন লুকাইয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের বাড়ির উঁচু কার্ণিসের উপর যে একটুখানি বৈকালের আকাশ চোখে পড়ে তারই দিকে বুভুক্ষুর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

সামনেই উপরের ঘরে মেজবাবু বন্ধুবান্ধব লইয়া বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন,

ম্যাকারটা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াইয়া সিগারেট খাইয়া পুনরায় ঘরে ঢুকিল। মেজবাবুর বন্ধু নীলরতনবাবু একবার বারান্দায় আসিয়া কাহাকে হাঁক দিলেন। অপুর মনে হয় তাহার জীবনের সব বৈকালগুলি এরা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইয়াছে, সবগুলি এখন ওদের জিম্মায়, তাহার নিজের আর কোন অধিকার নাই উহাতে।

প্রথম জীবনের সে-সব মাধুরীভরা মুহূর্তগুলি যৌবনের কলকোলাহল কোথায় মিলাইয়া গেল? কোথায় সে নীল আকাশ, মাঠ, আমের বউলের গন্ধ ভরা জ্যোৎস্নারাত্রি? পাখি আর ডাকে না, ফুল আর ফোটে না, আকাশ আর সবুজ মাঠের সঙ্গে মেলে না—ঘেঁটুফুলের ঝোপে সদ্যফোটা ফুলের তেতো গন্ধ আর বাতাসকে তেতো করে না। জীবনের সে যে রোমান্সের স্বপ্ন দেখিয়াছিল—যে স্বপ্ন তাহাকে এতদিন শত দুঃখের মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়াছে, তার সন্ধান তো কই এখনও মিলিল না? এ তো একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন, কর্মব্যস্ত, একঘেয়ে জীবন—সারাদিন এখানে আফিসের বদ্ধজীবন, রোকড়, খতিয়ান, মর্টগেজ, ইন্‌কামট্যাক্সের কাগজের বোঝার মধ্যে পক্ককেশ প্রবীন ঝুনো সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সপিনা ধরানোর প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করা, এটর্নিদের নামে বড় বড় চিঠি মুশাবিদা করা—সন্ধ্যায় পায়রার খোপের মত অপরিষ্কার নোংরা বাসাবাড়িতে ফিরিয়াই তখনি আবার ছেলে পড়াইতে ছোটা।

কেবল এক অপর্ণাই এই বদ্ধ জীবনের মধ্যে আনন্দ আনে। আফিস হইতে ফিরিলে সে যখন হাসিমুখে চা লইয়া কাছে দাঁড়ায়, কোনদিন হালুয়া, কোনদিন দু-চারখানা পরোটা, কোনদিন বা মুড়ি নারিকেল রেকাবিতে সাজাইয়া সামনে ধরে, তখন মনে হয় এ যদি না থাকিত! ভাগ্যে অপর্ণাকে সে পাইয়াছিল! এই ছোট্ট পায়রার খোপকে যে গৃহ বলিয়া মনে হয় সে শুধু অপর্ণা এখানে আছে বলিয়া, নতুবা চৌকী, টুল, বাসন-কোসন, জানালার পর্দা এসব সংসার নয়, অপর্ণা যখন বিশেষ ধরণের শাড়িটা পরিয়া ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, অপু ভাবে, এ স্নেহনীড় শুধু ওরই চারিধারে ঘিরিয়া। ওরই মুখের হাসি বুকের স্নেহ যেন পরম আশ্রয়, নাড় রচনা সে ওরই ইন্দ্রজাল।

অফিসে সে নানা স্থানের ভ্রমণকাহিনী পড়ে, ডেস্কের মধ্যে পুরিয়া রাখে। পুরানো বইয়ের দোকান হইতে নানা দেশের ছবিওয়ালা বর্ণনাপূর্ণ বই কেনে—নানা দেশের রেলওয়ে বা ষ্টিমার কোম্পানী যে সব দেশে যাইতে সাধারণকে প্রলুব্ধ করিতেছে—কেহ বলিতেছে, হাওয়াই দ্বীপে এস একবার—এখানকার নারিকেল কুঞ্জে, ওয়াকিকির বালুময় সমুদ্রবেলায় জ্যোৎস্নারাত্রে যদি তারাভি-

মুখী উর্মিলার সঙ্গীত না শুনিয়া মর, তবে তোমার জীবন বৃথা।

এলো পাশো দেখ নাই। দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার চূর্ণাপাথরের পাহাড়ের ঢালুতে, শান্ত রাত্রির তারাভরা আকাশের তলে কম্বল বিছাইয়া একবারটি ঘুমাইয়া দেখিও···শীতের শেষে নুড়িভরা উচুনীচু প্রান্তরে কর্কশ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে দু-এক ধরনের মাত্র বসন্তের ফুল প্রথম ফুটিতে শুরু করে, তখন সেখানকার সোডা-আল্‌কালির পলিমাটিপড়া রৌদ্রদীপ্ত মুক্ত তরুবলয়ের রহস্যময় রূপ—কিংবা ওয়ালোয়া হ্রদের তীরে উন্নত পাইন ও ডগ্‌লায় ফারের ঘন অরণ্য, হ্রদের স্বচ্ছ বরফগলা জলের তুষারকিরীটী মাজামা আগ্নেয়গিরির প্রতিচ্ছায়ার কম্পন—উত্তর আমেরিকার ঘন, স্তব্ধ, নির্জন আরণ্যভূমির নিয়ত পরিবর্তনশীল দৃশ্যরাজি, কর্কশ বন্ধুর পর্বতমালা, গম্ভীরনিনাদী জলপ্রপাত, ফেনিল পাহাড়ী নদীতীরে বিচরণশীল বল্‌গা হরিণের দল, ভালুক, পাহাড়ী ছাগল, ভেড়ার দল, উষ্ণ প্রস্রবণ, তুষারপ্রবাহ, পাহাড়ের ঢালুর গায়ে সিডাব ও মেপল গাছের বনের মধ্যে বুনো ভ্যালেরিয়ান্ ও ভায়োলেট্ ফুলের বিচিত্র বর্ণসমাবেশ—দেখ নাই এসব? এস এস।

টাহিটি! টাহিটি! কোথায় কত দূরে, কোন জ্যোৎস্নালোকিত রহস্যময় কূলহীন স্বপ্নসমুদ্রের পারে, শুভরাত্রে গভীর জলের তলায় যেখানে মুক্তার জন্ম হয়, সাগরগুহায় প্রবালের দল ফুটিয়া থাকে, কানে শুধু দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত তাহাদের অপূব আহ্বান ভাসিয়া আসে। আফিসের ডেস্কে বসিয়া এক একদিন সে স্বপ্নে ভোর হইয়া থাকে—এই সবের স্বপ্নে। ঐ রকম নির্জন স্থানে যেখানে লোকালয় নাই, ঘন নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে ছোট কুটিরে, খোলা জানালা দিয়া দূরের নীল সমুদ্র চোখে পড়িবে—তার ওপারে মরকত-শ্যাম ছোট ছোট দ্বীপ, বিচিত্র পক্ষীরাজ অজানা দেশের অজানা আকাশের তলে তারার আলোয় উজ্জ্বল মাঠটা একটা রহস্যের বার্তা বহিয়া আনিবে—কুটিরের ধারে ফুটিয়া থাকিবে ছোট ছোট বনফুল—শুধু সে আর অপর্ণা।

এই সব বড়লোকের টাকা আছে, কিন্তু জগৎকে দেখিবাব, জীবনকে বুঝিবাব পিপাসা কই এদের? এ সিমেণ্ট বাঁধানো উঠান চেয়ার, কোচ, মোটর—এ ভোগ নয়, এই শৌখীন বিলাসিতার মধ্যে জীবনের সবদিকে আলো-বাতাসের বাতায়ন আটকাইয়া এ মরিয়া থাকা—কে বলে ইহাকে জীবন? তাহার যদি টাকা থাকিত? কিছুও যদি থাকিত, সামান্য কিছু। অথচ ইহারা তো লাভ-ক্ষতি ছাড়া আর কিছু শেখে নাই, বোঝেও নাই, জানে না, জীবনে আগ্রহও নাই কিছুতেই, ইহাদের সিন্দুক-ভরা নোটের তাড়া।

এই আফিস-জীবনের বদ্ধতাকে অপু শান্তভাবে, নিরুপায়ের মত দুর্বলের

মত মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে এই মানসিক দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা যুদ্ধ চলিতেছে অনবরত, সে হঠাৎ দমিবার পাত্র নয় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে—ফেনোচ্ছল সুরার মত জীবনের প্রাচুর্য ও মাদকতা তাহার সারা অঙ্গের শিরায় উপশিরায়—ব্যগ্র, আগ্রহভরা তরুণ জীবন বুকের রক্তে উন্মত্ততালে স্পন্দিত হইতেছে দিনরাত্রি—তাহার স্বপ্নকে আনন্দকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা খুব সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু এক এক সময় তাহারও সন্দেহ আসে। জীবন যে এই রকম হইবে, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতি দণ্ড পল যে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বৈচিত্র্যহীন ঘটনায় ভরিয়া উঠিবে, তাহার কল্পনা তো তাহাকে এ আভাস দেয় নাই। তবে কেন এমন হয়! তাহাকে কাঁচা, অনভিজ্ঞ পাইয়া নিষ্ঠুর জীবন তাহাকে এতদিন কি প্রতারণাই করিয়া আসিয়াছে? ছেলেবেলায় মা যেমন নগ্ন দাবিদ্র্যেব রূপকে তাহার শৈশবচক্ষু হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিত তেমনই।...

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া গেল। আজ দু'বৎসর এখানে সে চাকরি করিতেছে, পূজার পূর্বে প্রতিবারই সে ও নৃপেন টাইপিস্ট কোথাও না কোথাও যাইবার পরামর্শ আঁটিয়াছে, নক্সা আঁকিয়াছে, ভাড়া কষিয়াছে, কখনও পুরুলিয়া, কখনও পুরী—যাওয়া অবশ্য কোথাও হয় না। তবুও যাইবার কল্পনা করিয়াও মনটা খুশী হয়। মনকে, বোঝায় এবার না হয় আগামী পূজায় নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

শনিবার অফিস বন্ধ হইয়া গেল। অপুর আজকাল এমন হইয়াছে—বাড়ি ফিরিয়া অপর্ণার মুখ দেখিতে পারিলে যেন বাঁচে, কতক্ষণে সাতটা বাজিবে, ঘন ঘন ঘড়ির দিকে সতৃষ্ণ চোখে চায়। পাঁচটা বাজিয়া গেলে অকূল সময়-সমুদ্রে যেন থৈ পাওয়া যায়—আর মোটে ঘণ্টা-দুই। ছ'টা—আর এক। হোক্ পায়রার খোপের মত বাসা, অপর্ণা যেন সব দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। তাহার কাছে গেলে আর কিছু মনে থাকে না।

অপর্ণা চা ও খাবার আনিল। এ সময়টা সে আধঘণ্টা স্বামীর কাছে থাকিতে পায়, গল্প করিতে পায়; আর সময় হয় না, এখনি আবার অপুকে ছেলে পড়াইতে বাহির হইতে হইবে। অপু এ-সময় তাহাকে সব দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়াছে, ফরসা লাল পাড় শাড়িটি পরা, চুলটি বাঁধা, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ—মূর্তিমতী গৃহলক্ষ্মীর মত হাসিমুখে তাহার জন্য চা আনে, গল্প করে, রাত্রে কি রান্না হইবে রোজ জিজ্ঞাসা করে,

সারাদিনের বাসার ঘটনা বলে। বলে, ফিরে এসো, তুজনে আজ মহারানী ঝিন্দন আর দিলীপ সিংহের কথাটা প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলব।

বার-তুই অপু তাহাকে সিনেমায় লইয়া গিয়াছে, ছবি কি করিয়া নড়ে অপর্ণা বুঝিতে পারে না, অবাক হইয়া দেখে, গল্পটাও ভাল বুঝিতে পারে না। বাড়ি আসিয়া অপু বুঝাইয়া বলে।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া অপু বলিল—এবার তো তোমায় নিয়ে যেতে লিখেছেন শ্বশুরমশায়, কিন্তু অফিসের ছুটির যা গতিক—রাম এসে কেন নিয়ে যাক্ না? তারপর আমি কার্তিক মাসের দিকে না হয় তু-চারদিনের জন্য যাব? তা ছাড়া যদি যেতেই হয় তবে এ সময় যত সকালে যেতে পাবা যায়—এ সময়টা বাপ-মায়ের কাছে থাকা ভাল, ভেবে দেখলাম।

অপর্ণা লজ্জারক্তমুখে বলিল—রাম ছেলেমানুষ, ও কি নিয়ে যেতে পাববে? তা ছাড়া মা তোমায় কতদিন দেখেন নি, দেখতে চেয়েছেন।

—তা বেশ চলো আমিই যাই। রামের হাতে ছেড়ে ভরসা হয় না, এ অবস্থায় একটু সাবধানে ওঠা-নামা করতে হবে কিনা। দাও তো ছাতাটা, ছেলে পড়িয়ে আসি। যাওয়া হয় তো চলো কালই যাই।—হাঁ একটা সিগারেট দাও না?

আবার সিগারেট! আটটা সিগারেট সকাল থেকে খেয়েছো—আব পাবে না—আবার পড়িয়ে এলে একটা পাবে।

—দাও দাও লক্ষীটি—রাতে আর চাইব না—দাও একটি।

অপর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হাসিমুখে বলিল—আবার রাত্রে তুমি কি ছাড়বে আর একটা না নিয়ে? তেমন ছেলে তুমি কিনা!···

বেশী সিগারেট খায় বলিয়া অপুই সিগারেটের টিন অপর্ণার জিম্মায় রাখিবাব প্রস্তাব করিয়াছিল। অপর্ণার কড়াকড়ি বন্দোবস্ত সব সময় খাটে না, অপু বরাদ্দ অনুযায়ী সিগারেট শেষ করিবাব পর আরও চায়, পীড়াপীড়ি করে, অপর্ণাকে শেষকালে দিতেই হয়। তবে ঘরে সিগারেট না মিলিলে বাহিবে গিয়া সে পারতপক্ষে কেনে না—অপর্ণাকে প্রবঞ্চনা করিতে মনে বড বাধে—কিন্তু সবদিন নয়, ছুটি-ছাটার দিন বাড়িতে প্রাপ্য আদায় করিয়াও আরও তু-এক বাক্স কেনে, যদিও সে অপর্ণাকে জানায় না।

ছেলে পড়াইয়া আসিয়া অপু দেখিল উপরের রুগ্ণ ভদ্রলোকটির ছোট মেয়ে পিণ্টু তাহাদের ঘরের এককোণে ভীত, পাংশু মুখে বসিয়া আছে। বাড়িসুদ্ধ হৈ-চৈ! অপর্ণা বলিল, ওগো এই পিণ্টু গাঙ্গুলীদের ছোট খুকীকে নিয়ে গোলদীঘিতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ও-বুঝি চীনে বাদাম খেয়ে কলে

জল খেতে গিয়েছে, আর ফিরে এসে দ্যাখে খুকী নেই, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর মা তো একেই জুজু হয়ে থাকে, আহা সে বেচারী তো নবমীর পাঁটার মত কাঁপছে, আর মাথা কুটছে। আমি পিণ্টুকে এখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, নইলে ওর মা ওকে আজ গুঁড়ো ক'রে দেবে। আর গাঙ্গুলী গিন্নী যে কাণ্ড করছে, জানোই তো তাকে, তুমিও একটু দেখো না গো!

গাঙ্গুলী-গিন্নী মরাকান্নার আওয়াজ করিতেছেন, কানে গেল।—ওগো আমি দুধ দিয়ে কি কালসাপ পুষেছিলাম গো! আমার এ কি সর্বনাশ হ'ল গো মা, ওগো তাই আপদেরা বিদেয় হয় না আমার ঘাড় থেকে—এতদিনে মনোবাঞ্ছা—ইত্যাদি।

অপু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল—পিণ্টু খেয়েছে কিছু?

—খাবে কি? ও কি ওতে আছে? গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁত পিষছে, আহা,. ওর কোন দোষ নেই, ও কিছুতেই নিয়ে যাবে না, সেও ছাড়বে না, তাকে আগলে রাখা কি ওর কাজ।

সকলে মিলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে খুকীকে কলুটোলা থানায় পাওয়া গেল। সে পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল, বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম বলিতে পারে না, একজন কনেস্টবল এ অবস্থায় তাহাকে পাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল।

বাড়ি আসিলে অপর্ণা বলিল—পাওয়া গিয়েছে ভালই হ'ল, বৌটাকে আর মেয়েটাকে কি ক'রেই গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁতে পিষছে গো! মানুষ মানুষকে এমনও বলতে পারে! কাল নাকি এখান থেকে বিদেয় হতে হবে—হুকুম হয়ে গিয়েছে।

অপু বলিল—কিছু দরকার নেই। কাল আমরা তো চলে যাচ্ছি, আমার তো আসতে এখনও চার-পাঁচ দিন দেরি। ততদিন ওঁরা রুগী নিয়ে আমাদের ঘরে এসে থাকুন, আমি এলেও অসুবিধা হবে না, আমি না হয় এই পাশেই বরদাবাবুদের মেসে গিয়ে রাত্রে শোব। তুমি গিয়ে বলো বৌঠাকরুনকে। আমি বুঝি, অপর্ণা! আমার মা আমার বাবাকে নিয়ে কাশীতে আমার ছেলেবেলায় ওই রকম বিপদে পড়েছিলেন—তোমাকে সে সব কথা কখনও বলি নি, অপর্ণা। বাবা মারা গেলেন, হাতে একটা সিকি-পয়সা নেই আমাদের, সেখানে দু-একজন লোক কিছু কিছু সাহায্য করলে, হবিষ্যির খরচ জোটে না—মা-তে আমাতে রাত্রে শুধু অড়রের ডাল-ভিজে খেয়ে কাটিয়েছি। আমি তখন ছেলেমানুষ, বছর দশেক মোটে বয়েস—গরীব হওয়ার কষ্ট যে কি, তা আমার বুঝতে বাকি নেই—কাল সকালেই ওঁরা এখানে আসুন।

অপর্ণা যাইবার সময় পিণ্টুর-মা খুব কাঁদিল। এ বাড়িতে বিপদে-আপদে

অপর্ণা যথেষ্ট করিয়াছে। রোগীর সেবা করিয়া ছেলেমেয়েকে দেখিতে সময় পাইত না, তাদের চুল বাঁধা, টিপ পরানো, খাবার খাওয়ানো, সব নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া অপর্ণা করিত। পিণ্টু তো মাসীমা বলিতে অজ্ঞান, সকলের কান্না থামে তো পিণ্টুকে আর থামানো যায় না। বউয়ের বয়স অপর্ণার চেয়ে অনেক বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চিঠি দিও ভাই, দুটো দু-ঠাঁই ভালয় ভালয় হ'য়ে গেলে আমি মায়ের পূজো দেবো।

ঘরের চাবি পিণ্টুর মায়ের কাছে রহিল।

রেলে ও স্টিমারে অনেক দিন পর চড়া। দুজনেই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুজনেই খুব খুশী। অপর্ণাও পল্লীগ্রামের মেয়ে, শহর তাহার ভাল লাগে না। অতটুকু ঘরে কোনদিন থাকে নাই, সকাল ও সন্ধ্যাবেলা যখন সব বাসাডে মিলিয়া একসঙ্গে কয়লার উনুনে আগুন দিত, ধোঁয়ায় অপর্ণার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত, চোখ জ্বালা করিত, সে-কি ভীষণ যন্ত্রণা। সে নদীর ধারের মুক্ত আলো বাতাসে প্রকাণ্ড বাড়িতে মানুষ হইয়াছে। এসব কষ্ট জীবনে এই প্রথম—এক একদিন তাহার তো কান্না পাইত। কিন্তু এই দুই বৎসরে সে নিজের সুখ-সুবিধার কথা বড একটা ভাবে নাই। অপুর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মত। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি, খেয়াল, সংসারানভিজ্ঞতা, হাসি-খুশি, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর স্বামীর দুঃখময় জীবনের কথা, ছাত্রাবস্থায় দারিদ্র্য ও অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম—সে সব শুনিয়াছে। সে-সব অপু বলে নাই, সে-সব বলিয়াছে প্রণব। বরং অপু নিজের অবস্থা অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছিল—নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারে পৈতৃক বৃহৎ দোতালা বাড়িটার কথাটা আরও দু-একবার না তুলিয়াছিল এমন নহে—নিজে কলেজ হোস্টেলে ছিল এ কথাও বলিয়াছে। বুদ্ধিমতী অপর্ণার স্বামীকে চিনিতে বাকী নাই। কিন্তু স্বামীর কথা, সে যে সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছে এ ভাব একদিনও দেখায় নাই। বরং সস্নেহে বলে—ছাখো, তোমাদের দেশের বাড়িটাতে যাবে যাবে বললে, একদিনও তো গেলে না—ভাল বাড়িখানা,—পুলুদার মুখে শুনেছি জমিজমাও বেশ আছে—একদিন গিয়ে বরং সব দেখেশুনে এসো। না দেখলে কি ও-সব থাকে?...

অপু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলে—তা যেতামই তো কিন্তু বড় ম্যালেরিয়া। তাতেই তো সব ছাড়লাম কিনা? নৈলে আজ অভাব কি?...

কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে দু-একটা বেফাঁস কথা মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলে,

ভুলিয়া যায় আগে কি বলিয়াছিল কোন্ সময়। অপর্ণা কখনও দেখায় নাই যে, এ সব কথার অসামঞ্জস্য সে বুঝিতে পারিয়াছে। না খাইয়া যে কষ্ট পায় অপর্ণার এ কথা জানা ছিল না। সচ্ছল ঘরের আদরের লালিতা মেয়ে, দুঃখ-কষ্টের সন্ধান সে জানে না। মনে মনে ভাবে, এখন হইতে স্বামীকে সে সুখে রাখিবে।

এটা একথা নেশার মত তাহাকে পাইয়াছে। অল্পদিনেই সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, অপু কি কি খাইতে ভালবাসে। তালের ফুলুরি সে করিতে জানিত না, কিন্তু অপু খাইতে ভালবাসে বলিয়া মনসাপোতায় নিরুপমার কাছে শিখিয়া লইয়াছিল।

এখানে সে কতদিন অপুকে কিছু না জানাইয়া বাজার হইতে তাল আনাইয়াছে, সব উপকরণ আনাইয়াছে। অপু হয়তো বর্ষার জলে ভিজিয়া অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া হাসিমুখে বলিত—কোথায় গেলে অপর্ণা? এত সকালে রান্নাঘরে কি, দেখি? পরে উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিত, তালেব বড়া ভাজা হচ্ছে বুঝি! তুমি জানলে কি ক'রে—বা রে…

অপর্ণা উঠিয়া স্বামীর শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিত, বলিত, এসো না, ওখানেই ব'সে খাবে, গরম গরম ভেজে দি—! অপুর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিত। ঠিক এইভাবেই কথা বলিত মা। অপুর অদ্ভুত মনে হয়, মায়ের মত স্নেহশীল, সেবাপরায়ণা, সেইরকমই অন্তর্যামিনী। বার্ধক্যের কর্মক্লান্ত মা যেন ইহারই নবীন হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মেয়েদের দেখিবার চোখ তাহার নতুন করিয়া ফোটে, প্রত্যেককে দেখিয়া মনে হয়, এ কাহারও মা, কাহারও স্ত্রী, কাহারও বোন। জীবনে এই তিনরূপেই নারীকে পাইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হস্তের পরিবেশনে এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবন পুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কি চিনিতে বাকী আছে তাহার?

স্টীমার ছাড়িয়া দুজনে নৌকায় চড়িল। অপর্ণার খুড়তুতো ভাই মুরারী উহাদের নামাইয়া লইতে আসিয়াছিল, সে-ও গল্প করিতে করিতে চলিল। অপর্ণা ঘোমটা দিয়া একপাশে সরিয়া বসিয়াছিল। হেমন্ত-অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ ছায়া নদীর বুকে নামিয়াছে, বাঁ দিকের তীরে সারি সারি গ্রাম, একখানা বড় হাঁড়ি-কলসী বোঝাই ভড় যশাইকাটির ঘাটে বাঁধা।

অপুর মনে একটা মুক্তির আনন্দ—আর মনেও হয় না যে জগতে শীলেদের অফিসের মত ভয়ানক স্থান আছে। তাহার সহজ আনন্দ-প্রবণ মন আবার নাচিয়া উঠিল, চারিধারের এই শ্যামলতা, প্রসার, নদীজলের গন্ধের সঙ্গে তাহার যে নাড়ীর যোগ আছে।

কৌতুক দেখিবার জন্য অপর্ণাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল—ওগো কলাবৌ, ঘোমটা খোলো, চেয়ে দ্যাখো, বাপের বাড়ির দ্যাশ্‌টা চেয়ে দ্যাখো গো—

মুরারী অন্যদিকে হাসিমুখে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অপর্ণা লজ্জায় আরও জড়সড় হইয়া বসিল। আরও খানিকটা আসিয়া মুরারি বলিল—তোমরা যাও, এইখানের হাটে যদি বড় মাছ পাওয়া যায়, জ্যাঠাইমা কিনতে বলে দিয়েছেন। এইটুকু হেঁটে যাব এখন।

মুরারি নামিয়া গেলে অপর্ণা বলিল—আচ্ছা তুমি কি? দাদার সামনে ওইরকম ক'রে আমায়—তোমার সেই দুষ্টুমি এখনও গেল না? কি ভাবলে বল তো দাদা—ছিঃ! পরে রাগের সুরে বলিল—দুষ্টু কোথাকার, তোমার সঙ্গে আমি আর কোথাও কখ্‌খনো যাব না—কখনো না, থেকো একলা বাসায়।

—বয়েই গেল। আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে সেধেছিলুম কিনা? আমি নিজে মজা ক'রে বেঁধে খাব।

—তাই খেও। আহা হা, কি রান্নার ছাঁদ, তবু যদি আমি না জানতাম! আলু ভাতে, বেগুন ভাতে, সাত রকম তরকারী সব ভাতে—কি রাঁধুনি!

—নিজের দিকে চেয়ে কথা বলো। প্রথম যেদিন খুলনার ঘাটে বেঁধেছিলে মনে আছে সব আলুনি?

—ওমা আমার কি হবে? এত বড় মিথ্যেবাদী তুমি, সব আলুনী! ওমা আমি কোথায়—

—সব। বিলকুল। মায় পটলভাজা পর্যন্ত।

অপর্ণা রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তুমি ভাঙন মাছ খাও নি? আমাদের এ নোনা গাঙের ভাঙন মাছ ভারী মিষ্টি। কাল মাকে বলে তোমায় নিশ্চয়ই খাওয়াব।

—লজ্জা করবে না তার বেলায়? কি বলবে মাকে—ও মা, এই আমায়—

অপর্ণা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ।

ঠিক সন্ধ্যার সময় অপর্ণাদের ঘাটে নৌকা লাগিল। দুজনেরই মনে এক অপূর্ব ভাব। শটিবনের সুগন্ধভরা স্নিগ্ধ হেমন্ত-অপরাহ্ন তার সবটা কারণ নয়, নদীতীরে ঝুপ্‌সি হইয়া থাকা গোলগাছের সবুজ সারিও নয়, কারণ—তাহাদের আনন্দ-প্রবণ অনাবিল যৌবন—ব্যগ্র নবীন, আগ্রহভরা যৌবন।

-

জ্যোৎস্নারাত্রে উপরের ঘরে সেই ফুলশয্যায় পালঙ্কে বাতি জ্বালিয়া বসিয়া পড়িতে পড়িতে সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় থাকে। নারিকেলশাখায় দেবীপক্ষের

বকের পালকের মত শুভ্র চাঁদের আলো পড়ে, বাহিরের রাত্রির দিকে চাহিয়া কত কথা মনে আসে, কত সব পুরাতন স্মৃতি—কোথায় যেন এই ধরণের সব পুরানো দিনের কত জ্যোৎস্না-ঝরা রাত। এ যেন সব আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী, সে ছিল কোন্ কুঁড়ে ঘরে, পেট পুরিয়া সব দিন খাইতেও পাইত না —সে আজ এত বড় প্রাচীন জমিদার ঘরের জামাই, অথচ আশ্চর্য এই যে, এইটাই মনে হইতেছে সত্য। পুরানো দিনের জীবনটা অবাস্তব, অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়।

হেমন্তের রাত্রি। ঠাণ্ডা বেশ। কেমন একটা গন্ধ বাতাসে, অপুর মনে হয় কুয়াসার গন্ধ। অনেক রাত্রে অপর্ণা আসে। অপু বলে—এত রাত যে!—আমি কতক্ষণ জেগে বসে থাকি?

অপর্ণা হাসে। বলে—নিচে কাকাবাবুর শোবার ঘর। আমি সিঁড়ি দিয়ে এলে পায়ের শব্দ ওঁর কানে যায়—এই জন্য উনি ঘরে খিল না দিলে আসতে পারি নে। ভারী লজ্জা করে।

অপু জানালার খড়খড়িটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। অপর্ণা লাজুক মুখে বলিল—এই শুরু হল বুঝি দুষ্টুমি? তুমি কী!—কাকাবাবু এখনও ঘুমোন নি যে!...

অপু আবার খটাস্ করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে বলিল—অপর্ণা, এক গ্লাস জল আনতে ভুলে গেলে যে!...ও অপর্ণা—অপর্ণা?

অপর্ণা লজ্জায় বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজাইয়া পড়িয়া রহিল।

ভোর রাত্রেও দুজনে গল্প করিতেছিল।

সকালের আলো ফুটিল। অপর্ণা বলিল—তোমার ক'টায় স্টীমার?... সারারাত তো নিজেও ঘুমুলে না, আমাকেও ঘুমুতে দিলে না—এখন খানিকটা ঘুমিয়ে থাকো—আমি অনাদিকে পাঠিয়ে তুলে দেব'খন বেলা হ'লে। গিয়েই চিঠি দিও কিন্তু। জানালার পর্দাগুলো ধোপার বাড়ি দিও—আমি না গেলে আর সাবান কে দেবে? সস্নেহে স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছ—এখন তোমাকে কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করে না—কলকাতায় না মেলে দুধ, না মেলে কিছু। এখানে এসময় কিছুদিন থাকলে শরীরটা সারত। রোজ অফিস থেকে এসে মোহনভোগ খেও—পিন্টুর মাকে বলে এসেছি—সে-ই ক'রে দেবে। এখন তো খরচ কমল? বেশী ছেলে পড়ানোতে কাজ নেই। যাই তাহলে?

অপু বলিল—ব'স ব'স—এখনও কোথায় তেমন ফর্সা হয়েছে;—কাকার উঠতে এখনও দেরি।

অপর্ণা বলিল—হ্যাঁ আর একটা কথা—ছাখো, মনসাপোতার ঘরটা এবার খুঁচি দিয়ে রেখো। নইলে বর্ষার দিকে বড্ড খরচ পড়ে যাবে, কলকাতার বাসায় তো চিরদিন চলবে না—ওট হ'ল আপন ঘরদোর। এবার মনসাপোতায় ফিরব, বাস না করলে খড়ের ঘব টেঁকে না। যাই এবার, কাকা এবার উঠবেন। যাই?

অপর্ণা চলিয়া গেলে অপুর মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এখনও বাড়ির কেহই উঠে নাই—কেন সে অপর্ণাকে ছাড়িয়া দিল? কেন বলিল—যাও! তাহাব সম্মতি না পাইলে অপর্ণা কখনও যাইত না।

কিন্তু অপর্ণা আর একবার আসিয়াছিল ঘণ্টাখানেক পরে, চা দেওয়া হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে—অপু তখন ঘুমাইতেছে। খোলা জানালা দিয়া মুখে বৌদ্র লাগিতেছে। অপর্ণা সন্তর্পণে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে এমন দেখায়!—এমন একটা মায়া হয় ওর ওপরে। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ভাবিল, মা সত্যিই বলে বটে, পটের মুখ—পটে আঁকা ঠাকুর দেবতার মত মুখ—

চলিয়া আসিবার সময়ে কিন্তু অপর্ণার সঙ্গে দেখা হইল না। অপুব আগ্রহ ছিল, কিন্তু আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনে বাড়ি সরগরম—কাহাকে যে বলে অপর্ণাকে একবার ডাকিয়া দিতে? মুখচোরা অপু ইচ্ছাটা কাহাকেও জানাইতে পারিল না। নৌকায় উঠিয়া মুরারীর ছোট ভাই বিশু বলিল—আসবার সময় দিদিব সঙ্গে দেখা ক'রে এলেন না কেন, জামাইবাবু? দিদি সিঁড়ির ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, আপনি যখন চলে আসেন—

কিন্তু নৌকা তখন জোর ভাঁটার টানে যশাইকাটি বাঁকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এবার কলিকাতায় আসিয়া অনেকদিন পরে দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমেরিকা যাইতেছে। পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ায় কেহ কাহারও ঠিকানা জানিত না। অথচ দেবব্রত এখানেই কলেজে পড়িতেছিল, এবার বি. এস্-সি. পাস্ করিয়াছে।...অপুর কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকিল, আনন্দ হইল, হিংসাও হইল। প্রতি শনিবারে বাড়ি না যাইয়া যে থাকিতে পারিত না, সেই ঘর-পাগল দেবব্রত আমেরিকা চলিয়া যাইতেছে!

মাস দুই-তিন বড কষ্টে কাটিল। আজ এক বছরের অভ্যাস—আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া অপর্ণার হাসিভরা মুখ দেখা কর্মক্লান্ত মন শান্ত হইত

আজকাল, এমন কষ্ট হয়। বাসায় না ফিরিয়াই সোজা ছেলে পড়াইতে যায় আজকাল, বাসায় মন লাগে না, খালি খালি ঠেকে।

লীলারা কেহ এখানে নাই। বর্ধমানের বিষয় লইয়া কি সব মামলা মকদ্দমা চলিতেছে, অনেকদিন হইতে তাহারা সেখানে।

একদিন রবিবারে সে বেলুড় মঠ বেড়াইয়া আসিয়া অর্পণাকে এক লম্বা চিঠি দিল, ভারী ভাল লাগিয়াছে জায়গাটা, অপর্ণা এখানে আসিলে একদিন বেড়াইয়া আসিবে। এসব পত্রের উত্তর অপর্ণা খুবই শীঘ্রই দেয়, কিন্তু পত্রখানার কোন জবাব আসিল না—দু'দিন, চারদিন, সাতদিন হইয়া গেল। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল—কি ব্যাপার? অর্পণা হয়ত নাই, সে মারা গিয়াছে—ঠিক তাই। রাত্রে নানা রকম স্বপ্ন দেখে—অর্পণা ছলছল চোখে বলিতেছে—তোমায় তো বলেছিলাম আমি বেশীদিন বাঁচব না, মনে নেই?··· সেই মনসাপোতায় একদিন রাত্রে?—আমার মনে কে বলত। যাই—আবার আর জন্মে দেখা হবে।

পরদিন পড়িবে শনিবার। সে আফিসে গেল না, চাকুরির মায়া না করিয়াই সুটকেশ গুছাইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এমন সময় শ্বশুরবাড়ির পত্র পাইল। সকলেই ভাল আছে। যাক—বাঁচা গেল! উঃ, কি ভয়ানক দুর্ভাবনার মধ্যে ফেলিয়াছিল উহারা! অর্পণার উপর একটু অভিমানও হইল। কি কাণ্ড, মন ভাল না থাকিলে এমন সব অদ্ভুত কথাও মনে আসে। কয়দিন সে ক্রমাগত ভাবিয়াছে, 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গানটা কলিকাতায় আজকাল সবাই গায়। কিন্তু গানটার বর্ণনার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির এত হুবহু মিল হয় কি করিয়া? গানটা কি তাহার বেলায় খাটিয়া যাইবে?

শনিবার অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মুরারি তাহার বাসায় বারবারন্দায় চেয়ারখানাতে বসিয়া আছে। শ্যালককে দেখিয়া অপু খুব খুশী হইল—হাসিমুখে বলিল, এ কি, বাসরে! সাক্ষাৎ বড়কুটুম যে। কার মুখ দেখে না জানি যে আজ সকালে—

মুরারি খামে-আঁটা একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল—কোন কথা বলিল না। অপু পত্রখানা হাত বাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিল, মুরারির মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে। সে যেন চোখের জল চাপিতে প্রাণপ্রণ চেষ্টা করিতেছে।

অপুর বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন হিম হইয়া গেল। কেমন করিয়া আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—অর্পণা নেই?

মুরারি নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না!

—কি হয়েছিল ?

—কাল সকালে আটটার সময় প্রসব হ'ল—সাড়ে ন'টার সময়—

—জ্ঞান ছিল ?

—আগাগোড়া। ছোট কাকীমার কাছে চুপি চুপি নাকি বলেছিল ছেলে হওয়ার কথা তোমাকে তার ক'রে জানাতে। তখন ভালই ছিল। হঠাৎ ন'টার পর থেকে—

ইহার পরে অপু অনেক সময় ভাবিয়া আশ্চর্য হইত—সে তখন স্বাভাবিক সুরে অতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করিয়াছিল কি করিয়া! মুরারি বাড়ি ফিরিয়া গল্প করিয়াছিল—অপূর্বকে কি ক'রে খবর শোনাব, সারা রেল আর ষ্টিমারে শুধু তাই ভেবেছিলাম—কিন্তু সেখানে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আমায় বলতে হ'ল না—ওই খবর টেনে বার করলে।

মুরারি চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে একবার অপুর মনে হইল, নবজাত পুত্রটি বাঁচিয়া আছে, না নাই ? সে কথা তো মুরারিকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বা সে-ও কিছু বলে নাই কে জানে, হয়ত নাই।

কথাটা ক্রমে বাসার সকলেই শুনিল। পরদিন যথারীতি আফিসে গিয়াছিল, আফিস হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতেছে, উপরের ভাড়াটে বন্ধু সেন মহাশয় অপুদের ঘরের বারান্দাতে উঠিলেন। অপু বলিল—এই যে সেন মশায়, আসুন আসুন।

সেন মহাশয় জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা দুঃখসূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া টুলখানা টানিয়া লইয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

—আহা-হা, রূপে সরস্বতী গুণে লক্ষ্মী। কলের কাছে সেদিন মা আমার সাবান নিয়ে কাপড় ধুচ্ছেন, আমি সকাল সকাল স্নান করব বলে ওপরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি। বললাম—কে বৌমা ? তা মা আমার একটু হাসলেন—বলি তা থাক, মায়ের কাপড় কাচা হয়ে যাক্! স্নানটা না হয় ন'টার পরেই করা যাবে এখন—একদিন ইলিশ মাছের দইমাছ রেঁধেছেন, অমনি তা বাটি ক'রে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আহা কি রকম কথা, কি লক্ষ্মীশ্রী—সবই শ্রীহরির ইচ্ছে! সবই তাঁর—

তিনি উঠিয়া যাইবার পর আসিলেন গাঙ্গুলী-গৃহিণী। বয়সে প্রবীণা হইলেও ইনি কখনও অপুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্তা বলেন নাই। আধ-ঘোমটা দিয়া ইনি দোরের আড়াল হইতে বলিতে লাগিলেন··· আহা, জলজ্যান্ত বৌটা, এমন হবে তা তো কখন জানি নি, ভাবিনি—কাল আমার আমার বড় ছেলে নবীন বলছে রাত্তিরে, মা শুনেছ এইরকম, অপূর্ববাবুর

স্ত্রী মারা গিয়াছেন এই মাত্র খবর এল—তা বাবা আমি বিশ্বাস করি নি। আজ সকালে আবার বাঁটুল বললে—তা বলি, যাই জেনে আসি—আসব কি বাবা, তুই ছেলের অফিসেব ভাত, বাঁটুলের আজকাল আবার দমদমার গুলীর কাবখানায় কাজ, দুটো-মুখে গুঁজেই দৌড়োয়, এখন আড়াই টাকা হপ্তা, সাহেব বলেছে বোশেখ মাস থেকে দেড় টাকা বাড়িযে দেবে। ওই এক ছেলে বেখে ওর মা মাবা যায়, সেই থেকে আমারই কাছে—আহা তা ভেবো না বাবা —সবারই ও কষ্ট আছে,—তুমি পুরুষ মানুষ তোমাব ভাবনা কি বাবা? বলে—

বজায় থাকুক চুড়ো-বাঁশী
মিলবে কত সেবাদাসী—

—একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে কব না কেন?—তোমাব বয়েসটাই বা কি এমন—

অপু ভাবিল—এবা লোক ভাল তাই এসে বলছে। কিন্তু আমায় কেন একটু একা থাকতে দেয না? কেউ না আসে ঘবে সেই আমাব ভাল। এরা কি বুঝবে?

সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাবান্দায় যে কোণে ফুলেব টব সাজানো, দু-একটা মশা সেখানে বিন বিন্ করিতেছে। অন্যদিন সে সেই সময়ে আলো জ্বালে, স্টোভ জ্বালিয়া চা ও হালুযা কবে, আজ অন্ধকাবেব মধ্যে বারান্দার চেয়াব খানাতে বসিযাই বহিল একমনে। সে কি একটা ভাবিতেছিল—গভীরভাবে ভাবিতেছিল।

ঘবেব মধ্যে দেশলাই জ্বালাব শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। বুকের ভিতবটা যে কেমন কবিয়া উঠিল—মুহূর্তের জন্য মনে হইল যেন অর্পণা আছে। এখানে থাকিলে এই সময় সে স্টোভ ধরাইত, সন্ধ্যা দিত? ডাকিয়া বলিল কে?

পিণ্টু আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু—মা আপনাদের কেরোসিনের তেলেব বোতলটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে—

অপু বিস্ময়ের স্বরে বলিল—ঘরে কে রে, পিণ্টু? তোর মা?…ও! বৌ-ঠাকুরুণ?—বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দেখিল পিণ্টুর মা ঘরেব মেঝেতে স্টোভ মুছিতেছে।

—বৌ-ঠাকরুণ, তা' আপনি আবার কষ্ট করে কেন মিথ্যে—আমিই বরং ওটা—

তেলের বোতলটা দিয়া সে আবাব আসিয়া বারান্দাতে বসিল। পিণ্টুর মা স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার তৈরী করিয়া পিণ্টুর হাতে পাঠাইয়া দিল ও রাত্রি নয়টার পর নিজের ঘর হইতে ভাত বাড়িয়া আনিয়া অপুদের ঘরের মেঝেতে খাইবার ঠাঁই করিয়া, ভাতের থালা ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেল।

পিণ্টুর বাবা সারিয়া উঠিয়াছেন, তবে এখনও বড় দুর্বল, লাঠি ধরিয়া সকালে বিকালে একটু-আধটু গোলদীঘিতে বেড়াইতে যান, নিচের একঘর ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়াতে সেই ঘরেই আজকাল ইহারা থাকেন। ডাক্তার বলিয়াছে, আর মাসখানেকের মধ্যে দেশে ফেরা চলিবে। পরদিন সকালেও পিণ্টুর মা ভাত দিয়া গেল। বৈকালে অফিস হইতে আসিয়া কাপড় জামা না ছাড়িয়াই বাহিরে বারান্দাতে বসিয়াছে। বউটি স্টোভ ধরাইতে আসিল।

অপু উঠিয়া গিয়া বলিল—রোজ রোজ আপনাকে এ কষ্ট করতে হবে না, বৌদি। আমি এই গোলদীঘির ধারের দোকান থেকে খেয়ে আসব চা।

বউটি বলিল—আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ঠাকুরপো, আমার আর কি কষ্ট? টুলটা নিয়ে এখানে বসুন, দেখুন চা তৈরী করি।

এই প্রথম পিণ্টুর মা তাহার সহিত কথা কহিল। পিণ্টু বলিল—কাকাবাবু, আমাকে গোলদীঘিতে বেড়াতে নিয়ে যাবে? একটা ফুলের চারা তুলে আন্‌ব, এনে পুঁতে দেব।

বউটির বয়স ত্রিশের মধ্যে, পাত্‌লা একহারা গড়ন, শ্যামবর্ণ, মাঝামাঝি দেখিতে। খুব ভালও নয়, মন্দও নয়। অপু টুলটা দুয়ারের কাছে টানিয়া বসিল। বউটি চায়ের জল নামাইয়া বলিল—এক কাজ করি ঠাকুরপো, একেবারে চাট্টি ময়দা মেখে আপনাকে খানকতক লুচি ভেজে দি—ক'খানাই বা খান—একেবারে রাতের খাবারটা এই সঙ্গেই খাইয়ে দি—সারাদিন ক্ষিদেও তো পেয়েছে।

মেয়েটি নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে তাহার নিজের সঙ্কোচ ক্রমে চলিয়া যাইতেছিল। সে বলিল—বেশ! করুন মন্দ কি। ওরে পিণ্টু, ওই পেয়ালাটা নিয়ে আয়—

থাক, থাক ঠাকুরপো, আমি ওকে আলাদা দিচ্ছি। কেট্‌লিতে এখনও চা আছে—আপনি খান। আপনাদের বেলুনটা কোথায় ঠাকুরপো?

—সত্যি আপনি বড্ড কষ্ট করছেন, বৌ-ঠাকরুণ—আপনাকে এত কষ্ট দেওয়াটা—

পিণ্টুর মা বলিল—আপনি বার বার ও-রকম বলছেন কেন? আপনারা আমার যা উপকার করেছেন, তা নিজের আত্মীয়ও করে না আজকাল। কে পরকে থাকবার জন্যে ঘর ছেড়ে দেয়?···কিন্তু আমার সে বলবার মুখ তো দিলেন না ভগবান, কি করি বলুন। আমি রুগী সামলে মেয়েকে যদি খাওয়াতে না পারি, তাই সে দুবেলা আপনি খেয়ে অফিসে গেলেই পিণ্টুকে নিজে গিয়ে ডেকে এনে আপনার পাতে খাওয়াত। এক একদিন—

কথা শেষ না করিয়াই পিণ্টুর মা হঠাৎ চুপ করিল। অপুর মনে হইল ইহার সঙ্গে অর্পণার কথা কহিয়া সুখ আছে, এ বুঝিবে, অন্য কেহ বুঝিবে না।

সারাদিন অপু কাজকর্মে ভুলিয়া থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, যখনই একটু মনে আসে অমনি একটা কিছু কাজ দিয়া সেটাকে চাপা দেয়। আগে সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া কি ভাবিত, খাতাপত্রে গল্প কবিতা লিখিত —কাজ ফাঁকি দিয়া অন্য বই পড়িত। কিন্তু অর্পণার মৃত্যুর ওর হইতে সে দশগুণ খাটিতে লাগিল, সকলের কাছে কাজের তাগাদা করিয়া, সারাদিনের কাজ দু'ঘণ্টায় করিয়া ফেলে, তাহার লেখা চিঠি টাইপ করিতে করিতে নৃপেন বিরক্ত হইয়া উঠিল।

পূর্ণিমা তিথিটা—অর্পণা ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া, এই তো গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মীর মত মহিমময়ী, কি সুন্দর ডাগর চোখ দুটি, কি সুন্দর মুখশ্রী। অপুর মনে হইয়াছিল ওর ঘাড ফেরাবার ভঙ্গিটা যেন রানীর মত—এক এক সময় সম্ভ্রম আসে মনে। অর্পণা হাসিয়া বলে—আমার যে লজ্জা করে, নইলে সকালে তোমার খাবার ক'রে দিতে ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোন লুচি ভাজতে জানে,—সেজ খুড়ীমা ছেলে সামলে সময় পান না—মা—থাকেন ভাড়ারে, তোমার খাবার কষ্ট হয়—না? হঠাৎ অপুর মনে হয়—দূর ছাই—কি লিখে যাচ্ছি মিছে—কি হবে আর এসবে?

কি বিরাট শূন্যতা—কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে,—জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে—কখনও না, কাহারও দ্বারা না—সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ফুলফল নাই—শুধু এক রুক্ষ, ধূসর বালুকাময় বহুবিস্তীর্ণ মরুভূমি!

মাসখানেক পরে পিণ্টুর মা বলিল—কখনো ভাই দেখি নি, ঠাকুরপো। আপনাকে সেই ভাইয়ের মত পেলুম, কিছু করতে পারলাম না কিছু—দিদি বলে যদি মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যান—তবে জানব সত্যিই আমি ভাই পেয়েছি।

অপু সংসারের বহু দ্রব্য পিণ্টুদের জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল—ডালা কুলো, ধামা, বঁটি, চাকী, বেলুন। পিণ্টুর মা কিছুতেই সে সব লইতে রাজী নয়—অপু বলিল, কি হবে বৌদি, সংসার তো উঠে গেল, ওসব আর হবে কি, অন্য কাউকে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে আপনারা নিয়ে যান, আমার মনে তৃপ্তি হবে তবুও।

মৃত্যুর পর কি হয় কেহই বলিতে পারে না? দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিল—ওসব কথা ভাবিয়া তো তাহাদের ঘুম নাই। মেসে বরদাবাবুর

উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার কাছেও একদিন কথাটা পাড়িল। বরদাবাবু তাহাকে মামুলি সান্ত্বনার কথা বলিয়া কর্তব্য সমাপন করিলেন। একদিন পল ও ভার্জিনিয়ার গল্প পড়িতে পড়িতে দেখিল মৃত্যুর পর ভার্জিনিয়া প্রণয়ী পলকে দেখা দিয়াছিল—হতাশ মন এইটুকু সূত্রকেই ব্যগ্র আগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তবুও তো এতটুকু আলো—সে আফিসে, মেসে বাসায় যে সব লোকের সঙ্গে কারবার করে—তাহারা নিতান্ত মামুলি ধরণেব সাংসারিক জীব—অপুর প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা আড়ালে হাসে, চোখ টেপাটেপি করে—করুণার হাসি হাসে। এইটাই অপু বরদাস্ত করিতে পারে না আদৌ। একদিন একজন সন্ন্যাসীর সন্ধান পাইয়া দরমাহাটার এক গলিতে তাঁহার কাছে সকালের দিকে গেল। লোকের খুব ভীড়, কেহ দর্শনপ্রার্থী, কেহ ঔষধ লইতে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর অপুর ডাক পড়িল। সন্ন্যাসী গেরুয়াধারী নহেন, সাদা ধুতি পরণে, গায়ে হাত-কাটা বেনিয়ান, জলচৌকির উপর আসন পাতিয়া আছেন। অপুর প্রশ্ন শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, —আপনার স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন? মাস দুই?—তাঁর পুনর্জন্ম হয়ে গিয়েছে।—অপু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ক'রে আপনি—মানে—

সন্ন্যাসীজী বলিলেন—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়। এতদিন থাকে না—আপনাকে বলে দিচ্ছি, বিশ্বাস করতে হয় এসব কথা। ইংরিজি পড়ে আপনারা তো এ সব মানেন না! তাই হ'তে হবে।

অপুর একথা আদৌ বিশ্বাস হইল না। অর্পণা, তাহার অর্পণা আর মাস আট-নয় পরে অন্য দেশে কোন গৃহস্থের ঘরের সব ভুলিয়া ছোট খুকী হইয়া জন্মিবে?…এত স্নেহ, এত প্রেম, এত মমতা—এসব ভূয়োবাজি? অসম্ভব! …সারারাত কিন্তু এই চিন্তায় সে ছট্‌পট্ করিতে লাগিল—একবাব ভাবে, হয়ত সন্ন্যাসী ঠিকই বলিয়াছেন—কিন্তু তার মন সায় দেয় না, মন বলে, ও-কথাই নয়—মিথ্যা, মিথ্যা মিথ্যা,…স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্ম আসিয়া বলিলেও সে-কথা বিশ্বাস করিবে না। দুঃখের মধ্যে হাসিও পাইল। ভাবিল অর্পণার পুনর্জন্ম হয়ে গেছে, ওর কাছে টেলিগ্রাম এসেছে! হাম্‌বাগ কোথাকার—ছাথ না কাণ্ড!…

এত ভয়ানক সঙ্গীহীনতার ভাবে গত দশ এগারো মাস তাহার হয় নাই। পিণ্টুরা চলিয়া যাওয়ার পর বাসাও ভাল লাগে না, অর্পণার সঙ্গে বাসাটা এতখানি জড়ানো যে, আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তদুপরি বিপদ, গাঙ্গুলি-গিন্নী তাঁহার কোন বোনঝির সঙ্গে তাহার বিবাহের যোগাযোগের জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহাকে একা একটু বসিতে দেখিলে

সংসারের অসারত্ব, কথিত বোনঝিটির রূপগুণ, সম্মুখের মাঘ মাসে মেয়েটিকে একবার দেখিয়া আসিবার প্রস্তাব, নানা বাজে কথা।

নিজে রাঁধিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা—অবশ্য ইতিপূর্বে সে বরাবরই রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এবার যেন রাঁধিতে কাহার উপর একটা সুতীব্র অভিমান। ঘরটাও বড় নির্জন, রাত্রিতে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। পাষাণভারের মত দারুণ নির্জনতা সব সময় বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। এমন কি, শুধু ঘরে নয়, পথে-ঘাটে, আফিসেও তাই—মনে হয় জগতে কেহ কোথাও আপনার নাই।

তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঠিকানা নাই—প্রণবও নাই এখানে। মুখের আলাপী দু'চারজন বন্ধু আছে বটে কি ও-সব বে-দরদী লোকের সঙ্গ ভাল লাগে না। রবিবার ও ছুটির দিনগুলি তো আর কাটেই না—অপুর মনে পড়ে বৎসরখানেক পূর্বেও শনিবারের প্রত্যাশায় সে-সব আগ্রহভরা দিন গণনা—আর আজকাল? শনিবার যত নিকটে আসে তত ভয় বাড়ে।

বৌবাজারের এক গলির মধ্যে তাহার এক কলেজ বন্ধুর পেটেণ্ট ঔষধের দোকান। অর্পণার কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া বসে। এ রবিবার দিনটাও বেড়াইতে গেল। কারবারের অবস্থা খুব ভাল নয়। বন্ধুটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—, তুমি?—আমার আজকাল হয়েছে ভাই—'কে আসিল বলে চমকিয়ে চাই, কাননে ডাকিলে পাখি'—সকাল থেকে হরদম পাওনাদার আসছে আর যাচ্ছে—আমি বলি বুঝি কোন পাওনাদার এল, ব'স ব'স।

অপু বসিয়া বলিল—কাবুলীর টাকাটা শোধ দিয়েছ?

—কোথা থেকে দেব দাদা? সে এলেই পালাই, নয় তো মিথ্যে কথা বলি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের দেনার দরুণ—ছোট আদালতে নালিশ করেছিল, পরশু এসে বাক্সপত্র আদালতের বেলিফ সীল ক'রে গিয়েছে। তোমার কাছে বলতে কি, এবেলায় বাজার খরচটা পর্যন্ত নেই—তার ওপর ভাই বাড়িতে সুখ নেই। আমি চাই একটু ঝগড়াঝাটি হোক, মান-অভিমান হোক—তা নয়, বৌটা হয়েছে এমন ভাল মানুষ সাত চড়ে রা নেই—

অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বল কি হে, সে তোমার ভাল লাগে না বুঝি?...

—রামোঃ—পান্‌সে লাগে, ঘোর পান্‌সে। আমি চাই একটু দুষ্টু হবে, একগুঁয়ে হবে—স্মার্ট হবে—তা নয় এত ভাল মানুষ, যা বলছি তাই করছে—

সংসারের এই কষ্ট, হয়তো একবেলা খাওয়াই হ'ল না—মুখে কথাটি নেই! কাপড় নেই—তাই সই, ডাইনে বললে তক্ষুণি ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে—নাঃ অসহ্য হয়ে পড়েছে।—বৈচিত্র্য নেই রে ভাই! পাশের বাসার বৌটা সেদিন কেমন স্বামীর উপর রাগ ক'রে কাচের গ্লাস, হাতবাক্স দুম্‌দাম্‌ ক'রে আছাড মেরে ভাঙলে, দেখে হিংসে হ'ল, ভাবলাম হায় রে, আর আমার কি কপাল! না, হাসি না—আমি তোমাকে সত্যি সত্যি প্রাণের কথা বলছি ভাই—এরকম পান্‌সে ঘরকন্না আর আমার চলছে না—বিলিভ্‌ মি—অসম্ভব!···ভালমানুষ নিয়ে ধুয়ে খাব? একটা দুষ্টু মেয়ের সন্ধান দিতে পার?···

—কেন আবাব বিয়ে করবে না কি?—একটাকে পার না খেতে দিতে—তোমায় দেখছি সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—

—না ভাই, এ সুখ আমার আর—জীবনটা এখন দেখছি একেবারে ব্যর্থ হ'ল মনের কোনও সাদ মিটল না—এক এক সময় ভাবি ওর সঙ্গে আমার ঠিক মিলন হয় নি—মিলন যদি ঘটত তাহলে দ্বন্দ্বও হ'ত—বুঝলে না?···কে, টেঁপি?—এই আমার বড় মেয়ে—শোন্‌, তোর মার কাছ থেকে দুটো পয়সা দিয়ে দু'পয়সার বেগুনি কিনে নিয়ে আয় তো আমাদের জন্যে, আর অমনি চায়ের কথা বলে দে—

—আচ্ছা মরণের পর মানুষ কোথায় যায় জান? বলতে পার?

—ও সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নি কখনও। পাওনাদার কি ক'রে তাডানো যায় বলতে পার? এখুনি কাবুলীওয়ালা একটা আসবে নেবুতলা থেকে। আঠার টাকা ধার নিয়েছি, চার আনা টাকা পিছু সুদ হপ্তায়। দু-হপ্তায় সুদ বাকী, কি যে আজ তাকে বলি?—স্কাউণ্ড্রেলটা এল বলে—দিতে পার দুটো টাকা ভাই?

—এখন তো নেই কাছে, একটা আছে রেখে দাও। কাল সকালে আর একটা টাকা দিয়ে যাব এখন। এই যে টেঁপি, বেশ বেগুন এনেছিস্‌—না না, আমি খাব না, তোমরা খাও, আচ্ছা এই একখানা তুলে নিলাম, নিয়ে যা টেঁপি!

বন্ধুর দোকান হইতে বাহির হইয়া সে খানিকটা লক্ষহীনভাবে ঘুরিল। লীলা এখানে আছে? একবার দেখিয়া আসিবে? প্রায় একবৎসর লীলারা এখানে নাই, তাহার দাদামহাশয় মামলা করিয়া লীলার পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু উদ্ধার করিয়াছেন, আজকাল লীলা মায়ের সঙ্গে আবার বর্ধমানের বাড়িতেই ফিরিয়া গিয়াছে। থার্ড ইয়ারে ভর্তি হইয়া এক বৎসর পড়িয়াছিল—পরীক্ষা দেয় নাই, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ভবানীপুর লালাদের ওখানে গেল। রামলগন বেয়ারা তাহাকে চেনে, বৈঠকখানায় বসাইল, মিঃ লাহিড়ী এখানে নাই, রাঁচি গিয়াছেন। লীলা দিদিমণি? কেন, সে-কথা বাবুর জানা নাই? দিদিমণির তো বিবাহ হইয়া গিয়াছে গত বৈশাখ মাসে। নাগপুরে জামাইবাবু বড় ইঞ্জিনিয়ার, বিলাতফেরত—একেবারে খাঁটি সাহেব, দেখিলে চিনিবার জো নাই। খুব বড লোকেব ছেলে—এদের সমান বড লোক। কেন বাবুর কাছে নিমন্ত্রণের চিঠি যায় নাই?

অপু বিবর্ণমুখে বলিল—কই না, আমার কাছে, হ্যাঁ—না আর ব'সব না—আচ্ছা।

বাহিরে আসিয়া জগৎটা যেন অপুর কাছে একেবারে নির্জন, সঙ্গীহীন বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহান ঠেকিল। কেন এইরকম মনে হইতেছে তাহার? লীলা বিবাহ করিবে ইহার মধ্যে অসম্ভব তো কিছু নাই? সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে তাহাতে মন খারাপ কবিবার কি আছে? ভালোই তো। জামাই ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন—লীলার উপযুক্ত বর জুটিয়াছে, ভালোই তো।

রাস্তা ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের মাঠটাতে অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল।

লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভাল কথা। ভালই তো।

অপরাজিত — পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা আর ভাল লাগে না, কিছুতেই না—এখানকার ধরাবাঁধা রুটিন-মাফিক কাজ, বদ্ধতা, একঘেয়েমি—এ যেন অপুর অসহ্য হইয়া উঠিল। তা ছাড়া একটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে ক্রমেই গড়িয়া উঠিতেছিল—কলিকাতা ছাড়িলেই যেন সর্ব দুঃখ দূর হইবে—মনের শান্তি আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইবে!

শীলেদের অফিসের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে সে চাঁপাদানীর কাছে একটা গ্রাম্য স্কুলের মাস্টারি লইয়া গেল। জায়গাটা না শহর, না-পাড়াগাঁ গোছের—চারিধারে পাটের কল ও কুলিবস্তি, টিনের চালাওয়ালা দোকানঘর ও বাজার, কয়লার গুঁড়োফেলা রাস্তার কালো ধূলো ও ধোঁয়া, শহরের পারিপাট্যও নাই, পাড়াগাঁয়ের সহজ শ্রীও নাই।

বড়দিনের ছুটিতে প্রণব ঢাকা হইতে কলিকাতায় অপুর সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিল। সে জানিত অপু আজকাল কলিকাতায় থাকে না—সন্ধ্যার কিছু আগে সে চাঁপদানী পৌছিল।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অপুর বাসাও বাহির করিল। বাজারের একপাশে একটা ছোট্ট ঘর—তার অর্ধেকটা একটা ডাক্তারখানা, স্থানীয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার সকালে বিকালে রোগী দেখেন। বাকী অর্ধেকটাতে অপুর একখানা তক্তপোশ, একটা আধময়লা বিছানা, খানকতক বই, একটা বাঁশের আলনায় খানকতক কাপড় ঝুলানো। তক্তপোশের নীচে অপুর স্টীলের তোরঙ্গটা।

অপু বলিল—এসো এসো, এখানকার ঠিকানা কি ক'রে জানলে?

—সে কথার দরকার নেই। তারপর কলকাতা ছেড়ে এখানে কি মনে ক'রে?—বাস্। এমন জায়গায় মানুষ থাকে?

—খারাপ জায়গাটা কি দেখলি? তা ছাড়া কলকাতায় যেন আর ভাল লাগে না—দিনকতক এমন হ'ল যে, বাইরে যেখানে হয় যাব, সেই সময় এখানকার মাস্টারি জুটে গেল, তাই এখানে এলুম। দাঁড়া, তোর চায়ের কথা বলে আসি—।

পাড়াতেই একটা বাঁকুড়া নিবাসী বামুনের তেলেভাজা পরোটার দোকান। রাত্রে তাহারই দোকানের অতি অপকৃষ্ট খাদ্য কলঙ্ক-ধরা পিতলের থালায় আনীত হইতে দেখিয়া প্রণব অবাক হইয়া গেল—অপুর রুচি অন্ততঃ মার্জিত ছিল চিরদিন, হয়ত তাহা সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু অমার্জিত ছিল না। সেই অপুর এ কি অবনতি! এ-রকম একদিন নয়, রোজই রাত্রে নাকি এই তেলেভাজা পরোটাই অপুর প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। এত অপরিষ্কারও তো সে অপুকে কস্মিন্ কালে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।

কিন্তু প্রণবের সব-চেয়ে বুকে বাজিল যখন পরদিন বৈকালে অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পাশের এক স্যাকরা দোকানে নীচ-শ্রেণীর তাসের আড্ডায় অতি ইতর ও স্থূল ধরণের হাস্য-পরিহাসের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া মহানন্দে তাস খেলিতে লাগিল।

অপুর ঘরটাতে ফিরিয়া আসিয়া প্রণব বলিল—কাল আমার সঙ্গে চল্ অপু—এখানে তোকে থাকতে হবে না—এখান থেকে চল্।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন রে, কি খারাপ দেখলি এখানে? বেশ জায়গা তো, বেশ লোক সবাই। ওই যে দেখলি বিশ্বম্ভর স্বর্ণকার—উনি এদিকের একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক, ওঁর বাড়ি দেখিস নি? গোলা কত! মেয়ের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করেছিল, কি খাওয়ানোটাই খাওয়ালেন—উঃ। পরে খুশীর সহিত বলিল—এখানে ওঁরা সব বলেছেন আমায় ধানের জমি

দিয়ে বাস করাবেন—নিকটেই বেগমপুরে ওঁদের—বেশ জায়গা—কাল তোকে দেখাব চল—ওঁরাই ঘরদোর বেঁধে দেবেন বলেছেন—আপাতত মাটির, মানে বিচুলির ছাউনি, এদেশে উলুখড় হয় না কিনা!

প্রণব সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিল—অপু তর্ক করিল, নিজের অবস্থার প্রাধান্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে নানা যুক্তির অবতারণা করিল, শেষে রাগ করিল, বিরক্ত হইল—যাহা সে কখন হয় না। প্রকৃতিতে তাহার রাগ বা বিরক্তি ছিল না কখনও। অবশেষে প্রণব নিরুপায় অবস্থায় পরদিন সকালের ট্রেনে কলিকাতায় গেল।

যাইবার সময় তাহার মনে হইল, সে অপু যেন আর নেই—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য একদিন যাহার মধ্যে উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, আজ সে যেন প্রাণহীন নিষ্প্রভ। এমনতর স্থূল তৃপ্তি বা সন্তোষ-বোধ, এ ধরণের আশ্রয় আঁকড়াইয়া ধরিবার কাঙালপণা কই অপুর প্রকৃতিতে তো ছিল না কখনও?

স্কুল হইতে ফিরিয়া রোজ অপু নিজের ঘরের রোয়াকে একটা হাতলভাঙা চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকে। এখানে সে অত্যন্ত একা ও সঙ্গীহীন মনে করে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা। সেটা এত অসহনীয় হইয়া উঠে, কোথাও একটু বসিয়া গল্প গুজব করিতে ভাল লাগে, মানুষের সঙ্গ স্পৃহনীয় মনে হয়, কিন্তু এখানে অধিকাংশই পাটকলের সর্দার, বাবু, বাজারের দোকানদার, তাও সবাই তাহার অপরিচিত। বিশু স্যাকৃরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডা সে নিজে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তবুও ন'টা-দশটা পর্যন্ত রাত একরকম কাটে ভালই।

অপুর ঘরের রোয়াকটার সামনেই মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন, সেটা পার হইয়া একটা পুকুর, জল যেমন অপরিষ্কার, তেমনি বিস্বাদ। পুকুরের ওপারের একটা কুলিবস্তি. দু'বেলা যত ময়লা কাপড় সবাই এই পুকুরেই কাচিতে নামে। রৌদ্র উঠিলেই কুলি লাইনের ছাপ-মারা খয়েরী-রংয়ের বারো-হাতী শাড়ি পুকুরের ও-পারের ঘাসের রৌদ্রে মেলানো অপুর রোয়াক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কুলিবস্তির ও-পাশে গোটাকতক বাদাম গাছ, একটা ইটখোলা, খানিকটা ধানক্ষেত, একটা পাটের গাঁটবন্দী কল। এক একদিন রাত্রে ইটের পাঁজার ফাটলে রাঙা ও বেগুনী আলো জলে, মাঝে মাঝে নিভিয়া যায়, আবার জলে, অপু নিজের রোয়াকে বসিয়া বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে দেখে। রাত দশটায় মার্টিন লাইনের একখানা গাড়ি হাওড়ার দিক হইতে আসে—অপুর রোয়াক ঘেঁষিয়া যায়—পোঁটলা-পুঁটলি, লোকজন, মেয়েরা—পাশেই স্টেশনে গিয়া থামে, একটু পরেই বাঁকুড়াবাসী ব্রাহ্মণটি তেলেভাজা

পরোটা ও তরকারী আনিয়া হাজির করে, খাওয়া শেষ করিয়া শুইতে অপুর প্রায় এগারোটা বাজে। দিনের পর দিন একই রুটিন। বৈচিত্র নাই, বদলও নাই।

অপু কাহারো সহিত গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে যায় যে, কোন মতলব আঁটিয়া তাহা নহে, ইহা সে যখনই করে, তখনই সে করে নিজের অজ্ঞাতসারে—নিঃসঙ্গতা দূর করিবার অচেতন আগ্রহে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা কাটিতে চায় না সব সময়! যাইবার মত জায়গা নাই, করিবার কত কাজও নাই—চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না। ছুটির দিনগুলি তো অসম্ভব-রকম দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

নিকটেই ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস। অপু রোজ বৈকালে ছুটির পরে সেখানে গিয়া বসিয়া প্রতিদিনের ডাক অতি আগ্রহের সহিত দেখে। ঠিক বৈকালে পাঁচটার সময় সাব্-অফিসের পিওন চিঠিপত্র-ভরা সীল-করা ডাক-ব্যাগটি ঘাড়ে করিয়া আনিয়া হাজির করে, সীল ভাঙিয়া বড় কাঁচি দিয়া সেটার মুখের বাঁধন কাটা হয়। এক একদিন অপুই বলে—ব্যাগটা খুলি চরণবাবু?

চরণবাবু বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুলুন না, আমি ততক্ষণ ইস্টাম্পের হিসেবটা মিলিয়ে ফেলি—এই নিন্ কাঁচি!

পোস্টকার্ড, খাম, খবরের কাগজ, পুলিন্দা, মনি-অর্ডার। চরণবাবু বলেন—মনি-অর্ডার সাতখানা? দেখেছেন কাণ্ডটা মশাই, এদিকে টাকা নেই মোটে। টোটালটা দেখুন না একবার দয়া ক'রে—সাতান্ন টাকা ন' আনা? তবেই হয়েছে—রইল পড়ে, আমি তো আর ইস্ত্রির গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনে মনি-অর্ডার তামিল করতে পারি না মশাই? এদিকে ক্যাশ বুঝে নেওয়া চাই বাবুদের রোজ রোজ—

প্রতিদিন বৈকালে পোস্ট মাস্টারের টহলদারী করা অপুর কাছে অত্যন্ত আনন্দায়ক কাজ। সাগ্রহে স্কুলের ছুটির পর পোস্টাফিসে দৌড়ানো চাই-ই তাহার। তাহার সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু খামের চিঠিগুলি। প্রতিদিনের ডাকে বিস্তর খামের চিঠি আসে—নানাধরণের খাম, সাদা, গোলাপী, সবুজ। চিঠি-প্রাপ্তিটা চিরদিনই জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা বলিয়া চিরদিনই চিঠির, বিশেষ করিয়া খামের চিঠির প্রতি তাহার কেমন একটা বিচিত্র আকর্ষণ। মধ্যে দু'বৎসর অর্পণা সে পিপাসা মিটাইয়াছিল—এক একখানা খাম বা তাহার উপরের লেখাটা হুবহু সে রকম, যে প্রথমটা হঠাৎ মনে হয় বুঝি বা সেই-ই চিঠি দিয়াছে। একদিন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাসায় এই রকম খামের চিঠি তাহারও কত আসিত।

তাহার নিজের চিঠি কোনদিন থাকে না, সে জানে তাহা কোথাও হইতে আসিবার সম্ভাবনা নাই—কিন্তু শুধু নানা ধরণের চিঠির বাহ্যদৃশ্যের মোহটাই তাহার কাছে অত্যন্ত প্রবল।

একদিন কাহার একখানি মালিকশূন্য সাকিমশূন্য পোস্টকার্ডের চিঠি ডেড-লেটার অফিস হইতে ঘুরিয়া সারা অঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের মত বহু ডাক মোহরের ছাপ লইয়া এখানে আসিয়া পড়িল। বহু সন্ধান করিয়াও তাহার মালিক জুটিল না। সেখানা রোজ এ-গ্রাম ও-গ্রাম হইতে ঘুরিয়া আসে—পিওন কৈফিয়ৎ দেয়, এ নামে কোন লোকই নাই এ অঞ্চলে। ক্রমে—চিঠিখানা অনাদৃত অবস্থায় এখানে-ওখানে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল—একদিন ঘরঝাঁট দিবার সময় জঞ্জালের সঙ্গে কে সামনের মাঠের ঘাসের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল, অপু কৌতুহলেব সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল—

শ্রীচরণকমলেষু,

মেজদাদা, আজ অনেকদিন যাবৎ আপনি আমাদের নিকট কোন পত্রাদি দেন না এবং আপনি কোথায় আছেন, কি ঠিকানা না জানিতে পারায় আপনাকেও আমবা পত্র লিখি নাই। আপনার আগের ঠিকানাতেই এ পত্রখানা দিলাম, আশা করি উত্তর দিতে ভুলিবেন না। আপনি কেন আমাদের নিকট পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝিতে সক্ষম হই নাই। আপনি বোধ হয় আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা না হইলে আপনি আমাদের এখানে না আসিলেও একখানা পত্র দিতে পারেন। এতদিন আপনার খবর না জানিতে পারিয়া কি ভাবে দিন যাপন করিতেছি তাহা সামান্য পত্রে লিখিলে কি বিশ্বাস করিবেন, মেজদাদা? আমাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে? সে যা হোক, যেরূপ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেইরূপ ফল! আপনাকে বৃথা দোষ দিব না। আশা করি আপনি অসন্তোষ হইবেন না। যদি অপরাধ হইয়া থাকে, ছোট বোন বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার শরীর কেমন আছে, আপনি আমার সভক্তি প্রণাম জানিবেন, খুব আশা করি পত্রের উত্তর পাইব। আপনার পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি—

সেবিকা

কুসুমলতা বসু

কাঁচা মেয়েলি হাতের লেখা, লেখার অপটুত্ব ও বানান-ভুলে ভরা। সহোদর বোনের চিঠি নয়, কারণ পত্রখানা লেখা হইতেছে জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামের কোন লোককে। এত আগ্রহপূর্ণ, আবেগভরা পত্রখানার শেষকালে এই গতি

ঘটিল? মেয়েটি ঠিকানা জানে না, নয় তো লিখিতে ভুলিয়াছে। অপটু লেখার ছত্রে ছত্রে যে আন্তরিকতা ফুটিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য পত্রখানা সে তুলিয়া লইয়া নিজের বাক্সে আনিয়া রাখিল। মেয়েটির ছবি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে—পনেরো-ষোল বৎসর বয়স, সুঠাম গঠন ছিপছিপে পাতলা, একরাশ কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথায়। ডাগর চোখ।···কখন সে তাহার মেজদাদার পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বৃথাই পথ চাহিয়া আছে! মানব মনের এত প্রেম, এত আগ্রহভরা আহ্বান, পবিত্র বালিকাহৃদয়ের এ অমূল্য অর্ঘ্য কেন জগতে এভাবে ধূলায় অনাদরে গড়াগড়ি যায়, কেহ পোঁছে না, কেহ তা লইয়া গর্ব করে না?

বিশ্বম্ভর স্যাকৃরার দোকানে সেদিন রাত এগারটা পর্যন্ত জোর তাসের আড্ডা চলিল—সবাই উঠিতে চায়, সবাই বলে রাত বেশী হইয়াছে, অথচ অপু সকলকে অনুরোধ করিয়া বসায়, কিছুতেই খেলা ছাড়িতে চায় না। অবশেষে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিতেছে, কলুদের পুকুরের কাছে স্কুলের থার্ড পণ্ডিত আশু সামান্য লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চলিয়াছেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন, কি অপূর্ববাবু যে, এত রাত্রে কোথায়?

—কোথাও না, এই বিশু স্যাকৃরার দোকানে তাসের—

থার্ড পণ্ডিত এদিক-ওদিক চাহিরা নিম্ন-স্বরে বলিলেন—একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি বিদেশী লোক—পূর্ণ দীঘ্‌ড়ীর খপ্পরে পড়ে গেলেন কি ক'রে বলুন তো?

অপু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, খপ্পরে-পড়া কেমন বুঝতে পারছি নে—কি ব্যাপারটা বলুন তো?

পণ্ডিত আরও স্বর নীচু করিয়া বলিল—এখানে ঘন-ঘন যাওয়া-আসা আপনার কি ভাল দেখাচ্ছে, ভাবছেন? ওদের টাকাকড়ি দেওয়া ও-সব? আপনি হচ্ছেন ইস্কুলের মাস্টার, আপনাকে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে, তা বোধ করি জানেন না?

—না! কি কথা?

—কি কথা তা আর বুঝতে পারছেন না মশাই? হুঁ—পরে কিছু থামিয়া বলিলেন—ও সব ছেড়ে দিন, বুঝবেন? আরও একজন আপনার আগে ঐ রকম ওদের খপ্পরে পড়েছিল, এখানকার নন্দ গুঁইয়ের আবগারী দোকানে কাজ করত, ঠিক আপনার মত অল্প বয়স—মশাই, টাকা শুষে শুষে তাকে একেবারে —ওদের ব্যবসাই ঐ। সমাজে একঘরে করবার কথা হচ্ছে—থার্ড পণ্ডিত একটু থামিয়া একটু অর্থসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন,—আর ও-মেয়ের এমন মোহই

বা কি, শহর অঞ্চলে বরং ওর চেয়ে ঢের—

অপু এতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতের কথাবার্তার গতি ও বক্তব্য-বিষয়ের উদ্দেশ্য কিছুই ধরিতে পারে নাই—কিন্তু শেষের কথাটাতে সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ মেয়ে, পটেশ্বরী ?

—হা হা হা, থাক্ থাক্, একটু আস্তে—

কি করেছে বল্‌ছেন—পটেশ্বরী ?

—আমি আর কি বলছি কিছু, সবাই যা বলে আমিও তাই বলছি। নতুন কথা আব কিছু বলছি কি ? যাবেন না ও-সবে, তাতে বিদেশী লোক, সাবধান ক'বে দি। ভদ্রলোকের ছেলে, নিজের চরিত্রটা আগে রাখতে হবে ভাল, বিশেষ যখন ইস্কুলের শিক্ষক এখানকার।

থার্ড পণ্ডিত পাশের পথে নামিয়া পড়িলেন, অপু প্রথমটা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসায় ফিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা তাহাব কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল।

পূর্ণ দীঘ্‌ড়ার বাড়িতে যাওয়া-আসার ইতিহাসটা এইরূপ—

প্রথমে এখানে আসিয়া অপু কয়েকজন ছাত্র লইয়া এক সেবা-সমিতি স্থাপন কবিয়াছিল। একদিন সে স্কুল হইতে ফিরিতেছে, পথে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহাব হাত দু'টা জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, আপনারা না দেখলে আমার ছেলেটা মারা যেতে বসেছে—আজ পনেরো দিন টাইফায়েড্, তা আমি কলের চাকরি বজায় বাখব না রুগীর সেবা করব ? আপনি দিন-মানটাব জন্যে জনকতক ভলাণ্টিয়াব যদি আমার বাড়ি—আর সেই সঙ্গে যদি দু-একদিন আপনি—

তেত্রিশ-দিনে রোগী আরাম হইল। এই তেত্রিশ দিনের অধিকাংশ দিনই অপু নিজে ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণপণে খাটিয়াছে। রাত্রি তিনটায় ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, অপু ছাত্রদিগকে জাগিতে না দিয়া নিজে জাগিয়াছে, তিনটা না বাজা পর্যন্ত বাহিরের দাওয়াব একপাশে বই পড়িয়া সময় কাটাইয়াছে, পাছে এমনি বসিয়া থাকিলে ঘুমাইয়া পড়ে।

একদিন দুপুরে টাল খাইয়া রোগী যায়-যায় হইয়াছিল। দীঘ্‌ড়ী মশায় পাটকলে, সে দিন ভলাণ্টিয়ার-দলের আবার কেহই ছিল না, দুপুরে ভাত খাইতে গিয়াছিল। অপু দীঘ্‌ড়ী মশায়ের স্ত্রীকে ভরসা দিয়া বুঝাইয়া শান্ত রাখিয়া মেয়ে দু'টির সাহায্যে গরম জল করাইয়া বোতলে পুরিয়া সেঁক-তাপ ও হাত-পা ঘষিতে ঘষিতে আবার দেহের উষ্ণতা ফিরিয়া আনে।

ছেলে সারিয়া উঠিলে দীঘ্‌ড়ী মশায় একদিন বলিলেন—আ[illegible] বা

উপকারটা করেছেন মাস্টার মশায়—তা এক মুখে আর কি বলব। আমার স্ত্রী বলছিল, আপনার তো রেঁধে খাওয়ার কষ্ট—এই একমাসে আপনি তো আমাদের আপনার লোক হয়ে পড়েছেন—তা আপনি কেন আমাদের ওখানেই খান না? আপনি বাড়ির ছেলের মত থাকবেন, খাবেন, কোনও অসুবিধে আপনার হবে না।

সেই হইতেই অপু এখানে একবেলা করিয়া খায়।

পরিচয় অল্প দিনের বটে, কিন্তু বিপদের দিনের মধ্যে দিয়া সে পরিচয়—কাজেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। অপু পূর্ণ দীঘ্‌ড়ীর স্ত্রীকে শুধু 'মাসিমা' বলিয়া ডাকে তাহাই নয়, মাসের বেতন পাইলে সবটা আনিয়া নতুন-পাতানো মাসিমার হাতে তুলিয়া দেয়। সে-টাকাব হিসাব প্রতি মাসের শেষে মাসিমা মুখে বুঝাইয়া দিয়া আরও চার-পাঁচ টাকা বেশী খরচ দেখাইয়া দেন এবং পরের মাসের মাহিনা হইতে কাটিয়া রাখেন। বাজারে বিশু স্যাকরা একদিন বলিয়াছিল—দীঘ্‌ড়ী বাড়ি টাকা রাখবেন না অমন ক'রে ওরা অভাবী লোক, বিশেষ ক'রে দীঘ্‌ড়ী গিন্নী ভারী খেলোয়াড় মেয়েছেলে, বিদেশী লোক আপনি আপনাকে বলে রাখি, ওদের সঙ্গে অত মেলামেশার দরকার কি আপনার?

মেয়ে-দুইটিরও সঙ্গে সে মেশে বটে। বড় মেয়েটির নাম পটেশ্বরী, বয়স বছর চৌদ্দ-পনেরো হইবে, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তবে তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলিয়া কোনদিনই মনে হয় নাই অপুর। তবে এটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার সুবিধা অসুবিধার দিকে বাড়ির এই মেয়েটিই একটু বেশী লক্ষ্য রাখে। পটেশ্বরী না রাঁধিয়া দিলে অর্ধেক দিন বোধহয় তাহাকে না খাইয়াই স্কুলে যাইতে হইত! তাহার ময়লা রুমালগুলি নিজে চাহিয়া লইয়া সাবান দিয়া রাখে, ছোট ভাইয়ের হাতে টিফিনের সময় তাহার জন্য আটার রুটি পাঠাইয়া দেয়, অপু খাইতে বসিলে পান সাজিয়া তাহার রুমালে জড়াইয়া রাখে। কি একটা ব্রতের সময় বলিয়াছিল, আপনার হাত দিয়ে ব্রতটা নেব মাস্টার মশায়! এ সবের জন্য সে মনে মনে মেয়েটির উপর কৃতজ্ঞ—কিন্তু এ সব জিনিস যে বাহিরের দিক হইতে এরূপ ভাবে দেখা যাইতে পারে, একথা পর্যন্ত তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই—সে জানেই না, এ ধরণের সন্দিগ্ধ ও অশুচি মনোভাবের খবর।

সে বিস্মিতও হইল, রাগও করিল। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন হইতে পূর্ণ দীঘ্‌ড়ী বাড়ী যাওয়া-আসা বন্ধ করিল। ভাবিল—কিছু না, মাঝে পড়ে পটেশ্বরীকে বিপদে পড়তে হবে।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়াবাসী বামুনটি রাশীকৃত বাজার-দেনা ফেলিয়া একদিন ঝাঁঝরা, হাতা ও বেলুনখানা মাত্র সম্বল করিয়া চাঁপদানীর বাজার হইতে রাতারাতি উধাও হইয়াছিল, সুতরাং আহারাদির খুবই কষ্ট হইতে লাগিল।

দীঘ্ড়ী-বাড়ি হইতে ফিরিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ রকম বাবা-মা তো কখনও দেখি নি? বেচারীকে এ-ভাবে কষ্ট দেওয়া—ছিঃ—যাক, ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আর রাখব না।

সেদিন ছুটির পর অপু একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিতে পাইল একটা শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধের লেখক তাহার বন্ধু জানকী এবং নামের তলায় ব্রাকেটের মধ্যে লেখা আছে—On deputation to England,

জানকী ভাল করিয়া এম-এ ও বি-টি পাস করিবার পর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে মাস্টারি করিতেছে এ-সংবাদ পূর্বেই সে জানিত কিন্তু তাহার বিলাত যাওয়ার কোন খবরই তাহার জানা ছিল না। কে-বা দিবে? দেখি দেখি—বা রে! জানকী বিলাত গিয়াছে, বাঃ—

প্রবন্ধটা কৌতূহলের সহিত পড়িল। বিলাতের একটা বিখ্যাত স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা সংক্রান্ত আলোচনা। বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে ভাবিল, উঃ জানকী, যে জানকী সেও গেল বিলেত!

মনে পড়িল কলেজ-জীবনের কথা—বাগবাজারের সেই শ্যামরায়ের মন্দির ও ঠাকুরবাড়ি—গরীব ছাত্রজীবনে জানকীর সঙ্গে কতদিন সেখানে খাইতে যাওয়ার কথা। ভালই হইয়াছে, জানকী কম কষ্টটা করিয়াছিল কি একদিন। বেশ হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।

এ-অঞ্চলের রাস্তায় বড় ধূলো, তাহার উপর আবার কয়লার গুঁড়া দেওয়া —পথ হাঁটা মোটেই প্রীতিকর নয়। দুধারে কুলিবস্তি; ময়লা দড়ির চারপাই পাতিয়া লোকগুলা তামাক টানিতেছে ও গল্প করিতেছে। এ-পথে চলিতে চলিতে অপরিচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণ বস্তিগুলির দিকে চাহিয়া সে কতবার ভাবিয়াছে, মানুষ কোন্ টানে কিসের লোভে এ-ধরণের নরককুণ্ডে স্বেচ্ছায় বাস করে? জানে না, বেচারীরা জানে না, পলে পলে এই নোংরা আবহাওয়া তাহাদের মনুষ্যত্বকে, রুচিকে, চরিত্রকে, ধর্মস্পৃহাকে, গলা টিপিয়া খুন করিতেছে। সূর্যের আলো কি ইহারা কখনও ভোগ করে নাই? বন-বনানীর শ্যামলতাকে ভালবাসে নাই? পৃথিবীর মুক্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করে নাই?

নিকটে মাঠ নাই, বেগমপুরের মাঠ অনেক দূরে, রবিবার ভিন্ন সেখানে যাওয়া চলে না। সুতরাং খানিকটা বেড়াইয়া সে ফিরিল।

অনেকদিন হইতে এ-অঞ্চলের মাঠে ও পাড়াগাঁয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এদিকের

গাছ-পালা ও বনফুলের একটা তালিকা ও বর্ণনা সে একখানা বড় খাতায় সংগ্রহ করিয়াছে। স্কুলের দু-একজন মাস্টারকে দেখাইলে তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ও-সবের কথা লইয়া আবার বই! পাগল আর কাকে বলে।

বাসায় আসিয়া আজ আর সে বিশু স্যাক্‌রার আড্ডায় গেল না। বসিয় বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে জানকীর কথা মনে পড়িল। বিলাতে—তা বেশ। কত-দিন গিয়াছে কে জানে? ব্রিটিশ মিউজিয়ম-টিউজিয়ম এতদিনে সব দেখা হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। পুরানো নর্ম্যান্ দুর্গ দু-একটা, পাশে পাশে জুনিপারের বন, দূরে ঢেউ খেলানো মাঠের সীমায় খড়িমাটির পাহাড়ের পিছনে, সন্ধ্যাধূসর আটলান্টিকের উদার বুকে অস্ত আকাশের রঙীন প্রতিচ্ছায়া, কি কি গাছ, পাড়াগাঁয়ের মাঠের ধারে বনের কি কি ফুল? ইংল্যাণ্ডের বনফুল নাকি ভারী দেখিতে সুন্দর—পাপি, ক্লিটিম্যাটিস, ডেজী।

বিশু স্যাক্‌রার দোকান হইতে লোক ডাকিতে আসে, আসিবার আজ এত দেরি কিসের? খেলুড়ে ভীম সাধুখাঁ, মহেশ সাঁবুই, নীলু ময়রা, ফকির আড্ডি —ইহারা অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া আছে—মাস্টার মশায়ের যাইবার অপেক্ষায় এখনও খেলা যে আরম্ভ হয় নাই।

অপু যায় না—তাহার মাথা ধরিয়াছে—না—আজ সে আর খেলায় যাইবে না।

ক্রমে রাত্রি বাড়ে, পদ্মপুকুরের ও-পারে কুলিবস্তির আলো নিবিয়া যায়, নৈশ-বায়ু শীতল হয়, রাত সাড়ে দশটায় আপ ট্রেন হেলিতে-দুলিতে ঝক্-ঝক্ শব্দে রোয়াকের কোল ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, পয়েণ্টসম্যান্ আঁধারে লণ্ঠন হাতে আসিয়া সিগ্‌ন্যালের বাতি নামাইয়া লইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে—মাস্টার-বাবু; এখনও বসিয়া আছেন?

—কে ভজুয়া? হ্যাঁ—সে এখনো বসিয়া আছে।

কিসের ক্ষুধা। কিসের যেন একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা।

ও-বেলা একখানা পুরানো জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল —একখানা খুব ভাল বই এ-সম্বন্ধে। শীলদের বাড়ির চাকরি-জীবনে কিনিয়াছিল—এখানা হইতে অপর্ণাকে কতদিন নীহারিকা ও নক্ষত্র-পুঞ্জের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত—ও-বেলা যখন সেখানা লইয়া পড়িতেছিল, তখন তাহার চোখে পড়িল, অতি ক্ষুদ্র, সাদা রংয়ের—খালি চোখের খুব তেজ না থাকিলে দেখা প্রায় অসম্ভব—এরূপ একটা পোকা বইয়ের পাতায় চলিয়া বেড়াইতেছে। ওর সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল—এই বিশাল জগৎ, নক্ষত্রপুঞ্জ, উল্কা নীহারিকা, কোটি কোটি দৃশ্য-অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব—ও-ও তো

এরই একজন অধিবাসী—এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই ওর জীবনানন্দ—কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু ?

কিন্তু মানুষেরই বা কতটুকু ? ঐ নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি ? আজকাল তাহার মনে একটা নৈরাশ্য ও সন্দেহবাদের ছায়া মাঝে মাঝে যেন উঁকি মারে। এই বর্ষাকালে সে দেখিয়াছে, ভিজা জুতার উপর এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতা গজায়—কতদিন মনে হইয়াছে মানুষও তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই রকম ছাতার মত জন্মিয়াছে—এখানকার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও তাহার বিভিন্ন গ্যাসগুলা প্রাণপোষণের অনুকূল একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া। এরা নিতান্তই এই পৃথিবীর, এরই সঙ্গে এদের বন্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতই হঠাৎ গজাইয়া উঠে, লাখে লাখে, পালে পালে জন্মায়, আবার পৃথিবীর বুকেই যায় মিলাইয়া। এরই মধ্য হইতে সহস্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনার আনন্দ, হাসি-খুশিতে দৈন্য-ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিয়া রাখে—গড়ে চল্লিশটা বছর পরে সব শেষ। যেমন ঐ পোকার সব শেষ হইয়া গেল তেমনি।

এই অবোধ জীবগণের সঙ্গে ঐ বিশাল নক্ষত্র জগতের ঐ গ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু—ঐ নিঃসীম নাক্ষত্রিক বিরাট শূন্যের কি সম্পর্ক ? সুদূরের পিপাসাও যেমন মিথ্যা, অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা—ভিজা জুতার বা পচা বিচালী-গাদার ব্যাঙের ছাতার মত যাহাদের উৎপত্তি—এই মহনীয় অনন্তের সঙ্গে তাহাদের কিসের সম্পর্ক ?

মৃত্যুপারে কিছুই নাই, সব শেষ। মা গিয়াছেন—অপর্ণা গিয়াছে—অনিল গিয়াছে—সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে—পূর্ণচ্ছেদ।

ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইখানাতে যে বিশ্বজগতের ছবি ফুটিয়াছে, ঐ পোকাটার পক্ষে যেমন তাহার কল্পনা ও ধারণা অসম্ভব, এমন সব উচ্চতর বিবর্তনের প্রাণী কি নাই যাহাদের জগতের তুলনায় মানুষের জগৎটা ঐ বইয়ের পাতায় বিচরণশীল প্রায় আনুবীক্ষণিক পোকাটার জগতের মতই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য ?

হয়ত তাহাই সত্য, হয়ত মানুষের সকল কল্পনা, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান মিলিয়া যে বিশ্বটার কল্পনা করিয়াছে সেটা বিরাট বাস্তবের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ নয়—তাহা নিতান্ত এ পৃথিবীর মাটির···মাটির,···মাটির।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতের তুলনায় ঐ পোকাটা এই জগতের মত! হয়ত তাহাই, কে বলিবে হ্যাঁ কি না ?

মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ? ভিজা জুতাকে রৌদ্রে দিলে তাহার উপরকার ছাতা কোথায় যায় ?

স্কুলের সেক্রেটারী স্থানীয় বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী রামতারন গুঁইয়ের বাড়ি এবার পূজায় খুব ধুমধাম। স্কুলের বিদেশী মাস্টার মহাশয়েরা কেহ বাড়ি যান নাই, এই বাজারে চাকুরিটা যদি বা জুটিয়া গিয়াছে, এখন সেক্রেটারীর মনস্তুষ্টি করিয়া সেটা তো বজায় রাখিতে হইবে! তাঁহারা পূজার কয়দিন সেক্রেটারীর বাড়িতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া লোকজনের আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ানোর বিলি-বন্দোবস্ত প্রভৃতিতে মহাব্যস্ত, সকলেই বিজয়া দশমীর পরদিন বাড়ি যাইবেন! অপুর হাতে ছিল ভাঁড়ার ঘরের চার্জ—কয়দিন রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত খাটিবার পর বিজয়া দশমীর দিন বৈকালে সে ছুটি পাইয়া কলিকাতায় আসিল।

প্রায় এক বৎসরের একঘেয়ে ওই পাড়াগাঁয়ে জীবনের পর বেশ লাগে শহরের এই সজীবতা! এই দিনটার সঙ্গে বহু অতীত দিনের নানা উৎসব-চপল আনন্দস্মৃতি জড়ানো আছে, কলিকাতায় আসিলেই যেন পুরানো দিনের সে-সব উৎসবরাজি তাহাকে পুরাতন সঙ্গী বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়া প্রীতিমধুর কলহাস্যে আবার তাহাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। পথে চলিতে চলিতে নিজের ছেলের কথা মনে হইতে লাগিল বারবার। তাহাকে দেখা হয় নাই—কি জানি কি রকম দেখিতে হইয়াছে। অপর্ণার মত, না তাহার মত?···ছেলের উপর অপু মনে মনে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, অপর্ণার মৃত্যুর জন্য সে মনে মনে ছেলেকে দায়ী করিয়া বসিয়াছিল, বোধ হয়। ভাবিয়াছিল, পূজার সময় একবার সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিবে—কিন্তু যাওয়ার কোন তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে খোকার পোশাকের দরুণ পাঁচটি টাকা শ্বশুর বাড়িতে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া পিতার কর্তব্য সমাপন করিয়াছে।

আজিকার দিনে শুধু আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু তাহার কোনও পূর্বপরিচিত বন্ধু আজকাল আর কলিকাতায় থাকে না, কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল—কোথায় যাওয়া যায়?

তার পরে সে লক্ষ্যহীনভাবে চলিল। একটা সরু গলি, দুজন লোকে পাশাপাশি যাওয়া যায় না, দুধারের একতলা নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘরে ছোট ছোট

গৃহস্থেরা বাস করিতেছে—একটা রান্নাঘরে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি বৌ লুচি ভাজিতেছে, দুটি ছোট মেয়ে ময়দা বেলিয়া দিতেছে—অপু ভাবিল, একবৎসর পর আজ হয়ত ইহাদের লুচি খাইবার উৎসব-দিন। একঠা উঁচু রোয়াকে অনেকগুলি লোক কোলাকুলি করিতেছে, গোলাপী সিল্কের ফ্রকপরা কোঁকড়াচুল একটি ছোট মেয়ে দরজার পর্দা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। একটা দৃশ্যে তাহার ভারী দুঃখ হইল। এক মুড়ির দোকানে প্রৌঢ়া মুড়িওয়ালীকে একটি অল্পবয়সী নীচুশ্রেণীর পতিতা মেয়ে বলিতেছে—ও দিদি —দিদি? একটু পায়ের ধুলো ত্থাও? পরে পায়ের ধূলা লইয়া বলিতেছে, একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, শোনো—ও দিদি? মুড়িওয়ালী তাহার কথায় আদৌ কান না দিয়া সোনার মোটা অনন্ত পরা ঝিয়ের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে—মেয়েটি তাহার মনোযোগ ও অনুগ্রহ আকর্ষণ-করিবার জন্য আবাব প্রণাম করিতেছে ও আবার বলিতেছে—দিদি, ও দিদি?—একটু পায়ের ধুলো ত্থাও। পরে হাসিয়া বলিতেছে—একটু খাওয়াবে না, ও দিদি?

অপু ভাবিল, এ রূপহীনা হতভাগিনীও হয়ত কলিকাতায় তাহার মত একাকী, কোন খোলার ঘরের অন্ধকার গর্ভগৃহ হইতে আজিকার দিনের উৎসবে যোগ দিতে তাহার চুমুরি শাড়িখানা পরিয়া বাহির হইয়াছে। পাশের দোকানের অবস্থাপন্ন মুড়িওয়ালীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে, উৎসবের অংশ হইতে যাহাতে সে বঞ্চিত না হয়। ওর চোখে ওই মুড়ীওয়ালীই হয়ত কত বড়লোক!

ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কবিরাজ-বন্ধুটির দোকানে গেল। বন্ধু দোকানেই বসিয়া আছে, খুব আদর করিয়া বলিল—এসো, এসো ভাই, ছিলে কোথায় এতদিন? বন্ধুর অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও খারাপ, পূবের বাসা ছাড়িয়া নিকটের একটা গলিতে সাড়ে তিন টাকা ভাড়াতে এক খোলার ঘর লইয়াছে—নতুবা চলে না—বলিল—আর ভাই পারি না, এখন হয়েছে দিন-আনি দিন-খাই অবস্থা। আমি আর স্ত্রী দুজনে মিলে বাড়িতে আচার চাটনি, পয়সা প্যাকেট চা—এই সব ক'রে বিক্রি করি—অসম্ভব স্ট্রাগল. করতে হচ্ছে ভাই, এসো বাসায় এসো।

নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘর। বন্ধুর বৌ বা ছেলেমেয়ে কেহই বাড়ি নাই—পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছে। বন্ধু বলিল—এবার আর ছেলেমেয়েদের কাপড়-টাপড় দিতে পারি নি—বলি ঐ পুরনো কাপড়ই ধোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে পর্। বৌটার চোখে জল দেখে শেষকালে ছোট মেয়েটার জন্ত একখানা ডুরে শাড়ি

—ভাই। ব'স ব'স, চা খাও, বাঃ, আজকের দিনে যদি এলে। দাঁড়াও ডেকে আনি ওকে।

অপু ইতিমধ্যে গলির মোড়ের দোকান হইতে আট আনার খাবার কিনিয়া আনিল। খাবারের ঠোঙা হাতে যখন সে ফিরিয়াছে তখন বন্ধু ও বন্ধু পত্নী বাসায় ফিরিয়াছে।—বাঃ রে, আবার কোথায় গিয়েছিলে—ওতে কি? খাবার? বাঃ রে, খাবার তুমি আবার কেন—

অপু হাসিমুখে বলিল—তোমার আমার জন্য তো আনি নি? খুকী রয়েছে, ঐ খোকা রয়েছে—এসো তো মানু—কি নাম? রমলা? ও বাবা, বাপের শখ ভাখ—রমলা! বৌ-ঠাকরুণ—ধরুণ তো এটা।

বন্ধুপত্নী আধঘোমটা টানিয়া প্রসন্ন হাসিভরা মুখে ঠোঙাটি হাত হইতে লইলেন। সকলকে চা ও খাবার দিলেন। সেই খাবারই।

আধঘণ্টাটাক পর অপু বলিল—উঠি ভাই, আবার চাঁপদানীতেই ফিরব—বেশ ভাল ভাই—কষ্টের সঙ্গে তুমি এই যে লড়াই করছ—এতেই তোমাকে ভাল করে চিনে নিলাম—কিন্তু বৌ-ঠাকরুণকে একটা কথা বলে যাই—এত ভালমানুষ হবেন না—আপনার স্বামী তা পছন্দ করেন না! দু-একদিন একটু-আধটু চুলোচুলি, হাতা-যুদ্ধ, বেলুন-যুদ্ধ—জীবনটা বেশ একটু সরস হয়ে উঠবে—বুঝলেন না? এ আমার মত নয়, কিন্তু আমার এই বন্ধুটির মত—আচ্ছা আসি, নমস্কার।

বন্ধুটি পিছু পিছু আসিয়া হাসিমুখে বলিল—ওহে তোমার বৌ-ঠাকরুণ বলছেন, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস কর, উনি বিয়ে করবেন, না, এই রকম সন্নিসি হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন?...উত্তর দাও।

অপু হাসিয়া বলিল—দেখে শুনে আর ইচ্ছে নেই ভাই, বলে দাও।

বাহিরে আসিয়া ভাবে—আচ্ছা, তবুও এরা আজ ছিল বলে বিজয়ার আনন্দটা করা গেল। সত্যিই শান্ত বৌটি। ইচ্ছে করে এদের কোনও হেল্প করি—কি ক'রে হয়, হাতে এদিকে পয়সা কোথায়?

তাহার পর কিসের টানে সে ট্রামে উঠিয়া একেবারে ভবানীপুরে লীলাদের বাড়ি গিয়া হাজির হইল। রাত তখন প্রায় সাড়ে-আটটা। লীলার দাদামশায়ের লাইব্রেরী-ঘরটাতে লোকজন কথাবার্তা বলিতেছে। গাড়ি-বারান্দাতে দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে—পোকার উপদ্রবের ভয়ে হলের ইলেকট্রিক আলোগুলিতে রাঙা সিল্কের ঘেরাটোপ বাঁধা। মার্বেলের সিঁড়ির ধাপ বাহিয়া হলের সামনের চাতালে উঠিবার সময় সেই গন্ধটা পাইল—কিসের গন্ধ ঠিক সে জানে না, হয়ত দামী আসবাব-পত্রের গন্ধ, হয়ত লীলার

দাদামশায়ের দামী চুরুটের গন্ধ—এখানে আসিলেই ওটা পাওয়া যায়।

লীলা—এবার হয়ত লীলা—অপুর বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে লাগিল।

লীলার ছোট ভাই বিমলেন্দু তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিল।

এই বালকটিকে অপুর বড ভাল লাগে—মাত্র বার দুই ইহার আগে সে অপুকে দেখিয়াছে, কিন্তু কি চোখেই যে দেখিয়াছে। একটু বিস্ময়মাখানো আনন্দের সুরে বলিল—অপূর্ববাবু, আপনি এতদিন পর কোথা থেকে? আসুন, আসুন, বসবেন। বিজয়ার প্রণামটা, দাঁড়ান।

—এসো এসো কল্যাণ হোক, মা কোথায়?

মা গিয়েছেন বাগবাজারের বাড়িতে—আসবেন এখুনি—বসুন।

—ইয়ে—তোমার দিদি এখানে তো?—না?—ও।

এক মুহূর্তে সারা বিজয়া দশমীর উৎসবটা, আজিকার সকল ছুটাছুটি ও পরিশ্রমটা অপুর কাছে বিস্বাদ, নীরস, অর্থহীন হইয়া গেল। শুধু আজ বলিয়া নয়, পূজা আরম্ভ হইবার সময় হইতেই সে ভাবিতেছে—লীলা পূজার সময় নিশ্চয় কলিকাতায় আসিবে—বিজয়ার দিন গিয়া দেখা করিবে। আজ চাঁপদানার চটকলে পাঁচটার ভোঁ বাজিয়া প্রভাত সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অসীম আনন্দের সহিত বিছানায় শুইয়া ভাবিয়াছিল—বৎসর দুই পরে আজ লীলাব সঙ্গে ওবেলা দেখা হইবে এখন। সেই লীলাই নাই এখানে!...

বিমলেন্দু তাহাকে উঠিতে দিল না। চা ও খাবার আনিয়া খাওয়াইল। বলিল—বসুন, এখন উঠতে দেব না, নতুন আইসক্রিমের কলটা এসেছে—বডমামার বন্ধুদের জন্যে সিদ্ধির আইসক্রিম হচ্ছে—খাবেন সিদ্ধির আইসক্রিম? রোজ দেওয়া—আপনার জন্যে এক ডিস্‌ আনতে বলে এলুম। আপনার গান শোনা হয় নি কতদিন, না সত্যি একটা গান করতেই হবে—ছাড়ছি নে।

লীলা কি সেই রায়পুরেই আছে। আসবে-টাসবে না?...

—এখন তো আসবে না দিদি—দিদির নিজের ইচ্ছেতে তো কিছু হবার জো নেই—দাদামশায় পত্র লিখেছিলেন, জামাইবাবু উত্তর দিলেন এখন নয়, দেখা যাবে এর পর।

তাহার পর সে অনেক কথা বলিল। অপু এ-সব জানিত না!—জামাইবাবু লোক ভাল নয়, খুব রাগী, বদমেজাজী। দিদি খুব তেজী মেয়ে বলিয়া পারিয়া উঠে না—তবু ব্যবহার আদৌ ভাল নয়। নিচু সুরে বলিল—নাকি খুব মাতালও—দিদি তো সব কথা লেখে না, কিন্তু এবার বড়দিদির ছেলে কিছুদিন বেড়াতে গিয়েছিল নাকি গরমের ছুটিতে, সে এসে সব বললে।

বড়দিদিকে আপনি চেনেন না? সুজাতাদি? এখানেই আছেন, এসেছেন আজ—ডাকব তাঁকে?

অপুর মনে পড়িল সুজাতাকে। বড়বৌরানীর মেয়ে বাল্যের সেই সুন্দরী, তন্বী সুজাতা—বর্ধমানের বাড়িতে তাহারই যৌবনপুষ্পিত তনুলতাটি একদিন অপুর অনভিজ্ঞ শৈশবচক্ষুর সম্মুখে নারী-সৌন্দর্যের সমগ্র ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে উজাড করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল—বারো বৎসর পূর্বের সে উৎসবের দিনটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে!

একটু পরে সুজাতা হাসিমুখে পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু একজন অপরিচিত, সুদর্শন, তরুণ যুবককে ঘরের মধ্যে দেখিয়া প্রথমটা সে তাড়াতাড়ি পিছু হাটিয়া পর্দাটা পুনরায় টানিতে যাইতেছিল—বিমলেন্দু হাসিয়া বলিল—বাঃ রে, ইনিই তো অপূর্ববাবু, বড়দি চিনতে পারেন নি?

অপু উঠিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। সে সুজাতা আর নাই, বয়স ত্রিশ পার হইয়াছে, খুব মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার সামনের দিকে দু-এক গাছা চুল উঠিতে শুরু হইয়াছে, যৌবনের চটুল লাবণ্য গিয়া মুখে মাতৃত্বের কোমলতা। বর্ধমানে থাকিতে অপুর সঙ্গে একদিনও সুজাতার আলাপ হয় নাই—রাঁধুনীর ছেলের সঙ্গে বাড়ির বড় মেয়ের কোন্ আলাপই বা সম্ভব ছিল? সবাই তো আর লীলা নয়! তবে বাড়ীর রাঁধুনী বামনীর ছেলেটিকে ভয়ে ভয়ে বড়লোকের বাড়ির একতলা দালানের বারান্দাতে অনেকবার সে বেড়াইতে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছে বটে।

সুজাতা বলিল—এসো এসো, ব'স। এখানে কি কর? মা কোথায়?

—মা তো অনেকদিন মারা গিয়াছেন।

—তুমি বিয়ে-থাওয়া করেছ তো—কোথায়?

সে সংক্ষেপে সব বলিল। সুজাতা বলিল—তা আবার বিয়ে কর নি? না না, বিয়ে ক'রে ফেল, সংসারে থাকতে গেলে ও-সব তো আছেই, বিশেষ যখন তোমার মা-ও নেই। সে বাড়ির আর মেয়ে-টেয়ে নেই?

অপুর মনে হইল লীলা থাকিলে, সে 'তোমার মা' এ-কথা না বলিয়া শুধু 'মা' বলিত, তাহাই সে বলে। লীলার মত আর কে এমন দয়াময়ী আছে যে তাহার জীবনে, তাহার সকল দারিদ্র্যকে সকল হীনতাকে উপেক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ করুণার ও মমতার স্নেহপাণি সহজ বন্ধুত্বের মাধুর্যে তাহার দিকে এমন প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল? সুজাতার কথার উত্তর দিতেই এ-কথাটা ভাবিয়া সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

সুজাতা ভিতরে চলিয়া গেলে অপুর মনে হইল, শুধু মাতৃত্বের শান্ত,

কোমলতা নয়, সুজাতার মধ্যে গৃহিণীপনার প্রবীণতাও আসিয়া গিয়াছে। বলিল—আসি ভাই বিমল, আমার আবার সাড়ে দশটায় গাড়ি।

বিমলেন্দু তাহাকে আগাইয়া দিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর আসিল। বলিল—আর বছর ফাল্গুন মাসে দিদি এসেছিল, দিন পনেরো ছিল। কাউকে বলবেন না, আপনার পুরানো অফিসে একবার আমায় পাঠিয়েছিল আপনার খোঁজে—সবাই বললে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, কোথায় কেউ জানে না। আপনার কথা আমি লিখব, আপনার ঠিকানা দিন?···দাঁড়ান, লিখে নি।

মাঘীপূর্ণিমার দিনটা ছিল ছুটি। সারাদিন সে আশেপাশের গ্রামগুলো পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যার অনেক পরে সে বাসায় আসিয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কত রাত্রে জানে না, তক্তপোশের কাছের জানালাতে কাহার মৃদু করাঘাতেব শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শীত এখনও বেশী বলিয়া জানালা বন্ধই ছিল, বিছানার উপর বসিয়া সে জানালাটা খুলিয়া ফেলিল। কে যেন বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া। কে?···উত্তর নাই। সে তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া অবাক হইয়া গেল—কে একটি স্ত্রীলোক এত রাত্রে তাহার জানালার কাছে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

অপু আশ্চর্য হইয়া কাছে গিয়া বলিল—কে ওখানে? পরে বিস্ময়ের সুবে বলিল—পটেশ্বরী? তুমি এখানে এত রাত্রে! কোথা থেকে—তুমি শ্বশুরবাড়ি ছিলে, এখানে কি ক'রে—

পটেশ্বরী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, কথা বলিল না—অপু চাহিয়া দেখিল, তাহার পায়ের কাছে একটা ছোট পুঁটুলি পড়িয়া আছে। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেঁদো না পটেশ্বরী কি হয়েছে বল। আর এখানে এভাবে দাঁড়িয়েও তো—শুনি কি হয়েছে? তুমি এখন আসছ কোত্থেকে বল তো?

পটেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—রিষ্‌ড়ে থেকে হেঁটে আসছি—অনেক রাত্তিরে বেরিয়েছি, আমি আর সেখানে যাব না—

—আচ্ছা, চলো চলো, তোমার বাড়িতে দিয়ে আসি—কি বোকা মেয়ে! এত রাত্তিরে কি এ ভাবে বেরুতে আছে।···ছিঃ—আর এই কনকনে শীতে, গায়ে একখানা কাপড় নেই, কিছু না—এ কি ছেলেমানুষি!

আপনার পায়ে পড়ি মাস্টার মশাই, আপনি বাবাকে বলবেন, আর যেন সেখানে না পাঠায়—সেখানে গেলে আমি মরে যাব—পায়ে পড়ি আপনার—

বাড়ির কাছাকাছি গিয়া বলিল—বাড়িতে যেতে বড্ড ভয় করছে, মাস্টার মশায়—আপনি বলবেন বাবাকে মাকে বুঝিয়ে—

সে এক কাণ্ড আর কি অত রাত্রে! ভাগ্যে রাত অনেক, পথে কেহ নাই!

অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া দীঘ্‌ড়ী-বাড়ী আসিয়া পটেশ্বরীর বাবাকে ডাকিয়া তুলিয়া সব কথা বলিল। পূর্ণ দীঘ্‌ড়ী বাহিরে আসিলেন, পটেশ্বরী আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে ও হাড়ভাঙ্গা শীতে ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতেছে—না-একখানা শীতবস্ত্র, না-একখানা মোটা চাদর।

বাড়ির মধ্যে গিয়া পটেশ্বরী কাঁদিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল—একটু পরে পূর্ণ দীঘ্‌ড়ী তাহাকে ডাকিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া দেখাইলেন পটেশ্বরীর হাতে, পিঠে, ঘাড়ের কাছে প্রহারের কালশিরার দাগ, এক এক জায়গায় রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে—মাকে ছাড়া দাগগুলি সে আর কাহাকেও দেখায় নাই, তিনি আবার স্বামীকে দেখাইয়াছেন। ক্রমে জানা গেল পটেশ্বরী নাকি রাত বারোটা হইতে পুকুরের ঘাটে শীতের মধ্যে বসিয়া ভাবিয়াছে কি করা যায়—দু ঘণ্টা শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিবার পরও সে বাড়ি আসিবার সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া মাস্টার মহাশয়ের জানালায় শব্দ করিয়াছিল।

মেয়েকে আর সেখানে পাঠানো চলিতে পারে না এ কথা ঠিক। দীঘ্‌ড়ী মশায় অপুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কোন উকিল বন্ধু আছে কি-না, এ সম্বন্ধে একটা আইনের পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক—মেয়ের ভরণপোষণের দাবী দিয়া তিনি জামাইয়ের নামে নালিশ করিতে পারেন কিনা। অপু দিন দুই শুধুই ভাবিতে লাগিল এক্ষেত্রে কি করা উচিত।

সুতরাং স্বভাবতই সে খুব আশ্চর্য হইয়া গেল, যখন মাঘীপূর্ণিমার দিনপাঁচেক পরে সে শুনিল পটেশ্বরীর স্বামী আসিয়া পুনরায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে আরও বেশী আশ্চর্য হইতে হইল, সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপারে। একদিন সে স্কুল হইতে ছুটির পরে বাহিরে আসিতেছে, স্কুলের বেহারা তাহার হাতে একখানা খামের চিঠি দিল—খুলিয়া পড়িল, স্কুলের সেক্রেটারী লিখিতেছেন, তাহাকে আর বর্তমানে আবশ্যক নাই—এক মাসের মধ্যে সে যেন অন্যত্র চাকুরী দেখিয়া লয়।

অপু বিস্মিত হইল—কি ব্যাপার! হঠাৎ ও নোটিশের মানে কি? সে তখনই হেডমাস্টারের কাছে গিয়া চিঠিখানা দেখাইল। তিনি নানা কারণে অপুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রথম, সেবাসমিতির দলগঠন অপুই করিয়াছিল, নেতৃত্বও করিত সে। ছেলেদের সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাহার কথায় ছেলেরা ওঠে বসে। জিনিসটা হেডমাস্টারের চক্ষুশূল। অনেকদিন হইতেই তিনি

সুযোগ খুঁজিতেছিলেন—ছিদ্রটা এত দিন পান নাই—পাইলে কি আর একটা অনভিজ্ঞ ছোকরাকে জব্দ করিতে এতদিন লাগিত?

হেডমাস্টার কিছু জানেন না—সেক্রেটারীব ইচ্ছা, তাঁহার হাত নাই। সেক্রেটারী জানাইলেন, কথাটা এই যে, অপূর্ববাবুর নামে নানা কথা রটিয়াছে, দীঘ্ড়ী বাড়ির মেয়েটির এই সব ঘটনা লইয়া। অনেকদিন হইতেই এ লইয়া তাঁহাব কানে কোন কোন কথা গেলেও তিনি শোনেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যে অনেকে আপত্তি করিতেছেন যে, ও-রূপ চরিত্রের শিক্ষককে কেন রাখা হয়। অপুর প্রতিবাদ সেক্রেটারী কানে তুলিলেন না।

—দেখুন, ও-সব কথা আলাদা। আমাদের স্কুলের ও ছাত্রদের দিক থেকে এ-ব্যাপারটা অন্যভাবে আমরা দেখব কিনা! একবার যাঁর নামে কুৎসা রটেছে, তাঁকে আর আমরা শিক্ষক হিসাবে রাখতে পারি নে—তা সে সত্যিই হোক বা মিথ্যেই হোক।

অপুব মুখ লাল হইয়া গেল এই বিরাট অবিচারে। সে উত্তেজিত সুরে বলিল—বেশ তো মশায়, এ বেশ জাষ্টিস্ হ'ল তো? সত্যি মিথ্যে না জেনে আপনারা একজনকে এই বাজারে অনায়াসে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন—বেশ তো!

বাহিরে আসিয়া রাগে ও ক্ষোভে অপুর চোখে জল আসিয়া গেল। মনে ভাবিল এসব হেডমাস্টারের কারসাজি—আমি যাব তাঁর বাড়ি খোশামোদ করতে? যায় যাক্ চাকরি! কিন্তু এদের অদ্ভুত বিচার বটে—ডিফেণ্ড করার একটা সুযোগ তো খুনী আসামীকে দেওয়া হয়ে থাকে, তা-ও এরা আমায় দিলে না!

কয়দিন সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখানকার চাকুরীর মেয়াদ, তো আর এই মাসটা—তারপর কি করা যাইবে? স্কুলে এক নতুন মাস্টার কিছুদিন পূবে কোন এক মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া দশটা টাকা পাঠাইয়াছিলেন। গল্পটা সেই ভদ্রলোকের কাছে অপু অনেকবার শুনিয়াছে! আচ্ছা, সেও এখানে বসিয়া বসিয়া খাতায় একটা উপন্যাস লিখিতে শুরু করিয়াছিল—মনে মনে ভাবিল—দশ-বারো চ্যাপ্টার তো লেখা আছে, উপন্যাসখানা যদি লিখে শেষ করতে পারি, তার বদলে কেউ টাকা দেবে না? কেমন হচ্ছে কে জানে, একবার রামবাবুকে দেখাব।

নোটিশ-মত অপুর কাজ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, একদিন পোস্টাফিসের ডাক-ব্যাগ খুলিয়া খাম ও পোষ্টকার্ডগুলি নাড়িতে-চাড়িতে একখানা বড় চৌকো, সবুজ রংয়ের মোটা খামের ওপর নিজের নাম দেখিয়া বিস্মিত হইল—

কে তাহাকে এত বড় শৌখিন খামে চিঠি দিল! প্রণব নয়, অন্য কেহ নয়, হাতের লেখাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

খুলিয়া দেখিলেই তো তাহার সকল রহস্য এখনই চলিয়া যাইবে, এখন থাক, বাসায় গিয়া পড়িবে এখন। এই অজানার আনন্দটুকু যতক্ষণ ভোগ করা যায়।

রান্না-খাওয়ার কাজ শেষ হইতে মার্টিন কোম্পানীর রাত দশটার গাড়ি আসিয়া পড়িল, বাজারের দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়িল। অপু পত্রখানা খুলিয়া দেখিল—দুখানা চিঠি, একখানা ছোট চার-পাঁচ লাইনের, আর একখানা মোটা সাদা কাগজে—পরক্ষণেই আনন্দে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তার বুকের রক্ত যেন চল্‌কাইয়া উঠিয়া গেল মাথায়—সর্বনাশ, কার চিঠি এ! চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না—লীলা তাহাকে লিখিতেছে। সঙ্গের চিঠিখানা তার ছোট ভাইয়ের—সে লিখিতেছে, দিদির এ-পত্রখানা তাহার পত্রের মধ্যে আসিয়াছে, অপুকে পাঠাইবার অনুরোধ ছিল দিদির, পাঠানো হইল।

অনেক কথা, ন' পৃষ্ঠা ছোট ছোট অক্ষরের চিঠি। খানিকটা পড়িয়া সে খোলা হাওয়ায় আসিয়া বসিল। কি অবর্ণনীয় মনোভাব, বোঝানো যায় না, বলা যায় না। আরম্ভটা এই রকম—

ভাই অপূর্ব,

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি—তুমি কোথায় আছ, আজকাল কি কর, জানবার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার কিন্তু কে বলবে, কার কাছেই বা খবর পাব? সেবার কলকাতায় গিয়ে বিনুকে একদিন তোমার পুরানো ঠিকানায় তোমার সন্ধানে পাঠিয়েছিলাম—সে বাড়িতে অন্য লোক আজকাল থাকে, তোমার সন্ধান দিতে পারে নি, কি করেই বা পারবে? একথা বিনু বলে নি তোমায়?

আমি বড় অশান্তিতে আছি এখানে, কখনও ভাবিনি এমন আমার হবে। কখনও যদি দেখা হয় তখন সব বলব। এই সব অশান্তির মধ্যে যখন আবার মনে হয় তুমি হয়ত মলিনমুখে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তখন মনের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন বিনুর পত্রে জানলাম বিজয়া দশমীর দিন তুমি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলে, তোমার ঠিকানাও পেলাম।

বর্ধমানের কথা মনে হয়? অত আদরের বর্ধমানের বাড়িতে আজকাল আর যাবার জো নেই। জ্যাঠামশায় মারা যাওয়ার পর থেকেই রমেন-দা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিল। আজকাল সে যা করছে, তা তুমি হয়ত কখনও শোনও নি। মানুষের ধাপ থেকে সে যে কত নীচে নেমে গিয়েছে, আর যা

কীর্তিকারখানা, তা লিখতে গেলে পুঁথি হয়ে পড়ে। কোন মারোয়াড়ীর কাছে নিজের অংশ বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল—এখন তার পরামর্শে পার্টিশন স্যুট আরম্ভ করেছে—বিনুকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে। এ-সব তোমার মাথায় আসবে কোনও দিন ?

কত রাত পর্যন্ত অপু চোখের পাতা বুজাইতে পারিল না। লীলা যাহা লিখিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী কেন লেখে নাই। সারা পত্রখানিতে একটা শান্ত সহানুভূতি স্নেহ, প্রীতি, করুণা। এক মুহূর্তে আজ দু বৎসরব্যাপী এই নির্জনতা অপুর যেন কাটিয়া গেল—এইমাত্র সে ভাবিতেছিল সংসারে সে একা—তাহার কেহ কোথাও নেই। লীলার পত্রে জগতের চেহারা যেন এক মুহূর্তে বদলাইয়া গেল। কোথায় সে—কোথায় লীলা!…বহুদূরের ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার প্রাণের উষ্ণ প্রেমময় স্পর্শ অপুর প্রাণে লাগিয়াছে—কিন্তু কি অপূর্ব রসায়ন এ স্পর্শটা—কোথায় গেল, অপুর চাকুরি যাইবার দুঃখ—কোথায় গেল গোটা-দুই বৎসরের পাষাণভারের মত নির্জনতা—নারীহৃদয়ের অপূর্ব রসায়নের প্রলেপ তাহার সকল মনে, সকল অঙ্গে, কী যে আনন্দ ছড়াইয়া দিল। লীলা যে আছে।…সব সময় তাহার জন্য ভাবে—দুঃখ করে, জীবনে অপু আর কি চায়?…সাক্ষাতের আবশ্যক নাই, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া এই স্পর্শটুকু অক্ষয় হইয়া বিরাজ করুক।

লীলার পত্র পাইবার দিন বারো পরে তাহার যাইবার দিন আসিয়া গেল।

ছেলেরা সভা করিয়া তাঁহাকে বিদায়-সম্বর্ধনা দিবার উদ্দেশ্যে চাঁদা উঠাইতেছিল—হেডমাস্টার খুব বাধা দিলেন। যাহাতে সভা না হইতে পায়, সেইজন্য দলের চাঁইদিগকে ডাকিয়া টেস্ট পরীক্ষার সময় বিপদে ফেলিবেন বলিয়া শাসাইলেন—পরিশেষে স্কুল-ঘরে সভার স্থানও দিতে চাহিলেন না, বলিলেন—তোমরা ফেয়ারওয়েল দিতে যাচ্ছ, ভাল কথা, কিন্তু এসব বিষয়ে আয়রন্ ডিসিপ্লিন্ চাই…যার চরিত্র নেই, তার কিছুই নেই, তার প্রতি কোনও সম্মান তোমরা দেখাও, এ আমি চাই নে, অন্তত স্কুল-ঘরে আমি তার জায়গা দিতে পারি নে।

সেদিন আবার ঝড় বৃষ্টি। মহেন্দ্র সাঁবুই-এর আটচালায় জনত্রিশেক উপরের ক্লাসের ছেলে হেডমাস্টারের ভয়ে লুকাইয়া হাতে লেখা অভিনন্দনপত্র পড়িয়া ও গাঁদাফুলের মালা গলায় দিয়া অপুকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাইল, সভা ভঙ্গের পর জলযোগ করাইল। প্রত্যেকে পায়ের ধূলা লইয়া, তাহার বাড়ি আসিয়া বিছানাপত্র গুছাইয়া দিয়া, নিজেরা তাহাকে বৈকালে ট্রেনে তুলিয়া দিল।

অপু প্রথমে আসিল কলিকাতায়।

একটা খুব লম্বা পাড়ি দিবে—যেখানে সেখানে—যেদিকে দুই চোখ যায়—এতদিনে সত্যই মুক্তি। আর কোনও জালে নিজেকে জড়াইবে না—সব দিক হইতে সতর্ক থাকিবে—শিকলের বাঁধন অনেক সময় অলক্ষিতে জড়ায় কিনা পায়ে!

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া সারা ভারতবর্ষের ম্যাপ ও য়্যাটলাস কয়দিন ধরিয়া দেখিয়া কাটাইল—ড্যানিয়েলের ওরিয়েণ্টাল সিনারি ও পিঙ্কার্টনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নানাস্থান নোট করিয়া লইল—বেঙ্গল নাগপুর ও ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলের নানাস্থানের ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইল। সত্তর টাকা হাতে আছে, ভাবনা কিসের?

কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ছেলেকে চোখের দেখা দেখিয়া যাওয়া দরকার না? সেই দিনই বৈকালের ট্রেনে সে শ্বশুরবাড়ি রওনা হইল। অপর্ণার মা জামাইকে এতটুকু তিরস্কার করিলেন না, এতদিন ছেলেকে না দেখিতে আসার দরুন একটি কথাও বলিলেন না। বরং এত আদর-যত্ন করিলেন যে অপু নিজেতে অপরাধী ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। অপু বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেছে, এমন সময়ে তাহার খুড়শাশুড়ী একটি সুন্দর খোকাকে কোলে করিয়া সেখানে আসিলেন। অপু ভাবিল—বেশ খোকাটি তো? কাদের? খুড়শাশুড়ী বলিলেন—যাও তো খোকন, এবাব তোমার আপনার লোকের কাছে। ধন্যি যাহোক, এমন নিষ্ঠুর বাপ কখনও দেখি নি! যাও তো একবার কোলে—

ছেলে তিন বৎসর প্রায় ছাড়াইয়াছে—ফুটফুটে সুন্দর গায়ের রং—অপর্ণার মত ঠোঁট ও মুখের নীচেকার ভঙ্গী, চোখ বাপের মত ডাগর ডাগর। কিন্তু সবসুদ্ধ ধরিলে অপর্ণার মুখের আদলই বেশী ফুটিয়া উঠে খোকার মুখে। প্রথমে সে কিছুতেই বাবার কাছে আসিবে না, অপরিচিত মুখ দেখিয়া ভয়ে দিদিমাকে জড়াইয়া রহিল—অপুর মনে ইহাতে আঘাত লাগিল। সে হাসিমুখে হাত বাড়াইয়া বার বার খোকাকে কোলে আনিতে গেল—ভয়ে শেষকালে খোকা দিদিমার কাঁধে মুখ লুকাইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় খানিকটা ভাব হইল। তাহাকে দু-একবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিলও। একবার কি একটা পাখি দেখিয়া বলিল—ফাখি, ফাখি, উই এত্তো ফাখি নেবো বাবা—

'প'কে কচি জিব ও ঠোঁটের কি কৌশলে 'ফ' বলিয়া উচ্চারণ করে, কেমন অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আর এত কথাও বলে খোকা!

কিন্তু বেশীর ভাগই বোঝা যায় না—উলটো পালটা কথা, কোন্ কথায়

উপর জোর দিতে গিয়া কোন্ কথার উপর দেয়—কিন্তু অপুর মনে হয় কথা কহিলে খোকার মুখ দিয়া যেন মানিক ঝরে—সে যাহাই কেন বলুক না, প্রত্যেক ভাঙা, অশুদ্ধ, অপূর্ণ কথাটি অপুর মনে বিস্ময় জাগায়। সৃষ্টিব আদিম যুগ হইতে কোন শিশু যেন কখনও 'বাবা' বলে নাই, 'জল' বলে নাই,—কোন্ অসাধ্য সাধনই না তাহার খোকা করিতেছে!

পথে বাবার সঙ্গে বাহির হইয়াই খোকা বকুনি শুরু করিল। হাত-পা নাড়িয়া বুঝাইতে চায়—অপু না বুঝিয়াই অন্যমনস্ক সুরে ঘাড নাড়িয়া বলে—ঠিক ঠিক। তারপর কি হল রে খোকা!

একটা বড সাঁকো পথে পডে, খোকা বলে—বাবা যাব—ওই দেখব।

অপু বলে—আস্তে আস্তে নেমে যা—নেমে গিয়ে একটা কু-উ করবি—

খোকা আস্তে আস্তে ঢালু বাহিয়া নীচে নামে—জলনিকাশের পথটার ফাঁকে ওদিকেব গাছপালা দেখা যাইতেছে—না বুঝিয়া বলে—বাবা, এই মধ্যে একতা বাগান—

—কু করো তো খোকা, একটা কু করো।

খোকা উৎসাহের সহিত বাঁশির মত সুরে ডাকে—কু-উ-উ। পবে বলে—তুমি কলুন বাবা?

অপু হাসিয়া বলে—কু-উ-উ-উ-উ—

খোকা আমোদ পাইয়া নিজে আবার করে—আবার বলে—তুমি কলুন? বাড়ি ফিরিবার পথে বলে, খবিছাক এনো বাবা—দিদিমা খবিছাক আঁড্‌বে—খবিছাক ভালো—সন্ধ্যাবেলা খোকা আরও কত গল্প করে। এখানকার চাঁদ গোল। মাসিমার বাড়ি একবার গিয়াছিল, সেখানকার চাঁদ ছোট্ট—এতটুকু! অতটুকু চাঁদ কেন বাবা? শীঘ্রই অপু দেখিল খোকা দুষ্টুও বড়। অপু পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিতেছে, খোকা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া সবাইকে বলে—ছ্যাখ, কত তাকা!—আয় আয়—

পরে একটা টাকা তুলিয়া বলে—এতা আমি কিছুতি দেবো না। হাতে মুঠো বাঁধিয়া থাকে—আমি কাঁচের ভাঁতা কিন্‌বো—অপু ভাবে খোকাটা দুষ্টুও তো হয়েছে—না—দে—টাকা কি করবি?

—না কিছুতি দেব না—হি-হি, ঘাড় দুলাইয়া হাসে।

অপুর টাকাটা হাত হইতে লইতে কষ্ট হয়—তবু লয়। এতটা টাকার ওর কি দরকার? মিছিমিছি নষ্ট।

কলিকাতা ফিরিবার সময়ে অপর্ণার মা বলিলেন—বাবা আমার মেয়ে গিয়েছে, যাক্—কিন্তু তোমার কষ্টই হয়েছে আমার বেশী! তোমাকে যে কি

চোখে দেখেছিলাম বলতে পারি নে, তুমি যে এ-রকম পথে পথে বেড়াচ্ছ, এতে আমার বুক ফেটে যায়, তোমার মা বেঁচে থাকলে কি বিয়ে না করে পারতে? খোকনের কথাটাও তো ভাবতে হবে, একটা বিয়ে কর বাবা।

নৌকায় আবার পীরপুরের ঘাটে আসা। অপর্ণার ছোট খুড়তুত ভাই ননী তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিতেছিল।

খররৌদ্রে বড়দলের নোনাজল চক্-চক্ করিতেছে। মাঝ নদীতে একখানা বাদাম-তোলা মহাজনী নৌকা, দূরে বড়দলের মোহনার দিকে সুন্দরবনের ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সীমারেখা।

আশ্চর্য! এরই মধ্যে অপর্ণা যেন কত দূরের হইয়া গিয়াছে। অসীম জলরাশির প্রান্তের ওই অনতিস্পষ্ট বনরেখার মতই দূরের—অনেক দূরের।

অপুদের ডিঙিখানা দক্ষিণতীর ঘেঁষিয়া যাইতেছিল, নৌকার তলায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ লাগিতেছে, কোথাও একটা উঁচু ডাঙা, কোথাও পাড় ধ্বসিয়া নদীগর্ভে পড়িয়া যাওয়ায় কাশঝোপের শিকড়গুলা বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। একটা জায়গায় আসিয়া অপুর হঠাৎ মনে হইল, জায়গাটা সে চিনিতে পারিয়াছে—একটা ছোট খাল, ডাঙার উপরে একটা হিজল গাছ। এই খালটিতেই অনেকদিন আগে অপর্ণাকে কলিকাতা হইতে আনিবার সময়ে সে বলিয়াছিল—এ কলা-বৌ, ঘোমটা খোল, বাপের বাড়ির ছ্যাশটা চেয়েই দ্যাখ—

তারপর স্টীমার চড়িয়া খুলনা, বাঁ দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিয়া লইল ওই যে ছোট্ট ঘরটি—প্রথম যেখানে সে ও অপর্ণা সংসার পাতে।

সেদিনকার সে অপূর্ব আনন্দমুহূর্তটিতে সে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, এমন একদিন আসিবে, যেদিন শূন্যদৃষ্টিতে খড়ের ঘরখানার দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘটনাটা মনে হইবে মিথ্যা স্বপ্ন?

নির্নিমেষ, উৎসুক, অবাক চোখে সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অপুর কেমন এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল—একবার ঘরখানার মধ্যে যাইতে, সব দেখিতে। হয়তো অপর্ণার হাতের উনুনের মাটির ঝিঁকটা এখনও আছে—আর যেখানে বসিয়া সে অপর্ণার হাতের জলখাবার খাইয়াছিল। প্রথম যেখানটিতে অপর্ণা ট্রাঙ্ক হইতে আয়না-চিরুনি বাহির করিয়া তাহার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল···

ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়া থাকে। স্টেশনের পর স্টেশন আসে ও চলিয়া যায়, অপু শুধুই ভাবে বড়দলের তীর, চাঁদাকাঁটার বন, ভাঁটার জল কল্‌কল্ করিয়া নামিয়া যাইতেছে,···একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর অবোধ হাসি—অন্ধকার রাত্রে বিকীর্ণ জলরাশির ওপারে কোথায় দাঁড়াইয়া অপর্ণা যেন সেই

মনসাপোতার বাড়ির পুরাতন দিনগুলির মত দুষ্টুমিভরা চোখে হাসিমুখে বলিতেছে—আর কক্ষনো যাবো না তোমার সঙ্গে। আর কক্ষনো না—দেখে নিও।

ফাল্গুন মাস। কলিকাতায় সুন্দর দক্ষিণ হাওয়া বহিতেছে, সকালে একটু শীতও, বোর্ডিংয়ের বারান্দাতে অপু বিছানা পাতিয়াছিল! খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়াই তাহার মনে হইল, আজ আর স্কুল নাই, টিউশনি নাই—আর বেলা দশটায় নাকে-মুখে গুঁজিয়া কোথাও ছুটিতে হইবে না—আজ সমস্ত সময়টা তাহার নিজের, তাহা লইয়া সে যাহা খুশি করিতে পারে—আজ সে মুক্ত !...মুক্ত !...মুক্ত।—আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না সে। কথাটা ভাবিতেই সারা দেহ অপূর্ব উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল—বাঁধন-ছেঁড়া মুক্তির উল্লাস! বহুকাল পর স্বাধীনতার আস্বাদন আজ পাওয়া গেল। ঐ আকাশের ক্রমবিলীয়মান নক্ষত্রটার মতই আজ সে দূর পথের পথিক—অজানার উদ্দেশ্যে সে যাত্রার আরম্ভ হয়ত আজই হয়, কি কালই হয়।

পুলকিত মনে বিছানা হইতে উঠিয়া নাপিত ডাকাইয়া কামাইল, ফর্সা কাপড় পরিল। পুরাতন শৌখিনতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠার দরুন দরজির দোকানে একটা মটকার পাঞ্জাবি তৈয়ারি করিতে দিয়াছিল, সেটা নিজে গিয়া লইয়া আসিল। ভাবিল—একবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখে আসি নূতন বই কি এসেছে, আবার কতদিনে কলকাতায় ফিরি, কে জানে? বৈকালে মিউজিয়ামে রকফেলার ট্রাস্টের পক্ষ হইতে মশক ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। অপুও গেল। বক্তৃতাটি সচিত্র। একটি ছবি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মশকের জীবনেতিহাসের প্রথম পর্যায়ে সেটা থাকে কীট—তারপরে হঠাৎ কীটের খোলস ছাড়িয়া সেটা পাখা গজাইয়া উড়িয়া যায়। ঠিক যে সময়ে কীটদেহটা অসাড়, প্রাণহীন অবস্থায় জলের তলায় ডুবিয়া যাইতেছে—নব-কলেবরধারী মশকটা পাখা ছাড়িয়া জল হইতে শূন্যে উড়িয়া গেল।

মানুষেরও তো এমন হইতে পারে। জলের তলায় সন্তরণকারী অন্যান্য মশক কীটের চোখে তাদের সঙ্গী তো মরিয়াই গেল—তাদের চোখের সামনে দেহটা তলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু জলের ঊর্ধ্বে যে জগতে মশক নবজন্মলাভ করিল, এরা তো আর কোনও খবরই রাখে না, সে জগতে প্রবেশের অধিকার তখনও তারা তো অর্জন করে নাই—মৃত্যু দ্বারা, অন্ততঃ তাদের চোখে যা মৃত্যু তার দ্বারা। এই মশক নিম্নস্তরের জীব, তার পক্ষে যা বৈজ্ঞানিক সত্য, মানুষের পক্ষে তা কি মিথ্যা?

কথাটা সে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

যাইবার আগে একবার পরিচিত বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া পরদিন সকালে সে সেই কবিরাজ বন্ধুটির দোকানে গেল। দোকানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না, উড়িয়া ছোকরা-চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইয়া পবে সে বাসার মধ্যে ঢুকিল।

সেই খোলার-বাড়ি—সেই বাড়িটাই আছে। সঙ্কীর্ণ উঠানের একপাশে বেলেপাথরের শিলপাতা। বন্ধুটি নোড়া দিয়া কি পিষিতেছে, পাশে বড একখানা খববেব কাগজের উপর একরাশ ধূসর রংয়ের গুঁড়া! সাবা উঠান জুড়িয়া কুলায়-ডালায় নানা শিকড বাকড বৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইযাছে।

বন্ধু হাসিয়া বলিল, এসো এসো, তারপর এতদিন কোথায় ছিলে? কিছু মনে কবো না ভাই খারাপ হাত, মাজন তৈরি করছি—এই ছাখ না ছাপানো লেবেল—চন্দ্রমুখী মাজন, মহিলা হোম ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট—আজকাল মেয়েদেব নাম না দিলে পাবলিকেব সিমপ্যাথি পাওয়া যায় না, তাই ঐ নাম দিয়েছি। ব'স ব'স—ওগো, বার হয়ে এসো না। অপূর্ব এসেছে, একটু চা-টা কবো।

অপু হাসিয়া বলিল, সিণ্ডিকেটের সভ্য তো দেখছি আপাতত মোটে দুজন, তুমি আব তোমার স্ত্রী এবং খুব যে য়্যাকৃটিভ সভ্য তাও বুঝছি।

হাসিমুখে বন্ধুপত্নী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অপুব মনে হইল, অন্য শিলখানাতে তিনিও কিছু পূর্বে মাজন-পেষা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাব আসিবার সংবাদ পাইয়াই শিল ছাড়িয়া ঘরেব মধ্যে পলাইয়াছিলেন। হাতে-মুখেব গুঁড়া ধুইয়া ফেলিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বাহিব হইলেও মাথায় এলোমেলো উড়ন্ত চুলে ও কপালেব পাশে ঘামে সে কথা জানাইয়া দেয়।

বন্ধু বলিল—কি করি বল ভাই, দিনকাল যা পড়েছে, পাওনাদারের কাছে দুবেলা অপমান হচ্ছি, ছোট আদালতে নালিশ ক'রে দোকানের ক্যাশবাক্স সীল ক'রে বেখেছে। দিন একটা টাকা খরচ—বাসায় কোন দিন খাওয়া হয়, কোন দিন—

বন্ধু-পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি ও-কাঁদুনি গেয়ো অন্য সময়। এখন উনি এলেন এতদিন পর, একটু চা খাবেন, ঠাণ্ডা হবেন, তা না তোমার কাঁদুনি শুরু হ'ল।

—আহা, আমি কি পথের লোককে ধরে বলতে যাই? অ আমার

ক্লাসফ্রেণ্ড, ওদের কাছে দুঃখের কথাটা বললে—ইয়ে, পাতা চায়ের প্যাকেট একটা খুলে নাও না? আটা আছে নাকি? আর ছাখ, না হয় ওকে খান চারেক রুটি অন্তত—

—আচ্ছা, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। পরে অপুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি বিজয়া দশমীর পর আর একদিনও এলেন না যে বড?

চা ও পরোটা খাইতে খাইতে অপু নিজের কথা সব বলিল—শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছে, সে কথাটাও বলিল। বন্ধু বলিল, তবেই ছাখ ভাই, তবু তুমি একা আর আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই কলকাতা শহরের মধ্যে আজ পাঁচ পাঁচটি বছর যে কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি তা আর—এই সব নিয়ে একরকম চালাই, পয়সা-প্যাকেট চা আছে, কবিরাজি মোদক আছে। মাজনের লাভ মন্দ না, কিন্তু কি জান, এই কৌটোটা পডে যায় দেড পয়সার ওপর, মাজন, লেবেল, ক্যাপসুলে তাও প্রায় দু'পয়সা—তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি করব, স্বামী-স্ত্রীতে খাটি কিন্তু মজুরী পোষায় কই? তবুও তো দোকানীব কমিশন ধরি নি হিসেবের মধ্যে। এদিকে চার পয়সাব বেশী দাম কবলে কম্পিট কবতে পারব না।

খানিক পরে বন্ধু বলিল—ওহে তোমার বৌঠাকরুণ বলছেন, আমাদের তো একটা খাওয়া পাওনা আছে, এবার সেটা হয়ে যাক্ না কেন?—বেশ একটা ফেয়ারওয়েল ফিস্ট হয়ে যাবে এখন, তবে উল্‌টো, এই যা—

অপু মনে মনে ভারী কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল বন্ধু-পত্নীর প্রতি। ইহাদেব মলিন বেশ ও ছেলেমেয়েগুলির শীর্ণ চেহারা হইতে ইহাদের ইতিহাস সে ভালই বুঝিয়াছিল? কিন্তু ভালো খাবার আনাইয়া খাওয়ানো একটু আমোদ আহ্লাদ করা—কিন্তু হয়ত সেটা দরিদ্র সংসারে সাহায্যের মত দেখাইবে! যদি ইহারা না লয় বা মনে কিছু ভাবে?···ও পক্ষ হইতে প্রস্তাবটা আসাতে সে ভারী খুশী হইল।

ভোজের আয়োজনে ছ-সাত টাকা ব্যয় করিয়া অপু বন্ধুর সঙ্গে ঘুরিয়া বাজার করিল। কই-মাছ, গলদা-চিংড়ি, ডিম আলু, ছানা, দই, সন্দেশ।

হয়তো খুব বড ধরণের কিছু ভোজ নয়, কিন্তু বন্ধু-পত্নীর আদরে হাসিমুখে তাহা এত মধুর হইয়া উঠিল। এমন কি এক সময়ে অপুর মনে হইল আসলে তাহাকে খাওয়ানোর জন্যই বন্ধু-পত্নীর এ ছল। লোকে ইষ্টদেবতাকেও এত যত্ন করে না বোধ হয়। পিছনে সব সময় বন্ধুর বৌটি পাখা হাতে বসিয়া তাহাদের বাতাস করিতেছিলেন, অপু হাত উঠাইতেই হাসিমুখে বলিলেন—ও

হবে না, আপনি আর একটু ছানার ডালনা নিন—ও কি, মোচার চপ পাতে রাখলেন কার জন্যে? সে শুনব না—

এই সময় একটি পনেরো-ষোল বছরের ছেলে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধু বলিল—এসো এসো কুঞ্জ, এসো বাবা, এইটি আমার শালীর ছেলে, বাগবাজারে থাকে। আমার সে ভায়েরা-ভাই মারা গেছে গত শ্রাবণ মাসে। পাটের প্রেসে কাজ করত, গঙ্গার ঘাটে রেললাইন পেরিয়ে আসতে হয়। তা রোজই আসে, সেদিন একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তা ভাবলে, আবার অতখানি ঘুরে যাবে? যেমন গাড়ির তলা দিয়ে গলে আসতে গিয়েছে আর অমনি গাড়িখানা দিয়েছে ছেড়ে। তারপর চাকায় কেটে-কুটে একেবারে আর কি—ছ'টি মেয়ে, আমার শালী আর এই ছেলেটি, একরকম ক'রে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে চলছে। উপায় কি?···তাই আজ ভাল খাওয়াটা আছে, কাল স্ত্রী বললে, যাও কুঞ্জকে বলে এসো—ওরে বসে যা বাবা, থালা না থাকে বসে যা না একখানা পাতা পেতে। হাত-মুখটা ধুয়ে আয় বাবা—এত দেরি ক'রে ফেললি কেন?

বেলা বেশী ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। অপু বলিল, আচ্ছা আজ উঠি ভাই, বেশ আনন্দ হ'ল আজ অনেকদিন পরে—

বন্ধু বলিল, ওগো, অপূর্বকে আলোটা ধরে গলির মুখটা পার ক'রে দাও তো? আমি আর উঠতে পারি নে—

একটা ছোট্ট কেরোসিনের টেমি হাতে বৌটি অপুর পিছনে পিছনে চলিল।

অপু বলিল, থাক, বৌ-ঠাকরুণ, আর এগোবেন না, এমন আর কি অন্ধকার, যান আপনি—

—আবার কবে আসবেন?

—ঠিক নেই, এখন একটা লম্বা পাড়ি তো দি—

—কেন, একটা বিয়ে-থা করুন না? পথে পথে সন্ন্যাসি হয়ে এ রকম বেড়ানো কি ভাল? মাও তো নেই শুনেছি। কবে যাবেন আপনি?···যাবার আগে একবার আসবেন না, যদি পারেন।

—তা হয়ে উঠবে না বৌ-ঠাকুরুণ। ফিরি যদি আবার তখন বরং—আচ্ছা নমস্কার।

বৌটি টেমি হাতে গলির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সে সকালে উঠিয়া ভাবিয়া দেখিল, হাতের পয়সা নানারকমে

উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন দেরী করিলে যাওয়াই হইবে না। এখানেই আবার চাকরির উমেদার হইয়া দোরে দোরে ঘুরিতে হইবে। কিন্তু আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কিছু ঠিক হইল না। একবার মনে হয় এটা ভাল, আবার মনে হয় ওটা ভাল। অবশেষে স্থির করিল স্টেশনে গিয়া সম্মুখে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই উঠা যাইবে। জিনিস-পত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখিল, আর মিনিট পনেরো পরে চার নম্বর প্লাটফর্ম হইতে গয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়িতেছে। একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া সোজা ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারের একটা জায়গায় সে নিজের বিছানাটি পাতিয়া বসিল।

অপু কি জানিত এই যাত্রা তাহাকে কোন পথে চালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে? এই চারটা বিশ মিনিটের গয়া প্যাসেঞ্জার—পরবর্তী জীবনে সে কতবার ভাবিয়াছে যে সে তো পাঁজি দেখিয়া যাত্রা শুরু করে নাই, কিন্তু কোন মহাশুভ মাহেন্দ্রক্ষণে সে হাওড়া স্টেশনের থার্ড ক্লাস টিকিট ঘরের খুলঘুলিতে ফিরিঙ্গি মেয়ের কাছে গিয়া একখানা টিকিট চাহিয়াছিল—দশ টাকার একখানা নোট দিয়া সাড়ে পাঁচ টাকা ফেরৎ পাইয়াছিল। মানুষ যদি তাহার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত।

অপু বর্তমানে এসব কিছুই ভাবিতেছিল না। এত বয়স হইল, কখনও সে গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে বেড়ায় নাই, সেই ছেলেবেলায় দুটিবার ছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলেও আর কখনও চড়ে নাই, রেলে চড়িয়া দূরদেশে যাওয়ার আনন্দে সে ছেলেমানুষের মত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাস্তার ধারে গাছপালা ক্রমশঃ কিরূপ বদলাইয়া যায়, লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে তাহার আছে, বর্ধমান পর্যন্ত দেখিতে দেখিতে গেল কিন্তু তার পরই অন্ধকারে আর দেখা গেল না।

পরদিন বৈকালে গয়ায় নামিয়া সে বিষ্ণুপদমন্দিরে পিণ্ড দিল। ভাবিল, আমি এসব মানি, বা না মানি, কিন্তু সবটুকু তো জানি নে? যদি কিছু থাকে, বাপমায়ের উপকারে লাগে! পিণ্ড দিবার সময় ভাবিয়া ভাবিয়া ছেলেবেলায় বা পরে যে যেখানে মারা গিয়াছে বলিয়া জানা ছিল, তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিল। এমন কি, পিসিমা ইন্দির ঠাকরুণকেও সে মনে করিতে না পারিলেও দিদির মুখে শুনিয়াছে, তাঁর উদ্দেশে—আতুরী ডাইনী বুড়ির উদ্দেশেও।

বৈকালে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেল। অপুর যদি কাহারও উপর শ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার আবাল্য শ্রদ্ধা এই সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর। ছেলের নাম তাই সে রাখিয়াছে অমিতাভ।

বামে ক্ষীণস্রোতা ফল্গু কটা রংয়ের বালুশয্যায় ক্লান্তদেহ এলাইয়া দিয়াছে, ওপারে হাজারিবাগ জেলার সীমান্তবর্তী পাহাড়শ্রেণী, সারাপথে ভারী সুন্দর ছায়া, গাছপালা, পাখির ডাক, ঠিক যেন বাংলাদেশ। সোজা বাঁধানো রাস্তাটি ফল্গুর ধারে ধারে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় চলিয়াছে, সারাপথ অপু স্বপ্নাভিভূতের মত একার উপর বসিয়া রহিল। একজন হালফ্যাশানের কাপড পরা তরুণী মহিলা ও সম্ভবত তাঁহার স্বামী মোটরে বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিতেছেন, অপু ভাবিল হাজার হাজার বছর পরেও এ কোন্ নূতন যুগের ছেলেমেয়ে—প্রাচীনকালের সেই পীঠস্থানটি এমন সাগ্রহে দেখিতে আসিয়াছিল? মনে পড়ে সেই অপূর্ব রাত্রি, নবজাত শিশুর চাঁদমুখ…ছন্দক…গয়ার জঙ্গলে দিনের পর দিন সে কি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ মোটর গাড়ি? শতাব্দির ঘন অরণ্য পার হইয়া এমন একদিন নামিয়াছে পৃথিবীতে পুরাতনের সবই চূর্ণ করিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নবযুগেব পত্তন করিয়াছে। রাজা শুদ্ধোধনের কপিলাবস্তু মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোন চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই—কিন্তু তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে দিকে সে বৃহত্তর কপিলাবস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরেও কে না মাথা নত করিবে?

গয়া হইতে পরদিন সে দিল্লী এক্সপ্রেসে চাপিল—একেবারে দিল্লীর টিকিট কাটিয়া। পাশের বেঞ্চিতেই একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন। কথায় কথায় ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল। গাড়িতে আর কোন বাঙালী নাই, কথাবার্তার সঙ্গী পাইয়া তিনি খুব খুশী। অপুর কিন্তু বেশী কথাবার্তা ভাল লাগিতেছিল না। এরা এ-সময় এত বক-বক করে কেন? মারোয়াড়ী দুটি তো সাসারাম হইতে নিজের মধ্যে বকুনি শুরু করিয়াছে, মুখের আর বিরাম নাই।

খুশীভরা, উৎসুক, ব্যগ্র মনে সে প্রত্যেক পাথরের নুড়িটি, গাছপালাটি লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিল। বামদিকের পাহাড়শ্রেণীর পিছনে সূর্য অস্ত গেল, সারাদিন আকাশটা লাল হইয়া আছে, আনন্দের আবেগে সে দ্রুতগামী গাড়ির দরজা খুলিয়া দরজার হাতল ধরিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, উঁহু, পড়ে যাবেন, পাদানিতে শ্লিপ করলেই—বন্ধ করুন মশাই।

অপু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগে কিন্তু, মনে হয় যেন উড়ে যাচ্ছি।

গাছপালা, খাল, নদী, পাহাড় কাঁকর-ভরা জমি, গোটা শাহাবাদ জেলাটা তাহার পায়ের তলা দিয়া পলাইতেছে। অনেক দূর পর্যন্ত শোণ নদের বালুর চড়া জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাইতেছে। নীলনদ? ঠিক এটা যেন নীলনদ। ওপারে সাত-আট মাইল গাধার পিঠে চড়িয়া গেলে ফ্যারাও রামেসিসের তৈরি আবু সিম্বেলের বিরাট পাষাণ মন্দির—ধূসর অস্পষ্ট কুয়াসায় ঘেরা মরুভূমির মধ্যে অতীতকালের বিস্মৃত দেবদেবীর মন্দির, এপিস, আইসিস, হোরাস, হাথর, রা—নীলনদ যেমন গতির মুখে উপলখণ্ড পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া চলে—মহাকালের বিরাট রথচক্র তাণ্ডব-নৃত্যছন্দে সব স্থাবর অস্থাবর জিনিসকে পিছু ফেলিয়া মহাবেগে চলিবার সময় এই বিরাট গ্র্যানাইট মন্দিরকে পথের পাশে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, জনহীন মরুভূমির মধ্যে বিস্মৃত সভ্যতার চিহ্ন—মন্দিরটা কোন বিস্মৃত ও বাতিল দেবদেবীর উদ্দেশ্যে গঠিত ও উৎসর্গীকৃত!

একটু রাত্রে ভদ্রলোকটি বলিলেন, এ লাইনে ভাল খাবার পাবেন না, আমার সঙ্গে খাবার আছে, আসুন খাওয়া যাক।

তাঁহার স্ত্রী কলার পাতা চিরিয়া সকলকে বেঞ্চির উপর পাতিয়া দিলেন—লুচি, হালুয়া ও সন্দেশ,—সকলকে পরিবেশন করিলেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি খানকতক বেশী লুচি নিন, আমরা তো আজ মোগলসরাইয়ে ব্রেকজার্নি করব, আপনি তো সোজা দিল্লী চলেছেন।

এ-ও অপুর এক অভিজ্ঞতা। পথে বাহির হইলে এত শীঘ্রও এমন ঘনিষ্ঠতা হয়! এক গলির মধ্যে শহরে শত বর্ষ বাস করিলেও তো হয় না? ভদ্রলোকটি নিজের পরিচয় দিলেন, নাগপুরের কাছে কোন গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ফরেস্ট-এ কাজ করেন, ছুটি লইয়া কালীঘাটে শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিলেন, ছুটি অন্তে কর্মস্থানে চলিয়াছেন। অপুকে ঠিকানা দিলেন। বার বার অনুরোধ করিলেন, সে যেন দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে একবার অতি অবশ্য অবশ্য যায়, বাঙালীর মুখ মোটে দেখিতে পান না—অপু গেলে তাঁহারা তো কথা কহিয়া বাঁচেন। মোগলসরাই-এ গাড়ি দাঁড়াইল। অপু মালপত্র নামাইতে সাহায্য করিল। হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌ-ঠাকরণ, নমস্কার, শীগ্‌গিরই আপনাদের ওখানে উপদ্রব করছি কিন্তু।

দিল্লীতে ট্রেন পৌঁছাইল রাত্রি সাড়ে এগারোটায়।

গাজিয়াবাদ স্টেশন হইতেই সে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া দেখিল—যে-দিল্লীতে গাড়ি আসিতেছিল তাহা এস, কপুর কোম্পানীর দিল্লী নয়,

লেজিস্‌লেটিভ য়্যাসেম্ব্লীর মেম্বারদের দিল্লী নয়, এসিয়াটিক পেট্রোলিয়মের এজেন্টের দিল্লী নয়—সে দিল্লী সম্পূর্ণ ভিন্ন—বহুকালের বহুযুগের নরনারীদের —মহাভারত হইতে শুরু করিয়া রাজসিংহ ও মাধবীকঙ্কণ,—সমুদয় কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পনা ও ইতিহাসের মাল মশলায় তাহার প্রতি ইটখানা তৈরি, তার প্রতি ধূলিকণা অপুর মনের রোমান্সে সকল নায়ক-নায়িকার পুণ্যপাদপূত—ভীষ্ম হইতে আওরঙ্গজেব ও সদাশিব রাও পর্যন্ত—গান্ধারী হইতে জাহানারা পর্যন্ত—সাধারণ দিল্লী হইতে সে দিল্লীর দূরত্ব অনেক!—দিল্লী কনৌজ দূর অস্তু, বহুদূর—বহুশতাব্দীর দূর পারে, সে দিল্লী কেহ দেখে নাই।

আজ নয়, মনে হয় শৈশবে মায়ের মুখে মহাভারত শোনার দিন হইতে ছিরের পুকুরের ধারের বাঁশবনের ছায়ার কাঁচা শেওড়ার ডাল পাতিয়া 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্রজীবন-প্রভাত' পড়িবার দিনগুলি হইতে, সকল ইতিহাস যাত্রা, থিয়েটার, কত গল্প, কত কবিতা, এই দিল্লী, আগ্রা, সমগ্র রাজপুতানা ও আর্যাবর্ত—তাহার মনে একটি অতি অপরূপ, অভিনব, স্বপ্নময় আসন অধিকার করিয়া আছে—অন্য কাহারও মনে সে রকম আছে কিনা, সেটা প্রশ্ন নয়, তাহার মনে আছে এইটাই বড় কথা।

কিন্তু বাহিরে ঘন অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না—অনেকক্ষণ চাহিয়া কেবল কতগুলি সিগ্‌ন্যালের বাতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, একটা প্রকাণ্ড ইয়ার্ড কেবিন, লেখা আছে 'দিল্লী জংসন ইস্ট্'—একটা গ্যাসোলিনের ট্যাঙ্ক তাহার পরই চারিদিকে আলোকিত প্ল্যাটফর্ম—প্রকাণ্ড দোতলা স্টেশন—সেই পিয়ার্স সোপ, কিটিংস পাউডার, হল্‌স্ ডিস্‌টেম্পার, লিপটনের চা। আবদুল আজিজ হাকিমের রৌশনেসেকাৎ, উৎকৃষ্ট দাদের মলম।

নিজের ছোট ক্যান্‌ভ্যাসের সুটকেশ ও ছোট বিছানাটা হাতে লইয়া অপু স্টেশনে নামিল—রাত অনেক, শহর সম্পূর্ণ অপরিচিত, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ওয়েটিংরুম দোতলায়, রাত্রি সেখানে কাটানোই নিরাপদ মনে হইল।

সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র জমা দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্ধমাইল-ব্যাপী দীর্ঘ শোভাযাত্রা করিয়া সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সোনার হাওদায় কোন শাহাজাদী নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন কি? দুধারে আবেদনকারী ও ওমরাহ্‌দল আভূমি তসলীম্ করিয়া অনুগ্রহভিক্ষার অপেক্ষায় করজোড়ে খাড়া আছে কি? নব আগন্তুক নরেন্দ্রনাথ পাৎশাবেগমের কোন সরাইখানায় ধূমপানরত বৃদ্ধ পারস্যদেশীয় শেখের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

কিন্তু এ যে একেবারে কলিকাতার মতই সব! এমন কি মণিলাল জুয়েলার্সের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। দুজন লোক কলিকাতা হইতে বেড়াইতে

আসিয়াছিল, টাঙাভাড়া সস্তা পড়িবে বলিয়া তাহাকে তাহারা সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিল। কুতুবের পথে একজন বলিল, মশাই আরও বার-দুই দিল্লী এসেছি, কুতুবের মুরগীর কাটলেট খান নি কখনও, না? আঃ—সে যা জিনিস, চলুন, এক ডজন কাটলেট অর্ডার দিয়ে তবে উঠব কুতুবমিনারে।

বাল্যকালে দেওয়ানপুরে পড়িবার সময় পুরনো দিল্লীর কথা পড়িয়া তাহার কল্পনা করিতে গিয়া বারবার স্কুলের পাশের একটা পুরাতন ইটখোলার ছবি অপুর মনে উদয় হইত, আজ অপু দেখিল পুরাতন দিল্লী বাল্যের সে ইটের পাজাটা নয়। কুতবমিনার নতুন দিল্লী শহর হইতে যে এতদূর তাহা সে ভাবে নাই। তদুপরি সে দেখিয়া বিস্মিত হইল, এই দীর্ঘ পথেব দুধারে মরুভূমির মত অনুর্বর কাঁটাগাছ ও ফণিমনসার ঝোপে ভরা রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তরের এখানে ওখানে সর্বত্র ভাঙা বাড়ি, মিনার মসজিদ, কবর, খিলান, দেওয়াল। সাতটা প্রাচীন মৃত রাজধানীর মূক কঙ্কাল পথের দুধারে উঁচুনিচু জমিতে বাবলাগাছ ও ক্যাকৃটাস গাছের ঝোপ-ঝাপের আড়ালে হৃতগৌরব নিস্তব্ধতায় আত্মগোপন করিয়া আছে—পৃথ্বীরাজ পিথৌরার দিল্লী, লালকোট, দাসবংশের দিল্লী, তোগলকদের দিল্লী, আলাউদ্দীন খিলজীর দিল্লী, শিরি ও জাহানপনাহ্, মোগলদের দিল্লী। অপু জীবনে এ রকম দৃশ্য দেখে নাই, কখনো কল্পনাও করে নাই, সে অবাক হইল, অভিভূত হইল, নীরব হইয়া গেল, গাইড-বুক উন্টাইতে ভুলিয়া গেল, ম্যাপের নম্বর মিলাইয়া দেখিতে ভুলিয়া গেল—মহাকালের এই বিরাট শোভাযাত্রা একটার পর একটা বায়োস্কোপের ছবির মত চলিয়া যাইবার দৃশ্যে সে যেন সম্বিৎহারা হইয়া পড়িল। আরও বিশেষ হইল এই জন্য যে, মন তাহার নবীন আছে। কখনও কিছু দেখে নাই, চিরকাল আঁস্তাকুড়ের আবর্জনায় কাটাইয়াছে অথচ মন হইয়া উঠিয়াছে সর্বগ্রাসী, বুভুক্ষু। তাই সে যাহা দেখিতেছিল, তাহা যেন বাহিরের চোখটা দিয়া নয়, সে কোন তীক্ষ্ণদর্শী তৃতীয় নেত্র, যেটা না খুলিলে বাহিরের চোখের দেখাটা নিষ্ফল হইয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে দুপুরের পর সে গেল কুতব হইতে অনেক দূরে গিয়াসউদ্দীন তোগলকের অসমাপ্ত নগর—তোগলকাবাদে। গ্রীষ্মে দুপুরের খররৌদ্রে তখন চারিধারের উষরভূমি আগুন-রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে তোগলকাবাদ দেখিয়া মনে হইল যেন কোন দৈত্যের হাতে গাঁথা এক বিরাট পাষাণ-দুর্গ! তৃণ-বিরল উষরভূমি পত্রহীন বাবলা ও কণ্টকময় ক্যাকটাসের পটভূমিতে খররৌদ্রে সে যেন এক বর্বর-অসুরবীর্য সু-উচ্চ পাষাণ দুর্গপ্রাচীর হইতে সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, মালব, পাঞ্জাব,—সারা আর্যাবর্তকে ভ্রূকুটি

করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রচেষ্টা নাই, নিষ্ঠুর বটে, রুক্ষ বটে, কিন্তু সবটা মিলিয়া এমন বিশালতার সৌন্দর্য, পৌরুষের সৌন্দর্য, বর্বরতার সৌন্দর্য—যা মনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে, হৃদয়কে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরে। সব আসছে, কিন্তু দেহে প্রাণ নাই, চারিধারে ধ্বংসস্তূপ, কাঁটাগাছ, বিশৃঙ্খলতা বড় বড় পাথর গড়াইয়া উঠিবার পথ বুজাইয়া রাখিয়াছে—মৃতমুখের ভ্রূকুটি মাত্র।

সাধু নিজামউদ্দিনের অভিশাপ মনে পড়িল—ইয়ে বসে গুজব, ইয়ে রাহে গুজব—

পৃথ্বীরাজের দুর্গের চবুতরার উপর যখন সে দাঁড়াইয়া—হি-হি, মুশকিল, কি অদ্ভুতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের সেই বনের ধারের ছিরে পুকুরটা এ দুর্গের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে, বাল্যে তাহারই ধারের শেওড়াবনে বসিয়া 'জীবন-প্রভাত' পড়িতে পড়িতে কতবার কল্পনা করিত, পৃথ্বীরাজের দুর্গ ঘিরে পুকুরের উঁচু ও-দিকের পাড়টার মত বুঝি!...এখনও ছবিটা দেখিতে পাইতেছে—কতকগুলি গুগ্‌লি শামুক, ও-পারের বাঁশঝাড়। যাক্ চবুতরার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দূর পশ্চিম আকাশের চারিধারের মহাশ্মশানের উপর ধূসর ছায়া ফেলিয়া সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী আকাশের পটে আগুনের অক্ষরে লিখিয়া সূর্য অস্ত গেল। সে সব অতি পবিত্র, গোপনীয় মুহূর্ত অপুর জীবনে—দেবতারা তখন কানে কানে কথা বলেন, তাহার জীবনে এরূপ সূর্যাস্ত আর ক'টা বা আসিয়াছে? ভয় ও বিস্ময় দুই-ই হইল, সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল, কি অপূর্ব অনুভূতি! জীবনের চক্রবালনেমি এতদিন যেন কত ছোট, অপরিসর ছিল, আজকার দিনটির অপু তাহা জানিত না।

নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মসজিদ প্রাঙ্গণে সম্রাট-দুহিতা জাহানারার তৃণাবৃত পবিত্র কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মসজিদ দ্বারে ক্রীত দু-চার পয়সার গোলাপফুল ছড়াইতে ছড়াইতে অপুর অশ্রু বাধা মানিল না। ঐশ্বর্যের-মধ্যে, ক্ষমতার দম্ভের মধ্যে লালিত হইয়াও পুণ্যবতী শাহাজাদীর এ দীনতা, ভাবুকতা, তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ রাখিয়াছে চিরদিন। এখনও যেন বিশ্বাস হয় না যে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেটা সত্যই জাহানারার কবর-ভূমি। পরে সে মসজিদ হইতে একজন প্রৌঢ় মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া কবরের শিরোদেশের মার্বেল ফলকের সেই বিখ্যাত ফার্সী কবিতাটি দেখাইয়া বলিল, মেহেরবানি করঁকে পড়িয়ে, হাম লিখ লেঙ্গে।

প্রৌঢ়টি কিঞ্চিৎ বকশিশের লোভে খামখেয়ালী বাঙালীবাবুটিকে খুশী করার জন্য জোরে জোরে পড়িল—

বিজুস গ্যাহ্, কসে ন-পোশদ্ মজার-ইমা-রা।
কি কবরপোষ্-ই-গরীবান্ হামিন্ মীগাহ্, বস অস্ত্।

পরে সে কবি আমীর খসরুর কবরের উপরও ফুল ছড়াইল।

পরদিন বৈকালে শাহ্জাহানের লালপাথরের কেল্লা দেখিতে গিয়া অপরাহ্নের ধূসর ছায়ায় দেওয়ান-ই খাসের পাশের খোলা ছাদে একখানা পাথরের বেঞ্চিতে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। মনে মনে এসব স্থানের জীবন-ধারার কাহিনী কেহ লিখিতে পারে নাই। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায় যাহা পড়িয়াছে, সে সবটাই কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে জেব্উন্নিসা, সে উদিপুরী বেগম, সে মমতাজমহল, সে জাহানারা—আবাল্য যাহাদের সঙ্গে পরিচয়, সবগুলিই কল্পনা-সৃষ্ট প্রাণী, বাস্তবজগতের মমতাজ বেগম, উদিপুরী জেব্উন্নিসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কে জানে এখানকার সে সব রহস্যভরা ইতিহাস? মূক যমুনা তাহার সাক্ষী আছে, গৃহভিত্তির প্রতি পাষাণ খণ্ড তার সাক্ষী আছে, কিন্তু তাহারা তো কথা বলিতে পারে না!

তিনদিন পর সে বৈকালের দিকে কাট্নীর লাইনের একটা ছোট্ট স্টেশনে নিজের বিছানা ও সুটকেশটা লইয়া নামিয়া পড়িল। হাতে বেশী পয়সা ছিল না বলিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এলাহাবাদ আসিতে বাধ্য হয়—তাই এত দেরি। কয়দিন স্নান নাই, চুল রুক্ষ উস্ক-খুস্ক—জোর পশ্চিমা বাতাসে ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে।

ট্রেন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র স্টেশনে সম্মুখে একটা ছোট পাহাড়। দোকান-বাজারও চোখে পড়িল না।

স্টেশনের বাহিরের বাঁধানো চাতালে একটু নির্জন স্থানে সে বিছানার বাণ্ডিলটা খুলিয়া পাতিল। কিছুই ঠিক নাই, কোথায় যাইবে, কোথায় শুইবে, মনে এক অপূর্ব অজানা আনন্দ।

সতরঞ্চির উপর বসিয়া সে খাতা খুলিয়া খানিকটা লিখিল, পরে একটা সিগারেট খাইয়া সুটকেশটা ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। টোকা মাথায় একজন গোঁড় যুবককে কাঁচা শালপাতার পাইপ খাইতে খাইতে কৌতূহলী চোখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অপু বলিল, উমেরিয়া হিয়াঁসে কেত্তা দূর হোগা?

প্রথমবার লোকটা কথা বুঝিল না। দ্বিতীয়বারে ভাঙা হিন্দীতে বলিল, তিশ মীল্।

ত্রিশ মাইল রাস্তা! এখন সে যায় কিসে? মহামুশকিল! জিজ্ঞাসা করিয়া

জানিল, ত্রিশ মাইল পথের দুধারে শুধু বন আর পাহাড়। কথাটা শুনিয়া অপুর ভারি আনন্দ হইল। বন, কি রকম বন? খুব ঘন? বাঘ পর্য্যন্ত আছে! বাঃ—কিন্তু এখন কি করিয়া যাওয়া যায়?

কথায় কথায় গোঁড় লোকটি বলিল, তিন টাকা পাইলে সে নিজের ঘোড়াটা ভাড়া দিতে রাজী আছে।

অপু রাজী হইয়া ঘোড়া আনিতে বলাতে লোকটা বিস্মিত হইল। আর বেলা কতটুকু আছে, এখন কি জঙ্গলের পথে যাওয়া যায়? অপু নাছোড়বান্দা। সামনের এই সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে জঙ্গলের পথে ঘোড়ায় চাপিয়া যাওয়ার একটা দুর্দমনীয় লোভ তাহাকে পাইয়া বসিল—জীবনে এ সুযোগ কটা আসে, এ কি ছাড়া যায়?

গোঁড় লোকটি জানাইল, আরও এক টাকা খোরাকি পাইলে সে তল্পি বহিতে রাজী আছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল—পিছনে মোট-মাথায় লোকটা।

স্নিগ্ধ রাত্রি—স্টেশন হইতে অল্পদূরে একটা বস্তি, একটি পাহাড়ী নালা, বাঁক ঘুরিয়াই পথটা শাল-বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চারিধারে জোনাকি পোকা জ্বলিতেছে—রাত্রির অপূর্ব নিস্তব্ধতা, ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো শাল-পলাশের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাটির উপর যেন আলো-আঁধারের বুটি-কাটা জাল বুনিয়া দিয়াছে। অপু পাহাড়ী লোকটার নিকট হইতে একটা শালপাতার পাইপ ও সে-দেশী তামাক চাহিয়া লইয়া ধরাইল বটে, কিন্তু দু'টান দিতেই মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—শালপাতার পাইপটা ফেলিয়া দিল।

বন সত্যই ঘন—পথ আঁকা বাঁকা, ছোট ঝরণা এখানে-ওখানে, উপল বিছানো পাহাডী নদীর তীরে ছোট ফার্ণের ঝোপ, কি ফুলের সুবাস, রাত্রিচর পাখির ডাক। নির্জনতা, গভীর নির্জনতা!

মাঝে-মাঝে সে ঘোড়াকে ছুটাইয়া দেয়, ঘোড়া-চড়া অভ্যাস তাহার অনেকদিন হইতে আছে। বাল্যকালে মাঠের ছুটা ঘোড়া ধরিয়া কত চড়িয়াছে, চাঁপদানীতেও ডাক্তারবাবুটির ঘোড়ায় প্রায় প্রতিদিনই চড়িত।

সারারাত্রি চলিয়া সকাল সাড়ে সাতটায় উমেরিয়া পৌঁছিল। একটা ছোট গ্রাম,—পোস্টাফিস, ছোট বাজার ও কয়েকটা গালার আড়ত। ফরেস্ট রেঞ্জার ভদ্রলোকটিব নাম অবনীমোহন বসু। তিনি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, আসুন, আসুন, আপনি পত্র দিলেন না, কিছু না, ভাবলুম বোধ হয় এখনও আসবার দেরি আছে—এতটা পথ এলেন রাতারাতি? ভয়ানক লোক তো আপনি।

পথেই একটা ছোট নদীর জলে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সে ফিট্‌ফাট হইয়া আসিয়াছে। তখনই চা খাবারের বন্দোবস্ত হইল। অপু লোকটিকে নিজের মনিব্যাগ শূন্য করিয়া চার টাকা দিয়া বিদায় দিল।

ছুপুরের আহারের সময় অবনীবাবুর স্ত্রী তুজনকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। অপু হাসিমুখে বলিল, এখন আপনাদের জ্বালাতন করতে এলুম বৌঠাকরুণ!

অবনীবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, না এলে দুঃখিত হতাম—আমরা কিন্তু জানি আপনি আসবেন। কাল ওঁকে বলেছিলাম আপনার আসবার কথা, এমন কি আপনার থাকবার জন্যে সাহেবের বাংলোটা ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে রাখার কথাও হ'ল—ওটা এখন খালি পড়ে আছে কিনা।

—এখানে আর কোন বাঙালী কি অন্য কোন দেশের শিক্ষিত লোক নিকটে নেই?

অবনীবাবু বললেন, আমার এক বন্ধু খুরিয়ার পাহাড়ে তামার খনির জন্যে প্রসপেক্টিং করছেন—মিঃ রায়চৌধুরী, জিওলজিস্ট, বিলেতে ছিলেন অনেক-দিন—তিনি ঐখানে তাঁবুতে আছেন—মাঝে মাঝে তিনি আসেন।

অল্প দিনেই ইহাদের সঙ্গে কেমন একটা সহজ মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল—যাহা কেবল এই সব স্থানে, এই সব অবস্থাতেই সম্ভব, কৃত্রিম সামাজিকতার হুমকি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক বন্ধুত্বের দাবিকে ঘাড় গুঁজিয়া থাকিতে বাধ্য করে না বলিয়াই। একদিন বসিয়া বসিয়া সে খেয়ালের বসে কাগজে একটা কথকতার পালা লিখিয়া ফেলিল। সেদিন সকালে চা খাইবার সময় বলিল, দিদি, আজ ও-বেলা আপনাদের একটা নতুন জিনিস শোনাব।

অবনীবাবুর স্ত্রীকে সে দিদি বলিতে শুরু করিয়াছে। তিনি সাগ্রহে বলিলেন, কি, কি বলুন না? আপনি গান জানেন—না? আমি অনেকদিন ওঁকে বলেছি আপনি গান জানেন।

—গানও গাইব, কিন্তু একটা কথকতার পালা শোনাব, আমার বাবার মুখে শোনা জড়ভরতের উপাখ্যান।

দিদির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া স্বামীকে কহিলেন, দেখ্‌লে গো—দ্যাখ! বলি নি আমি, গলার স্বর অমন, নিশ্চয় গান জানেন—খাট্‌ল না কথা?

তুপুরবেলা দিদি তাহাকে তাস খেলার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করিলেন।

—লেখা এখন থাক্। তাস জোড়াটা না খেলে খেলে পোকায় কেটে দিলে—এখানে খেলার লোক মেলে না—যখন ওঁর বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসেন তখন

মাঝে মাঝে খেলা—আসুন আপনি। উনি, আর আপনি—

—আর একজন?

—আর কোথায়? আমি আর আপনি বসব—উনি একা দু'হাত নিয়ে খেলবেন।

জ্যোৎস্না রাত্রে বাংলোর বারান্দাতে সে কথকতা আরম্ভ করিল। জড়-ভরতের বাল্যজীবনের করুণ কাহিনী নিজেরই শৈশব-স্মৃতির ছায়াপাতে, সত্য ও পূত হইয়া উঠে, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে বাবার গলার স্বর কেমন করিয়া অলক্ষিতে তাহার গলায় আসে—শালবনের পত্র-মর্মরে, নৈশ পাখির গানের মধ্যে রাজর্ষি ভরতের সরল বৈরাগ্য ও নিস্পৃহ আনন্দ যেন প্রতি সুরমূর্ছনাকে একটি অতি পবিত্র মহিমময় রূপ দিয়া দিল। কথকতা থামিলে সকলেই চুপ করিয়া রহিল। অপু খানিকটা পর হাসিয়া বলিল—কেমন লাগল?

অবনীবাবু একটু ধর্মপ্রাণ লোক, তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল—কথকতা দু-একবার শুনিয়াছেন বটে, কিন্তু এ কি জিনিস! ইহার কাছে সে সব লাগে না।

কিন্তু সকলের চেয়ে মুগ্ধ হইলেন অবনীবাবুর স্ত্রী। জ্যোৎস্নার আলোতে তাঁহার চোখ ও কপোলে অশ্রু চিক্-চিক্ করিতেছিল। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলিলেন না। স্বদেশ হইতে দূরে এই নিঃসন্তান দম্পতির জীবনযাত্রা এখানে একেবারে বৈচিত্র্যহীন, বহুদিন এমন আনন্দ তাঁহাদের কেহ দেয় নাই।

দিন দুই পরে অবনীবাবুর বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসিলেন, ভারী মনখোলা ও অমায়িক ধরণের লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কানের পাশে চুলে পাক ধরিয়াছে, বলিষ্ঠ গঠন ও সুপুরুষ। একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খান। জব্বলপুর হইতে হুইস্কি আনাইয়াছেন কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, খানিকক্ষণ তাহার বর্ণনা করিলেন। অবনীবাবুও যে মদ খান অপু তাহা ইতিপূর্বে জানিত না। মিঃ রায়চৌধুরী অপুকে বলিলেন, আপনার গুণের কথা সব শুনলাম, অপূর্ববাবু। সে আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। আপনার চোখ দেখলে যে-কোন লোক আপনাকে ভাবুক বলবে। তবে কি জানেন, আমরা হয়ে পড়েছি ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট। আজ আপনাকে আর একবার কথকতা করতে হবে, ছাড়চি নে আজ!

কথাবার্তায়, গানে হাসিখুশিতে সেদিন প্রায় সারারাত কাটিল। মিঃ রায়চৌধুরী চলিয়া যাইবার দিন তিনেক পরে একজন চাপরাসী তাঁহার নিকট হইতে অপুর নামে একখানা চিঠি আনিল। তাঁহার ওখানে একটা ড্রিলিং তাঁবুর তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লোক দরকার। অপূর্ববাবু কি আসিতে রাজী

আছেন? আপাততঃ মাসে পঞ্চাশ টাকা ও বাসস্থান। অপুর নিকট ইহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। ভাবিয়া দেখিল, হাতে আনা দশেক পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে, উহারা অবশ্য যতই আত্মীয়তা দেখান, গান ও কথকতা করিয়া চিরদিন তো এখানে কাটানো চলিবে না? আশ্চর্যের বিষয়, এতদিন কথাটা আদৌ তাহার মনে উদয় হয় নাই যে কেন!

মিঃ রায়চৌধুরীর বাংলো প্রায় মাইল কুড়ি দূর। তিনদিন পরে ঘোড়া ও লোক আসিল। অবনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। পথ অতি দুর্গম, উমেরিয়া হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিম-দিকে গেলেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। দুই-তিনটি ছোট ছোট পাহাড়ী নদী, আবার ছোট ছোট ফার্ন ঝোপ, ঝরণা—একটার জলে অপু মুখ ধুইয়া দেখিল জলে গন্ধকের গন্ধ। পাহাড়িয়া করবী ফুটিয়া আছে, বাতাস নবীন মাদকতায় ভরা, খুব স্নিগ্ধ, এমন কি যেন একটু গা শির্‌-শির্‌ করে—এই চৈত্র মাসেও।

সন্ধ্যার পূর্বে সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া গেল। খনির কার্যকারিতা ও লাভালাভের বিষয় এখনও পরীক্ষাধীন, মাত্র খান চার-পাঁচ চওড়া খড়ের ঘর। দুইটা বড় বড় তাঁবু, কুলিদের থাকিবার ঘর, একটা অফিস ঘর! সর্বসুদ্ধ আটদশ বিঘা জমির উপর সব। চারিধার ঘেরিয়া ঘন, দুর্গম অরণ্য, পিছনে পাহাড় আবার পাহাড়।

মিঃ রায়চৌধুরী বলিলেন—খুব সাহস আছে আপনার তা আমি বুঝেছি, যখন শুনলাম আপনি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে উমেরিয়া এসেছিলেন। ও পথে রাত্রে এদেশের লোকও যেতে সাহস পায় না।

অপরাজিত — অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপুর এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু হইল এ দিনটি হইতে। এমন এক জীবন, যাহা সে চিরকাল ভালবাসিয়াছে, যাহার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনদিন যে হাতের মুঠায় নাগাল পাওয়া যাইবে তাহা ভাবে নাই।

তাহাকে যে ড্রিল তাঁবুর তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে, তাহা এখান হইতে আরও সতেরো-আঠারো মাইল দূরে। মিঃ রায়চৌধুরী নিজের একটা ঘোড়া দিয়া তাহাকে পরদিনই কর্মস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নতুন স্থানে আসিয়া

অপু অবাক হইয়া গেল। বন ভালবাসিলে কি হইবে, এ ধরণের বন কখনও দেখে নাই। নিবিড় বনানীর প্রান্তে উচ্চ তৃণভূমি, তারই মধ্যে খড়ের বাংলো-ঘর, একটা পাতকূয়া, কুলীদের বাসের খুপ্‌ড়ি, পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, সেদিকের ঘন বন কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহা চোখে দেখিয়া আন্দাজ করা যায় না—ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া পাহাড়, একটার পিছনে আর একটা, আর গভীর জনমানবহীন অরণ্য, সীমা নাই, কূল-কিনারা নাই। চারিদিকের দৃশ্য অতি গভীর। তাঁবুর ঠিক পিছনেই পাহাড় শ্রেণীর একটা স্থান আবার অনাবৃত, বেজায় খাড়া ও উঁচু—বিরাটকায় নগ্ন গ্রানাইট্ চূড়াটা বৈকালের শেষ রোদে কখনও দেখায় রাঙা, কখনও ধূসর, কখনও ঈষৎ তাম্রাভ কালো রংয়ের—এরূপ গম্ভীর-দৃশ্য অরণ্যভূমির কল্পনাও জীবনে সে করে নাই কখনও!

অপুর সারাদিনের কাজও খুব পরিশ্রমের, সকালে স্নানের পর কিছু খাইয়াই ঘোড়ায় উঠিতে হয়, মাইল চারেক দূরের একটা জায়গায় কাজ তদারক করিবার পর প্রায়ই মিঃ রায়চৌধুরীর ষোলো মাইল দূরবর্তী তাঁবুতে গিয়া রিপোর্ট করিতে হয়—তবে সেটা রোজ নয়, দু'দিন অন্তর অন্তর। ফিরিতে কোন দিন হয় সন্ধ্যা, কোন দিন বা রাত্রি একপ্রহর দেড়প্রহর। সবটা মিলিয়া কুড়ি-পঁচিশ মাইলের চক্র, পথ কোথাও সমতল, কোথাও ঢালু, কোথাও দুর্গম। ঢালটাতে জঙ্গল আছে তবে তার তলা অনেকটা পরিষ্কার, ইংরাজীতে যাকে বলে open forest—কিন্তু পোয়াটাক পথ যাইতে না যাইতে সে মানুষের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘন অরণ্যের নির্জনতার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায়—সেখানে জন নাই, মানুষ নাই, চারিপাশে বড় বড় গাছ, ডালে পাতায় নিবিড় জড়াজড়ি, পথ নাই বলিলেও হয়, কখনও ঘোড়া চালাইতে হয় পাহাড়ী নদীর শুষ্ক খাত বাহিয়া, কখনও গভীর জঙ্গলের দুর্ভেদ্য বেত-বন ঠেলিয়া—যেখানে বন্যশূকর বা শম্বর হরিণের দল যাতায়াতের সুঁড়ি পথ তৈরি করিয়াছে—সে পথে। কত ধরণের গাছ, লতা, গাছের ডালে এখানে-ওখানে বিচিত্র রঙের অর্কিড, নিচে ম্যাজোলিয়ার হলুদ ফুল ফুটিয়া প্রভাতের বাতাসকে গন্ধ-ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। ঘোড়া চালাইতে চালাইতে অপুর মনে হয় সে যেন জগতে সম্পূর্ণ একা, সারা দুনিয়ার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই—শুধু আছে সে, আর আছে তাহার ঘোড়াটি ও চারিপাশের এই অপূর্বদৃষ্ট বিজন বন! আর কি সে নির্জনতা! কলিকাতার বাসায় নিজের বন্ধ-দুয়ার ঘরটার কৃত্রিম নির্জনতা নয়, এ ধরণের নির্জনতার সঙ্গে তাহার কখনও পরিচয় ছিল না। এ নির্জনতা বিরাট, অদ্ভুত, এমন কিছু, যাহা পূর্ব হইতে ভাবিয়া অনুমান করা যায় না, অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে।

ভারী পছন্দ হয় এ জীবন, গল্পের বইয়ে-টইয়ে যে রকম পড়িত, এ যে ঠিক তাহাই। খোলা জায়গা পাইলেই ঘোড়া ছাড়িয়া দেয়, গতির আনন্দে সারা দেহে একটা উত্তেজনা আসে; খানাখন্দ, শিলা পাইওরাইটের স্তূপ কে মানে? নত শাল-শাখা এড়াইয়া দোদুল্যমান অজানা লতার পাশ কাটাইয়া পৌরুষ-ভরা উদ্দামতার আনন্দে তীরবেগে ঘোড়া উড়াইয়া চলে।

ঠিক এই সব সময়েই তাহার মনে পড়ে—প্রায়ই মনে পড়ে—শীলেদের অফিসের সেই তিনবৎসর-ব্যাপী বদ্ধ, সঙ্কীর্ণ, অন্ধকার কেরানী-জীবনের কথা। এখনও চোখ বুজিলে অফিসটা সে দেখিতে পায়, বাঁয়ে নৃপেন টাইপিস্ট বসিয়া খট-খট করিতেছে, রামধন নিকাশনবিশ বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে, সেই বাঁধানো মোটা ফাইলের দপ্তরটা—নিকাশনবিসের পেছনের দেওয়াল চুণ-বালি খসিয়া দেখিতে হইয়াছে যেন একটি পূজা-নিরত পুরুতঠাকুর। রোজ সে ঠাট্টা করিয়া বলিত, 'ও রামধনবাবু, আপনার পুরুতঠাকুর আজ ফুল ফেললেন না? উঃ সে কি বদ্ধতা—এখন যেন সে-সব একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে বাংলোয় ফিরিয়া পাতকূয়ার ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া এক প্রকার বন্য লেবুর রস মিশানো চিনির শরবত খায়— গরমের দিনে শরীর যেন জুড়াইয়া যায়—তার পরই রামচরিত মিশ্র আসিয়া রাত্রের খাবার দিয়া যায়—আটার রুটি, কুমড়া বা ঢ্যাঁড়সের তরকারী ও অড়হরের ডাল। বারো-তেরো মাইল দূরের এক বস্তি হইতে জিনিস পত্র সপ্তাহ অন্তর কুলীরা লইয়া আসে—মাছ একেবারেই মেলে না, মাঝে-মাঝে অপু পাখি শিকার করিয়া আনে। একদিন সে বনের মধ্যে এক হরিণকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাইয়া অবাক হইয়া গেল—বড়শিঙ্গা কিংবা শম্বর হরিণ ভারী সতর্ক, মানুষের গন্ধ পাইলে তার ত্রিসীমানায় থাকে না—কিন্তু তাহার ঘোড়ার বারোগজের মধ্যে এ হরিণটা আসিল কিরূপে? খুশী ও আগ্রহের সহিত বন্দুক উঠাইয়া লক্ষ্য করিতে গিয়া সে দেখিল লতাপাতার আড়াল হইতে শুধু মুখটি বাহির করিয়া হরিণটিও অবাক চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ঘোড়ায় চড়া মানুষ দেখিয়া ভাবিতেছে হয়ত, এ আবার কোন জীব!...হঠাৎ অপুর বুকের মধ্যটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—হরিণের চোখ দুটি যেন তাহার খোকার চোখের মত! অমনি ডাগর ডাগর, অমনি অবোধ, নিষ্পাপ; সে উদ্যত বন্দুক নামাইয়া তখনি টোটাগুলি খুলিয়া লইল। এখানে যতদিন ছিল আর কখনও শিকারের চেষ্টা করে নাই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় সন্ধ্যার পরেই, তার পরে সে নিজের খড়ের বাংলোর কম্পাউণ্ডে চেয়ার পাতিয়া বসে।—অপূর্ব নিস্তব্ধতা। অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ও

আঁধারের পিছনকার পাহাড়ের গম্ভীরদর্শন অনাবৃত গ্রানাইট প্রাচীরটা কি অদ্ভুত দেখায়। শালকুসুমের সুভাসভরা অন্ধকার, মাথার উপরকার আকাশে অগণিত নৈশ নক্ষত্র। এখানে অন্য কোন সাথী নাই, তাহার মন ও চিন্তার উপর অন্য কাহারও দাবী-দাওয়া নাই উত্তেজনা নাই, উৎকণ্ঠা নাই—আছে শুধু সে, আর এই বিশাল অরণ্য প্রকৃতির কর্কশ; বিরাট সৌন্দর্য—আর আছে এই নক্ষত্রভরা নৈশ আকাশটা।

বাল্যকাল হইতেই সে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু এখানে তাদের এ কি রূপ! কুলীরা সকাল সকাল খাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়ে—রামচরিত মিশ্র মাঝে মাঝে অপুকে সাবধান করিয়া দেয়, তাম্বুকা বাহার মাৎ বৈঠিয়ে বাবুজী—শেরকা বড়া ডর হ্যায়—পরে সে কাঠকুঠা জ্বালিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া গ্রীষ্মের রাত্রেও বসিয়া আগুন পোহায়—অবশেষে সেও যাইয়া শুইয়া পড়ে, তাহার অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায়—স্তব্ধ রাত্রি, আকাশ অন্ধকার···পৃথিবী অন্ধকার···আকাশে বাতাসে অদ্ভুত নীরবতা, আবলুসের তালপাতার ফাঁকে দু-একটা তারা যেন অসীম রহস্যভরা মহাব্যোমের বুকের স্পন্দনের মত দিপ্ দিপ্ করে বৃহস্পতি স্পষ্টতর হয়, উত্তর-পূর্ব কোণের পর্বতসানুর বনের উপরে কালপুরুষ উঠে, এখানে-ওখানে অন্ধকারের বুকে আগুনের আঁচড় কাটিয়া উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলা কি অদ্ভুতভাবে স্থান পরিবর্তন করে! আবলুস ডালের ফাঁকের তারাগুলা ক্রমশঃ নিচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পর্বতসানুর দিক হইতে মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশালাকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়, বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে। রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল—অদ্ভুতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল!—জীবনে কখনও তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই বিশাল নক্ষত্র-জগৎটার সঙ্গে, এ-ভাবে হইবার আশাও কখনও কি ছিল?

অপুর বাংলো-ঘরের পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, পিছনকার পাহাড়তলী আধমাইলের কম, দক্ষিণের পাহাড় মাইল দুই দূরে। সামনে বহুদূর বিস্তৃত উঁচুনীচু জমিটা পাল ও পপরেল চারা ও একপ্রকার অর্ধশুষ্ক তৃণে ভরা—অনেক দূর পর্যন্ত খোলা। সারা পশ্চিম দিকচক্রবাল জুড়িয়া বহুদূরে, বিন্ধ্য পর্বতের নীল অস্পষ্ট সীমারেখা, ছিন্দওয়ারা ও মহাদেও শৈলশ্রেণী—পশ্চিমা বাতাসের ধূলা-বালি যেদিন আকাশকে আবৃত না করে সেদিন বড় সুন্দর দেখায়। মাইল

এগারো দূরে নর্মদা বিজন বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, খুব সকালে ঘোড়ায় উঠিয়া স্নান করিতে গেলে বেলা নটার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায়।

দক্ষিণে পর্বতসানুর ঘন বন নিবিড়, জনমানবহীন, রুক্ষ ও গম্ভীর। দিনের শেষে পশ্চিম গগন হইতে অস্ত-সূর্যের আলো পুড়িয়া পিছনের পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া ও অনাবৃত, তাহার গ্রানাইট্ দেওয়ালটা প্রথমে হয় হলদে, পরে হয় মেটে সিঁদুরের রং, পরে জরদা রঙের হইতে হইতে হঠাৎ ধূসর ও তারপরেই কালো হইয়া যায়। ওদিকে দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটে আলোর টিপের মত সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠে, অরণ্যানী ঘন অন্ধকারে ভরিয়া যায়, শাল ও পাহাড়ী বাঁশের ডালপালায় বাতাস লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হয়—রামচরিত ও জহুরী সিং বাঘের ভয়ে আগুন জ্বালে, চারিধারে শিয়াল ডাকিতে শুরু করে, বন মোরগ ডাকে, অন্ধকার আকাশ দেখিতে দেখিতে গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক, ছায়াপথ একে একে দেখা দেয়। পৃথিবী, আকাশ-বাতাস অপূর্ব রহস্যভরা নিস্তব্ধতায় ভরিয়া আসে, তাঁবুর পাশের দীর্ঘ ঘাসের বন দুলাইয়া এক একদিন বন্যবরাহ পলাইয়া যায়, দূরে কোথায় হায়েনা উন্মাদের মত হাসিয়া উঠে, গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ পাহাড়ের পিছন হইতে ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, এ যেন সত্যই গল্পের বইয়ে-পড়া জীবন।

এক এক দিন বৈকালে সে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যায়। শুধুই উঁচু-নীচু অর্ধশুষ্ক তৃণভূমি ; ছোটবড় শিলাখণ্ড ছড়ানো, মাঝে-মাঝে শাল ও বাদাম গাছ। আর এক জাতীয় বড় বন্য গাছের কি অপূর্ব আকাবাঁকা ডালপালা, চৈত্রের রৌদ্রে পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, নীল আকাশের পটভূমিতে পত্রশূন্য ডালপালা যেন ছবির মত দেখা যায়। অপুর তাঁবু হইতে মাইল-তিনেক দূরে একটা ছোট পাহাড়ী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অপু তাহার নাম রাখিয়াছে বক্রতোয়া। গ্রীষ্মকালে জল আদৌ থাকে না, তাহারই ধারে একটা শাল-ঝাড়ের নিচের একখানা পাথরের উপর সে একদিন গিয়া বসে, ঘোড়াটা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখে—স্থানটা ঠিক ছবির মত।

স্বর্ণাভ বালুর উপর অন্তর্হিত বন্যনদীর উপল-ঢাকা চরণ-চিহ্ন—হাত কয়েক মাত্র প্রশস্ত নদীখাত, উভয় তীরই পাষাণময়, ওপারে কঠিন ও দানাদার কোয়ার্ট জাইট ও ফিকে হল্‌দে রঙের বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে ভরা, অতীত কোন্ হিমু-যুগের তুষার নদীর শেষ প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া এখানে হয়ত আটকাইয়া গিয়াছে, সোনালী রংয়ের নদী-বালু হয়ত স্বর্ণরেণু মিশানো, অস্ত-সূর্যের রাঙা আলোয় অত চক্-চক্ করে কেন নতুবা ? নিকটে সুগন্ধ লতাকস্তুরীর জঙ্গল, খর বৈশাখী রৌদ্রে শুষ্ক শুঁটিগুলি ফাটিয়া মৃগনাভির গন্ধে অপরাহ্নের

বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। বক্রতোয়া হইতে খানিকটা দূরে ঘন বনের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট ঝরণা, যেন উঁচু চৌবাচ্চা ছাপাইয়া জল পড়িতেছে এমন মনে হয়। নীচের একটা খাতে গ্রীষ্মদিনেও জল থাকে। রাত্রে ওখানে হরিণদের দল জল খাইতে আসে শুনিয়া অপু কতবার দেড় প্রহর রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে গিয়াছে, কখনও দেখে নাই। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষাও কাটিল, শরৎকালে বন্য শেফালীবনে অজস্র ফুল ফুটিল, বক্রতোয়ার শাল-ঝাড়টার কাছে বসিলে তখনও ঝরণার শব্দ পাওয়া যায়—এমন সময়ের এক জ্যোৎস্নারাত্রে সে জহুরী সিংকে সঙ্গে লইয়া জায়গাটাতে গেল। দশমীর জ্যোৎস্না ডালে-পাতায়, পাহাড়ী বাদাম বনের মাথায়—স্নিগ্ধ বাতাসে শেফালীর ঘন মিষ্টি গন্ধ। এই জ্যোৎস্না-মাখা বনভূমি, এই রাত্রির স্তব্ধতা, এই শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু, এরা যেন কতকালের কথা মনে করাইয়া দেয়, যেন দূর-কোনও জন্মান্তরের কথা।

হরিণের দল কিন্তু দেখা গেল না।

এই সব নির্জন স্থানে অপু দেখিল মনের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়। শহরে লোকালয়ে যে-মন আত্মসমস্যা লইয়া ব্যাহত থাকে, ambition লইয়া ব্যস্ত থাকে, এখানকার উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় সে-সব আশা, আকাঙ্ক্ষা সমস্যা অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। আরও ব্যাপক হয়, উদার হয়। স্রষ্টা হয়, angle of vision একদম বদলাইয়া যায়। এইজন্য অনেক অনেক বই-ই—গার্হস্থ্য সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্যামূলক ও প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় —এখানকার নিঃসঙ্গ ও বিশ্বতোমুখী জীবনে তা অতি খেলো, রসহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এখানে ভাল লাগে সেই সব, যাহা শাশ্বত কালের। এই অনন্তের সঙ্গে যাহার যোগ আছে। অপুর সেই গ্রহবিজ্ঞানের বইখানা যেমন—এখন যেন তাদের নতুন অর্থ হয়। এত ভাবিতে শেখায়! চৈতন্যের কোন নতুন দ্বার যেন খুলিয়া যায়।

ফাল্গুনমাসে একজন ফরেষ্ট সার্ভেয়ার আসিয়া মাইল দশেক দূরে বনের মধ্যে তাঁবু ফেলিলেন। অপু তাহার সহিত ভাব করিয়া ফেলিল। মাদ্রাজী ভদ্রলোক, বেশ লেখাপড়া-জানা। অপু প্রায়ই সন্ধ্যাটা সেখানে কাটাইত, চা খাইত, গল্পগুজব করিত, ভদ্রলোক থিওডোলাইট পাতিয়া এ-নক্ষত্র ও-নক্ষত্র চিনাইয়া দিতেন, এক-একদিন আবার দুপুরে নিমন্ত্রণ করিয়া একরকম ভাতের পিঠা খাওয়াইতেন, অপু সকালে উঠিয়া যাইত, দুপুরের পর খাওয়া সারিয়া ঘোড়ায় নিজের তাঁবুতে ফিরিত।

ফিরিবার পথে ডানদিকের পাহাড়ী ঢালুতে বহুদূর ব্যাপিয়া শীতের শেষে

লোহিয়া ও বিজনীর ফুলের বন। ঘোড়া থামাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিত, তাঁবুতে ফিরিবার কথা ভুলিয়া যাইত। যে কখনও এমন নির্জন অরণ্যভূমিতে—যেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ যাও লোক নাই, জন নাই, গ্রাম নাই, বস্তি নাই—সে-সব স্থানের মুক্ত আকাশের তলে কঠিন ব্যাসাল্ট্ কি গ্রানাইটের রুক্ষ পর্বত-প্রাচীরের ছায়ায়, নিম্নভূমিতে, ঢালুতে, ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরেব বাশি-রাশি অগণিত বেগুনি, জরদা ও শ্বেতাভ হলুদ বঙেব বন্য লোহিয়া ও বিজনিব ফুলেব বন না দেখিয়াছে—তাহাকে এ দৃশ্যের ধারণা করানো অসম্ভব হইবে। এমন কত শত বৎসব ধবিয়া প্রতি বসন্তে রাশি-রাশি ফুল ফুটিয়া ঝবিতেছে, কেহ দেখিবাব নাই, শুধু ভোম্‌রা ও মৌমাছিদের মহোৎসব।

একদিন অমবকণ্টক দেখিতে যাইবার জন্য অপু মিঃ বায়চৌধুবীব নিকট ছুটি চাহিল।

মনটা ইহাব আগে অত্যন্ত উতলা হইয়াছিল, কেন যে উতলা হইল, কাবণটা কিছুতেই ভাল ধবিতে পারিল না। ভাবিল এই সময় একবাব ঘুবিয়া আসিবে।

মিঃ বায়চৌধুবী শুনিয়া বলিলেন—যাবেন কিসে? পথ কিন্তু অত্যন্ত খাবাপ, এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূব হবে, এর মধ্যে যাট মাইল ডেন্‌স ভার্জিন ফরেষ্ট—বাঘ, ভাল্লুক, নেকডেব দল সব আছে। বিনা বন্দুকে যাবেন না, ঘোডা সহিস নিয়ে যান—রাত হবার আগে আশ্রয় নেবেন কোথাও—সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ার বাঘ, বসগোল্লাটির মত লুফে নেবে নইলে। ঐ জন্যে কত দিন আপনাকে বাবণ কবেছি এখানেও সন্ধ্যার পর তাঁবুর বাইরে বসবেন না—বা অন্ধকাবে বনের পথে একা ঘোডা চালাবেন না—তা আপনি বড্ড রেক্‌লেস।

তখন সে উৎসাহে পডিয়া বিনা ঘোডাতেই বাহিব হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—ধারাল পাথরের নুডিতে জুতার তলা কাটিয়া চিরিয়া গেল, অতদূর পথ হাঁটিবার অভ্যাস নাই, পায়ে এক বিরাট ফোস্কা উঠিয়াছে। পিছনে রামচরিত বোঁচকা লইয়া আসিতেছিল, সে সমানে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে, মুখে কথাটি নাই। বহু দূরের একটা পাহাড দেখাইয়া বলিল, ওর পাশ দিয়া পথ। পাহাডটা ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যায়, বোঝা যায় না, মেঘ না পাহাড—এত দূরে। অপু ভাবিল পায়ে হাঁটিয়া অতদূরে সে যাইবে ক'দিনে?

এ ধরণের ভীষণ অরণ্যভূমি, অপুর মনে হইল এ অঞ্চলে এতদিন আসিয়াও

সে দেখে নাই। সে যেখানে থাকে, সেখানকার বন ইহার তুলনায় শিশু, নিতান্ত অবোধ শিশু। দুপুরের পর যে বন শুরু হইয়াছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

অন্ধকার নামিবার আগে একটা উঁচু পাহাড়ের উপরকার চড়াই পথে উঠিতে হইল—উঠিয়াই দেখা গেল—সর্বনাশ, সামনে আবার ঠিক এমনি আর একটা পাহাড়। অপুর পায়ের ব্যাথাটা খুব বাড়িয়াছিল, তৃষ্ণাও পাইয়াছিল বেজায়—অনেকক্ষণ হইতে জলের সন্ধান মেলে নাই, আবলুস গাছের তলা বিছাইয়া অম্লমধুর কেঁদফল পড়িয়াছিল—সারা দুপুর তাহাই চুষিতে চুষিতে কাটিয়াছে—কিন্তু জল অভাবে আর চলে না।

দূরে দূরে, উত্তরে পশ্চিমে নীল পর্বতমালা। নিম্নে উপত্যকার ঘন বনানী সন্ধ্যার ছায়ায় ধূসর হইয়া আসিতেছে, সরু পথটা বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া নামিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্মুখে পাহাড়টার ওপারে এক মাইলের মধ্যে বন-বিভাগের একটা ডাকবাংলো পাওয়া গেল। চারিধারে নিবিড় শাল বন, মধ্যে ছোট্ট খড়ের ঘর। খনি ও বনবিভাগের লোকেরা মাঝে মাঝে রাত্রি কাটায়।

এ রাত্রির অভিজ্ঞতা ভারি অদ্ভুত ও বিচিত্র। বাংলোতে অপুরা একটি প্রৌঢ় লোককে পাইল, সে ইহারই মধ্যে খিল দিয়া বসিয়া কি পড়িতেছিল, ডাকাডাকিতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, লোকটা মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নাম আজবলাল ঝা। বয়স ষাট বা সত্তর হইবে। সে সেই রাত্রে নিজের ভাণ্ডার হইতে আটা ও ঘৃত বাহির করিয়া আনিয়া অপুর নিষেধ সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট পুরি ভাজিয়া আনিল—পরে অতিথি-সৎকার সারিয়া সে ঘরের মধ্যে বসিয়া সু-স্বরে সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছু পরেই অপু বুঝিল লোকটা সংস্কৃত ভাল জানে—নানা কাব্য উত্তমরূপে পড়িয়াছে। নানাস্থান হইতে শ্লোক মুখস্থ বলিতে লাগিল—কাব্যচর্চায় অসাধারণ উৎসাহ, তুলসীদাসী রামায়ণ হইতেই অনর্গল দোঁহা আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে ওঝাজী নিজের কাহিনী বলিল। দেশ ছিল দ্বারভাঙ্গা জেলায়। সেখানেই শৈশব কাটে, তের বৎসর বয়সে উপনয়নের পর এক বেনিয়ার কাছে চাকরী লইয়া কাশী আসে। পড়াশুনা সেইখানেই—তারপরে কয়েক জায়গায় টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কোথাও সুবিধা হয় নাই। পেটের ভাত জুটে না, নানা স্থানে ঘুরিবার পর এই ডাকবাংলোয় আজ সাত-আট বছর বসবাস করিতেছে। লোকজন বড় এখানে কেহ আসে না,

কালেভদ্রে এক-আধ-জন, সে-ই একা থাকে, মাঝে মাঝে তের মাইল দূরের বস্তি হইতে খাবার জিনিস ভিক্ষা করিয়া আনে, বেশ চলিয়া যায়। সে আছে আর আছে তাহার কাব্যগ্রন্থগুলি—তাহার মধ্যে দুখানা হাতে লেখা পুঁথি মেঘদূত ও কয়েক সর্গ ভট্টি।

অপুর অত সুন্দর লাগিল এই নিরীহ, অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্তা ও তাহার আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি—এই নির্জন বনবাসের একটা শান্ত সন্তোষ। তবে লোকটি যেন একটু বেশী বকে, বিদ্যাটা যেন বেশী জাহির করিতে চায় —কিন্তু এত সরলভাবে করে যে, দোষ ধরাও যায় না। অপু বলিল—পণ্ডিতজী, আপনাকে থাকতে দেয়, কেউ কিছু বলে না?

—না বাবুজী, নাগেশ্বরপ্রসাদ বলে একজন ইঞ্জিনীয়ার আছেন, তিনি আমাকে খুব মানেন, সেই জন্যে কেউ কিছু বলে না।

কথায় কথায় সে বলিল—আচ্ছা পণ্ডিতজী, এ বন কি অমরকণ্টক পর্যন্ত এমনি ঘন?

—বাবুজী, এই হচ্ছে সেই প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যারণ্য। অমরকণ্টক ছাড়িয়া বহুদূর পর্যন্ত বন, এমনি ঘন—চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্য এই বনের পশ্চিম দিকে। এর বর্ণনা শুনুন তবে নৈষবচরিতে—দময়ন্তী রাজ্যভ্রষ্ট নলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে এই বনে পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন—ঋক্ষবান্ পর্বতের পাশের পথ দিয়ে তিনি বিদর্ভ দেশে চলে যান। রামায়ণেও এই বর্ণনা শুনবেন অরণ্যকাণ্ডে। শুনুন তবে।

অপু ভাবিল লোকটা বর্তমানের কোন ধার ধারে না, প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে ডুবিয়া আছে—সব কথায় পুরাণের কথা আনিয়া ফেলে। লোকটিকে ভারী অদ্ভুত লাগিতেছিল—সারাজাবন এখানে-ওখানে ঘুরিয়া কিছুই করিতে পারে নাই—এই বনবাসে নিজের প্রিয় পুঁথিগুলা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া চলিয়াছে, কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। ঐ ধরণের লোকের দেখা মেলে না বেশী।

ওঝাজী সুস্বরে রামায়ণের বর্ণনা পড়িতেছিল। কি অদ্ভুতভাবে যে চারিপাশের দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খায়। নির্জন শালবনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, তেন্দু ও চিরঞ্জীগাছের পাতাগুলি এক এক জায়গায় ঘন কালো দেখাইতেছে। বনের মধ্যে শিয়ালের দল ডাকিয়া উঠিয়া প্রহর ঘোষণা করিল।

কোথায় রেল, মোটর, এরোপ্লেন, ট্রেড-ইউনিয়ন? ওঝাজীর মুখে অরণ্য-কাণ্ডের শ্লোক শুনিতে শুনিতে সে যেন অনেক দূরের এক সুপ্রাচীন জাতির অতাত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পড়িল একেবারে। অতীতের গিরিতরঙ্গিণী-

তীরবর্তী তপোবন, হোমধূমপবিত্র গোধূলির আকাশতলে বিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুগভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ, জলকলস, চীর-কৃষ্ণাজিন পরিহিত সজপা মুণিগণের বেদপাঠধ্বনি শান্ত গিরিসানু···বনজ কুসুমের সুগন্ধ···গোদাবরীতটে পুন্নাগ নাগকেশরের বনে পুষ্প-আহরণরতা সুমুখী আশ্রম বালকগণ···কৃশাঙ্গী রাজবধূগণ···ক্ষীণজ্যোৎস্নায় নদীজল আলো হইয়া উঠিয়াছে, তীরে স্থলবেতসের বনে ময়ূর ডাকিতেছে···

সে যেন স্পষ্ট দেখিল, এই নিবিড় অজানা অরণ্যানীর মধ্য নির্ভীক, কবাটকক্ষ, ধনুষ্প্রাণি, প্রাচীন রাজপুত্রগণ সকল বিপদকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। দূরে নীল মেঘের মত পরিদৃশ্যমান ময়ূর নিনাদিত ঘন বন, দুর্গম পথের নানা শ্বাপদ, রাক্ষসে পূর্ণ খন্দ, গুহা, গহ্বর, মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত—অজানা মৃত্যুসঙ্কুল—চারিধারে পর্বতরাজির ধাতুরঞ্জিত শৃঙ্গ-সকল আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কুন্দগুল্ম, সিন্দুবার ; শিরীষ, অর্জুন, শাল, নীপ, বেতস, তিনিশ, ও তমাল তরুতে শ্যামায়মান গিরিসানু · শরদ্বারা বিদ্ধ রুরু ও পৃষত মৃগ আগুনে ঝলসাইয়া খাওয়া, বিশাল ইঙ্গুদী তরুমূলে সতর্ক রাত্রি যাপন···

ওঝাজী উৎসাহ পাইয়া অপুকে একটা পুঁটলি খুলিয়া একরাশ সংস্কৃত কবিতা দেখাইলেন, গর্বের সহিত বলিলেন, বাবুজী, ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত কবিতায় আমার হাত আছে, একবার কাশী-নরেশের সভায় আমার গুরুদেব ঈশ্বরশরণ আমায় নিয়ে যান। একজোড়া দোশালা বিদায় পেয়েছিলাম, এখনও আছে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।—তারপর তিনি অনেকগুলি কবিতা শুনাইলেন, বিভিন্ন ছন্দের সৌন্দর্য ও তাহাতে তাঁহার রচিত শ্লোকের কৃতিত্ব সকল উৎসাহে বর্ণনা করিলেন। এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ওঝাজী বহু কবিতা লিখিয়াছেন, এখনও লেখেন, সবগুলি সযত্ন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও দিয়াছেন, একটিও নষ্ট হইতে দেন নাই, তাহাও জানাইলেন।

একটি অদ্ভুত ধরণের দুঃখ ও বিষাদ অপুর হৃদয় অধিকার করিল। কত কথা মনে আসিল, তাহার বাবা এই রকম গান পাঁচালি লিখিতেন তাহার ছেলেবেলায়। কোথায় গেল সে সব ? যুগ যে বদল হইয়া যাইতেছে ইহারা তাহা ধরিতে পারে না। ওঝাজীর এত আগ্রহের সহিত লেখা কবিতা কে পড়িবে ? কে আজকাল ইহার আদর করিবে ? কোন্ আশা ইহাতে পুরিবে ওঝাজীর ? অথচ কত ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহাদের পিছনে আছে। চাপদানীর পোস্টাফিসে কুড়াইয়া পাওয়া সেই ছোট মেয়েটির নাম-ঠিকানা-ভুল পত্রখানার মতই তাহা ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া যাইবে !

সকালে উঠিয়া সে ওঝাজিকে একখানা দশটাকার নোট দিয়া প্রণাম করিল। নিজের একখানা ভাল বাঁধানো খাতা লিখিবার জন্য দিল—কাছে আর টাকা বেশী ছিল না, থাকিলে হয়ত আরও দিত। তাহার একটা দুর্বলতা এই যে, যে একবার তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে তাহাকে দিবার বেলায় সে মুক্তহস্ত, নিজের সুবিধা-অসুবিধা তখন সে দেখে না।

ডাকবাংলো হইতে মাইল খানেক পরে পথ ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, ক্রমে আরও উপরে, উচ্চ মালভূমির উপর দিয়া পথ—শাল, বাঁশ, খয়ের ও আবলুসের ঘন অরণ্য—ডাইনে বামে উঁচুনীচু ছোট বড় পাহাড় ও টিলা—শালপুষ্পসুরভি সকালের হাওয়া যেন মনের আয়ু বাড়াইয়া দেয়। চতুর্থ দিন বৈকালে অমরকণ্টক হইতে কিছু দূরে অপরূপ সৌন্দর্যভূমির সঙ্গে পরিচয় হইল—পথটা যেখানে নীচের দিকে নামিয়াছে, দুই দিকে পাহাড়ের মধ্যে সিকিমাইল চওড়া উপত্যকা, দুধারের সানুদেশের বন অজস্র ফুলে ভরা—পলাশের গাছ যেন জ্বলিতেছে। হাত দুই উঁচু পাথরের পাড়, মধ্যে গৈরিক বালু ও উপল-শয্যায় শিশু শোণ—নির্মল জলের ধারা হাসিয়া খুশিয়া আনন্দ বিলাইতে বিলাইতে ছুটিয়া চলিয়াছে—একটা ময়ূর শিলাখণ্ডের আড়াল হইতে নিকটের গাছের ডালে উঠিয়া বসিল। অপুর পা আর নড়িতে চায় না—তার মুগ্ধ ও বিস্মিত চোখের সম্মুখে শৈশব কল্পনার স্বর্গকে কে আবার এভাবে বাস্তবে পরিণত করিয়া খুলিয়া বিছাইয়া দিল!

এত দূরবিসর্পিত দিগ্‌বলয় সে কখনও দেখে নাই, এত নির্জনতার কখনও ধারণা ছিল না তাহার—বহুদূরে পশ্চিম আকাশের অনতিকষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখার উপরকার আকাশটাতে সে কি অপরূপ বর্ণসমুদ্র!

কি অপূর্ব দৃশ্য চোখের সম্মুখে যে খুলিয়া যায়! এমন সে কখনও দেখে নাই—জীবনে কখনও দেখে নাই।

এ বিপুল আনন্দ তাহার প্রাণে কোথা হইতে আসে!

এই সন্ধ্যা, এই শ্যামলতা, এই মুক্ত প্রসারের দর্শনে যে অমৃত মাখানো আছে, সে মুখে তাহা কাহাকে বলিবে?···কে তাহার এ চোখ ফুটাইল কে সাঁঝ-সকালের, সূর্যাস্তের, নীল বনানীর শ্যামলতার মায়া-কাজল তাহার চোখে মাখাইয়া দিল?

দূরবিসর্পিত চক্রবালরেখা দিগন্তের যতটুকু ঘিরিয়াছে, তাহারই কোন কোন অংশে, বহুদূরে সোমর শ্যামলতা অনতিস্পষ্ট সান্ধ্যদিগন্তে বিলীন, কোন কোন অংশে, ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা-যাওয়া বনরেখায় পরিস্ফুট, কোন দিকে সাদা-সাদা বকের দল আকাশের নীলপটে ডানা মেলিয়া দূর হইতে দূরে চলিয়াছে···মন

কোথাও বাধে না। অবাধ, উদার দৃষ্টি, পরিচয়ের গণ্ডি পার হইয়া যাইয়া অদৃশ্য অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া চলে···

তাহার মনে হইল সত্য সত্য সত্য—এই শান্ত নির্জন আরণ্যভূমিকে মনের ডালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নব জগতের জন্ম হয়—ঐ দূর ছায়াপথের মত তাহা দূরবিসর্পিত, এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নও—তাহাকে ধরা যায় না অথচ এই সব নীরব জীবনমুহূর্তে অনন্ত দিগন্তেব দিকে বিস্তৃত তাহার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব কবা যায়। এই এক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছেও—এই অদৃশ্য জগৎটার মোহস্পর্শ মাঝে মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জরীর উন্মাদ সুবাসে, সন্ধ্যা-ধূসর অনতিস্পষ্ট গিরিমালার সীমা-বেখায়, নেকড়ে বাঘের ডাকেভরা জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র জনহীন আরণ্যভূমির গাম্ভীর্যে, অগণিত তারাখচিত নিঃসীম শূন্যের ছবিতে। বৈকালে ঘোড়াটি বাঁধিয়া যখনই বক্রতোয়ার ধারে বসিয়াছে, তখনই অপর্ণার মুখ মনে পডিয়াছ, কতকাল ভুলিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন শৈশব-মধ্যাহ্নে মায়ের মুখে-শোনা মহাভারতের দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়াছে—তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইয়াছে যে, যে-জীবন যে-জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পবিপূর্ণ, আনন্দভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে, দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা···

আজ তাহার বসিয়া বসিয়া মনে হয়, শীলেদের বাড়ি চাকুরি তাহার দৃষ্টিকে আরও শক্তি দিয়াছিল, অন্ধকার অফিস ঘরে একটুখানি জায়গায় দশটা হইতে সাতটা পর্যন্ত আবদ্ধ থাকিয়া একটুখানি খোলা জায়গার জন্য সে কি তীব্র লোলুপতা, বুভুক্ষা—দুই টিউশনির ফাঁকে গড়ের মাঠের দিকের বড় গির্জাটার চূড়ার পিছনকার আকাশের দিকে তৃষিত চোখে চাহিয়া থাকার সে কি হ্যাংলামি! কিন্তু সেই বদ্ধ জীবনই পিপাসাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল, শক্তির অপচয় হইতে দেয় নাই, ধরিয়া বাঁধিয়া সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ মনে হয় চাঁপদানীর হেড মাস্টার যতীশবাবুও তাহার বন্ধু—জীবনের পরম বন্ধু—সেই নিষ্পাপ দরিদ্র ঘরের উৎপীড়িতা মেয়ে পটেশ্বরীও। ভগবান তাহাকে নিমিত্তস্বরূপ করিয়াছিলেন—তাহারা সকলে মিলিয়া চাঁপদানীর সেই কুলী-বস্তির জীবন হইতে তাহাকে জোর করিয়া দূর করিয়া না দিলে আজও যে

সেখানেই থাকিয়া যাইত। এমন সব অপরাহ্ণে সেখানে বিশু স্যাকরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডায় মহা খুশিতে আজও বসিয়া তাস খেলিত।

একথাও প্রায়ই মনে হয়, জীবনকে খুব কম মানুষেই চেনে। জন্মগত ভুল সংস্কারের চোখে সবাই জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা করে, দেখিবার চেষ্টা করে, দেখাও হয় না, বোঝাও হয় না। তা ছাড়া সে চেষ্টাই বা ক'জন করে ?...

অমরকণ্টক তখনও কিছু দূর। অপু বলিল, রামচরিত, কিছু শুকনো ডাল আর শালপাতা কুড়িয়ে আন, চা করি। রামচরিতের ঘোর আপত্তি তাহাতে। সে বলিল, হুজুর এসব বনে বড় ভাল্লুকের ভয়। অন্ধকার হবার আগে অমরকণ্টকের ডাকবাংলোয় যেতে হবে। অপু বলিল, তাড়াতাড়ি চা হয়ে যাবে, যাও না তুমি; পরে সে বড় লোটাটায় শোনের জল আনিয়া তিন টুকরো পাথরের উপর চাপাইয়া আগুন জ্বালিল। হাসিয়া বলিল, একটা ভজন গাও রামচরিত, যে আগুন জ্বলেছে, এর কাছে তোমার ভাল্লুক এগোবে না, নির্ভয়ে গাও।

জ্যোৎস্না উঠিল। চারিধারে অদ্ভুত, গম্ভীর শোভা। কল্যকার কাব্য-পুরাণের রেশ তাহার মন হইতে এখনও যায় নাই। বসিয়া বসিয়া মনে হইল সত্যই যেন কোন্ সুন্দরী, চারুনেত্রা রাজবধূ—নব-পুষ্পিতা মল্লীলতার মত তন্বী লীলাময়ী—এই জনহীন নিষ্ঠুর অরণ্যভূমিতে পথ হারাইয়া বিপন্নার মত ঘুরিতেছে—তাহার উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—দূরে ঋক্ষবান্ পর্বতের পার্শ্ব দিয়া বিদর্ভ যাইবার পথটি কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নন্-কো-অপারেশনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি তখন বছর তিনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময়ে একদিন প্রণব রাজসাহী জেল হইতে খালাস পাইল।

জেলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয় নাই, কেবল চোখের কেমন একটা অসুখ হইয়াছে, চোখ কর্‌কর্ করে, জল পড়ে। জেলের ডাক্তার মিঃ সেন চশমা লইতে বলিয়াছেন এবং কলিকাতার এক চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞের নামে একটি পত্রও দিয়াছেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া সে ঢাকা রওনা হইল এবং সেখান হইতে গেল স্বগ্রামে। এক প্রৌঢ়া খুড়ীমা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই, বাপ মা শৈশবেই মারা গিয়াছেন, এক বোন ছিল, সেও বিবাহের পর মারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে বাড়ি পৌঁছিল। খুড়ীমা ভাঙা রোয়াকের ধারে কম্বলের আসন পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। খুড়ীমার নিজের ছেলেটি মানুষ নয়, গাঁজা খাইয়া বেড়ায়, প্রণবকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছেন, ভালোওবাসেন, কিন্তু লেখাপড়া জানিলে কি হইবে, তাঁহার পুনঃ পুনঃ সদুপদেশ সত্ত্বেও সে কেবলই নানা হাঙ্গামায় পড়িতেছে, ইচ্ছা করিয়া পড়িতেছে।

এ বৃদ্ধবয়সে শুধু তাঁহারই মরণ নাই, ইত্যাদি নানা কথা ও তিরস্কার প্রণবকে রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। বাগানের বড় কাঁঠাল গাছের একটা ডাল কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, খুড়ীমা চৌকি দিয়া বেড়ান কখন, তিনি ও-সব পারিবেন না, তাঁহাকে যেন কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ কর্তাদের অত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি চোখের উপর নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দেখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

দিনচারেক বাড়ি থাকিয়া খুড়ীমাকে একটু শান্ত করিয়া চশমার ব্যবস্থার দোহাই দিয়া সে কলিকাতায় রওনা হইল। সোদপুরে খুড়ীমার একজন ছেলেবেলার-পাতানো গোলাপফুল আছেন, তাঁহারা প্রণবকে দেখিতে চান একবার, সেখানে যেন সে অবশ্য অবশ্য যায়, খুড়ীমার মাথার দিব্য। প্রণব মনে মনে হাসিল। বৎসর-চার পূর্বে গোলাপ-ফুলের বড় মেয়েটির যখন বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তখন খুড়ীমা এই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রণব যাওয়ার সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তারপরই আসিল নন্-কো-অপারেশনের ঢেউ, এবং নানা দুঃখ-দুর্ভোগ। সেটির বিবাহ হইয়াছে, এবার বোধ হয় ছোটটির পালা।

কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে অপুর খোঁজ করিল, পরিচিত স্থানগুলিতে গিয়া দেখিল, দু-একদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী খুঁজিল কারণ যদি অপু কলিকাতায় থাকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। চাঁপদানীতে যে অপু নাই তাহা তিন বৎসর আগে জেলে ঢুকিবার সময় জানিত, কারণ তাহারও প্রায় এক বৎসর আগে অপু সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

একদিন সে মন্মথদের বাড়ি গেল। তখন রাত প্রায় আটটা, বাহিরের ঘরে মন্মথ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছে। সে আজকাল এটর্নি, খুড়-শ্বশুরের বড় নামডাক ও পশারের সাহায্যে নতুন বসিলেও দু'পয়সা উপার্জন করে। মন্মথ যে ব্যবসায়ে উন্নতি করিবে, তাহার প্রমাণ প্রণব সেদিনই পাইল।

ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পরে রাত সাড়ে সাতটার কাছাকাছি মন্মথ যেন

একটু উসখুস করিতে লাগিল—যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। একটু পরেই একখানা বড মোটরগাডি আসিয়া দরজায় লাগিল, একটি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবকের হাত ধরিয়া দু'জন লোক ঘরে প্রবেশ করিল। প্রণব দেখিয়াই বুঝিল যুবকটি মাতাল অবস্থায় আসিয়াছে। সঙ্গের লোক দুইটির মধ্যে একজনের একটা চোখ খারাপ, ঘোলাটে ধরণের—বোধ হয় সে-চোখে দেখিতে পায় না, অপর লোকটি বেশ সুপুরুষ। মন্মথ হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে মল্লিক মশায়, আসুন, ইনিই মিঃ সেন শর্মা? · বসুন নমস্কার। গোপাল-বাবু, বসুন এইখানে। আর ওঁকে আমাদের কনডিশনস্ সব বলেছেন তো?

কথা বলার ধরণে প্রণব বুঝিল মল্লিক মশায় বড পাকা লোক। উত্তর দিবার পূর্বে তিনি একবার প্রণবের দিকে চাহিলেন। প্রণব উঠিতে যাইতেছিল, মন্মথ বলিল—না, না, বসো হে। ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, একসঙ্গে কলেজে পডতাম—ও ঘরের লোক, বলুন আপনি। মল্লিক মশায় একটা পুঁটুলি খুলিয়া কি সব কাগজ বাহির করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নস্বরে খানিকক্ষণ কি কথাবার্তা হইল। সঙ্গের অন্য লোকটি দু-বার যুবকটির কানে-কানে ফিস্-ফিস্ করিয়া কি কি বলিল, পরে যুবক একটা কাগজে নাম সই করিল। মন্মথ দু'বার সইটা পরীক্ষা করিয়া কাগজখানা একটা খামের মধ্যে পুরিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল ও একরাশ নোটের তাডা মল্লিক মশায়কে গুণিয়া দিল। পরে দলটি গিয়া মোটরে উঠিল।

প্রণব অপুর মত নির্বোধ নয়, সে ব্যাপারটা বুঝিল। যুবকটির নাম অজিতলাল সেন-শর্মা, কোনও জমিদারের-ছেলে। যে-জন্যই হউক, সে দুই হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট করিয়া দেড হাজার টাকা লইয়া গেল এবং মল্লিক মশায় তাহার দালাল, কারণ সকলকে মোটরে উঠাইয়া দিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন ও পুনরায় প্রণবের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্মথের সঙ্গে নিম্নস্বরে কিসের তর্ক উঠাইলেন—সাডে সাত পার্সেণ্টের জন্য তিনি যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেন নাই, এ কথা কয়েকবার শুনাইলেন। ঠিক ঠিক সেই সময়েই প্রণব বিদায় হইল।

পরদিন মন্মথর সঙ্গে আবার দেখা। মন্মথ হাসিয়া বলিল—কালকের সেই কাপ্তেন বাবুটি হে—আবার শেষরাত্রে তিনটের সময় মোটরে এসে হাজির। আবার চাই হাজার টাকা,—থোকে থার্টিফাইভ পার্সেণ্ট লাভ মেরে দিলুম। মল্লিক লোকটা ঘুঘু দালাল। বড়লোকের কাপ্তেন ছেলে যখন শেষরাতে হ্যাণ্ডনোট কাটছেন, তখন আমরা যা পারি ক'রে নিতে—আমার কি, লোকে

যদি দেড়হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কেটে এক হাজার নেয় আমার তাতে দোষ কি ? এই-সব চরিয়েই তো আমাদের খেতে হবে ! কত রাত এমন আসে ছ্যাখ না, টাকার যা বাজার কলকাতায়, কে দেবে ?

প্রণব খুব আশ্চর্য হইল না। ইহাদের কার্যকলাপ সে কিছু কিছু জানে, এক অপ্রকৃতিস্থ মাতাল যুবকদের নিকট হইতে ইহারা এক রাত্রিতে হাজার টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জন করিয়াও বড গলায় সেইটাই আবার বাহাদুরি করিয়া জাহির করিতেছে। হতভাগ্য যুবকটির জন্য প্রণবের কষ্ট হইল—মত্ত অবস্থায় সে যে কি সই করিল, কত টাকা তাহার বদলে পাইল, হয়ত বা তাহা সে বুঝিতেও পারিল না।

কলিকাতা হইতে সে মামার বাড়ি আসিল। মাতৃসমা বড় মামীমা আর ইহজগতে নাই। গত বৎসর পূজার সময় তিনি—প্রণব তখন জেলে। সেখানেই সে সংবাদটা পায়। গঙ্গানন্দকাটির ঘাটে নৌকা ভিড়িতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাল ট্রেনে সারা রাত ঘুম হয় নাই আদৌ। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া দোতলার কোণের ঘরে বিশ্রামেব জন্য যাইয়া দেখিল, বিছানার উপর একটি পাঁচ বৎসরের ছেলে চুপ করিয়া শুইয়া। দেখিয়া মনে হইল, একরাশ বাসি গোলাপফুল কে যেন বিছানার উপর উপুড় করিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছে,—হ্যাঁ, সে যাহা ভাবিয়াছে তাই—জ্বরে ছেলেটির গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে, মুখ জ্বরের ধমকে লাল, ঠোঁট কাঁপিতেছে, কেমন যেন দিশেহারা ভাব। মাথার দিকে একখানা রেকাবিতে দুখানা আধ-খাওয়া ময়দার রুটি ও খানিকটা চিনি। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাজল না ?

খোকা যেন হঠাৎ চমক ভাঙিয়া কতকটা ভয় ও কতকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কোনও কথা বলিল না।

প্রণবের মনে বড কষ্ট হইল—ইহাকে ইহারা এ ভাবে একা উপরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। অসহায় বালক একলাটি শুইয়া মুখ বুজিয়া জ্বরের সঙ্গে যুঝিতেছে, পথ্য দিয়াছে কি—না, দুখানা ময়দার হাতে-গড়া রুটি ও খানিকটা লাল চিনি। আর কিছু জোটে নাই ইহাদের ? জ্বরের ঘোরে তাহাই বালক যাহা পারিয়াছে খাইয়াছে। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—খোকা রুটি কেন, সাবু দেয় নি তোমায় ?

খোকা বলিল—ছাবু নেই।

—নেই কে বলল ?

—মা—মামীমা বললে ছাবু নেই।

সে জ্বরে হাঁপাইতেছে দেখিয়া প্রণব ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহার মাথাটা

বেশ করিয়া ধুইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এরূপ করিতেই জ্বরটা একটু কমিয়া আসিল, বালক একটু সুস্থ হইল। দিশেহারা ও হাঁস-ফাঁস ভাবটা কাটিয়া গেল। প্রণব বলিল—বল তো আমি কে ?

খোকা বলিল—জা-জা-জা জানি নে তো ?

প্রণব বলিল,—আমি তোমার মামা হই খোকা। তোমার বাবা বুঝি আসে নি এর মধ্যে ?

কাজল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ন্-ন্-না তো, বাবা কতদিন আসে নি।

প্রণব কৌতূহলের সুরে বলিল—তুমি এত তোৎলা হ'লে কি ক'রে, কাজল ?

সে অপুর ছেলেকে খুব ছোটবেলায় দেখিয়াছিল। আজ দেখিয়া মনে হইল, অপুর ঠোঁটের সুকুমার রেখাটুকু ও গায়ের সুন্দর রঙটি বাদে ইহার মুখের বাকী সবটুকু মায়ের মত।

কাজল ভাবিয়া বলিল—আমার বাবা আসবে না ?

–আসবে না কেন ? বাঃ!

–ক-ক-কবে আসবে।

—এই এল বলে। বাবার জন্যে মন কেমন করে বুঝি ?

কাজল কিছু বলিল না।

অপুর উপরে প্রণবের খুব রাগ হইল। ভাবিল আচ্ছা পাষণ্ড তো ? মা-মরা কচি বাচ্চাটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বসে আছে! ওকে এখানে কে দেখে তার নেই ঠিক—দয়া মায়া নেই শরীরে ?

শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে প্রণবের নিকট জামাইয়ের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন—বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের যোগাযোগটি তো ঘটিয়েছিলে, ভেবে ছাখো তো সে আজ পাঁচ বচ্ছরের মধ্যে নিজের ছেলেকে একবার চোখের দেখা দেখতে এল না, ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মাইনের চাকরি করছেন আর ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভবঘুরের মত, চাল নেই চুলো নেই, কোন জন্মে যে করবেন সে আশাও নেই—ব'লো না, হাড়ে চটেছি আমি—এদিকে ছেলেটি কি অবিকল তাই।·· এই বয়সে থেকেই নির্বোধ, অথচ যেমন চঞ্চল তেমনি একগুঁয়ে। চঞ্চল কি একটু-আধটু ? ঐটুকু তো ছেলে, একদিন করেছে কি, একদল গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে চলে গিয়েছে সেই শীবপুরের বাজারে···এদিকে আমরা খুঁজে পাই নে, চারদিকে লোক পাঠাই—শেষে মাখন মুহুরীর সঙ্গে দেখা, সে ধরে নিয়ে আসে। খাওয়াও, দাওয়াও, মেয়ের ছেলে কখনও আপনার হয় না, যে পর সে-ই পর।

খোকা বাপের মত লাজুক ও মুখচোরা—কিন্তু প্রণবের মনে হইল, এমন

সুন্দর ছেলে সে খুব কম দেখিয়াছে। সারা গা বহিয়া যেন লাবণ্য ঝরিতেছে, সদাসর্বদা মুখ টিপিয়া কেমন এক করুণ, অপ্রতিভ ধরণের হাসি হাসে —মুখখানা এত লাজুক ও অবোধ দেখায় সে সময়!···কেমন যে একটা করুণা হয়! এখানে কয়েক দিন থাকিয়া প্রণব বুঝিয়াছে, দিদিমা মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতে বালককে যত্ন করিবার আর কেহ নাই—সে কখন খায়, কখন শোয় কি পরে—এ সব বিষয়ে বাড়ির কাহারও দৃষ্টি নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে তো নাতিকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না, সর্বদা কড়া শাসতে রাখেন। তাঁহার বিশ্বাস এখন হইতে শাসন না করিলে এ-ও বাপের মত ভবঘুরে হইয়া যাইবে, অথচ বালক বুঝিয়া উঠিতে পাবে না, দাদামহাশয় কেন তাহাকে অমন উঠিতে-তাড়া বসিতে-তাড়া দেন—ফলে সে দাদামহাশয়কে যমের মত ভয় করে তাঁহার ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটিতে চায় না।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রণব দেবব্রতের সঙ্গে দেখা করিল। দেবব্রত একটু বিষন্ন—বিলাত যাইবার পূবে সে একটি মেয়েকে নিজের চোখে দেখিয়া বিবাহের জন্য পছন্দ করিয়াছিল—কিন্তু তখন নানা কারণে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়—সে আজ তিন বৎসর পূর্বের কথা। এবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া সে নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া সন্ধান লইয়া জানে মেয়েটির এখনও বিবাহ হয় নাই! মেয়েটির ডান পায়ের হাঁটুতে নাকি কি হইয়াছে, ডাক্তার সন্দেহ করিতেছেন বোধ হয় তাহাকে চিরজীবনের জন্য ঐ পা খাটো হইয়া থাকিবে —এঅবস্থায় কে ই বা বিবাহ করিতে অগ্রসর হইবে? শুনিবা-মাত্র দেবব্রত ধরিয়া বসিয়াছে সে ঐ মেয়েকেই বিবাহ করিবে—মায়ের ঘোর আপত্তি, পিসেমহাশয়ের আপত্তি, মামাদের আপত্তি—সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। হয় ঐ মেয়েকে বিবাহ করিবে, নতুবা দরকার নাই বিবাহে।

দেবব্রতের সঙ্গে প্রণবের খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না, অপুর সঙ্গে ইতিপূর্বে বার-দুই-তিন তাহার কাছে গিয়াছিল এই মাত্র। এবার সে যায় অপুর কোন সন্ধান দিতে পারে কিনা তাহাই জানিবার জন্য। কিন্তু এই বিবাহ-বিভ্রাটকে অবলম্বন করিয়া মাস-দুইয়ের মধ্যে দু'জনের একটা ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিল।

দেবব্রত এই সব গোলমালের দরুন পিসেমহাশয়ের বাসা ছাড়িয়া কলিকাতায় হোটেলে উঠিয়াছিল—বৈকালে সেখানে একদিন প্রণব বেড়াইতে গিয়া শুনিল, দেবব্রতের মা এ বিবাহে মত দিয়াছেন। দেবব্রত বলিল—ঠিক সময়ে এসেছেন, আমি ভাবছিলুম আপনার কথা—কাল পিসেমশায় আর বড় মামা যাবেন মেয়েকে আশীর্বাদ করতে, আপনিও যান ওঁদের সঙ্গে। ঠিক বিকেল পাঁচটায় এখানে আসবেন।

মেয়ের বাড়ি গোয়াবাগান। ছোট দোতলা বাড়ি, নিচে একটা প্রেস। মেয়ের বাপ গভর্ণমেণ্টের চাকরি করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া খুব সুন্দরী বলিয়া মনে হইল না প্রণবের, গায়ের রং যে খুব ফর্সা তাও নয়, তবে মুখে এমন কিছু আছে যাতে একবার দেখিলে বার বার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। ঘাড়েব কাছে একটা যৌতুকচিহ্ন, চুল বেশ বড় বড় ও কোঁকড়ানো। বিবাহেব দিনও উভয় পক্ষেব সম্মতিক্রমে ধার্য হইয়া গেল।

দেবব্রত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ-ঘরের ছেলে। দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে জানে না, এ পর্যন্ত বরাবর যথেষ্ট পয়সা হাতে পাইয়াছে, তাহার পিসেমহাশয় অপুত্রক, তাঁহাব সম্পত্তি ও কলিকাতার দু'খানা বাড়ি দেবব্রতই পাইবে। কিন্তু পয়সা অপব্যয় করার দিকে দেবব্রতের ঝোঁক নাই, সে খুব হিসাবী ও সতর্ক এ বিষযে। সাংসারিক বিষয়ে দেবব্রত খুব হুঁশিয়ার—পাটনায় যে চাকরিটা সে সম্প্রতি পাইয়াছে, সে শুধু তাহাব যোগাড-যন্ত্র ও সুপারিশ ধরিবার কৃতিত্বের পুরস্কার—নতুবা কুড়ি-বাইশ জন বিলাত ফেরত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারেব দরখাস্তেব মধ্যে তাহার মত তরুণ ও অনভিজ্ঞ লোকের চাকুরি পাইবার কোনই আশা ছিল না। শাঁখাবিটোলায় দেবব্রতের পিসেমহাশয় তাবিণী মিত্রেব বাড়ি হইতেই দেবব্রত বিবাহ করিতে গেল। পিসিমার ইচ্ছা ছিল খুব বড় একটা মিছিল করিয়া বর রওনা হয়, কিন্তু পিসেমহাশয় বুঝাইলেন ও-সব একালের ছেলে- বিশেষ করিয়া দেবব্রতের মত বিলাত-ফেরত ছেলে—পছন্দ করিবে না। মায়ের নিকট বিবাহ করিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার সময় দেবব্রতের চোখ ভিজিয়া উঠিল—স্বর্গগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া দেবব্রতর মা-ও চোখের জল ফেলিলেন—সবাই বকিল, তিরস্কার করিল। একজন প্রতিবেশিনী হাসিয়া বলিলেন—দোর-ধরুণীর টাকা কৈ? ··

দেবব্রতর পিসিমা বলিলেন—আমার কাছে গুণে নিও মেজবৌ। ও-কি দোর-ধরা হ'ল? আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাঙ্গাল দেশে নিয়ম ছিল দেখেছি সাতজন এয়ো আর সাতজন কুমারী এই চোদ্দজনকে দোর-ধরুণীর টাকা দিয়ে তবে বর বেরুতে পেত বাড়ি থেকে। একালে তো সব দাঁড়িয়েছে—

দেবব্রত একটুখানি দাঁড়াইল। ফিরিয়া বলিল—মা শোন একটু।···

আড়ালে গিয়ে চুপি চুপি বলিল—চাটুয্যে বাড়ির মেয়েটা দোর ধরার জন্যে দাঁড়িয়েছিল, আমি জানি, ছোট পিসীমা তাকে সরিয়ে দিয়েছেন—এ-সবেতে আমার মনে বড় কষ্ট হয় মা। এই দশ টাকার নোটটা রাখো, তাকে তুমি দিও —কেন তাকে সরালে বল তো—আমি জানি অবিশ্যি কেন সরিয়েছে—কিন্তু এতে লোকের মনে কষ্ট হয় তাও ওরা বোঝে না!

মা বলিলেন—ও-কথা তোর ওদেব বলবার দরকার নেই—টাকা দিলি আমি দেবো এখন। ছোট ঠাকুরঝির দোষ কি, বিধবা মেয়েকে কি বলে আজ সামনে রাখে বল না? হিন্দুর নিয়মগুলো তো মানতে হবে, সবাই তোমার মত বেহ্মজ্ঞানী হয়নি এখনো। মেয়েটার দোষ দিইনি, তার আর বয়স কি—ছেলেমানুষ—সে না-হয় অত বোঝে সোঝে না, আমোদে নেচে দোর ধরবে বলে দাঁড়িয়েছে—তার বাপ-মায়ের তো এটা দেখতে হয়! শুভকাজের দিন বিধবা মেয়েকে কেন এখানে পাঠানো বাপু? তা নয়—গরীব কিনা, পাঠিয়েছে—যা কিছু ঘবে আসে—যাক্। আমি দেবো এখন—তা হ্যাঁ রে পাঁচটা দিলেই তো হ'ত—এত কেন?

—না মা ঐ থাক্। ছোটপিসিমাকে ব'লো বুঝিরে ওতে শুভকাজ এগোয় না, আরোও পিছিয়ে ষায়।

দু-তিনখানা বাড়ির মোড়ে চাটুয্যে বাড়িটা। ইহারা সবাই ছাপাখানায় কাজ করে, বৃদ্ধ চাটুয্যেমশায়ও আগে কম্পোজিটবের কাজ করিতেন, আজকাল চোখে দেখেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজকাল তাঁহার কাজ প্রতি-বেশীদের নিকট অভাব জানাইয়া আধুলি ধার করিয়া বেড়ানো! দেবব্রত ইহাদের সকলকেই অনেক দিন হইতে চেনে। তাহার গোলাপফুল সাজানো মোটরখানা চাটুয্যেবাড়ির সম্মুখে মোড় ঘুরিবার সময় দেবব্রত কেবলই ভাবিতেছিল, কোনও জানালার ফাঁক দিয়া তের বৎসরের বিধবা মেয়েটা হয়ত কৌতুহলের সহিত তাহাদের মোটর ও ফিটন গাড়ির সারির দিকে চাহিয়া আছে।

রাত্রের গোড়ার দিকেই বিবাহ ও বরযাত্রীভোজন মিটিয়া গেল।

দেবব্রত বাসরে গিয়া দেখিল, সেখানে অত্যন্ত ভিড়—বাসরের ঘর খুব বড় নয়—সামনের দালানেও স্থান নেই, অন্য অন্য ঘরের বাক্স তোরঙ্গ সব দালানে বাহির করা হইয়াছে, অথচ মেয়েদের ভিড এত বেশী যে বসাতো দূরের কথা, সকলের দাঁড়াইবাব জায়গাও নাই। সে বড় শালাকে বলিল—দেখুন. যদি অনুমতি করেন, একটু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যে জাহির করি। এই ট্রাঙ্কগুলো এখানে রাখার কোন মানে নেই—লোক ডাকিয়ে দেওয়ালের দিকে এক সারি এখানে, আর এক সারি ক'রে দিন সিঁড়ির ধাপে ধাপে—বুঝলেন না?...যাবার আসবারও কষ্ট হবে না অথচ এদের জায়গা হবে এখন। তাহার ছোট শালীরা ব্যাপারটা লইয়া তাহাকে কি একটা ঠাট্টা করিল। সবাই হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি একটার পর কিন্তু যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। দেবব্রত বাসর হইতে বাহির হইয়া দালানের একটা স্টীলের তোরঙ্গের উপর বসিয়া একটা

সিগারেট ধরাইল। তাহার মনে আনন্দের সঙ্গে কেমন একটা উত্তেজনা।···মনে মনে খুব একটা তৃপ্তিও অনুভব করিল।···জীবন এখন সুনির্দিষ্ট পথে চলিবে—লক্ষ্মীছাড়ার জীবন শেষ হইল। পাটনার চাকুরিতে একটা সুবিধা এই যে, জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর, বাড়িভাড়া সস্তা, বছরে পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িবে—তবে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সুদ কিছু কম। সে ভাবিল—যাই তো আগে, ফৈজুদ্দীন হোসেনকে একটু হাতে রাখতে হবে, ওর হাতেই সব—অন্য সব ডিরেক্টার তো কাঠের পুতুল। ক্যাণ্টনমেণ্টের ক্লাবে গিয়েই ভর্তি হয়ে যাবো—ওরা আবার ওসব দেখলে ভেজে কিনা।

নববধূ এখনও ঘুমায় নাই, দেবব্রত গিয়া বলিল—বাইরে এসো না সুনীতি, কেউ নেই। আসবে?

নববধূ চেলীর পুঁটুলী নয়, কিন্তু পায়ের জন্য তার উঠিতে কষ্ট হয়—দেবব্রত তাহাকে সযত্নে ধরিয়া দালানে আনিয়া তোরঙ্গটার ওপব ধীরে ধীরে বসাইয়া দিল। নববধূ হাসিয়া বলিল—ওই দোরটা বন্ধ ক'রে দাও—সিঁড়ির ওইটে—শেকল উঠিয়ে দাও—হ্যা—ঠিক হয়েছে—নৈলে এক্ষুণি কেউ এসে পড়বে।

দেবব্রত পাশে বসিয়া বলিল—রাতজেগে কষ্ট হচ্ছে খুব—না?

—কি এমন কষ্ট, তা ছাড়া দুপুরবেলা আমি ঘুমিয়েছি খুব।

—আচ্ছা, তুমি কনে-চন্দন পরো নি কেন সুনীতি? এখানে সে চলন নেই?

মেয়েটি সলজ্জমুখে বলিল—মা পরাতে বলেছিলেন—

—তবে?

—জ্যাঠাইমা বললেন, তুমি নাকি পছন্দ করবে না।

দেবব্রত হাসিয়া উঠিয়া বলিল -কেন বল তো—বিলেত-ফেরত বলে? বা তো—

পরে সে বলিল—অমি সাত তারিখে পাটনায় যাব, বুঝলে, তোমাকে আর মাকে এসে নিয়ে যাব মাস-দুই পরে, সুনীতি। তোমার বাবাকে বলে রেখেছি।

মেয়েটি নতমুখে বলিল—আচ্ছা একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না?···

—বল না, কি মনে করব?—

—আচ্ছা; আমার এই পা নিয়ে তুমি যে বিয়ে করলে, যদি আমার পা না সারে? দ্যাখ, তোমার গা ছুঁয়ে সত্যি বলচি আমার ইচ্ছে ছিল না বিয়ের। মাকে কতবার বুঝিয়ে বলেছি, মা এই তো আমার পায়ের দশা, পরের ওপর অনর্থক কেন বোঝা চাপানো সারাজীবন—তা মা বললেন তুমি নাকি খুব—

তোমার নাকি খুব ইচ্ছে। আচ্ছা কেন বল তো এ মতি তোমার হ'ল?

দেবব্রত বলিল—স্পষ্ট কথা বললে তুমিও কিছু মনে করবে না সুনীতি? তাহলে বলি শোন, তোমার এই পায়ের দোষ যদি না হ'ত তবে আমি অন্য জায়গায় বিয়ে করে ফেলতুম—যেদিন থেকে শুনেছি পায়ের দোষের জন্য তোমার বিয়ে এই তিন বছরের মধ্যে হয় নি—সেদিন থেকে আমার মন বলছে ওখানেই বিয়ে করব, নয় তো নয়। অন্য জায়গায় বিয়ে করলে মনে শান্তি পেতাম না সুনীতি। সেই যে তোমাকে দেখে গিয়েছিলুম, তারপর বিয়ে তখন ভেঙে গেল, কিন্তু তোমার মুখখানা কতবার যে মনে হয়েছে!...কেন কে জানে—আমি কাব্যি করছি নে সুনীতি, ওসব আমার আসে না, আমি সত্যি কথা বলছি।

তারপর সে আজ ওবেলার চাটুয্যে-বাড়ির বিধবা মেয়েটির কথা বলিল। বলিল—দ্যাখ এও তো কাব্যের কথা নয়—আজ বিয়ের আসনে বসে কেবলই সেই ছোট মেয়েটার কথা মনে হয়েছে। ছোট পিসিমা তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আজ আমার অর্ধেক আনন্দ মাটি করেছেন, সুনীতি—তোমার কাছে বলছি, আর কাউকে ব'লো না যেন! এ কেউ বুঝবে না, আমার মা-ও বোঝেন নি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল।

কাজলের মুশকিল বাধে রোজ সন্ধ্যার সময়। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে তাহার মামীমা বলিলেন, ওপরে চলে যাও, শুয়ে পড গিয়ে। কাজল বিপন্নমুখে রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ওপরে কেউ নাই, মধ্যে একটা অন্ধকার সিঁড়ি, তাহার উপর দোতলার পাশের ঘরটাতে আলনায় একরাশ লেপকাঁথা বাঁধা আছে। আধ-অন্ধকারে সেগুলো এমন দেখায়!

আগে আগে দিদিমা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিতেন। দিদিমা আর নাই, মামীমারা খাওয়াইয়া দিয়াই খালাস। সেদিন সে সেজ দিদিমাকে বলিয়াছিল। তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এখন তোমায় যাই শোওয়াতে। একা এটুকু আর যেতে পারেন না, সেদিন তো পীরপুরের হাটে একা পালিয়ে যেতে পেরেছিলে? ছেলের ন্যাকরা দেখে বাঁচিনে।

নিরুপায় হইয়া ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতে আর সাহস না করিয়া প্রথমটা দোরের কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। কোণে

কড়ির আলনার নীচে দাদামহাশয়ের একরাশ পুরানো হুঁকার খোল ও হুঁকা-দান। এককোণে মিটমিটে তেলের প্রদীপ, তাতে সামান্য একটুখানি আলো হয় মাত্র, কোণের অন্ধকার তাহাতে আরও যেন সন্দেহজনক দেখায়। এখানে একবার আসিলে আর কেহ কোথাও নাই, ছোট মামীমা নাই। ছোট দিদিমা নাই, দলু নাই, টাটি নাই—শুধু সে আর চারিপাশের এই-সব অজানা বিভীষিকা। কিন্তু এখানেই বা সে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? ছোট মাসীমা ও বিন্দু-ঝি এঘরে শোয়, তাহাদের আসিতে এখনও বহু দেরি, শীতের হাওয়ায় হাড-কাঁপুনি ধরিয়া যায় যে! অগত্যা সে অন্যান্য দিনের মত চোখ বুজিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিজের বিছানার উপর উঠিয়াই ছোট লেপটা একেবারে মুড়ি দিয়া ফেলে। কিন্তু বেশীক্ষণ লেপমুড়ি দিয়া থাকিতে পারে না—ঘরের মধ্যে কোন কিছু নাই তো? মুখ খুলিয়া একবার ভীতচোখে চারিধারে চাহিয়া দেখিয়া আবার লেপমুড়ি দেয়—আর যত বাজ্যের ভূতের গল্প কি ঠিক ছাই এই সময়টাতেই মনে আসে।

দিদিমা থাকিতে এ-সব কষ্ট ছিল না। দিদিমা তাহাকে ঘুম না পাড়াইয়া নামিতেন না। কাজল উপরে আসিয়াই বিছানায় উপরকার সাজানো লেপ-কাঁথার স্তূপের উপর খুশী ও আমোদের সহিত বার বার লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইতে থাকিত—আমি জলে ঝাঁপাই—হি-হি—আমি জলে ঝাঁপাই—ও দিদিমা—হি-হি—

কোনোরকমে দিদিমা তাহার লাফানো হইতে নিবৃত্ত করিয়া শোয়াইতে কৃতকার্য হইলে সে দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত,—এইবার একতা গ-গ-অ-ল্প।—কথার শেষের দিকে ঠোঁট দুটি ফুলের কুঁড়ির মত এক জায়গায় জড করিয়া না আনিলে কথা মুখ দিয়া বাহির হইত না। তাহার দিদিমা হাসিয়া বলিত—যে গুড খাস, খেয়ে খেয়ে এমন তোৎলা। গল্প বলব, কিন্তু তুমি পাশ ফিরে চুপটি ক'রে শোবে, নডবেও না. চডবেও না। কাজল ভ্রূ কুঁচকাইয়া ঘাড সামনের দিকে নামাইয়া থুৎনী প্রায় বুকের উপর লইয়া আসিত। পরে চোখের ভুরু উপরের দিকে উঠাইয়া হাসি-ভরা চোখে চুপ করিয়া দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। দিদিমা বলিত, দুষ্টুমি ক'রো না দাদাভাই, আমার এখন অনেক কাজ, তোমার দাদু আবার এখুনি পাশার আড্ডা থেকে আসবেন, তাঁকে খেতে দেব। ঘুমোও তো লক্ষ্মী ভাইটি! কাজল বলিত, ইল্লি!...দা-দা-দাদুকে খাবার দেবে তো ছোট মামীমা, তু-তুমি এখন যাবে বৈ কি? একতা গ-গ-অ-প্প কর, হ্যাঁ দিদিমা—

এ ধরণের কথা সে শিখিয়াছে বড় মাসতুতো ভায়েদের কাছে। তাহার

বড় মাসীমার ছেলে দলু কথায় কথায় বলে ইল্লি! কাজলও শুনিয়া শুনিয়া তাহাই ধরিয়াছে।

তাহার পর দিদিমা গল্প করিতেন, কাজল জানালার বাহিরে তারাভরা, স্তব্ধ, নৈশ আকাশের দিকে চাহিয়া একবার মুখ ফুলাইত আবার হাঁ করিত, আবার ফুলাইত আবার হাঁ করিত। দিদিমা বলিত, আঃ, ছিঃ দাদু। ও-রকম দুষ্টমি করলে ঘুমুবে কখন? এখুনি তোমার দাদু ডাকবেন আমায়, তখন তো আমায় যেতে হবে। চুপটি ক'রে শোও। নইলে ডাকব তোমার দাদুকে?

দাদামশায়কে কাজল বড় ভয় করে, এইবার সে চুপ হইয়া যাইত। কোথায় গেল সেই দিদিমা! সে আরও বছর দেড় আগে, তখন তাহার বয়স সাড়ে-চার বছর—একদিন ভারী মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সে রাত্রে ঘুমাইতেছিল, সকালে উঠিলে অরু চুপি চুপি বলিল—ঠাকুমা কাল রাতে মারা গিয়েছে, জানিস নে কাজল?

—কো-কোথায় গিয়েছে?

—মারা গিয়েছে, সত্যি, আজ শেষরাত্রে নিয়ে গিয়েছে। তুই ঘুমুচ্ছিলি তখন।

—আবার ক-কবে আসবে?

অরু বিজ্ঞের সুরে বলিল—আর বুঝি আসে? তুই যা বোকা। ঠাকুরমাকে তো পোড়াতে নিয়ে চলে গেছে ওই দিকে।—সে হাত তুলিয়া নদীর বাঁকের দিকে দেখাইয়া দিল।

অরু ভারী চালবাজ। সব তাতেই ওইরকম চাল দেয়, ভারী তো এক বছরের বড়, দেখায় যেন সব জানে, সব বোঝে। ওই চালবাজীর জন্যই তো কাজল অরুকে দেখিতে পারে না।

সে খুব বিস্মিতও হইল। দিদিমা আর আসবে না! কেন?...কি হইয়াছে দিদিমার?...বা রে!

কিন্তু সেই হইতে দিদিমাকে আর সে দেখিতে পায় নাই। গোপনে গোপনে অনেক কাঁদিয়াছে, কোথায় দিদিমা এরকম একরাত্রের মধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছে, কিছু ঠিক করিতে পারে নাই।

আজকাল আর কেহ কাছে বসিয়া খাওয়ায় না, সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসে না, গল্প করে না। একলাটি এই অন্ধকারের মধ্য দিয়া আসিয়া উপরের ঘরে শুইতে হয়। সকলের চেয়ে মুশকিল হইয়াছে এইটাই বেশী 'কি-না!

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাস যায় যায়।

অপু অনেকদিন পরে দেশে ফিরিতেছিল। গাড়ির মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোক লক্ষ্ণৌ-এর খরমুজার গুণবর্ণনা করিতেছিলেন, অনেকে মন দিয়া শুনিতেছিল—অপু অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল। কতক্ষণে গাড়ি বাংলা দেশে আসিবে? সাতসমুদ্র তেরোনদীর পারের রূপকথার রাজ্য বাংলা! আজ দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর সে বাংলার শান্ত, কমনীয় রূপ দেখে নাই, এই বৈশাখে বাঁশের বনে বনে শুকনো বাঁশখোলার তলা-বিছাইয়া পড়িয়া-থাকা, কাঞ্চনফুলে-ভরা সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটে সদ্যস্নাত নতমুখী তরুণীর মূর্তি—কলিকাতার মেস-বাটী, দালানের রেলিং-এ কাপড় মেলিয়া দেওয়া, বাবুরা সব অফিসে, নিচের বালতিতে বৈকাল তিনটার সময় কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছে—এ সব সুপরিচিত প্রিয় দৃশ্যগুলি আর একবার দেখিবার জন্য —উঃ, মন কি ছট্‌ফট্‌ই না করিয়াছে গত ছ'বছর। বাংলা ছাড়িয়া সে ভাল করিয়া বাংলাকে চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে। কতক্ষণে বাংলাকে দেখা যাইবে আজ? সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময়।

রাণীগঞ্জ ছাড়িয়া অনেক দূর আসিবার পরে, বালুময় মাঠের মধ্যে সিঙ্গারণ নদীর গ্রীষ্মের জল খররৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে—দূর গ্রামের মেয়েরা আসিয়া নদীখাতের বালু খুঁড়িয়া সেই জলে কলসী ভর্তি করিয়া লইতেছে—একটি কৃষক-বধূ জল-ভরা কলসী কাঁখে রেলের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ি দেখিতেছে—অপু দৃশ্যটা দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল—সারা শরীরে একটা অপূর্ব আনন্দ-শিহরণ। কতদিন বাংলার মেয়ের পরিচিত ভঙ্গিটি সে দেখে নাই! চোখ মন জুড়াইয়া গেল।

বর্ধমান ছাড়াইয়া নিদাঘ অপরাহ্ণের ঘন ছাওয়ায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। একটা ছোট পুকুর ফুটন্ত পদ্মফুলে একেবারে ভরা, ফুলের পাতায় জল দেখা যায় না—ওপারে বিচালি-ছাওয়া গৃহস্থের বাটি, একটা প্রাচীন সজিনা গাছ জলের ধারে ভাঙিয়া পড়িয়া গলিয়া খসিয়া যাইতেছে, একটা গোবরগাদা —আজ সারাদিনের আগুন-বৃষ্টির পরে, বিহার ও সাঁওতাল পরগণার বন্ধুর আগুন-রাঙা ভূমিশ্রীর পরে, ছায়াভরা পদ্মপুকুরটা যেন সারা বাংলার কমনীয় রূপের প্রতীক হইয়া তাহার চোখে দেখা দিল।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা আসিয়া দাঁড়াতেই সে যেন খানিকটা অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এত আলো, এত লোকজন, এত ব্যস্ততা, এত গাড়ি-ঘোড়া জীবনে যেন এই প্রথম দেখিতেছে, হাওড়া পুল পার হইবার সময় ওপারের আলোকজ্জল মহানগরীর দৃশ্যে সে মুগ্ধ হইয়া গেল—ওগুলা কি? মোটর বাস? কই আগে তো ছিল না কখনও? কি বড় বড় বাড়ি কলিকাতায়, ফুটপাতে কি লোকজনের ভিড়! বাড়ির মাথায় একটা কিসের বিজ্ঞাপনের বিজলী আলোর রঙীন হরপ একবার জ্বলিতেছে, আবার নিভিতেছে —উঃ, কী কাণ্ড!

হ্যারিসন রোডের একটা বোর্ডিং-এ উঠিয়া একা একটা ঘর লইল—স্নানের ঘর হইতে সাবান মাখিয়া স্নান সারিয়া সারাদিনের ধূমধূলি ও গরমের পর ভারী আরাম পাইল। ঘরের আলোর সুইচ টিপিয়া ছেলেমানুষের মত আনন্দে আলোটাকে একবার জ্বালাইতে একবার নিভাইতে লাগিল—সবই নতুন মনে হয়। সবই অদ্ভুত লাগে।

পরদিন সে কলিকাতার সবত্র ঘুরিল—কোন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা হইল না। বৌবাজারের সেই কবিরাজ বন্ধুটি বাসা উঠাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, পূর্বপরিচিত মেসগুলিতে নতুন লোকেরা আসিয়াছে, কলেজ স্কোয়ারের সেই পুরাতন চায়ের দোকানটি উঠিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় সে একটা নতুন থিয়েটারে গেল শুধু বাংলা গান শোনার লোভে। বেশী দামের টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের সারির আসনে বসিয়া পুলকিত ও উৎসুক চোখে সে চারিদিকের দর্শকের ভিড়টা দেখিতেছিল। একটা অঙ্কের শেষে সে বাহিরে আসিল, ফুটপাতে একজন বুড়ী পান বিক্রী করিতেছে, অপুকে বলিল, বাবু, পান নেবেন না? নেন না! অপু ভাবিল. সবাই মিঠে পান কিনছে বড় আয়নাওয়ালা দোকান থেকে। এ বুড়ীর পান বোধ হয় কেউ কেনে না—আহা নিই এর কাছ থেকে।

সকলেরই উপর কেমন একটা করুণার ভাব, সবাই উপর কেমন একটা ভালবাসা, সহানুভূতির ভাব—অপুর মনের বর্তমান অবস্থায় বুড়ী পানওয়ালী হাত পাতিয়া দশটা টাকা চাহিয়া বসিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে পারিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সে বাহির হইয়া বুড়ীটার কাছে পান কিনিতে যাইতেছে, এমন সময় পিছনের আসনের দিকে নজর পড়িল।

সে একটু আগাইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল—সুরেশ্বরদা, চিনতে পারেন?

কলিকাতায় প্রথম ছাত্র-জীবনের সেই উপকারী বন্ধু সুরেশ্বর, সঙ্গে একটি

তরুণী মহিলা। সুরেশ্বর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গুডনেস্ গ্রেসাস্। আমাদের সেই অপূর্ব না?

অপূর্ব হাসিয়া বলিল—কেন, সন্দেহ হচ্ছে না কি? ওঃ, কতদিন পরে আপনার সঙ্গে, ওঃ?

—দেখে সন্দেহ হবার কথাই বটে। মুখের চেহারা বদলেছে, রঙটা একটু তামাটে—যদিও you are as handsome as ever—ও, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—ইনি আমার বেটার-হাফ—আর ইনি আমার বন্ধু অপূর্ববাবু—ইনি ভাবুক, লেখক, ভবঘুরে এ্যাণ্ড হোয়াট নট্—তারপর, কোথায় ছিলে এতদিন?

—কোথায় ছিলুম না তাই বরং জিজ্ঞেস করুন—in all sorts of places—তবে সভ্য জগৎ থেকে দূরে—ছ'বছর পর কাল কলকাতায় এসেছি। ও ড্রপ উঠল বুঝি, এখন থাক, বলব এখন।

—মোস্ট বাজে প্লে। তার চেয়ে চলো, তোমার সঙ্গে বাইরে যাই—

অপু বন্ধুকে সিগারেট দিয়া নিজে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল—আপনার এ-সব দেখে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, তাই ভাল লাগছে না বোধ হয়। আমার চোখ নিয়ে যদি দেখতেন, তবে ছ'বছর বনবাসের পর উড়িয়াদের রাম-যাত্রাও ভাল লাগত। জানেন সুরেশ্বরদা, সেখানে আমার ঘর থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একটা গিরগিটি থাকত—সেটা এবেলা-ওবেলা রঙ বদলাত, দু'টি বেলা তাই শখ ক'রে দেখতে যেতুম—তাই ছিল একমাত্র তামাশা, তাই দেখে আনন্দ পেতুম।

রাত সাড়ে ন'টায় থিয়েটার ভাঙিল। তারপর সে থিয়েটার-ঘর হইতে নিঃসৃত সুবেশ নরনারীর স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল—এই আলো, লোকজন সাজানো দোকানপসরা—এসব সে ছেলেমানুষের মত আনন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

স্ত্রীকে মাণিকতলায় শ্বশুরবাড়িতে নামাইয়া দিয়া সুরেশ্বর অপুর সহিত কর্পোরেশন স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় গিয়া উঠিল। অপুর কথা সব শুনিয়া বলিল—এই পাঁচ বছর ওখানে ছিলে? মন-কেমন করত না দেশের জন্যে?

—Oh at times I felt so terribly homesick—homesick for Bengal—শেষ দু-বছর দেশ দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলুম—

ফুটপাত বাহিয়া কয়েকটি ফিরিঙ্গি মেয়ে হাসি কলরব করিতে করিতে পথ চলিতেছে, অপু সাগ্রহে সেদিকে চাহিয়া রহিল। মানুষের গলার স্বর মানুষের কাছে এত কাম্যও হয়। রাস্তাভরা লোকজন, মোটর গাড়ি, পাশের একটি

একতলা বাড়িতে সাজানো গোছানো ছোট্ট ঘরে কয়েকটি সাহেবের ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করিয়া খেলা করিতেছে—সবই অদ্ভুত, সবই সুন্দর বলিয়া মনে হয়। আলোকোজ্জ্বল রেস্তোরাঁটায় অনবরত লোকজন ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে, মোটর হর্ণের আওয়াজ, মোটর বাইকের শব্দ, একখানা রিক্সা গাড়ি ঠুং ঠুং করিতে করিতে চলিয়া গেল—অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—যেন এসব সে কখনও দেখে নাই।

সুরেশ্বরকে বলিল—দেখুন জানালার ধারে এসে—ঐ যে নক্ষত্রটা দেখছেন, আজ ক'বছর ধরে ওটাকে উঠতে দেখেছি ঘন বন-জঙ্গল-ভরা পাহাড়ের মাথার ওপরে। আজ ওটাকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর বাড়ির মাথার ওপরে উঠতে দেখে কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। এই তো পৌনে দশটা রাত ? এ সময় গত পাঁচ বৎসর শুধু আমি জঙ্গল পাহাড-আর ভেড়িয়ার ডাক, কখনো কখনো বাঘের ডাকও—। আর কি loneliness ! শহরে বসে সে সব বোঝা যাবে না।

সুরেশ্বরও নিজের কথা বলিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন কলেজের অধ্যাপক, বিবাহ করিয়াছে কলিকাতায়। সম্প্রতি শালীর বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছে। বলিল—ছ্যাখ ভাই, তোমার ও জীবন একবার আস্বাদ করতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু তখন কি জানতুম বিয়ে এমন জিনিস হয়ে দাঁড়াবে ? যদি কিছু করতে চাও জীবনে বিয়ে ক'রো না কখনও, বলে দিলুম। বিয়ে করো নি ত ?

অপু হাসিয়া বলিল—ওঃ, আমি ভাবছি আপনার এ লেকচার যদি বৌদি শুনতেন !···

—না না, শোনো। সত্যি বলছি, সে উনিশ-শো পনেরো সালের সুরেশ্বর আর নই আমি। সংসারের হাড়িকাঠে যৌবন গিয়েছে, শক্তি গিয়েছে, স্বপ্ন গিয়েছে, জীবনটা বৃথা খুইয়েছি—কত কি করবার ইচ্ছে ছিল, ওঃ যেদিন এম. এ. ডিপ্লোমাটা নিয়ে কন্‌ভোকেশন হল থেকে বেরুলাম, মনে আছে মাঘের শেষ, গোলদীঘির দেবদারু গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, সবে দখিনা হাওয়া শুরু হয়েছে, গাউন সমেত এক দোকানে গিয়ে ফটো ওঠালুম, কি খুশী ! মনে হ'ল, সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায় ! ফটোখানা আজও আছে—চেয়ে দেখে ভাবি, কি ছিলুম, কি হয়ে দাঁড়িয়েছি ! পাড়াগাঁয়ের কলেজে তিন-শো চব্বিশ দিন একই কথা আওড়াই, দলাদলি করি, প্রিন্সিপ্যালের মন যোগাই, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করি, ছেলেদের ডাক্তার দেখাই, এর মধ্যে মেয়ের বিয়ের ভাবনাও ভাবি—না না, তুমি হেসো না, এসব ঠাট্টা নয়।

অপু বলিল—এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লেন কেন হঠাৎ সুরেশ্বরদা—এক পেয়ালা কফি—

—না না তোমাকে পেয়ে সব বললুম, কারুর কাছে বলি নে, কে বুঝবে, তারা সবাই দেখছে দিব্যি চাকরি করছি, মাইনে বাড়ছে, তবে বেশই আছি। আমি যে মরে যাচ্ছি, তা কেউ বুঝবে না।

রেস্তোরাঁ হইতে বাহির হইয়া পরস্পর বিদায় লইল। অপু বলিল—জানেন তো—In each of us a child has lived and a child has died—a child of promise, who never grew up—কিন্তু জীবনটা অদ্ভুত জিনিস সুরেশ্বরদা—অত সহজে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আচ্ছা আসি, বড় আনন্দ পেলুম আজ। যখন প্রথম কলকাতায় পড়তে আসি, জায়গা ছিল না, তখন আপনারা জায়গা দিয়েছিলেন, সে কথা ভুলি নি এখনও।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে ঘুমাইয়া কাটাইল। বৈকালের দিকে ভবানীপুরের লীলার মামার বাড়ি গেল। অনেক দিন সে লীলার কোন সংবাদ জানে না—দূর হইতে লাল ইটের বাড়িটা চোখে পড়িতেই একটা আশা ও উদ্বেগে বুক টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল, লীলা এখানে আছে, না নাই—যদি গিয়া দেখে সে আছে! সেই একদিন দেখা হইয়াছিল অপর্ণার মৃত্যুর পূর্বে। আজ আট বৎসর হইতে চলিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন দিন দেখা হয় নাই।

প্রথমেই দেখা হইল লীলার ভাই বিমলেন্দুর সঙ্গে। সে আর বালক নাই, খুব লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের চেহারা অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে। বিমলেন্দু প্রথমটা যেন অপুকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বৈঠকখানার পাশের ঘরে লইয়া বসাইল। দু-পাঁচ মিনিট এ-কথা ও-কথার পরে অপু যতদূর সম্ভব সহজ স্বরে বলিল—তারপর তোমার দিদির খবর কি—এখানে না শ্বশুরবাড়ি?

বিমলেন্দু কেমন একটা আশ্চর্য সুরে বলিল—ও, ইয়ে আসুন আমার সঙ্গে—চলুন।

কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় অপুর মন ভরিয়া উঠিল, ব্যাপার কি? একটু পরে গিয়া বিমলেন্দু রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া নীচু সুরে বলিল—দিদির কথা কিছু শোনেন নি আপনি?

অপু উদ্বিগ্নমুখে বলিল—না—কি? লীলা আছে তো?

—আছেও বটে, নেইও বটে। সে সব অনেক কথা, আপনি ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড বলে বলছি। দিদি ঘর ছেড়েছে। স্বামী গোড়া থেকেই ঘোর মাতাল—অতি কু-চরিত্র। বেন্টিক স্ট্রীটের এক ইহুদী মেয়েকে নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রে দিলে—তাকে নিজের বাসাতে রাত্রে নিয়ে যেতে শুরু করলে। দিদিকে

জানেন তো? তেজী মেয়ে, এ সব সহ্য করার পাত্রী নয়—সেই রাত্রেই ট্যাক্সি ডাকিয়ে পদ্মপুকুরে চলে আসে নিজের ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে। মাস দুই পর একদিন দাদাবাবু এল, মেয়েকে সিনেমা দেখাবার ছুতো ক'রে নিয়ে গেল জব্বলপুরে—আর দিদির কাছে পাঠায় না। তারপর দিদি যা করেছে—সে যে আবার দিদি করতে পারত তা কখনও কেউ ভাবে নি। হীরক সেনকে মনে আছে? সেই যে ব্যারিস্টার হীরক সেন, আমাদের এখানে পার্টিতে দেখেছেন অনেকবার। সেই হীরক সেনের সঙ্গে দিদি একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। একবৎসর কোথায় রইল—আজকাল ফিরে এসেছে, কিন্তু হীরক সেনকে ছেড়েছে। একা আলিপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। এ বাড়িতে তার নাম আর করার উপায় নেই। মা কাশীবাসিনী হয়েছেন, আর আসবেন না।

কথা শেষ করিয়া বিমলেন্দু নিজেকে একটু সংযত করার জন্য বোধ হয় একটু চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল,—হারক সেন কিছু না—এ শুধু তার একটা শোধ তোলা মাত্র, সেন তো শুধু উপলক্ষ। আচ্ছা, তবে আসি অপূর্ববাবু, এখন কিছু দিন থাকবেন তো এখানে?—বিমলেন্দু চলিয়া যায় দেখিয়া অপু কথা খুঁজিয়া পাইল, তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিয়া অকারণে বলিল,—শোনো, শোনো, লীলা আলিপুরে আছে তা হলে?

এ প্রশ্ন সে করিতে চাহে নাই, সে জানে এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। কিন্তু এক সঙ্গে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কোন্‌টা সে জিজ্ঞাসা করিবে?

বিমলেন্দু বলিল,—এতে আমাদের যে কি মর্মান্তিক—বর্ধমানে আমাদের বাড়িব সেই নিস্তারিণী ঝিকে মনে আছে? সে দিদিকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছে, পূজোর সময় বাড়ি গেলুম, সে ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল। সে-বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত করার জো নেই। রমেনদা আজকাল বাড়ির মালিক বুঝলেন না? দিদিও সুখে নেই, বলবেন না কাউকে, আমি লুকিয়ে যাই, এত কাঁদে মেয়ের জন্যে! হীরক সেন দিদির টাকাগুলো দু হাতে উড়িয়েছে, আবার বলছিল বিলেতে বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই লোভ দেখিয়েই নাকি টানে—দিদি আবার তাই বিশ্বাস করত। জানেন তো দিদিরও ঝোঁক আছে, চিরকাল।

বিমলেন্দু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, অপু আবার গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—তুমি মাঝে মাঝে কোন সময়ে যাও?—বিমলেন্দু বলিল,—রোজ যে যাই তা নয়, বিকেলে দিদি মোটরে বেড়াতে আসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে, ঐখানে দেখা করি।

বিমলেন্দু চলিয়া গেলে অপু অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে রসা রোডে আসিয়া পড়িল—কি ভাবিতে ভাবিতে সে শুধুই হাঁটিতে লাগিল। পথের ধারে একটা পার্ক, ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে। দড়ি ঘুরাইয়া ছোট মেয়েরা লাফাইতেছে, সে পার্কটায় ঢুকিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিল। লীলার উপর রাগ বা অভিমান কোনটাই হইল না, সে অনুভব করিল, এত ভালবাসে নাই সে কোনদিনই লীলাকে। এই আট বৎসরে লীলা তো তাহার কাছে অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ পর্যন্ত ভাল মনে হয় না, অথচ মনের কোন্ গোপন অন্ধকার কোণে এত ভালবাসা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার জন্য! ভাবিল দাদামশাইয়ের যত দোষ, কে এ বিয়ে দিতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল তাঁকে? বেচারী লীলা! সবাই মিলে ওর জীবনটা নষ্ট করে দিলে।

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবার পরে সে বাসা বদলাইয়া অন্য এক বোর্ডিং-এ গিয়া উঠিল। পুরানো দিনের কষ্টগুলা আবার সবই আসিয়া জুটিয়াছে—একা এক ঘরে থাকিবার মত পয়সা হাতে নাই, অথচ দুই তিনটি কেরানীবাবুর সঙ্গে এক ঘরে থাকা আজকাল তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। লোক তাঁহারা ভালই, অপুর চেয়ে বয়েস অনেক বেশী, সংসারী, ছেলেমেয়ের বাপ। ব্যবহারও তাঁহাদের ভাল। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদের মনের ধারা যে-পথ অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে অপু তাহার সহিত আদৌ পরিচিত নয়। সে নির্জনতাপ্রিয়, একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, সেইটাই এখানে হইবার জো নাই। সে বৈকালের দিকে বারান্দাটাতে সবে আসিয়া বসিয়াছে—কেশববাবু হুঁকা হাতে পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—এ যে অপূর্ববাবু, একাটি বসে আছেন? চৌধুরী-ব্রাদার্স বুঝি এখনও অফিস থেকে ফেরেন নি? আজ শোনেন নি বুঝি মোহনবাগানের কাণ্ডটা? আরে রামোঃ—শুনুন তবে—

কলিকাতা তাহার পুরাতন রূপে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই ধূলা, ধোঁয়া, গোলমাল, একঘেয়েমি, সঙ্কীর্ণতা, সব দিনগুলা এক রকমের হওয়া—সেই সব।

সে চলিয়া আসিত না, কিংবা হয়ত আবার এতদিন চলিয়া যাইত, মুশকিল এই যে, মিঃ রায়চৌধুরীও ওখানকার কাজ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী গড়িবার চেষ্টায় আছেন, অপুকে তাঁহার আফিসে কাজ দিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু অপু বসিয়া ভাবিতেছিল, গত ছ' বছরের জীবনের পরে আবার কি সে অফিসের ডেস্কে বসিয়া কেরানী-

গিরি করিতে পারিবে? এদিকে পয়সা ফুরাইয়া আসিল যে! না করিলেই বা চলে কিসে?

সেখানে থাকিতে এই ছয় বৎসরে যা হইয়াছিল, অপু বোঝে এখানে তা চব্বিশ বৎসরেও হইত না। আর্টের নতুন স্বপ্ন সেইখানে সে দেখিয়াছে।

ওখানকার সূর্যাস্তের শেষ আলোয়, জনহীন প্রান্তরে, নিস্তব্ধ অরণ্যভূমির মায়ায়, অন্ধকার-ভরা নিশীথ রাত্রির আকাশের নীচে, শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসেভরা দুপুরের রোদে সে জীবনের গভীর রহস্যময় সৌন্দর্যকে জানিয়াছে।

কিন্তু কলিকাতার মেসে তাহা তো মনে আসে না—সে ছবিকে চিন্তায় ও কল্পনায় গড়িয়া তুলিতে গভীরভাবে নির্জন চিন্তার দরকার হয়—সেইটাই তাহার হয় না এখানকার মেস-জীবনে। সেখানে তাহার নির্জন প্রাণের গভীর, গোপন আকাশে সত্যের যে নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিস্মান্ হইয়া দেখা দিয়াছিল, এখানকার তরল জীবনানন্দের পর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তাহারা চিরদিনই অপ্রকাশ রহিয়া যাইত।

মনে আছে সে ভাবিয়াছিল, ঐ সৌন্দর্যকে, জীবনের ঐ অপূর্ব রূপকে সে যতদিন কালিকলমে বন্দী করিয়া দশজনের চোখের সামনে না ফুটাইতে পারিবে —ততদিন সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না—

আর একদিন সেখানে সে কি অদ্ভুত শিক্ষাই না পাইয়াছিল।

ঘোড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। এক জায়গায় বনের ধারে ঝোপের মধ্যে অনেক লতাগাছে গা লুকাইয়া একটা তেলাকুচা গাছ। তেলাকুচা বাংলার ফল —অপরিচিত মহলের একমাত্র পরিচিত বন্ধু, সেখানে দাঁড়াইয়া গাছটাকে দেখিতে বড় ভাল লাগিতেছিল।...তেলাকুচা লতার পাতাগুলা সব শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল একটা আধ-পাকা ফল। তারপর দিনের পর দিন সে ঐ লতাটার মৃত্যু-যন্ত্রণা লক্ষ্য করিয়াছে। ফলটা যতই পাকিয়া উঠিতেছে, বোঁটার গোড়ায় যে অংশ সবুজ ছিল, সেটুকু যতই রাঙা সিঁদুরে রং হইয়া উঠিতেছে, লতাটা, ততই দিন দিন হলদে শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া আসিতেছে।

একদিন দেখিল, গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটাও বোঁটা শুকাইয়া গাছে ঝুলিতেছে, তুল-তুলে পাকা, সিঁদুরের মত টুক-টুকে রাঙা—যে কোন পাখি, বনের বানর কি কাঠবিড়ালীর অতি লোভনীয় আহার্য। যে লতাটা এতদিন ধরিয়া ন' কোটি মাইল দূরের সূর্য্য হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল হইতে উপাদান লইয়া মৃত জড়পদার্থ হইতে এ উপাদেয় খাবার তৈয়ারী করিয়াছে, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে—

ঐ পাকা টুকটুকে ফলটাই তাহার জীবনের চরম পরিণতি! ফলটা পাখিতে কাঠবিড়ালীতে খাইবে, এজন্য গাছটাকে তাহারা ধন্যবাদ দিবে না; তেলাকুচা লতাটা, অজ্ঞাত, অখ্যাতই থাকিয়া যাইবে। তবুও জীবন তাহার সার্থক হইয়াছে—ঐ টুকটুকে ফলটাতে ওর জীবন সার্থক হইয়াছে! যদি ফলটা কেউ না-ই খায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া আরও কত তেলাকুচার জন্ম ঘোষণা করিবে, আর কত লতা, কত ফুল-ফল, কত পাখির আহার।

মন তখন ছিল অদ্ভুত রকমের তাজা, সবল, গ্রহণশীল, সহজ, আনন্দময়। তেলাকুচা-লতার এই ঘটনাটা তাহার মনে বড় ধাক্কা দিয়াছিল—সে কি ঐ সামান্য বন-ঝোপের তেলাকুচা-লতাটার চেয়েও হীন হইবে?... তাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নাই? সে জগতে কিছু দিবে না?

সেখানে কতদিন শালবনের ছায়ায় পাথরের উপর বসিয়া দুপুরে এ প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে!...কত নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁবুর বাহিরের ঘন নৈশ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই সব স্বপ্নই মনে জাগিত। বহু দূর, দূর ভবিষ্যতের শিরীষফুলের পাপড়ির মত নরম ও কচি-মুখ কত শত অনাগত বংশধরদের কথা মনে পড়িত, খোকার মুখখানা কি অপূর্ব প্রেরণা দিত সে সময়?—ওদের জীবনে কত দুঃখরাত্রের বিপদ আসিবে, কত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবে—তখন যুগান্তের এপার হইতে দৃঢ়হস্ত বাড়াইয়া দিতে হইবে তোমাকে—তোমার কত শত বিনিদ্র রজনীর মৌন জনসেবা, হে বিস্মৃত পথের মহাজন পথিক, একদিন সার্থক হইবে—অপরের জীবনে।

দুঃখের নিশীথে তাহার প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে—তা সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে, জীবনকে সে কি ভাবে দেখিল তা লিখিয়া যাইবে—

নিজের প্রথম বইখানির দিনে দিনে প্রবর্ধমান পাণ্ডুলিপিকে সে সস্নেহ প্রতীক্ষার চোখে দেখে—বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথা তাহার আগ্রহভরা বক্ষস্পন্দনে আশা, আনন্দের সঙ্গীত জাগায়—মা যেমন শিশুকে চোখের সম্মুখে কান্নাহাসির মধ্য দিয়া বাড়িতে দেখেন, দুরু-দুরু বক্ষে তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবেন—তেমনি।

বই-লেখার কষ্টটুকু করার চেয়ে বইয়ের কথা ভাবিতে ভাল লাগে। কাদের কথা বইয়ে লেখা থাকিবে—কত লোকের কথা। গরীবদের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না।

পথে ঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে কত অদ্ভুত ধরণের লোকের সঙ্গে

পরিচয় ঘটিয়াছে জীবনে—কত সাধু-সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারী, গায়ক, পুতুল-নাচওয়ালা, আম-পাড়ানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলে-মেয়ে—এদের কথা।

আজিকার দিন হইতে অনেক দিন পরে—হয়তো শত শত বৎসর পরে তাহার নাম যখন এ বছরের-ফোটা-শালফুলের মঞ্জুরীর মত—কিংবা তাহার ঘরের কোণের মাকড়সার জালের মত—কোথায় মিলাইয়া যাইবে, তখন তাহার কত অনাগত বংশধর কত সকালে সন্ধ্যায়, মাঠে, গ্রাম্য নদীতীরে, দুঃখের দিনে, শীতের সন্ধ্যায় অথবা অন্ধকার গহন নিস্তব্ধ দুপুর-রাত্রে, শিশির-ভেজা ঘাসের উপর তারার আলোর নীচে শুইয়া-শুইয়া তাহার বই পড়িবে —কিংবা বইয়ের কথা ভাবিবে।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশঙ্কাও জাগে। যদি কেউ না পড়ে। আবার ভাবে, পৃথিবীর কোন্ অতীতে আদিম যুগের শিল্পীদল দুর্গম গিরিগুহার অন্ধকারে বৃষ, বাইসন, ম্যামথ আঁকিয়া গিয়াছিল—প্রাচীনদিনের বিস্মৃত প্রতিভা এতকাল পর তাহার দাবি আদায় করিতেছে—নতুবা ক্যাণ্টাব্রিয়া, দর্দঞ্ ও পিবেনিজের পর্বতগুহাগুলায় দেশবিদেশের মনীষী ও ভ্রমণকারীদের এত ভিড় কিসের? তেলাকুচা লতাটা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে জীবন দিয়া ফলটাকে মানুষ করিয়া গিয়াছে যে! আত্মদানের ফল বৃথা যাইবে না। কত গাছ গজাইবে বীজে—

নিজের প্রথম বইখানি—মনে কত চিন্তাই আসে। অনভিজ্ঞ মন সবটাতেই অবাক হইয়া যায়, সবটাতেই গাঢ় পুলক অনুভব করে।

এই তাহার বই লেখার ইতিহাস।

কিন্তু প্রথম ধাক্কা খাইল বইখানার পাণ্ডুলিপি হাতে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া। অজ্ঞাতনামা লেখকের বই কেহ লওয়া দূরে থাকুক, ভাল করিয়া কথাও বলে না। একটা দোকানে খাতা রাখিয়া যাইতে বলিল। দিন পাঁচেক পরে তাহাদের একখানা পোস্টকার্ড পাইয়া অপু ভাল কাপড় পরিয়া, জুতা বুরুশ করিয়া বন্ধুর চশমা ধার করিয়া দুরু-দুরু বক্ষে সেখানে গিয়া হাজির হইল। অত ভাল বই তাহার—পড়িয়া হয়ত উহারা অবাক হইয়া গিয়াছে।

দোকানের মালিক প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বলিল—ও! ওহে সতীশ, এঁর সেই খাতাখানা এঁকে দিয়ে দাও তো—বড় আলমারির দেরাজে দেখো।

অপুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। খাতা ফেরত দিতে চায় কেন? সে বিবর্ণ মুখে বলিল—আমার বইখানা কি—

না। নতুন লেখকের বই নিজের খরচে তাহারা ছাপাইবে না। তবে যদি সে পাঁচ শত টাকা খবচ দেয়, তবে সে অন্য কথা। অপু অত টাকা কখনও এক জায়গায় দেখে নাই।

পরদিন সকালে বিমলেন্দু অপুব বাসায় আসিয়া হাজির। বৈকালে পাঁচটাব সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনেব মাঠে লীলা আসিবে, বিশেষ কবিয়া বলিযা দিয়াছে তাহাকে লইয়া যাইতে।

বৈকালে বিমলেন্দু আবার আসিল। দু'জনে মাঠে গিয়া ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিবার পর বিমলেন্দু একটা হলদে রঙের মোটর দেখাইয়া বলিল, ঐ দিদি আসছে—আসুন, গাছতলায় গাডি পার্ক করবে, এখানে ট্রাফিক পুলিশে আজকাল বড কডাকডি করে।

অপুব বুক টিপ্-টিপ্ কবিতেছিল। কি বলিবে, কি বলিবে সে লীলাকে?

বিমলেন্দু আগে আগে, অপু পিছনে পিছনে। লীলা গাডি হইতে নামে নাই, বিমলেন্দু গাডির জানালার কাছে গিয়া বলিল,—দিদি, অপূর্ববাবু এসেছেন, এই যে।—পরক্ষণেই অপু গাডিব পাশে দাঁডাইয়া হাসিমুখে বলিল—এই যে, কেমন আছ, লীলা?

সত্যই অপূর্ব সুন্দরী। অপুর মনে হইল, যে-কবি বলিয়াছেন্ সৌন্দর্যই একটা মহৎ গুণ, যে সুন্দর তাহার আর কোন গুণেব দরকার করে না, তিনি সত্যদর্শী, অক্ষরে অক্ষরে তাঁহাব উক্তি সত্য।

তবুও আগের লীলা আর নাই, একটু মোটা হইয়া পডিয়াছে, মুখের সে তরুণ লাবণ্য আর কই? মুখেব পরিণত সৌন্দর্য ঠিক তাহার মা মেজবৌরানীর এ বয়সে যাহা ছিল তাই, সেই ছেলেবেলায় বর্ধমানের বাটীতে দেখা মেজ-বৌরানীর মুখেব মত। উদ্দাম লালসামাখা সৌন্দর্য নয়—শান্ত, বরং যেন কিছু বিষণ্ন।

বাডির বাহির হইয়া গিয়াছে যে মেয়ে, তাহার ছবির সঙ্গে অপু কিছুতেই এই বিষণ্ননয়না দেবীমূর্তিকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। লীলা ব্যস্ত হইয়া হাসিমুখে বলিল—এসো অপূর্ব এসো। তুমি তো আমাদের ভুলেই গিয়েচ একেবারে। উঠে এসে বসো। চলো, তোমাকে একটু বেডিয়ে নিয়ে আসি। শোভা সিং, লেক—

লীলা মধ্যে বসিল, ও-পাশে বিমলেন্দু, এ-পাশে অপু, অপুর মনে পড়িল বাল্যকাল ছাড়া লীলার এত কাছে সে আর কখনও বসে নাই। বার বার

লীলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। এতকাল পরে লীলাকে আবার এত কাছে পাইয়াছে—বার বার দেখিয়াও যেন তৃপ্তি হইতেছিল না। লীলা অনর্গল বকিতেছিল, নানা রকম মোটরগাড়ির তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছিল, মাঝে মাঝে অপুর সম্বন্ধে এটা-ওটা প্রশ্ন করিতেছিল। লেক দেখিয়া অপু কিন্তু নিরাশ হইল। সে মনে মনে ভাবিল—এই লেক। এরই এত নাম! এ কলকাতার বাবুদের ভাল লাগিতে পারে—ভারী তো! লীলা আবার এরই এত সুখ্যাতি করছিল—আহা, বেচারী কলকাতা ছেড়ে বিশেষ কোথাও তো যায় নি!—লীলা পাছে অপ্রতিভ হয় এই ভয়ে সে নিজের মতটা আর ব্যক্ত করিল না। একটা নারিকেল গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা—সেখানে দু'জনে বসিল। বিমলেন্দু মোটর লইয়া লেক ঘুরিতে গেল। লীলা হাসিমুখে বলিল—তারপর, তুমি নাকি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলে?

—তোমার শ্বশুর বাড়ির দেশে গিয়েছিলুম—জব্বলপুরের কাছে।—বলিয়া ফেলিয়া অপু ভাবিল কথাটা বলা ভাল হয় নাই, হয় তো লীলার মনে কষ্ট হইবে—ছিঃ—

কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা ঐ দ্বীপ-মতন ব্যাপারগুলো—ওতে যাবার পথ নেই···

—সাঁতার দিয়ে যাওয়া যায়। তুমি তো ভাল সাঁতার জানো—না? ও-সব কথা যাক—এতদিন কোথায় ছিলে, কি করছিলে বলো। তোমাকে দেখে আজ এত খুশী হয়েছি!···আমার বাসায় এসো আলিপুরে—চা খাবে। একটু তামাটে রঙ হয়েছে কেন?···রোদে ঘুরে ঘুরে বুঝি—আচ্ছা, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

অপু একটু হাসিল। কোন নাটুকে ধরণের কথা সে মুখে বলিতে পারে না। আর এই সময়েই যত মুখচোরা রোগ আসিয়া জোটে! কতকাল পরে তো লীলাকে একা কাছে পাইয়াছে—কিন্তু মুখে কথা জোগায় কৈ?···কত কথা লীলাকে বলিবে ভাবিয়াছিল—এখন লীলাকে কাছে পাইয়া সে-সব কথা মুখ দিয়া তো বাহির হয়ই না—বরং নিতান্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হয়।

হঠাৎ লীলা বলিল—হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি নাকি বই লিখেছ? একদিন আমাকে দেখাবে না, কি লিখলে? আমি জানি তুমি একদিন বড় লেখক হবে, তোমার সেই ছেলেবেলার গল্প লেখার কথা মনে আছে? তখন থেকেই জানি।

পরে সে একটা প্রস্তাব করিল। বিমলেন্দুর মুখে সে শুনিয়াছে, বইওয়ালারা বই লইতে চায় না—ছাপাইতে কত খরচ পড়ে? এ বই ছাপাইয়া বাহির

করিবার সমুদয় খরচ দিতে সে রাজী।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে অপুর সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের ঢেউ খেলিয়া গেল। সব খরচ? যত লাগে! তবুও আজ সে মুখে কিছু বলিল না।

অপুর মনে লীলার জন্য একটা করুণা ও অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল, ঠিক পুরাতন দিনের মত। লীলারও কত আশা ছিল আর্টিষ্ট হইবে, ছবি আঁকিবে, অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সে তাহারই মত কত কি স্বপ্নের জাল বুনিত। এখন শুধু নতুন নতুন মোটর গাড়ি কিনিতেছে, সাহেবী দোকানে লেস্ কিনিয়া বেড়াইতেছে—পুরাতন দিনের যজ্ঞবেদীতে আগুন কই, নিভিয়া গিয়াছে। যজ্ঞ কিন্তু অসমাপ্ত। কৃপার পাত্র লীলা। অভাগিনী লীলা!

ঠিক সেই পুরাতন দিনের মত মনটি আছে কিন্তু। তাহাকে সাহায্য করিতে মায়ের-পেটের-মমতাময়ী-বোনের মতই হাত বাড়াইয়া দিয়াছে অমনি। আশৈশব তাহার বন্ধু······তাহার সম্বন্ধে অন্ততঃ ওর মনের তারটি খাঁটি সুরেই বাজিল চিরদিন। এখানেও হয়ত করুণা, মমতা, অনুকম্পা—ওদেরই বাড়িতে না তাহার মা ছিল রাঁধুনী, কে জানে হয়তো কোন শুভ মুহূর্তে তাহার হীনতা, দৈন্য, অসহায় বাল্যজীবন, বড়লোকের মেয়ে লীলার কোমল বাল্য-মনে ঘা দিয়াছিল, সহানুভূতি, করুণা, মমতা জাগাইয়াছিল। সকল সত্যকার ভালবাসার মশলা এরাই—এরা যেখানে নাই, ভালবাসা সেখানে মাদকতা আনিতে পারে, মোহ আনিতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়িত্বের স্নিগ্ধতা আনে না।

সে ভাবিল, লীলার মনটা ভাল বলে সেই সুযোগে সবাই ওর টাকা নিচ্ছে। ও বেচারী এখনও মনে সেই ছেলেমানুষটি আছে—আমি ওকে exploit করতে পারব না। দরকার নেই আমার বই-ছাপানোয়।

এদিকে মুশকিল। হাতের টাকা ফুরাইল! চাকুরিও জোটে না।

মিঃ রায়চৌধুরী অনবরত ঘুরাইতে ও হাঁটাইতে লাগিলেন। অপু যেখানে ছিল সেখানে আবার এঁরা ম্যাঙ্গানিজের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, অপু ধরিয়া পড়িল তাহাকে আবার সেখানে পাঠানো হউক। অনেকদিন ঘোরানোর পর মিঃ রায়চৌধুরী একদিন প্রস্তাব করিলেন, সে আরও কম টাকা বেতনে সেখানে যাইতে রাজী আছে কি না? অপমানে অপুর চোখে জল আসিল, মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। একথা বলিতে উহারা আজ সাহস করিল শুধু এইজন্য যে উহারা জানে যতই কমে হউক না কেন সে সেখানে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইবে, অর্থের জন্য নয়—অর্থের জন্য এ অপমান সে সহ্য করিবে না নিশ্চয়।

কিন্তু···

শরতের প্রথম—নিচের অধিত্যকায় প্রথম আব্‌লুস ফল পাকিতে শুরু

করিয়াছে বটে, কিন্তু মাথার উপরে পর্বত সানুর উচ্চস্থানে এখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। টেঁপারী বনে এখনও ফল পাকিয়া হলদে হইয়া আছে, ভালুক দল এখনও সন্ধ্যার পরে টেঁপারী খাইতে নামে, টিয়া পাখির ঝাঁক সারাদিন কলরব করে, আরও উপরে যেখানে হইতে বাদাম ও সেগুন বনের শুরু, সেখানে অজস্র সাদা মাজুফল, আরও উপরে রিঠাগাছে থোলো-থোলো ফুল ধরিয়াছে, এমন কি ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে দু-একটা রিঠাগাছে এখনও দু-এক ঝাড দেরিতে ফোটা রিঠা ফুলও পাওয়া যাইতে পারে।

সেখানকার সেই বিরাট রুক্ষ আরণ্যভূমি, নক্ষত্রালোকিত আলো-আঁধার, উদার জনহীন বিশাল তৃণভূমি, সেই টানা একঘেয়ে পশ্চিমে হাওয়া, সেই অবাধ জ্যোৎস্না, স্বাধীনতা, প্রসারতা, সেই বিরাট নির্জনতা তাহাকে আবার ডাকিতেছে। এক এক সময় তাহার মনে হয় কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছ-পালাকে দূব করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিক্স্-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে। ধরাবিদ্রবেণকারী সভ্যতাদর্পী মানুষ যে স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পর্বতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশের রাজার নামে, হ্রদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে, ওর শুশুক, পাখি, শিল, বলগা হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে—তেল, ব্যবসা, চামড়ার লোভে, ওর মহিমময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।

এ যেন এমন একটা শক্তি যা বিপুল, বিশাল, বিরাট। অসীম ধৈর্যের ও গাম্ভীর্যের সহিত সে সংহৃত শক্তিতে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, কারণ সে জানে তাহার নিজ শক্তির বিপুলতা। অপু একবার ছিন্দওয়ারার জঙ্গলে একটা খনি ও সাইডিং লাইন তৈরি হওয়ার সময়ে আরণ্যভূমির তপস্যাস্তব্ধ, দূরদর্শী, রুদ্রদেবেব মত এই মৌন, গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। ঐ শক্তিটা ধীরভাবে শুধু সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।

অপুর কিন্তু চাকরি হইল না। এবার একা মিঃ রায়চৌধুরীর হাত নয়। জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানীর অন্যান্য ডাইরেক্টররা নাকি রাজী হইল না। হয়ত বা তাহারা ভাবিল, এ লোকটার সেখানে ফিরিবার এত আগ্রহ কেন? পুরানো লোক, চুরির সুলুক-সন্ধান জানে, সেই লোভেই যাইতেছে। তা ছাড়া ডাইরেক্টররাও মানুষ, তাদেরও প্রত্যেকেরই বেকার ভাগনে, ভাইপো, শালীর

ছেলে আছে।

সে ভাবিল, চাকরি না হয়, বইখানা বাহির করিয়া দেখিবে চলে কিনা। মাসিক পত্রিকায় দু-একটা গল্পও দিল, একটা গল্পের বেশ নাম হইল, কিন্তু টাকা কেহ দিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল—অপর্ণার গহনাগুলি শ্বশুর-বাড়িতে আছে, সেগুলি সেখান হইতে এই সাত-আট বৎসর সে আনে নাই। সেগুলি বেচিয়া তো বই বাহির করার খরচ যোগাড় হইতে পারে! এই সহজ উপায়টা কেন এতদিন মাথায় আসে নাই?

সে লীলার কাছে আরও কয়েকবার গেল, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করিল না। উপন্যাসের খাতাখানা লইয়া গিয়া পড়িয়া শোনাইল। লীলা খুব উৎসাহ দেয়। একদিন লীলা হিসাব করিতে বসিল বই ছাপাইতে কত লাগিবে। অপু ভাবিল—অন্য কেউ যদি দিত হয়ত নিতুম, কিন্তু লীলা বেচারীর টাকা নেব না।

একদিন সে হঠাৎ খবরের কাগজে তাহার সেই কবিরাজ বন্ধুটির ঔষধের দোকানের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল। সেইদিনই সন্ধ্যার পর সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল, সুকিয়া স্ট্রিটের একটা গলিতে দোকান। বন্ধুটি বাহিরেই বসিয়া ছিল, দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ—তুমি! তুমি বেঁচে আছ দাদা?

অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, কম খুঁজি নি তোমায়! ভাগ্যিস আজ তোমার শিল্পাশ্রমের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল, তাই তো এলুম! তারপর কি খবর বল? দোকানের আসবাবপত্র দেখে মনে হচ্ছে, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে!

বন্ধু খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা এ-গল্প ও-গল্প করিল। পরে বলিল—এসো, বাসায় এসো।

ছোট সাদা রঙের দোতলা বাড়ি, নীচের উঠানে একটা টিনের শেডের তলায় আট-দশটি-লোক কি সব জিনিস প্যাক্‌ করিতেছে, লেবেল আঁটিতেছে, অন্যদিকে একটা কল ও চৌবাচ্চা, আর একটা টিনের শেডে গুদাম। উপরে উঠিয়াই একটা মাঝারি হলঘর, দু'পাশে দু'টা ছোট-ছোট ঘর, বেশ সাজানো। একটা সেঠ্‌ টমাসের বড় ক্লক ঘড়ি দালানে টক্‌টক্‌ করিতেছে। বন্ধু ডাকিয়া বলিল—ওরে বিন্দু, শোন, তোর মাকে বল, এক্ষুণি দু'পেয়ালা চা দিতে।

অপু উৎসুকভাবে বলিল—তার আগে একবার বৌঠাকরুণের সঙ্গে দেখাটা করি—বিন্দুকে বল তাঁকে এদিকে একবার আসতে বলতে? না কি, এখন অবস্থা ফিরেছে বলে তিনি আর আমার সঙ্গে দেখা করবেন না?

কবিরাজ বন্ধু ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল—পরে নিম্নস্বরে অনেকটা যেন আপন মনেই বলিল—সে আর তোমার সঙ্গে দেখা করবে না ভাই। তাকে আর কোথায় পাবে? রমলা আর সে দুজনেই ফাঁকি দিয়েছে।

অপু অবাক মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

—এ মাঘে রমলা গেল, পরের শ্রাবণে সে গেল। ওঃ সে কি সোজা কষ্ট গিয়েছে ভাই? তখন ওদিকে কাবুলীর দেনা, এদিকে মহাজনের দেনা—যমে-মানুষ টানাটানি চলছে। তোমার কথা কত বলত। এই শ্রাবণে পাঁচ বচ্ছর হয়ে গিয়েছে! তারপরে বিয়ে করব না, করব না,—আজ বছর তিনেক হ'ল বস্তিবাটিতে—

তারপর বন্ধুর কথায় নতুন-বৌ চা ও খাবার লইয়া অপুর সামনেই আসিল। শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, কিশোরী মেয়েটি, চোখ মুখ দেখিয়া মনে হয় খুব চটপটে, চতুর। খাবার খাইতে গিয়া খাবারের দলা যেন অপুর গলায় আটকাইয়া যায়। বন্ধুটি নিজের কোন্ কালির বড়ি ও পাতা চায়ের প্যাকেটের খুব বিক্রী ও ব্যবসায়ের দিক হইতে এ-দুটি দ্রব্যের সাফল্যের গল্প করিতেছিল।

উঠিবার সময় বাহিরে আসিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—নতুন বৌটি দেখতে তো বেশ, এ-দিকেও বেশ গুণবতী না?

—মন্দ না কিন্তু বড মুখরা ভাই। আগের তাকে তো জানতে? সে ছিল ভাল মানুষ এর পান থেকে চুণ খসলেই—কি করি ভাই, তার ইচ্ছে ছিল না যে আবার—

ফুটপাতে একা পড়িয়াই অপুর মনে পড়িল, পটুয়াটোলার সেই খোলার বাড়ির দরজায় প্রদীপ হাতে হাস্যমুখী, নিরাভরণা, দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে - আজ ছ'বছর কাটিয়া গেলেও মনে হয় যেন কালকার কথা।

অপরাজিত একবিংশ পরিচ্ছেদ

কাজল বড় হইয়া উঠিয়াছে, আজকাল গ্রামের সীতানাথ পণ্ডিত সকালে একবেলা করিয়া পড়াইয়া যান, কিন্তু একটু ঘুমকাতুরে বলিয়া সন্ধ্যার পরে দাদামশায়ের অনেক বকুনি সত্ত্বেও সে পড়িতে পারে না, চোখের পাতা যেন জড়াইয়া আসে, অনেক সময় যেখানে-সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে—রাত্রে কেহ যদি ডাকিয়া খাওয়ায়, তবেই খাওয়া হয়। তা ছাড়া, বেশী রাত্রে খাইতে হইলে দাদামশায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়—সে এক বিপদ!

দাদামশায়ের সহিত পারতপক্ষে কাজল খাইতে বসিতে চাহে না। বড় ভাত ফেলে, ছড়ায়—গুছাইয়া খাইতে জানে না বলিয়া দাদামশায় তাকে খাইতে বসিয়া সহবৎ শিক্ষা দেন।

কাজল আলুভাতে দিয়া শুকনা ভাত খাইতেছে—দাদামশায় হাঁকিয়া বলিলেন—ডাল দিয়ে মাখো—শুধু ভাত খাচ্চ কেন?—মাখো—মেখে খাও—

তাড়াতাড়ি কম্পিত আনাড়ী হাতে ডাল মাখিতে গিয়া থালার কানা ছাড়াইয়া কিন্তু ডাল-মাখা ভাত মাটিতে পড়িয়া গেল। দাদামশায় ধমক দিয়া উঠিলেন—পড়ে গেল, পড়ে গেল—আঃ, ছোঁড়া ভাতটা পর্যন্ত যদি গুছিয়ে খেতে জানে!—তোল্ তোল্—খুঁটে খুঁটে তোল্—

কাজল ভয়ে ভয়ে মাটি-মাখা ভাতগুলি থালাব পাশ হইতে আবার থালার তুলিয়া লইল।

—বেগুন পটোল ফেলেছিস্ কেন?—ও খাবার জিনিস না?—সব একসঙ্গে মেখে নে—

খানিকটা পবে তাঁহাব দৃষ্টি পড়িল, কাজল উচ্ছেভাজা খায় নাই—তখন অম্বল দিয়া খাওয়া হইয়া গিয়াছে—তিনি বলিলেন—উচ্ছেভাজা খাস্‌নি?—খাও—ও। অম্বলমাখা ভাত ঠেলে বাখো। উচ্ছেভাজা তেতো বলিয়া কাজলের মুখে ভালো লাগে না—সে তাতে হাতও দেয় নাই। দাদামশায়ের ভয়ে অম্বল-মাখা ভাত ঠেলিয়া রাখিয়া তিক্ত উচ্ছেভাজা একটি একটি করিয়া খাইতে হইল—একটিও ফেলিবাব জো নাই—দাদামশায়ের সতর্ক দৃষ্টি। ভাত খাইবে কি কান্নায় কাজলেব গলায় ভাতের দলা আটকাইয়া যায়। খাওয়া হইয়া গেলে মেজ মামীমাব কাছে গিয়া বলিয়া কহিয়া একটা পান লয়—পান খুলিয়া দেখে কি কি মশলা আছে, পবে মিনতির সুরে একবার মেজ মামীমার কাছে একবার ছোট মামীমাব কাছে বলিয়া বেড়ায়—ইতি একটু কাৎ, ও মামীমা তোমার পায়ে পড়ি। একটু কাৎ দাও না—। কাঠ অর্থাৎ দারুচিনি। মামীমা ঝঙ্কার দিয়া বলেন—বোজ বোজ ডালচিনি চাই—ছেলে আবার শৌখিন কত।...উঃ, তায় আবার জিভ দেখা চাই—মুখ বাঙা হ'ল কিনা—

তবে পড়াশুনাব আগ্রহ তাহার বেশী ছাড়া কম নয়। বিশ্বেশ্বর মুহুরীর হাতবাক্সে কেশরঞ্জনের উপহারের দরুন গল্পের বই আছে অনেকগুলি। খুনী আসামী কেমন করিয়া ধরা পড়িল, সেই সব গল্প। আর পড়িতে ইচ্ছা করে আরব্য উপন্যাস, কি ছবি! কি গল্প! দাদামশায়ের বিছানার উপর একদিন পড়িয়া ছিল—সে উল্‌টাইয়া দেখিতেছে, টের পাইয়া বিশ্বেশ্বর মুহুরী কাড়িয়া লইয়া বলিল, এঃ আট বছরের ছেলের আবার নভেল পড়া? এইবার একদিন তোমার দাদামশায় শুনতে পেলে দেখো কি করবে।

কিন্তু বইখানা কোথায় আছে সে জানে—দোতলার শোবার ঘরের সেই কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকটার মধ্যে—একবার যদি চাবিটা পাওয়া যাইত।

সারারাত জাগিয়া পড়িয়া ভোরের আগেই তাহা হইলে তুলিয়া রাখে।

এ কয়েকদিন বৈকালে দাদামশায় বসিয়া বসিয়া তামাক খান, আর সে পণ্ডিতমশায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া পড়ে। সেই সময় পণ্ডিতমশায়ের পেছনকার অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপের উত্তর-ধারের সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা অদ্ভুত ঘটনায় রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়, ঘটনাটাও হয়ত খুব স্পষ্ট নয়, সে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে তো পারে না। কিন্তু দিদিমার মুখে শোনা গল্পের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রেরা নাম-না-জানা নদীর ধারে ঠিক এই সন্ধ্যা-বেলাটাতেই পৌছায় কোন্ রাজপুরীকে কাঁপাইয়া রাজকন্যাদের সোনার রথ বৈকালের আকাশপানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—সে অন্যমনস্ক হইয়া দেওয়ালের পাশে ঝুকিয়া আকাশটার দিকে চাহিয়া থাকে, কেমন যেন দুঃখ হয়—ঠিক সেই সময় সীতানাথ পণ্ডিত বলেন—দেখুন, দেখুন বাঁড়ুয্যেমশায়, আপনার নাতির কাণ্ডটা দেখুন, শ্লেটে বুড়্‌কে লিখতে দিলাম, তা গেল চুলোয়—হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছে দেখুন—এমন অমনোযোগী ছেলে যদি—

দাদামশায় বলেন—দিন না ধাঁ করে এক থাপ্পড় বসিয়ে গালে—হতভাগা ছেলে কোথাকার—হাড় জ্বালিয়েছে, বাবা করবে না খোঁজ, আমার ঘাড়ে এ বয়সে যত ঝুঁকি।

তবে কাজল যে দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা সবাই বলে। একদণ্ড সুস্থির নয়, সর্বদা চঞ্চল, একদণ্ড চুপ করিয়া থাকে না, সবদা বকিতেছে। পণ্ডিতমশায় বলেন—দেখ্‌ তো দলু কেমন অঙ্ক কষে? ওর মধ্যে অনেক জিনিস আছে—আর তুই অঙ্কে একেবারে গাধা।—পণ্ডিত পিছন ফিরিলেই কাজল মামাতো-ভাই দলুকে আঙুল দিয়া ঠেলিয়া চুপি চুপি বলে,—তো-তোর মধ্যে অনেক জিনিস আছে, কি জিনিস আছে রে, ভাত ডাল খি-খিচুড়ি···খিচুড়ি? হি-হি ইল্লি! খিচুড়ি খাবি, দলু?

দাদামশায়ের কাছে আবার নালিশ হয়।

তখন দাদামশায় ডাকিয়া শাস্তিস্বরূপ বানান জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন—বানান কর সূর্য। কাজল বানানটা জানে, কিন্তু ভয়জনিত উত্তেজনায় দরুন হঠাৎ তাহার তোতলামিটা বেশী করিয়া দেখা দেয়—দু'একবার চেষ্টা করিয়াও 'দন্ত স্য' কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিবে না বুঝিয়া অবশেষে বিপন্নমুখে বলে—তা-তালব্য শয়ে দীঘ্য-উকার—

ঠাস করিয়া এক চড় গালে। ফরসা গাল, তখনই দাড়িমের মত রাঙা হইয়া ওঠে, কান পর্যন্ত রাঙা হইয়া যায়। কাজলের ভয় হয় না, একটা নিষ্ফল অভিমান হয়—বাঃ রে, বানানটা তো সে জানে, কিন্তু মুখে যে আটকাইয়া যায়

তা তার দোষ কিসের? কিন্তু মুখে অত কথা বলিয়া বুঝাইয়া প্রতিবাদ বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার মত এতটা জ্ঞান তাহার হয় নাই—সবটা মিলিয়া অভিমানের মাত্রাটাই বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু অভিমানটা কাহার উপর সে নিজেও ভাল বোঝে না।

এই সময়ে কাজলের জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

সীতানাথ পণ্ডিতমশায় একটু-আধটু জ্যোতিষের চর্চা করিতেন। কাজলের পড়িবার সময় তাহার দাদামশায়ের সঙ্গে সীতানাথ পণ্ডিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন—পাঁজি দেখিয়া ঠিকুজি তৈয়ারী, জন্মের লগ্ন ও রোগ গণনা আয়ুষ্কাল নির্ণয় ইত্যাদি। আজ বছরখানেক ধরিয়া কাজল প্রায়ই এসব শুনিয়া আসিতেছে—যদিও সেখানে সে কোন কথা বলে না।

কার্তিক মাসের শেষ, শীত তখনও ভাল পড়ে নাই। বাড়ির চারিপাশে অনেক খেজুরবাগান, শিউলিরা কার্তিকের শেষে গাছ কাটিয়াছে। শীতের ঠাণ্ডা সান্ধ্য বাতাসে টাটকা খেজুর-রসের গন্ধ মাখানো থাকে।

কাজলদের পাড়ার ব্রহ্মঠাকরুন এই সময় কি রোগে পড়িলেন। ব্রহ্ম-ঠাকরুনের বয়স কত তা নির্ণয় করা কঠিন—মুড়ি ভাজিয়া বিক্রয় করিতেন, পতি-পুত্র কেহই ছিল না—কাজল অনেকবার মুড়ি কিনিতে গিয়াছে তাঁহার বাড়ি। অত্যন্ত খিট্‌খিটে মেজাজের লোক, বিশেষ করিয়া ছেলেপিলেদের দু'চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারিতেন না—দূর দূর করিতেন, উঠানে পা দিলে পাছে গাছটা ভাঙে, উঠানটা খুঁড়িয়া ফেলে—এই ছিল তাঁহার ভয়—কাজলকে বাড়িব কাছাকাছি দেখিলে বলিতেন—একটা যেন মগ—মগ একটা—বাড়ি যা বাপু—কঞ্চি-টঞ্চির খোঁচা মেরে বসবি—যা বাবু এখান থেকে। ঝালের চারাগুলো মাড়াস নে—

সেদিন দুপুরের পর তাহার মামাতো-বোন অরু বলিল—ব্রেহ্ম-ঠাকুমা মর-মর হয়েছে, সবাই দেখতে যাচ্ছে— যাবি কাজল?

ছোট্ট একতলা বাড়ির ঘর, পাড়ার অনেকে দেখিতে আসিয়াছে—মেজেতে বিছানা পাতা, কাজল ও অরু দোরের কাছে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। ব্রহ্মঠাকরুনকে আর চেনা যায় না, মুখের চেহারা যেমন শীর্ণ তেমনি ভয়ঙ্কর, চক্ষু কোটরগত, তাহার ছোট-মামা কাছে বসিয়া আছে, হারু কবিরাজ দাওয়ায় বসিয়া লোকজনের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে।

বৈকালে দু-তিনবার শোনা গেল ব্রহ্মঠাকরুনের রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।

কাজল কিছু বিস্মিত হইল। এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রহ্মঠাকরুন যাঁহাকে গামছা পরিয়া উঠানে গোবরজল ছিটাইতে দেখিয়া সে তখনই ভাবিত—

তাহার দাদামশায়ের মত লোক পর্যন্ত যাঁহাকে মানিয়া চলে—তাঁহার একি দশা হইয়াছে আজ!...এত অসহায়, এত দুর্বল, তাঁহাকে কিসে করিয়া ফেলিল?...

ব্রহ্মঠাকরুন সন্ধ্যার আগে মারা গেলেন। কাজলের মনে হইল পাড়াময় একটা নিস্তব্ধতা—কেমন একটা অবোধ্য বিভীষিকার ছায়া যেন সারা পাড়াকে অন্ধকারের মত গ্রাস করিতে আসিতেছে...সকলেরই মুখে যেন একটা ভয়ের ভাব।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়াছে। পাড়ার সকলে ব্রহ্মঠাকরুনের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার বাড়ির উঠানে সমবেত হইয়াছে! কাজলের দাদামহাশয়ও গিয়াছেন। কাজল ভয়ে ভয়ে খানিকটা দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল—কিন্তু ব্রহ্মঠাকরুনের বাড়ি পর্যন্ত যাইতে পারিল না—কিছু দূরে একটা বাঁশঝাড়ের নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। সেখান হইতে উঠানটা বা বাড়িটা দেখা যায় না—কথাবার্তার শব্দও কানে আসে না। বাতাস লাগিয়া বাঁশ ঝাড়ের কঞ্চিতে শব্দ হইতেছে—চারিধার নির্জন...কাজলের বুক দুরু-দুরু করিতেছিল.. একটা অদ্ভুত ধরনের ভাবে তাহার মন পূর্ণ হইল—ভয় নয়, একটা বিস্ময়-মাখানো রহস্যের ভাব...অন্ধকারে গা লুকাইয়া দু-একটা বাদুড় আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে...অন্যদিন এমন সময়ে বাদুড় দেখিলেই কাজল বলিয়া উঠে—বাদুড় বাদুড় মেথর, যা খাবি তা তেঁতর—

আজ উড়নশীল বাদুড়ের দৃশ্য তাহার মনে কৌতুক না জাগাইয়া সেই অজানা রহস্যের ভাবই যেন ঘনীভূত করিয়া তুলিল!—

ব্রহ্মঠাকরুন মারা গেলেন বটে—কিন্তু মৃত্যুকে কাজল এই প্রথম চিনিল। দিদিমা মারা গিয়াছিলেন কাজলের পাঁচবছর বয়সে—তাহাও গভীর রাত্রে—কাজল তখন ঘুমাইয়া ছিল—কিছু দেখে নাই—বোঝেও নাই। এবার মৃত্যুর বিভীষিকা, এই অপূর্ব রহস্য তাহার শিশু-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একা একা বেড়ায়, তেমন সঙ্গী-লেজুড় নাই—আর ঐ সব কথা ভাবে। একদিন তাহার মনে হইল যদি সেও ব্রহ্মঠাকরুনের মত মরিয়া যায়!...হাত-পায়ে যেন সে বল হারাইয়া ফেলিল,—সত্য, সে-ও হয়তো মারা যাইবে!...

দিনের পর দিন ভয়টা বাড়িতে লাগিল। একলা শুইয়া শুইয়া কথাটা ভাবে—নদীর বাঁধা ঘাটের পৈঠায় সন্ধ্যার সময় বসিয়া ঐ কথাই মনে ওঠে।... এই বড়দলের তীরে দিদিমার মত, ব্রহ্মঠাকরুনের মত তার দেহও একদিন পুড়াইতে—

কথাটা ভাবিতেই ভয়ে সর্বশরীর যেন অবশ হইয়া আসে...

কাজল তাহার জন্মের সালটা জানিত ; কিছুদিন আগে তাহার দাদামশায় সীতানাথ পণ্ডিতের কাছে কাজলের ঠিকুজি করাইয়াছিলেন—সে সে-সময় সেখানে ছিল। কিন্তু তারিখটা জানে না—তবে মাঘ মাসের শেষের দিকে, তা জানে।

একদিন সে দুপুরে চুপি চুপি কাছারিঘরে ঢুকিল। তাকের উপর রাশীকৃত পুরানো পাঁজি সাজানো থাকে। চুপি চুপি সবগুলি নামাইয়া ১৩৩০ সালের পাঁজিখানা বাছিয়া লইয়া মাঘ মাসের শেষের দিকের তারিখগুলো দেখিতে লাগিল—কি সে বুঝিল সে-ই জানে—তাহার মনে হইল ২৫-শে মাঘ বড় খারাপ দিন। ঐ দিন জন্মিলে আয়ু কম হয়, খুব কম। তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল—ঐ দিনটাতেই হয়তো সে জন্মিয়াছে···ঠিক।···

বড় মামীমাকে বৈকালে জিজ্ঞাসা করিল—আমি জন্মেছি কত তারিখে মামীমা ?···বড় মামীমার তো তাহা ভাবিয়া ঘুম নাই ! তিনি জানেন না। বড় মামাতো ভাই পটলকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি কবে জন্মেছি জানিস্ পটলদা ?···পটলের বয়স বছর দশেক, সে কি করিয়া জানিবে ? দাদামশায়ের কাছে ঠিকুজি আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না। একদিন সীতানাথ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলেছেন—কেন, সে খোঁজে তোমার কি দরকার ?···সে থাকিতে না পারিয়া সোজাসুজি বলিয়াই ফেলিল—আ-আমি ক-কতদিন বাঁচব, পণ্ডিতমশায় ?···

সীতানাথ পণ্ডিত অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—এমন কথা কোন ছেলের মুখে কখনও তিনি শোনেন নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়া কহিলেন···শুনেছেন ও বাঁড়ুয্যেমশায়, আপনার নাতি কি বলছে ? শশীনারায়ণ শুনিয়া বলিলেন—এদিকে তো দেখছি বেশ ইঁচড়-পাকা ? দু'মাসের মধ্যে আজও তো দ্বিতীয় নামতা রপ্ত হ'ল না—বলো বারো পোনেরং কত ?

কাজলের ভয়কে কেহই বুঝিল না। কাজল ধমক খাইল বটে, কিন্তু ভয় কি তাতে যায় ? এক এক সময়ে তাহার মন হাঁপাইয়া ওঠে—কাহাকেও বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না···এখন সে কি করে ? এখানে তাহার কথা কেহ শুনিবে না, রাখিবে না তাহা সে বোঝে। তাহার বাবাকে বলিতে পারিলে হয় তো উপায় হইত।

বর্ষাকালের শেষের দিকে দু-একবার জ্বরে পড়ে। জ্বর আসিলে উপরের ঘরে একলাটি একটা কিছু টানিয়া গায়ে দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। কাহারও পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া বলে—ও মামীমা জ্বর এয়েচে আমার—একটা

লে-এ এ-প বে-বের করে দাও না ?—ইচ্ছা করে কেহ কাছে বসে, কিন্তু বাড়ির এত লোক সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। জ্বরের প্রথম দিকে কিন্তু চমৎকার লাগে, কেমন যেন একটা নেশা, সব কেমন অদ্ভুত লাগে। ঐ জানালার গরাদটাতে একটা ডেও-পিঁপড়ে বেড়াইতেছে, চুনে-কালিতে মিশাইয়া জানালার কবাটে একটা দাড়িওয়ালা মজার মুখ। জানালার বাহিরে নারিকেল গাছে নারিকেলসুদ্ধ একটা কাঁদি ভাঙ্গিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। নিচে তাহার ছোট মামাতো বোন অরু, 'ভাত ভাত' করিয়া চিৎকার শুরু করিয়াছে—বেশ লাগে। কিন্তু শেষের দিকে বড় কষ্ট, গা জ্বালা করে, হাত-পা ব্যথা করে, সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করে, মাথা যেন ভার বোঝা, এ সময়টা কেহ কাছে আসিয়া যদি বসে!

কাছারির উত্তর গায়ে পথের ধারে এক বুড়ীর খাবারের দোকান, বারো মাস খুব সকালে উঠিয়া সে তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরি ভাজে। কাজল তাহার বাঁধা খরিদ্দার। অনেকবার বকুনি খাইয়াও সে এ লোভ সামলাইতে সমর্থ হয় নাই। সারিবার দিন-দুই পরেই কাজল সেখানে গিয়া হাজির। অনেকক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া ফুলুরিভাজা দেখিল, পুঁইপাতার বেগুনি, জবাপাতার তিল-পিটুলি। অবশেষে সে অপ্রতিভ মুখে বলে—আমায় পুঁইপাতার বেগুনি দাও না দিদিমা? দেবে? এই নাও পয়সাটা। বুড়ী দিতে চায় না, বলে—না খোকা দাদা, সেদিন জ্বর থেকে উঠেছ, তোমার বাড়ির লোক শুনলে আমায় বকবে—কিন্তু কাজলের নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে দিতে হয়।

একদিন বিশ্বেশ্বর মুহুরীর কাছে ধরা পড়িয়া যায়। বুড়ীর দোকান হইতে বাহির হইয়া জবাপাতার তিল-পিটুলির ঠোঙা-হাতে খাইতে খাইতে পুকুর পাড় পর্যন্ত গিয়াছে—বিশ্বেশ্বর আসিয়া ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল বলিল—আচ্ছা পাজি ছেলে তো? আবার ঐ তেলে-ভাজা খাবারগুলো রোজ রোজ খাওয়া।

কাজল বলিল—আমি খা-খা-খাচ্ছি তা তো-তোমার কি?

বিশ্বেশ্বর মুহুরী হঠাৎ আসিয়া তাহার কান ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—আমার কি, বটে?—রাগে অপমানে কাজলের মুখ রাঙা হইয়া গেল। ইহাদের হাতে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা তাহার এই প্রথম। সে ছেলেমানুষি সুরে চিৎকার করিয়া বলিল—মুখপুড়ি, হতচ্ছাড়া তু-তুমি মারলে কেন?

বিশ্বেশ্বর তাহার গালে জোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—আমি কেন, এসো তো কর্তার কাছে একবার—এসো।

কাজল পাগলের মত যা-তা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। চড়ের চোটে

তখন তাহার কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে এবং বোধ হয় এ অপমানের কোনও প্রতিকার এখানকার কাহারও নিকট হইতে হইবার আশা নাই, মুহূর্ত মধ্যে ঠাওরাইয়া বুঝিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—আমার বা-বাবা আসুক, বলে দেব, দেখো—দেখো তখন—

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা যাও, তোমার বাবার ভয়ে আমি একেবারে গর্তের মধ্যে যাব আর কি ? আজ পাঁচ বছরের মধ্যে খোঁজ নিলে না, ভারী তো—। হয়ত একথা বলিতে বিশ্বেশ্বর সাহস করিত না, যদি সে না জানিত তাঁহার এ জামাইটির প্রতি কর্তার মনোভাব কিরূপ।

কাজল রাগের মাথায় ও কতকটা পাছে বিশ্বেশ্বর দাদামশায়ের কাছে ধরিয়া লইয়া যায় সেই ভয়ে, পুকুরের দক্ষিণ-পাড়ের নারিকেল বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—দেখো না, দেখো তুমি, বাবা আসুক না—পরে পিছন দিকে চাহিয়া খুব কড়া কথা শুনানো হইতেছে এমন সুরে বলিল—তোমার পেটে খি-খিচুড়ি আছে, খি-খিচুড়ি খাবে—খিচুড়ি ?

নদীর বাঁধাঘাটে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ দিদিমার কথা ভাবিল। দিদিমা থাকিলে বিশ্বেশ্বর মুহুরী গায়ে হাত তুলিতে পারিত ? সে জবাপাতার বেগুনি খায় তো ওর কি ?

ঐ একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। দিদিমা বলিত নক্ষত্র খসিয়া পড়িলে সেই সময় পৃথিবীতে কেউ না কেউ জন্মায়। মরিয়া কি নক্ষত্র হয় ? সে যদি মারা যায়, হয়তো অমনি আকাশের গায়ে নক্ষত্র হইয়া ফুটিয়া থাকিবে।

আরও মাস কয়েক পরে ভাদ্রমাসের শেষের দিকে। দাদামশায়ের বৈকালিক মিছরির পানা খাওয়ার শ্বেত পাথরের গেলাসটা তাহার বড় মামীমা মাজিয়া ধুইয়া উপরের ঘরের বাসনের জলচৌকিতে রাখিতে তাহার হাতে দিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় কেমন করিয়া গেলাস হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কাজলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের গতি যেন মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঃ, সর্বনাশ ! দাদামশায়ের মিছরিপানার গেলাসটা যে ! সে দিশেহারা অবস্থায় টুকরাগুলো তাড়াতাড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিল ; পরে অন্য জায়গায় ফেলিলে পাছে কেহ টের পায়, তাই তাড়াতাড়ি আরব্য উপন্যাস যাহার মধ্যে আছে সেই বড় কাঠের সিন্দুকটার পিছনে গোপনে রাখিয়া দিল। এখন সে কি করে ! কাল যখন গেলাসের খোঁজ পড়িবে বিকালবেলা, তখন সে কি জবাব দিবে ?

কাহারও কাছে কোন কথা বলিল না, বাকি দিনটুকু ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতেও পারিল না। এক জায়গায় বসিতে পারে না, উদ্বিগ্ন মুখে ছুটফট

করিয়া বেড়ায় ঐ—রকম একটা গেলাস আর কোথাও পাওয়া যায় না? একবার সে এক খেলুড়ে বন্ধুকে চুপি চুপি বলিল,—ভাই তো-তোদের বাড়ি একটা পাথরের গে-গেলাস আছে?

কোথায় সে এখন পায় একটা শ্বেত পাথরের গেলাস? রাত্রে একবার তাহার মনে হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। কলিকাতা কোন দিকে? সে বাবার কাছে চলিয়া যাইবে কলিকাতায়—কাল বৈকালের পূর্বেই।

কিন্তু রাত্রে পালানো হইল না। নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিল, দুই-তিন বার কাঠের সিন্দুকটার পিছনে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, গেলাসের টুকরাগুলা সেখান হইতে কেহ বাহির করিয়াছে কিনা। বড় মামীমার সামনে আর যায় না, পাছে গেলাসটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। দুপুরের কিছু পর বাড়ির রাস্তা দিয়া কে একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নাট-মন্দিরের বেড়ার কাছে ছুটিয়া দেখিতে গেল—কিন্তু সাইকেল দেখা তাহার হইল না, নদীর বাঁধাঘাটে একখানা কাহাদের ডিঙি-নৌকা লাগিয়াছে, একজন ফর্সা চেহারার লোক একটি ছড়ি ও ব্যাগ হাতে ডিঙি হইতে নামিয়া ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়া মাঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে—কাজল অবাক্ হইয়া ভাবিতেছে, লোকটা কে, এমন সময় লোকটা মাঝির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে কাজল অল্পক্ষণের জন্য চোখে যেন ধোঁয়া দেখিল, পরক্ষণেই সে নাটমন্দিরের বেড়া গলাইয়া বাহিরের নদীর ধারের রাস্তাটা বাহিয়া বাঁধাঘাটের দিকে ছুটিল। যদিও অনেক বছর পরে দেখা তবুও কাজল চিনিয়াছে লোকটিকে—তাহার বাবা।

অপু খুলনার ষ্টীমার ফেল করিয়াছিল। নতুবা সে কাল রাত্রেই এখানে পৌঁছিত। সে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতেছিল, পরশু ভোরে নৌকা এখানে আসিয়া তাহাকে বরিশালের ষ্টীমার ধরাইয়া দিতে পারিবে কিনা। কথা শেষ করিয়াই ফিরিয়া চাহিয়া সে দেখিল একটি ছোট সুশ্রী বালক ঘাটের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই সে চিনিল। আজ সারা পথ, নৌকায় সে ছেলের কথা ভাবিয়াছে, না জানি সে কত বড় হইয়াছে, কেমন দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, না মনে রাখিয়াছে! ছেলের আগেকার চেহারা তাহার মনে ছিল না। এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া সে যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইল—তাহার সেই তিন বছরের ছোট্ট খোকা এমন সুদর্শন লাবণ্য-ভরা বালকে পরিণত হইল কবে?

সে হাসিমুখে—বলিল—কি রে খোকা, চিন্‌তে পারিস্?

কাজল ততক্ষণে আসিয়া অসীম নির্ভরতায় সহিত তাহার কোমর জড়াইয়া

ধরিয়াছে—ফুলের মত মুখটি উঁচু করিয়া হাসি-ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না বৈ কি? আমি বেড়ার ধার থেকে দেখেই ছুট দিইছি—এতদিন আস নি কে-কেন বাবা?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। এতদিন তো ভুলিয়া ছিল, কিন্তু আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবামাত্রই—অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য, এই ক্ষুদ্র বালকটি তাহারই ছেলে, জগতে নিতান্ত অসহায় হাত-পা হারা, অবোধ—জগতে সে ছাড়া ওর আব কেউ তো নাই! কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়া ছিল!

কাজল বলিল—ব্যাগে কি বাবা?

—দেখবি? চল দেখাব এখন। তোর জন্যে কেমন পিস্তল আছে, এক সঙ্গে দুম্ দুম্ আওয়াজ হয়, ছবির বই আছে দুখানা। কেমন একটা বগাবেব বেলুন—

—তো-তো-তোমাকে একটা কথা বলব বাবা? তো-তোমাব কাছে একটা পাথরের গে-গেলাস আছে?

—পাথরের গেলাস? কেন রে, পাথরের গেলাস কি হবে?

কাজল চুপি চুপি বাবাকে গেলাস ভাঙার কথা সব বলিল। বাবার কাছে কোন ভয় হয় না। অপু হাসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—আচ্ছা চল্, কোন ভয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সব ভয়টা কাটিয়া গেল, একজন অসীম শক্তিধর বজ্রপাণি দেবতা যেন হঠাৎ বাহুদ্বয় মেলিয়া তাহাকে আশ্রয় ও অভয়দান করিয়াছে—মাভৈঃ।

রাত্রে কাজল বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা!

অপুর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় এখন নিজেরই অচল। সে ভুলাইবার জন্য বলিল—আচ্ছা হবে, হবে! শোন্ একটা গল্প বলি খোকা। কাজল চুপ করিয়া গল্প শুনিল। বলিল—নিয়ে যাবে তো বাবা? এখানে সবাই বকে, মারে বাবা। তুমি নিয়ে চল, তোমার কত কাজ করে দেব।

অপু হাসিয়া বলে, কাজ করে দিবি? কি কাজ করে দিবি রে খোকা?

তারপর সে ছেলেকে গল্প শোনায়, একবার চাহিয়া দেখে, কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খানিক রাত্রি পর্যন্ত সে একখানা বই পড়িল, পরে আলো নিভাইবার পূর্বে ছেলেকে ভাল করিয়া শোয়াইতে গেল। ঘুমন্ত অবস্থায় বালককে কি অদ্ভুত ধরণের অবোধ, অসহায়, দুর্বল ও পরাধীন মনে হইল অপুর! কি অসহায় ও পরাধীন! সে ভাবে এই যে ছেলে, পৃথিবীতে এ তো কোথাও ছিল না, ঘাটিয়াও তো আসে নাই—অপর্ণা ও সে, দু'জনে যে

উহাকে কোন্ অনন্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার পর সংসারে আনিয়া অবোধ নিষ্পাপ বালককে একা এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে? কিন্তু এখন কোথায়ই বা লইয়া যায়?

প্রাচীন গ্রীসের এক সমাধির উপর সেই যে স্মৃতিফলকটির কথা সে পড়িয়াছিল ফ্রেডারিক হ্যারিসনের বই-এ—

This child of ten years
Philip, his father laid here
His great hope, Nikoteles.

সে দূর কালের ছোট্ট বালকটির সুন্দর মুখ, সুন্দর রং, দেব-শিশুর মত সুন্দর দশ বৎসরের বালক নিকোটিলিস্‌কে আজ রাত্রে যেন নির্জন প্রান্তরে খেলা করিতে দেখিতে পাইতেছে—সোনালী চুল, ডাগর ডাগর চোখ। তাহার স্নেহস্মৃতি গ্রীসের নির্জন প্রান্তরের সমাধিক্ষেত্রের বুকে অমর হইয়া আছে। শত শতাব্দী পূর্বে সেই বিরহী পিতৃ-হৃদয়ের সঙ্গে সে যেন আজ নিজের বাড়ীর যোগ অনুভব করিল। মনে হইল, মানুষ সব কালে, সব অবস্থায় এক, এক। কিংবা· ·দেবতার মন্দির-দ্বারে আরোগ্যকামী বহু যাত্রী জড় হইয়াছে নানা দিক্‌দেশ হইতে···ছোট ছেলেটি গরীব বাবা তাহাকে আনিয়াছে···ছেলেটি অসুখে ভোগে, রুগ্‌ণ, স্বপ্নে দেবতা আসিয়া বলিলেন —যদি তোমার রোগ সারিয়ে দিই, আমায় কি দেবে ইউফেনিস্? উঃ, সত্যি! অসুখ সারিলে বাঁচে! ছেলেটি উৎসাহের সুরে বলিল—দশটা মার্বেল আমার আছে, সব কটাই দিয়ে দেব—দেবতা খুশীর সুরে বলিলেন— স—ব ক—টা! বলো কি?—বেশ বেশ, রোগ সারিয়ে দেব তোমার।

বাৎসল্যরসের এমন গভীর অনুভূতি জীবনে তাহার এই প্রথম···

অনেক দিন পরে উপরের ঘরটাতে শুইল। সেই তাহার ফুলশয্যার খাটটাতে। কাজল পাশেই ঘুমাইতেছে—কিন্তু কত রাত পর্যন্ত তাহার নিজের ঘুম আসিল না। জানালার বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। গত পাঁচ ছয় বৎসর বিদেশে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবনযাত্রা ও নবতর অনুভূতিরাজির ফলে পুরাতন দিনের অনেক অনুভূতিই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—এখানকার তো আরও, কারণ আট নয় বৎসর এখানকার জীবনের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তাই আজ এই চিলে-কোঠার বহু পরিচিত ঘরটা, এই পালঙ্কটা, ঐ সুপারি বনের সারি—এসব যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। ঠিক আবার পুরানো দিনের মত জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ঠিক সেই সব দিনের মত নাটমন্দির হইতে নৈশ কীর্তনের খোলের আওয়াজ আসিতেছে

—কিন্তু সে অপু নাই—বদলাইয়া গিয়াছে—বেমালুম বদলাইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বই ছাপাইয়া ফেলিল পূজোর পরেই!

কেবল হাড় ছড়াটা বেচিতে পারিল না। অপর্ণার অন্যান্য গহনার অপেক্ষা সে এই হার ছড়াটার সঙ্গে খুব বেশী পরিচিত। তাই হারটা সামনে খুলিয়া খানিকক্ষণ ভাবিল, অপর্ণার সেই হাসি-হাসি মুখখানা যেন ঝাপসা-মত মনে পড়ে—প্রথমটাতে হঠাৎ যেন খুব সুস্পষ্ট মনে আসে—আধ সেকেণ্ড কি সিকি সেকেণ্ড মাত্র সময়ের জন্য—তারপরই ঝাপ্সা হইয়া যায়। ঐ আধ সেকেণ্ডের জন্য মনে হয়, সে-ই সেরকম ঘাড বাঁকাইয়া মুখে হাসি টিপিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

ছাপানো বই-এর প্রথম কপিখানা দপ্তরীর বাড়ি হইতে আনাইয়া দেখিয়া সে দুঃখ ভুলিয়া গেল। কিছু না, সব দুঃখ দূর হইবে। এই বই-এ সে নাম করিবে।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হইতে সে নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো ভিটাকে অভিনন্দন পাঠাইল মনে মনে। যেখানেই থাকি, ভুলি নি! যাহাদের বেদনার রঙে তাহার বইখানা রঙীন, কত স্থানে, কত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে পরিচয়, হয়ত কেউ বাঁচিয়া আছে, কেউ বা নাই। তাহারা আজ কোথায় সে জানে না, এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-শান্তির মধ্য দিয়া সে মনে মনে সকলকেই আজ তাহার ধন্যবাদ জানাইতেছে।

মাসকয়েকের জন্য একটা ছোট অফিসে একটা চাকরি জুটিয়া গেল তাই রক্ষা। এক জায়গায় আবার ছেলে পড়ায়। এসব না করিলে খরচ চলে বা কিসে, বই-এর বিজ্ঞাপনের টাকাই বা আসে কোথা হইতে। আবার সেই সাড়ে নয়টার সময় আফিসে দৌড়, সেখান হইতে বাহির হইয়া একটা গলির মধ্যে একতলা বাসার ছোট্ট ঘরে দুটি ছেলে পড়ানো। বাড়ির কর্তার কিসের ব্যবসা আছে, এই ঘরে তাঁহাদের বড় বড় প্যাকবাক্স ছাদের কড়ি পর্যন্ত সাজানো। তাহারই মাঝখানে ছোট তক্তপোশে মাদুর পাতিয়া ছেলে-দু'টি পড়ে—সন্ধ্যার পরে অপু যখনই পড়াইতে গিয়াছে, তখনই দেখিয়াছে কয়লার ধোঁয়ায় ঘরটা ভরা।

শীতকাল কাটিয়া পুনরায় গ্রীষ্ম পড়িল। বই-এর অবস্থা খুব সুবিধা নয়, নিজে না খাইয়া বিজ্ঞাপনের খরচ যোগায়, তবু বই-এর কাটতি নাই। বইওয়ালারা উপদেশ দেয়, এডিটারদের কাছে, কি বড় বড় সাহিত্যিকদের কাছে যান, একটু যোগাড়যন্ত্র ক'রে ভাল সমালোচনা বার করুন, আপনাকে চেনে কে, বই কি হাওয়ায় কাটবে মশাই? অপু সে সব পারিবে না, নিজের

লেখা বই বগলে করিয়া দোরে দোরে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার কর্ম নয়। এতে বই কাটে ভাল, না কাটে সে কি করিবে?

অতএব জীবন পুরাতন পরিচিত পথ ধরিয়াই বহিয়া চলিল—অফিস আর ছেলেপড়ানো। রাত্রে আর একটা নতুন বই লেখে। ও যেন একটা নেশা বই বিক্রী হয়-না-হয়, কেউ পড়ে-না-পড়ে, তাহাকে যেন লিখিয়া যাইতেই হইবে।

মেসে লেখার অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া সে একটা ছোট একতলা বাড়ির নীচেকার একটা ঘর আট টাকায় ভাড়া লইয়া সেখানে উঠিয়া গেল। মেসের বাবুরা লোক বেশ ভালই—কিন্তু তাঁহাদের মানসিক ধারা যে-পথ অবলম্বনে চলে অপুর পথ তা নয়—তাঁহাদের মূর্খতা, সংস্কার, সীমাবদ্ধতা ও সর্বরকমের মানসিক দৈন্য অপুকে পীড়া দেয়। খানিকক্ষণ মিষ্টালাপ হয়তো এদের সঙ্গে চলিতে পারে—কিন্তু বেশীক্ষণ আড্ডা দেওয়া অসম্ভব—বরং কারখানার ননী মিস্ত্রী, কি চাঁপদানীর বিশু স্যাকরার আড্ডার লোকজনকে ভালই লাগিত—কারণ তাহারা যে জগৎটাতে বাস করিত—অপুর কাছে সেটা একেবারেই অপরিচিত—তাহাদের মোহ ছিল, সেই অজানা ও অপরিচয়ের মোহ, কাশীর কথকঠাকুর কি অমরকণ্টকের আজবলাল ঝা-কে যে কারণে ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু এরা সে ধরণের অনন্যসাধারণ নয় নিতান্তই সাধারণ ও নিতান্ত ক্ষুদ্র। কাজেই বেশীক্ষণ থাকিলেই হাঁপ ধরে। অপুর নতুন ঘরটাতে দরজা জানালা কম, দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খুলিলে পাশের বাড়ির ইট-বার-করা দেওয়ালটা দেখা যায় মাত্র। ভাবিল—তবুও তো একা থাকতে পারব—লেখাটা হবে।

বাড়ি বদল করার দিনটা জিনিসপত্র সরাইতে ও ঘর গুছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল।

আজ রবিবার ছেলে-পড়ানো নাই। বাপ্‌! নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সেই অতটুকু ঘর, কয়লার ধোঁয়া আর রাজ্যের প্যাকবাক্সের টার্পিন তেলের মত গন্ধ। আজ কয়েক দিন হইল কাজলের একখানা চিঠি পাইয়াছে, এই প্রথম চিঠি, কাটাকুটি বানান ভুলে ভর্তি। আর একবার পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল—বার-পনেরো হইল এইবার লইয়া। বাবার জন্য তাহার মন কেমন করে, একবার যাইতে লিখিয়াছে, একখানা আরব্য উপন্যাস ও একটা লণ্ঠন লইয়া যাইতে লিখিয়াছে, যেন বেশী দেরী না হয়। অপু ভাবে, ছেলেটা পাগল, লণ্ঠন কি হবে? লণ্ঠন?···ত্যাখ-তো কাণ্ড। উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া ছেলের পত্রের জবাব লিখিল। সে আগামী শনিবার তাহাকে দেখিতে

যাইতেছে। সোম ও মঙ্গল বার ছুটি, ট্রেনে স্টীমারে বেজায় ভিড়। খুলনার স্টীমার এবারও ফেল করিল। শ্বশুরবাড়ি পৌছিতে বেলা দুপুর গড়াইয়া গেল।

নৌকা হইতে দেখে কাজল ঘাটে তাহার অপেক্ষায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া—নৌকা থামিতে-না-থামিতে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। মুখ উঁচু করিয়া বলিল—বাবা,—আমার আরব্য উপন্যাস?—অপু সে-কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কাজল কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল—হু-উঁ বাবা, এত ক'রে লিখলাম, তুমি ভুলে গেলে—লণ্ঠন?…অপু বলিল,—আচ্ছা তুই পাগল নাকি—লণ্ঠন কি করবি?—কাজল বলিল, সে লণ্ঠন নয় বাবা!…হাতে ঝুলনো যায়, রাঙা কাচ, সবুজ কাচ বের করা যায় এমনি ধারা। হুঁ-উঁ, তুমি আমার কোন কথা শোনো না। একটা আর্শি আনবো বাবা?

—আর্শি?—কি করবি আর্শি?

—আমি আর্শিতে ছিঁয়া দেখবো—

অপর্ণার দিদি মনোরমা অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি আসিয়াছেন। বেশ সুন্দরী, অনেকটা অপর্ণার মত মুখ। ছোট ভগ্নীপতিকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন, স্বর্গগত মা ও বোনের নাম করিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপু তাঁহার কাছে একটা সত্যকার স্নেহ-ভালবাসা পাইল। সন্ধ্যাবেলা অপু বলিল—আসুন দিদি, ছাদের উপর ব'সে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।

ছাদ নির্জন, নদীর ধারেই, অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অপু বলিল—আমার বিয়ের রাতের কথা মনে হয় মনোরমাদি?

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেও যেন এক স্বপ্ন। কোথা থেকে কি যেন সব হয়ে গেল ভাই—এখন ভেবে দেখলে—সেদিন তাই এই ছাদের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলুম—তোমাকেও তো আমি সেই বিয়ের পর আর কখনও দেখি নি। এবার এসেছিলুম ভাগ্যিস, তাই দেখাটা হ'ল।

হাসির ভঙ্গি অপর্ণার মত, মুখের কত কি ভাব,—ঠিক তাহারই মত—বিস্মৃতি জগৎ হইতে সে-ই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মনোরমা অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুমি তো দিদি বলে খোঁজও কর না ভাই। এবার পূজোর সময় বরিশালে যেও—বলা রইল, মাথার দিব্যি। আর তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিও তো!

কোথা হইতে কাজল আসিয়া বলিল—বাবা একটা অর্থ জান?…

অর্থ? কি অর্থ?

কাজলের মুখ তাহার অপূর্ব সুন্দর মনে হয়—কেমন একধরনের ঘাড় একধারে বাঁকাইয়া চোখে খুশীর হাসি হাসিয়া কথাটা শেষ করে, আবার তখন

'বোকার মতই হাসে—হঠাৎ যেন মুখখানা করুণ ও অপ্রতিভ দেখায়। ঠিক এই সময়েই অপুর মনে ওই স্নেহের বেদনাটা দেখা দেয়—কাজলের ঐ ধরণের মুখভঙ্গিতে।

—বল দেখি, বাবা, 'এখান থেকে দিলাম সাড়া, সাড়া গেল সেই বামুন-পাড়া ?' কি অর্থ!

অপু ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—পাখি।

কাজল ছেলেমানুষি হাসির খই ফুটাইয়া বলিল, ইল্লি! পাখি বুঝি? শাঁক তো—শাঁকের ডাক। তুমি কিচ্ছু জানো না বাবা।

অপু বলিল—ছিঃ বাবা, ওরকম ইল্লি টিল্লি বলো না, বলতে নেই ও-কথা, ছিঃ।

—কেন বলতে নেই বাবা?…

—ও ভাল কথা নয়।

আসিবার আগের দিন রাত্রে কাজল চুপি চুপি বলিল—এবার আমায় নিয়ে যাও বাবা, আমার এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগে না।

অপু ভাবিল—নিয়েই যাই এবারে, এখানে ওকে কেউ দেখেনা, তাছাড়া লেখাপড়াও এখানে থাকলে যা হবে!

পরদিন সকালে ছেলেকে লইয়া সে নৌকায় উঠিল অপর্ণার তোরঙ্গ ও হাতবাক্সটা এখানে আট-নয় বৎসর পড়িয়া আছে, তাহার বড় শালী সঙ্গে দিয়া দিলেন। ইহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপুকে বার বার বরিশালে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সকালের নবীন রোদ ভাঙা নাটমন্দিরের গায়ে পড়িয়াছে। নদীর জল হইতে একটা আমিষ গন্ধ আসিতেছে। শ্বশুর মহাশয়ের তামাক-খাওয়ার কয়লা পোড়ানোর জন্য শুকনা ডালপালায় আগুন দেওয়া হইয়াছে নদীর ধারটাতেই। কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়ার রাশ উপরে উঠিতেছে। সকালের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। আজ বহু বৎসর আগে যেদিন বন্ধু প্রণবের সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে এ বাটী আসিয়াছিল তখন সে কি ভাবিয়াছিল এই বাড়িটার সহিত তাহার জীবনে এমন একটি অদ্ভুত যোগ সাধিত হইবে, আজও সেদিনটার কথা বেশ স্পষ্ট মনে হয়। মনে আছে, আগের দিন একটা গ্রামোফোনের দোকানে গান শুনিয়াছিল—'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।' শুনিয়া গানটা মুখস্থ করিয়াছিল ও সারাপথে ও ষ্টীমারে আপন মনে গাহিয়াছিল—এখনও গুন্ গুন্ করিয়া গানটা গাহিলে সেই দিনটা আবার ফিরিয়া আসে।

ছেলেকে সঙ্গে লইয়া অপু প্রথমে মনসাপোতা আসিল। বছর ছয়-সাত

এখানে আসা ঘটে নাই। এই সময়ে দিনকয়েকের ছুটি আছে, এইবার একবার না দেখিয়া গেলে আর আসা ঘটিবে না অনেকদিন।

ঘরদোরের অবস্থা খুবই খারাপ। অপুর মনে পড়িল, ঠিক এই রকম অপরিষ্কার ভাঙা ঘরে এই বালকের মাকে সে একদিন আনিয়া তুলিয়াছিল। তেলিদের বাড়ি হইতে চাবি আনিয়া ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল। খড নানস্থানে উডিয়া পড়িয়াছে, ইঁদুরের গর্ত, পাডাব গরু-বাছুর উঠিয়া দাওয়া ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। উঠানে বন জঙ্গল।

কাজল চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া অবাক্ হইয়া বলিল—বাবা, এইটে তোমাদের বাড়ি।

অপু হাসিয়া বলিল—তোমারও বাড়ি বাবা। মামার বাডির কোঠা দেখেছ জন্মে অবধি, তাতে তো চলবে না, পৈতৃক সম্পত্তি তোমাব এই।

সকালে উঠিয়া একটি খবরে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিরুপমা আর নাই। সে গত পৌষ মাসে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, পথে কলেরা হয়, সেখানেই মারা যায়। নিরুপমার জ্যাঠা বৃদ্ধ সরকার মহাশয় বলিতেছিলেন —আর দাদাঠাকুর, তোমরা লেখাপডা শিখে দেশে তো আর আসবে না? মেয়েটার কথা মনে হলে আর অন্ন মুখে ওঠে না। হ'ল কি জান, বললে কুড়ুলের পাটে মেলা দেখতে যাব। তার তো জানো পূজো-আচ্চা এক বাতিক ছিল। পাডার সবাই যাচ্ছে, আমি বলি, তা যাও। ওমা, তিন দিন পর সকালে খবর এল নিরুপমা মর-মর, শান্তিপুরের পথে একটা দোকানে—কি সমাচার, না কলেরা। গেলুম সবাই ছুটে। পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমরা যখন গেলুম তখন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে, চিনতে পাবলে, চোখ দিয়ে হু-হু জল পড়তে লাগল। দাদাঠাকুর মা আমার পাডাসুদ্ধ সবারই উপকার ক'রে বেডাত···তুমি সবই জান—আর অসুখ দেখে সেই পাডার লোকই··· যারা সঙ্গে ছিল, পথের ধারের একটা দোচালা ভাঙা ঘরে মাকে আমার ফেলে সবাই পালিয়েছে। পাশের দোকানীটা লোক ভাল—সেই একটু দেখাশুনা করেছে। চিকিৎসে হয় নি, পত্তরও হয় নি, বেঘোরে নিরু-মাকে হারালুম।

সরকার-বাড়ি হইতে ফিরিতে একটু বেলা হইয়া গেল। উঠানে পা দিয়া ডাকিল—ও খোকা—কাজল দুপুরে ঘুমাইতেছিল, কখন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে এবং তেলি-বাড়ি হইতে আঁকশি যোগাড় করিয়া আনিয়া উঠানের গাছের চাঁপা-ফুল পাড়িবার জন্য নিচের একটা ডালে আঁকশি বাধাইয়া টানাটানি করিতেছে।

দৃশ্যটা তাহার কাছে অদ্ভুত মনে হইল। অপর্ণার পোতা সেই চাঁপাফুল গাছটা। কবে তাহার ফুল ধরিয়াছে, কবে গাছটা মানুষ হইয়াছে, গত সাত

বৎসরের মধ্যে অপুর সে খোঁজ লওয়ার অবকাশ ছিল না—কিন্তু খোকা কেমন করিয়া—

সে বলিল—খোকা ফুল পাড়ছিস্ তো, গাছটা কে পুঁতেছিল জানিস্?

কাজল বাবার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি এসো না বাবা, ঐ ডালটা চেপে ধরো না। মোটে দুটো পড়েছে।

অপু বলিল—কে পুঁতেছিল জানিস গাছটা? তোর মা!

কিন্তু মা বলিলে কাজল কিছুই বোঝে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে দিদিমা ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না, দিদিমাই তাহার সব। মা একটা অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। মায়ের কথায় তাহার মনে কোনও বিশেষ সুখ বা দুঃখ জাগায় না।

অনেকদিন পরে মনসাপোতা আসা। সকলেই বাড়িতে থাকে, নানা সদুপদেশ দেয়। ক্ষেত্র কপালী অপুকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিল, দুধ পাঠাইয়া দিল—ঘর ছাইবার জন্য ভড়েরা এক গাড়ি উলুখড় দিতে চাহিল।

রাত্রে আবার কি কাজে সরকার-বাড়ির সামনের পথ দিয়া আসিতে হইল। বাড়িটায় দিকে চাওয়া যায় না। গোটা মনসাপোতাটা নিরুদির অভাবে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। নিরুদি, আজ খোকাকে নিয়ে এসেছি, তুমি এসে ওকে দেখবে না, আদর করবে না, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দেবে না?

রাত্রে অপু আর কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না। চোখের সামনে নিরুপমার সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই অনুযোগের সুর কানে। আর একটি বার দেখা হয় না তার সঙ্গে?

কাজলকে সে কলিকাতায় লইয়া আসিল পরদিন বৈকালের ট্রেনে। সন্ধ্যার পর গাড়িখানা শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকিল। এত আলো, এত বাড়িঘর, এত গাড়িঘোড়া—কি কাণ্ড এ সব! কাজল বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। সে শুধু বাবার হাত ধরিয়া চারিদিকে ডাগর চোখে চাহিতে চাহিতে চলিল।

হ্যারিসন রোডের বড় বড় বাড়িগুলা দেখাইয়া এইবার সে বলিল—ওগুলো কাদের বাড়ি, বাবা? অত বাড়ি?

বাবার বাসাটায় ঢুকিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তাটার গাড়িঘোড়া দেখিতে লাগিল। অবাক্-জলপান জিনিসটা কি? বাবার দেওয়া দুটো পয়সা কাছে ছিল, এক পয়সার অবাক্-জলপান কিনিয়া খাইয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এমন অপূর্ব জিনিস সে জীবনে আর কখনও খায় নাই। চাল-ছোলা ভাজা সে অনেক খাইয়াছে। কিন্তু কি মশলা দিয়া ইহারা তৈরী করে এই অবাক্-জলপান?

অপু তাহাকে ডাকিয়া বাসার মধ্যে লইয়া গেল—ওরকম একলা কোথাও যাস্ নে খোকা। হারিয়ে যাবি কি, কি হবে। যাওয়ার দরকার নেই।

কাজলের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। আর দাদামশায়ের বকুনি খাইতে হইবে না, একা গিয়া দোতলার ঘরে রাত্রিতে শুইতে হইবে না, মামীমাদের ভয়ে পাতের প্রত্যেক ভাতটি খুঁটিয়া গুছাইয়া খাইতে হইবে না। একটি ভাত পাতের নীচে পড়িয়া গেলে বড় মামীমা বলিত—পেয়েছ পরের, দেদার ফেল আর ছড়াও—বাবার অন্ন তো খেতে হ'ল না কখনো!

ছেলেমানুষ হইলেও সব সময় এই খাবার খোঁটা কাজলের মনে বড় বাজিত।

অপু বাসায় আসিয়া দেখিল, কে একখানা চিঠি দিয়াছে তাহার নামে—অপরিচিত হস্তাক্ষর। আজ পাঁচ-ছয় দিন পত্রখানা আসিয়া চিঠির বাক্সে পড়িয়া আছে। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহাকে লিখিতেছেন, তাহার বই পড়িয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছেন, শুধু তিনি নহেন, তাঁহার বাড়িশুদ্ধ সবাই—প্রকাশকের নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া এই পত্র লিখিতেছেন, তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

দু-তিনবার চিঠিখানা পড়িল। এতদিন পরে বোঝা গেল যে অন্ততঃ একটি লোকেরও ভাল লাগিয়াছে তাহার বইখানা।...

পরের প্রশংসা শুনিতে অপু চিরকালই ভালবাসে, তবে বহু দিন তাহার অদৃষ্টে সে জিনিসটা জোটে নাই—প্রথম যৌবনের সেই সরল হাম্বড়া ভাব বয়সের অভিজ্ঞতার ফলে দূর হইয়া গিয়াছিল, তবুও সে আনন্দের সহিত বন্ধু-বান্ধবদের নিকট চিঠিখানা দেখাইয়া বেড়াইল।

পরের দিন কাজল চিড়িয়াখানা দেখিল, গড়ের মাঠ দেখিল। মিউজিয়ামে অধুনালুপ্ত সেকালের কচ্ছপের প্রস্তরীভূত বৃহৎ খোলা দু'টি দেখিয়া সে অনেকক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। পরে অপু ফিরিয়া যাইতেছে, কাজল বাবার কাপড় ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া বলিল—শোন বাবা।—কচ্ছপ দুটোর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আচ্ছা এ দুটোর মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় তবে কে জেতে বাবা?...অপু গম্ভীর মুখে ভাবিয়া ভাবিয়া বলে—ওই বাঁ দিকেরটা জেতে—কাজলের মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়।

কিন্তু গোলদীঘিতে মাছের ঝাঁক দেখিয়া সে সকলের অপেক্ষা খুশী। এত বড় বড় মাছ আর এত এক সঙ্গে। মেলা ছেলেমেয়ে মাছ দেখিতে জুটিয়াছে বৈকালের সেও বাবার কথায় এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া জলে ছড়াইয়া দিয়া অধীর আগ্রহে মাছের খেলা দেখিতে লাগিল। তুমি ছিপে ধরবে বাবা? কত বড় বড় মাছ? অপু বলিল—চুপ্ চুপ্—ও মাছ ধরতে দেয় না।

ফুটপাতে একজন ভিখারী বসিয়া। কাজল ভয়ের সুরে বলিল—শিগগির একটা পয়সা দাও বাবা, নইলে ছুঁয়ে দেবে—তাহার বিশ্বাস, কলকাতার যেখানে যত ভিখারী বসিয়া আছে ইহাদের পয়সা দিতেই হইবে, নতুবা-ইহারা আসিয়া ছুঁইয়া দিবে, তখন তোমাকে বাড়ি ফিরিয়া স্নান করিতে হইবে, সন্ধ্যাবেলা কাপড ছাড়িতে হইবে—সে এক মহা হাঙ্গামা।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপুর চাকরিটি গেল। অর্থের এমন কষ্ট সে অনেক দিন ভোগ করে নাই। ভাল স্কুলে দিতে না পারিয়া সে ছেলেকে কর্পোরেশনের ফ্রি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ছেলেকে দুধ পর্যন্ত দিতে পাবে না, ভাল কিছু খাওয়াইতে পারে না। বইয়ের বিশেষ কিছু আয় নাই। হাত এদিকে একেবারে কপর্দকশূন্য।

কাজলের মধ্যে অপু একটা পৃথক জগৎ দেখিতে পায়। দু'টা টিনের চাকতি, গোটা দুই মার্বেল, একটা কল টেপা খেলনা, মোটর গাড়ি, খান দুই বই হইতে যে মানুষ কিসে এত আনন্দ পায়—অপু তাহা বুঝিতে পারে না। চঞ্চল ও দুষ্ট ছেলে—পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে অপু তাহাকে মাঝে মাঝে ঘরে চাবি দিয়া রাখিয়া নিজের কাজে বাহির হইয়া যায়—এক একদিন চার পাঁচ ঘণ্টাও হইয়া যায়—কাজলের কোনো অসুবিধা নাই—সে রাস্তার ধারের জানালাটায় দাঁড়াইয়া পথের লোকজন দেখিতেছে—না হয়, বাবার বইগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া ছবি দেখিতেছে—মোটের উপর বেশ আনন্দেই আছে।

এই বিরাট নগরীর জীবনস্রোত কাজলের কাছে অজানা দুর্বোধ্য। কিন্তু তাহার নবীন মন ও নবীন চক্ষু যে-সকল জিনিস দেখে ও দেখিয়া আনন্দ পায়—বয়স্ক লোকের ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাহা অতি তুচ্ছ। হয়তো আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে—দ্যাখো বাবা, ওই চিলটা একটা কিসের ডাল মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, সামনে ছাদের আলসেতে লেগে ডালটা—ওই দ্যাখো বাবা রাস্তায় পড়ে গিয়েছে—

বাবার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া এত ট্রাম, মোটর, লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে কোথায় একটা কাক ফুটপাতের ধারে ড্রেনের জলে স্নান করিতেছে তাই দেখিয়া তাহার মহা আনন্দ—তাহা আবার বাবাকে না দেখাইলে কাজলের মনে তৃপ্তি হইবে না। সব বিষয়েই বাবাকে আনন্দের ভাগ না দিতে পারিলে, কাজলের যেন আনন্দ পূর্ণ হয় না। খাইতে খাইতে বেগুনিটা, কি তেলে-ভাজা

কচুরিখানা এককামড খাইয়া ভাল লাগিলে বাকী আধখানা বাবার মুখে গুঁজিয়া দিবে—অপুও তাহা তখনি খাইয়া ফেলে—ছিঃ আমার মুখে দিতে নেই—একথা বলিতে তার প্রাণ কেমন করে—কাজেই পিতৃত্বের গাম্ভীর্যভরা ব্যবধান অকারণে গড়িয়া উঠিয়া পিতা-পুত্রের সহজ সরল মৈত্রীকে বাধাদান করে নাই, কাজল জীবনে বাবার মত সহচর পায় নাই—এবং অপুও বোধ হয় কাজলের মত বিশ্বস্ত ও একান্ত নির্ভরশাল তরুণ বন্ধু খুব বেশী পায় নাই জীবনে।

আর কি সরলতা!…পথে হয়ত দুজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কাজল বলিল—শোনো বাবা একটা কথা—শোনো, চুপি চুপি বলব—পরে পথের এদিক ওদিক চাহিয়া লাজুক মুখে কানে কানে বলে—ঠাকুর বড় দুটোখানি ভাত দ্যায় হোটেলে—আমায় খেয়ে পেট ভরে না—তুমি বলবে বাবা? বললে আর দুটো দেবে না?

দিনকতক গলির একটা হোটেলে পিতাপুত্রে দুজনে খায়—হোটেলের ঠাকুর হয়ত শহরের ছেলের হিসেবে ভাত দেয় কাজলকে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে কাজল বয়সের অনুপাতে দুটি বেশী ভাতই খাইয়া থাকে।

অপু মনে মনে হাসিয়া ভাবে—এই কথা আবার কানে কানে বলা।· রাস্তার মধ্যে ওকে চেনেই বা কে আর শুনছেই বা কে!…ছেলেটা বেজায় বোকা।

আর একদিন কাজল লাজুক মুখে বলিল—বাবা একটা কথা বলব?—

—কি?

—নাঃ বাবা—বলব না—

—বল্ না কি?

কাজল সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি লাজুক স্বরে বলিল—তুমি মদ খাও বাবা?…

অপু বিস্মিত হইয়া বলিল—মদ…কে বলেছে তোকে?

—সেই যে সেদিন খেলে! সেই রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে? পান কিনলে আর সেই যে—

অপু প্রথমটা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল— পরে বুঝিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—দূর বোকা—সে হলো লেমনেড্—সেই পানের দোকানে তো?…তোর ঠাণ্ডা লেগেছিল বলে তোকে দিই নি।…খাওয়াব তোকে একদিন, ও একরকম মিষ্টি শরবৎ। দূর—

কাজলের কাছে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া সে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল যে এখানে মোড়ে মোড়ে মদের

দোকান—পান ও মদ এক সঙ্গে বিক্রয় হয় প্রায় সর্বত্র। সোডা লেমনেড্ সে কখনো দেখে নাই ইহার আগে, জানিত না—কি করিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে বোতলে ওগুলো মদ। তাই তো সেদিন বাবাকে খাইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল—এত দিন লজ্জায় বলে নাই। সেই দিনই অপু তাহাকে লেমনেড্ খাওয়াইয়া তাহার ভ্রম ঘুচাইয়া দিল।

এই অবস্থায় একদিন সে বিমলেন্দুর পত্র পাইল, একবার আলিপুরে লীলার ওখানে পত্রপাঠ আসিতে। লীলার ব্যাপার সুবিধা নয়। তাহারও আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয়। নিজের যাহা কিছু ছিল গিয়াছে, আর কেহ দেয়ও না, বাপের বাড়িতে তাহার নাম করিবার পর্যন্ত উপায় নাই। ইদানিং তাহার মা কাশী হইতে তাহাকে টাকা পাঠাইতেন। বিমলেন্দু নিজের খরচ হইতে বাঁচাইয়া কিছু টাকা দিদির হাতে দিয়া যাইত। তাহার উপর মুস্কিল এই যে, লীলা বড়মানুষের মেয়ে, কষ্ট করা অভ্যাস নাই, হাত ছোট করিতে জানে না।

এই রকম কিছুদিন গেল। লীলা যেন দিন দিন কেমন হইয়া যাইতেছিল। অমন হাস্যময়ী লীলা, তাহার মুখে হাসি নাই, মনমরা বিষণ্ণ ভাব। শরীরও যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে। গত বর্ষাকাল এই ভাবেই কাটে, বিমলেন্দু পূজার সময় পীড়াপীড়ি করিয়া ডাক্তার দেখায়। ডাক্তার বলেন, থাইসিসের সূত্রপাত হইয়াছে, সতর্ক হওয়া দরকার।

বিমলেন্দু লিখিয়াছে—লীলার খুব জ্বর। ভুল বকিতেছে, কেহই নাই, সে একা ও একটি চাকর সারারাত জাগিয়াছে, আত্মীয়স্বজন কেহ ডাকিলে আসিবে না, কি করা যায়। এ অবস্থায় অপু এখানে আজকাল তত আসিতে পারে না, অনেকদিন লীলাকে দেখে নাই। লীলার মুখ যেন রাঙা, অস্বাভাবিক-ভাবে রাঙা ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

বিমলেন্দু শুষ্কমুখে বলিল—কাল রঘুয়ার মুখে খবর পেয়ে এসে দেখি এই অবস্থা। এখন কি করি বলুন তো? বাড়ির কেউ আসবে না, আমি কাউকে বলতেও যাব না, মাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দেব?

অপু বলিল—মা যদি না আসেন?

—কি বলেন? এক্ষুণি ছুটে আসবেন—দিদি-অন্ত প্রাণ তাঁর। তিনি যে আজ চার বছর কলকাতামুখো হন নি, সে এই দিদির কাণ্ডই তো। মুস্কিল হয়েছে কি জানেন, কাল রাত্রেও বকেছে, শুধু খুকী, খুকী, অথচ তাকে আনানো অসম্ভব!

অপু বলিল,—আর এক কাজ করতে হবে, একজন নার্স আমি নিয়ে আসি ঠিক করে। মেয়ে মানুষের নার্সিং পুরুষকে দিয়ে হয় না। বসো তোমরা।

দুই তিন দিনে সবাই মিলিয়া লীলাকে সরাইয়া তুলিল। জ্ঞান হইলে সে একদিন কেবল অপুকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল—কখন এলে অপূব?

রোগ হইতে উঠিয়াও লীলার স্বাস্থ্য ভাল হইল না। শুইয়া আছে তো শুইয়াই আছে, বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে। মাথার চুল উঠিয়া যাইতে লাগিল। আপন মনে গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে, ভাল করিয়া কথা বলে না, হাসেও না। কোথাও নড়িতে চড়িতে চায় না। ইতিমধ্যে কাশী হইতে লীলার মা আসিলেন। বাপের বাড়ি থাকেন, রোজ মোটরে আসিয়া দু'তিন ঘণ্টা থাকেন—আবার চলিয়া যান। ডাক্তার বলিয়াছে, স্বাস্থ্যকর জায়গায় না লইয়া গেলে রোগ সারিবে না।

দুপুর বেলাটা—কিন্তু একটু মেঘ করার দরুণ রৌদ্র নাই কোথাও। অপু লীলার বাসায় গিয়া দেখিল লীলা জানালার ধারে বসিয়া আছে। সে সব সময় আসিতে পারে না, কাজলকে একা বাসায় রাখিয়া আসা চলে না। ভারী চঞ্চল, ও রীতিমত নির্বোধ ছেলে। তাহা ছাড়া রান্নাবান্না ও সমুদয় কাজ করিতে হয় অপুর, কাজলকে দিয়া কুটাগাছটা ভাঙিবার সাহায্য নাই, সে খেলাধূলা লইয়া সারাদিন মহাব্যস্ত—অপু তাহাকে কিছু করিতে বলেও না, ভাবে—আহা, খেলুক একটু। পুওর মাদারলেস্ চাইল্ড।

লীলা ম্লান হাসিয়া বলিল—এস।

—এরা কোথায়? বিমলেন্দু কোথায়? মা এখনও আসেন নি?

—বসো। বিমলেন্দু এই কোথায় গেল। নার্স তো নিচে, বোধ হয় খেয়ে একটু ঘুমুচ্ছে।

—তারপর কোথায় যাওয়া ঠিক হ'ল—সেই ধরমপুরেই? সঙ্গে যাবেন কে—

—মা আর বিমল।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। পরে লীলা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—আচ্ছা অপূব, বর্ধমানের কথা মনে হয় তোমার?

অপু ভাবিল, কি হয়ে গিয়েচে লীলা।

মুখে বলিল—মনে থাকবে না কেন—খুব মনে আছে।

লীলা অন্যমনস্কভাবে বলিল—তোমরা সেই ওদিকের একটা ঘরে থাকতে—সেই আমি যেতুম—

—তুমি আমাকে একটা ফাউন্টেন পেন দিয়েছিলে মনে আছে লীলা? তখন ফাউন্টেন পেন নতুন উঠেচে।—মনে নেই তোমার?

লীলা হাসিল।

অপু হিসাব করিয়া বলিল—তা ধর প্রায় আজ বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা।

লীলা খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—অপূর্ব, কেউ মোটরটা কিনবে বলতে পারো, তোমার সন্ধানে আছে।

লীলার অত সাধের গাড়িটা···এত কষ্টে পড়িয়াছে সে!—

লীলা বলিল,—আমি সে সব গ্রাহ্য করি নে, কিন্তু মা-ও ভাবেন—যাক্ সে সব কথা। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে অপূর্ব?

—কোথায়?

—যেখানে হোক। তোমার সেই পোর্তো প্লাতায়—মনে নেই, সেই যে সমুদ্রের মধ্যে কোন্ ডুবো জাহাজ উদ্ধার করে বলেছিলে সোনা আনবে? সেই যে 'মুকুলে' পড়ে বলেছিলে?

কথাটা অপুর মনে পড়িল। হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ সেই—ঠিক। উঃ, সে কথা মনে আছে তোমার!

—আমি বলেছিলাম, কেমন ক'রে যাবে? তুমি বলেছিলে, জাহাজ কিনে সমুদ্রে যাবে।

অপু হাসিল। শৈশবের সাধ-আশার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে সে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, লীলাও এ ধরণের নানা আশা পোষণ করিত, বিদেশে যাইবে, বড় আর্টিস্ট হইবে ইত্যাদি—ওর সামনে আর সে কথা বলার আবশ্যক নাই।

কিন্তু লীলাই আবার খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যাবে না? যাও যাও—পরে—হি-হি করিয়া হাসিয়া কেমন একটা অদ্ভুত স্বরে বলিল—সমুদ্র থেকে সোনা আনবে তো তোমারই—পোর্তো প্লাতা থেকে, না। ···ছ্যাখো, এখনও ঠিক মনে ক'রে রেখেছি—রাখি নি? হি-হি—একটু চা খাবে?

লীলার মুখের শীর্ণ হাসি ও তাহার বাঁধুনীহারা উদ্‌ভ্রান্ত আল্‌গা ধরণের কথাবার্তা অপুর বুকে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধিল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল এত ভালবাসে নাই সে লীলাকে আর কোনো দিন আজ যত বাসিয়াছে।

—দুপুর বেলা চা খাব কি?—সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না লীলা।

লীলা বলিল—তোমার মুখে সেই পুরনো গানটা শুনি নি অনেকদিন—সেই 'আমি চঞ্চল হে'—গাও তো?

মেঘলা দিনের দুপুর। বাহিরের দিকে একটা সাহেব বাড়ির কম্পাউণ্ডে গাছের ডালে অনেকগুলি পাখি কলরব করিতেছে। অপু গান আরম্ভ করিল,

লীলা জানালার ধারেই বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া গানটা শুনিতে লাগিল। লীলায় মনে আনন্দ দিবার জন্য গানটা দু-তিনবার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল। গান শেষ হইয়া গেল, তবু লীলা জানালার বাহিরেই চাহিয়া আছে, অন্যমনস্কভাবে যেন কি জিনিস লক্ষ্য করিতেছে!

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। দুজনেই চুপ করিয়া ছিল। হঠাৎ লীলা বলিল—একটা কথার উত্তর দেবে?

লীলার গলার স্বরে অপু বিস্মিত হইল। বলিল—কি কথা?...

—আচ্ছা, বেঁচে লাভ কি?

অপু এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—বলিল—এ কথার কি—এ কথা কেন? বল না?...

—না লীলা। এ ধরনের কথাবার্তা কেন? এর দরকার নেই।

—আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে?...

—কি বল?...

—আচ্ছা, আমাকে লোকে কি ভাবে?

সেই লীলা! তাহার মুখে এ রকম দুর্বল ধরনের কথাবার্তা, সে কি কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল! অপু এক মুহূর্তে সব বুঝিল—অভিমানিনী তেজস্বিনী লীলা আর সব সহ্য করিতে পারে, লোকের ঘৃণা তাহার অসহ্য। গত কয়েক বৎসরে ঠিক তাহাই জুটিয়াছে তাহার কপালে। এতদিন সেটা বোঝে নাই—সম্প্রতি বুঝিয়াছে—জীবনের উপর টান হারাইতে বসিয়াছে।

অপুর গলায় যেন একটা ডেলা আটকাইয়া গেল। সে যতদূর সম্ভব সহজ স্বরে বলিল—এ ধরণের কথা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন লীলার কাছে বলে নাই, কোন দিন না—দ্যাখো লীলা, অন্য লোকের কথা জানি নে, তবে আমার কথা শুনবে?...আমি তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বড তো ভাবিই—অনেকের চেয়ে বড় ভাবি—তোমাকে কেউ চেনে নি, চিনলে না, এই কথা ভাবি।—আজ নয় লীলা, এতটুকু বেলা থেকে তোমায় আমি জানি, অন্য লোকেরা ভুল করতে পারে, কিন্তু আমি—

লীলা যেন অবাক্ হইয়া গেল, কখনও সে এ রকম দেখে নাই অপুকে। সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল—সত্যি বলছ? কিন্তু অপুর মুখ দেখিয়া হয়ত বুঝিল প্রশ্নটা অনাবশ্যক। পরক্ষণেই খেয়ালা অপু আর একটা কাজ করিয়া বসিল—এটাও সে ইহার আগে কখনো করে নাই—লীলার খুব কাছে সরিয়া গিয়া তার ডান হাতখানা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া লীলাকে নিজের দিকে টানিয়া তার মুখ ফিরাইল। পরে গভীর স্নেহে তার উত্তপ্ত ললাটে, কানের

পাশের চূর্ণ কুন্তলে হাত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়স্বরে বলিল—তুমি আমি ছেলে-বেলার সাথী, লীলা—আমরা কেউ কাউকে ভুলব না—কোনো অবস্থাতেই না। এতদিন ভুলি নি-ও কখনো লীলা।

লীলার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিল···যাহা আজ অপুর মুখে, কথার সুরে ডাগর চোখের অকপট দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইল—জীবনে কোনদিন কাহারও কাছ হইতে তাহা সে কখনও পায় নাই—আজ সে দেখিল অপুকে সে চিরকাল ভালবাসিয়া আসিয়াছে—বিশেষ করিয়া অপুর মাতৃবিয়োগের পর লালদীঘির সামনের ফুট পাতে তাকে যেদিন শুষ্ক নিরাশ্রয় ভাবে বেড়াইতে দেখিয়াছিল—সেদিনটি হইতে।

···অপুর চমক ভাঙিল—লীলা কখন তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়াছিল—তাহার অশ্রুপ্লাবিত পাণ্ডুর মুখখানি !···

অপু বাহিরে চলিয়া আসিল—সে অনুভব করিতেছিল লীলার মত সে কাহাকেও ভালবাসে না—সেই গভীর অনুকম্পামিশ্রিত ভালবাসা, যা মানুষকে সব ভুলাইয়া দেয়, আত্মবিসর্জনে প্রণোদিত করে।

লীলাকে যে করিয়াই হউক সে সুখী করিবে। লীলাকে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না, নিজেকে ছোট ভাবিতে দিবে না। যাহার ইচ্ছা লীলাকে ছাড়ুক, সে লীলাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে লীলাকে কোথাও লইয়া যাইবেই—এ অবস্থায় কলকাতায় থাকিলে লীলা বাঁচিবে না। বিশ্ব একদিকে—লীলার মুখের অনুরোধ আর একদিকে।

সারাপথ ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

দিন তিনেক পরে।

বেলা আটটা। অপু সকালে স্নান সারিয়া কাজলকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইবে—এমন সময় মিঃ লাহিড়ীর ছোট নাতি অরুণ ঘরে ঢুকিল। এককোণে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি উত্তেজিত স্বরে বলিল—শিগ্‌গির আসুন, দিদি কাল রাত্রে বিষ খেয়েছে।

বিষ! সর্বনাশ! লীলা বিষ খাইয়াছে!

কাজলকে কি করা যায়?—খোকা তুই—বরং—ঘরে থাক একা। আমি একটা কাজে যাচ্ছি। দেরী হবে ফিরতে।

কিন্তু কাজলের চোখে ধূলো দেওয়া অত সহজ নয়। কেন বাবা? কি কাজ? কোথায়? কত দেরি হতে পারে?···কোনমতে ভুলাইয়া তাহাকে রাখিয়া দুজনে ট্যাক্সি ধরিয়া লীলার বাসায় আসিল। আরও দুখানা মোটর

দাঁড়াইয়া আছে। ঢুকিতেই লীলাদের বাড়ির ডাক্তার বৃদ্ধ কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা। অরুণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি অবস্থা এখন?

কেদারবাবু বলিলেন—অবস্থা তেমনি! আর একটা ইন্‌জেক্‌শ্যন করেছি। হিল্‌কক্ সাহেব এলে যে বুঝতে পারি। অপুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—বড্ড স্যাড্ ব্যাপার—বড্ড স্যাড্। জিনিসটা? মরফিয়া। রাত্রে কখন খেয়েছে, তা তো বোঝা যায় নি, আজ সকালে তাও বেলা হলে তবে টের পাওয়া গেল। কর্ণেল হিল্‌ককৃকে আনতে লোক গিয়েছে—তিনি না আসা পর্যন্ত—

অরুণের সঙ্গে সঙ্গে উপরের সেই ঘরটাতে গেল—মাত্র দিন তিনেক আগে যেটাতে বসিয়া সে লীলাকে গান শুনাইয়া গিয়াছে। প্রথমটা কিন্তু সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না, তাহার হাত কাঁপিতেছিল পা কাঁপিতেছিল। ঘরটা অন্ধকার জানালার পর্দাগুলো বন্ধ, ঘরে বেশী লোক নাই, কিন্তু বারান্দাতে আট দশজন লোক। সবাই পদ্মপুকুরের বাড়ির!—সবাই চুপি চুপি কথা কহিতেছে, পা টিপিয়া টিপিয়া হাঁটিতেছে। কিছু বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিয়াছে এখানে, এমন বলিয়া কিন্তু অপুর মনে হইল না। অথচ একজন—যে পৃথিবীর সুখকে এত ভালবাসিত, আকাঙ্ক্ষা করিত, আশা করিত—উপেক্ষায় মুখ বাঁকাইয়া পৃথিবী হইতে ধীরে ধীরে বিদায় লইতেছে।

সেদিনকার সেই জানালার পাশের খাটেই লীলা শুইয়া। সংজ্ঞা নাই, পাণ্ডুর, কেমন যেন বিবর্ণ—ঠোঁট ঈষৎ নীল। একখানা হাত খাটের বাহিরে ঝুলিতেছিল—সে তুলিয়া দিল। গায়ে রেশমের বরফি-কাটা বিলাতী লেপ। কি অপূর্ব যে দেখাইতেছে লীলাকে!...মরণাহত মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের সৌন্দর্য যেন এ পৃথিবীর নয়—কিংবা হরিদ্রাভ হাতীর দাঁতে খোদাই মুখ যেন। দেবীর মত সৌন্দর্য আরও অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার মনে হইল লীলা ঘামিতেছে। তবে বোধ হয় আর ভয় নাই, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। চুপি চুপি বলিল—ঘামছে কেন?

ডাক্তারবাবু বলিলেন—এটা মরফিয়ার সিম্‌টম্!

মিনিট-দশ কাটিল। অপু বাহিরের বারান্দাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের ঘরে লোকেরা একবার ঢুকিতেছে, আবার বাহির হইতেছে, অনেকেই আসিয়াছে, কেবল মিঃ লাহিড়ী ও লীলার মা নাই। মিঃ লাহিড়ী দার্জিলিং-এ, লীলার মা মাত্র কাল এখান হইতে বর্ধমানে কি কাজে গিয়াছেন। লীলা সত্যই অভাগিনী।

এমন সময় নীচে একটা গোলমাল। একখানা গাড়ীর শব্দ উঠিল। ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন—তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন, পিছনে কেদারবাবু ও বিমলেন্দু। অনেকেই ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, কেদারবাবু নিষেধ করিলেন।

মিনিট সাতেক পরে ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—Too late, কোনও আশা নাই।

আরও আধঘণ্টা। এত লোক।—অপু ভাবিল, ইহারা এতকাল কোথায় ছিল?···আজ too late! too late!

লীলা মারা গেল বেলা দশটায়। অপু তখন খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ লীলা চোখ বুজিয়াই ছিল, সে সময়টা হঠাৎ চোখ মেলিয়া চাহিল—তারাগুলা বড় বড, তাহার দিকেও চাহিল, অপুব দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—লীলা তাহাকে চিনিয়াছে বোধ হয়।···কিন্তু পবক্ষণেই দেখিল—দৃষ্টি অর্থহীন, আভাহীন, উদাসীন, অস্বাভাবিক। তারপরই লীলা যেন চোখ তুলিয়া কড়িকাঠে, সেখান হইতে আরও অস্বাভাবিকভাবে মাথাব শিয়রে কার্নিসের বিটের দিকে ইচ্ছা করিয়াই কি দেখিবার জন্য চোখ ঘুবাইল—স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওরকম চোখ ঘুরাইতে পারে না।

তারপরেই সবাই ঘরের বাহির হইয়া আসিল। কেবল বিমলেন্দু ছেলে-মানুষের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অপুও ফিরিল। হায়রে পাপ, হায় পুণ্য! কে মানদণ্ডে তৌল করিবে? মূর্খ···মূর্খ···মূর্খ··· মূর্খ···লীলার বিচার করিবে কে? এই সব মূর্খের দল? দুঃখের মধ্যে তাহার হাসি আসিল।

কাজল এই কয়মাসেই বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। বাড়িতেই পড়ে—অনেক সময় নিজের বই রাখিয়া বাবার বইগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখে। আজকাল বাবা কি কাজে সর্বদাই বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, এই জন্য বাবার কাজও সে অনেক করে।

বাসায় অনেকগুলো বিড়াল জুটিয়াছে। সে যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন ছিল একটা মাত্র বিড়াল—এখন জুটিয়াছে আরও গোটা তিন। কাজল খাইতে বসিলেই পাতের কাছে সবগুলা আসিয়া জোটে। তাহারা ভাত খায় না, খায় শুধু মাছ। কাজল প্রথমে ভাবে কাহাকেও সে এক টুকরাও দিবে না—করুক মিউ মিউ। কিন্তু একটু পরে একটা অল্প বয়সের বিড়ালের উপর বড় দয়া হয়। এক টুকরা তাহাকে দিতেই অন্য সবগুলা করুণস্বরে ডাক শুরু করে—কাজল ভাবে—আহা, ওরা কি বসে বসে দেখবে—দিই ওদেরও একটু একটু। একে

ওকে দিতে কাজলের মাছ প্রায় সব ফুরাইয়া যায়। বাঁড়ুয্যেদের ছেলে অনু একটা বিড়ালছানাকে রাস্তার উপর দিয়া ইঞ্জিন যায়, ওরই তলায় ফেলিয়া দিয়াছিল—ভাগ্যে সেটা মরে নাই—যে ইঞ্জিন চালায়, সে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া ফেলে! কাজল আজকাল একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে বিড়ালগুলির থাকিবার জায়গা করিয়া দিয়াছে।

রাত্রে শুইয়াই কাজল অমনি বলে,—গল্প বল বাবা। আচ্ছা বাবা, ওই যে রাস্তায় ইঞ্জিন চালায় যারা, ওরা কি যখন হয় থামাতে পারে, যেদিকে ইচ্ছে চালাতে পারে? সে মাঝে মাঝে গলির মুখে দাঁড়াইয়া বড রাস্তায় ষ্টীম রোলার চালাইতে দেখিয়াছে। যে লোকটা চালায় তাহার উপব কাজলের মনে মনে হিংসা হয়। কি মজা ওই কাজ করা। যখন খুশি চালানো, যতদূর হয়, যখন খুশি থামানো। মাঝে মাঝে সিটি দেয়, একটা চাকা বসিয়া বসিয়া ঘোরায়। সব চুপ কবিয়া আছে, সামনে একটা ডাণ্ডা যেই টেপে অমনি ঘটাং ঘটাং বিকট শব্দ।

এই সময়ে অপুর হঠাৎ অসুখ হইল। সকালে অন্য দিনের মত আর বিছানা হইতে উঠিতেই পারিল না—বাবা সকালে উঠিয়া মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খায়, কাজলের মনে হয় সব ঠিক আছে—কিন্তু আজ বেলা দশটা বাজিল, বাবা এখনও শুইয়া—জগৎটা আর যে স্থিতিশীল নয়, নিত্য নয়—সব কি যেন হইয়া গিয়াছে। সেই রোদ উঠিয়াছে, কিন্তু রোদের চেহারা অন্য রকম, গলিটার চেহারা অন্য রকম, কিছু ভাল লাগে না, বাবার অসুখ এই প্রথম, বাবাকে আর কখনো সে অসুস্থ দেখে নাই—কাজলের ক্ষুদ্র জগতে সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। সারা দিনটা কাটিল, বাবার সাড়া নাই,—সংজ্ঞা নাই—জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পডিয়া। কাজল পাউরুটি কিনিয়া আনিয়া খাইল। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কাজল পরমানন্দ পানওয়ালার দোকান হইতে তেল পুরিয়া আনিয়া লণ্ঠন জ্বালিল। বাবা তখনও সেই রকমই শুইয়া। কাজল অস্থির হইয়া উঠিল—তাহার কোনও অভিজ্ঞতা নাই এ সব বিষয়ে, কি এখন সে করে? দু-একবার বাবার কাছে গিয়া ডাকিল, জ্বরের ঘোরে বাবা একবার বলিয়া উঠিল—স্টোভটা নিয়ে আয়, ধরাই খোকা—স্টোভটা—

অর্থাৎ সে স্টোভটা ধরাইয়া কাজলকে রাঁধিয়া দিবে।

কাজল ভাবিল, বাবাও তো সারাদিন কিছু খায় নাই—স্টোভ ধরাইয়া বাবাকে সাবু তৈরী করিয়া দিবে। কিন্তু স্টোভ সে ধরাইতে জানে না, কি করে এখন? স্টোভটা ঘরের মেঝেতে লইয়া দেখিল তেল নাই। আবার পরমানন্দের দোকানে গেল। পরমানন্দকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পাশেই

একজন নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী। ডাক্তারটি একেবারে নতুন, একা ডাক্তারখানায় বসিয়া কড়ি-বরগা গুনিতেছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে বাসায় আসিলেন, অপুকে ডাকিয়া তাহার হাত ও বুক দেখিলেন, কাজলকে ঔষধ লইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিতে বলিলেন। অপু তখন একটু ভাল—সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল—ও পারবে না, রাত্তিরে এখন থাক্, ছেলেমানুষ, এখন থাক্—

এই সবের জন্য বাবার উপরে রাগ হয় কাজলের। কোথায় সে ছেলে-মানুষ, সে বড় হইয়াছে। কোথায় সে না যাইতে পারে, বাবা পাঠাইয়া দেখুক দিকি সে কেমন পারে না? বিশেষতঃ অপরের সামনে তাহাকে কচি বলিলে, ছেলেমানুষ বলিলে, আদর করিলে বাবার উপর তাহার ভারী রাগ হয়।

বাবার সামনে স্টোভ ধরাইতে গেলে কাজল জানে বাবা বারণ করিবে, বলিবে—উঁহু করিস নে খোকা, হাত পুড়িয়ে ফেলবি। সে সরু বারান্দাটার এক কোণে স্টোভটা লইয়া গিয়া কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও সেটা জ্বালিতে পারিল না। অপু একবার বলিল—কি কচ্ছিস ও খোকা, কোথায় গেলি ও খোকা?—আঃ, বাবার জ্বালায় অস্থির।—ঘরে আসিয়া বলিল—বাবা কি খাবে? মিছরি আর বিস্কুট কিনে আনবো? অপু বলিল—না না, সে তুই পারবি নে। আমি খাবো না কিছু। লক্ষ্মী বাবা, কোথাও যেও না ঘর ছেড়ে, রাত্তিরে কি কোথাও যায়? হারিয়ে যাবি—

হ্যাঁ, সে হারাইয়া যাইবে! ছাড়িয়া দিলে সে সব জায়গায় যাইতে পারে, পৃথিবীর সর্বত্র একা যাইতে পারে, বাবার কথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

পরদিন সকালে উঠিয়া কাজল প্রথমে ঔষধ আনিল। বাবার জন্য ফুট-পাতের দোকান হইতে খেজুর ও কমলালেবু কিনিল। একটু দূরের দুধের দোকান হইতে জ্বাল-দেওয়া গরম দুধও কিনিয়া আনিল। দুধের বাটি হাতে ছেলে ফিরিলে অপু বলিল—কথা শুনবি নে খোকা? দুধ আনতে গেলি রাস্তা পার হয়ে সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের দোকানে? এখন গাড়ি ঘোড়ার বড় ভিড়—যেও না বাবা—দে বাকী পয়সা!

খুচরা পয়সা না থাকায় ছেলেকে সকালে ঔষধের দামের জন্য একটা টাকা দিয়াছিল, কাজল টাকাটা ভাঙাইয়া এগুলি কিনিয়াছে, নিজে মাত্র এক পয়সার বেগুনি খাইয়াছিল, (তেলে-ভাজা খাবারের উপর তাহার বেজায় লোভ) বাকী পয়সা বাবার হাতে ফেরত দিল।

অপু বলিল—একখানা পাঁউরুটি- নিয়ে আয়, ওই দুধের আমি অতটা তো খাবো না, তুই অর্ধেকটা রুটি দিয়ে খা—

—না বাবা, এই তো কাছেই হোটেল, আমি ওখানে গিয়ে—

—না, না, সেও তো রাস্তা পার হয়ে, আফিসের সময় এখন মোটরের ভিড়, এ-বেলা ওই খাও বাবা, আমি তোমাকে ওবেলা দুটো রেঁধে দেবো।

কিন্তু দুপুরের পর অপুর আবার খুব জ্বর আসিল। রাত্রের দিকে এত বাড়িল- আর কোনও সংজ্ঞা রহিল না। কাজল দোরে চাবি দিয়া ছুটিয়া আবার ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার আবার আসিলেন, মাথায় জলপটির ব্যবস্থা দিলেন, ঔষধও দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে আর কেউ থাকে না? তোমরা দুজন মোটে? অসুখ যদি বাড়ে তবে বাড়িতে টেলিগ্রাম ক'রে দিতে হবে। দেশে কে আছে?

—দেশে কেউ নেই। আমার মা তো নেই···আমি আর বাবা শুধু—

—মুশকিল। তুমি ছেলেমানুষ কি করবে? হাসপাতালে দিতে হবে তা হলে, দেখি আজ রাতটা—

কাজলের প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতাল! সে শুনিয়াছে সেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না! বাবার অসুখ কি এত বেশী যে, হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে?

ডাক্তার চলিয়া গেল। বাবা শুইয়া আছে—শিয়রের কাছে আধভাঙ্গা ডালিম, গোটাকতক লেবুর কোয়া। পালং শাকের গোড়া বাবা খাইতে ভালবাসে, বাজার হইতে সেদিন পালং শাকের গোড়া আনিয়াছিল, ঘরের কোণে চুপড়িতে শুকাইতেছে—বাবা যদি আর না ওঠে। না রাঁধে? কাজলের গলায় কিসের একটা ডেলা ঠেলিয়া উঠিল। চোখ ফাটিয়া জল আসিল—ছোট বারান্দাটার এক কোণে গিয়া সে আকুল হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ভগবান বাবাকে সারাইয়া তোল, পালং শাকের গোড়া বাবাকে খাইতে না দেখিলে সে বুক ফাটিয়া মরিয়া যাইবে—ভগবান বাবাকে ভাল করিয়া দাও।

মেঝেতে তাহার পরিবার মাদুরটা পাতিয়া সে শুইয়া পড়িল। ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালিয়া রাখিল—একবার নাড়িয়া দেখিল কতটা তেল আছে, সারারাত জ্বলিবে কি না। অন্ধকারে তাহার বড় ভয়—বিশেষ বাবা আজ নড়ে না, চড়ে না, কথাও বলে না।

দেয়ালে কিসের সব যেন ছায়া! কাজল চক্ষু বুজিল।

মাসদেড় হইল অপু সারিয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে যাইতে হয় নাই, এই গলিরই মধ্যে বাঁড়ুয্যেরা বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, তাঁহাদের এক ছেলে ভাল

ডাক্তার। তিনি অপুর বাড়িওয়ালার মুখে সব শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন—ইনজেক্‌শনের ব্যবস্থা করিলেন, শুশ্রূষার লোক দিলেন, কাজলকে নিজের বাড়ি হইতে খাওয়াইয়া আনিলেন। উহাদের বাড়ির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়া গিয়াছে।

চৈত্রের প্রথম। চাকুরি অনেক খুঁজিয়াও মিলিল না। তবে আজকাল লিখিয়া কিছু আয় হয়।

সকালে একদিন অপু মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কাজলকে পড়াইতেছে, একজন কুড়ি-বাইশ বছরের চোখে-চশমা ছেলে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে আসতে পারি?—আপনারই নাম অপূর্ব-বাবু? নমস্কার—

—আসুন, বসুন বসুন। কোত্থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার বই পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সবাই এত মুগ্ধ হয়েছে, তাই আপনার ঠিকানা নিয়ে—

অপু খুব খুশী হইল—বই পড়িয়া এত ভাল লাগিয়াছে যে, বাড়ি খুঁজিয়া দেখা করতে আসিয়াছে একজন শিক্ষিত তরুণ যুবক। এ তার জীবনে এই প্রথম।

ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া বলিল—অজ্ঞে, ইয়ে এই ঘরটাতে আপনি থাকেন বুঝি!

অপু একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, ঘরের আসবাবপত্র অতি হীন, ছেঁড়া মাদুরে পিতাপুত্রে বসিয়া পড়িতেছে। খানিকটা আগে কাজল ও সে দুজনে মুড়ি খাইয়াছে, মেঝের খানিকটাতে তার চিহ্ন। সে ছেলের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাইয়া দিয়া সলজ্জ সুরে বলিল—তুই এমন দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছিস খোকা, রোজ রোজ তোকে বলি খেয়ে অমন করে ছড়াবি নে—তা তোর—আর বাটিটা অমন দোরের গোড়ায়—

কাজল এ অকারণ তিরস্কারের হেতু না বুঝিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আমি কই বাবা, তুমিই তো বাটিটাতে মুড়ি—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাম্, লেখ, বানানগুলো লিখে ফেল।

যুবকটি বলিল—আমাদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে খুব আলোচনা—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওবেলা বাড়িতে থাকবেন: 'বিভাবরী' কগেজের এডিটার শ্যামাচরণবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আমি—আরও তিন-চার জন সেই সঙ্গে আসব।—তিনটে? আচ্ছা, তিনটেতেই ভাল।

আরও খানিক কথাবার্তার পর যুবক বিদায় লইলে অপু ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল,—উস্-স্-স্-স্ খোকা।

ছেলে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না বাবা—

—না বাপ আমার, লক্ষ্মী আমাব, রাগ ক'রো না। কিন্তু কি করা যায় বল তো?

—কি বাবা?

—তুমি এক্ষুণি ওঠ, পড়া থাক এবেলা, এই ঘরটা ঝেড়ে বেশ ভাল ক'রে সাজাতে হবে—আর ওই তোব ছেঁড়া জামাটা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে রাখ দিকি! ওবেলা 'বিভাবরী'র সম্পাদক আসবে—

—'বিভাবরী' কি বাবা?

—'বিভাবরী' কাগজ বে পাগল, কাগজ—দৌড়ে যা তো পাশের বাসা থেকে বালতিটা চেয়ে নিয়ে আয় তো!

বৈকালের দিকে ঘবটা একরকম মন্দ দাঁড়াইল না। তিনটাব পবে সবাই আসিলেন। শ্যামাচবণবাবু বলিলেন—আপনার বইটাব কথা আমার কাগজে যাবে আসছে মাসে। ওটাকে আমিই আবিষ্কাব কবেছি মশাই। আপনার লেখা গল্পটল্প? দিন না।

পরেব মাসে 'বিভাববী' কাগজে তাহার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গল্পটাও বাহিব হইল। শ্যামাচবণবাবু ভদ্রতা করিয়া পঁচিশটি টাকা গল্পেব মূল্যস্বরূপ লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া আর একটা গল্প চাহিয়া পাঠাইলেন।

অপু ছেলেকে প্রবন্ধটি পাড়তে দিয়া নিজে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া শুনিতে লাগিল। কাজল খানিকটা পড়িয়া বলিল—বাবা এতে তোমার নাম লিখেছে যে! অপু হাসিয়া বলিল—দেখেছিস খোকা, লোকে কত ভাল বলেছে আমাকে? তোকেও একদিন ওই রকম বলবে, পড়াশুনো করবি ভাল কবে, বুঝলি?

দোকানে গিয়া শুনিল 'বিভাবরী'তে প্রবন্ধ বাহির হইবার পরে খুব বই কাটিতেছে—তাহা ছাড়া তিন বিভিন্ন স্থান হইতে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। বইখানার অজস্র প্রশংসা!

একদিন কাজল বসিয়া পড়িতেছে, সে ঘরে ঢুকিয়া হাত দুখানা পিছনের দিকে লুকাইয়া বলিল,—খোকা, বল তো হাতে কি?…কথাটা বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, শৈশবে একদিন তাহার বাবা—সেও এমনি বৈকাল বেলাটা

—তাহার বাবা এইভাবেই, ঠিক এই কথা বলিয়াই খবরের কাগজের মোড়কটা তাহার হাতে দিয়াছিল! জীবনের চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুতভাবেই আবর্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া! কাজল ছুটিয়া গিয়া বলিল,—কি বাবা দেখি?—পরে বাবার হাত হইতে জিনিষটা লইয়া দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। অজস্র ছবিওয়ালা আরব্য উপন্যাস! দাদামশায়ের বইয়ে তো এত রঙীন ছবি ছিল না? নাকের কাছে ধরিয়া দেখিল কিন্তু তেমন পুরানো গন্ধ নাই, সেই এক অভাব।

অনেক দিন পরে হাতে পয়সা হওয়াতে সে নিজের জন্যও একরাশ বই ও ইংরেজী ম্যাগাজিন কিনিয়া আনিয়াছে।

পরদিন সে বৈকালে তাহার এক সাহেব বন্ধুর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়া গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলে তাহার সঙ্গে দেখা করতে গেল। সাহেবের বাড়ি কানাড়ায়, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বয়স নাম এ্যাশ্‌বার্টন। হিমালয়ের জঙ্গলে গাছপালা খুঁজিতে আসিয়াছে, ছবিও আঁকে। ভারতবর্ষে এই দুইবার আসিল! স্টেট্‌সম্যানে তাঁহার লেখা হিমালয়ের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া অপু হোটেলে গিয়া মাস-দুই পূর্বে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে। এই দু-মাসের মধ্যে দু-জনের বন্ধুত্ব খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

সাহেব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ফ্লানেলের ঢিলা স্যুট পরা, মুখে পাইপ, খুব দীর্ঘাকার, সুশ্রী মুখ, নীল চোখ, কপালের উপরের দিকের চুল খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। অপুকে দেখিয়া হাসিমুখে আগাইয়া আসিল, বলিল—দেখ, কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ও-রকম কোনদিন হয় নি। কাল একজন বন্ধুর সঙ্গে মোটরে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা জায়গায় গিয়ে বসেছি, কাছে একটা পুকুর, ও-পারে একটা মন্দির, এক সার বাঁশগাছ, আর তালগাছ, এমন সময়ে চাঁদ উঠল, আলো আর ছায়ার কি খেলা! দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে! মনে হল, Ah this the East!···the eternal East, অমন দেখি নি কখনও।

অপু হাসিয়া বলিল,—And pray, who is the Sun?···

এ্যাশবার্টন হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—না, শোন, আমি কাশী যাচ্ছি, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না কিন্তু। আসছে হপ্তাতেই যাওয়া যাক্ চলো।

কাশী! সেখানে সে কেমন করিয়া যাইবে। কাশীর মাটিতে সে পা দিতে পারিবে না। শত-সহস্র স্মৃতি-জড়ানো কাশী, জীবনের ভাণ্ডারের অক্ষয় সঞ্চয়—ও কি যখন তখন গিয়া নষ্ট করা যায়!···সেবার পশ্চিম যাইবার সময় মোগলসরাই দিয়া গেল, কাশী যাইবার অত ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারিল না

কেন ?…কেন, তাহা অপরকে সে কি করিয়া বুঝায় !…

বন্ধু বলিল, তুমি জাভায় এসো না আমার সঙ্গে ?…বারোবুদরের স্কেচ আঁকব, তা ছাড়া মাউন্ট শ্যালাকের বনে যাব। ওয়েস্ট জাভাতে বৃষ্টি কম হয় বলে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট তত জমকালো নয়, কিন্তু ইস্ট জাভার বন দেখলে তুমি মুগ্ধ হবে, তুমি তো বন ভালবাস, এস না।…

বন্ধুর কাছে লীলাদের বাড়ি অনেকদিন আগে দেখা বিয়াত্রিচে দান্তের সেই ছবিটা। অপু বলিল—বতিচেলির না ?

—না। আগে বলত লিওনার্ডোব—আজকাল ঠিক হয়েছে আম্বে্রাজো ডা প্রেসিড-এর, বতিচেলিব কে বললে ?

লীলা বলিয়াছিল। বেচারী লীলা !

সপ্তাহের শেষে কিন্তু বন্ধুটির আগ্রহ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে কাশী রওনা হইতে হইল। কাশীতে পরদিন বেলা বারোটার সময় পৌঁছিয়া বন্ধুকে ক্যান্টন্‌মেন্টের এক সাহেবী হোটেলে তুলিয়া দিল ও নিজে একা করিয়া শহরে গোধুলিয়ার মোড়ের কাছে 'পার্বতী আশ্রমে' আসিয়া উঠিল।

গোধুলিয়ার মোড হইতে একটু দূরে সেই বালিকা বিদ্যালয়টা আজও আছে। ইহারই একটু দূরে তাহাদের সেই স্কুলটা ! কোথায় ? একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। এখানেই কোথায় যেন ছিল। একটা বাড়ি সে চিনিল। তাহার এক সহপাঠী এই বাড়িতে থাকিত—দু-একবার তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল। বাসা নয় নিজেদের বাড়ি। একটি বাঙালী ভদ্রলোক শসা কিনিতেছিলেন—সে জিজ্ঞাসা করিল—এই বাড়িতে প্রসন্ন বলে একটা ছেলে আছে—জানেন ?—ভদ্রলোক বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—প্রসন্ন ? ছেলে !… অপু সামলাইয়া বলিল—ছেলে না, মানে এই আমাদেরই বয়সী। কথাটা বলিয়া সে অপ্রতিভ হইল—প্রসন্ন বা সে আজ কেহই ছেলে নয়—আর তাহাদের ছেলে বলা চলে না—একথা মনে ছিল না। প্রসন্নর ছেলে-বয়সের মূর্তিই মনে আছে কি না ! প্রসন্ন বাড়ি নাই, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল সে আজকাল চারপাঁচটি ছেলেমেয়ের বাপ।

স্কুলটা কোথায় ছিল চিনিতে পারিল না। একজন লোককে বলিল—মশায়, এখানে 'শুভঙ্করী পাঠশালা' বলে একটা স্কুল কোথায় ছিল জানেন ?

—শুভঙ্করী পাঠশালা ! কৈ না, আমি তো এই গলিতে দশ বছর আছি—

—তাতে হবে না, সম্ভবত বাইশ-তেইশ বছর আগেকার কথা।

—এ বসাক মশায়, বসাক মশায়, আসুন একবারটি এদিকে। এঁকে

জিজ্ঞেস করুন, ইনি চল্লিশ বছরের খবর বলতে পারবেন।

বসাক মশায় প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন—বিলক্ষণ! তা আর জানিনে। ঐ হরগোবিন্দ শেঠের বাড়িতে স্কুলটা ছিল। ঢুকতেই নিচু-মত তো! দুধারে উঁচু রোয়াক?

অপু বলিল—হাঁ—হা ঠিক। সামনে একটা চৌবাচ্চা—

—ঠিক ঠিক—আমাদের আনন্দবাবুর স্কুল! আনন্দবাবু মারাও গিয়েছেন আজ আঠার উনিশ বছর। স্কুলও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। আপনি এসব জানলেন কি করে?

—আমি পড়তুম ছেলেবেলায়। তারপর কাশী থেকে চলে যাই।

একটা বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল। তাহাদের বাড়ির মোড়েই। ইহারা তখন শোলার ফুল ও টোপর তৈরী করিয়া বেচিত। অপু বাড়িটার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। গৃহীণীকে চিনিল—বলিল, আমায় চিনতে পারেন? ঐ গলির মধ্যে থাকতুম বেলবেলায়—আবার বাবা মারা গেলেন?—গৃহিণী চিনতে পারলেন। বসিতে দিলেন, বলিলেন—তোমার মা কেমন আছেন?

অপু বলিল—তাহার মা বাঁচিয়া নাই।

—আহা! বড ভালমানুষ ছিল! তোমার মার হাত—সোডার বোতল খুলতে গিযে হাত কেটে গিয়েছিল মনে আছে?

অপু হাসিয়া বলিল—খুব মনে আছে, বাবার অসুখের সময়!

গৃহিণীর ডাকে একটি বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের বিধবা মেয়ে আসিল। বলিলেন—একে মনে আছে?···

—আপনার মেয়ে না? উনি কি জন্যে রোজ বিকেলে জানালার ধারে খাটে শুয়ে কাঁদতেন! তা মনে আছে।

—ঠিক বাবা, তোমার সব মনে আছে দেখছি। আমার প্রথম ছেলে তখন বছর-খানেক মারা গিয়েছে—তোমরা যখন এখানে এলে। তার জন্যেই কাঁদত। আহা, ছেলে আজ বাঁচলে চল্লিশ বছর বয়স হ'ত।

একবার মণিকর্ণিকার ঘাটে গেল। পিতার নশ্বর দেহের রেণু-মেশানো পবিত্র মণিকর্ণিকা।

বৈকালে বহুক্ষণ দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া কাটাইল।

ঐ সেই শীতল মন্দির—ওরই সামনে বাবার কথকথা হইত সে-সব দিনে—সঙ্গে সঙ্গে সে বৃদ্ধ বাঙাল কথক ঠাকুরের কথা মনে হইয়া অপুর মন উদাস হইয়া গেল। কোন্ জাদুবলে তাহার বালকহৃদয়ের দুর্লভ স্নেহটুকু সেই বৃদ্ধ

চুরি করিয়াছিল—এখন এতকাল পরেও তাহার উপর অপুর যে স্নেহ অক্ষুণ্ণ আছে—আজ তাহা সে বুঝিল।

পরদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে সে স্নান করিতে নামিতেছে, হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল একজন বৃদ্ধা একটা পিতলের ঘটিতে গঙ্গাজল ভর্তি করিয়া লইয়া স্নান সারিয়া উঠিতেছেন—চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া সে চিনিল—কলিকাতার সেই জ্যাঠাইমা! সুরেশের মা!···বহুকাল সে আর জ্যাঠাইমা-দের বাড়ি যায় নাই, সেই নববর্ষের দিনটার অপমানের পর আর কখনও না। সে আগাইয়া গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—চিনতে পারেন জ্যাঠাইমা? আপনারা কাশীতে আছেন নাকি আজকাল?···বৃদ্ধা খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন···নিশ্চিন্দিপুরের হরি ঠাকুরপোর ছেলে না?···এসো এসো, চিরজীবি হও বাবা—আর বাবা চোখেও ভাল দেখিনে তার ওপর দেখ এই বয়সে একা বিদেশে পড়ে থাকা···ভারা-ঘটিটা কি নিয়ে উঠতে পারি? ভাড়াটেদের মেয়ে জলটুকু বয়ে দেয়—তো তার আজ তিনদিন জ্বর—

—ও, আপনিই বুঝি একলা কাশীবাস—সুনীলদারা কোথায়?

বৃদ্ধা ভারী ঘটিটা ঘাটের রাণার উপর নামাইয়া বলিলেন—সব কলকাতায়, আমায় দিয়েছে ভেন্ন করে বাবা! ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিলুম সুনীলের, গুপ্তিপাড়ার মুখুয্যে—ওমা, বৌ এসে বাবা সংসারের হ'ল কাল— সে সব বলব এখন বাবা—তিন-এর-এক ব্রজেশ্বরের গলি—মন্দিরের ঠিক বাঁ গায়ে—একা থাকি, কারুর সঙ্গে দেখাশুনা হয় না। সুরেশ এসেছিল, পূজোর সময় দু'দিন ছিল। থাকতে পারে না—তুমি এসো বাবা, আমার বাসায় আজ বিকেলে, অবিশ্যি অবিশ্যি।

অপু বলিল— দাঁড়ান জ্যাঠাইমা, চট ক'রে ডুব দিয়ে নি, আপনি ঘটিটা ওখানে রাখুন, পৌছে দিচ্ছি।

—না বাবা, থাক আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তুমি বললে এই যথেষ্ট হ'ল—বেঁচে থাকো।

তবুও অপু শুনিল না, স্নান সারিয়া ঘটি হাতে জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁহার বাসায় গেল। ছোট্ট একতলা ঘরে থাকেন—পশ্চিম দিকের ঘরে জ্যাঠাইমা থাকেন, পাশের ঘরে আর এক একজন প্রৌঢ়া থাকেন—তাঁহার বাড়ি ঢাকা। অন্য ঘরগুলি একটি বাঙালী গৃহস্থ ভাড়া লইয়াছেন, যাঁদের ছোট মেয়ের কথা জ্যাঠাইমা বলিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন—সুনীল আমার তেমন ছেলে না। ঐ যে হাড়হাবাতে

ছোটলোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলাম, সংসারটাসুদ্ধ উচ্ছন্ন দিলে। কি থেকে শুরু হ'ল শোন। ও বছর শেষ মাসে নবান্ন করেছি, ঠাকুরঘরের বারকোশে নবান্ন মেখে ঠাকুরদের নিবেদন করে রেখে দিইছি। দুই নাতিকে ডাকছি, ভাবলাম ওদের একটু একটু নবান্ন মুখে দি। বৌটা এমন বদমায়েস, ছেলেদের আমার ঘরে আসতে দিলে না—শিখিয়ে দিয়েছে, ও-ঘরে যাস নি, নবান্নর চাল খেলে নাকি ওদের পেট কামড়াবে। তাই আমি বললাম, বলি হঁ্যা গা বৌমা, আমি কি ওদের নতুন চাল খাইয়ে, মেরে ফেলবার মতলব করছি? তা শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, সেকেলে লোক ছেলেপিলে মানুষ করার কি বোঝে? আমার ছেলে আমি যা ভাল বুঝব করব, উনি যেন তার ওপর কথা না কইতে আসেন। এই সব ঝগড়া শুরু, তারপর দেখি ছেলেও তো বৌমার হয়ে কথা বলে। তখন আমি বললাম, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর তোমার সংসারে থাকব না। বৌ রাত্রে কানে কি মন্তর দিয়েছে, ছেলে দেখি তাতেই রাজী। তাহলেই বোঝ বাবা, এত ক'রে মানুষ ক'রে শেষে কিনা আমার কপালে—জ্যাঠাইমার দুই চোখ দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—কেন, সুরেশদা কিছু বললেন না?

—আহা, সে আগেই বলি নি? সে শ্বশুরবাড়ির বিষয় পেয়ে সেখানেই বাস করছে, সেই রাজসাহী না দিনাজপুর। সে একখানা পত্তর দিয়েও খোঁজ করে না, মা আছে কি মলো। তবে আর তোমাকে বলছি কি? সুরেশ কলকাতায় থাকলে কি আর কথা ছিল বাবা?

অপুকে খাইতে দিয়া গল্প করিতে করিতে তিনি বলিলেন, ও ভুলে গিয়েছি তোমাকে বলতে, আমাদের নিশ্চিন্দিপুরের ভুবন মুখুয্যের মেয়ে লীলা যে কাশীতে আছে, জান না?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—লীলাদি! নিশ্চিন্দিপুরের? কাশীতে কেন?

জ্যাঠাইমা বলিলেন—ওর ভাসুর কি চাকরি করে এখানে। বড় কষ্ট মেয়েটার, স্বামী তো আজ ছ'সাত বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, বড় ছেলেটা কাজে না লেগে বসে আছে, আরও চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ, ভাসুরের সংসারে ঘাড় গুঁজে থাকে। যাও না, দেখা ক'রে এসো আজ বিকেলে, কালীতলার গলিতে ঢুকেই বাঁদিকের বাড়িটা।

বাল্যজীবনের সেই রাণুদির বোন লীলাদি! নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে। বৈকাল হইতে অপুর দেরি সহিল না, জ্যাঠাইমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই সে কালীতলার গলি খুঁজিয়া বাহির করিল—সরু ধরণের তেতালা বাড়িটা। সিঁড়ি যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনি অন্ধকার, এত অন্ধকার সে পকেট হইতে দেশলাই-

এর কাঠি বাহির করিয়া না জ্বালাইয়া সে এই বেলা দুইটার সময়ও পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

একটা ছোট দুয়ার পার হইয়া সরু একটা দালান। একটি দশ বারো বছরের ছেলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, এখানে কি নিশ্চিন্দিপুরের লীলাদি আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলো গিয়ে। অপুর কথা শেষ না হইতে পাশের ঘর হইতে নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, কে রে খোকা? সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতলা গড়নের গৌরবর্ণ মহিলা দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরনে আধ-ময়লা শাড়ি,হাতে শাঁখা, বয়স বছর সাঁইত্রিশ মাথায় একরাশ কালো চুল। অপু চিনিল, কাছে গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, চিনতে পার লীলাদি?

পরে লীলা তাহার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং চিনিতে পারে নাই দেখিয়া বলিল, আমার নাম অপু, বাড়ি নিশ্চিন্দিপুরে ছিল আগে—

লীলা তাড়াতাড়ি আনন্দের স্বরে বলিয়া উঠিল—ও! অপু, হরিকাকার ছেলে! এসো, এসো ভাই, এসো। পরে সে অপুর চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিল এবং কি বলিতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অদ্ভুত মুহূর্ত! এমন সব অপূর্ব, সুপবিত্র মুহূর্তও জীবনে আসে। লীলাদির ঘনিষ্ঠ আদরটুকু অপুর সারা শরীরে একটা স্নিগ্ধ আনন্দের শিহরণ আনিল। গ্রামের মেয়ে তাহাকে ছোট দেখিয়াছে, সে ছাড়া এত আপনার জনের মত অন্তরঙ্গতা কে দেখাইতে পারে? লীলাদি ছিল তাহাদের ধনী প্রতিবেশী ভুবন মুখুয্যের মেয়ে, বয়সে তাহার অপেক্ষা অনেক বড, অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, তারপরেই শ্বশুর বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল ও সেইখানেই থাকিত। শৈশবে অল্পদিন মাত্র উভয়ের সাক্ষাৎ, কিন্তু আজ অপুর মনে হইল লীলদির মত আপনার জন সারা কাশীতে আর কেহ নাই। শৈশব-স্বপ্নের সেই নিশ্চিন্দিপুর, তারই জলে বাতাসে দুজনের দেহ পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছে একদিন।

তারপর লীলা অপুর জন্য আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, দালানেই পাতিল, ঘরদোর বেশী নাই, বিশেষ করিয়া পরের সংসার; নিজের নহে। সে নিজে কাছে বসিল, কত খোঁজ-খবর লইল। অপুর বারণ সত্ত্বেও ছেলেকে দিয়া জলখাবার আনাইল, চা করিয়া দিল।

তারপর লীলা নিজের অনেক কথা বলিল। বড ছেলেটি চৌদ্দ বছরের হইয়া মারা গিয়াছে, তাহার উপর সংসারের এই দুর্দশা। উনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু, ভাসুরের সংসারে চোর হইয়া থাকা, ভাসুর লোক মন্দ নন, কিন্তু বড় জা— পায়ে কোটি কোটি দণ্ডবৎ। দুর্দশার একশেষ। সংসারের যত উঞ্ছ কাজ সব

তাহার ঘাড়ে, আপন জন কেহ কোথাও নাই, বাপের বাড়িতে এমন কেহ নাই যাহার কাছে দুই দিন আশ্রয় লইতে পারে। সতু মানুষ নয়, লেখাপড়া শেখে নাই, গ্রামে মুদির দোকান করে, পৈতৃক সম্পত্তি একে একে বেচিয়া খাইতেছে —তাহার উপর দুইটি বিবাহ করিয়াছে, একরাশ ছেলেপিলে। তাহার নিজের চলে না, লীলা সেখানে আর কি করিয়া থাকে।

অপু বলিল—দুটো বিয়ে কেন?

—পেটে বিদ্যে না থাকলে যা হয়। প্রথম পক্ষের বৌয়ের বাপের সঙ্গে কি ঝগড়া হ'ল, তাকে জব্দ করার জন্যে, আবার বিয়ে করলে। এখন নিজেই জব্দ হচ্ছেন, দুই বৌ ঘাড়ে—তার ওপর দুই বৌয়ের ছেলেপিলে। তার ওপর রাণুও ওখানেই কিনা!

—রাণুদি? ওখানে কেন?

—তারও কপাল ভাল নয়। আজ বছর সাত-আট বিধবা হয়েছে, তার আর কোনও উপায় নেই, সতুর সংসারেই আছে। শ্বশুর বাড়িতে এক দেওর আছে, মাঝে মাঝে নিয়ে যায়, বেশির ভাগ নিশ্চিন্দিপুরেই থাকে।

অপু অনেকক্ষণ ধরিয়া রাণুদির কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতেছিল, কিন্তু কেন প্রশ্নটা করিতে পারে নাই সে-ই জানে। লীলার কথার পরে অপু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। হঠাৎ লীলা বলিল—ছাখ্ ভাই অপু, নিশ্চিন্দিপুরের সেই বাঁশবাগানের ভিটে এত মিষ্টি লাগে, কি মধু যে মাখানো ছিল তাতে! ভেবে ছাখ্, মা নেই, বাবা নেই, কিছুই তো নেই, —তবুও তার কথা ভাবি। সেই বাপের ভিটে আজ দেখি নি এগারো বছর। সেবার সতুকে চিঠি লিখলাম, উত্তর দিলে এখানে কোথায় থাকবে, থাকবার ঘরদোর নেই, পূবের দালান ভেঙে পড়ে গিয়েছে, পশ্চিমের কুঠুরীদুটোও নেই, ছেলেপিলে কোথায় থাকবে,— এই সব একরাশ ওজর। বলি থাক তবে, ভগবান যদি মুখ তুলে চান কোনদিন, দেখব—নয় তো বাবা বিশ্বনাথ তো চরণে রেখেইছেন—

আবার লীলা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অপু বলিল, ঠিক বলেছ লীলাদি, আমারও গাঁয়ের কথা এত মনে পড়ে। সত্যিই, কি মধুমাখানো ছিল, তাই এখন ভাবি।

লীলা বলিল, পদ্মপাতায় খাবার খাস নি কতদিন বল দিকি? এ-সব দেশে শালপাতায় খাবার খেতে খেতে পদ্মপাতার কথা ভুলেই গিইছি, না? আবার এক একদিন একটা দোকানে কাগজে খাবার দেয়। সেদিন আমার মেজ ছেলে এনেছে, আমি বলি দূর দূর, ফেলে দিয়ে আয়, কাগজে আবার মিষ্টি খাবার কেউ দেয় আমাদের দেশে?

অপুর সারা দেহ স্মৃতির পুলকে যেন অবশ হইয়া গেল। লীলাদি মেয়েমানুষ কিনা, এত খুঁটিনাটি জিনিসও মনে রাখে। ঠিকই বটে, সেও পদ্মের পাতায় কতকাল খাবার খায় নাই, ভুলিয়াই গিয়াছিল কথাটা। তাহাদের দেশে বড় বড় বিল, পদ্মপাতা সস্তা, শালপাতার রেওয়াজ ছিল না। নিমন্ত্রণ বাড়িতেও পদ্মপাতাতে ব্রাহ্মণভোজন হইত, লীলাদির কথায় আজ আবার সব মনে পড়িয়া গেল।

লীলা চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কতদিন যাস্‌নি সেখানে অপু? তেইশ বছর? কেন, কেন? আমি না হয় মেয়েমানুষ—তুই তো ইচ্ছে করলেই যেতে—

—তা নয় লীলাদি, প্রথমে ভাবতুম বড় হয়ে যখন রোজগার করব, মাকে নিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুরের ভিটেতে গিয়ে বাস করব. মার বড় সাধ ছিল। মা মারা যাওয়ার পরেও ভেবেছিলুম কিন্তু তার পরে—ইয়ে—

স্ত্রীবিয়োগের কথাটা অপু বয়োজ্যেষ্ঠা লীলাদির নিকট প্রথমটা তুলিতে পারিল না। পরে বলিল। লীলা বলিল, বৌ কতদিন বেঁচে ছিলেন?

অপু লাজুক সুরে বলিল—বছর চারেক—

—তা এ তোমার অন্যায় কাজ ভাই—তোমার এ বয়সে বিয়ে করবে না কেন?···তোমাকে তো এতটুকু দেখেছি, এখনও বেশ মনে হচ্ছে—ছোট্ট, পাতলা টুকটুকে ছেলেটি—একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে আমাদের ঘাটের পথের বাঁশতলাটায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—কালকের কথা যেন সব—না না, ও কি, ছিঃ—বিয়ে কর ভাই! খোকাকে কলকাতায় রেখে এলে কেন—দেখতাম একবারটি।

লীলাও উঠিতে দেয় না—অপুও উঠিতে চায় না। লীলার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিল—ছেলেমেয়েগুলিকে আদর করিল। উঠিবার সময় লীলা বলিল—কাল আসিস অপু, নেমন্তন্ন রইল—এখানে দুপুরে খাবি। পরদিন নেমন্তন্ন রাখিতে গিয়া কিন্তু অপু লীলাদির পরাধীনতা মর্মে মর্মে বুঝিল—সকাল হইতে সমুদয় সংসারের রান্নার ভার একা লীলাদির উপর। কৈশোরে লীলাদি দেখিতে ছিল খুব ভাল—এখন কিন্তু সে লাবণ্যের কিছুই অবশিষ্ট নাই—চুল দু-চার গাছা এরই মধ্যে পাকিয়াছে, শীর্ণ মুখ শিরা-বাহির হওয়া হাত, আধময়লা শাড়ি পরনে, রাঁধিবার আলাদা ঘরদোর নাই, ছোট্ট দালানের অর্ধেকটা দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, তারই ও-ধারে রান্না হয়। লীলাদি সমস্ত রান্না সারিয়া তার জন্য মাছের ডিমের বড়া ভাজিতে বসিল, একবার কড়াখানা উনুন হইতে নামায়, আবার তোলে, আবার নামায়, আবার ভাজে! আগুনের তাতে মুখ তার রাঙা

দেখাইতেছিল—অপু ভাবিল কেন এত কষ্ট করছে লীলাদি, আহা রোজ রোজ ওর এই কষ্ট, তার ওপর আমার জন্যে আর কেন কষ্ট করা?

বিদায় লইবার সময় লীলা বলিল—কিছুই করতে পারলুম না ভাই—এলি যদি এত কাল পরে, কি করি বল, পরের ঘরকন্না, পরের সংসার, মাথা নিচু ক'রে থাকা, উদয়াস্ত খাটুনিটা দেখলি তো? কি আর করি, তবুও একটা ধরে আছি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠল, বিয়ে তো দিতে হবে? ঐ বটঠাকুর ছাড়া আর ভরসা নেই। সন্ধেবেলাটা বেশ ভাল লাগে—দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যের সময় বেশ কথা হয়, পাঁচালী হয় গান হয়—বেশ লাগে। দেখিস্ নি? আসিস্ না আজ ওবেলা—বেশ জায়গা, আসিস্, দেখিস্ এখন। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।—তারপর সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল—তোদের দেখলে যে কত কথা মনে পড়ে—কি সব দিন ছিল—

এবার অপু অতিকষ্টে চোখের জল চাপিল।

আর একটি কর্তব্য আছে তাহার কাশীতে—লীলার মায়ের সঙ্গে দেখা করা। বাঙালীটোলার নারদ ঘাটে তাঁদের নিজেদের বাড়ি আছে—খুঁজিয়া বাড়ি বাহির করিল। মেজ-বৌরানী অপুকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। চোখের জল ফেলিলেন।

কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় ঘরে একটি ছোট মেয়ে ঢুকিল—বছর ছয়-সাত হইবে, ফ্রক-পরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—অপু তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—লীলার মেয়ে। কি সুন্দর দেখিতে! এত সুন্দরও মানুষ হয়? স্নেহে, স্মৃতিতে, বেদনায় অপুর চোখে জল আসিল—সে ডাক দিল—শোন খুকী মা, শোন তো।

খুকী হাসিয়া পলাইতেছিল, মেজ-বৌরানী ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া দিলেন। সে তার দিদিমার কাছেই কাশীতে থাকে আজকাল। গত বৈশাখ মাসে তাহার বাবা মারা গিয়াছেন—লীলার মৃত্যুর পূর্বে। কিন্তু লীলাকে সে সংবাদ জানানো হয় নাই। দেখিতে অবিকল লীলা—এ বয়সে লীলা যা ছিল তাই। কেমন করিয়া অপুর মনে পড়িল শৈশবের একটি দিনে বর্ধমানে লীলাদের বাড়িতে সেই বিবাহ উপলক্ষে মেয়ে মজলিসের কথা—লীলা যেখানে হাসির কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে হাসাইয়াছিল—সে-ই লীলাকে সে প্রথম দেখে এবং লীলা তখন দেখিতে ছিল ঠিক এই খুকীর মত অবিকল!

মেজ-বৌরানী বলিলেন—মেয়ে তো ভাল, কিন্তু বাবা, ওর কি আর বিয়ে দিতে পারব? ওর মার কথা যখন সকলে শুনবে—আর তা না জানে কে—ওই মেয়ের কি বিয়ে হবে বাবা?

অপুর দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইল একটি কথা বলিবার জন্য—সেটা কিন্তু সে চাপিয়া রাখিল। মুখে বলিল—দেখুন, বিয়ের জন্যে ভাবচেন কেন? লেখাপড়া শিখুক, বিয়ে নাই বা হ'ল, তাতে কি? মনে ভাবিল—এখন সে কথা বলব না, খোকা যদি বাঁচে, মানুষ হয়ে ওঠে—তবে সে কথা তুলব। যাইবার সময় অপু লীলার মেয়েকে আবার কাছে ডাকিল। এবাব খুকী তাহার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ডাগর ডাগর উৎসুক চোখে তাহার মুখেব দিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিনেব বাকী সময়টুকু অপু বন্ধুর সঙ্গে সাবনাথ দেখিয়া কাটাইল। সন্ধ্যাব দিকে একবার কালীতলার গলিতে লীলাদের বাসায় বিদায় লইতে গেল—কাল সকালেই এখান হইতে রওনা হইবে। নিশ্চিন্দিপুবেব মেয়ে, শৈশব দিনেব এক সুন্দর আনন্দ-মুহূর্তের সঙ্গে লীলাদীর নাম জড়ানো—বাব বাব কথা কহিযাও যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না।

আসিবার সময় অপু মুগ্ধ হইল লীলাদির আন্তরিকতা দেখিয়া। তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়া সে নিচে নামিয়া আসিল, আবার চিবুক ছুঁইয়া আদব করিল, চোখের জল ফেলিল, যেন মা, কি মায়ের পেটের বড় বোন। কতকগুলো কাঠের খেলনা হাতে দিয়া বলিল—খোকাকে দিস্—তার জন্যে কাল কিনে এনেছি।

অপু ভাবিল—কি চমৎকার মানুষ লীলাদি!···আহা পরের সংসারে কি কষ্টটাই না পাচ্ছে! মুখে কিছু বললুম না—তোমায় আমি বাপের ভিটে দেখাব লীলাদি, এই বছরের মধ্যেই।

ট্রেনে উঠিয়া সারাপথ কত কি কথা তাহার মনে যাওয়া-আসা কবিতে লাগিল। রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে উঠিল আজ কতকাল পরে। বাল্যকালে এই স্টেশনেই সে প্রথম জলের কল দেখে, কাশী নামিয়াই ছুটিয়া গিয়াছিল আগে জলের কলটার কাছে। চেঁচাইয়া বলিয়াছিল, দেখো দেখো মা জলের কল!—সে সব কি আজ?

আজ কতদিন হইতে সে আর একটি অদ্ভুত জিনিস নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিতেছে, কী তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছে। আগে তো সে এ রকম ছিল না? অন্ততঃ এ ভাবে তো কই কখনও এর আগে—সেটা হইতেছে ছেলের জন্য মন-কেমন করা।

কত কথাই মনে হইতেছে এই কয়দিনে—পাশের বাড়ির বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী কাজলকে বড় ভালবাসে—সেখানেই তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। কখনও মনে হইতেছে, কাজল যে দুষ্টু ছেলে, হয়ত গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল,

কোনও বদ্‌মাইস লোকে ভুলাইয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে কিংবা হয়ত চুপি চুপি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইতে যাইতেছিল, মোটর চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি বাঁড়ুয্যেরা একটা তার করিত না? হয়ত তার করিয়াছিল, ভুল ঠিকানায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। উহাদের আলিসাবিহীন নেড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে উঠিয়া পড়িয়া যায় নাই? কিন্তু কাজল তো কখনও ঘুড়ি ওড়ায় না? একটু আনাড়ি, ঘুড়ি ওড়ানো কাজ একেবারে পারে না। না—সে উড়াইতে যায় নাই, তবে হয়ত বাঁড়ুয্যে বাড়ির ছেলেদের দলে মিশিয়া উঠিয়াছিল, আশ্চর্য কি!

আর্টিস্ট বন্ধুর কথার উত্তরে সে খানিকটা আগে বলিয়াছিল সে জাভা, বালি, সুমাত্রা দেখিবে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দেখিবে, আফ্রিকা দেখিবে—ওদের বিষয় লইয়া উপন্যাস লিখিবে। সাহেবরা দেখিয়াছে তাদের চোখে—সে নিজের চোখে দেখিতে চায়, তার মনের রঙ কোন্ রঙ ধরায়—ইউগাণ্ডার দিক্‌দিশাহীন তৃণভূমি, কেনিয়ার অরণ্য। বুড়ো বেবুন রাত্রে কর্কশ চীৎকার করিবে, হায়েনা পচা জীবজন্তুর গন্ধে উন্মাদের মত আনন্দে হি-হি করিয়া হাসিবে, দুপুরে অগ্নীবর্ষী খররৌদ্রে কম্পমান উত্তাপতরঙ্গ মাঠে প্রান্তরে, জনহীন বনের ধারে কতকগুলি উঁচুনীচু সদাচঞ্চল বাঁকা রেখার সৃষ্টি করিবে। সিংহেরা দল পাকাইয়া ছোট কণ্টকবৃক্ষের এতটুকু ক্ষুদ্র ছায়ায় গোলাকারে দাঁড়াইয়া অগ্নিবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করে—পার্ক ন্যাশন্যাল আলাবার্ত···wild celery-র বন···

কিন্তু খোকা যে টানিতেছে আজকাল, কোনও জায়গায় যাইতে মন চায় না খোকাকে ফেলিয়া। কাজল, খোকা, কাজল, খোকা, খোকন, ও ঘুড়ি উড়াইতে পারে না, কিছু বুঝিতে পারে না, কিছু পারে না, বড় নির্বোধ। কিন্তু ওর আনাড়ি মুঠাতে বুকের তার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। টানিতেছে, প্রাণপণে টানিতেছে—ছোট্ট দুর্বল হাত দু'টি নির্দয়ভাবে মুচড়াইয়া সরাইয়া লওয়া? সর্বনাশ! ধামা চাপা থাকুক বিদেশযাত্রা।

ট্রেন হু-হু চলিতেছে···মাঝে মাঝে আম বন, জলার ধারে লালহাঁস বসিয়া আছে, আখের ক্ষেতে জল দিতেছে, গম কাটিতেছে। রেলের ধারের বস্তিতে উদুখলে শস্য কুটিতেছে, মহিষের পাল চরিয়া ফিরিতেছে। বড় বড় মাঠে দুপুর গড়াইয়া গিয়া ক্রমে রোদ পড়িয়া আসিল। দূরে দূরে চক্রবাল-সীমায় এক-আধটা পাহাড় ঘন নীল ও কালো হইতেছে।

কি জানি হঠাৎ কেন আজ কত কথাই যেন মনে পড়িতেছে, বিশেষ করিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কথা। হয়ত এতকাল পরে লীলাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার

জন্যই। ঠিক তাই। বহু দূরে আর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবন-ধারা বাঁশবনের আমবনের ছায়ায় পাখির কলকাকলীর মধ্য দিয়া, জানা-অজানা বনপুষ্পের সুবাসের মধ্য দিয়া-সুখে-দুঃখে বহুকাল আগে বহিত—এককালে যার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তার—আজ তা স্বপ্ন—স্বপ্ন, কতকাল আগে দেখা স্বপ্ন! গোটা নিশ্চিন্দিপুর, তার ছেলেবেলাকার দিদি, মা ও রাণুদি, মাঠ বন, ইচ্ছামতী সবই যেন অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়, স্বপ্নের মতই অবাস্তব। সেখানকার সব কিছুই অস্পষ্ট স্মৃতিতে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এই তো ফাল্গুন-চৈত্র মাস—সেই বাঁশপাতা ও বাঁশের খোলার রাশি—শৈশবের ভাঙা জানালাটার ধারে বসিয়া বসিয়া কতকাল আগের সে সব কল্পনা আনন্দপূর্ণ দিনগুলি, শীতরাত্রির সুখস্পর্শ কাঁথার তলা,—অনন্ত কালসমুদ্রে সে সব ভাসিয়া গিয়াছে কতকাল আগে।···

কেবল স্বপ্নে, একদিন যেন বাল্যের সেই রুপো চৌকিদার গভীর রাত্রে ঘুমের মধ্যে কড়া হাঁক দিয়া যায়—ও বায় ম—শ—য়—য়, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া আসে, আবার বাড়ির পাশেই সেই পোড়ো ভিটাতে বহুকাল আগের বসন্ত নামে, প্রথম চৈত্রের নানা জানা-অজানা, ফুলে বনভূমি ভরিয়া যায়, তাহাদের পুরানো কোঠাবাড়ির ভাঙা জানালার ধারে অতীত দিনের শত সুখদুঃখে পরিচিত পাখির দল কলকণ্ঠে গান গাহিয়া উঠে, ঠাকুরমারদের নারিকেল গাছে কাঠঠোকরার শব্দ বিচিত্র গোপনতায় তন্দ্রারত হইয়া পড়ে··· স্বপ্নে দশ বৎসরের শৈশবটি আবার নবীন হইয়া ফিরিয়া আসে··

এতদিন সে বাড়িটা আর নাই···কতকাল আগে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ইট-কাঠ স্তূপাকার হইয়া আছে—তাহাও হয় তো মাটির তলায় চাপা পড়িতে চলিল—সে শৈশবের জানালাটার কোনও চিহ্ন নাই—দীর্ঘদিনের শেষে সোনালী রোদ যখন বটগাছের ছায়া দীর্ঘতর করিয়া তোলে, ফিঙে-দোয়েল ডাক শুরু করে—তখন আর কোনও মুগ্ধ শিশু জানালার ধারে বসিয়া থাকে না—হাত তুলিয়া অনুযোগের সুরে বলে না—আজ রাতে যদি মা ঘরে জল পড়ে, কাল কিন্তু ঠিক রাণুদিদিদের বাড়ি গিয়ে শোবো—রোজ রোজ রাত জাগতে পারিনি বলে দিচ্চি।

অপুর একটা কথা মনে হইয়া হাসি পাইল।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার বছরখানেক আগে অপু একরাশ কড়ি পাইয়াছিল। তাহার বাবা শিষ্যবাড়ি হইতে এগুলি আনেন। এত কড়ি আগে কখনও অপু ছেলেবেলায় একসঙ্গে দেখে নাই। তাহার মনে হইল সে হঠাৎ অত্যন্ত

বড়লোক হইয়া গিয়াছে—কড়ি খেলায় সে যতই হারিয়া যাক তাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের শেষ হইবে না। একটা গোল বিস্কুটের ঠোঙায় কড়ির রাশি রাখিয়া দিয়াছিল। সে ঠোঙাটা আবার তোলা থাকিত তাদের বনের ধারের দিকের ঘরটায় উঁচু কুলুঙ্গিটাতে।

তারপর নানা গোলমালে খেলাধূলায় অপুর উৎসাহ গেল কমিয়া, তারপরই গ্রাম ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবার কথা হইতে লাগিল। অপু আর একদিনও ঠোঙার কড়িগুলি লইয়া খেলা করিল না, এমন কি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার সময়েও গোলমালে, ব্যস্ততায়, প্রথম দূর বিদেশে রওনা হইবার উত্তেজনার মুহূর্তে সেটার কথা মনেও উঠে নাই। অত সাধের কড়িভরা ঠোঙাটা সেই কড়িকাঠের নিচেকার বড় কুলুঙ্গিটাতেই রহিয়া গিয়াছিল।

তারপর অনেককাল পরে সে কথা অপুর মনে হয় আবার। তখন অপর্ণা মারা গিয়াছে। একদিন অন্যমনস্কভাবে ইডেন গার্ডেনের কেয়াঝোপে বসিয়া ছিল, গঙ্গার ও-পারের দিকে সূর্যাস্ত দেখিতে দেখিতে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে।

আজও মনে হইল।

কড়ির কৌটো!...একবার সে মনে মনে হাসিল...বহুকাল আগে নিশ্চিহ্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাওয়া ছেলেবেলার বাড়ির উত্তর দিকের ঘরের কুলুঙ্গিতে বসানো সেই টিনের ঠোঙাটা!—দূরে সেটা যেন শূন্যে কোথায় এখনও ঝুলিতেছে, তাহার শৈশবজীবনের প্রতীকস্বরূপ...অস্পষ্ট, অবাস্তব, স্বপ্নময় ঠোঙাটা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, পয়সায় চার গণ্ডা করিয়া মাকড়সার ডিমের মত সেই যে ছোট ছোট বিস্কুট, তারই ঠোঙাটি—উপরে একটা বিবর্ণ-প্রায় হাঁ-করা রাক্ষসের মুখের ছবি...দূরের কোন্ কুলুঙ্গিতে বসানো আছে...তার পিছনে বাঁশবন, শিমুলবন, তার পিছনে সোনাডাঙার মাঠ, ঘুঘুর ডাক... তাদেরও পিছনে তেইশ বছর আগেকার অপূর্ব মায়ামাখানো নিঝুম চৈত্র-দুপুরের রৌদ্রভরা নীলাকাশ...

অপরাজিত

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চৈত্র মাসের প্রথমে একটা বড় পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া গেল। খুব বড় গাড়িবারান্দা, সামনের 'লনে' ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা, খানিকটা জায়গা সামিয়ানা টাঙানো। নিমন্ত্রিত পুরুষ মহিলাগণ যাঁহার যেখানে ইচ্ছা

বেড়াইতেছেন। একটা মার্বেলের বড় চৌবাচ্চায় গোটাকতক কুমুদ ফুল, ঠিক মাঝখানে একটা মার্বেলের ফোয়ারা—গৃহকর্ত্রী তাহাকে লইয়া গিয়া জায়গাটা দেখাইলেন, সেটা নাকি তাদের 'লিলি পণ্ড'। জয়পুর হইতে ফোয়ারাটা তৈয়ারী করাইয়া আনিতে কত খরচ পড়িয়াছে, তাহাও জানাইলেন।

পার্টির সকল আমোদ-প্রমোদের মধ্যে একটি মেয়ের কণ্ঠ-সঙ্গীত সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক মনে হইল। ব্রিজের টেবিলে সে যোগ দিতে পারিল না, কারণ ব্রিজখেলা সে জানে না, গান শেষ হইলে খানিকটা বসিয়া বসিয়া খেলাটা দেখিল। চা, কেক, স্যাণ্ডউইচ, সন্দেশ, রসগোল্লা, গল্প-গুজব, আবার গান! ফিরিবার সময় মনটা খুব খুশী ছিল। ভাবিল—এদের পার্টিতে নেমন্তন্ন পেয়ে আসা একটা ভাগ্যের কথা। আমি লিখে নাম করেছি, তাই আমার হ'ল। যার-তার হোক দিকি? কেমন কাটল সন্ধ্যেটা। আহা, খোকাকে আনলে হ'ত, ঘুমিয়ে পড়বে এই ভয়ে আনতে সাহস হ'ল না যে।—খান-দুই কেক খোকার জন্য চুপিচুপি কাগজে জড়াইয়া পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দেখিল সেগুলি ঠিক আছে কি না।

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া উঠাইতে গিয়া বলিল, ও খোকা, খোকা, ওঠ, খুব ঘুমুচ্ছিস্ যে—হি-হি—ওঠ্ রে। কাজলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। যখনই সে বোঝে বাবা আদর করিতেছে, মুখে কেমন ধরণের মধুর দুষ্টামির হাসি হাসিয়া ঘাড় কাৎ করিয়া কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া আদরের প্রতীক্ষায় থাকে, আর এত আদর খাইতেও পারে।

অপু বলিল, শোন্ খোকা গল্প করি,—ঘুমুসনে—

কাজল হাসিমুখে বলে, বলো দিকি বাবা একটা অর্থ?

হাত কন্ কন্ মাণিকলতা, এ ধন তুমি পেলে কোথা,

রাজার ভাণ্ডারে নেই, বেনের দোকানে নেই—

অপু মনে মনে ভাবে—খোকা, তুই—তুই আমার সেই বাবা। ছেলে বেলায় চলে গিয়েছিলে, তখন তো কিছু বুঝি নি, বুঝতামও না—শিশু ছিলাম! তাই আবার আমার কোলে আদর কাড়াতে এসেছে বুঝি? মুখে বলে, কি জানি, জাঁতি বুঝি?

—আহা হা, জাঁতি কি আর দোকানে পাওয়া যায় না! তুমি বাবা কিছু জান না—

ভাল কথা, কেক্ এনেছি, ছাখ্, বড়লোকের বাড়ির কেক্, ওঠ—

—বাবা তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে, ঐ বইখানা তোলো তো···

আর্টিস্ট বন্ধুটির পত্র। বন্ধু লিখিয়াছে—সমুদ্রপারের বৃহত্তর ভারতবর্ষ শুধু

কুলী-আমদানীর সার্থকতা ঘোষণা করিয়া নীরব থাকিয়া যাইবে? তোমাদের মত আর্টিস্ট লোকের এখানে আসার যে নিতান্ত দরকার। চোখ থাকিয়াও নাই শতকরা নিরানব্বই জনের, তাই চক্ষুষ্মান মানুষদের একবার এ-সব স্থানে আসিতে বলি। পত্র পাঠ এসো, ফিজিতে মিশনারীরা স্কুল খুলিতেছে, হিন্দি জানা ভারতীয় শিক্ষক চায়, দিনকতক মাস্টারী তো করো, তা'পর একটা কিছু ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ চিরদিন মাস্টারী করিবার মত শান্ত ধাত তোমার নয়, তা জানি। আসিতে বিলম্ব কবিও না।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া সে খানিকক্ষণ কি ভাবিল, ছেলেকে বলিল, আচ্ছা খোকা, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যদি চলে যাই, তুই থাকতে পারবি নে? যদি তোকে মামার বাড়ি রেখে যাই?—

কাজল কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, হ্যাঁ তাই যাবে বৈকি! তুমি ভারী দেরি কর, কাশীতে বলে গেলে তিন দিন হবে, ক'দিন পরে এলে? না বাবা—

অপু ভাবিল অবোধ শিশু! এ কি কাশী? এ বহুদূর, দিনের কথা কি এখানে ওঠে?—থাক, কোথায় যাইবে সে? কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে খোকাকে! অসম্ভব!

কাজল ঘুমাইয়া পড়িলে ছাদে উঠিয়া সে অনেকক্ষণ একা বসিয়া রহিল। দূরে বাড়িটার মাথায় সার্কুলার রোডের দিকে ভাঙা চাঁদ উঠিতেছে, রাত্রি বারোটার বেশী—নিচে একটা মোটর লরী ঘস্ ঘস্ আওয়াজ করিতেছে। এই রকম সময়ে এই রকম ভাঙা চাঁদ উঠিত দূরে জঙ্গলের মাথায় পাহাড়ের একটা জায়গায় যেখানে উটের পিঠের মত ফুলিয়া উঠিয়াই পরে বসিয়া গিয়া একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই খাঁজটার কাছে, পাহাড়ী ঢালুতে বাদাম গাছের বনে দিনমানে পাকা পাতায় বনশীর্ষ যেখানে রক্তাভ দেখায়। এতক্ষণে বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত, কক্ কক্ কক্—

সে মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল, সার্কুলার রোড নাই, বাড়িঘর নাই, মোটর লরীর আওয়াজ নাই, ব্রিজের আড্ডা নাই, 'লিলি পণ্ড' নাই, তার ছোট্ট খড়ের বাংলো ঘরখানায় রামচরিত মিশ্র মেজেতে ঘুমাইতেছে, সামনে পিছনে ঘন অরণ্যভূমি, নির্জন, নিস্তব্ধ, আধ-অন্ধকার। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও শুধু উঁচু নীচু ডাঙ্গা, শুকনা ঘাসের বন, সাজা ও আবলুসের বন, শালবন, পাহাড়ী চামেলি ও লোহিয়ার বন—বনফুলের অফুরন্ত জঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল সে মুক্তি, সেই রহস্য, সে সব অনুভূতি, ঘোড়ার পিঠে মাঠের পর মাঠ উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলা, সেই দৃঢ়-পৌরুষ জীবনে, আকাশের সঙ্গে, ছায়াপথের সঙ্গে নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি রাত্রে সে অপূর্ব

মানসিক সম্পর্ক।

এ কি জীবন সে যাপন করিতেছে এখানে? প্রতিদিন একই রকম একঘেয়ে নীরস, বৈচিত্র্যহীন—আজ যা, কালও তা। অর্থহীন কোলাহলে ও সার্থকতাহীন ব্রীজের আড্ডার আবহাওয়ায়, টাকা রোজগারের মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ-জীবন-নদীর স্তব্ধ, সহজ, সাবলীল ধারা যে দিনে দিনে শুকাইয়া আসিতেছে এ কি সে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না?

ঘুমের ঘোরে কাজল বিছানার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এক পাশে সরাইয়া শোয়াইল। একেই তো সুন্দর, তার উপর কি যে সুন্দর দেখাইতেছে খোকাকে ঘুমন্ত অবস্থায়!

কাশী হইতে ফিরিবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অপু 'বিভাবরী' ও 'বঙ্গ সুহৃদ' দুখানা পত্রিকার তরফ হইতে উপন্যাস লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। দুখানাই প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র, দুখানারই গ্রাহক সারা বাংলা জুড়িয়া এবং পৃথিবীর যেখানে যেখানে বাঙালা আছে, সর্বত্র। 'বিভাবরী' তাহাকে সম্প্রতি আগাম কিছু টাকা দিল—'বঙ্গ সুহৃদ'-এর নিজেদের বড় প্রেস আছে—তাহারা নিজের খরচে অপুর একখানা ছোট গল্পের বই ছাপাইতে রাজী হইল। অপুর বইখানির বিক্রয়ও হঠাৎ বাড়িয়া গেল, আগে যে সব দোকানে তাহাকে পুছিতও না—সে সব দোকান হইতে বই চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল। এই সময়ে একটি বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ফার্মের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইল, অপু যেন বিয়া একবার দেখা করে।

অপু বৈকালের দিকে দোকানে গেল। তাহারা বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিজেদের খরচে ছাপাইতে ইচ্ছুক—অপু কি চায়? অপু ভাবিয়া দেখিল। প্রথম সংস্করণ হু-হু কাটিতেছে—অপর্ণার গহণা বিক্রয় করিয়া বই ছাপাইয়াছিল, লাভটা তার সবই নিজের। ইহাদের দিলে লাভ কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু দোকানে দোকানে ছুটাছুটি, তাগাদা—এসব হাঙ্গামাও কমিবে। তা ছাড়া নগদ টাকার একটা মোহ আছে, সাত পাঁচ ভাবিয়া সে রাজী হইল। ফার্মের কর্তা তখনই একটা লেখাপড়া করিয়া লইলেন—আপাততঃ ছ'শো টাকায় কথাবার্তা মিটিল, শ'-দুই সে নগদ পাইল।

দু'শো টাকা খুচরা ও নোটে। এক গাদা টাকা! হাতে ধরে না। কি করা যায় এত টাকায়? পুরানো দিন হইলে সে ট্যাক্সি করিয়া খানিকটা বেড়াইত, রেস্টুরেণ্টে খাইত, বায়স্কোপ দেখিত। কিন্তু আজকাল আগেই খোকার কথা মনে হয়। খোকাকে কি আনন্দ দেওয়া যায় এ টাকায়? মনে হয় লীলার কথা। লীলা কত আনন্দ করিত আজ!

একটা ছোট গলি দিয়া যাইতে যাইতে একটা শরবৎ-এর দোকান। দোকানটাতে পান বিড়ি বিস্কুট বিক্রি হয়, আবার গোটা দুই তিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে! দিনটা খুব গরম, অপু শরবৎ খাওয়ার জন্য দোকানটাতে দাঁড়াইল। অপুর একটু পরেই দু'টি ছেলেমেয়ে সেখানে কি কিনিতে আসিল। গলিরই কোন গরিব ভাড়াটে গৃহস্থ ঘরের ছোট ছেলে মেয়ে—মেয়েটি বছর সাত, ছেলেটি একটু বড়। মেয়েটি আঙুল দিয়া সিরাপের বোতল দেখাইয়া বলিল—ওই ছাখ দাদা সবুজ—বেশ ভালো, না? ছেলেটি বলিল—সব মিশিয়ে ছায়। বরফ আছে, ওই যে—

—ক' পয়সা নেয়?

—চার পয়সা।

অপুর জন্য দোকানী শরবৎ মিশাইতেছে, বরফ ভাঙিতেছে, ছেলেমেয়ে দু'টি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি অপুর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাকে ওই সবুজ বোতল থেকে দেবে, না?

যেন সবুজ বোতলের মধ্যে সচীদেবীর পায়স পোরা আছে।

অপুর মন করুণার্দ্র হইল। ভাবিল—এরা বোধ হয় কখনও কিছু দেখেনি এই রং করা টক চিনির রসকে কি ভাবছে, ভালো সিরাপ কি জানে না। বলিল—খুকী, খোকা খাবে? খাও না—ওদের দু'গ্লাস শরবৎ দাও তো—

প্রথমটা তারা খাইতে রাজী হয় না, অনেক করিয়া অপু তাহাদের লজ্জা ভাঙিল। অপু বলিল—ভালো সিরাপ তোমার আছে? থাকে তো দাও, আমি দাম দোব। কোন জায়গা থেকে এনে দিতে পার না?

বোতলে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা ভাল সিরাপ এ অঞ্চলে নাকি কুত্রাপি মেলা সম্ভব নয়। অবশেষে সেই শরবৎই এক এক বড় গ্লাস দুই ভাই-বোন মহাতৃপ্তি ও আনন্দের সহিত খাইয়া ফেলিল, সবুজ বোতলের সেই টক চিনির রসই।

অপু তাহাদের বিস্কুট ও এক পয়সা মোড়কের বাক্সে চকলেট্ কিনিয়া দিল—দোকানটাতে ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় ছাই! তবুও অপুর মনে হইল পয়সা তার সার্থক হইয়াছে আজ।

বাসায় ফিরিয়া তাহার মনে হইল বড় সাহিত্যের প্রেরণার মূলে এই মানব-বেদনা। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রজাস্বত্ব আইন 'সার্ফ' নীতি; জার-শাসিত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, শীত, অত্যাচার, কুসংস্কার, দারিদ্র্য—গোগোল, ডস্টয়ভ্স্কি, গোর্কি, টলস্টয় ও শেকভের সাহিত্য সম্ভব করিয়াছে। সে বেশ কল্পনা করিতে পারে, দাসব্যবসায়ের দুর্দিনে, আফ্রিকার এক মরুবেষ্টিত

পল্লী-কুটির হইতে কোমল বয়স্ক এক নিগ্রো বালক পিতামাতার স্নেহকোল হইতে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্যুত হইয়া বহু দূর বিদেশের দাসের হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল, বহুকাল আর সে বাপ-মাকে দেখিল না, ভাই-বোনেদের দেখিল না—দেশে দেশে তাহার অভিনব জীবনধারার দৈন্য, অত্যাচার ও গোপন অশ্রুজলের কাহিনী, তাহার জীবনের সে অপূর্ব ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা সে যদি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত! আফ্রিকার নীরব নৈশ আকাশ তাহাকে প্রেরণা দিত, তাম্রবর্ণ মরুদিগন্তের স্বপ্নমায়া তাহার চোখে অঞ্জন মাখাইয়া দিত; কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাহারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া বিশ্ব হইতে বিদায় লইল।

দিন-দুই পরে একদিন সন্ধ্যার পর গড়ের মাঠ হইতে একা বেড়াইয়া ফিরিবার মুখে 'হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের সামনে একটুখানি দাঁড়াইয়া—একজন আধাবয়সী লোক কাছে আসিয়া বলিল—বাবু প্রেমারা খেলবেন? খুব ভাল জায়গা। আমি নিয়ে যাব, এখান থেকে পাঁচ মিনিট। ভদ্র জায়গা, কোন হাঙ্গামায় পড়তে হবে না। আসবেন?

অপু বিস্মিত মুখে লোকটার মুখের দিকে চাহিল। আধময়লা কাপড় পরণে, খোঁচা খোঁচা কড়া দাড়ি-গোঁফ, ময়লা দেশী টুইলের সার্ট, কব্জির বোতাম নাই—পান ঠোঁট দুটো কালো। দেখিয়াই চিনিল—সেই ছাত্রজীবনের পরিচিত বন্ধু হরেন—সেই যে ছেলেটি একবার তাহাদের কলেজ হইতে বই চুরি করিয়া পলাইতে গিয়া ধরা পড়ে। বহুকাল আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই—অপু লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবার পর আর কখনো নয়। লোকটাও অপুকে চিনিল, থতমত খাইয়া গেল, অপুও বিস্মিত হইয়াছিল—এসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা তাহার নাই—জীবনে কখনও না—তবুও সে বুঝিয়াছিল তাহার এই ছাত্র-জীবনের বন্ধুটি কোন্ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কিছু উত্তর করিবার পূর্বে হরেন আসিয়া তাহার হাত দু'টি ধরিল—বলিল, মাপ কর ভাই, আগে টের পাই নি। বহুকাল পরে দেখা—থাক কোথায়?—

অপু বলিল—তুমি থাক কোথায়—এখানেই আছ—কত দিন?...

—এই নিকটেই। তালতলা লেন—আসবে...অনেক কথা আছে—

আজ আর হবে না; আসছে সোমবার পাঁচটার সময় যাব। নম্বরটা লিখে নি।

—সে হবে না ভাই—তুমি আর আসবে না—তোমার দেখা আর পাবার ভরসা রাখি নে, আজই চলো।

অতি অপরিচ্ছন্ন বাসা। একটি মাত্র ছোট ঘর। অপু ঘরে ঢুকিতেই কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ তাহার নাকে গেল! ছোট্ট ঘর, জিনিসপত্রে ভর্তি, মেঝেতে বিছানা-পাতা, তাহারই একপাশে হরেন অপুর বসিবার জায়গা করিয়া দিল। ময়লা চাদর, ময়লা কাঁথা, ময়লা বালিশ, ময়লা কাপড়, ছেঁড়া মাদুর—কলাই-করা গ্লাস, থালা, কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন, কাঁথার আড়াল হইতে তিন-চারটি শীর্ণ কালো কালো ছোট হাত পা বাহির হইয়া আছে—একটি সাত আট বছরের মেয়ে ওদিকের দালানে দুয়ারের চৌকাঠের উপর বসিয়া। দালানের ওপাশটা রান্নাঘর—হরেনের স্ত্রী সম্ভবতঃ রাঁধিতেছে।

হরেন মেয়েটিকে বলিল—ওরে টেঁপি, তামাক সাজ তো—

অপু বলিল—ছোট ছেলেমেয়েকে দিয়ে তামাক সাজাও কেন?···নিজে সাজো—ও শিক্ষা ভালো নয়—

হরেন স্ত্রীর উদ্দেশে চীৎকার করিয়া বলিল—কোথায় রৈলে গো, এদিকে এসো, ইনি আমার কলেজ-আমলের সকলের চেয়ে বড় বন্ধু, এত বড় বন্ধু আর কেউ ছিল না—এঁর কাছে লজ্জা করতে হবে না—একটু চা-টা খাওয়াও—এসো এদিকে।

তারপর হরেন নিজের কাহিনী পাড়িল। কলেজ ছাড়িয়াই বিবাহ হয়—তারপর এই দুঃখ-দুর্দশা—বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ এই সব লেণ্ডি-গেণ্ডি। কত রকম করিয়া দেখিয়াছে—কিছুতেই কিছু হয় না। স্কুলমাষ্টারী, দোকান, চালানী ব্যবসা, ফটোগ্রাফের কাজ, কিছুই বাকী রাখে নাই। আজকাল যাহা করে তা তো অপু দেখিয়াছে। বাসায় কেহ জানে না—উপায় কি?—এতগুলির মুখে অন্ন তো—এই বাজার ইত্যাদি।

হরেনের কথাবার্তার ধরণ অপুর ভাল লাগিল না। চোখেমুখে কেমন যেন একটা—ঠিক বোঝানো যায় না—অপুর মনে হইল হরেন এই সব নীচ ব্যবসায়ে পোক্ত হইয়া গিয়াছে।

হরেনের স্ত্রীকে দেখিয়া অপুর মন সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। কালো শীর্ণ চেহারা, হাতে গাছকতক কাচের চুড়ি। মাথার সামনের দিকে চুল উঠিয়া যাইতেছে, হাতে কাপড়ে বাটনার হলুদ-মাখা। সে এমন আনন্দ ও ক্ষিপ্রতার সহিত চা আনিয়া দিল যে, সে মনে করে যেন এত দিনে স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধুর সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গিয়াছে—দুঃখ বুঝি ঘুচিল। উঠিবার সময় হরেন বলিল—ভাই বাড়ি-ভাড়া কাল না দিলে অপমান হ'ব—পাঁচটা টাকা থাকে তো দাও তো।

অপু টাকাটা দিয়া দিল। বাহির হইতে যাইতেছে, বড় ছেলেটিকে তার মা

যেন কি শিখাইয়া দিল, সে দরজার কাছে আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু, আমার দু'খানা ইস্কুলের বই এখনও কেনা হয় নি—কিনে দেবেন? বই না কিনলে মাস্টার মারবে—

হরেন ভানের সুরে বলিল—যা যা আবার বই—হ্যাঁ, ইস্কুলও যত—ফি বছর বই বদলাবে—যা এখন—

অপু তাহাকে বলিল—এখন তো আর কিছু হাতে নেই খোকা, পকেট একেবারে খালি।

হরেন অনেক দূব পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সে চাষবাস করিবার জন্য উত্তরপাড়ায় জমি দেখিয়া আসিয়াছে, দুই হাজাব টাকা হইলে হয়—অপূর্ব কি টাকাটা ধার দিতে পারিবে? না হয়, আধাআধি বথরা—খুব লাভের ব্যবসা।

প্রথম দিনের সাক্ষাতেই এ সব?

কেমন একটা অপ্রীতিকব মনোভাব লইয়া অপু বাসায় ফিরিল। শেষে কিনা জুয়ার দালালী? প্রথম যৌবনে ছিল চোর, আরও কত কি করিয়াছে, কে খোঁজ রাখে? এ আব ভাল হইল না!

দিন তিনেক পর একদিন সকালে হবেন আসিয়া হাজির অপুর বাসায়। নানা বাজে কথার পর উত্তবপাড়ার জমি লওয়াব কথা পাড়িল। টিউব-ওয়েল বসাইতে হইবে। কাবণ জলেব সুবিধা নাই—অপূর্ব কত টাকা দিতে পারে? উঠিবার সময় বলিল···ওহে তুমি মানিককে কি বই কিনে দেবে বলেছিলে, আমায় বলছিল। অপু ভাবিয়া দেখিল এরূপ কোনকথা মানিককে সে বলে নাই·· যাহা হউক, না হয় দিয়ে দিবে এখন। মানিককে বইয়ের দরুন টাকা হরেনের হাতে দিয়া দিল।

তাহার পর হইতে হরেনের যাতায়াত শুরু হইল একটু ঘন ঘন। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে ছেলে মানিকও আসিতে লাগিল! কখনও সে আসিয়া বলে তাহারা বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে, টাকা দিন কাকাবাবু। কখনও তাহার জুতা নাই, কখনো ছোট খোকার জামা নাই···কখনও তাহার বড দিদি, ছোট দিদির বায়না। ইহারা আসিলে দু-তিন টাকার কমে অপুর পার হইবার উপায় নাই। হরেনও নানা ছুতায় টাকা চায়, বাড়ি ভাড়া—স্ত্রীর অসুখ।

একদিন কাজলের একটা সেলুলয়েডের ঘর-সাজানো জাপানী সামুরাই পুতুল খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তার দিন-দুই আগে মানিকের সঙ্গে তার ছোট বোন টেঁপি আসিয়াছিল···অনেকক্ষণ পুতুলটা নাড়াচাড়া করিতেছিল, কাজল দেখিয়াছে। তার পর দিন-দুই আর সেটার খোঁজ নাই, কাজল আজ দেখিল পুতুলটা নাই। ইহার দিন পনেরো পরে হরেনের বাসায় চায়ের

নিমন্ত্রণে গিয়া অপু দেখিল, কাজলের জাপানী পুতুলটা একেবারে সামনেই একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের পাশে বসানো। পাছে ইহারা লজ্জায় পড়ে তাই সেদিকটা পিছু ফিরিয়া বসিল ও যতক্ষণ রহিল, লণ্ঠনটার দিকে আদৌ চাহিল না। ভাবিল···থাক গে, খুকী লোভ সামলাতে না পেরে এনেছে, খোকাকে আর একটা কিনে দেবো!

উঠিয়া আসিবার সময় মানিক বলিল—মা বললেন, তোর কাকাবাবুকে বল একদিন আমাদের কালীঘাট দেখিয়ে আনতে—সামনের রবিবার চলুন কাকাবাবু আমাদের ছুটি আছে, আমিও যাব।

অপুর বেশ কিছু খরচ হইল রবিবারে। ট্যাক্সিভাড়া, জলখাবার, ছেলে-পিলেদের খেলনা ক্রয়, এমন কি বড মেয়েটির একখানা কাপড় পর্যন্ত। কাজলও গিয়াছিল, সে এই প্রথম কালীঘাট দেখিয়া খুব খুশী।···

সেদিন নিজের অলক্ষিতে অপুর মনে হইল, তাহার কবিরাজ বন্ধুটিও তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা···তাদের প্রথম জীবনের সেই দারিদ্র্য—সেই পরিশ্রম—কখনও বিশেষ কিছু তো চাগে নাই কোনদিন—বরং কিছু দিতে গেলে ক্ষুণ্ণ হইত। কিন্তু আন্তরিক স্নেহটুকু ছিল তাহার উপর। এখনও ভাবিলে অপুর মন উদাস হইয়া পড়ে।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছোকরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিতে শুনিতে বেশ, সুন্দর চোখ-মুখ, একটু লাজুক, কথা বলিতে গেলে মুখ রাঙ্গা হইয়া যায়।

অপু তাহাকে চিনিল···চাঁপদানীর পূর্ণ দিঘড়ীর ছেলে রসিকলাল—যাহাকে সে টাইফয়েড হইতে বাঁচাইয়াছিল। অপু বলিল—রসিক তুমি আমার বাসা জানলে কি ক'রে ?···

—আপনার লেখা বেরুচ্চে 'বিভাবরী' কাগজে—তাদের অফিস থেকে নিয়েছি—

—তারপর, অনেককাল পর দেখা—কি খবর বলো।

—শুনুন, দিদিকে মনে আছে তো ? দিদি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে—বলে দিয়েচে যদি কলকাতায় যাস, তবে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করিস। আপনার কথা বড্ড বলে, আপনি একবার আসুন না চাঁপদানীতে।

—পটেশ্বরী ? সে এখনও মনে ক'রে রেখেছে আমার কথা ?

রসিক স্বর নীচু করিয়া বলিল—আপনার কথা এমন দিন নেই—আপনি চলে এসেচেন আট দশ বছর হোল—এই আট দশ বছরের মধ্যে আপনার কথা বলে নি—এমন একটা দিনও বোধ হয় যায় নি। আপনি কি কি খেতে

ভালবাসতেন—সে সব দিদির এখনও মুখস্থ। কলকাতায় এলেই আমায় বলে মাস্টার মশায়ের খোঁজ করিস না রে? আমি কোথায় জানব আপনার খোঁজ —কলকাতা শহর কি চাঁপদানী? দিদি তা বোঝে না। তাই এবার 'বিভাবরী'তে আপনার লেখা—

—পটেশ্বরী কেমন আছে? আজকাল আর সে সব শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার—

—শাশুড়ী মারা গিয়েচে, আজকাল কোন অত্যাচার নেই, দু তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে,—সে-ই আজকাল গিন্নী, তবে সংসারের বড কষ্ট। আমাকে বলে দেয় বোতলের চাট্‌নি কিনতে—দশ আনা দাম—আমি কোথা থেকে পাব —তাই একটা ছোট বোতল আজ এই দেখুন কিনে নিয়ে যাচ্ছি ছ' আনায়। টেঁপারিব আচার। ভালো না?

—এক কাজ করো। চলো আমি তোমাকে আচাব কিনে দিচ্ছি, আমের আচার ভালবাসে? চলো দেশী চাট্‌নি কিনি। ভিনিগাব দেওয়া বিলিতি চাট্‌নি হয়তো পছন্দ করবে না।

—আপনি কবে আসবেন? আপনাব সঙ্গে দেখা হয়েচে অথচ আপনাকে নিয়ে যাই নি শুনলে দিদি আমাকে বাড়িতে তিষ্ঠুতে দেবে না কিন্তু, আজই আসুন না? —

—সে এখন হবে না, সময় নেই। সুবিধে মত দেখব।

অপু অনেকগুলি ছেলেমেয়েব খেলনা, খাবার চাট্‌নি কিনিয়া দিল। বসিককে স্টেশনে তুলিয়া দিযা আসিল। বসিক বলিল—আপনি কিন্তু ঠিক যাবেন একদিন এব মধ্যে—নৈলে ওই বললুম যে—

কি চমৎকার নীল আকাশ আজ। গবম আজ একটু কম।

চৈত্র দুপুরের এই ঘন নীল আকাশের দিকে চাহিলেই আজকাল কেন শৈশবের কথাই তাহার মনে পডে?

একটা জিনিষ সে লক্ষ্য করিয়াছে। বাল্যে যখন অন্য কোনও স্থানে সে যায় নাই—যখন যাহা পডিত—মনে মনে তাহার ঘটনাস্থলের কল্পনা করিতে গিয়া নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবন, আমবাগান, নদীব ঘাট, কুঠির মাঠেব ছবি মনে ফুটিয়া উঠিত—তাও আবার তাদের পাডার ও তাদের বাড়ির আশেপাশের জায়গার। তাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন তো বামায়ণ মহাভারত মাখানো ছিল—দশরথের রাজপ্রাসাদ ছিল তাদের পাড়ার ফণি মুখুয্যেদের ভাঙা দোতলা বাড়িটা—মাধবীকঙ্কণে পডা একলিঙ্গের মন্দির ছিল ছিরে পুকুরের পশ্চিমদিকের সীমানার বড বাঁশঝাড়টার তলায়—বঙ্গবাসীতে পডা জোয়ান-অব্-আর্ক মেষপাল চরাইত নদীপারের দেয়াড়ের কাশবনের চরে, শিমুল গাছের ছায়ায়…

তারপর বড় হইয়া কত নতুন স্থানে একে একে গেল, মনের ছবি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে লাগিল—ম্যাপ চিনিল, ভূগোল পড়িল, বড় হইয়া যে সব বই পড়িল তাদের ঘটনা নিশ্চিন্দিপুরের মাঠে, বনে, নদীর পথে ঘাটে নাই কিন্তু, এতকালের পরেও বাল্যের যে ছবিগুলি একবার অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তা অপরিবর্তিতই আছে—এতকাল পরও রামায়ণ মহাভারতের কোনও ঘটনা কল্পনা করে—নিশ্চিন্দিপুরের সেই অস্পষ্ট, বিস্মৃতপ্রায় স্থানগুলিই তার রথীভূমি হইয়া দাঁড়ায়—অনেককাল পর সেদিন আর একবার পুরনো বইয়ের দোকানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাধবীকঙ্কণ ও জীবনসন্ধ্যা পড়িতেছিল—কি অদ্ভুত!—পাতায় পাতায় নিশ্চিন্দিপুর মাখানো, বাল্যের ছবি এখনও সেই অস্পষ্ট-ভাবে-মনে-হওয়া জঙ্গলে-ভরা পোড়ো পুকুরটার পশ্চিম সীমানায় বাঁশঝাড়ের তলায়!…

এবার মাঝে মাঝে দু-একটি পূর্ব-পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে অপুর দেখা হইতে লাগিল। প্রায়ই কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার—জানকী মফঃস্বলের একটা গবর্ণমেণ্ট ইস্কুলের হেডমাস্টার, মন্মথ এটর্নির ব্যবসায়ে বেশ উপার্জন করে। দেবব্রত একবার ইতিমধ্যে সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়াছিল, স্ত্রীর পা সারিয়া গিয়াছে, দু'টি মেয়ে হইয়াছে। চাকুরিতে বেশ নাম করিয়াছে, তবে চেষ্টায় আছে কণ্ট্রাক্টরী ব্যবসায় স্বাধীনভাবে আরম্ভ করিতে। দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু সেই সমীর আজকাল ইন্‌সিওরেন্সের বড় দালাল। সে চিরকাল পয়সা চিনিত, হিসাবী ছিল—আজকাল অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। কষ্টদুঃখ করিতে করিতে একবারও সে ইহাদিগকে হিংসা করে না। তারপর এবার জানকীর সঙ্গে একদিন কলকাতায় দেখা হইল। মোটা হইয়া গিয়াছে বেজায়, মনের তেজ নাই, গৃহস্থালীর কথাবার্তা—অপুর মনে হইল সে যেন একটা বদ্ধ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে।

তাহার এটর্নি বন্ধু মন্মথ একদিন বলিল—ভাই, সকাল থেকে ব্রিফ নিয়ে বসি, সারাদিনের মধ্যে আর বিশ্রাম নেই—খেয়েই হাইকোর্ট, পাঁচটায় ফিরে একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি ঘণ্টা-তিনেক—তারপর বাড়ি ফিরে আবার কাজ—খবরের কাগজখানা পড়বারও সময় পাইনে, কিন্তু এত টাকা রোজগার করি, তবু মনে হয়, ছাত্রজীবনই ছিল ভাল। তখন কোন একটা জিনিস থেকে বেশী আনন্দ পেতুম—এখন মনে হয়, আই হ্যাভ লস্ট দি সস্ অফ্ লাইফ—

অপু নিজের কথা ভাবিয়া দেখে। কৈ, এত বিরুদ্ধ ঘটনার ভিতর দিয়াও তাহার মনে আনন্দ—কেন নষ্ট হয় নাই? নষ্ট হয় তো নাই-ই, কেন তাহা

দিনে দিনে এমন অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্যে বাড়িয়া চলিয়াছে? কেন পৃথিবীটা, পৃথিবী নয়—সারা বিশ্বটা, সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বটা এক অপরূপ রঙে তাহার কাছে রঙীন? আর দিনে দিনে এ কি গহন গভীর রহস্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া প্রতি বিষয়ে অতি তীব্রভাবে সচেতন করিয়া দিতেছে?...

সে দেখিতে পায় তার ইতিহাস, তার এই মনের আনন্দের প্রগতির ইতিহাস, তার ক্রমবর্ধমান চেতনার ইতিহাস।

এই জগতের পিছনে আর একটা যেন জগৎ আছে। এই দৃশ্যমান আকাশ, পাখির ডাক, এই সমস্ত সংসার-জীবন-যাত্রা—তারই ইঙ্গিত আনে মাত্র—দূর দিগন্তের বহুদূর ওপারে কোথায় যেন সে জগৎটা—পিঁয়াজের একটা খোসার মধ্যে যেমন আর একটা খোসা তার মধ্যে আর একটা খোসা, সেটাও তেমনি এই আকাশ, বাতাস, সংসারের আবরণে কোথাও যেন ঢাকা আছে, কোন্ জীবন-পারের মনের পারের দেশে। স্থির সন্ধ্যায় নির্জনে একা কোথাও বসিয়া ভাবিলেই সেই জগৎটা একটু একটু নজরে আসে।

সেই জগতটার সঙ্গে যোগ-সেতু প্রথম স্থাপিত হয় তার বাল্যে—দিদি যখন মারা যায়। তারপর অনিল—মা—অপর্ণা—সর্বশেষে লীলা। দুস্তর অশ্রু পারাবার সারাজীবন ধরিয়া পাড়ি দিয়া আসিয়া আজ যেন বহু দূরে সে-দেশের তালীবনরেখা অস্পষ্ট নজরে আসে।

আজ গোলদীঘির বেঞ্চিখানায় বসিয়া তাই সে ভাবিয়া দেখিল, অনেক দিন আগে তার বন্ধু অনিল যে-কথা বলিয়াছিল, এ জেনারেশনের হাত হইতে কাজের ভার লওয়া—আর সবাই তা লইয়াছে, তার সকল সহপাঠীই এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, দিকে দিকে জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে তারা নামিয়া পড়িয়াছে, কেবল ভবঘুরে হইয়াছে সে ও প্রণব। কিন্তু সত্য কথা সে বলিবে? মন তার কি বলে?

তার মনে হয় সে যাহা পাইয়াছে জীবনে, তাহাতেই তার জীবন হইয়াছে সার্থক। সে চায় না অর্থ, চায় না—কি সে চায়?

সেটাও তো খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে না। সে কি অপরূপ জীবন-পুলক এক একদিন দুপুরের রোদে ছাদটাতে সে অনুভব করে, তাকে অভিভূত উত্তেজিত করিয়া তোলে, আকাশের দিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকে, যেন সে দেববাণীর প্রত্যাশা করিতেছে।...

কাজল কি একটা বই আগ্রহের সঙ্গে পড়িতেছিল—অপু ঘরে ঢুকিতেই চোখ তুলিয়া ব্যগ্র উৎসাহের সুরে উজ্জ্বলমুখে বলিল—ওঃ, কি চমৎকার গল্পটা বাবা।—শোনো না বাবা—এখানে বসো—। পরে সে আরও কি সব বলিয়া

যাইতে লাগিল। অপু অন্যমনস্ক মনে ভাবিতেছিল—বিদেশে যাওয়ার ভাড়া সে যোগাড় করিতে পারে—কিন্তু খোকা—খোকাকে কোথায় রাখিয়া যায়?··· মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিব? মন্দ কি···কিছু দিন না হয় সেখানেই থাকুক—বছর দুই তিন—তারপর সে তো ঘুরিয়া আসিবেই। তাই করিবে? মন্দ কি?

কাজল অভিমানের সুরে বলিল—তুমি কিচ্ছু শুন্‌চ না, বাবা—

—শুন্‌ব না কেন রে, সব শুন্‌ছি। তুই বলে যা না?

—ছাই শুনছো, বল দিকি শ্বেত পরী কোন্ বাগানে আগে গেল?

বলিল—কোন্ বাগানে?—আচ্ছা একটু আগে থেকে বল্‌তো খোকা—ওটা ভাল মনে নেই! খোকা অতশত ঘোরপ্যাচ বুঝিতে পারে না,—সে আবার গোড়া হইতে গল্প-বলা শুরু করিল—বলিল—এইবার তো রাজকন্যে শেকড় খুঁজতে যাচ্চে, কেমন? মনে আছে তো?—(অপু এক বর্ণও শোনে নাই) তারপর শোনো বাবা—

কাজলের মাথার চুলের কি সুন্দর ছেলেমানুষি গন্ধ!—দোলা, চুষিকাটি, ঝিনুকবাটি, মায়ের কোল—এই সব মনে করাইয়া দেয়—নিতান্ত কচি। সত্যি ওর দিকে চাহিয়া দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না—কি হাসে, কি চোখ দু'টি—মুখ কি সুন্দর—এইটুকু এক রত্তি ছেলে—যেন বাস্তব নয়, যেন এ পৃথিবীর নয়—কোন্ সময় জ্যোৎস্নাপরী আসিয়া ওকে যেন উড়াইয়া লইয়া কোনও স্বপ্নপারের দেশে লইয়া যাইবে—দিনরাত কি চঞ্চলতা, কি সব অদ্ভুত খেয়াল ও আব্‌দার—অথচ কি অবোধ অসহায়!—ওকে কি করিয়া প্রতারণা করা যাইবে?—ও তো একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—ওকে কি বলিয়া ভুলানো যায়? অপু মনে মনে সেই ফন্দিটাই ভাবিতে লাগিল।

ছেলেকে বলিল—চিনি নিয়ে আয় তো খোকা—একটু হালুয়া করি।

কাজল মিনিট দশেক মাত্র বাহিরে গিয়াছে—এমন সময় গলির বাহিরে রাস্তায় কিসের একটা গোলমাল অপুর কানে গেল। বাহির হইয়া ঘরের দোরে দাঁড়াইল—গলির ভিতর হইতে লোক দৌড়াইয়া বাহিরের দিকে ছুটিতেছে একজন বলিল—একটা কে লরি চাপা পড়েছে—

অপু দৌড়িয়া গলির মুখে গেল! বেজায় ভিড়, সবাই আগাইতে চায়, সবাই ঠেলাঠেলি করিতেছে। অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিয়াছে। একজন কে বলিল···কে চাপা পড়েছে মশাই···

—ওই যে ওখানে একটি ছেলে—আহা মশায়, তখনই হয়ে গিয়েছে—মাথাটা আর নেই—

অপু রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল···বয়স কত?

বছর নয় দশ হবে—ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ ফর্সা দেখতে—আহা!—

অপু এ প্রশ্নটা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না···তাহার গায়ে কি ছিল। কাজল তার নতুন তৈরী খদ্দরের শার্ট পরিয়া এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছে···

কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ অপু হাতে পায়ে অদ্ভুত ধরণের বল পাইল···বোধ হয় সে যে খুব ভালবাসে, সে ছাড়া এমন বল আর কেহ পায় না এমন সময়ে। খোকার কাছে এখনি যাইতে হইবে···যদি একটুও বাঁচিয়া থাকে—সে বোধ হয় জল খাইবে, হয়তো ভয় পাইয়াছে—

ওপারের ফুটপাতে গ্যাসপোস্টের পাশে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পুলিশ আসিয়াছে—ট্যাক্সিতে ধরাধরি করিয়া দেহটা উঠাইতেছে। অপু ধাক্কা মারিয়া সামনের লোকজনকে হঠাইয়া খানিকটা জায়গা ফাঁকা করিয়া ফেলিল। কিন্তু ফাঁকায় আসিয়া সামনে ট্যাক্সিটার দিকে চাহিয়াই তাহার মাথাটা এমন ঘুরিয়া উঠিল যে, পাশের লোকের কাঁধে নিজের অজ্ঞাতসারে ভর না দিলে সে হয়তো পড়িয়াই যাইত। ট্যাক্সির সামনে যে ভিড় জমিয়াছে তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া ডিঙি মারিয়া কাণ্ডটা দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে—কাজল। অপু ছুটিয়া গিয়া ছেলের হাত ধরিল—কাজল ভীত অথচ কৌতূহলী চোখে মৃত দেহটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল—অপু তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিল।
—কি দেখছিলি ওখানে?···আয় বাসায়—

অপু অনুভব করিল, তাহার মাথা যেন ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে—সারা দেহে যেন এইমাত্র কে ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারির শক্ লাগাইয়া দিয়াছে।

গলির পথে কাজল একটু ইতস্ততঃ করিয়া অপ্রতিভের সুরে বলিল—বাবা গোলমালে আমায় যে সিকিটা দিয়েছিলে চিনি আনতে, কোথায় পড়ে গিয়েচে খুঁজে পাইনি।

—যাক গে। চিনি নিয়ে চলে আসতে পারতিস্ কোন্‌কালে—তুই বড় চঞ্চল ছেলে খোকা।

দিন দুই পরে সে কি কাজে হ্যারিসন্ রোড দিয়া চিৎপুরের দিকে ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিল, মোড়ের কাছে শীলেদের বাড়ির রোকড়নবিশ রামধন-বাবুকে ছাতি মাথায় যাইতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিল, কাছে গিয়া বলিল, কি রামধনবাবু, চিনতে পারেন? রামধনবাবু হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, অপূর্ববাবু যে? তারপর কোথা থেকে

আজ এতকাল পরে! ওঃ আপনি একটু অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েছেন, তখন ছিলেন ছোকরা—

অপু হাসিয়া বলিল—তা বটে। এদিকেও চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হল—কতকাল আর ছোকরা থাকব—আপনি কোথায় চলেছেন ?

—অফিস যাচ্ছি, বেলা প্রায় এগারোটা বাজে—না? একটু দেরি হয়ে গেল। একদিন আসুন না? কতদিন তো কাজ করেছেন, আপনার পুরনো অফিস, হঠাৎ চাকরিটা দিলেন ছেড়ে, তা নইলে আজ এ্যাসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার হ'তে পারতেন, হরিচরণবাবু মারা গিয়াছেন কিনা।

সত্যিই বটে বেলা সাড়ে দশটা। রামধনবাবু পুরনো দিনের মত ছাতি মাথায়, লংক্লথের ময়লা ও হাত-ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে, ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়া, অপু দশ বৎসর পূর্বে আফিসটাতে কাজ করিত, সেখানে গুটি গুটি চলিয়াছেন।

অপু জিজ্ঞাসা করিল, রামধনবাবু, কতদিন কাজ হ'ল ওদের ওখানে আপনার সবসুদ্ধ ?

রামধনবাবু পুরনো দিনের মত গর্বিতস্বরে বলিল, এই সাঁইত্রিশ বছর যাচ্ছে। কেউ পারবে না বলে দিচ্ছি,—এক কলমে এক সেরেস্তায়। আমার হ্যাখ্‌তায় পাঁচ পাঁচটা ম্যানেজার বদল হ'ল—কত এল, কত গেল—আমি ঠিক বজায় আছি। এ শর্মার চাকরি ওখান থেকে কেউ নড়াতে পারছেন না—যিনিই আসুন। হাসিয়া বলিলেন,—এবার মাইনে বেড়েছে, এই পঁয়তাল্লিশ হ'ল।

অপুর মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—সাঁইত্রিশ বছর একই অন্ধকার ঘরে একই হাতবাক্সের উপর ভারী খেরো-বাঁধানো রোকড়ের খাতা খুলিয়া কালি ও ষ্টিলপেনের সাহায্যে শীলেদের সংসারের চালডালের হিসাব লিখিয়া চলা—চারিধারে সেই একই দোকান-পসার, একই পরিচিত গলি, একই সহকর্মীর দল, একই কথা ও আলোচনা—বারোমাস, তিনশো তিরিশদিন!—সে ভাবিতে পারে না—এই বদ্ধজল, পঙ্কিল, পচা পানা পুকুরের মত গতিহীন, প্রাণহীন, ক্ষুদ্র জীবনের কথা ভাবিলেও তাহার গা কেমন করিয়া উঠে।

বেচারী রামধনবাবু—দরিদ্র, বৃদ্ধ, ওর দোষ নাই, তাও সে জানে। কলিকাতার বহু শিক্ষিতসমাজে, আড্ডায়, ক্লাবে সে মিশিয়াছে। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন—অর্থহীন, ছন্দহীন, ঘটনাহীন দিনগুলি! শুধু টাকা, টাকা—শুধু খাওয়া, পানাসক্তি, ব্রিজখেলা, ধূমপান, একই তুচ্ছ বিষয়ে একঘেয়ে অসার বুকুনি—তরুণ মনের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়, আনন্দকে ধ্বংস করে, দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করে, শেষে ঘোর কুয়াশা আসিয়া সূর্যালোককে রুদ্ধ করিয়া দেয়—ক্ষুদ্র,

পঙ্কিল, অকিঞ্চিৎকর জীবন কোন রকমে খাত বাহিয়া চলে!...সে শক্তিহীন নয়—এই পরিণাম হইতে সে নিজেকে বাঁচাইবে।

তারপর সে রামধনবাবুর অনুরোধে সে কতকটা কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া শীলেদের বাড়ি গেল। সেই অফিস, ঘোরদোর, লোকেব দল বজায় আছে। প্রবোধ মুহুরী বডলোক হইবার জন্য কোন লটারীতে প্রতি বৎসর একখানি টিকিট কিনিতেন, বলিতেন—ও পাঁচটা টাকা বাজে খরচের সামিল ধবে রেখেছি দাদা। যদি একবার লেগে যায়, তবে সুদে আসলে সব উঠে আসবে। তাহা আজও আসে নাই, কারণ তিনি আজও দেবোত্তর এস্টেটের হিসাব কষিতেছেন।

খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল সকলে। মেজবাবু কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বেলা এগারোটা বাজে, তিনি এই মাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছেন—বিলিয়ার্ড ঘরের সামনের বারান্দাতে চাকর তাঁহাকে এখনি তৈল মাখাইবে, বড রূপার গুডগুডিতে রেশমের গলাবন্ধ-ওয়ালা নলে বেহারা তামাক দিয়া গেল।

এ বাড়ির একটি ছেলেকে অপু পূর্বে দিনকতক পড়াইয়াছিল, তখন সে ছোট ছিল, বেশ সুন্দর দেখিতে ছিল—ভারী পবিত্র মুখশ্রী, স্বভাবটিও ছিল ভারী মধুর। সে এখন আঠার উনিশ বছরের ছেলে, কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল—অপু দেখিয়া ব্যথিত হইল যে, সে এই সকালেই অন্ততঃ দশটা পান খাইয়াছে—পান খাইয়া খাইয়া ঠোঁট কালো—হাতে রূপার পানের কৌটা—পান জর্দা। এবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল মারিয়াছে, খানিকক্ষণ কেবল নানা ফিল্মের গল্প করিল, বাষ্টার কিটন্‌কে মাস্টারমশায়ের কেমন লাগে? চার্লি চ্যাপলিন? নর্মা শিয়ারাব—ও সে অদ্ভুত!

ফিরিবার সময় অপুর মনটা বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বালক, ওর দোষ কি? এই আবহাওয়ায় খুব বড প্রতিভাও শুকাইয়া যায়—ও তো অসহায় বালক—

রামধনবাবু বলিলেন, চললেন অপূর্ববাবু? নমস্কার। আসবেন মাঝে মাঝে।

গলির বাহিরে সেই পচা খড বিচালি, পচা আপেলের খোলা, শুঁটকি মাছের গন্ধ।

রাত্রিতে অপুর মনে হইল সে একটা বড় অন্যায় করিতেছে, কাজলের প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিতেছে। ওরও তো সেই শৈশব। কাজলের এই অমূল্য শৈশবের দিনগুলিতে সে তাহাকে এই ইট, কংক্রিট, সিমেণ্ট ও বার্ড-কোম্পানীর পেটেণ্ট স্টোনে বাঁধানো কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া দিনের পর দিন তাহার কাঁচা, উৎসুক, স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন তুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অনুভূতিতে ভরাইয়া

তুলিতেছে—তাহার জীবনে বন-বনানী নাই, নদীর মর্ম্মর নাই, পাখির কলস্বর, মাঠ, জ্যোৎস্না, সঙ্গী-সাথীদের সুখদুঃখ—এসব কিছুই নাই, অথচ কাজল অতি সুন্দর ভাবপ্রবণ বালক—তাহার পরিচয় সে অনেকবার পাইয়াছে।

কাজল দুঃখ জানুক, জানিয়া মানুষ হউক। দুঃখ তার শৈশবে গল্পে পড়া সেই সোনা-করা জাদুকর! ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় ঝুলি ঘাড়ে বেড়ায়, এই চাপ-দাড়ি, কোণে-কাঁদাড়ে ফেরে, কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কেউ পোছে না, সকলে পাগল বলে দূর দূর করে, রাতদিন হাপর জ্বালায়, রাতদিন হাপর জ্বালায়।

পেতল থেকে, রাং থেকে, সীসে থেকে ও-লোক কিন্তু সোনা করতে জানে, করিয়াও থাকে।

এই দিনটিতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সবপ্রথম এতকাল পরে একটা চিন্তা মনে উদয় হইল। নিশ্চিন্দিপুর একবারটি ফিরিলে কেমন হয়? সেখানে আর কেউ না থাক্, শৈশব-সঙ্গিনী রাণুদিদি তো আছে। সে যদি বিদেশে চলিয়া যায়, তার আগে খোকাকে তার পিতামহের ভিটাটা দেখাইয়া আনাও তো একটা কর্ত্তব্য?

পরদিনই সে কাশীতে লীলাদিকে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিল, সে খোকাকে লইয়া একবার নিশ্চিন্দিপুর যাইতেছে, খোকাকে পিতামহের গ্রামটা দেখাইয়া আনিবে। পত্রপাঠ যেন লীলাদি তার দেওরকে সঙ্গে লইয়া সোজা নিশ্চিন্দিপুরে চলিয়া যায়।

অপরাজিত

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ট্রেনে উঠিয়াও যেন অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না, সে সত্যই নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতে আবার পা দিতে পারিবে—নিশ্চিন্দিপুর, সে তো শৈশবের স্বপ্নলোক! সে তো মুছিয়া গিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে, সে শুধু একটা অনতিস্পষ্ট সুখস্মৃতি মাত্র, কখনও ছিল না, নাই-ও।

মাঝেরপাড়া স্টেশনে ট্রেন আসিল বেলা একটার সময়। খোকা লাফ দিয়া নামিল, কারণ প্লাটফর্ম খুব নিচু। অনেক পরিবর্তন হইয়াছে স্টেশনটার, প্লাটফর্মের মাঝখানে জাহাজের মাস্তুলের মত উঁচু যে সিগন্যালটা ছেলেবেলায় তাহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল সেটা আর এখন নাই। স্টেশনের বাহিরে পথের উপর একটা বড় জাম গাছ, অপুর মনে আছে, এটা আগে ছিল না।

ওই সেই বড় মাদার গাছটা, যেটার তলায় অনেককাল আগে তাহাদের এদেশ ছাড়িবার দিনটাতে মা খিচুড়ি রাঁধিয়াছিলেন। গাছের তলায় দুখানা মোটর-বাস যাত্রীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া, অপুরা থাকিতে থাকিতে দুখানা পুরনো ফোর্ড ট্যাক্সিও আসিয়া জুটিল। আজকাল নাকি নবাবগঞ্জ পর্যন্ত বাস ও ট্যাক্সি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—জিনিসটা অপুর কেমন যেন ভাল লাগিল না। কাজল নবীন যুগের মানুষ, সাগ্রহে বলিল—মোটর কারে ক'রে যাব বাবা? অপু ছেলেকে জিনিসপত্রসমেত ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিল, বটের ঝুরি দোলানো, স্নিগ্ধ ছায়াভরা সেই প্রাচীন দিনের পথটা দিয়া সে নিজে মোটরে চড়িয়া যাইতে পারিবে না কখনই। এ দেশের সঙ্গে পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ কি খাপ খায়?

চৈত্রমাসের শেষ। বাংলায় সত্যিকার বসন্ত এই সময়েই নামে। পথ চলিতে চলিতে পথের ধারের ফুলেভরা ঘেঁটুবনের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। এই কম্পমান চৈত্রদুপুরের রৌদ্রের সঙ্গে, আকন্দ ফুলের গন্ধের সঙ্গে শৈশব যেন মিশানো আছে—পশ্চিম বাংলার পল্লীতে এ কমনীয় বসন্তের রূপ সে তো ভুলিয়াই গিয়াছিল।

এই সেই বেত্রবতী! এমন মধুর স্বপ্নভরা নামটি কোন নদীর আছে পৃথিবীতে? খেয়া পার হইয়া আবার আষাঢ়ুর বাজার। ডিডোল ও ডানলপ টায়ারের বিজ্ঞাপন-ওয়ালা পেট্রোলের দোকান নদীর উপরেই। বাজারেরও চেহারা অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। তেইশ বছর আগে এত কোঠাবাড়ি ছিল না। আষাঢ়ু হইতে হাঁটিয়া যাওয়া সহজ, মাত্র দুই মাইল, জিনিসপত্রের জন্য একটা মুটে পাওয়া গেল, মোটরবাস ও ট্যাক্সির দরুন ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ি আজকাল নাকি এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মুটে বলিল—ধঞ্চে-পলাশগাছির ওই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যাবেন তো বাবু? ধঞ্চেপলাশগাছি?··· নামটাই তো কতকাল শোনে নাই, এতদিন মনেও ছিল না। উঃ কতকাল পরে এই অতি সুন্দর নামটা সে আবার শুনিতেছে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এমন সময়ে পথটা সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে, ঢুকিয়া পড়িল—পাশেই মধুখালির বিল—পদ্মবনে ভরিয়া আছে। এই সেই অপূর্ব সৌন্দর্যভূমি, সোনাডাঙার স্বপ্নমাখানো মাঠটা—মনে হইল এত জায়গায় তো বেড়াইল, এমন অপরূপ মাঠ ও বন কই কোথাও তো দেখে নাই! সেই বনঝোপ, ঢিপি, বন, ফুলে ভর্তি বাব্‌লা—বৈকালের এ কী অপূর্ব রূপ!

তারপরই দূর হইতে ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার উঁচু ঝাঁকড়া মাথাটা নজরে পড়িল—যেন দিক্‌সমুদ্রে ডুবিয়া আছে—ওর পরেই

নিশ্চিন্দিপুর। ক্রমে বটগাছটা পিছনে পড়িল—অপুর বুকের রক্ত চল্‌কাইয়া যেন মাথায় উঠিতে চাহিতেছে, সারা দেহ এক অপূর্ব অনুভূতিতে যেন অবশ হইয়া আসিতেছে। ক্রমে মাঠ শেষ হইল, ঘাটের পথের সেই আমবাগানওলা—সে রুমাল কুড়াইবার ছলে পথের মাটি একটু তুলিয়া মাথায় ঠেকাইল। ছেলেকে বলিল—এই হ'ল তোমার ঠাকুরদাদার গাঁ, খোকা, ঠাকুরদাদার নামটা মনে আছে তো—বল তো বাবা কি?

কাজল হাসিয়া বলিল—শ্রীহরিহর রায়, আহা, তা কি আর মনে আছে?

অপু বলিল, শ্রী নয় বাবা, ঈশ্বর বলতে হয়, শিখিয়ে দিলাম যে সেদিন?

রাণুদিদির সঙ্গে দেখা হইল পরদিন বৈকালে।

সাক্ষাতের পূর্ব-ইতিহাসটা কৌতুকপূর্ণ, কথাটা রানীর মুখেই শুনিল।

রানী অপু আসিবার কথা শুনে নাই, নদীর ঘাট হইতে বৈকালে ফিরিতেছে, বাঁশবনের পথে কাজল দাঁড়াইয়া আছে, সে একা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

রানী প্রথমত থতমত খাইয়া গেল—অনেককাল আগেরকার একটা ছবি অস্পষ্ট মনে পড়িল—ছেলেবেলায় ওই ঘাটের ধারের জঙ্গলে-ভরা ভিটাটাতে হরিকাকারা বাস করিত, কোথায় যেন তাহারা উঠিয়া গিয়াছিল তারপরে। তাদের বাড়ির সেই অপু না?—ছেলেবেলার সেই অপু? পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সে কাছে গিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিল—অপুও বটে, নাও বটে। যে বয়সে সে গ্রাম ছড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তার সে সময়ের চেহারাখানা রানীর মনে আঁকা আছে, কখনও ভুলিবে না—সেই বয়স, সেই চেহারা, অবিকল। রানী বলিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেছ খোকা?

কাজল বলিল—গাঙ্গুলীদের বাড়ি—

রানী ভাবিল, গাঙ্গুলীরা বড়লোক, কলিকাতা হইতে কেহ কুটুম্ব আসিয়া থাকিবে, তা'দেরই ছেলে। কিন্তু মানুষের মতও মানুষ হয়? বুকের ভিতরটা ছাঁত করিয়া উঠিয়াছিল একেবারে। গাঙ্গুলীবাড়ির বড় মেয়ের নাম করিয়া বলিল—তুমি বুঝি কানুপিসির নাতি?

কাজল লাজুক চোখে চাহিয়া বলিল—কানুপিসি কে জানি নে তো? আমার ঠাকুরদাদার এই গাঁয়ে বাড়ি ছিল—তাঁর নাম ঈশ্বর হরিহর রায়—আমার নাম অমিতাভ রায়।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রানীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না অনেকক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয়ও হইল। রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল—তোমার বাবা—

খোকা ?...

কাজল বলিল—বাবার সঙ্গেই তো কাল এলাম। গাঙ্গুলীবাড়িতে এসে উঠলাম রাত্রে। বাবা ওদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করচে, মেলা লোক দেখা করতে এসেচে কিনা তাই।—

রানী দুই হাতের তালুর মধ্যে কাজলের সুন্দর মুখখানা লইয়া আঁদরের সুরে বলিল—খোকন, খোকন ঠিক বাবার মত দেখতে—চোখ দুটি অবিকল! তোমার বাবাকে এ পাড়ায় ডেকে নিয়ে এসো খোকন। বলগে রাণুপিসি ডাকচে।

সন্ধ্যার আগেই ছেলের হাত ধরিয়া অপু রানীদের বাড়ি ঢুকিয়া বলিল—কোথায় গেলে রাণুদি, চিনতে পার?—রাণু ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, অবাক হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—মনে করে যে এলি এতকাল পরে?—তা ও-পাড়ায় গিয়ে উঠলি কেন? গাঙ্গুলীরা আপনার লোক হ'ল তোর?—পরে লীলাদির মত সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

কি অদ্ভুত পরিবর্তন। অপুও অবাক হইয়া দেখিতেছিল, চৌদ্দ বছরের সে বালিকা রাণুদি কোথায়! বিধবার বেশ, বাল্যের লাবণ্যের কোনও চিহ্ন না থাকিলেও রানী এখনও সুন্দরী কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, শৈশবসঙ্গিনী রাণুদির সঙ্গে ইহার মিল কোথায়?—এই সেই রাণুদি!—

সে কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য হইল ইহাদের বাড়িটার পরিবর্তন দেখিয়া। ভুবন মুখুয্যেরা ছিলেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, ছেলেবেলার সে আট-দশটা গোলা, প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, গরুবাছুর. লোকজনের কিছুই নাই। চণ্ডীমণ্ডপের ভিটা মাত্র পড়িয়া আছে, পশ্চিমের কোঠা ভাঙিয়া কাহারা ইট লইয়া গিয়াছে—বাড়িটার ভাঙা, ধ্বসা, ছন্নছাড়া চেহারা, এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন?

রানী সজলচোখে বলিল—দেখছিস কি, কিছু নেই আর। মা বাবা মারা গেলেন, টুনু, খুড়ীমা এঁরাও গেলেন, সতুর মা-ও মারা গেল, সতু মানুষ হ'ল না তো, এতদিন বিষয় বেচে বেচে চালাচ্ছে। আমারও—

অপু বলিল—হ্যাঁ, লীলাদির কাছে সব শুনলাম সেদিন কাশীতে—

—কাশীতে? দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর? কবে—কবে?

পরে অপুর মুখে সব শুনিয়া সে ভারী খুশী হইল। দিদি আসিতেছে তাহা হইলে? কতকাল দেখা হয় নাই।

রানী বলিল—বৌ কোথায়? বাসায়—তোর কাছে?

অপু হাসিয়া বলিল—স্বর্গে।

—ও আমার কপাল! কত দিন? বিয়ে করিস্ নি আর?—

সেই দিনই আবার বৈকালে চড়ক। আর তেমন জাঁকজমক হয় না, চড়ক

গাছ পুঁতিয়া কেহ ঘুরপাক খায় না। সে বাল্যমন কোথায় মেলা দেখার অধীর আনন্দে ছুটিয়া যাওয়া—সে মনটা আর নাই, কেবল সে-সব অর্থহীন আশা, উৎসাহ, অপূর্ব অনুভূতির স্মৃতিটা মাত্র আছে। এখন যেন সে দর্শক আর বিচারক মাত্র, চল্লিশ বৎসরে মনটা কেমন বদলাইয়া গিয়াছে, বাড়িয়াছে —তাহারই একটা মাপ-কাঠি আজ খুঁজিয়া পাইয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। চড়কতলায় পুরানো আমলের কত পরিচিত বন্ধু নাই, নিবারণ গোয়ালা লাঠি খেলিত, ক্ষেত্র কপালী বহুরূপীর সাজ দিত, হারাণ মাল বাঁশের বাঁশি বাজাইয়া বিক্রয় করিত, ইহারা কেহ আর নাই, কেবল পুরাতনের সঙ্গে একটা যোগ এখনও আছে। চিনিবাস বৈরাগী এখনও তেলেভাজা খাবারের দোকান করে।

আজ চব্বিশ বছর আগে এই চড়কের মেলার পরদিনই তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—তারপর কত ঘটনা, কত দুঃখ বিপদ কত নূতন বন্ধুবান্ধব সব, গোটা জীবনটাই ··কিন্তু কেমন করিয়া এত পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও সেই দিনটি অনুভূতিগুলির স্মৃতি এত সজীব, টাটকা, তাজা অবস্থায় আজ আবার ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চড়কের মেলা দেখিয়া হাসিমুখে ছেলেমেয়েরা ফিরিয়া যাইতেছে, কারও হাতে বাঁশের বাঁশি, কারও হাতে মাটির রং করা ছোবা পালকি। একদল গেল গাঙ্গুলী পাড়ার দিকে, একদল সোনাডাঙ্গা মাঠের মাটির পথ বাহিয়া, ছাতিমবনের তলায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়াঘাটে—চব্বিশ বছর আগে যাহারা ছিল ছোট, এই রকম মেলা দেখিয়া ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে তেলেভাজা, জিবে-গজা হাতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারা অনেকদিন বড় হইয়া নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—কেউবা মারা গিয়াছে; আজ তাদের ছেলেমেয়েদের দল ঠিক আবার তাহাই করিতেছে, মনে মনে আজিকার এই নিষ্পাপ, দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলিকে সে আশীর্বাদ করিল।

বৈশাখের প্রথমেই লীলা তার দেওরের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরে আসিল। দুই বোনে অনেকদিন পরে দেখা, দুই জনে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। অপুকে লীলা বলিল—তোর মনে যে এত ছিল, তা তখন কি জানি? তোর কল্যাণেই বাপের ভিটে আবার দেখলুম, কখনও আশা ছিল না যে আবার দেখব। খোকার জন্য কাশী হইতে একরাশ খেলনা ও খাবার আনিয়াছে, মহা খুশীর সহিত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিল।

অপু বৈকালে ছেলেকে লইয়া নৌকায় খাবরাপোতার ঘাট পর্যন্ত বেড়াইতে গেল! তেঁতুলতলার ঘাটের পাশে দক্ষিণদেশের ঝিনুকতোলা বড় নৌকা বাঁধা

ছিল, হাওয়ায় আলকাতরা ও গাবের রস মাখানো বড় ডিঙিগুলার শৈশবের সেই অতি পুরাতন বিস্মৃত গন্ধ···নদীর উত্তর পাড়ে ক্রমাগত নলবন, ওকড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ, ঢালু ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁইয়া আছে, মাঝে মাঝে ঝিঙে পটলের ক্ষেতে উত্তুরে মজুরেরা টোকা মাথায় নিড়ান দেয়, এক এক স্থানে নদীর জল ঘন কালো, নিথর, কলার পাটির মত সমতল—যেন মনে হয়, নদী এখানে গহন, গভীর অতলস্পর্শ,—ফুলে ভরা উলুখড়ের মাঠ, আকন্দবন, ডাঁসা, খেজুরের কাঁদি দুলানো খেজুর গাছ, উইঢিবি, বকের দল, উঁচু শিমুল ডালে চিলের বাসা—সবাইপুরের মাঠের দিক হইতে বড় এক ঝাঁক শামকুট পাখি মধুখালির বিলের দিকে গেল—একটা বাবলাগাছে অজস্র বন-ধুঁধুল ফল দুলিতে দেখিয়া খোকা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই দেখ বাবা, সেই যে কলকাতায় আমাদের গলির মোড়ে বিক্রী হয় গায়ে সাবান মাখবার জন্যে, কত ঝুলচে দেখ, ও কি ফল বাবা?

অপু কিন্তু নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল। কতকাল সে এ সব দেখে নাই! পৃথিবীর এই মুক্ত রূপ তাহাকে যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দ উগ্রবীর্য সুরার মত নেশার ঘোর আনে তাহার শিরার রক্তে, তাহা অভিভূত করিয়া ফেলে, আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহাদের যে গোপন বাণী শুধু তাহারই মনের কানে কানে, মুখে তাহা বলিয়া বুঝাইবে সে কাহাকে?

দূর গ্রামের জাওয়া-বাঁশের বন অস্ত-আকাশের রাঙা পটে অতিকায় লায়ার পাখির পুচ্ছের মত খাড়া হইয়া আছে, একধারে উঁচু পাড়ে সারিবাঁধা গাঙ-শালিকের গর্ত, কি অপূর্ব শ্যামলতা, কি সান্ধ্য-শ্রী!

কাজল বলিল—বেশ দেশ বাবা—না?

—তুই এখানে থাক্ খোকা—আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাকতে পারবি নে? তোর পিসিমার কাছে থাকবি, কেমন তো?

কাজল বলিল—হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে বৈ কি? আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

অপু ভাবিতেছিল শৈশবে এই ইচ্ছামতী ছিল তার কাছে কি অপূর্ব কল্পনায় ভরা! গ্রামের মধ্যের বর্ষাদিনের জলকাদা-ভরা পথঘাট, বাঁশপাতাপচা আঁটাল মাটির গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পাইয়া সে মুক্ত আকাশের তলে নদীর ধারটিতে আসিয়া বসিত। কত বড় নৌকা ওর ওপর দিয়া দূর দেশে চলিয়া যাইত। কোথায় ঝালকাটি, কোথায় বরিশাল, কোথায় রায়মঙ্গল—অজানা দেশের অজানা কল্পনায় মুগ্ধ মনে কতদিন সে না ভাবিয়াছে, সেও একদিন ওই রকম নেপাল মাঝির বড় ডিঙিটা করিয়া নিরুদ্দেশ বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়া যাইবে।

ইছামতী ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মা। তার তীরের আকাশে-বাতাসের সঙ্গীত মায়ের মুখের ঘুম-পাড়ানি গানের মত শত স্নেহে তার নব-মুকুলিত কচি মনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তার তীরে সে সময়ের কত আকাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্য, রোমান্স—তার তীর ছিল দূরের অদেখা বিদেশ, বর্ষার দিনে এই ইছামতী কূলে-কূলে ভরা ঢলঢল গৈরিক রূপে সে অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখিত—ইংরাজি বই-এ পড়া Cape Nun-এর ওদিকের দেশটা—যে দেশ হইতে লোক আর ফেরে না— He who passes Cape Nun, will either return or not—মুগ্ধচোখে কুলছাপানো ইছামতী দেখিয়া তখন সে ভাবিত—ওঃ, কত বড আমাদের এই গাঙটা !!

এখন সে আর বালক নাই, কত বড় বড় নদীর দুকূল-ছাপানো লীলা দেখিয়াছে—গঙ্গা, শোণ, বড়দল, নর্মদা—তাদের অপূর্ব সন্ধ্যা, অপূর্ব বর্ণসম্ভার দেখিয়াছে—সে বৈচিত্র্য, সে প্রখরতা ইছামতীর নাই, এখন তার চোখে ইছামতী ছোট নদী। এখন সে বুঝিয়াছে তার গরীব ঘরের মা উৎসবদিনের যে বেশভূষায় তার শৈশব-কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া দিত, এসব বনেদী বড় ঘরের মেয়েদের হীরামুক্তার ঘটা, বারানসী শাড়ির রংঢং-এর কাছে তার মায়ের সেই কাচের চুড়ি, শাঁখা কিছুই নয়।

কিন্তু তা বলিয়া ইছামতীকে সে কি কখনো ভুলিবে ?

দুপুরে সে ঘরে থাকিতে পাবে না। এই চৈত্রদুপুরের রোদের উষ্ণ নিঃশ্বাস কত পরিচিত গন্ধ বাহিয়া আনে—শুকনো বাঁশের খোলার, ফুটন্ত ঘেঁটুবনেব ঝরা পাতার সোঁদা সোঁদা রোদপড়া মাটির, নিম ফুলের, আরও কত কি কত কি ;—বাল্যে এই সব দুপুরে তাকে ও তাহার দিদিকে পাগল করিয়া দিয়া টো টো করিয়া শুধু মাঠে, বাগানে, বাঁশতলায়, নদীর ধারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত—আজও সেই রকমই পাগল করিয়া দিল। গ্রামসুদ্ধ সবাই দুপুরে ঘুমায়—সে একা একা বাহির হয়—উদ্‌ভ্রান্তের মত মাঠের ঘেঁটুফুলেভরা উঁচু ডাঙায়, পথে পথে নিঝুম দুপুরে বেড়াইয়া ফেরে—কিন্তু তবু মনে হয়, বাল্যের স্মৃতিতে যতটা আনন্দ পাইতেছে, বর্তমানের আসল আনন্দ সে ধরণের নয়—আনন্দ আছে, কিন্তু তার প্রস্তুতি বদলাইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে দেবদেবীরা নিশ্চিন্দিপুরে বাঁশবনের ছায়ায় এই সব দুপুরে নামিয়া আসিতেন। এক একদিন সে নদীর ধারের সুগন্ধ তৃণভূমিতে চুপ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিছুই করে না, রৌদ্রভরা নীল আকাশটার দিকে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া থাকে—কিছু ভাবেও না—সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ বাইয়া মনে মনে বলে—ওগো মাতৃভূমি, তুমি ছেলেবেলায় যে অমৃতদানে

মানুষ করেছিল, সেই অমৃত হ'ল আমার জীবন-পথের পাথেয়—তোমার বনের ছায়ায় আমার সকল স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল একদিন, তুমি আবার শক্তি দাও, হে শক্তিরূপিনী!

দুঃখ হয় কলকাতার ছাত্রটির জন্য। এদের বাপের বাড়ি বৌবাজারে, মামার বাড়ি পটুয়াটোলায়, পিসির বাড়ি বাগবাজারে···বাংলাদেশকে দেখিল না কখনও। এরা কি মাধবপুরের গ্রামের উলুখড়ের মাঠের ও-পারের আকাশে রং ধরা দেখিল? স্তব্ধ শরৎ-দুপুরের ঘনবনানীর মধ্যে ঘুঘুর ডাক শুনিয়াছে? বন-অপরাজিতা ফুলের নীরব মহোৎসব এদের শিশু-আত্মায় তার আনন্দের স্পর্শ দিয়াছে কোনও কালে? ছোট্ট মাটির ঘরের দাওয়ায় আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া নারিকেল পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কাঁপন দেখে নাই কখনও—এরা অতি হতভাগ্য।

রানীর যত্নে আদরে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সতুদের বাড়ির সে-ই আজকাল কর্ত্রী, নিজের ছেলেমেয়ে হয় নাই, ভাইপোদের মানুষ করে। অপুকে রানা বাড়িতে আনিয়া রাখিল—কাজলকে দু'দিনে এমন আপন করিয়া লইয়া ফেলিয়াছে যে, সে পিসিমা বলিতে অজ্ঞান। রানীর মনে মনে ধারণা, অপু শহরে থাকে যখন, তখন খুব চায়ের ভক্ত,—দু'টিবেলা ঠিক সময়ে চা দিবার জন্য তাহার প্রাণপণ চেষ্টা। চায়ের কোন সরঞ্জাম ছিল না, লুকাইয়া নিজের পয়সায় সতুকে দিয়া নবাবগঞ্জের বাজার হইতে চায়ের ডিস্ পেয়ালা আনাইয়া লইয়াছে—অপু চা তেমন খায় না কখনও, কিন্তু এখানে সে সেকথা বলে না। ভাবে—যত্ন করে রাণুদি চা করুক না। এমন যত্ন আর জুটবে কোথাও। তুমিও যেমন।

দুপুরে একদিন খাইতে বসিয়া অপু চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। রানীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—একটা বড় চমৎকার ব্যাপার হ'ল—দেখো এই টকে-যাওয়া এঁচড়-চচ্চড়ি এতকাল খাইনি—নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আর কখনও নয়—তাই মুখে দিয়েই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল রাণুদি—

রাণুদি বোঝে এসব কথা—তাই রাণুদির কাছে বলিয়াও সুখ।

এ কয়দিন আকাশটা ছিল মেঘ-মেঘ। কিন্তু হঠাৎ কখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে সে জানে না—বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া সে অবাক চোখে চুপ করিয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া রহিল—বাল্যের সেই অপূর্ব বৈকাল—যাহার জন্য প্রথম প্রথম বিরহী বালক-মন কত হাঁফাইয়াছে বিদেশে, ক্রমে

একটা অস্পষ্ট মধুর স্মৃতিমাত্র মনে আঁকিয়া রাখিয়া যেটা কবে মন হইতে বেমালুম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল—

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় এই সব সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহার মনটা কেমন অকারণে খারাপ হইত—এক একদিন কেমন কান্না আসিত, বিছানায় বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিত—তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলিত—ও-ওই উড়ে গেল···ও-ও ওই!···কেঁদো না খোকা, বাইরে এসে পাখি দেখসে। আহা হা, তোমার বড় দুখ্‌খু খোকন—তোমার নাতি মরেছে, পুতি মরেছে, সাত ডিঙি ধন সমুদ্দুরে ডুবে গিয়েছে, তোমার বড় দুখ্‌খু কেঁদো না কেঁদো না, আহা হা!··

রানী পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া আনিতে যাইতেছে, অপু বলিল—মনে পড়ে রাণুদি, এই উঠানে এমন সব বিকেলে বৌ-চুরি খেলা খেলতুম কত, তুমি আমি, দিদি, সতু, নেড়া—?

রাণু বলিল—আহা তাই বুঝি ভাবচিস্‌ বসে বসে! কত মালা গাঁথতুম মনে আছে বকুলতলায়? সারাদিন বকুলতলাতেই পড়ে আছি, আমি, দুগ্‌গা—আজকাল ছেলেমেয়েরা আর মালা গাঁথে না, বকুল ফুলও আর তেমন পড়ে থাকে না—কালে কালে সবই যাচ্ছে।·

কিছু পরে জল লইয়া ফিরিবার সময় বলিল—এক কাজ করো না কেন অপু, সতু তো তোদের নীলমণি জ্যাঠার দরুন জমাটা ছেড়ে দেবে, তুই কেন গিয়ে বাগানটা নিগে যা না? তোদেরই তো ছিল—ও যা, নিজের জমি-জমাই বিক্রি ক'রে ফেললে সব, তা আবার জমার বাগান রাখবে—নিবি তুই?

অপু বলিল—মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, রাণুদি। মরবার কিছুদিন আগেও বলত বড় হলে বাগানখানা নিস্‌ অপু। আমার আপত্তি নেই, যা দাম হবে আমি দেব।

প্রতি সন্ধ্যায় সতুদের রোয়াকে মাদুর পাতা হয়, রানী, লীলা, অপু ছেলেপিলেদের মজলিস্‌ বসে। সতুও যোগ দেয়, তামাকের দোকান বন্ধ করিয়া আসিতে তাহার রাত হইয়া যায়। অপু বলে—আচ্ছা, আজকাল তোমরা ঘাটের পথে ষাঁড়াতলায় পিঠে দাও না রাণুদি? কই সেই ষাঁড়াগাছটা তো নেই সেখানে? রানী বলে—সেটা মরে গিয়েছে—তার পাশেই একটা চারা, দেখিস নি সিঁদুর দেওয়া আছে?·· নানা পুরানো কথা হয়। অপু জিজ্ঞাসা করে—ছেলেবেলায় একবার পঙ্গপালের দল এসেছিল, মনে আছে লীলাদি?···গ্রামের একটি বিধবা যখন নববধূরূপে এ গ্রামে প্রথম আসেন, অপু তখন ছেলেমানুষ। তিনিও সন্ধ্যার পর এ বাড়িতে আসেন। অপু বলে—খুড়ীমা আপনি নতুন এসে কোথায় দুধে-আলতার পাথরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মনে

আছে আপনার? বিধবাটি বলেন—সে সব কি আর এ জন্মের কথা, বাবা? সে সব কি আর মনে আছে?

অপু বলে—আমি বলি শুনুন, আপনাদের দক্ষিণের উঠানে যে নিচু গোয়ালঘরটা ছিল তারই ঠিক সামনে। বিধবা মেয়েটি আশ্চর্য হইয়া বলেন—ঠিক, ঠিক, এখন মনে পড়েছে, এত দিনের কথা তোমার মনে আছে বাবা!

তাঁদেরই বাড়ির আর এক বিবাহে কোথা হইতে তাঁদের এক কুটুম্বিনী আসেন, খুব সুন্দরী—এতকাল পরে তাঁর কথা ওঠে। সবাই তাঁকে দেখিয়াছিল সে সময়, কিন্তু নামটা কাহারও মনে নেই এখন। অপু বলে—দাঁড়াও রাণুদি নাম বলছি—তার নাম সুবাসিনী। সবাই আশ্চর্য হইয়া যায়। লীলা বলে—তোর তখন বয়েস আট কি নয়, তোর মনে আছে তার নাম?—ঠিক, সুবাসিনীই বটে। সবারই মনে পড়ে নামটা। অপু মৃদু মৃদু হাসি মুখে বলে আরও বলছি শোনো, ডুরি শাড়ি পরত, রাঙা জমির ওপর ডুরে দেওয়া—না? বিধবা বধূটি বলেন, ধন্যি বাপু যা হোক্, রাঙা ডুরে পরত ঠিকই, বয়েস ছিল বাইশ-তেইশ। তখন তোমার বয়স বছর আষ্টেক হবে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেকার কথা যে!

অপুর খুব মনে আছে, অত সুন্দরী মেয়ে তাদের গাঁয়ে আর কখনও আসে নাই ছেলেবেলায়। সে বলিল—রাঙা শাড়ি পরে আমাদের উঠানের কাঁঠালতলায় জল সইতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখনও।

এখানকার বৈকালগুলি সত্যই অপূর্ব। এত জায়গায় তো সে বেড়াইল, মাসখানেক এখানে থাকিয়া মনে হইল এমন বৈকাল সে কোথাও দেখে নাই। বিশেষ করিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন এই বৈকালগুলিতে সূর্য যেদিন অস্ত যাইবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোটুকু পর্যন্ত বড গাছের মগডালে, বাঁশঝাড়ের আগায় হাল্কা সিঁদুরের রঙ মাখাইয়া দেয়, সেদিনের বৈকাল। এমন বিল্বফুলের অপূর্ব সুরভি-মাখানো, এমন পাখি-ডাকা উদাস বৈকাল—কোথায় এর তুলনা? এত বেলগাছও কি এদেশটায়, ঘাটে, পথে, এ-পাড়া, ও-পাড়া সর্বত্র বিল্বফুলের সুগন্ধ।

একদিন—জ্যৈষ্ঠের প্রথমটা, বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া ঈশান কোণ হইতে কালবৈশাখীর মেঘ উঠিল, তার পরেই খুব ঝড়, এ বছরের প্রথম কাল-বৈশাখী। অপু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—তাদের পোড়াভিটার বাঁশবনের মাথার উপকার দৃশ্যটা কি সুপরিচিত! বাল্য এই মাথাদুলানো বাঁশঝাড়ের উপরকারের নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জা মনে কেমন সব অনতিস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা জোগাইত, কত কথা যেন বলিতে চাহিত, আজও সেই মেঘ, সেই

বাঁশবন, সেই বৈকাল সবই আছে, কিন্তু সে অপূর্ব জগৎটা আর নাই। এখন যা আনন্দ সে শুধু স্মৃতির আনন্দ মাত্র। এবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া অবধি সে ইহা লক্ষ্য করিতেছে—এই বন, এই দুপুর, এই গভীর রাত্রে চৌকিদারের হাঁকুনি, কি লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের সঙ্গে এক অপূর্ব স্বপ্ন-মাখানো ছিল, দিগন্তরেখার ওপারের এক রহস্যময় কল্পলোক তখন সদাসর্বদা হাতছানি দিয়া আহ্বান করিত—তাদের সন্ধান আর মেলে না।

সে পাখির দল মরিয়া গিয়াছে; তেমন দুপুর আর হয় না; যে চাঁদ এমন বৈশাখীরাত্রে খড়ের ঘরের দাওয়ার ধারের নারিকেল পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কম্পন আনিয়া এক ক্ষুদ্র কল্পনাপ্রবণ গ্রাম্য বালকের মনে মূলহীন, কারণহীন আনন্দের বান ডাকাইত, সে সব চাঁদ নিভিয়া গিয়াছে। সে বালকটিই বা কোথায়? পঁচিশ বৎসর আগেকার এক দুপুরে বাপমায়ের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফেরে নাই, জাওয়া-বাঁশের বনের পথে তার ছোট ছোট পায়ের দাগ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বহুদিন।

তার ও তার দিদির সে সব আশা পূর্ণ হইয়াছিল কি?

হায় অবোধ বালক-বালিকা!···

রোজ রোজ বৈকালে মেঘ হয়, ঝড় ওঠে। অপু বলে, রাণুদি, আম কুড়িয়ে আনি? রানী হাসে। অপু ছেলেকে লইয়া নতুন-কেনা বাগানে আসিয়া দাঁড়ায়—সবাইকে আম কুড়াইতে ডাকে, কাহাকেও বাধা দেয় না। বাল্যের সেই পটুলে, তেঁতুলতলী, নেকো, বাঁশতলা,—ঘন মেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা ধামা হাতে আম কুড়াইতে আসে। অপু ভাবে, আহা জীবনের এই এদের কত আনন্দের কত সার্থকতার জিনিস। চারিধারে চাহিয়া দেখে, সমস্ত বাগানের তলাটা ধাবমান, কৌতুকপর, চীৎকাররত বালক-বালিকাতে ভরিয়া গিয়াছে।

দিদি দুর্গা, ছোট্ট মেয়েটি, এই কাজলের চেয়ে কিছু বড়, পরের বাগানে আম কুড়াইবার অপরাধে বকুনি খাওয়া কৃত্রিম উল্লাসভরা হাসিমুখে একদিন ওই ফণিমনসার ঝোপের পাশের বেড়াটা গলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—বহুকালের কথাটা।

অপু কি করিবে আমবাগানে? এই সব গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা সাধ মিটাইয়া আম কুড়াইবে এ বাগানে, কেহ তাহাদের বারণ করিবার থাকিবে না, বকিবার থাকিবে না, অপমান করিবার থাকিবে না, ফণিমনসার ঝোপের আড়ালে অপমানিত ছোট্ট খুকিটি ধূলামাখা আঁচল গুছাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু তৃপ্তির হাসি হাসিবে···

এত দিন সে এখানে আসিলেও নিজেদের ভিটাতে ঢুকিতে পারে নাই, যদিও বাহির হইতে সেটা প্রতিদিনই দেখিত; কারণ ঘাটের পথটা তার পাশ দিয়াই। বিকালের দিকে সে একদিন একা চুপি চুপি বনজঙ্গল ঠেলিয়া সেখানে ঢুকিল। বাড়িটা আর নাই, পড়িয়া ইট স্তূপাকার হইয়া আছে—লতাপাতা, শ্যাওড়াবন, বনলতার গাছ, ছেলেবেলাকার মত কালমেঘের জঙ্গল। পিছনের বাঁশঝাড়গুলা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাড়িয়া চারিধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কোনও ঘরের চিহ্ন নাই, বন জঙ্গল, রাঙা রোদ বাঁশের মগডালে। পশ্চিমের পাঁচিলের গায়ে সেই কুলুঙ্গিটা আজও আছে, ছেলেবেলায় যে কুলুঙ্গিটাতে সে ভাঁটা, বাতাবীলেবুর বল, কড়ি রাখিত। এত নিচু কুলুঙ্গিটা তখন কত উঁচু বলিয়া মনে হইত, তাহার মাথা ছাড়াইয়া উঁচু ছিল, ডিঙ্গাইয়া দাঁড়াইলে তবে নাগাল পাওয়া যাইত! ঠেসদেওয়ালের গায়ে ছুরি দিয়া ছেলেবেলায় একটা ভূত আঁকিয়াছিল, সেটা এখনও আছে। পাশেই নীলমণি জ্যাঠামশায়ের পোড়োভিটা—সেও ঘন বনে ভরা, চারিধার নিঃশব্দ, নির্জন—এ পাড়াটাই জনহীন হইয়া গিয়াছে, এধার দিয়া লোকজনের যাতায়াত বড় কম। এই সে স্থানটি, কতকাল আগে যেখানে দিদি ও সে একদিন চড়ুইভাতি করিয়াছিল! কণ্টকাকীর্ণ শেঁয়াকুল বনে দুর্গম দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছে সারা জায়গাটা। পোড়োভিটার সে বেলগাছটা—একদিন যার তলায় ভীষ্মদেব শরশয্যা পাতিতেন তাহার নয় বৎসরের শৈশবে—সেটা এখনও আছে, পুষ্পিত শাখা-প্রশাখার অপূর্ব সুবাসে অপরাহ্ণের বাতাস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

পাঁচিলের ঘুলঘুলিটা কত নিচু বলিয়া মনে হইতেছে, এইটাতেই অপু আশ্চর্য হইল—বার বার কথা তার মনে হইতেছিল। কত ছোট ছিল সে তখন! খোকার মত অতটুকু বোধ হয়।

কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই কি লতার গন্ধ বাহির হইতেছে।···কতদিন গন্ধটা মনে ছিল না, বিদেশে আর সব কথা হয়ত মনে পড়িতে পারে, কিন্তু পুরাতন দিনের গন্ধগুলা তো মনে পড়ে না—

এ অভিজ্ঞতাটা অপুর এতদিন ছিল না। সে দিন বাঁওড়ের ধারে বেড়াইতে গিয়া পাকা বটফলের গন্ধে অনেকদিনের একটা স্মৃতি মনে উদয় হইয়াছিল—ছোট্ট কাচের পরকলা বসানো মোমবাতির সেকেলে লণ্ঠন হাতে তাহার বাবা শশী যোগীর দোকানে আলকাতরা কিনিতে আসিয়াছে—সেও আসিয়াছে বাবার কাঁধে চড়িয়া বাবার সঙ্গে—কাচের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো, আধ-অন্ধকার বাঁশবন, বাঁওড় হইতে নাল ফুল তুলিয়া বাবা তাহার হাতে দিয়াছে—কোন্ শৈশবের অস্পষ্ট ছবিটা, অবাস্তব, ধোঁয়া-ধোঁয়া! পাকা

বটফলের গন্ধে কতকাল পরে তাহার সেই অত্যন্ত শৈশবের একটা সন্ধ্যা আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন।

পোড়োভিটার সীমানায় প্রকাণ্ড একটা খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি ডাঁসা খেজুর ঝুলিতেছে—এটা সেই চারা খেজুর গাছটা, দিদি যার ডাল কাটারি দিয়া কাটিয়া গোড়ার দিকে দড়ি বাঁধিয়া খেলাঘরের গরু করিত—কত বড় ও উঁচু হইয়া গিয়াছে গাছটা!

এইখানে খিড়কীদোরটা ছিল, চিহ্নও নাই কোনও। এইখানে দাঁড়াইয়া দিদির চুরি-করা সেই সোনার কৌটাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল একদিন। কত সুপরিচিত জিনিস এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আজও আছে! রাঙী গাইয়ের বিচালি খাওয়ার মাটির নাদাটা কাঁঠালতলায় বাঁশপাতা ও মাটি বোঝাই হইয়া এখনও পড়িয়া আছে। ছেলেবেলায় ঠেসদেওয়াল গাঁথার জন্য বাবা মজুর দিয়া এক জায়গায় ইট জড় করিয়া রাখিয়াছিলেন···অর্থাভাবে আর গাঁথা হয় নাই। ইটগুলা এখনও বাঁশবনের ছায়ায় তেমনি পড়িয়া আছে। কতকাল আগে মা তাকের উপর জলদানে পাওয়া মেটে কলসী তুলিয়া রাখিয়াছিল, সংসারের প্রয়োজনের জন্য—পড়িয়া মাটিতে অর্ধপ্রোথিত হইয়া আছে। সকলের অপেক্ষা সে যেন অবাক হইয়া গেল···পাঁচিলের সেই ঘুলঘুলিটা আজও নতুন অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়া—বালিচুণ একটুও খসে নাই যেন কালকের তৈরী—এই জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি হইবে ও কুলুঙ্গিতে?

খিড়কীদোরের পাশে উঁচু জমিটাতে মায়ের হাতে পোঁতা সজ্‌নে গাছ এখনও আছে। যাইবার বছরখানেক আগে মাত্র মা ডালটা পুঁতিয়াছিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গাছটা বাড়িয়া বুড়া হইয়া গিয়াছে—ফল খাইতে আর কেহ আসে নাই—জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়া আছে এতকাল—অপরাহ্ণের রাঙা রোদ গাছটার গায়ে পড়িয়া কি উদাস, বিষাদমাখা দৃশ্যটা ফুটাইয়াছে যে!···ছায়া ঘন হইয়া আসে, কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই লতাটার গন্ধ আরও ঘন হয়—অপুর শরীর যেন শিহরিয়া ওঠে—এ গন্ধ তো শুধু গন্ধ নয়—এই অপরাহ্ণ, এই গন্ধের সঙ্গে জড়ানো আছে মায়ের কত রাত্রের আদরের ডাক, দিদির কত কথা, বাবার পদাবলী গানের সুর, বাল্যের ঘরকন্নার সুধাময় দারিদ্র্য—কত কি—কত কি—

ঘন বনে ঘুঘু ডাকে; ঘুঘু—ঘু—

সে অবাক্ চোখে রাঙারোদ-মাখানো সজ্‌নে গাছটার দিকে আবার চায়—মনে হয় এ বন, এ স্তূপাকার ইটের রাশি, এ সব স্বপ্ন—এখনি মা ঘাট হইতে সন্ধ্যায় গা ধুইয়া ফিরিয়া ফরসা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়খানা উঠানের বাঁশের আলনায় মেলিয়া দিবে, তারপরে প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা দিতে দিতে তাহাকে

দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিবে—এত সন্ধ্যে ক'রে বাড়ি ফিরলি অপু ?

ভিটার চারিদিকে খোলামকুচি, ভাঙা কলসী ; কত কি ছড়ানো—ঠাকুরমায়ের পোড়োভিটাতে তো পা রাখিবার স্থান নাই, বৃষ্টির ধোয়াটে কতদিনের ভাঙা খাপ্‌রা, খোলামকুচি বাহির হইয়াছে। এগুলি অপুকে বড় মুগ্ধ করিল, সে হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতদিনের গৃহস্থ-জীবনের সুখ-দুঃখ এগুলোর সঙ্গে জড়ানো ! মা পিছনের বাঁশবনে এক জায়গায় সংসারের হাঁড়িকুড়ি ফেলিত, সেগুলি এখনও সেইখানেই আছে ! একটা আস্কে-পিঠে গড়িবার মাটির মুচি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। অপু অবাক হইয়া ভাবে, কোন্ আনন্দ-ভরা শৈশব-সন্ধ্যার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ছিল না জানি ! উঠানের মাটির খোলামকুচির মধ্যে সবুজ কাচের চুড়ির টুকরা পাওয়া গেল। হয়ত তার দিদির হাতের চুড়ির টুকরা।—এ ধরণের চুড়ি ছোট্ট মেয়েরাই পরে—টুকরাটা সে হাতে তুলিয়া লইল। এক জায়গায় আধখানা বোতল ভাঙা—ছেলেবেলায় এ ধরণের বোতলে মা নারিকেল তৈল রাখিত—হয়ত সেটাই।

একটা দৃশ্য তাকে বড় মুগ্ধ করিল। তাদের রান্নাঘরের ভিটার ঠিক যে কোণে মা রাঁধিবার হাঁড়িকুড়ি রাখিত—সেখানে একখানা কড়া এখনও বসানো আছে, মরিচা ধরিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আংটা খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাটিতে বসিয়া যাওয়ার দরুন একটুও নড়ে নাই।

তাহারা যেদিন রান্না-খাওয়া সারিয়া এ গাঁ ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিল—আজ চব্বিশ বৎসর পূর্বে, মা এঁটো কড়াখানাকে ওইখানেই বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল—কে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওখানা ঠিক আছে এখনও।

কত কথা মনে ওঠে। একজন মানুষের অন্তরতম অন্তরের কাহিনী কি অন্য মানুষ বোঝে ! বাহিরের মানুষের কাছে একটা জঙ্গলে-ভরা পোড়োভিটা মাত্র—মশার ডিপো। তুচ্ছ জিনিস। কে বুঝবে চব্বিশ বৎসর পূর্বের এক দরিদ্র ঘরের অবোধ বালকের জীবনের আনন্দ-মুহূর্তগুলির সহিত এ জায়গার কত যোগ ছিল ?

ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার, তিন হাজার বছর কাটিয়া যাইবে—তখন এ গ্রাম লুপ্ত হইবে, ইছামতীই চলিয়া যাইবে, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সভ্যতা, নতুন ধরণের রাজনৈতিক অবস্থা—যাদের বিষয় এখন কল্পনা করিতেও কেহ সাহস করে না তখন আসিবে জগতে ! ইংরেজ জাতির কথা প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইবে, বর্তমান বাংলা ভাষাকে তখন হয়তো আর কেহ

বটফলের গন্ধে কতকাল পরে তাহার সেই অত্যন্ত শৈশবের একটা সন্ধ্যা আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল সেদিন।

পোড়োভিটার সীমানায় প্রকাণ্ড একটা খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি ডাঁসা খেজুর ঝুলিতেছে—এটা সেই চারা খেজুর গাছটা, দিদি যার ডাল কাটারি দিয়া কাটিয়া গোড়ার দিকে দড়ি বাঁধিয়া খেলাঘরের গরু করিত—কত বড় ও উঁচু হইয়া গিয়াছে গাছটা!

এইখানে খিড়কীদোরটা ছিল, চিহ্নও নাই কোনও। এইখানে দাঁড়াইয়া দিদির চুরি-করা সেই সোনার কৌটাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল একদিন। কত সুপরিচিত জিনিস এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর আজও আছে! রাঙী গাইয়ের বিচালি খাওয়ার মাটির নাদাটা কাঁঠালতলায় বাঁশপাতা ও মাটি বোঝাই হইয়া এখনও পড়িয়া আছে। ছেলেবেলায় ঠেসদেওয়াল গাঁথার জন্য বাবা মজুর দিয়া এক জায়গায় ইট জড় করিয়া রাখিয়াছিলেন···অর্থাভাবে আর গাঁথা হয় নাই। ইটগুলা এখনও বাঁশবনের ছায়ায় তেমনি পড়িয়া আছে। কতকাল আগে মা তাকের উপর জলদানে পাওয়া মেটে কলসী তুলিয়া রাখিয়াছিল, সংসারের প্রয়োজনের জন্য—পড়িয়া মাটিতে অর্ধপ্রোথিত হইয়া আছে। সকলের অপেক্ষা সে যেন অবাক হইয়া গেল···পাঁচিলের সেই ঘুলঘুলিটা আজও নতুন অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়া—বালিচুণ একটুও খসে নাই যেন কালকের তৈরী—এই জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি হইবে ও কুলুঙ্গিতে?

খিড়কীদোরের পাশে উঁচু জমিটাতে মায়ের হাতে পোঁতা সজ্‌নে গাছ এখনও আছে। যাইবার বছরখানেক আগে মাত্র মা ডালটা পুঁতিয়াছিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গাছটা বাড়িয়া বুড়া হইয়া গিয়াছে—ফল খাইতে আর কেহ আসে নাই—জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়া আছে এতকাল—অপরাহ্নের রাঙা রোদ গাছটার গায়ে পড়িয়া কি উদাস, বিষাদমাখা দৃশ্যটা ফুটাইয়াছে যে!···ছায়া ঘন হইয়া আসে, কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই লতাটার গন্ধ আরও ঘন হয়—অপুর শরীর যেন শিহরিয়া ওঠে—এ গন্ধ তো শুধু গন্ধ নয়—এই অপরাহ্ন, এই গন্ধের সঙ্গে জড়ানো আছে মায়ের কত রাত্রের আদরের ডাক, দিদির কত কথা, বাবার পদাবলী গানের সুর, বাল্যের ঘরকন্নার সুধাময় দারিদ্র্য—কত কি—কত কি—

ঘন বনে ঘুঘু ডাকে; ঘুঘু—ঘু—

সে অবাক্ চোখে রাঙ্গারোদ-মাখানো সজ্‌নে গাছটার দিকে আবার চায়—মনে হয় এ বন, এ স্তূপাকার ইটের রাশি, এ সব স্বপ্ন—এখনি মা ঘাট হইতে সন্ধ্যায় গা ধুইয়া ফিরিয়া ফরসা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়খানা উঠানের বাঁশের আলনায় মেলিয়া দিবে, তারপরে প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা দিতে দিতে তাহাকে

দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিবে—এত সন্ধ্যে ক'রে বাড়ি ফিরলি অপু?

ভিটার চারিদিকে খোলামকুচি, ভাঙা কলসী; কত কি ছড়ানো—ঠাকুরমায়ের পোড়োভিটাতে তো পা রাখিবার স্থান নাই, বৃষ্টির ধোয়াটে কতদিনের ভাঙা খাপ্‌রা, খোলামকুচি বাহির হইয়াছে। এগুলি অপুকে বড় মুগ্ধ করিল, সে হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতদিনের গৃহস্থ-জীবনের সুখ-দুঃখ এগুলোর সঙ্গে জড়ানো! মা পিছনের বাঁশবনে এক জায়গায় সংসারের হাঁড়িকুড়ি ফেলিত, সেগুলি এখনও সেইখানেই আছে! একটা আস্কে-পিঠে গড়িবার মাটির মুচি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। অপু অবাক হইয়া ভাবে, কোন্ আনন্দ-ভরা শৈশব-সন্ধ্যার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ছিল না জানি! উঠানের মাটির খোলামকুচির মধ্যে সবুজ কাচের চুড়ির টুকরা পাওয়া গেল। হয়ত তার দিদির হাতের চুড়ির টুকরা।—এ ধরণের চুড়ি ছোট্ট মেয়েরাই পরে—টুকরাটা সে হাতে তুলিয়া লইল। এক জায়গায় আধখানা বোতল ভাঙা—ছেলেবেলায় এ ধরণের বোতলে মা নারিকেল তৈল রাখিত—হয়ত সেটাই।

একটা দৃশ্য তাকে বড় মুগ্ধ করিল। তাদের রান্নাঘরের ভিটার ঠিক যে কোণে মা রাঁধিবার হাঁড়িকুড়ি রাখিত—সেখানে একখানা কড়া এখনও বসানো আছে, মরিচা ধরিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আংটা খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাটিতে বসিয়া যাওয়ার দরুন একটুও নড়ে নাই।

তাহারা যেদিন রান্না-খাওয়া সারিয়া এ গাঁ ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিল—আজ চব্বিশ বৎসর পূর্বে, মা এঁটো কড়াখানাকে ওইখানেই বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল—কে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওখানা ঠিক আছে এখনও।

কত কথা মনে ওঠে। একজন মানুষের অন্তরতম অন্তরের কাহিনী কি অন্য মানুষ বোঝে! বাহিরের মানুষের কাছে একটা জঙ্গলে-ভরা পোড়োভিটা মাত্র—মশার ডিপো। তুচ্ছ জিনিস। কে বুঝবে চব্বিশ বৎসর পূর্বের এক দরিদ্র ঘরের অবোধ বালকের জীবনের আনন্দ-মুহূর্তগুলির সহিত এ জায়গার কত যোগ ছিল?

ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার, তিন হাজার বছর কাটিয়া যাইবে—তখন এ গ্রাম লুপ্ত হইবে, ইছামতীই চলিয়া যাইবে, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সভ্যতা, নতুন ধরণের রাজনৈতিক অবস্থা—যাদের বিষয় এখন কল্পনা করিতেও কেহ সাহস করে না তখন আসিবে জগতে! ইংরেজ জাতির কথা প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইবে, বর্তমান বাংলা ভাষাকে তখন হয়তো আর কেহ

বুঝিবে না, একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ভাষা এদেশে প্রচলিত হইবে।

তখনও এই রকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হাজার বর্ষ পরের বৈশাখ দিনের শেষে! তখনও এই রকম পাখি ডাকিবে, এই রকম চাঁদ উঠিবে। তখন কি কেহ ভাবিবে তিন হাজার বছর পূর্বের এক বিস্মৃত বৈশাখী বৈকালের এক গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্রজগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব আনন্দে দুলিয়া উঠিত—এই স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ তার মনে কি আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিত? তিন হাজার বছরের প্রাচীন জ্যোৎস্না একদিন কোন্ মায়াস্বপ্ন তাহার শৈশব-মনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল? নিঃশব্দে শরৎ-দুপুরে বনপথে ক্রীডারত সে ক্ষুদ্র নয় বৎসরের বালকের মনের বিচিত্র-অনুভূতিরাজির ইতিহাস কোথায় লেখা থাকিবে? কোথায় লেখা থাকিবে বিস্মৃত অতীতে তার সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বিদেশ হইতে বহুদিন পরে বাডি ফিরিয়া মায়ের হাতে বেলের শরবৎ খাওয়ার সে মধুময় চৈত্র অপরাহ্ণটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্ণের নিদ্রা ভাঙিয়া পাপিয়ার সে মনমাতানো ডাক, কোথায় লেখা থাকিবে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলির সে-সব আনন্দ-কাহিনী।

দূর ভবিষ্যতের যেসব তরুণ বালকবালিকাদের মনে এইসব কালবৈশাখী নব আনন্দের বার্তা আনিবে, কোন্ পথে তারা আসিবে?

বাহির হইয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল।

সারা ভিটার উপর আসন্ন সন্ধ্যা এক অদ্ভুত, করুণামাখা ছায়া ফেলিয়াছে, মনে হয়, বাড়িটার এই অপূর্ব বৈকাল কাহার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিয়া করিয়া ক্লান্ত, জীর্ণ, অবসন্ন ও অনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে—আর সাড়া দেয় না, প্রাণ আর নাই।

বার বার করিয়া ঘুলঘুলিটার কথাই মনে পড়িতেছিল। ঘুলঘুলি দুটা এত ভাল আছে এখনও, অথচ মানুষেরাই গেল চলিয়া!

সে নিশ্চিন্দিপুরও আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবার বাসও করে সে অপূর্ব আনন্দ আর পাইবে না—এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ছেলেবেলায় যারা ছিল সাথী—এখন তাদের সঙ্গে আর অপুর কোনদিকেই মিশ খায় না—তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর সে সুখ নাই, তারা লেখা পড়া শিখে নাই, এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথাও যায় নাই—সবারই পৈতৃক কিছু জমি-জমা আছে, তাহাই হইয়াছে তাদের কাল। তাদের মন, তাদের দৃষ্টি পঁচিশ বৎসর পূর্বের সেই বাল্যকালের কোঠায় আজও নিশ্চল।…কোনদিক হইতেই অপুর আর

কোন যোগ নাই তাহাদের সহিত। বাল্যে কিন্তু এসব দৃষ্টি খোলে নাই—জিনিসের উপর একটা অপরিসীম নির্ভরতার ভাব ছিল—সব অবস্থাকেই মানিয়া লইত বিনা বিচারে। সত্যকার জীবন তখনই যাপন করিয়াছিল নিশ্চিন্দিপুরে।

তাহা ছাড়া বাল্যের সুপরিচিত ও অতি প্রিয় সাথীদের অনেকে বাঁচিয়া নাই। বোষ্টম দাদু নাই, জ্যাঠাইমা—রাণুদির মা নাই, আশালতাদি বিবাহের পর মরিয়া গিয়াছে, পটু এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়া অন্য কোথায় বাস করিতেছে, নেড়া, রাজু রায়, প্রসন্ন গুরুমশায় কেহই আর নাই—স্বামী মারা যাওয়ার পরে গোকুলের বউ খুড়িমাকে তাহার ভাই আসিয়া লইয়া গিয়াছে—দশ বারো বৎসর তিনি এখানে আসেন নাই, বাঁচিয়া আছেন কিনা কেহ জানে না।

তবু মেয়েদের ভাল লাগে। রাণুদি, ও-বাড়ির খুড়িমা, রাজলক্ষ্মী, লীলাদি, এরা স্নেহে, প্রেমে, দুঃখে, শোকে যেন অনেক বাড়িয়াছে, এতকাল পরে অপুকে পাইয়া ইহারা সকলেই খুশী, কথায় কাজে এদের ব্যবহার মধুর ও অকপট। পুরাতন দিনের কথা এদের সহিত কহিয়া সুখ আছে—বহুকালের খুঁটিনাটি কথাও মনে রাখিয়াছে—হয়তো বা জীবনের পরিধি ইহাদের সঙ্কীর্ণ বলিয়াই, ক্ষুদ্র বলিয়াই এতটুকু তুচ্ছ জিনিসও আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে।

আজ সে একথা বুঝিয়াছে, জীবনে অনবরত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিতে হইয়াছিল বলিয়াই আজ সে যাহা পাইয়াছে—এখানে পৈতৃক জমি জমার মালিক হইয়া নির্ভাবনায় বসিয়া থাকিলে তাহা পাইত না। আজ যদি সে বিদেশে যায়, সমুদ্রপারে যায়—যে চোখ লইয়া সে যাইবে, নিশ্চিন্দিপুরে গত পঁচিশ বৎসর নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিলে সে চোখ খুলিত না। একদিন নিশ্চিন্দিপুরকে যেমন সে সুখ-দুঃখ দ্বারা অর্জন করিয়াছিল—আজ তেমনি সুখ-দুঃখ দিয়া বাহিরকে অর্জন করিয়াছে।

নদীতে গা ধুইতে গিয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এই সব কথাই সে ভাবিতেছিল। সারাদিনটা আজ গুমট গরম, প্রতিপদ তিথি—কাল গিয়াছে পূর্ণিমা। আজ এখনি জ্যোৎস্না উঠিবে। এই নদীতে ছেলেবেলায় যে-সব বধূরা জল লইতে আসিত, তারা এখন প্রৌঢ়া, কত নাইও—মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে, যে-সব কোকিল সেই ছেলে-বেলাকার রামনবমী দিনের পুলকমুহূর্তগুলি ভরাইয়া দুপুরে কুক কুক ডাক দিত, কচিপাতা-ওঠা বাঁশবনে তাদের ছেলেমেয়েরা আবার তেমনি গায়।

শুধু তাহার দিদি শুইয়া আছে। রায়পাড়ার ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায় তাহাদের গ্রামের শ্মশান, সেখানে। সে-দিদির বয়স আর বাড়ে নাই, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয় নাই—তার কাচের চুড়ি, নাটাফলের

পুঁটুলি অক্ষয় হইয়া আছে এখনও। প্রাণের গোপন অন্তরে যেখানে অপুর শৈশবকালের কাঁচা শিশুমনটি প্রবুদ্ধ জীবনের শত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, উচ্চাশা ও কর্মস্তূপের নিচে চাপা পড়িয়া মরিয়া আছে—সেখানে সে চিরবালিকা, শৈশব জীবনের সে সমাধিতে জনহীন অন্ধকার রাত্রে সে-ই আসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলে—শিশু প্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফেরে।

আজ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া সাঁঝ-সকালে তার আশ্রয়স্থানটিতে সোনার সূর্যকিরণ পড়ে। বর্ষাকালের নিশীথে মেঘ ঝর ঝর জল ঢালে, ফাল্গুন দিনে ঘেঁটু ফুল, হেমন্ত দিনে ছাতিম ফুল ফোটে। জ্যোৎস্না উঠে। কত পাখি গান গায়। সে এ সবই ভালবাসিত। এ সব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই কোথাও।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একবার কলিকাতা আসিল—ফিরিতে কুড়ি পঁচিশ দিন দেরি হইয়া গেল—আষাঢ় মাসের শেষ, বর্ষা ইতিমধ্যেই খুব পড়িয়াছিল, সম্প্রতি দু-একদিন একটু ধরল, কখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিন ঠাণ্ডা, কোনদিন বা সারাদিন খর রৌদ্র।—

এই ক'দিনে দেশের চেহারা বদলাইয়াছে, গাছপালা আর যেন সবুজ উঁচু গাছের মাথা হইতে কচি মাকাল-লতা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে···বাল্যের অতীব পরিচিত দৃশ্য, এখনও বউ-কথা-কও ডাকে, কিন্তু কোকিল ও পাপিয়া আর নাই—এখনও বনে সোঁদালি ফুলের ঝাড় অজস্র, কুচি পট্‌পটি ফলের থোলো বাঁড়িয়াছে গাছে গাছে—কটু গন্ধ ঘেঁটকোল রোজ বেলা শেষে কোন্ ঝোপঝাপের অন্ধকারে ফোটে, ঘাটের পথে ফিরিবার সময় মেয়েরা নাকে কাপড় চাপা দেয়—কি পরিচিত, কি অপূর্ব ধরণের পরিচিত সবই, অথচ বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিল সবটা এতদিন।···বাহিরের মাঠ সবুজ হইয়াছে নবীন আউশ ধানে—এই সময় একদিন সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিল।

খুব রৌদ্র, দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে, বেলা তিনটার কম নয়, অপু কি কাজে গ্রামের পিছনদিকের বনের পথ ধরিয়া যাইতেছিল। দুধারে বর্ষার বনঝোপ বন সবুজ, বাঁশবনে একটা কঞ্চি হইতে হলদে পাখি উড়িয়া আর একটা কঞ্চিতে বসিতেছে। একটা জায়গায় ঘনবনের মধ্যে সুঁড়ি পথ, বড়গাছের পাতার ফাঁক দিয়া ঝলমলে পরিপূর্ণ রৌদ্র পড়িয়া, কচি, সবুজ, পাতার রাশি স্বচ্ছ দেখাইতেছে.

কেমন একটা অপূর্ব স্নগন্ধ উঠিতেছে বনঝোপ হইতে—সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল সেদিকে চাহিয়াই।…তাহার সেই অপূর্ব শৈশব জগৎটা!—

ঠিক এইরকম সুঁড়ি বনের পথ বাহিয়া এমনি রৌদ্রালোকিত ঘুঘুডাকা দীর্ঘ শ্রাবণ দিনে, দুপুর ঘুরিয়া বৈকাল আসিবার পূর্ব সময়টিতে সে ও দিদি চৌশালিকের বাসা, পাকা মাকালফল, মিষ্টি রাংচিতার ফল খুঁজিয়া বেড়াইত —দুপুর রোদের গন্ধমাখানো, কত লতা দোলানো, সেই রহস্যভরা, করুণ, মধু আনন্দলোকটি!…মাইল বাহিয়া এ গতি নয়, সেখানে যাওয়ার যানবাহন নাই—পৃথিবীর কোথায় যেন একটি পথ আছে যাহা সময়ের বীথিতল বাহিয়া মানুষকে লইয়া চলে তার অলক্ষিতে। ঘন ঝোপের ভিতর উঁকি মারিতেই চক্ষের নিমেষে তাহার ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের শৈশবলোকটিতে আবার সে ফিরিয়া গেল, যখন এই বন, এই নীল আকাশ, উজ্জ্বল আনন্দভরা, এই রৌদ্র-মাখানো শ্রাবণ দুপুরটাই ছিল জগতের সবটুকু—বাহিরের বিশ্বটা ছিল অজানা, সে সম্বন্ধে কিছু জানিতও না, ভাবিতও না—রঙে রঙে রঙীন রহস্যঘন সেই তার প্রাচীন দিনের জগৎটা!…

এ যেন নবযৌবনের উৎস-মুখ, মন বার বার এর ধারায় স্নান করিয়া হারানো নবীনত্বকে ফিরিয়া পায়—গাছপালার সবুজ, রৌদ্রালোকের প্রাচুর্য দুর্গাটুনটুনির অবাধ কাকলী—ঘন সুঁড়িপথের দূরপারে শৈশবসঙ্গিনী দিদির ডাক যেন শুনা যায়।—

কতক্ষণ সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—বুঝাইবার ভাষা নাই, এ অনু-ভূতি মানুষকে বোবা করিয়া দেয়! অপুর চোখ ঝাপ্সা হইয়া আসিল, কোন্ দেবতা তার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন? তার নিশ্চিন্দিপুর আসা সার্থক হইল!

আজ মনে হইতেছে যৌবন তার স্বর্গের দেবতাদের মত অক্ষয়, অনন্ত… সে জগৎটা আছে—তার মধ্যেই আছে। হয়তো কোন বিশেষ পাখির গানের সুরে, কি কোনও বনফুলের গন্ধে শৈশবের সে হারানো জগৎটা আবার ফিরিবে। অপুর কাছে সেটা একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সৌন্দর্যের প্লাবন বহাইয়া ও মুক্তির বিচিত্র বার্তা বহন করিয়া তা আসে, যখনই আসে। কিন্তু ধ্যানে তাকে পাইতে হয়, শুধু অনুভূতিতেই সে রহস্য-লোকের সন্ধান মিলে!

তার ছেলে কাজল বর্তমানে এই জগতের অধিবাসী। এজন্য ওর কল্পনাকে অপু সঞ্জীবিত রাখিতে প্রাণপণ করে—শক ও হুণের মত বৈষয়িকতা ও পাকাবুদ্ধির চাপে সে-সব সোনার স্বপ্নকে রূঢ়হস্তে কেহ পাছে ভাঙিয়া দেয় —তাই সে কাজলকে তার বৈষয়িক শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে সরাইয়া আনিয়াছে—নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনে, মাঠে, ফুলে ভরা বনঝোপে, নদীতীরের

উলুখড়ের নির্জনে চরে সেই অদৃশ্য জগৎটার সঙ্গে ওর সেই সংযোগ স্থাপিত হউক —যা একদিন বাল্যে তার নিজের একমাত্র পার্থিব ঐশ্বর্য ছিল···

নিশ্চিন্দিপুর, ১৭ই আষাঢ়

ভাই প্রণব,

অনেকদিন তোমার কোন সংবাদ পাই নি, কোনো সন্ধানও জানতুম না। হঠাৎ সেদিন কাগজে দেখলুম তুমি আদালতে কম্যুনিজম নিয়ে এক বক্তৃতা দিয়েছ, তা থেকেই তোমার বর্তমান অবস্থা জানতে পারি।

তুমি জান না বোধ হয়, আমি অনেকদিন পর আমার গ্রামে ফিরেছি। অবশ্য দু'দিনের জন্য, সে-সব কথা পরে লিখব। খোকাকেও এনেছি। সে তোমায় বড় মনে রেখেছে, তুমি ওর মাথায় জল দিয়ে বাতাস করে জ্বর সারিয়েছিলে সে-কথা ও এখনও ভোলে নি।

দেখ প্রণব, আজকাল আমার মনে হয়—অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন—এসবই জীবন! এবার এখানে এসে জীবনটাকে নতুন চোখে দেখতে পাই, এমন সুবিধে ও অবকাশ আর কোথাও হয় নি—এক নাগপুর ছাড়া! কত আনন্দের দিনের যাওয়া-আসা হ'ল জীবনে। যেদিনটিকে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রথম কুঠির মাঠ দেখতে যাই সরস্বতী পূজোর বিকেলে—যেদিন আমি ও দিদি রেলরাস্তা দেখতে ছুটে যাই—যেদিন বিয়ের আগের রাত্রে তোমার মামার বাড়ির ছাদটিতে বসেছিলুম সন্ধ্যায়,—জন্মাষ্টমার তিমিরভরা বর্ষণসিক্ত রাত জেগে কাটিয়েছিলুম আমি ও অপর্ণা মনসাপোতার খড়ের ঘরে, জীবনের পথে এরাই তো আনন্দের অক্ষয় পাথেয়—যে আনন্দ অর্থের উপর নির্ভর করে না, ঐশ্বর্যের উপর নির্ভর করে না, মান-সম্মান বা সাফল্যের উপরও নির্ভর করে না যা সূর্যের কিরণের মত অকৃপণ, অপক্ষপাতী, উদার, ধনী-দরিদ্র বিচার করে না, উপকরণের স্বল্পতা বা বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না। বড়লোকের মেয়েরা নতুন মোটর কিনে যে আনন্দ পায়, মা অবিকল সেই আনন্দই পেতেন যদি নেমন্তন্ন থেকে আমি ভাল ছাঁদা বেঁধে আনতে পারতুম, আমার দিদি সেই আনন্দই পেত যদি বনঝোপে কোথাও পাকা-ফলে ভরা মাকাললতা কি বৈঁচিগাছের সন্ধান পেত।

জীবনে সর্বপ্রথম যেবার একা বিদেশে গেলুম পিসিমার বাড়ি সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজা দিতে, বছর কয়েক বয়স তখন—হাজার বছর যদি বাঁচি, কে ভুলে যাবে সেদিনের সে আনন্দ ও অনুভূতির কথা? বহু পয়সা খরচ ক'রে মেরু পর্যটকেরা তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে, উত্তর-হিম-কটিবন্ধের বরফ-জমা নদী ও অন্ধকার আরণ্যভূমির নির্জনতার মধ্যে Northern light জ্বলা আকাশের

তলায়, অবাস্তব হলুদরঙের চাঁদের আলোয়, শুভ্রতুষারাবৃত পাইন ও সিলভার ফুসের অরণ্যে নেকড়ে বাঘের ডাক শুনে সে আনন্দ পান না···আমি সেদিন খালি পায়ে বালুমাটির পথে শিমুল সোঁদালি বনের ছায়ায় ছায়ায় ভিন্-গাঁয়ে যেতে যেতে যে আনন্দ পেয়েছিলুম। আমি তো বড হয়ে জীবনে কত জায়গায় গেলুম, কিন্তু জীবনের উপায় মুক্তির প্রথম আস্বাদের সে পাগলকরা আনন্দের সাক্ষাৎ আর পাই নি···তাই রেবাতটের সেই বেতসতরুতলেই অবুঝ মন বার বার ছুটে ছুটে যায় যদি, তাকে দোষ দিতে পারি কৈ ?···

আজ একথা বুঝি ভাই যে, সুখ ও দুঃখ দুই-ই অপূর্ব। জীবন খুব বড একটা রোমান্স—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স। এ বিশ্বাসটা এতদিন আমার ছিল না—ভাবতুম লাফালাফি ক'রে বেড়ালেই বুঝি জীবন সার্থক হয়ে গেল—তা নয়, দেখলুম ভাই।

এর সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা আত্মার যে কি বিচিত্র, অমূল্য য়্যাডভেঞ্চার··· তা বুঝে দেখতে ধ্যানদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে, তা আসে এই রহস্যমাখা যাত্রাপথের অমানবীয় সৌন্দর্যের ধারণা থেকে।···

শৈশবের গ্রামখানাতে ফিরে এসে জীবনের এই সৌন্দর্যরূপটাই শুধু চোখে দেখছি। এতদিনের জীবনটা একচমকে দেখবার এমন সুযোগ আর হয় নি কখনও। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্তন, এত রস···অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে চারিধারের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব শান্তির মধ্যে কত কথাই মনে আসে, কত বছর আগেকার সে শৈশব-সুরটা যেন কানে বাজে, এক পুরনো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুর···কত দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, রাখালের বাঁশির সুরের ওপারের যে দশটি অনন্ত তার কথাই মনে ওঠে।

কিছুতেই আমাদের দেশের লোকে বিস্মিত হয় না কেন বলতে পার, প্রণব ? বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা। যে মানুষ কোনও কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে তো প্রাণহীণ। কলকাতায় দেখেছি কি তুচ্ছ জিনিস নিয়েই সেখানকার বড় বড় লোকে দিন কাটায়। জীবনকে যাপন করা একটা আর্ট—তা এরা জানে না বলেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে পড়ে।

দিনের মধ্যে খানিকটা অন্তত নির্জনে বসে একে ভাবতে হয়—উঃ সে দেখেছিলুম নাগপুরে ভাই—যে কী অবর্ণনীয় আনন্দ পেতুম। বৈকালটিতে যখন কোনো শালবনের ছায়ায় পাথরের ওপর গিয়ে বসতুম—লোকাতীত যে বড় জীবন শত শত জন্মমৃত্যুর দূর পারে অক্ষুণ্ণ, তার অস্তিত্বকে মন যেন

চিনে নিত···ডি সিটারের, আইনস্টাইনের বিশ্বটার চেয়েও তা বড়।

এখানে এসেও তাই মনে হচ্ছে প্রণব।···এখানে বুঝেচি জগতে কত সমান্য জিনিস থেকে কত গভীর আনন্দ আসতে পারে। তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ যশমান। আমার জীবনে এরাই হোক অক্ষয়। এত ছায়া, এত ডাঁসা খেজুরের আতাফুলের সুগন্ধ, এত স্মৃতির আনন্দ কোথায় আর পাব? হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারি এখানে, তবু এ পুরনো হবে না যেন।

লীলাকে জানতে? আমার মুখে দু' একবার শুনেছ। সে আর নেই। সে সব অনেক কথা। কিন্তু যখনই তার কথা ভাবি, অপর্ণার কথা ভাবি, তখন মনে হয় এদের দু'জনের সঙ্গ পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে—বাইবেলে পড়েছ তো—And I saw a new Heaven and a New Earth—এরা জীবন দিয়ে আমার সে চোখ খুলে দিয়েছে।

হ্যাঁ, তোমায় লিখি। আমি বাইরে যাচ্ছি। খুব সম্ভব যাব ফিজি ও সামোয়া—এক বন্ধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়েছি। কাজলকে কোথায় রেখে যাই এই ছিল সমস্যা। তোমার মামার বাড়ি রাখব না—তোমার মেজমামীমা লিখেছেন কাজলের জন্য তাঁদের মন খারাপ, সে চলে গিয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। হোক অন্ধকার, সেখানে আর নয়। আমার এক বাল্যসঙ্গিনী এখানে আছেন। তাঁর কাজেই ওকে রেখে যাব। এঁর সন্ধান না পেলে বিদেশে যাওয়া কখনও ঘটে উঠত না, খোকাকে যেখানে-সেখানে ফেলে যেতে পারতুম না তো!

আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি, মেঘশূন্য আকাশ সুনীল। খুব জ্যোৎস্না উঠবে—ইচ্ছা হয় তোমায় নিয়ে দেখাই এ-সব, তোমার ঋণ শোধ দিতে পারব না জীবনে ভাই—তুমিই অপর্ণাকে জুটিয়ে দিয়েছিলে···কত বড় দান যে সে জীবনের, তা তুমিও হয়তো বুঝবে না।

তোমারই চিরদিনের বন্ধু

অপু

দুপুরে একদিন রাণু বলিল, অপু তোর কিছু দেনা আছে—

কি দেনা রাণুদি?

মনে আছে আমার খাতায় একটা গল্প শেষ করিস নি?

রাণু একটা খাতা বাহির করিয়া আনিল। অপু খাতাটা চিনিতে পারিল না। রাণু বলিল—এতে একটা গল্প আধখানা লিখেছিলি মনে আছে ছেলেবেলায়? শেষ লিখে দে এবার।···অপু অবাক হইয়া গেল। বলিল—রাণুদি, সেই খাতাখানা এতকাল রেখে দিয়েছ তুমি?

রাণু মৃদু হাসিল।

—বেশ দাও। এখন আমার লেখা কাগজে বেরুচ্ছে, তোমার খাতখানায় গল্পটা অর্ধেক রাখব না। কিন্তু কি ভেবে খাতাখানা রেখেছিলে রাণুদি এতদিন?

—শুনবি? একদিন তোর সঙ্গে দেখা হবেই, গল্প শেষ ক'রে দিবিই জানতুম!

অপু মনে ভাবিল—তোমাদের মত বাল্যসঙ্গিনী জন্ম জন্ম যেন পাই রাণুদি। মুখে বলিল—সত্যি? দেখি—দেখি খাতাটা।

খাতা খুলিয়া বাল্যের হাতের লেখাটা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিল। রানীকে দেখাইয়া হাসিয়া বলিল—একটা পাতে সাতটা বানান ভুল ক'রে বসে আছি ছ্যাখো।

সে এই মঙ্গলরূপিণী নারীকেই সারাজীবন দেখিয়া আসিয়াছে—এই স্নেহময়ী, করুণাময়ী নারীকে—হয়তো ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালের ও ভাসা ভাসা ধরনের বলিয়া···অপর্ণা দু'দিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল—লীলার সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের শত সুখ ও দুঃখ ও সদাজাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে—পটেশ্বরী, রাণুদি, নির্মলা, নিরুদি, তেওয়ারী-বধূ—সবই তাই। তাই যদি হয় অপু দুঃখিত নয়—তাই ভালো, এই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়ানো ভবঘুরে পথিক-জীবনে সহচর-সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে··তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশী মেশামেশি করিয়া তাহাদের দুর্বলতাকে আবিষ্কার করিবার শখ তাহার নাই—সে যাহা পাইয়াছে চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে ইহার জন্য।

ভাদ্রের শেষে আর একবার কলকাতায় আসিয়া খবরের কাগজে একদিন পড়িল, ফিজি-প্রত্যাগত কয়েকজন ভারতীয় আর্যমিশনে আসিয়া উঠিয়াছেন। তখনই সে আর্যমিশনে গেল। নিচে কেহ নাই, জিজ্ঞাসা করিলে একজন উপরের তলায় যাইতে বলিল।

ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের একজন যুবক হিন্দীতে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। অপু বলিল—আপনারা এসেছেন শুনে দেখা করতে এলুম ফিজির সব খবর বলবেন দয়া ক'রে? আমার খুব ইচ্ছে সেখানে যেতে।

যুবকটি একজন আর্যসমাজী মিশনারী। সে ইস্ট আফ্রিকা, ট্রিনিডাড, মরিশস—নানা স্থানে প্রচার-কার্য করিয়াছে। অপুকে ঠিকানা দিল, পোস্ট বক্স ১১৭৫, লউটোকা, ফিজি। বলিল, অযোধ্যা জেলায় আমার বাড়ি—এবার যখন ফিজি যাব একসঙ্গেই যাব।

অপু যখন আর্যমিশন হইতে বাহির হইল, তখন বেলা সাড়ে দশটা।

বাসায় আসিয়া টিকিতে পারিল না। কাজল সেখানে নাই, ঘরটার সবত্র কাজলের স্মৃতি, ওই জানালাতে কাজল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিত—দেওয়ালের ঐ পেরেকটা সে-ই পুঁতিয়াছিল, একটা টিনের ভেঁপু ঝুলাইয়া রাখিত—ওই কোণটাতে টুলটার উপর বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া মুড়ি খাইত—অপুর যেন হাঁপ ধরে—ঘরটাতে সত্যই থাকা যায় না।

বৈকালে খানিকটা বেড়াইল। বাকী চারশ' টাকা আদায় হইল। আর কিছুদিন পর কলকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে—কত দূর, সপ্তসিন্ধু পারের দেশ!···কে জানে আর ফিরবে কিনা?···ভিটা-লেভু, ত্যানি-লেভু, নিউ হেব্রিডিস্—সামোয়া!—অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবালবাঁধে-ঘেরা নিস্তরঙ্গ ঘন নীল উপ-সাগর, একদিকে সিন্ধু সীমাহারা, অকূল!—দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত—অন্যদিকে ঘরোয়া ছোট্ট পুকুরের মত উপসাগরটির তীরে নারিকেল পত্র নির্মিত ছোট ছোট কুটির—মধ্যে লৌহ প্রস্তরের পাহাড়ের সূক্ষ্মাগ্র নাসা, উভয়কে দ্বিধাবিভক্ত করিতেছে—রৌদ্রলোকপ্লাবিত সাগরবেলা। পথিক জীবনের যাত্রা আবার নতুন দেশের নতুন আকাশতলে শুরু হইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে!

পুরাতন দিনের সঙ্গে যে-সব জায়গার সম্পর্ক···আর একেবারে সে-সব দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল···

মায়ের মৃত্যুর পূর্বে যে ছোট একতলা ঘরটাতে থাকিত অভয় নিয়োগী লেনের মধ্যে—সেটার পাশ দিয়াও গেল। বহুকাল এইদিকে আসে নাই। গলির মুখে একটা গ্যাসপোস্টের কাছে সে চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—

একটি ছিপ্‌ ছিপে চেহারার উনিশ কুড়ি বছরের পাড়াগাঁয়ের যুবক সামনের ফুটপাতে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কিছু মুখচোরা, কিছু নির্বোধ—বোধ হয় নতুন কলিকাতায় আসিয়াছে—বোধ হয় পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—ক্ষুধাশীর্ণ মুখ—অপু ওকে চেনে—ওর নাম অপূর্ব রায়।—তেরো বছর আগে ও এই গলিটার মধ্যে একতলা বাড়িটাতে থাকিত। এক মুঠো হোটেলের রান্না ডাল-ভাতের জন্য হোটেলওয়ালার কত মুখ-নাড়া সহ্য করিত—মায়ের সঙ্গে দেখা করিবার প্রত্যাশায় পাঁচিলের গায়ে দাগ কাটিয়া ছুটির আর কতদিন বাকি হিসাব রাখিত। দাগগুলি জামরুলগাছটার পাশে লোনাধরা পাঁচিলের গায়ে

আজও হয় তো আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্যাস জ্বলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের ছবি মিলাইয়া গেল!···

বাসার নির্জন ছাদে একা আসিয়া বসিল। মনে কি অদ্ভুত ভাব!—কি অদ্ভুত অনুভূতি!—নবমীর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—কেমন সব কথা মনে উঠে—বিচিত্র সব কথা—বসিয়া বসিয়া ভাবে, এই রকম জ্যোৎস্না আজ উঠিয়াছে তাদের মনসাপোতার বাড়িতে, নাগপুরের বনে তার সেই খড়ের বাংলোর সামনের মাঠে, বাল্যে সেই একটিবার গিয়াছিল লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি, তাদের উঠানের পাশে সেই পুকুর পাড়টাতে, নিশ্চিন্দপুরের পোড়ো-ভিটাতে, অপর্ণা ও সে শ্বশুর বাড়ির যে ঘরটাতে শুইত—তারই জানালার গায়ে—চাঁপদানীতে পটেশ্বরীদের বাড়ির উঠানে—দেওয়ানপুরের বোর্ডিংয়ের কম্পাউণ্ডে, জীবনের সহিত জড়ানো এই সব স্থানের কথা ভাবিতেই জীবনের বিচিত্রতা, প্রগাঢ় রহস্য তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল···

এবার কলিকাতা হইতে বাড়ি ফিরিবার সময় মাঝেরপাড়া স্টেশনে নামিয়া অপু আর হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে পারিল না—খোকাকে আজ দেড়মাস দেখে নাই—ছ'ক্রোশ রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া বাড়ি পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে—খোকার জন্য মন এত অধীর হইয়া উঠিয়াছে যে, এত দেরি করা একেবারেই অসম্ভব।—বাবার কথা মনে হইল—বাবাও ঠিক তাকে দেখিবার জন্য, দিদিকে দেখিবার জন্য এমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন—প্রবাস হইতে তিনি ফিরিবার পথে তাদের বাল্যে। আজকাল পিতৃহৃদয়ের এসব কাহিনী সে বুঝিয়াছে—কিন্তু তখন তো হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া পন্থা ছিল না, এখন আর সেদিন নাই, মোটর-বাসে এক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিন্দিপুর। যা একটু দেরি সে কেবল বেত্রবতীর খেয়াঘাটে।

গ্রামে পৌছিতে অপুর প্রায় বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মাদুর পাতিয়া রাণুদিদের রোয়াকে ছেলেকে লইয়া বসিল। লীলা আসিল, রাণু আসিল, ও-বাড়ির রাজলক্ষ্মী আসিয়া বসিল। রাণুদের বাড়ির চারিধারে হেমন্ত অপরাহ্ণ ঘনাইয়াছে···নানা লতাপাতায় সুগন্ধ উঠিতেছে···

কি অদ্ভুত ধরণের সোনালী রোদ এই হেমন্ত বৈকালের! আকাশ ঘন নীল—তার তলে রাণুদিদের বাড়ির পিছনের বাঁশের ঝাড়ে সোনালী সড়কির মত বাঁশের সুচালো ডগায় রাঙা রোদা-মাখানো, কোনটার উপর ফিঙে পাখি বসিয়া আছে—বাদুড়ের দল বাসায় ফিরিতেছে!···পাঁচিলের পাশের বনে এক একটা আমড়া গাছে থোলো থোলো কাঁচা আমড়া।

সন্ধ্যার শাঁখ বাজিল। জগতের কি অপূর্ব রূপ!...আবার অপুর মনে হয়, এদের পেছনে কোথায় আর একটা অসাধারণ জগৎ আছে—ওই বাঁশবনের মাথার উপরকার সিঁদুর মেঘভরা আকাশ, বাঁশের সোনালী সড়কির আগায় বসা ফিঙে-পাখির দুলুনি—সেই অপূর্ব, অচিন্ত্য জগৎটার সীমানায় মনকে লইয়া গিয়া ফেলে। সন্ধ্যার শাঁখ কি তাদের পোড়াভিটাতেও বাজিল?...পুজার সময় বাবার খরচপত্র আসিত না, মা কত কষ্ট পাইত—দিদির চিকিৎসা হয় নাই—সে সব কথা মনে আসিল কেন এখন?

অন্য সবাই উঠিয়া যায়। কাজল পড়িবার বই বাহির করে। রাণু রান্নাঘরে রাঁধে, কুটনো কোটে। অপুকে বলে—এইখানে আয় বসবি. পিঁড়ি পেতে দি—

অপু বলে, তোমার কাছে বেশ থাকি রাণুদি। গাঁয়ের ছেলেদের কথাবার্তা ভাল লাগে না।

রাণু বলে—দু'টি মুড়ি মেখে দি—খা বসে বসে। দুধটা জ্বাল দিয়েই চা ক'রে দিচ্ছি।

—রাণুদি সেই ছেলেবেলাকার ঘটিটা তোমাদের—না?

রাণু বলে—আমার ঠাকুরমা জগন্নাথ থেকে এনেছিলেন তাঁর ছেলেবয়সে। আচ্ছা অপু, দুগ্‌গার মুখ তোর মনে পড়ে?

অপু হাসিয়া বলে—না রাণুদি। একটু যেন আবছায়া—তাও সত্যি কিনা বুঝিনে। রাণু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা! সব স্বপ্ন হয়ে গেল। অপু ভাবে, আজ যদি সে মারা যায়, খোকাও বোধ হয় তাহার মুখ এমনি ভুলিয়া যাইবে। রাণুর মেয়ে বলিল—ও মামা, আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে আজ এইলোপেলেন্ গিইল।

কাজল বলিল—হাঁ বাবা, আজ দুপুরে। এই তেঁতুল গাছের ওপর দিয়ে গেল

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি?

—হাঁ তাই। কি ইংরেজি বুঝিনে—উড়ো জাহাজ যাকে বলে—কি

নিশ্চিন্দিপুরের সাত বছরের মেয়ে আজকাল এরোপ্লেন দেখিতে পায় তাহা হইলে?

পরদিন সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না-রাত্রে অভ্যাস মত নদীর ধারে মাঠে বেড়াইতে গেল। কতকাল আগে নদীর ধারের ওইখানটিতে একটা সাঁইবাব্‌লা তলায় বসিয়া এইরকম বৈকালে সে মাছ ধরিত—আজকাল সেখানে সাঁইবাব্‌লার বন, ছেলেবেলার সে গাছটা আর চিনিয়া লওয়া যায় না।

ইছামতী এই চঞ্চল জীবনধারার প্রতীক। ওর দু'পাড় ভরিয়া প্রতি চৈত্র বৈশাখ কত বনকুসুম, গাছপালা, পাখি-পাখালী, গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কত পাখির দল আসে যায়, ধারে ধারে কত জেলেরা জাল ফেলে, তীববর্তী গৃহস্থবাড়িতে হাসি-কান্নার লীলাখেলা হয়, কত গৃহস্থ আসে, কত গৃহস্থ যায়—কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে, আবাব বৃদ্ধাবস্থায় তাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতোজলে ভাসিয়া যায়—এমন কত মা, কত ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী মরাকালের বীথিপথে আসে যায়—অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, নিবীহ।…

আজকাল নির্জনে বসিলেই তাহাব মনে হয়, এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়াব মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন, এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদেব দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত, এ সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়ে না। যেমন সাহেব বন্ধুটি বলিত, "ভাবতবর্ষের একটা রূপ আছে, সে তোমরা জান না। তোমরা এখানে জন্মেচ কিনা, অতি পরিচয়ের দোষে সে চোখ ফোটে নি তোমাদেব।"

আকাশের রং আব এক বকম—দূরেব সে গহন হিরাকসের সমুদ্র ঈষৎ কৃষ্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে—তাব তলায় সারা সবুজ মাঠটা, মাধবপুরের বাঁশবনটা কি অপূর্ব, অদ্ভুত, অপার্থিব ধবণেব ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে!…ও যেন পরিচিত পৃথিবীটা নয়, অন্য কোন অজানা জগতের কোনও অজ্ঞাত দেবলোকেব…

প্রকৃতির একটা যেন নিজস্ব ভাষা আছে। অপু দেখিয়াছে, কতদিন বক্রতোয়ার উপল-ছাওয়া-তটে শাল-ঝাড়ের নিচে ঠিক-দুপুরে বসিয়া—দূরে নীল আকাশের পটভূমিতে একটা পত্রশূন্য প্রকাণ্ড কি গাছ—সেদিকে চাহিলেই এমন সব কথা মনে আসিত যা অন্য সময় আসার কল্পনাও করিতে পারিত না—পাহাড়ের নিচে বনফলের জঙ্গলেও একটা কি বলিবাব ছিল যেন। এই ভাষাটা ছবির ভাষা—প্রকৃতি এই ছবির ভাষায় কথা বলেন—এখানেও সে দেখিল গাছপালায়, উইটিবির পাশে শুকনো খড়ের ঝোপে, দূরের বাঁশবনের সারিতে—সেই সব কথাই বলে—সেই সব ভাবই মনে আনে। প্রকৃতির এই ছবির ভাষাটা সে বোঝে। তাই নির্জন মাঠে, প্রান্তরের বনের ধারে একা বেড়াইয়া সে যত প্রেরণা পায়—যে পুলক অনুভব করে তা অপূর্ব—সত্যিকার

Joy of Life—পায়ের তলায় শুকনো লতা-কাটি, দেয়াড়ের চরে রাঙা-রোদ মাখানো কষাড় ঝোপ, আকন্দের বন, ঘেঁটুবন—তার আত্মাকে এরা ধ্যানের খোরাক যোগায়, এ যেন অদৃশ্য স্বাতী নক্ষত্রের বারি, তারই প্রাণে মুক্তার দানা বাঁধে।

সন্ধ্যার পূরবী কি গৌরীরাগিণীর মত বিষাদ-ভরা আনন্দ, নির্লিপ্ত ও নির্বিকার—বহুদূরের ওই নীল কৃষ্ণাভ মেঘরাশি, ঘন নীল, নিথর গহন আকাশটা মনে যে ছবি আঁকে, যে চিন্তা যোগায়, তার গতি গোমুখী গঙ্গার মত অনন্তের দিকে, সে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কথা বলে, মৃত্যুপারের দেশের কথা কয়,—ভালবাসা—বেদনা—ভালবাসিয়া হারানো—বহুদূরের এক প্রীতিভরা পুনর্জন্মের বাণী···

এইসব শান্ত সন্ধ্যায় ইছামতীর তীরের মাঠে বসিলেই রক্তমেঘস্তূপ ও নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চারিপাশের সেই অনন্ত বিশ্বের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে বাল্যে এই কাঁটাভরা সাঁইবাব্‌লার ছায়ায় বসিয়া বসিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে সে দূর দেশের স্বপ্ন দেখিত—আজকাল চেতনা তাহার বাল্যের সে ক্ষুদ্র গণ্ডী পার হইয়া ক্রমেই দূর হইতে দূরে আলোকের পাখায় চলিয়াছে—এই ভাবিয়া এক এক সময় সে আনন্দ পায়—কোথাও না যাক্—যে বিশ্বের সে একজন নাগরিক, তা ক্ষুদ্র, দীন বিশ্ব নয়। লক্ষ কোটি আলোক-বর্ষ যার গণনার মাপকাঠি, দিকে দিকে অন্ধকারে ডুবিয়া ডুবিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ. নীহারিকাদের দেশ, অদৃশ্য ইথারের বিশ্ব যেখানে মানুষের চিন্তাতীত, কল্পনাতীত দূরত্বের ক্রমবর্ধমান পরিধিপানে বিস্তৃত—সেই বিশ্বে সে জন্মিয়াছে···

ঐ অসীম শূন্য কত জীবলোকে ভরা—কি তাদের অদ্ভুত ইতিহাস! অজানা নদীতটে প্রণয়ীদের কত অশ্রুভরা আনন্দতীর্থ—সারা শূন্য ভরিয়া আনন্দ-স্পন্দনের মেলা—ইথারের নীল সমুদ্র বাহিয়া বহু দূরের বৃহত্তর বিশ্বের সে-সব জীবনধারার ঢেউ প্রাতে, দুপুরে, রাতে, নির্জনে একা বসিলেই তাহার মনের বেলায় আসিয়া লাগে—অসীম আনন্দ ও গভীর অনুভূতিতে মন ভরিয়া উঠে—পরে সে বুঝিতে পারে শুধু প্রসারতার দিকে নয়—যদিও তা বিপুল ও অপরিমেয়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-স্তরের আর একটা Dimension যেন তার মন খুঁজিয়া পায়—এই নিস্তব্ধ শরত-দুপুর যখন অতীতকালের এমনি এক মধুর মুগ্ধ শৈশব-দুপুরের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও করুণ হইয়া উঠে তখনই সে বুঝিতে পারে চেতনার এ স্তর বাহিয়া সে বহুদূর যাইতে পারে—হয়ত কোন অজ্ঞাত সৌন্দর্যময় রাজ্যে, দৈনন্দিন ঘটনার গতানুগতিক অনুভূতিরাজি ও একঘেয়ে মনোভাব যে রাজ্যের সন্ধান দিতে পারিতই না কোনদিন।···

নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নব রূপ সে দেখিতে পাইল। মনে হইল যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেব-শিল্পীর হাতে আবর্তিত হইতেছে—তিনি জানেন কোন্ জীবনের পর কোন্ অবস্থার জীবনে আসিতে হয়, কখনও বা সঙ্গতি, কখনও বা বৈষম্য—সবটা মিলিয়া অপূর্ব রসসৃষ্টি—বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট—

ছ'হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ঈজিপ্টে—সেখানে নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে, নীলনদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন্ দরিদ্রঘরের মা বোন বাপ ভাই বন্ধুবান্ধবদের দলে কবে সে এক মধুর শৈশব কাটাইয়া গিয়াছে—আবার হয়ত জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে—কর্ক-ওক্, বার্চ ও বীচ্ বনের শ্যামল ছায়ায় বনেদী ঘরের প্রাচীন প্রাসাদে মধ্যযুগের আড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায়, সুন্দরমুখ সখীদের দলে। হাজার বছর পর আবার হয়ত সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে—তখন কি মনে পড়িবে এবারকারের এই জীবনটা?—কিংবা কে জানে আর হয়ত এ পৃথিবীতে আসিবে না—ওই যে বটগাছের সারির মাথায় সন্ধ্যার ক্ষীণ প্রথম তারকাটি—ওদের জগতে অজানা জীবন-ধারার মধ্যে হয়ত এবার নবজন্ম!—কতবার যেন সে আসিয়াছে···জন্ম হইতে জন্মান্তরে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া···বহু, বহু দূর অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল···কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি—জীবনের ও জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কি অপরূপ অভিযান···শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে, পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে।···এই সবটা লইয়া সে আসল বৃহত্তর জীবন—পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র—তার স্বপ্ন যে শুধু কল্পনাবিলাস, এ যে হয় না তা কে জানে—বৃহত্তর জীবনচক্র কোন্ দেবতার হাতে আবর্তিত হয় কে জানে?···হয়ত এমন সব প্রাণী আছেন যাঁরা মানুষের মত ছবিতে, উপন্যাসে, কবিতায় নিজেদের শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না—তাঁরা এক এক বিশ্ব সৃষ্টি করেন—তার মানুষের সুখে-দুঃখে উত্থান-পতনে আত্মপ্রকাশ করাই তাঁদের পদ্ধতি—কোন্ মহান্ বিবর্তনের জীব তাঁর অচিন্ত্যনীয় কলা-কুশলতাকে গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে এ-রকম রূপ দিয়াছেন—কে তাঁকে জানে?···

একটি অবর্ণনীয় আনন্দে, আশায়, অনুভূতিতে, রহস্যে মন ভরিয়া উঠিল। প্রাণবন্ত তার আশা, সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বনলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখাপত্রের তিক্ত গন্ধ আনে—নীল শূন্যে বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রবে শোনায়। সে জীবনের অধিকার হইতে তাহাকে কাহারও বঞ্চনা করিবার শক্তি নাই—

আর মনে হইল সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয়—ওটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন্ সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্যদ পিতৃলোক—এই শত, সহস্র শতাব্দী তার পায়ে-চলার পথ—তার ও সকলেরই মৃত্যুদ্বারা অস্পৃষ্ট যে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণভাবে বর্তমান—নিঃসীম সময় বাহিয়া যে গতি সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক···।

অপু তাহাদের ঘাটের ধারে আসিল। ওইখানটিতে এমন এক সন্ধ্যার অন্ধকারে বনদেবী বিশালাক্ষী স্বরূপ চক্রবর্তীকে দেখা দিয়াছিলেন কতকাল আগে!

আজ যদি আবার তাহাকে দেখা দেন।

—তুমি কে?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি কি বর চাও?

—অন্য কিছুই চাই নে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবাগানের ছায়ায় অবোধ, উদ্‌গ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী?—

"You enter it by the Ancient way
Through Ivory Gate and Golden"

ঠিক দুপুর বেলা।

রানী কাজলকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না—বেজায় চঞ্চল। এই আছে, কোথা দিয়া যে কখন বাহির হইয়া গিয়াছে—কেহ বলিতে পারে না। সে রোজ জিজ্ঞাসা করে—পিসিমা, বাবা কবে আসবে? কতদিন দেরী হবে?—

অপু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—রাণুদি, খোকাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, ওকে এখানে রাখবে, ওকে ব'লো না আমি কোথা যাচ্ছি। যদি আমার জন্য কাঁদে, ভুলিয়ে রেখো—তুমি ছাড়া ওকাজ আর কেউ পারবে না।

রাণু চোখ মুছিয়া বলিয়াছিল—ওকে এ-রকম ফাঁকি দিতে তোর মন সরছে? বোকা ছেলে তাই বুঝিয়ে গেলি—যদি চালাক হ'ত?

অপু বলিয়াছিল, দেখ আর একটা কথা বলি। ওই বাঁশবনের জায়গাটা—তোমায় চল দেখিয়ে রাখি—একটা সোনার কৌটো মাটিতে পোঁতা আছে আজ অনেকদিন—মাটি খুঁড়লেই পাবে। আর যদি না ফিরি আর খোকা যদি

বাঁচে—বৌমাকে কৌটোটা দিও সিঁদুর রাখতে। খোকাও কষ্ট পেয়ে মানুষ হোক—এত তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্তি করার দরকার নেই। যেখানে যায় যেতে দিও—কেবল যখন ঘাটে যাবে, তুমি নিজে নাইতে নিয়ে যেও—সাঁতার জানে না, ছেলেমানুষ ডুবে যাবে। ও একটু ভীতু আছে, কিন্তু সে ভয় এ নেই তা-নেই বলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা ক'রো না—কি আছে কি নেই তা বলতে কেউ পারে না রাণুদি। কোনোদিকেই গোঁড়ামী ভাল নয়—তা ওর ওপর চাপাতে যাওয়ারও দরকার নেই। যা বোঝে বুঝুক, সেই ভাল।

অপু জানিত, কাজল শুধু তার কল্পনা-প্রবণতার জন্য ভীতু। এই কাল্পনিক ভয় সকল আনন্দ রোমান্স ও অজানা কল্পনা উৎস-মুখ। মুক্ত প্রকৃতির তলায় খোকার মনের সব বৈকাল ও রাত্রিগুলি অপূর্ব রহস্যে রঙীন হয়ে উঠুক—মনে প্রাণে এই তাহার আশীর্বাদ।

ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হয়ত লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রাখিতে কোন পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের সোনার সন্ধানেই বা বাহির হইয়াছে। গিয়াছেও প্রায় ছ'সাত মাস হইল।

সতুও অপুর ছেলেকে ভালবাসে। সে ছেলেবয়সের সেই দুষ্টু সতু আর নাই, এখন সংসারের কাছে ঠেকিয়া সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন সে আবার খুব হরিভক্ত। গলায় মালা, মাথায় লম্বা চুল। দোকান হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া রোয়াকে বসিয়া খোল লইয়া কীর্তন গায়। নীলমণি রায়ের দরুন জমার বাগান বিক্রয় করিয়া অপুর কাছে সত্তর টাকা পাইয়াছিল—তাহা ছাড়া কাটিহার তামাকের চালান আনিবার জন্য অপুর নিকট আরও পঞ্চাশটি টাকা ধার স্বরূপ লইয়াছিল। এটা রানীকে লুকাইয়া—কারণ রানী জানিতে পারিলে মহা অনর্থ বাধাইত—কখনও টাকা লইতে দিত না।

কাজলের ঝোঁক পাখির উপর। এত পাখি সে কখনও দেখে নাই—তাহার মামার বাড়ির দেশে ঘিঞ্জি বসতি, এত বড় বন, মাঠ নাই—এখানে আসিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় পিছনের সমস্ত মাঠ, বন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দৈত্যদানো, ভূত ও শিয়ালের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে —পিসিমার কাছে আরও ঘেঁষিয়া শোয়। কিন্তু দিনমানে আর ভয় থাকে না, তখন পাখির ডিম ও বাসা খুঁজিয়া বেড়াইবার খুব সুযোগ। রাণু বারণ করিয়াছে—গাঙের ধারের পাখির গর্তে হাত দিও না কাজল, সাপ থাকে। শোনে না, সেদিনও গিয়াছিল পিসিমাকে লুকাইয়া কিন্তু অন্ধকার হইয়া গেলেই তার যত ভয়।

দুপুরে সেদিন পিসিমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশবনে পাখির বাসা খুঁজিতে

বাহির হইয়াছিল। সবে শীতকাল শেষ হইয়া রৌদ্র বেজায় চড়িয়াছে, আকাশে বাতাস বনে কেমন গন্ধ। বাবা তাহাকে কত বনের গাছ, পাখি চিনাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাই সে জানে কোথায় বনমরিচার লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ-ফুল ধরিয়াছে, কেলেকোঁড়ার লতার কচি ডগা ঝোপের মাথায় মাথায় সাপের মত দুলিতেছে।

কখনও সে ঠাকুরদাদার পোড়ো ভিটাটাতে ঢোকে নাই। বাহির হইতে তাহার বাবা তাহাকে দেখাইয়াছিল, বোধ হয় ঘন বন বলিয়া ভিতরে লইয়া যায় নাই। একবার ঢুকিয়া দেখিতে কৌতূহল হইল।

জায়গাটা খুব উঁচু ঢিবিমত। কাজল এদিকে ওদিক চাহিয়া ঢিবিটার উপরে উঠিল—তারপর ঘন কুঁচকাঁটা ও শ্যাওড়া বনের বেড়া ঠেলিয়া নিচের উঠানে নাবিল। চারিধারে ইট, বাঁশের কঞ্চি, ঝোপঝাপ। পাখি নাই এখানে? এখানে তো কেউ আসে না—কত পাখির বাসা আছে হয়ত—কে বা খোঁজ রাখে?

বসন্তবৌরী ডাকে—টুকলি—টুকলি—তাহার বাবা চিনাইয়াছিল, কোথায় বাসাটা? না, এমনি ডালে বসিয়া ডাকিতেছে?

মুখ উঁচু করিয়া খোকা ঝিকুড়ে গাছের ঘন ডালপালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল।

এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ[1] দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যথনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি …আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি আমাদের আশীর্বাদ নাও, বংশের উপযুক্ত হও।

আরও বাহির হইল। সোঁদালি বনের ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুরমাদের বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম, এ ঝোপের ও ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গাণ্ডীবধারী অর্জুন, অভাগিনী ভানুমতী, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, পরাজিত রাজপুত্র দুর্যোধন, তমসাতীরের পর্ণ কুটিরে প্রীতিমতী তাপসবধূবেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী জানকী, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্যহস্তে ভ্রাম্যমানা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে মাঠে মাঠে গোচারণ-রত সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র ত্রিজট—হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি, এই যে আবার ফিরে এসেছ! চেন না আমাদের? কত দুপুরে ভাঙা জানলাটায় বসে বসে আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি যে কত পরিচয়। এসো…এসো…এসো ·

সঙ্গে সঙ্গে রাণুর গলা শোনা গেল—ও খোকা, ওরে দুষ্টু ছেলে, এই এক গলা বনের মধ্যে ঢুকে তোমার কি হচ্ছে জিজ্ঞেস করি—বেরিয়ে আয় বলছি। খোকা হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল। সে পিসিমাকে মোটেই ভয় করে না। সে জানে পিসিমা তাকে খুব ভালবাসে— দিদিমার পরে এক বাবা ছাড়া তাকে এমন ভাল আর কেউ বাসে নাই।

হঠাৎ সেই সময় রাণুর মনে হইল অপু ঠিক এমনি দুষ্টু মুখের ভঙ্গি করিত ছেলেবেলায় —ঠিক এমনটি।

যুগে যুগে অপরাজিত জীবন-রহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্ম-প্রকাশ করে!

খোকার বাবা একটু ভুল কবিয়াছিল।

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সমাপ্ত

কাজল

মা-কে

উপন্যাস লেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যিনি আমার পিছনে মাভৈঃ বাণী নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেই মা আমাকে সর্বক্ষণ উৎসাহ দিয়েছেন, পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। আমার এবং তাঁর পরিশ্রম সমান সমান।

অনেক বিনিদ্র রাত্রির ইতিহাস রয়ে গেল এ বই-এর পেছনে। লিখতে লিখতে মনে হয়েছে পাঠকদের কথা, জানি না তাঁরা একে কেমন ভাবে নেবেন। তাঁদের জন্যই আমার পরিশ্রম, তাঁরা গ্রহণ করলে আমি ধন্য হবো।

সমস্ত উপন্যাসটি মূল পাণ্ডুলিপি থেকে কপি করে দিয়েছেন আমার দুই বন্ধু, শ্রীদিলীপ দত্ত এবং শ্রীমিলন সিংহ। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ

ও

কাজলের পশ্চাৎপট

১৯৪০ সনের ৩রা ডিসেম্বর আমার বিয়ে হয়। সে সময়ে উনি ৪১ নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীটের 'প্যারাডাইস লজে' থাকতেন। আমার বিয়ের প্রায় এক বছর পরে ঐ মেসের বাস তিনি উঠিয়ে দেন।

ঐ মেসে ছিলেন উনি বহুদিন, কাগজ-পত্র বই-খাতা জিনিসপত্র জমেছিল ওখানে অপর্যাপ্ত। মেসের বাস যখন তুলে দেন তখন তার কিছু জিনিস উনি পাঠিয়ে দেন ঘাটশীলায়, কিছু আমাদের দেশের বাড়ী গোপালনগর বারাকপুরে।

ঘাটশীলায় যে ঘরে আমি শুতাম তার পায়ের দিকের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ভাবী সুন্দর একটি শিশুর ছবি, অপূর্ব ছবিটি। খয়েরী রংয়ের সঙ্গে সাদা মেশানো বিলিতি ছবি। নীচে ইংরেজীতে ছবিটির নাম লেখা ছিল 'বাবল্‌স্'। ছেলেটিব কোলের উপর একটি বাটীতে কিছু সাবান-গোলা জল। একটি কাঠিতে ফুঁ দিয়ে ছেলেটি বুদ্‌বুদ্‌ তৈরী করছে।

ওঁব কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম, কোনও বিলাতী কোম্পানীর বিজ্ঞাপনেব ক্যালেণ্ডাব ওটা। উনি ছবিটি আমাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ঐ ছবি দেখেই নাকি উনি কাজলের চরিত্র লিখতেন। অমনি নিষ্পাপ, দেব-দুর্লভ রূপবান, কোমল, সুন্দর ছেলেটি—কাজল নাকি ওঁর কল্পনায় ঐ রূপেই ছিল।

উনি নিজে আমাকে বহুদিন বলেছেন, এক সময়ে নাকি উনি সন্তান-সন্তান করে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বহু লোকের কাছে শুনেছি, অনেককে উনি নাকি বলতেন—আমাকে বাবা ডাকবি ?—ডাক না।

আবও শুনেছি, উনি নাকি এই পিতৃ-সম্বোধন শুনবার জন্য নানা প্রকার ঘুসও দিতেন কাউকে কাউকে।

আজ আরও অনেক কথাই মনে পড়ছে। ওঁর ধর্মমেয়ে, নাম তার রেণু। রেণুর উল্লেখ আছে ওঁর অনেক বইতে, দিনপঞ্জিগুলিতে। ওঁর বিচিত্র জগৎ বইখানা রেণুকে উৎসর্গ করেছিলেন। রেণুর সঙ্গে ওঁর স্নেহের সম্পর্ক গভীরতর ছিল। রেণুকে নিয়েই ওদের পরিবারের সঙ্গে ওঁর গভীর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে ওদের সকলের সঙ্গেই ওঁর আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় হয়েছিল।

আমার বিয়ের পরে রেণু এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে।

আমাকে ডাকত রেণু মা মণি বলে, ওঁকে বলত বাবা। রেণুর সঙ্গে ওঁর মাঝে মাঝে দেখা হত কলকাতায়। রেণু তখন কলকাতাতেই ছিল।

বাবলু যখন এক বছরের, সে সময় একদিন একটি নিরেট-লোহার সুন্দর মোটরগাড়ী এনে বাবলুকে দেন। উনি বলেন, তোর দিদি দিয়েছে—রেণুদিদি।

কাজল সম্বন্ধে উনি কি লিখবেন, তার কিছু কিছু আভাস অপরাজিত বইতে পাওয়া যায়। ওতেই বীজাকারে কাজল সম্বন্ধে সকল কথাই প্রায় বলা আছে। তারপর যিনি তাঁর কল্পনার কাজলকে বাস্তবে রূপ দেবেন, প্রতিমার কাঠামোর ওপর খড়-বিচুলী বেঁধে মাটি ধরিয়ে রং-তুলির স্পর্শে যিনি সেই প্রতিমাকে সঞ্জীবিত করবেন, সে দায়িত্ব তার। গল্পকে টেনে নিয়ে যাবার, উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব লেখকের, বিভূতিভূষণের অসমাপ্ত রচনা যিনি সমাপ্ত করবেন তাঁর।

কাজল উপন্যাস সম্পর্কে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে আকাশের নব নব ছায়ারূপ দেখতে দেখতে সন্ধ্যাবেলায় বিলবিলের ধারে ঠেস-দেয়ালে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে করতে আলোচনা করেছেন। কাজল এখন কত বড় হয়েছে, কি করছে কি ভাবছে, এসব আলোচনা করতেন! বাবলু হওয়ার পর মুহূর্তে মুহূর্তে বাবলুকে দেখা চাই। বাবলু কি করছে, কেমন অঙ্গভঙ্গী করছে—সর্বদা বাড়ীর সকলকে ডেকে দেখাতে ভালবাসতেন। সর্দার খেলুড়ের সঙ্গে বাবলু যেন ছিল শিশু-খেলুড়ে। বুঝতে পারতাম, কাজল উপন্যাসের পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে। কাজল উপন্যাস সম্বন্ধে বহু নোট নিতেন। কিছু কিছু লিখেও ছিলেন। কিন্তু ওঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য, এবং উনিশ-কুড়ি বছরের ব্যবধানে বিশেষ-কিছু রক্ষা করতে পারি নি।

বাবলু যখন একটু বড় হল এবং স্কুলে যেতে শুরু করল, তখন বাবলু বাবার কথা শুনতে চাইত। তাঁর লেখার বিষয়, তাঁর ভালো-লাগা, তাঁর জীবনচর্যা ও জানতে চাইত। তন্ময় হয়ে শুনত এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইত সব-কিছু। দীর্ঘদিন বাবলুর সঙ্গে ওঁর স্মৃতিতর্পণ করতে করতে 'কাজল' উপন্যাস সম্পর্কে অন্তরে অন্তরে গভীর ইচ্ছা ছিল। তার হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষার পরে একেবারে একটানা অবসর কি করে কাটবে এই ভাবনায় যখন অস্থির হয়ে উঠেছিল, তখন নিজেই একদিন আমায় বলল—মা কাজল লিখব। আমি সেদিন ওকে মুখে উৎসাহ দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, লেখ, চেষ্টা কর। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে।

সেই শুরু, তারপর তিন বছর পার হয়ে চার বছর চলছে। আজ কাজল সত্যিই শেষ হল।

আমার শ্বশুরমশাই-এর অসমাপ্ত কার্যভার তুলে নিয়েছিলেন তাঁর পুত্র অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে। আজ তাঁদের পায়ের তলায়, বঙ্গবাণীর পায়ের তলায় বাবলু কুণ্ঠিত অক্ষম পদক্ষেপে পূজার থালা নিয়ে দাঁড়াল। সামান্য উপচার, অতিসামান্য ওর পুঁজি। কিন্তু পূজায় যার যেটুকু ক্ষমতা সে তাই নিয়েই সাঙ্গ করে, এ-ও তাই। ওর নির্মল পূজার আগ্রহটুকুই ভগবান গ্রহণ করুন।

১৩৫৭ সালের ২৮শে ভাদ্র ওঁর জীবিতাবস্থায় শেষ জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল আমার মামার বাসাবাড়ী সুইনহো স্ট্রিটে। এই অনুষ্ঠানে বহু সাহিত্যিক বন্ধুরা এসেছিলেন ওঁর। শ্রদ্ধেয় উপেন-দা, বন্ধুবর মনোজ বসু, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, বেগম জাহানআরা খান স্বামী সহ, গজেন ঠাকুরপো, সুমথ ঠাকুরপো ইত্যাদি।

এই জন্মদিনে গজেন ঠাকুরপো সুমথ ঠাকুরপো ওঁকে একখানা খাতা উপহার দেন—তার ওপর একটি কালো কভার লাগানো ছিল। সুন্দর বাঁধানো, তাতে সোনালী অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা ছিল—'কাজল'। এ খাতাখানা আজ আমার কাছে আছে। সেই সময়েই ঠিক হয়ে যায় কাজল উনি লিখতে শুরু করবেন অবিলম্বে এবং তা ধারাবাহিক ভাবে বেরুবে কোন পত্রিকায়। আমি জানতাম কাজল উনি লিখবেন, যেমন জানতাম ইছামতী দ্বিতীয়খণ্ড উনি লিখবেন। অথৈ জলও দ্বিতীয়খণ্ড লেখবার ইচ্ছে ছিল ওঁর। ওরই কাছে আরও শুনেছি দেবযান লিখবার ইচ্ছা ছিল ওঁর পথের পাঁচালী লিখবারও আগে। কিন্তু লিখেছেন অনেক পরে। একটা খাতায় উনি দেবযানের খানিকটা লিখে রেখেছিলেন বহুদিন পর্যন্ত। এ লেখার বহু পরে উনি দেবযান শেষ করেন—আমার বিয়েরও দু-তিন বছর পরে। তখন দেবযানের নাম ছিল 'দেবতার ব্যথা'। ওঁর লেখার প্লট লেখা থাকত ছোট ছোট বইতে। তাতে উনি কি লিখবেন সামান্য কথায় তার স্কেচ করে রাখতেন। পরে ঐ স্কেচ দেখলেই ওঁর মনে পড়ত উনি কি লিখবেন। ঐ সব বিভিন্ন চরিত্রের বহু ঘটনার সামান্য টুকরো ও নানান লেখার খসড়া আজও আমি রেখে দিয়েছি যত্ন করে আমার কাছে।

তাতে কত কি লিখবার কত কি জানবার আগ্রহ ছিল ওঁর, তার পরিচয় পাওয়া যায়! আরও পাওয়া যায়, কত কি পড়েছিলেন উনি তার আভাস। উনি যেন ছিলেন চিরদিনের ছাত্র—প্রকৃতির এই যে মহিমময় অনন্ত ঐশ্বর্যভরা পরিবেশ, এর ভিতরে আত্মহারা ছিলেন তিনি। প্রকৃতিপাগল বিভূতিভূষণ।

ঘাটশীলার ওঁর মৃত্যুর পাঁচ-ছ দিন আগে বেলাশেষে আমি বসেছিলাম আমাদের বারান্দার চওড়া সিঁড়ির ওপর। উনি দাঁড়িয়েছিলেন সামনে। বাবলু উঠোনের ঘাসের ওপর ওর বাবাকে নিয়ে খেলছিল। আজও বড় বেশী করে সেই দিনটির কথা, সেই অপরাহ্ন বেলাটির কথা আমার মনে পড়ে।

উনি সে সময়ে আমাকে বললেন—তুমি আমার দিকে একদম নজর দাও না। আমি কখন কি করি বল তো? এদিকে আমার কাজল শুরু করতে হবে। বাবলুকে নিয়ে কি করি বল তো? তুমি শুধু শুধু বাবলুকে আমার কাছে দাও।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম: সে কি গো, আমিই বরং ছেলেটাকে কাছে পাই নে, শুধু তুমি ওকে নিয়ে ঘুরছ কোথায় কোথায়। ওর দুর্বল স্বাস্থ্য—কোথায় আমি ভাবছি, ওর কি স্বাস্থ্য টিকবে!

চট করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন উনি।—আর বেড়ানো নয়, কি বল? খুবই বেড়ানো হয়েছে। পুজোর ভেতর অত্যন্ত বেড়ালাম, কি বল? বেড়ালাম না?

আমি চুপ করে রইলাম। এমন ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত লোক আমি জীবনে দেখি নি। ছেলেপুলেদের যেমন মিষ্টি ও খেলনার লোভ দেখিয়ে বশীভূত করা যায়, এই বালক-স্বভাব ভদ্রলোকটিকেও বেড়ানোর নামে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যেত, যদি জানতে পারতেন সেখানে দেখবার কিছু আছে।

উনি নিজেই আবার বললেন—এইবার লেখা শুরু করি কি বল? পুজোতে ও রকম সবাই একটু—বুঝলে না, সব বন্ধুবান্ধব এক জায়গায় হওয়া, আমোদ হয় না, কি বল? কাল আমাকে খুব ভোরে তুলে দেবে, জানলে?

আমি হাসলাম: তোমার চাইতে ভোরে উঠব আমি? তোমার চোখে কি ঘুম আছে! আমার তো মনে হয় না।

ওঁরই ডাকে ঘুম ভাঙল সেদিন আমার—ওঠো, ওঠো। গেট খুলে দাও। আমি 'কাজলের' ছক তৈরী করব না আজ? মনে নেই? ওঠো, দেরী হয়ে যাবে।

আমি ঘুম-জড়ানো চোখে বাইরের দিকে তাকালাম: রাত রয়েছে যে, আর একটু পরে যাও। যাবে বনে পাহাড়ে, ওখানে তো সদাই নির্জন।

উনি বললেন—না, উপাসনা সেরে নেব না আমার সেই শিলাসনে! তারপরে লেখা।

আমি জানতাম, উনি 'ফুলডুরীর' পেছনে বনের ভেতর একটি বিরাট পাথরের ওপর বসে লিখতেন! আমাকে নিয়েও যেতেন ওখানে মাঝে মাঝে,

উপাসনা করতেন। যে সব কত কথা, কত স্মৃতি। .

তখনও জানি না, কি করাল মেঘ ঝুলছে আমার মাথার ওপর গর্ভে তার বজ্রাগ্নি লুকিয়ে নিয়ে। সেই দিনই যে আমার জীবনের চরম দিন, তার কিছুমাত্র আভাস পাইনি আমি।

সকাল সকাল ফেরা ওঁর হল না। উনি ফিরলেন একেবারে বেলা সাড়ে-দশটা এগারটায়। আমি তখন রান্নায় ব্যাপৃত। ওঁকে দোর খুলে দিলাম। উনি বললেন—প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার।

ওর খাবার করাই ছিল। বিছানার উপর বসলে ওঁকে খাবার এনে দিলাম।

উনি সেই খাবারটুকু খেয়ে আমাকে বললেন—আর কিছু দাও। কি আছে তোমার?

আমি বললাম—নারকেল-চিঁড়ে খাও। তুমি ভালবাস।

নারকেল-চিঁড়ে দিয়ে আমি আবার রান্নায় ফিরে গেলাম।

ওঁর ডাক আবার কানে গেল—শুনে যাও।

আমি বান্নাঘর থেকে ছুটে গেলাম ওঁর কাছে।

এমন করে তো উনি ডাকেন না আমাকে। আমি যেতেই উনি বললেন—দেখ, আমার বুকে যেন চিঁড়ে আটকে গেছে।

আমি বললাম, শুকনো চিঁড়ে খেলে এমনিই হয়। ভিজিয়ে খেতে চাও না আম কলা না থাকলে। কত ঘুরে এসেছ, গলা শুকিয়ে আছে না?

আমি ওঁর গলায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

উনি বললেন, একটু কোরামিন দাও আমাকে। আমার ঘরে কোরামিন থাকত। আমার ঠাকুরপো ডাক্তার ছিলেন। আমি ওঁকে ধরে আছি—আমার জা যমুনাকে ডেকে বললাম—দশ ফোঁটা কোরামিন দে তো।

আমি জীবনে ওঁকে খুব সামান্যই ওষুধ খেতে দেখেছি। কোরামিন চাওয়ায় আমি ঘাবড়ে গেলাম খুব। সেই স্থচনা। তখন বুঝি নি আমি। স্বাস্থ্যবান লোক ছিলেন। একটু পরেই সামলে উঠলেন একটু। আমিও তখন অনভিজ্ঞা। বুঝতে পারি নি কি কঠোর নিয়তি অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

উনি স্নান করতে যাবেন বললেন। বাড়ীতে উনি স্নান করতেন না কখনও। দেশে থাকলে নদীতে, ঘাটশীলায় নানা পুকুরে। আমাকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। ইদানীং বাবলুকে নিয়ে যেতেন রোজ আমি না গেলেও।

সেদিন বললেন—আজ আর বাবলুকে নেব না, শরীরটা ভাল নেই।

অনেক বাধা দিলাম। শরীর ভাল নেই, বাইরে স্নান করতে যেও না তুমি। কিছুতেই শুনলেন না।

আমি বললাম—উঠোনের ধারে জল দি তোমায়। বাথরুমে নাই বা নাইলে।

বাথরুমে স্নান করতে একদম ভালবাসতেন না উনি। আমাদের ঘরের সামনের চওড়া সিঁড়িগুলোতে বসে স্নান করতে বলেছিলাম আমি।

উনি বললেন—কিছু হবে না! যাব আর আসব।

তখন কিছু হল না।

দুপুরে ভাত খেতে বসেছেন, তখন ধলভূমগড় রাজবাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ করে গেল টি-পার্টির। উনি খুসী হয়ে বললেন—যাব ঠিক, বঙ্কিমবাবুকে গিয়ে বল।

দু-এক জন কাকে আরও নিমন্ত্রণ করতে বললেন। তখনও জানি না, কি আছে আমাদের কপালে।

একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ঠাকুরপোর ডাকে ঘুম ভাঙল—দাদা কি সাজে যাচ্ছেন উঠে দেখ বৌদি।

আমার দুরন্ত অভিমান হল। আমার কি একটুও ইচ্ছে করে না উনি একটু সাজুন?

আমি চুপ করে রইলাম। উনি হয়ত বুঝলেন আমার অন্তরের অভিমান। তাই বললেন—দাও কি দেবে। কি হবে সাজলে-গুজলে? দুখানা হাত বেরুবে আমার?

সেইদিন—আর তারপর তিন দিনের দিন ওঁকে মহাযাত্রায় সাজিয়ে দিয়েছিলাম।

আপনাদের আশীর্বাদে বাবলু 'কাজল' লিখেছে। আজ সকলের সঙ্গে ওঁর আশীর্বাদও বাবলুর মাথায় ঝরে পড়ুক।

বাণভট্টের পুত্র ভূষণভট্ট অসমাপ্ত 'কাদম্বরী' শেষ করেছিলেন। বাবলুর হাতে 'কাজল' প্রাণময় হয়ে উঠুক এই আমার মঙ্গলময়ের প্রতি প্রার্থনা।

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শীত শেষ হইয়া বসন্তের বাতাস বহিতে শুরু করিয়াছে। পুরাতন পাতা ঝরিয়া গিয়া গাছে গাছে নতুন কচিপাতার সমারোহ। এই দিনগুলোতে কাজলের বেশীক্ষণ বাড়ীতে মন বসে না—বিশেষতঃ বৈকালের দিকে। সূর্য বাঁশবাগানের মাথা ছাড়াইয়া একটু নামিলেই রোদটা কেমন রাঙা আর আরামদায়ক হইয়া আসে। রাণুপিসিদের গাইটা অলস মধ্যাহ্নে জঙ্গলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাসলতা খায়। কাজল উত্তরের জানালায় বসিয়া লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণ পরে তাহার আর মন টেঁকে না—বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট করিতে থাকে। বন্য লতাপাতার যে বিশেষ ঘ্রাণটা বাতাসে বহিয়া আসে—সেটাই যেন তাহাকে আরও চঞ্চল করিয়া তোলে। গন্ধটার সহিত এই বাহিরে যাইবার ইচ্ছার যে কি সম্পর্ক—তাহা সে বুঝিতে পারে না, কেমন যেন রহস্যময় ভাব হয় মনে।

সন্তর্পণে দরজার খিল খুলিতে গেলে অসাবধানে আওয়াজ হয়। রাণু জাগিয়া বলে—ছেলের বুঝি আবার বেরুনো হচ্ছে ?

কাজল একটু অপ্রতিভ হয় বটে, কিন্তু ভয় পায় না। খিলটা হাতে ধরিয়াই দুষ্টামির হাসি হাসিতে থাকে।

বাহির হইতে দিতে রাণুর আপত্তি নাই। শুধু সাবধান করিয়া দেয়—খবরদার নদীতে নামবি নে, নৌকোয় উঠবি নে কিন্তু—বল, উঠবি নে ?

কাজল প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে বাহিরে যাইবার অনুমতি পায়।

অপু বলিয়া গিয়াছিল—দেখো রাণুদি, নদীতে যেন একলা না যায়। চান করবার সময় তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে। ছেলেমানুষ, সাঁতার জানে না—ডুবে যেতে পারে। কাজলও রাণুপিসির কথার অবাধ্য হয় না—ইছামতীর ঘাটে জেলেদের মাছধরা নৌকোগুলি বাঁধা থাকে। এপাড়ার ওপাড়ার কিছু ছেলে জমা হইয়া তাহার উপর উঠিয়া খেলা করে। কাজলের পাড়ে বসিয়া খেলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। পিসি বারণ করিয়াছে যে।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কাজল বাবার নতুন কেনা আমবাগানের দিকে হাঁটিতে থাকে। বাগানের প্রান্তে কাহাদের একটা বাঁশঝাড়। সতুকাকা সেদিন বলিতেছিল বাঁশগাছ নাকি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। রাতারাতি নাকি বাঁশের কোঁড় একহাত লম্বা হইতে দেখা গিয়াছে। কথাটা শুনিয়া কাজলের মনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিল। তাই এ জায়গাকে সে

উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্বাচিত করিয়াছে। বাগানের শেষ গাছটার নীচে একখানি বাঁশের কোঁড় হইয়াছে। হাত দিয়া মাপিয়া আমগাছের গুঁড়িতে সমান উচ্চতায় কাজল ঝামা ঘসিয়া একটা দাগ দিয়া রাখে প্রত্যেক দিন। পরের দিন গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে, গাছ কতখানি বাড়িল। গাছটার কাছে পৌছিয়া কাজল ভাল একটা ঝামা খুঁজিতে লাগিল। কাছাকাছি পাওয়া গেল না। কাজলকে ঢুকিতে হইল বাঁশবনের মধ্যে। বাঁশবনের ভিতরকার আগাছা কেহ কোনদিন পরিষ্কার করে না—মালিকের দায় পড়ে নাই। নির্দিষ্ট সময়ের শেষ কয়েক গাড়ি বাঁশ কাটিয়া চালান দিয়া সিন্দুকে পয়সা তুলিলেই তাহার কাজ শেষ। বাঁশ তো বিনা যত্নেই বাড়ে। তাহার জন্য আবার কে—

কাজল এ[illegible] থামি[illegible]—পায়েব নীচের শুকনা বাঁশপাতার মচমচ শব্দও থামিয়া যায়। [illegible]সংগে সংগে কোথায় লুকানো পাখীটার কুব্-কুব্ ডাক স্পষ্ট হইয়া ওঠে। বাঁশপাতা হইতে কেমন একটা গন্ধ ওঠে—কাজলের মন-কেমন-করা ভাবটা বাড়িয়া যায়। উপর-নীচে কোনদিকেই পাখীটাকে দেখা যায় না। রাণুপিসি ডাকটা চিনাইয়া দিয়া বলিয়াছিল—কুবো পাখী। কাজলের হাসি পাইয়াছিল নামটা শুনিয়া। কেমন নাম ত্যাখো—বলে কিনা কুবো পাখী—

খোকার মধু-ঝরা হাসি দেখিয়া রাণীর কি-একটা পুরানো কথা মনে পড়ে। এক পলকের জন্য সে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। পর মুহূর্তেই হাসিয়া বলে—পাগল একটা, এত হাসবার হলো কি নাম শুনে ?

কাজলের একবার মনে হয় ডাক বাঁদিকের ঝোপ হইতে আসিতেছে। সেদিকেই বনটা বেশী ঘন। কিছুদিন আগেও বুনোরা এই জঙ্গল হইতে কি একটা জন্তু শিকার করিয়া গিয়াছে। কাজেই একেবারেই যে গা ছমছম করে না এমন নহে। কিন্তু পাখীটাকে দেখিবার কৌতূহলও কম নহে। রাণুপিসি বলিয়াছে লাল-লাল চোখ—সে দেখিবে কেমন লাল চোখ। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করা যায় না। কিছুটা বাঁদিকে হাঁটিলে মনে হয় ডানদিক হইতে আওয়াজটা আসিতেছে। ডানদিকে একটু অগ্রসর হইলেও আওয়াজটা পিছনে ঘুরিয়া যায়। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া পরে কাজল হাল ছাড়িয়া দেয়।

ভারী তো পাখী—পরে দেখা যাইবে। আরও একটু সন্ধান করিলে কি দেখা হইত না—নিশ্চয় হইত। নেহাত কাজ আছে বলিয়াই তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইতেছে।

সন্ধ্যায় সতুকাকার দু'একজন বন্ধুবান্ধব এপাড়া-ওপাড়া হইতে আসিয়া জোটে। মোটা কালোমত একজন লোক—গলায় কণ্ঠি, ঠুকিয়া ঠুকিয়া খোলটাকে ঠিক-সুরে বাঁধে। পরে সবাই মিলিয়া কীর্তন শুরু করে। একদিন কাজলের খুব মজা লাগিয়াছিল। গানের মাঝামাঝি—যেখানে 'কোথা যাও প্রভু নগর ছাড়িয়া' পদটা আছে সেখানে সবাই এমন হাঁ করিয়া দীর্ঘ টান দিয়াছিল যে কাজল হাসি চাপিতে পারে নাই। এতগুলি বয়স্ক মানুষকে এক সারিতে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে কাহার না হাসি পায়?

কীর্তন তাহার খুব একটা ভাল লাগে নাই। গানের যে স্থানটিতে তাহার আমোদ হয়, সে স্থানটিতেই উহারা উঠিয়া পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে থাকে। ব্যাপার দেখিয়া প্রথম দিন সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। রাণী তাহাকে খাওয়াইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া আসার পরেও এক একদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত গান হয়। শুনিতে শুনিতেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। কখনো কখনো বিনা কারণে মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া যায়—দেখে জানলা দিয়া সুন্দর জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িয়াছে। বাহিরের আতা-গাছটা—ভূতো-বোম্বাই আমগাছটা—উঠানটা অপূর্ব জ্যোৎস্নায় ভাসিয়া যাইতেছে। ঘুম-ঘুম চোখে সেদিকে তাকাইয়া থাকিলে বেশ লাগে। মনে হয়, কেহ যেন ঐ জঙ্গল হইতে উঠানের জ্যোৎস্নায় আসিয়া দাঁড়াইবে। তাহার গায়ে রূপকথার দেশের পরিচ্ছদ; মৃদু চন্দ্রালোকে সে একবার কাজলের দিকে তাকাইয়া হাসিবে—পরে ইশারায় ডাকিয়া আনিবে সঙ্গীদের। একদল পরীর দেশের লোকে উঠান ভরিয়া যাইবে। তাহাদের ভাষা বোঝা যায় না—কিন্তু তাহা সঙ্গীতময়। উঠানের ধূলায় চাঁদের আলোয় ছায়া সৃষ্টি করিয়া তাহারা লীলায়িত ভঙ্গীতে নৃত্য করিবে। মাঝে মাঝে কাজল নিজে অবাক হইয়া যায় তাহার চিন্তার গতি দেখিয়া।

এই সময় বাবার কথা মনে পড়ে খুব। রাণুপিসি পাশে ঘুমাইতেছে। পিসির নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। জানলার বাহিরে উঠানে সেই অপার্থিব চাঁদের আলোর দেশ। এ সময় বাবা থাকিলে বেশ হইত। মনের যে ভাবই হোকনা না কেন, বাবাকে বুঝাইয়া বলিবার দরকার পড়ে না—বাবা নিজেই কেমন সব বুঝিয়া লয়। বাবা হয়তো বলিতে পারিত, কেন সে এমন অদ্ভুত চিন্তা করে। শুধু এ সব কারণেই নহে—অন্য কারণও আছে। হ্যাঁ, সে লুকাইবে না—বাবাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, বাবার জন্য তাহার মন কেমন করিতেছে।

পরের দিন দুপুরে ললিতমোহন বাড়ুজ্যের ছেলে চনু আসিয়া তাহাকে

একা-দোক্কা খেলিতে ডাকে। চড়কতলার মাঠে খেলা জমিয়া ওঠে। অবশ্য কাজল খেলায় খুব পটু নহে। তাহার তাকও প্রশংসার অযোগ্য। তিন নম্বর ঘর টিপ করিয়া ঘুটি ছুঁড়িলে সেটা পাঁচ নম্বর ঘরে পড়িবেই। অবশ্য প্রত্যেক বারই কাজল এমন ভান করিয়া থাকে যেন ওটা পাঁচ নম্বর ঘরেই ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। খেলা সমাপ্ত হইলে সন্ধ্যার আবছা আঁধারে বাড়ী ফিরিবার সময় কাজল চনুকে প্রশ্নটা করিয়াই ফেলে—তুই জানলার পাশে শুয়ে ঘুমোস?

চনু বাক্যালাপের গতি কোনদিকে বুঝিতে না পারিয়া সংক্ষেপে বলে—হুঁ।

—রাত্তিরে জাগিসনে কখনো? চাঁদনী রাত্তিরে?

—কত!

—কিছু দেখিস? মানে, ভাবিস কিছু?

—ভাবব আবার কি? দাদা গায়ে পা তুলে দেয় বলেই না ঘুম ভাঙে। পা-টা নামিয়ে দিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কেন রে?

—মনে হয় না কিছু? এই, কোন অদ্ভুত দেশের কথা, কি গল্পে-পড়া কোন লোকের কথা?

গল্প বলিতে চনু পড়িয়াছে কথামালার 'ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর'। তাহা চাঁদনী রাত্রে স্বপ্ন দেখিবার জন্য খুব আদর্শ উপাদান নহে। কাজলটা কি পাগল নাকি? সন্ধ্যাবেলা যত উদ্ভট কথা। না, চন্দ্রালোকিত রাত্রে অগ্রজের পদ-তাড়নায় জাগিয়া তাহার বিশেষ কিছু মনে হয় না।

কাজলও যে বিশেষ কিছু দেখিতে পায়, তাহা নহে। কিন্তু এক ফালি চাঁদের আলো—একটি পাতা খসিয়া পড়া হইতে সে অনেক কিছু কল্পনা করিয়া লইতে পারে। নিজের বৈশিষ্ট্য বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই—তবুও তাহার সঙ্গীদের সহিত একটা চিন্তাগত পার্থক্য সে অনুভব করিতে পারে। যেমন দুর্গা-পিসির কথা! বাবা ও রাণুপিসির কাছে গল্প শুনিয়া সে দুর্গার চেহারা ও স্বভাব কিছুটা কল্পনা করিয়া লইয়াছে, নির্জনে বসিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে, পিসি সামনে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। এই একটা ফল কুড়াইয়া লইল কোন গাছতলা হইতে, এই আধখানা ভাঙিয়া তাহাকে দিল খাইতে। অপু ও রাণী দুর্গার শৈশবের গল্পই করিয়াছে—এখন থাকিলে পিসির যে অনেক বয়স হইত, তাহা কাজলের কখনও মনে হয় নাই। শুধু এইটুকু সে বোঝে, পিসি বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে খুব ভালবাসিত।

নিশ্চিন্দিপুরের সহিত কাজলের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। অথচ কোথায় ছিল সে এক বৎসর আগে! দাদামশায়ের ভয়ে জুজু হইয়া থাকিতে হইত। প্রকৃত ভালবাসার স্বাদ সে দাদামশায়ের কাছ হইতে পায়

নাই কখনো—তাড়নাই জুটিত বেশী। কেবল দিদিমার কথা মনে পড়ে। বাবা যে তাহাকে মামাবাড়ী হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিল—দিদিমা পাইল না তাহা দেখিতে। দিদিমাই যা-একটু বাবার গল্প করিত। আর কাহারও জন্য মন খারাপ করে না তত। এখানে সে ভালই আছে। বাবা নাই বটে—কিন্তু বাবা তো আসিবে। পিসি তাহাকে ভালবাসে। সবার উপর তাহাকে আকর্ষণ করে গ্রামের একটা নীরব ভাষা। কেহ সঙ্গে থাকিলে অনেক সময় ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে যখন সে নিজেদের পুরাতন ভিটায় যায়—অন্ততঃ তখন তো নয়ই। সম্পত্তির স্বত্ববোধ তাহার মধ্যে এখনও জন্মে নাই। কিন্তু নিজের পিতৃপুরুষের ভিটায় বসিয়া চিন্তা করার মধ্যে যে একটা রোমঞ্চকর অনুভূতি আছে—তাহা মনকে দোলা দেয়। দুপুরে গিয়া জঙ্গল ঠেলিয়া চুপি-চুপি সে উঠানে বসিয়া থাকে। চুপি চুপি বসিবার বিশেষ কারণ আছে। এ দিকে বিশেষ লোকজন আসে না—আসিবেই বা কি প্রয়োজনে? একমাত্র আকর্ষণ—সজিনাগাছটাও বুড়া হইয়াছে, ফল ভাল হয় না তত। কাজেই সে জন্য সতর্ক হইবার প্রয়োজন নাই। আসলে এই জায়গায় উদ্দামতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে না একেবারে। অন্য জায়গা হইলে কাজল বটের ঝুরি ধরিয়া ঝুলিয়া, এখানে ওখানে লাফাইয়া এক তাণ্ডব বাধাইয়া তুলিত। কিন্তু এ ভিটায় আসিয়া বসিলে কে যেন তাহার ছোট্ট মনটাকে শান্ত করস্পর্শে স্নিগ্ধ করিয়া দেয়। এখানে তাহার ঠাকুমা রান্না করিয়াছে—পিসি পুতুল খেলিয়াছে—বাবা রাজা সাজিয়াছে আরসির সামনে—ঠাকুরদা বসিয়া বালি-কাগজে পালা লিখিয়াছে। তাহাদের পুণ্যস্মৃতিমণ্ডিত স্থানে কি প্রগল্‌ভ হওয়া যায়! কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই। সে আপনি চুপ হইয়া থাকে।

দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইয়া যায়। কেমন একটা অদ্ভুত ছায়া নামিয়া আসিতে থাকে। কাজলের মনে হয়, এই বুঝি কেহ পিছন হইতে কথা বলিয়া উঠিবে। যেন সে আমলটা শেষ হইয়া যায় নাই। সে মিথ্যা বলিবে না —ভূতপেত্নীতে তাহার একটু ভয় আছে। কিন্তু এই সময় যদি তাহার ঠাকুমা কি পিসি আসিয়া তাহার সহিত কথা বলে তবে সে একটুও ভয় পাইবে না। সে তো তাহাদের একান্ত আপনার; কাহারও নাতি—কাহারও ভাইপো। কত আদর করিত সবাই বাঁচিয়া থাকিলে। একটু আগের রাঙা বাসন্তী রোদটার মতই তাহারা কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবার সময় গাছের মাথায় সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বল জ্বল করিতে থাকে। বাবা তাহাকে চিনাইয়া দিয়াছিল সব। কালপুরুষ ঝুঁকিয়া থাকে পশ্চিম দিগন্তের কাছাকাছি। বাবা একবার বলিয়াছিল কালপুরুষের ছোরাটা

যে তিনটি নক্ষত্র দিয়া তৈয়ারী—তাহার মধ্যে একটা নক্ষত্র বলিয়া মনে হইলেও আসলে নীহারিকা। সে একটা দুরবীন পাইলে দেখিবার চেষ্টা করিত। যাহা হউক, আপাততঃ আমবাগানটা তাড়াতাড়ি পার হইয়া যাওয়া ভাল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে।

বাড়ী ঢুকিলে রাণী বলে—এতক্ষণ ছিলি কোথায়, হাঁরে—ও খোকন? এই রাতবিরেতে কি বাইরে বেড়াতে আছে বাবা? কোথায় ছিলি?

কাজল আরক্ত মুখে আমতা আমতা করিয়া বলে—এই একটু ঐ পুরানো ভিটেয়—

রাণী আর প্রশ্ন করে না। তাহার হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা কেমন সুন্দর লাগিতে থাকে। খোকন চিনিয়া লইয়াছে আপনার সঠিক স্থান। রক্তের ভিতরকার অমোঘ আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে পবিত্র তীর্থে। ঐতিহ্যের ধারায় গতি ধীর—কিন্তু অনিবার্য! এ ভিটাকে ফেলিয়া তাহারা কেহ কোথাও থাকিতে পারে নাই। অপু গিয়াছিল চলিয়া—সে-ও কি বেশীদিন পারিল দূরে থাকিতে? বংশের সন্তানের হাত ধরিয়া আবার তো সেই ফিরিয়া আসিতে হইল। কি যে টান রহিয়া যায়, তাহা রাণী ব্যাখ্যা করিতে পারে না। হয়তো এতদিনে মণিকর্ণিকার ঘাট হইতে হরিহরের দেহাবশেষ বাতাসে ভাসিয়া অন্ধসংস্কারে ফিরিয়া আসিয়াছে নিশ্চিন্দিপুরে। সর্বজয়ার অদৃশ্য উপস্থিতি হয়তো এখনও ভিটার অণুতে অণুতে। গোবৎস যেমন জন্মগ্রহণ করিয়াই ঠিক মাতৃস্তন্য খুঁজিয়া লয়—তাহাকে চিনাইয়া দিতে হয় না, কাজলকেও তেমনি কোন নির্দেশ দিতে হয় নাই। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না—করাইয়া দিতে হয় না। সব ঠিক ঠিক চলে।

মাস দুই পরের কথা। গরম বেশ পড়িয়াছে। আজ আহার করিতে একটু বেলা হইয়াছিল। রাণী এখনও কাজলকে বাহির হইতে দেয় নাই, বিশ্রামের জন্য নিজের কাছে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। কাজল কাত হইয়া শুইয়া পা দুইটা পিসির গায়ে তুলিয়া দিয়া গল্প শুনিতেছিল। রাণীর হইয়াছে বিপদ—যতই গল্প চলুক, কাজলও ঘুমায় না—তাহারও ঘুম হয় না। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—শ্রীমান অমিতাভ রায়, চিঠি আছে—অমিতাভ রায়। কাজল প্রথমটা বিশ্বাস করে নাই—নিশ্চয়ই ভুল শুনিয়াছে। তাহাকে চিঠি লিখিবে কে!

দৌড়াইয়া চিঠিটা নিতে গেল সে। বেশ মোটা কাগজে রঙীন খামের

চিঠি। রাণীও উঠিয়া আসিয়াছিল কাজলের পিছু পিছু। সে বলিল—খোল্ তো খোকন, কার চিঠি—। রাণীর বুক ঢিব ঢিব করিতেছিল। হয়তো তাহারই চিঠি—কতদিন আর ভুলিয়া থাকিতে পারে! কাজল খাম খুলিয়া চিঠিটা বাহির করিয়া প্রথমে যেন চোখে ধোঁয়া দেখিল। কিছু বুঝিতে পারিল না প্রথমটা। খুব চেনা, খুব পরিচিত হস্তাক্ষর, এ নিশ্চয়ই—। পরক্ষণেই রাণীর হৃৎস্পন্দনকে দ্রুতায়িত করিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল—বাবা দিয়েচে—বাবার চিঠি পিসি। এই দ্যাখো বাবার হাতের লেখা।

উত্তেজনায় সে হাঁপাইতেছিল।

একটু পরেই রাণী দেখিল, সে আর কাজল দুজনেই অঝোরধারে কাঁদিতেছে।

অপু রাণীকে লিখিয়াছে—

'ফিজি থেকে আফ্রিকায় এসেছি। কখন কোথায় ঘুরছি কিছু ঠিক নেই। ফিজিতে একটা মিশনারী স্কুলে মাস্টারী করলাম কিছুদিন। এ্যাশবার্টন সাহেবই সব ঠিক করে দিয়েছিল। জীবনটাকে যেমন করে দেখতে চেয়েছিলাম—ঠিক তেমনি করেই দেখছি রাণুদি। কোথাও ধাক্কা পেলাম না। আশ্চর্য একটা অসীমত্বের সন্ধান পেয়ে গেছি। মনে হয় যেন সময় অফুরন্ত—তা ফুরিয়ে যাবে না কোনোদিন। জীবনও তাই বাঁধনহারা, অসীম। মহাকাল এত বিশাল—তার আঁচলটুকুই এত বড় যে সেই বিশালতাকে অনুভব করা বহু দূরের কথা, ধারণাটাকে কল্পনায় আনতেই মানুষের যুগযুগান্ত কেটে যাবে। এই জীবনকে—ত্রিকালকে বুকের পাঁজরে পাঁজরে ব্যথায়-বেদনায়, আনন্দে-উল্লাসে, স্বপ্নে-জাগরণে প্রতিক্ষণে অনুভব করেছি। আমার আর ভয় কি রাণুদি? এখন মনে হচ্ছে, ভক্তিভাবটা শুধু মেয়েদেরই একচেটে নয়—আমার মনেও একটা ভক্তির ভাব জেগে উঠছে। এ কিন্তু ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি নয়। বর্তমানের ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতে রহস্যের প্রদোষালোকে আলোকিত পরিসরে বিস্তৃত যে মহাজীবন—তার প্রতি ভক্তি। এ যেন কিছুটা নিজেরই প্রতি ভক্তি। নিজেকে, বিশেষ করে নিজের জীবনকে জানবার অদম্য স্পৃহায় ঘুরে বেড়াচ্চি। এখন মনে হচ্ছে যেন তা ছাড়িয়ে আরও বেশী কিছু জেনে ফেলেচি। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করা যায় না রাণুদি—সে বোধ ভাষার অতীত। সে সকল জানার জানা—এক অনির্বচনীয় পরম-পাওয়া।'

কাজলকে লিখিয়াছে—

'তোমার জন্যই হয়তো আমাকে ফিরে আসতে হবে। কতদিন ফিজিতে সমুদ্রের তীরে বসে আশ্চর্য সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে তোমার কথা ভেবেছি। তুমি

আমার প্রাণের অংশ দিয়ে তৈরী স্বপ্ন, বাবা। চেষ্টা করছি তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে। তুমি পিসির কথা শুনে চলো তো? বেশী রাতে বেরুবে না। নদীর ধারে বেশী যেও না। আমার বাক্সে যে ফার্স্ট বুকটা আছে—সেটা মনোযোগ দিয়ে পড়বে। এখানে অনেক মজার মজার জিনিস দেখছি—ফিরে তোমাকে গল্প বলবো। তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। আমার জন্য তোমার মন খারাপ হয় না?'

বাবার জন্য তাহার মন খারাপ হয় কি না! এমন দিন কবে গিয়াছে যে সকাল হইতে রাত্রির মধ্যে বাবার কথা ভাবে নাই? বরং বাবাই তো তাহাকে ফেলিয়া বেশ থাকিতে পারিতেছে। বাবা ফিরিয়া আসিলে সে বাঁচে।

দুপুরে অপুর রাখিয়া-যাওয়া স্যুটকেশ হইতে ডায়েরীখানা বাহির করিয়া সে পড়িতে বসে। ইহা সে মধ্যে মধ্যেই পড়িয়া থাকে। এক বৎসরের ঠাসবুনোট লেখায় ভর্তি ডায়েরী। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক জায়গায় তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। কাশীর কথা লেখা আছে কয়েক পাতা। বাবা তাহাকে রাখিয়া একবার কাশী গিয়াছিল বটে। কাজল পাড়িয়া ফেলে পাতা কয়টা। এ কাহার কথা লেখা! লীলা কে? তাহার মেয়ের সহিত বাবা তাহার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে যে! বিবাহ! এ তো বড় মজার কথা হইল। কলিকাতায় থাকিতে গলির ওপারে একটা বাড়ীতে সে বিবাহের উৎসব দেখিয়াছিল। বর মোটরগাড়ি করিয়া মালা-চন্দন পরিয়া আসে। পরে গাড়ী হইতে নামিলে একজন মেয়ে কুলোর ওপর কি-সব সাজাইয়া তাহাকে বরণ করে ও অন্যান্যরা জোরে হাতপাখা নাড়িয়া বাতাস করিতে থাকে। ওপাড়ার চনুর দিদিরও তো বিবাহের কথা চলিতেছে। চনু বলিতেছিল, দিদি কালো বলিয়া নাকি পাত্রপক্ষ এক হাজার টাকা পণ চাহিয়াছে। বেশ মজা তো। বিবাহ করিলে সেও টাকা পাইবে তাহা হইলে। কিন্তু বাবা তো লিখিতেছে লীলার (এ কে?) মেয়ে ফর্সা। ফর্সা মেয়েকে বিবাহ করলে টাকা দিবে তো? টাকা পাইলে সে সব টাকা বাবাকে দিয়া দিবে। আচ্ছা, কত বৎসর বয়স হইলে বিবাহ হইয়া থাকে?

সেদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়াছিল—কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই। সুন্দর একটা ছায়াঘন আমেজে গ্রামটা ঝিমাইতেছিল। পাখীর ডাক শোনা যাইতেছিল কম। কেবল বহু উঁচুতে প্রায় মেঘের গায়ে গায়ে কয়েকটা চিল উড়িতেছিল।

কাদের মিঞার ক্ষেতের পাশে কাজল একবার থামিল। কাদের তাহার শালার সহিত পিডান দিতেছে ক্ষেত। কাজলকে দেখিয়া কাদেরের শালা বলিল—বাড়ী চলে যাও কর্তাবাবা—বিষ্টি হতে পারে। কাদের আপত্তি করিয়া বলিল—পানি হবে না মোটে—দেখছো না চিল উড়ছে ওপরে। ডানায় পানি পলি নামি আসব নীচপানে। আবহাওয়া তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদের আলাপ করিতে দিয়া কাজল হাঁটিতে লাগিল মেঠোপথ ধরিয়া। ঐ পথটা গিয়াছে আষাঢ়ু—এই পথটা ঘুরিয়া গিয়াছে নদীর দিকে। একটা বড গাছ রহিয়াছে তুইটা পথের সঙ্গমস্থলে। জায়গাটা কাজলের বড ভাল লাগে। গ্রামের যাবতীয় লোক এই পথ দিয়া আষাঢ়ুর হাটে গিয়া থাকে। অচেনা লোকও যায় কত। ভিন-গাঁ হইতে মালপত্র কাঁধে করিয়া আলের পথ মাঠের পথ ধরিয়া এখানে আসে। এখান হইতে কাঁচা পথ ধরিয়া চলিয়া যায় হাটে। পণ্যাদি কাঁধে হাটমুখী জনস্রোত দেখিতে কাজলের বেশ লাগে।

খানিকক্ষণ সেখানে বসিয়া কাজল একবার নদীর পথে কিছুদূর হাঁটিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে দেখিল একজন লোক আষাঢ়ুর পথ হইতে নামিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। বুকটা তাহার একবার কেমন করিয়া উঠিল। দৌড়াইয়া আগাইয়া গেল সে—এইবার লোকটার পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। বহুদিনের অনভ্যাসের ফলে শব্দটা যেন জিভ দিয়া আর বাহির হইতেছে না। মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে। পথের পাশের জঙ্গল হইতে বাতাস অজস্র বন্যপুষ্পের গন্ধ বহিয়া আনিতেছে। একটা ধাক্কা দিয়া কাজল শব্দটা বাহির করিল—বাবা!

অপু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় ফিরিয়া তাকাইল। এই ডাকটার জন্য সে ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে। সমুদ্রের ফেনোচ্ছল উর্মিমালা, বিষুবমণ্ডলীর দেশের তারকাখচিত তমিস্র রাত্রির আকর্ষণ, উষ্ণ বালুকায় শুইয়া উপরে নারিকেল-পাতায় বাতাসের মর্মরধ্বনি শুনিবার অদ্ভুত অনুভূতি—সব সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এই ডাকটা শুনিবার লোভেই তো! সে থাকিতে পারে নাই।

অপুর হাত হইতে ব্যাগ আর বাক্স পড়িয়া গেল ধূলায়। পথের মধ্যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সে তুই হাত সামনে বাড়াইয়া দিয়া চোখ বুজিল। পরক্ষণেই কাজল ঝাঁপাইয়া পড়িল অপুর বাহুবন্ধনে।

চিলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া আসিতেছিল নীচে। এইবার বৃষ্টি নামিবে।

সন্ধ্যায় রাণীর রান্নাঘরের দরজায় পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া অপু মনের আনন্দে গল্প করিতেছিল।

—আর পারলাম না থাকতে রাণুদি। সে কি টান, তা যদি একবার বুঝতে! যা দেখি যা করি, সবই যেন কেমন ফাঁকা আর অর্থহীন লাগে। সেই বাড়ীতে এনে তবে ছাড়ল।

রাণী হাসিয়া বলে—আর আমরা বুঝি কেউ নই?

—কে বলেছে একথা রাণুদি? তোমরা সবাই মিলে আমাব জীবন সার্থক করে তুলেছ। কোথায় যেত আজ কাজল—তুমি না থাকলে? তোমার দান কি ভোলবার? মায়ের স্নেহ দিয়ে আমাদেব দুজনকেই ঘিবে রেখেচ তুমি।

রাণীর গলার কাছে হঠাৎ একটা কি কুণ্ডলী পাকাইয়া ওঠে! এত সুখেব দিনও ভগবান তাহার কপালে লিখিয়াছিলেন! পরে সামলাইয়া বলে—এই নে, দুটো পবোটা আগে খা, তারপব গরম গরম ভেজে দিচ্ছি—

রাত্রে ছেলেকে লইয়া শোয় অপু। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাহাবও ঘুম আসে না। বৈকালে একবাব খুব ঝড হইয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল। তাই গরম নাই তত। জানালার পাশে শুইয়া আকাশে নক্ষত্রগুলি দেখা যায় স্পষ্ট। মধ্যপ্রদেশ হইতে ফিরিয়া একই নক্ষত্র কলিকাতাব আকাশে দেখিয়া তাহাব কেমন অবাক লাগিয়াছিল। আবার ফিজি ঘুরিয়া আসিয়া এই নক্ষত্রগুলিকে কেমন চেনা-চেনা অথচ অনেক দূরের বলিয়া মনে হইতেছে। বিদেশে ইহারাই ছিল তাহার সঙ্গী—এই নক্ষত্র, মুক্ত উদার আকাশ প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া বহিয়া-যাওয়া ভবঘুরে বাতাস। সেও সুন্দর-জীবন—সে যে জীবন চাহিয়াছিল, সেই জীবন। কিন্তু এখন কাজলের পাশে শুইয়া তাহাব উদ্দাম জীবনের গতিবেগ কিছুটা প্রশমিত করিতে ইচ্ছা করিল। কোথায় ফেলিয়া যাইবে একে? একবার গিয়া তো মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে নাড়িব টান। শৈশবে বাবা অনেকদিন না আসিলে তাহার রাগ হইত—অভিমান হইত। বাড়ী ফিরিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া হরিহরকে অপুর রাগ ভাঙাইতে হইত। এখন বড মমতা হয় হরিহরের প্রতি। বাবা কি আব ইচ্ছা করিয়া আসিত না। সংসার চালাইবাব দুরূহ প্রয়াসে বাবাকে কোথায় না ঘুরিতে হইয়াছে—কি না করিতে হইয়াছে। বেচারা বাবা—তাহারও কত ইচ্ছা করিত অপুকে দেখিতে; আসিতে পারিত না শুধু কাজের চাপে! বই-খাতা বগলে তালি-মারা ছাতা হাতে স্থান হইতে স্থানান্তরে বেড়াইত কাজের সন্ধানে। আজ অপু লেখক হইয়াছে—বই বাজারে কাটিতেছে মন্দ নয়, তাহার চাইতে বেশী মিলিতেছে প্রশংসা। কত বৎসর

পরে তাহাদের বাড়ীর লোক আজ সচ্ছলতার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু বাবাকে দেখানো গেল না এই সব দিন—বাবা বাঁচিয়া থাকিলে বৃদ্ধ হইয়া যাইত, তাহাকে অপু শিশুর মত পরিচর্য্যা করিত। থাক—কাজলের মধ্য দিয়া সে তাহার শৈশবে হারাইয়া-যাওয়া পিতাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাহাকে মনের মত করিয়া মানুষ করিতে হইবে—ঠিক যেমন করিয়া সে চায়, তেমনি করিয়া। ভাবিয়াছিল, গ্রামে না রাখিয়া কাজলের প্রতি সে অন্যায় করিতেছে। গ্রামে হয়তো কাজলের শিশুমন পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। তাই ছেলেকে কলিকাতার অসুন্দর পরিবেশ হইতে আনিয়া একেবারে প্রকৃতির মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন ভাবিল, এইভাবে রাখিলে উহার পড়াশুনা কিছুই হইবে না। বরং কোন-একটা ছোট শহরে লইয়া যাই। মাঝে মাঝে গ্রামে লইয়া আসিবে—মাঝে মাঝে বেড়াইতে লইয়া যাইবে দূরে। তাহাতে উহার চোখ ভাল করিয়া ফুটিবে। সব দিক দিয়াই ছেলেকে চৌকস করিয়া তোলা প্রয়োজন।

পরের দিন সারাবেলা অত্যন্ত গরম ছিল—কোথাও বাহির হওয়া যায় নাই। বিকালের দিকে রোদ একেবারে কমিয়া গেলে অপু ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল—বল দেখি কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়? পরে নিজেই খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—চল্। আগে বেরুই তো, তারপর দেখা যাবে। নে, হাত মুখ ধুয়ে জামাটা পরে নে।

নিজের সার্টটা আনিবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া কি মনে করিয়া জোরে ডাকিল, রাণুদি!

রাণী ভিতরে ছিল, আসিয়া বলিল—কি? আরে, বেরুচ্ছিস বলে মনে হচ্চে!

—রাণুদি, একটা জিনিস খেতে বড় ইচ্ছা করচে, খাওয়াবে?

—ও মা? সে আবার কি কথা। খাওয়াবো না কেন। বল না—

—গরম পড়েছে খুব, একটু আমপোড়া-সরবৎ খাওয়াবে?

—আমপোড়া-সরবৎ! সে আবার কি রে। কখনো শুনি নি।

—আমাদের এদিকে খায় না। বাবা পশ্চিম থেকে শিখে এসেছিলেন। পশ্চিমে খুব খায়। বাবা মাঝে মাঝে করতে বলতেন। তুমি বানাও রাণুদি, আমি দেখিয়ে দিচ্চি।

—করচি। এই সামান্য ব্যাপার, আমি ভাবি কি-না-কি খেতে চাইবি।

এটা কিন্তু সামান্য ব্যাপার নয় রাণুদি। কতদিন খাইনি বলো তো? ছোটবেলায় মাঝে মাঝে মা করে দিতেন। আমাদের অবস্থা কি ছিল, সে তো

তুমি জানোই। নিজেদের বাগান ছিল না, ঘরে সব সময় চিনিও থাকত না—আমপোড়া-সরবৎ তখন একটা বিলাসিতা। কালেভদ্রে হলে খুব ভালো লাগতো। আজ বানাও তো রাণুদি। খেয়ে দেখি, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে কিনা। খোকাকেও একটু দিও—কাঁচা আম আছে তো?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। কাল এক ঝুড়ি আম দিয়ে গিয়েছে তুলসীর মা।

কাজল আসিয়া বলিল—বাবা, তোমার হয়েচে? আমার এই বোতামটা লাগিয়ে দাও তো, আমি পারচি নে—

অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—দেখেচো কাণ্ড রাণুদি? উল্‌টো ঘরে বোতাম লাগিয়ে বসে আছে। হ্যাঁরে, তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে?

একটু পরে বারান্দায় বসিয়া সরবতে প্রথম চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেবেলাটা ফিরিয়া আসিল। অপু চোখ বুঁজিয়া আমপোড়ার সোদা গন্ধ উপভোগ করিতেছিল। এই গন্ধটা কেমন পুরাতন দিনগুলোকে মনে পড়াইয়া দেয়। সেই দাওয়ায় চাটাই পাতিয়া বসিয়া তালের বড়া খাওয়া, সেই মাটির দোয়াত হাতে প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাছে পড়িতে যাওয়া। কত কথা মনে পড়ে। রাত্রে প্রদীপের আলোয় বসিয়া পড়িতে পড়িতে কানে আসিত মায়ের খুন্তি নাড়িবার শব্দ। বিদেশ হইতে বাবা আসিলে অপুর অত্যন্ত আনন্দ হইত। রাত্রে বিছানায় শুইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শুনিত, বারান্দায় বসিয়া বাবা গান করিতেছে।

আর একজনের কথা মনে পড়ে!

বাংলা দেশ হইতে বহুদূরে তারকাখচিত আকাশের নিচে সমুদ্রবেলায় শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ একসময় তাহার তন্দ্রার ঘোরে মনে হইয়াছে, সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বদলায় নাই। তাহার বয়স বাড়ে নাই। তাহার চোখের দৃষ্টির পরিবর্তন হয় নাই। তাহার আঁচলে বাঁধা নাটাফলগুলির সংখ্যা একটিও কমে নাই। সে অপুর সামনে দাঁড়াইয়া হাসিয়াছে।

তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে অপু অবাক হইয়া আকাশের দিকে চাহিত। সমস্ত দুঃখের দিনে উদার আকাশ তাহাকে শান্ত করিয়াছে। দেখিত, বাংলার আকাশের সহিত বিদেশের আকাশের কোন প্রভেদ নাই। দেখিত, তাহার দিদির দৃষ্টি যেন ক্রমশঃ আনীহারিকা-সৌরচরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এইমাত্র এইখানে ছিল—তাহার ঘুম ভাঙিতে দেখিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বেড়াতে যাবে না বাবা?

ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া অপু বলিল—চলো বাবা, যাই।

পথে বাহির হইয়া বলিল, আমরা যদি এখান থেকে চলে গিয়ে অন্য জায়গায় থাকি, তবে তোর মন খারাপ হবে—না রে?

কাজল প্রথমে অবাক হইয়া গেল। চলিয়া যাইবার কথা উঠিতেছে কেন? অবশ্য বাবা যেখানে আছে, এমন জায়গায় থাকিতে তাহার খারাপ লাগিবে না, কিন্তু পিসিকে ছাড়িয়া থাকা বড়ো কষ্টের।

—কোথায় যাবো বাবা?

কোথায় যাওয়া হইবে তাহা অপুও কিছু ভাবে নাই। গ্রাম ছাড়িয়া বেশীদূর যাওয়া হইবে না, আবার কলিকাতাও কাছে হইবে—এমন স্থানের সন্ধান সে মনে মনে করিতেছিল। ছেলেব প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে বলিল—আমিও তাই ভাবছি রে।

গ্রাম ছাড়িয়া বেশীদূর যাওয়া ঘটিবে না—সে যাইতে পারিবে না। বারবার তাহাকে ভিক্ষুকের মতো ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে নিশ্চিন্দিপুরে। এ গ্রামের প্রকৃতি তাহার কাছে জীবনধারণের জন্য বাতাসের মতো প্রয়োজনীয়। তবুও ছেলের কল্যাণের জন্য যাইতেই হইবে বাহিরে। ভাল স্কুলে না পড়িলে কাজলের চোখ ফুটিবে না। দেওয়ানপুব স্কুলের মিঃ দত্ত-র কাছে সে নিজে ঋণী; বৃহত্তর জীবনে প্রবেশের মুখে তিনি তাহাকে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কাজলকে সে নিজে তৈয়ারী করিয়া দিবে।

নদীর ধারে যাইবার পথে আধাবয়সী স্থূলবপু এক ভদ্রলোক ডাকিয়া নমস্কার করিলেন—আপনিই তো অপূর্ববাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে তো আগে এ গ্রামে দেখি নি বলেই বোধ হচ্ছে। নতুন এসেছেন বুঝি?

নতুনই বটে। তাও ধরুন গিয়ে খুব নতুন আর কি! বছর কয়েক তো হয়ে গেল। আমার নাম রাধারমণ চাটুজ্যে। বরাবরের নিবাস ঝাপড়দহ'র কাছে গ্রামে, তা সে মশাই এমন ম্যালেরিয়া যে কি বলব। দেখ্-দেখ্ করে একেবারে গ্রাম উজাড়—

—ও।

—হ্যাঁ। তারপর আর সে গ্রামে ভরসা করে বাস করা—বুঝলেন না? তাও গিন্নী বলেছিলেন, যেখানে যাচ্ছ সেখানে কি আর জরজারি নেই? কথাটা অবশ্য মন্দ বলে নি, কি বলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠিক কথাই বলেছেন উনি।

—মশায় শুনলাম দেশ-বিদেশ অনেক ঘুরেছেন, একদিন গল্প শুনতে যাবো।

সেজন্যেই মশায়ের সঙ্গে আলাপ কর।।

—দেশ-বিদেশ আর কি, সে এমন-কিছু নয়। তবে যাবেন নিশ্চয়ই, তার জন্য আর বলার কি আছে?

এই শুরু হইল। রাধারমণ তো আসিলেই, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম হইতে অন্যান্যরাও একে দুয়ে করিয়া আসিয়া হাজির হইল। ঘরে প্রায়ই নতুন মুখ দেখা যাইতেছে। অনেকেই যাচিয়া আলাপ করিতেছে। অপু যেখানে গিয়াছিল, তাহার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান সকলেরই প্রায় একপ্রকার। সবাই জানিতে চায় দেশটা কেমন, পৌছাইলেই ধরিয়া তাহারা ম্লেচ্ছ করিয়া দেয় শোনা গিয়াছে, একথা কতদূর সত্য? একদিন সন্ধ্যাবেলা একজন প্রতিবেশী আসিয়া হাজির হইল, সে কাহার কাছে শুনিয়াছে বিলাতে অমাবস্যার রাত্রে রামধনু দেখা যায়। অপু সদ্য বিদেশ হইতে আসিয়াছে—অতএব সত্য-মিথ্যা যাচাই করাবার জন্য সে ছাড়া উপযুক্ততর লোক আর কই? অপু শুনিয়া হাসিয়া বলিল—বিলেত যাকে বলে; ঠিক সেখানে তো আমি যাই নি। আর তাছাড়া রাত্তিবে রামধনু কি করে দেখা সম্ভব? রামধনু তৈরী হয় কি ভাবে? জলকণার উপর আলো—

একঘণ্টা সময় লাগিল। অনেক পরিশ্রম করিয়া বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেওয়ার পর শ্রোতার মাথা নাড়ার ভাব দেখিয়া গত এক ঘণ্টার পরিশ্রমের সার্থকতা সম্বন্ধে অপুর কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। বুঝুক আর নাই বুঝুক, লোকটা ইহার মিনিট দুই পরে বিদায় লইল।

গ্রাম হইতে বিদায় লইতে হইবে বলিয়া অপু ছেলেকে লইয়া দুইবেলা পথে পথে বেড়ায়। রাস্তায় লোকে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার আশ্চর্য ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিতে চায়। অপু কাহাকেও নিরাশ করে না। সে জানে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই সারাজীবনে বাংলাদেশের বাহিরে পা দেওয়ার সুযোগ পাইবে না। ভাবিয়া তাহার দুঃখ হয়। এই সহজ মমত্ববোধের ফলে সে কয়েক শতবার কথিত গল্প পুনরায় হাসিমুখে করিতে থাকে।

অপু বলি-বলি করিয়াও কথাটা রাণীকে বলিতে পারিতেছিল না। চলিয়া যাইবার কথা শুনিলে রাণী যে আদৌ সুখী হইবে না ইহা অপুর জানা ছিল বলিয়াই কথাটা সে সাহস করিয়া রাণীর নিকট তুলিতে পারিতেছিল না। যাইবার সময় আচমকা না বলিয়া এখন হইতে আভাস দিয়া রাখা ভাল। অথচ সাহসের অভাব। দুই-চার দিন বলি বলি করিয়া অপু রান্নাঘরের সামনে ঘোরাফেরা করিল, তারপর একসময় দুর্গানাম করিয়া কথা পাড়িয়া ফেলিল।

—একটা কথা ছিল রাণুদি।

রাণী তোরঙ্গ গোছাইতেছিল। অপুর গলার স্বরে এবং মুখভাবে বিস্মিত হইয়া তাকাইল।

অপু একটা ঢোক গিলিল। —এই, মানে, কাজলের পড়াশুনাটা এবার ভাল ভাবে শুরু করে দেওয়া দরকার।

—তাতে কি?

—না, বলছিলাম কি, ওকে এখন থেকে একটু—মানে একটু ভাল স্কুলে তো পড়াতে হবে। তাই রাণুদি ভাবছি কিছুদিনের জন্য শহর এলাকায় বাসাভাড়া করে থাকব। আগামী হপ্তায় হয়তো রওনা দিতে হবে। বুঝতেই পারছ, ছেলেটার পড়াশুনো তো হওয়া দরকার।

রাণী কোন কথা বলিল না, তোরঙ্গের ডালা খোলাই রাখিয়া বিছানায় আসিয়া বসিল, মুখটা রহিল খোলা জানালার দিকে। তাহার অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতে পারিত অপুর কথা তাহার কানে যায় নাই, সে অন্য-মনস্কভাবে বাইরের কাঁঠালগাছটা দেখিতেছে মাত্র।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—রাগ করলে রাণুদি? অপু ভাবিয়াছিল রাণুদি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে, রাণী মুখ ফিরাইলে দেখিল তাহার চোখে জল নাই।

হাত দিয়া বিছানার চাদরটা মসৃণ করিতে করিতে রাণী বলিল—না রে রাগ করিনি। রাগ করবো কেন? তুই কি পাগল হলি অপু? এতে তো কাজলেরই ভালো হবে, ওর লেখাপড়া কি কিছু হবে এখানে থাকলে?

একটু থামিয়া বলিল—তাছাড়া পরের জিনিস আর কতদিন নিজের কাছে রাখব? মায়া পড়ে গেলে ছাড়তে যে বড়ো কষ্ট হবে। তার চাইতে তুই এখনই নিয়ে যা—

এত সহজে ব্যাপার মিটিয়া যাইবে অপু আশা করে নাই। যাহা হউক, রাণুদি যে চলিয়া যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। অপু বলিল—মাঝে মাঝে এখানে নিয়ে আসবো রাণুদি, প্রত্যেক ছুটিতে আসবো। আমারই বা কে আছে বলো তুমি ছাড়া? বরং তখন তুমি বিরক্ত হয়ে উঠবে দেখো—

একটু পরেই হাতপাখা চাহিবার জন্য ঘরে ঢুকিতে গিয়া অপু চৌকাঠেই দাঁড়াইয়া গেল। বিছানার ওপর উপুড় হইয়া রাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

অনেক ভাবিয়া অপু মালতীনগরে যাওয়া স্থির করিয়াছিল। মালতীনগর জায়গাটা এখনও পুরা শহর হইয়া উঠিতে পারে নাই, তবে শহরের সুবিধা

মোটামুটি প্রায় সমস্ত পাওয়া যায়। অনেক বাড়ী ঘর, মানুষ-জন ও হাট-বাজারের মধ্যে গ্রাম হইতে শহরের স্পর্শই বেশী। নিশ্চিন্দপুর হইতে অবশ্য খুব কাছে হইল না। কিন্তু কি আর করা যায়। সব সুবিধা দেখিতে গেলে চলে না। কিছু দিন আগে অপু মালতীনগর স্কুলে গিয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলিয়া আসিয়াছিল। সেখানকার ব্যবস্থা তাহার পছন্দ হইয়াছে। ভর্তি করাইবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ একটা কথা ভাবিয়া তাহার খুব অবাক লাগিল। সে আজ ছেলেকে ভর্তি করাইবার জন্য ঘুরিতেছে, ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছে। আশ্চর্য, এই কিছুদিন আগে তাহার কথাই তাহার মা-বাবা চিন্তা করিয়াছে। সত্যই সে অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। অথচ সন্তানের পিতার যতটা গম্ভীর ও রাশভারী হওয়া উচিত, তাহা সে বিস্তর চেষ্টা করিয়াও হইতে পারিতেছে না। রাশভারী মুখ করিবার চেষ্টা করিল, হইল না। খানিক পরে নিজেরই হাসি পাইল। আসলে সে বৃদ্ধ হয় নাই, তাহার পক্ষে বৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে।

বিদায় লইবার পালা বেশ কয়েকদিন ধরিয়া চলিল। রাণী ভালমন্দ রান্না করিতে লাগিল, পাড়ার মানুষ এবং গল্পপিপাসুরা দল বাঁধিয়া আসিয়া বিদায় লইয়া গেল। কড়ার রহিল, অপুকে প্রায়ই আসিতে হইবে। কাজল সকাল-বিকালে একবার করিয়া বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিল।

সময়কে যাইতে দিব না বলিলে সময় অধিকতর তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। ক্রমশঃ যাইবার দিন আসিয়া গেল। অপু মালতীনগরে একখানি বাসা ভাড়া করিয়াছে। সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় আসবাব কিনিয়া সেখানে রাখা আছে। একসঙ্গে সমস্ত কেনা গেল না। দৈনন্দিন কাজে প্রয়োজন দেখা দিলে ক্রমশঃ কেনা হইবে। বহুকাল বাদে অপু সংসার পাতিতেছে—একা। কি কি জিনিস লাগিবে, তাহা রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া কেনা হইয়াছে। অপুর একার উপর ভার থাকিলে হয়তো নূতন বাড়ী গিয়া প্রথম দিন উপবাস করিতে হইত।

যাইবার গোলমাল, বাক্স গোছানো, নানাবিধ উপদেশ এবং উত্তেজনায় কাজল কিছুটা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, নতুবা রওনা হইবার সময় সে নিশ্চয় একবার কাঁদিয়া ফেলিত। পরে তাহার মনে হইয়াছিল—পিসি অত কাঁদলে আর আমি দিব্যি চলে এলাম। পিসি হয়তো ভাবলে ছেড়ে আসতে আমার মন খারাপ হয়নি।

মন খারাপ তাহার অবশ্যই হইয়াছে, কিন্তু সেই গোলমালে তাহার কান্না আসে নাই।

অপুর মনটা কেমন ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল। রাণীর কাছে কাজলকে রাখিয়া

তাহার যে সহজ নিশ্চিন্ততা ছিল, তাহা সে ফিরিয়া পাইতেছিল না। অনেক প্রতিজ্ঞা, অনেক পত্র লিখিবার প্রতিশ্রুতি, অনেক চোখের জলের মধ্য দিয়া তাহারা মাঝেরপাড়া স্টেশনে পৌঁছিয়া গেল।

ট্রেনে উঠিয়া কাজল বলিল—একটা কথা বলব বাবা?

—কি?

—আমরা মালতীনগরে যাচ্ছি, না?

—হ্যাঁ।

—সেখানে থাকতে কেমন লাগবে বাবা?

কঠিন প্রশ্ন। অপু জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর দেখিতে দেখিতে উত্তর খুঁজিতে লাগিল।

মালতীনগর জায়গাটা কাজলের খুব খারাপ লাগিল না। ঘনবসতি সে ভালবাসে না, মালতীনগরে তাহা নাই। বাবা যে বাসা ভাড়া লইয়াছে সেটা শহরের অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। জানালায় দাঁড়াইলে অনেক দূর দেখা যায়, দৃষ্টির কোন প্রতিবন্ধক নাই। একটা জানলা আর মুক্ত আকাশ কাজলের অত্যন্ত প্রয়োজন। দূরের আকাশে চিল ওড়া দেখিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারে। তাই জানলা একটা অবশ্যই দরকার প্রান্তরের দিকে। সে যে শুধু চিল দেখিবার জন্যই দাঁড়াইয়া থাকে এমন নহে। আসলে চিলগুলা উঠিতে উঠিতে যখন বিন্দুবৎ হইয়া আসে তখন কাজলের মনটা হঠাৎ বিপুল একটা প্রসার লাভ করে। মনে মনে রোজ ভাবে—বাব্বাঃ,—কোথায় উঠে গিয়েছে চিলগুলো, এই এতটুকু দেখাচ্চে একেবারে! আচ্ছা, ওখান থেকে না-জানি পৃথিবীটা কেমন দেখায়। সুদূরের কল্পনা তাহার শিশুমনে স্বপ্নের রঙ বুলাইয়া দেয়। আরও কি-একটা মনের মধ্যে হয়, সে ঠিক বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, সেটা বুঝাইবার উপযুক্ত ভাষা তার আয়ত্তে নাই। দূরের কথা ভাবিলে দুপুরের জানালায় বসিয়া মেঘস্পর্শী পাখী দেখিলে তাহার বুকের গভীরে কি-একটা কথা গুমরাইয়া উঠে, সে তাহা ভাষায় অনুবাদ করিতে পারে না।

একদিন অপু বাহির হইতে আসিয়া কাজলকে জানলায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কি রে, কি দেখছিস হাঁ করে?

কি দেখিতেছিল তাহা সে বাবাকে মোটেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই, প্রকাশের চেষ্টায় তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। চিলগুলি নহে, অগ্নিবর্ষী আকাশটা নহে, মাঠ-প্রান্তর নহে, মেঘ নহে, অথচ এই সবগুলি মিলিয়া যে গভীর ঐকতান সাধারণ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাহিরে সর্বদাই বাজিতেছে, তাহা সে কেমন করিয়া শুনিয়া ফেলিয়াছে। অপু একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহার নিজের শৈশবের চিন্তা হুবহু কাজলের মনে প্রতিফলিত হইয়াছে—হুবহু। ছোটবেলায় সে-ও রোয়াকে বসিয়া গ্রীষ্মের দুপুরে অবাক হইয়া আকাশ দেখিত। প্রকৃতির আশ্চর্য নিয়মগুলির কাছে শ্রদ্ধায় তাহার মাথা নত হইয়া আসে। মানুষের মতামত, ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রকৃতি কঠোর হাতে পৃথিবী শাসন করিতেছে। প্রকৃতি স্পষ্ট, জড়তাশূন্য অথচ রহস্যময়। প্রকৃতির রহস্যময়তার প্রতি আকর্ষণ কাজলের রক্তেও সঞ্চারিত। আর মুক্তি নাই—সে মুক্তি পায় নাই, কাজলও পাইবে না।

রান্নাবান্না কোন রকমে হইতেছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে কাজলের মুখে অপুর রান্না মোটামুটি খারাপ লাগে না।

কিন্তু এইভাবে বেশীদিন চলিবে না, তাহা অপু বুঝিতে পারিয়া একটি বুড়ীকে রান্নার জন্য ধরিয়া আনিল। খুব বুড়ী নয়, দুইজনের রান্নার কাজ চালাইয়া লইতে পারে। বুড়ীরও কোথাও আশ্রয় মিলিতে ছিল না, বলিবামাত্র পোঁটলা হাতে করিয়া আসিয়া পড়িল। তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া অপু মনে মনে ভাবিল—আহা, বুড়ী মানুষ, কোথাও কেউ নাই। ·একে তাড়াব না, রেখে দেব যতদিন থাকে। মুখে বলিল—তোমাকে কি বলে ডাকব বলো দেখি? তোমার ছেলের নাম তো গোপাল? তাহলে গোপালের মা বলে ডাকব, কেমন!

—আর বাবা ছেলে! সে কি আমায় দেখে, না খেতে দেয়? তবুও কি জ্বালা, তার নাম ধরেই লোকে আমায় ডাকবে। যেখানে যাই, শুধু গোপালের মা আর গোপালের মা—

—তবে অন্য একটা কিছু বলো, সেভাবেই ডাকব'খন।

তাহাতেও বুড়ীর আপত্তি। দেখা গেল, যে ছেলে খাইতে বা পরিতে দেয় না, মুখে আপত্তি করা সত্ত্বেও বুড়ী তাহারই নামে পরিচিত হইতে চায়। অপুর কেমন মায়া পড়িয়া যাওয়ায় গোপালের মা থাকিয়া গেল।

মালতীনগরে আসিবার পরদিন অপু কাজলকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। যে পথটা বাজারের মধ্য দিয়া গিয়া রেললাইন পার হইয়াছে, সে পথ ধরিয়া দু'জনে কিছুক্ষণ হাঁটিল। বাজার ছাড়াইবার পর বাঁদিকে একটি দোকান হইতে অপু একটা সিগারেট কিনিল। লুঙি-পরা একজন মানুষ হাত-পা

নাড়িয়া বলিতেছে—বেরিয়েছে কি এখন ! এসেই দুপুরের আগে একবার জাবনা খেয়ে বেরিয়েছে। তা কোথাও খুঁজে পাচ্চি নে, কি করি বলো দেখি হরিধন ? দুধেল গাই—কোথাও বেঁধে রেখে দুধ-টুধ দুয়ে নিচ্চে না তো ?

হরিধন, দোকানের মালিক, অপুকে পয়সা ফেরত দিতে দিতে বলিল—খুঁজে দেখ পাবে'খন, এখনও তো সন্ধ্যে লাগে নি। তুমি বড বেশী ভাবো কামাল !

কামাল একটা বিড়ি ধরাইয়া বসিল।

বাজার ছাড়াইয়া কাজল বলিল—বাবা, শোনো।

—কি রে !

—আমায় আর একবার কোলকাতায় নিয়ে যাবে ?

—কেন রে ? শহর বুঝি খুব ভাল লাগে ? বায়োস্কোপ দেখবি ?

—না।

—তবে ?

একটু চুপ করিয়া কাজল বলিল—যাদুঘর আবার দেখব।

অপু অবাক হইল, আনন্দিতও হইল।

—নিশ্চয় নিয়ে যাবো। আমারও দু'চার দিনের মধ্যে একবার কোলকাতায় যেতে হবে। তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো'খন।

পথটা এখন নিজন—ফাঁকা। শহরের এদিকে লোকবসতি কম। কাজল চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছিল ; সারাদিন রৌদ্রে পুড়িবার পর সন্ধ্যায় মাটি হইতে কেমন চমৎকার একটা গন্ধ বাহির হয়। গন্ধটার সহিত গরমকালের একটা যোগাযোগ আছে। শীতকালেও তো রৌদ্র ওঠে—কিন্তু তখন এমন গন্ধ বাহির হয় না। এক জায়গায় পথের ধারে অনেকগুলি রাধাচূড়া গাছ—হলদে ফুল ফুটিয়া আছে। অপু ছেলেকে চিনাইয়া দিল—ঐ দেখ, ঐ হচ্ছে রাধাচূড়া ফুল। কালকেই নাম করেছিলাম, মনে আছে ?

বেশ শান্ত সুন্দর সন্ধ্যা। এইবার একটি একটি করিয়া নক্ষত্র উঠিবে। অপুর হঠাৎ মনে হইল—বেশ হতো, যদি বাড়ী গিয়ে দেখতাম অপর্ণা জলখাবার তৈরী করে বসে আছে। কাজলের হাত-মুখ ধুইয়ে খাবার খাইয়ে পড়াতে বসাতো। আমায় লুচি আর বেগুনভাজা এনে দিয়ে চা চড়াতে যেতো। মন্দ হয় না যদি সত্যিই—

অনেক দূর আসা হইয়াছে। সামনেই রেললাইন।

ফিরিবার জন্য অপু ছেলের হাত ধরিয়া টানিবে, এমন সময় কাজল মুখে একটা শব্দ করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

অপু সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, কাজল রেললাইনের ধারে ঢালু জমিটার দিকে চাহিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রেললাইনের পাশে একটা গরু পড়িয়া রহিয়াছে—মৃত। ট্রেনের ধাক্কায় নিশ্চয় মারা গিয়াছে। সিং দুইটা ভাঙিয়া কোথায় গিয়াছে কে জানে, মেরুদণ্ড ভাঙিয়া শরীরটাকে প্রায় একটা মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়াছে। পিঠের কাছে চামড়া ফুটা হইয়া একটুকরা রক্তাক্ত মেরুদণ্ডের হাড় বাহির হইয়া আছে। ঘাড় ভাঙা, মুখের কোণে রক্তমাখা ফেনা।

—বাবা!

কাজল যেন কেমন হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উবু হইয়া বসিয়া পড়িল, তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অপু ভয় পাইয়া গেল।

—কি রে? ভয় কি? ওঠো বাবা, মাণিক আমার। কোন ভয় নেই।

কাজল রক্তশূন্য মুখে বলিল—সেই লোকটার গরু। একেবারে মরে গেছে বাবা? আমার খারাপ লাগছে।

বাড়ী আসিবার পথে কাজল কাঁদিয়া অস্থির। জোরে কাঁদে নাই, ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। অপু অনুভব করিতেছিল, তাহার হাতের ভিতর কাজলের হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা। অপুর নিজেরও খারাপ লাগিতেছিল। বীভৎস দৃশ্যটা! কেন যে ওই পথে গেল তাহারা।

—তুই অত ভয় পেলি কেন? হ্যাঁ রে?

কাজল জবাব দিতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল ঈষৎ ফাঁক-হওয়া রক্তফেনা-মাখা মুখ, ভাঙা মেরুদণ্ডের বাহির-হইয়া-থাকা হাড়টা আর মৃত গরুর পড়িয়া থাকিবার অস্বাভাবিক ভঙ্গি।

অসুন্দর জিনিসের সহিত তাহার পরিচয় কম, সুন্দর সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইয়া এই প্রথম সরাসরি অসুন্দরের সহিত পরিচয় হইয়া গেল।

এ দিনটা কাজল ভুলিতে পারে নাই।

মালতীনগরে যে স্কুলে কাজল ভর্তি হইয়াছে, সেটা অপুর বাসা হইতে খুব একটা দূরে নহে। তবু অপু কাজলকে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিতে আসে। আবার ছুটি হইলে লইয়া আসে। বাদবাকি সময় তাহার একার, নিজস্ব। এই সময় সে একটি নূতন উপন্যাস লিখিয়া থাকে। প্রথম উপন্যাসের সাফল্য তাহাকে সাহসী করিয়াছে। এক উপন্যাসেই তাহার বলিবার কথা শেষ হইয়া যায় নাই। অনেক বাকী রহিয়াছে। এই উপন্যাসে তাহা লিখিবে।

আশেপাশের দুই একজন প্রতিবেশী অপুর কাছে যাতায়াত করিয়া থাকেন।

ইহারা জানিয়া গিয়াছেন, অপু লেখক। অপুর উপন্যাস এঁরা পড়েন নাই, কিন্তু লেখকের উপর এঁদের অবিচল ভক্তি। ফলে, শহরে সাহিত্যিকের আগমন সংবাদ রটিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। তাহার বাসায় কয়েকটি ছোকরা যাতায়াত শুরু করিল। ইহাদের রচনা অপুকে মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইত—দরকার হইলে কলম চালাইয়া ঠিক করিয়া দিতে হইত। অপুর উপন্যাস ইহারা পড়িয়াছে। অপু অবাক হইয়া লক্ষ্য করিল, তাহার নাম বেশ ছড়াইয়াছে। এত দ্রুত খ্যাতি আসিবে, ইহা তাহার কল্পনার বাইরে ছিল। একদিক দিয়া ভালই হইয়াছে। একা থাকিতে হয়। এ ধরণের কিছু তরুণের সহিত আলাপ থাকা ভালো।

কাজলকে প্রতিবেশীর বাড়ীতে রাখিয়া মাঝে মাঝে সে একদিনের জন্য কলিকাতায় যায়। বই হইতে আয় হইতেছে মন্দ নহে। পাবলিশারের কাছে গিয়া অপু টাকা লইয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মালতীনগরে ফেরে। কাজলকে ছাড়িয়া সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। আজকাল তাহার এই ভাবিয়া অবাক লাগে যে কাজলকে ফেলিয়া কি ভাবে এত দিন সে বাহিরে পড়িয়াছিল? হোক ফিজি সুন্দর স্থান, কাজল সুন্দরতর।

কলিকাতায় একদিন তাহাকে প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে পাণ্ডুলিপি লইয়া ফিরিতে হইয়াছে। নূতন লেখকের উপন্যাস কেহ ছাপিতে রাজী হয় নাই। এখন পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম। প্রকাশক খাতির করিতেছে, যত্ন করিতেছে। পূর্বের সে হেনস্থার দিন নাই।

একদিন প্রকাশকের দোকানে ঢুকিতেই প্রকাশক হাসিয়া বলিলেন, আসুন অপূর্ববাবু, বহুদিন বাঁচবেন। এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল। ইনি হচ্ছেন 'শবরী' কাগজের সম্পাদক। আপনার একটা উপন্যাস চান, তাই ঠিকানা চাইছিলেন। তা আপনার নাম করতে করতে আপনি এসে হাজির।

পরে পার্শ্বস্থ স্থূলকায় ব্যক্তিটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—নিন, আর ঠিকানা দিতে হল না, একেবারে লেখক মশাইকে ধরে দিলাম।

কথাবার্তা ঠিক হইয়া গেল। আগামী সংখ্যা হইতে অপু লিখিবে। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। সম্পাদক ভদ্রলোক অপুর লেখার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন।

অগ্রিম টাকা পকেটে লইয়া অপু পুরাতন দিনের মত খেয়ালে কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইল। এখন সে হোটেলে ঢুকিয়া যাহা ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা খাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে নোটগুলি একটা একটা করিয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিতে পারে। আজ হইতে অনেকদিন আগে, অবশ্য খুব বেশী দিন আর কি,

তাহাকে অভুক্ত অবস্থায় রাস্তায় বেড়াইতে হইয়াছে শুকনো মুখে। কেহ ভালবাসিয়া বলে নাই, আহা, তোমার বুঝি খাওয়া হয় নি? এসো যা হয় ডুটো ডাল-ভাত—না, সেরূপ কেহ বলে নাই। বরং তেওয়ারী-বধূ বেশ ভাল ছিল, তাহার স্নেহ ছিল। জীবনের পথে তেওয়ারী-বধূর মত কয়েক জনের নিকট হইতে স্নেহস্পর্শ পাইয়াই তো কষ্টের মধ্যেও মানুষ সম্বন্ধে সে হতাশ হইয়া পড়ে নাই। আজ টাকা কয়টা পকেটে করিয়া সে পরিচিত স্থানগুলিতে একবার করিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, মানুষ যেখানে কষ্ট পায়, ভগবান সেইখানেই আবার তাকে সুখ দেন। আমার সেই পুরানো মেসের সামনেই পকেটে আজ একগাদা টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কথাটা ভাবিয়া তাহার কেমন অদ্ভুত লাগিল। মনে হইল, রাস্তার ওপারের ঐ দোকানে বসিয়া-থাকা ধূমপানরত মানুষটিকে ডাকিয়া বলে—শুনুন; আমি ঐ গলিতে থাকতাম অনেকদিন আগে। খেতে পেতাম না, কলেজের মাইনে দিতে পারতাম না। মা বাড়ীতে কষ্ট পেতেন, টাকা পাঠাতে পারতাম না। আর এখন আমার পকেটে এই দেখুন, অনেক টাকা—অনেক। এ দিয়ে আমি কি করি বলুন তো?

কিছুদিনের মধ্যেই অপু আরও একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখিতে শুরু করিল। বাজারে তাহার বেশ নাম। বিশেষ করিয়া তরুণদের কাছে তাহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত আদর পাইতেছে। মালতীনগরের সেই তরুণ বাহিনী রোজ তাহার দুর্গ আক্রমণ করে, সে মাঝে মাঝে বিরক্ত হইলেও মুখে কিছু বলিতে পারে না। ছেলেগুলোকে সে পছন্দ করে, কিন্তু বড় বেশী বক বক করে তাহারা। অপুর মাথা ধরিয়া যায়।

অপু প্রতি মাসে একগাদা পত্রিকা ও বই কিনিয়া থাকে। ছেলের জন্য ভালো শিশুসাহিত্য আনে। এমন বই আনে, যাহা কাজলের মনের গভীরে ঘুমন্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে জাগাইয়া তোলে। কূপমণ্ডুক হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার কোন অর্থ নাই, ছেলেকে সে মধ্যবিত্ত মনের অধিকারী করিয়া গড়িবে না। অপু নিজে ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন পড়িতে ভালবাসে। সে পড়ে ও ভাল গল্প পাইলে তৎক্ষণাৎ ছেলেকে ডাকিয়া শোনায়। এই ভাবে অপু ছেলের মনে একটা পিপাসা জাগায়। কাজলের বিশেষ বন্ধু কেহ নাই, স্কুলে নাই, পাড়াতেও নাই। সে সমবয়সীদের মত দৌড়ঝাঁপ করিতে পারে না—যে সব খেলায় শারীরিক কসরতের প্রয়োজন, সেগুলি কাজল সভয়ে এড়াইয়া চলে। চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, সে পারে না। এইতো সেদিন বেণু আর শ্রীশ আম

পাড়বার জন্য মুখুয্যেদের বাগানে পাঁচিল ডিঙাইয়া ঢুকিতেছিল। আম খাইতে কাজলের আপত্তি নাই, কিন্তু মধ্যে প্রাচীররূপী বড একটা বাধা রহিয়াছে। অত উঁচু পাঁচিল তাহার পার হইবার সাধ্য নাই। বেণু আর শ্রীশ অদ্ভুত কৌশলে তর তর করিয়া পাঁচিলের মাথায় উঠিয়া গেল। শ্রীশ মিটিমিটি হাসিয়া বলিল —কি 'র, পারবি নে?

তাহাদেব উঠিবার কায়দা দেখিয়া কাজলের মনে হইতেছিল, ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি তাহারা এই কার্যেব অনুশীলন কবিয়াছে। মনে মনে নিজের অক্ষমতা বুঝিয়া কাজল ম্রিয়মান হইয়া বলিল—না ভাই আমাব ডান পাযে ব্যথা। একটা ফেলে দে না ভাই, খাই।

শ্রীশ এবং বেণুবা দয়া কবিযা একটা দুইটা আম তাহাকে খাইতে দেয়। উপায় কি! নিজে উঠিয়া পাডিবার সাধ্য তাহার নাই।

বাহিরের দুনিয়ায় লাফালাফি করিয়া বেডাইবার সামর্থ নাই বলিয়া সে ঘবের বাইবে অধিকাংশ সময় কাটায়। মাঝে মাঝে কাজল বাবার ওয়াইড-ওয়ার্লড ম্যাগাজিনগুলি নাডিয়া চাডিযা দেখে। গল্পগুলির আকর্ষণ তীব্র। ছবি দেখিয়া তাহার গায়ের লোম কাঁটা দিযা উঠে—যে ছবিটায় খুব রহস্যজনক ঘটনার আভাস পাওয়া যায়, বাবাকে বলিয়া গল্পটা কাজল শুনিয়া লয়।

অপু বুঝিতে পারে, কাজলেব মানসিক বৃদ্ধি শুরু হইয়াছে। ঠিক এই একই জিনিস সেও করিত দেওয়ানপুরের স্কুলে। কঠিন ইংরেজী বুঝিতে না পারিলে ছবি দেখিয়া কিছুটা আভাস পাইবার চেষ্টা করিত, অনেক সময় রমাপতিদাকে ধরিয়া গল্পটা বুঝিয়া লইত। সেই একই জিনিস আবার ঘটিতেছে। রক্তের ভিতব অদৃশ্য বীজ রহিয়াছে—তাহাই এ সব সম্ভব করিতেছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস দুইখানি শুরু করিবার কিছুদিন পরে অপু বিকালে বসিয়া ছেলের সঙ্গে জলখাবার খাইতেছিল। গোপালের মা পরোটা ভাজিয়া দিয়া রাস্তার ওপারের দোকানে দোক্তা আনিতে গিয়াছে। এমন সময় বসিবার ঘরের দরজাব মুখে আসিয়া দাঁড়াইল একটি মেয়ে। কিশোরী বলাই অধিক সঙ্গত, মেয়েটির বয়স কোন মতেই পনেরো-ষোলর বেশী নহে। অপু অবশিষ্ট পরোটাসুদ্ধ থালাখানা তাডাতাডি খাটের নীচে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! মেয়েটি একা আসে নাই, তাহার পিছনে আরও একটি মেয়ে আসিয়াছে। এ মেয়েটি হয়ত প্রথমটির চেয়ে বৎসর দুই-তিনের বড় হইবে।

অপু উঠিয়া কোঁচা দিয়া খাটটা পরিষ্কার করিয়া মেয়ে দুটিকে বসিতে দিল।

কাজল অবাক হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছে। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মেয়েটি লজ্জিত স্বরে বলিল—আপনিই তো অপূর্বকুমার রায়, লেখক ?

অপুর মনে ভারী আনন্দ হইল। সে লেখক বলিয়া মেয়ে দুটি দেখা করিতে আসিয়াছে। এ অভিজ্ঞতার স্বাদ তাহার নিকট একেবারে নূতন। প্রশংসা সে আগেও পাইয়াছে, কিন্তু মেয়েদের নিকট হইতে তাহা পাওয়ায় একটা আলাদা আনন্দ রহিয়াছে।

মেয়ে দুটি মালতীনগরেই থাকে। ছোট মেয়েটির নাম হৈমন্তী, বড়টি তাহার দিদি, নাম—সরযূ। হৈমন্তীর সাহিত্যে গভীর অনুরাগ আছে, সে অপুর লেখা পড়িয়া অবাক হইয়াছে তাহার ক্ষমতায়। অপু কি তাহাকে একটা অটোগ্রাফ দিবে ?

অপু সত্যই অবাক হইল। মফঃস্বলে মেয়েরা একা বেড়াইতেছে, ইহা বেশ নূতন দৃশ্য। তাহা ব্যতীত কলিকাতায় অটোগ্রাফ চাহিলে ততটা অবাক হইবার কারণ থাকে না, কিন্তু মালতীনগরে অটোগ্রাফ। নাঃ, মেয়ে দুটি দেখা যাইতেছে বেশ আলোকপ্রাপ্তা।

অটোগ্রাফ দেওয়ার পর অপু তাহাদের চা খাইতে অনুরোধ করিল। তাহারা লেখকের সহিত কথা বলিতেই আসিয়াছিল, অতএব বিশেষ আপত্তি করিল না।

কথায় কথায় প্রকাশ পাইল, হৈমন্তী গল্প লিখিয়া থাকে! অপু বলিল—সেটা আগে বলেন নি কেন ? বাঃ, খুব ভাল কথা। একদিন নিয়ে আসুন, পড়া যাক।

দিদি কথাটা প্রকাশ করিয়াছিল। হৈমন্তী সরযুর দিকে কটমট করিয়া তাকাইল, অপুর মজা লাগিতেছিল। হৈমন্তীর ছেলেমানুষি তাহার মনের আনন্দকে হঠাৎ ডাকিয়া তুলিল। নারীর স্পর্শ না থাকিলে জীবনটা পানসে লাগে, নারীর কল্যাণহস্তই জীবনের রূপ পালটাইয়া দেয়।

হৈমন্তী একখানা চাঁপাফুল-রঙের শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল, শাড়ীর আঁচল হাতে জড়াইতে জড়াইতে লজ্জিত মুখে বলিল—দিদির যেমন কাণ্ড! লেখা-টেখা কিছু নয়, ও এমনি—

সরযূ বাধা দিয়া বলিল—না অপূর্ববাবু। বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। এই সেদিনও ওর লেখা বেরিয়েছে কাগজে।

সরযূ যে পত্রিকার নাম করিল, সেটা শুনিয়া অপু সত্যিই বিস্মিত হইল। বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে যদি এই দুগ্ধপোষ্য বালিকার রচনা ছাপা হইয়া থাকে তবে তাহা অবশ্যই একবার পড়িয়া দেখিতে হইতেছে।

অপু বলিল—কোন আপত্তি শুনছি নে, কবে লেখা আনবেন বলুন। ফাঁকি দিলে চলবে না।

সরযূ বলিল—বাবাও শুনেছেন আপনি এখানে থাকেন। উনি বলছিলেন একদিন আপনাকে দুপুরে খাবার কথা বলতে। না আপনারও কোন আপত্তি শোনা হবে না। কবে যাবেন বলুন—যেদিন যাবেন, সেইদিন হৈমন্তী আপনাকে লেখা শোনাবে।

অপু বিশেষ আপত্তি করিল না। ববিবারে নিমন্ত্রণ রহিল। কাজলও সঙ্গে যাইবে। হৈমন্তী এবং সরযূ দুইজনে কাজলকে অনেক আদর করিয়া বিদায় লইল। ঠিকানাটা অপু রাখিয়া দিল।

মেয়ে দুটি বিদায় লইলে অপু বিছানার কাছে আসিয়া বসিতে যাইবে, চাদবের উপর নজর পডিল কয়েকটা বেলফুল। তখনও বেশ তাজা, বেশীক্ষণ তোলা হয় নাই। অপু মনে মনে ভাবিল—এখানটায় হৈমন্তী বসেছিল। ও-ই নিয়ে এসেছিল ফুলগুলো। ভুলে ফেলে গেছে, আচ্ছা মেয়ে যা হোক—

অপু ফুলগুলো তুলিয়া একবার গভীর ঘ্রাণ লইল।

রবিবারে ছেলেকে লইয়া অপু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। নিজে একটু বিলাসিতা করিতে ছাড়ে নাই, একটা শান্তিপুরী ধুতি পরিয়াছে। কিন্তু সে তুলনায় জামাটা ভাল হইল না—ময়লা মতো। অথচ এই ধুতিটা পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার তাহার বড শখ। ফলে বিসদৃশ জামাকাপড পরিহিত অপু নিমন্ত্রণ খাইতে গেল।

বাডীতে পা দিতেই হৈমন্তীর বাবা আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। ভদ্রলোক সরকারী কাজ করেন—বদলীর চাকরী। তিনি অপুর উপন্যাসটি পডিয়াছেন। সম্প্রতি যে পত্রিকা দুইটিতে অপু উপন্যাস লিখিতেছে, সেগুলিও তাঁহার বাডীতে রাখা হয়।

অপু অবাক হইয়া দেখিল, বাডীময় সাহিত্যের আবহাওয়া। বাবা, ভাই বোন সবাই বেশ শিক্ষিত ও উদার। বসিবার ঘরে প্রচুর বই রহিয়াছে—অগোছালো ভাবে খাটের উপর ও টেবিলের উপর ছডানো। অপু নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছে, যে বাড়ীতে বই সাজানো থাকে, সে বাড়ী পাঠক কম। পড়ুয়াদের বই কখনো গোছানো থাকিতে পারে না। যাহারা শখের আসবাবের মতো বই দিয়া ঘর সাজাইয়া সুরুচির পরিচয় দিতে চায়—তাহাদের বই সাজানো থাকিতে পারে। হৈমন্তীদের পরিবার সম্বন্ধে অপুর বেশ একটা শ্রদ্ধা জন্মিল। তাহার মনে বদ্ধমূল ধারণা আছে—যাহারা বই পড়িতে ভালবাসে

তাহারা কখনো খারাপ মানুষ হইতে পারে না। অনেকদিন পরে এই বাড়ীতে আসিয়া অপুর মনে হইল, বেশ সহজ পছন্দসই আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়াছে! কাজল আসিবামাত্রই বই-এর কাছে গিয়া বসিয়াছে, বই পাইলে সে আর কিছু চায় না। অপু কিছুক্ষণ বাদে বলিল—তা এবার লেখাগুলো পড়লে হতো না?

হৈমন্তী কিছুটা সঙ্কোচের সহিত খান দুই পত্রিকা আনিয়া অপুর হাতে দিল। অপু ব্যগ্রতার সহিত একটি হইতে সূচীপত্র দেখিয়া গল্প খুঁজিয়া পড়িতে শুরু করিল। সে ভাবিয়াছিল, মেয়েলী প্রেমের মিষ্টি মিষ্টি গল্প হইবে। একটি মেয়েকে একজন ছেলে দূর হইতে ভালবাসিল, দুই-একটা চিঠি দিল। বাগানে একবার দেখাও হইল--পরে অভিভাবকগণ জানিতে পারিয়া মেয়েটিকে ঘরে বন্দী করিল। ইহার পর নায়ক দাড়ি কামানো বন্ধ করিল, রোগা হইতে লাগিল এবং স্কুলমাস্টারীতে ঢুকিয়া বড় বড কবিতা লিখিয়া পরে টি. বি. হইয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিল। ইহা ব্যতীত মেয়েরা আর লিখিবেই বা কি?

একটু তাচ্ছিল্যের সহিত পড়িতে শুরু করিয়াছিল বলিয়াই বোধহয় ধাক্কাটা জোরে লাগিল। সাধারণ ন্যাকা-ন্যাকা ভাষায় লেখা নহে—প্রেমের গল্পও নহে। একটি মেয়ে গল্প লিখিতে ভালবাসিত। বিবাহ হইয়া পতিগৃহে অজস্র সাংসারিক কাজের ভিড়ে তাহার লেখিকা-সত্তা গেল চাপা পড়িয়া। একদিন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় মেয়েটি অবসর পাইয়া টিনের তোরঙ্গ খুলিয়া তাহার লেখার খাতা বাহির করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিজা বাতাসের সহিত তাহার কুমারী-জীবনের স্মৃতি যেন হু হু করিয়া ঢুকিয়া পড়িল ঘরের ভিতর। এই গল্প। ভাষার উপর লেখিকার দখলের কথা সহজেই বোঝা যায়। অপু অবাক হইল। গল্প পড়িয়া মামুলী ধরনের কি প্রশংসা করিবে তাহা ঠিক ছিল, এখন গল্পটা সত্য সত্যই ভাল হইয়া পড়ায় সে কিছু বলিতে পারিল না।

খাইতে বসিয়া অপু বলিল—সত্যিই খুব ভাল লেখা আপনার। এতটা ভালো, মিথ্যে বলবো না, আমি আশা করতে পারি নি।

হৈমন্তী বলিল—আমাকে আর আপনি বলছেন কেন, তুমি বলুন।

—তোমার গল্প সত্যিই ভাল লাগল হৈমন্তী। এত সাধারণ প্লট নিয়ে এত চমৎকার করে তা ফুটিয়ে তোলা—না, তোমার মধ্যে শিল্পিমন লুকিয়ে আছে।

হৈমন্তীর বাবা হাসিয়া বলিলেন—অত প্রশংসা করবেন না অপূর্ববাবু, মাথা বিগড়ে যাবে ওর। তবে হ্যাঁ, এ মেয়েটি আমার সত্যিই—পড়াশুনোতেও বড় ভালো ছিল। বরাবর ক্লাসে ফার্স্ট হতো। বড় অসুখে পড়েছিল বলে বছর-খানেক পড়া বন্ধ আছে।

খাওয়া হইলে হৈমন্তী অপুর জন্য মশলা আনিল। মশলা লইতে লইতে

অপু জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, সেদিন তুমি আমার খাটের ওপরে বেলফুল ফেলে এসেছিলে, না? তুমি যাবার পর দেখি পড়ে আছে। আমার অবশ্য ভালোই হয়েছিল, সারা সন্ধ্যে গন্ধ শুঁকে শুকে বেশ কবিত্ব কবা গেল।

মাথা নীচু করিয়া হৈমন্তী বলল—ফেলে আসি নি, আপনার জন্যই নিয়ে গিয়েছিলাম, রেখে এসেছি। আপনাব লেখা পড়ে মনে হয়েছিল ফুল পেলে আপনি খুশী হবেন।

—আমার জন্য নিয়ে গিয়েছ তো আমাকেই দিলে না কেন?

উত্তরে হৈমন্তী কিছু বলিল না, কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া পবে মাথা তুলিয়া অপুর দিকে তাকাইয়া একটু সলজ্জ হাসি হাসিল।

—কই, বললে না তো দাওনি কেন?

—দিয়েই তো এসেছিলাম। আপনি বুঝতে পাবেন নি, সে কি আমার দোষ?

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে কাজল বলিল—বেশ লোক এরা, না বাবা। উত্তর না পাইয়া অভিযোগেব স্বরে বলিল—হুঁ বাবা, তুমি সেই থেকে শুনছো না কিছু।

অপু চমক ভাঙিয়া বলিল—এ্যাঁ? ও হ্যাঁ, তা ভাল লোক। বেশ ভাল লোক—নাও, এখন তাড়াতাড়ি পা চালাও, বাড়ী গিয়ে তোমার ইংরিজি বানানগুলো—

হৈমন্তী প্রায়ই অপুর বাসায় আসে। অপু সম্প্রতি খ্যাতি পাইতেছে—কিন্তু এই মেয়েটি তাহাকে সত্যি কবিয়া চিনিয়াছে। পুস্তক-সমালোচকদের দায়-সারা ভাসা-ভাসা আলোচনা নহে, হৈমন্তী তার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তার চোখ দিয়া বিচার করিয়াছে। অপুর লেখক এবং ব্যক্তি-সত্তাকে এমন করিয়া আর কেহ আদর করে নাই—এক লীলা ছাড়া। হৈমন্তী তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছে, চিনিতে পারিয়াছে।

অপুর মনে ধীরে ধীরে কেমম একটা বুভুক্ষা জাগিয়া উঠিল। ভালবাসা পাইবার ক্ষুধা। তার মনে হইল, সারাজীবন এইভাবে ভাসিয়া বেড়ানো সম্ভব নহে, জীবনের মূল মাটির মধ্যে চালাইয়া নিজেকে মৃত্তিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিন আসিয়াছে। যতবার সে স্থায়ী হইবার চেষ্টা করিয়াছে, দুর্ভাগ্যের ঝড়ে তাকে ভাসাইয়া লইয়াছে দূরে। এখন গৃহের শান্তি পাইতে ইচ্ছা করে। তবে সে স্থাণু হইয়া পড়িতে চায় না, গৃহকে সে পায়ের বেড়ী না ভাবিয়া জীবনানন্দের একটি দিক হিসাবে পাইতে চায়।

একদিন বিকালে হৈমন্তী আসিল। সঙ্গে তাহার ভাই। অপু হাসিয়া বলিল—আরে, এস, এস। ভালই হলো। বিকেলটা মোটে কাটছিল না; এখন বেশ গল্প করা যাবে তোমার সঙ্গে।

—তা তো করবেন। কিন্তু আজ আমার একটা গল্প শুনতে হবে আপনাকে। দেখছেন তো, একদিন প্রশ্রয় দিয়ে কি কাণ্ড করেছেন!

—বারে, সে কি কথা! নিশ্চয় শুনব গল্প। তোমার গল্প আমার সত্যিই ভাল লাগে হৈমন্তী, সেদিন তোমায় মিথ্যে বলিনি। মামুলি প্রশংসাও করি নি! সত্যিই তোমার মধ্যে অদ্ভুত গুণ আছে। কোত্থেকে পেলে বলো তো?

—বাড়িয়ে বলা আপনার অভ্যেস। আমার লেখা এমন-কিছু নয়—

জোর তর্ক শুরু হইয়া গেল। অপু প্রমাণ করিবেই, হৈমন্তী ভাল লিখিয়া থাকে। আধঘণ্টা বাগ্‌যুদ্ধের পর হৈমন্তী হার মানিল। অপু বলিল—চলো, উঠোনে মাদুর পেতে বসি, ভেতরে বড্ড গরম।

চারজনে উঠানে বসিল। কাজলের সহিত হৈমন্তীর আশ্চর্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম কাজল তাহাকে তত পছন্দ করিতে পারে নাই। কিন্তু পরে কি ভাবে যেন কাজলের মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এখন সে সর্বদা হৈমন্তীর কাছে কাছে ঘোরে। হৈমন্তী প্রথম দিন কাজলকে দেখিয়াই ভালোবাসিয়াছিল। কাজলের উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, মুখের গড়ন, সবটাই যেন অপুর ধাঁচে গড়া। দেখিলে আদর না করিয়া থাকা যায় না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। কাজল হৈমন্তীর কোলের কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। প্রতাপ (হৈমন্তীর ভাই) হাঁটুর উপরে থুতনি রাখিয়া কি যেন ভাবিতেছে। উঠানের সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ে ঝিঁঝির শব্দ। সমস্ত দিনের তাপের পর এখন চারিদিকে কেমন শান্ত স্তব্ধতা।

হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য অপুর কেন যেন ফিজির সমুদ্রবেলার কথা মনে পড়িল। এই সময় স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া পাঁউরুটি ও সামুদ্রিক মাছের ঝোল দিয়া জলযোগ করিয়া সে বেলাভূমিতে আসিয়া বসিত। সমুদ্রের ওপরেই একটি ছোট শহরে সে মাস্টারি করিত। কোনদিনই তাঁর তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা হইত না। সে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিত। সামনে অবিশ্রান্ত গর্জন করিতেছে সমুদ্র। মাঝে মাঝে ঢেউগুলি তাহার কাছ বরাবর আসিয়া পড়িতেছে, চলিয়া যাইবার সময় ফেলিয়া যাইতেছে একটি টানা লম্বা সাদা রেখা আর কয়েকটি ঝিনুক। অপুর অদ্ভুত অনুভূতি হইত—একটা অপার রহস্যের অনুভূতি। সমুদ্রের প্রকাণ্ডত্বের সহিত নিজেকে একাত্ম করিবার মহৎ অনুভূতি। অথচ এই এখন সে মালতীনগরে বসিয়াও তো বেশ আনন্দ পাইতেছে।

অত বিশাল দৃশ্যের সম্মুখীন যে হইয়াছে—তাহার এই ক্ষুদ্রস্থানে আবদ্ধ থাকিয়াও কি আনন্দ পাওয়া সম্ভব ?

অপু মনে মনে নিজের আনন্দের কারণটা অনুভব করিল। উন্মত্তের মতো উল্কাবেগে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া মরিলেই সার্থকতা লাভ হয় না। জীবনের আনন্দ রহিয়াছে অনুভূতির গাঢ়ত্বের ভিতর, জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার ভিতর। ফিজির সমুদ্রতীরে বসিয়া সে যেমন হইতে পারে—মালতীনগরেও হইতে পারে।

স্তব্ধতা ভাঙিয়া অপু বলিল—তুমি গান গাইতে পারো হৈমন্তী ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হৈমন্তী বলিল—পারি।

—একখানা গাও না, শুনি।

সামান্য পরেই হৈমন্তী গাহিল—'দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া, ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ।'

অপু সামনের দিকে ঝুঁকিয়া শুনিতেছিল। হৈমন্তীর গলা ভাল। বিশেষ করিয়া গানের কথা এবং উদাস সুর অপুর হৃদয় স্পর্শ করিল। পরিবেশের সঙ্গে গানটা যেন কেমন করিয়া মিলিয়া গেল।

'ঘরেও নহে পারেও নহে
যে জন আছে মাঝখানে,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়—'

গান শেষ হইয়া গেল। অন্ধকার নামিয়াছে। বেশ বাতাস। অপু ওপরে তাকাইল—সব নক্ষত্র এখনও দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহ ঝকঝক করিতেছে। অপু বলিল—বৃহস্পতি চেন ? ঐ দেখ। ঐ যেটা ও-বাড়ীর কার্নিসের ডানদিকে জ্বলজ্বল করছে—দেখছো ?

—হ্যাঁ।

—ভাবো দেখি, ওটা পৃথিবীর চেয়ে কত বড়। অন্ধকারের বুকে দীর্ঘপথে সূর্যকে পরিক্রমা করছে সৃষ্টির উষা থেকে। ও রকম কত গ্রহ কত নীহারিকা ধূমকেতু মহাশূন্যের অকল্পনীয় ব্যাপ্তিতে ঘুরে বেড়াচ্চে। জীবনটা বড়ো অদ্ভুত, বড় সুন্দর, না ? অনুভব করো ?

—করি। সেজন্যেই তো আপনার লেখা আমার ভাল লাগে।

একটা দমকা বাতাস আসিল। সন্ধ্যামালতীর ঝাড়ে লাগিল দোলা। অনেক শুকনো পাতা খড়খড় শব্দ করিয়া উঠানের উপর দিয়া সরিয়া গেল। কাজল বলিল—সেই যে বাবা তুমি বলেছিলে, এদের দেবে সেই জিনিস—

অপু হাসিয়া বলিল—ওই ত্যাখো, একদম ভুলে বসে আছি। কলকাতা

থেকে অরেঞ্জক্রীম-দেওয়া বিস্কুট এনেছি। তাই কাজলকে বলেছিলাম তোমরা এলে দেবার কথা। ভাগ্যিস তুই মনে করিয়ে দিলি খোকা—

অপু উঠিয়া ঘরে আনিতে গেল।

হৈমন্তীদের বাড়ীতে অপু প্রায়ই যাতায়াত করে আজকাল। হৈমন্তীর বাবা-মা তাহাকে পাইলে সত্যই খুশী হন। সে গিয়া গল্পগুজব করিয়া জলখাবার খাইয়া বাড়ী ফেরে। কাজলও সঙ্গে যায়। মাঝে মাঝে গানের আসর বসে, হৈমন্তী আগে হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অপু পছন্দ করে, ফলে এ বাড়ীর সহিত তাহাব ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিতে বেশী দেরী হয় নাই।

অপু অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছে, একা সারাজীবন কাটানো তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অপর্ণার কথা ভাবিয়াই সে অন্তর হইতে সায় পাইতেছিল না। কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া দেখিল, অপর্ণার স্মৃতি তাহার মনের যে গোপন কন্দরে স্থায়ী রঙে আঁকা হইয়া গিয়াছে—সেখানে আর কাহারও স্থান নাই। কিন্তু হৈমন্তীকে সে অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে যদি বলে—আমি হৈমন্তীকে ভালবাসি না, তবে তাহা মিথ্যা কথা হইবে।

অপর্ণার স্মৃতিকে শ্রদ্ধার আলোয় বাঁচাইয়া রাখিয়াই সে বর্তমান সত্যকে মর্যাদা দিবে। একমাত্র ভয় ছিল কাজলকে লইয়া। কিন্তু কাজল ও হৈমন্তী পরস্পরকে নিকট-বন্ধনে বাঁধিয়াছে। সেদিক দিয়া চিন্তার আর কারণ নাই।

একদিন অপু কথাটা হৈমন্তীর বাবার কাছে পাড়িল। ভদ্রলোক আপত্তি করিলেন না। অপু সজ্জন, সুপুরুষ, বাজারে নামডাক হইয়াছে। সম্প্রতি বই লিখিয়া ভাল উপার্জন করিতেছে। এমন পাত্রের সহিত বিবাহ না দিবার কোনো কারণ নাই। তিনি নিজেও বুদ্ধিমান এবং সাহিত্যরসিক। অপুর ব্যক্তিত্ব এবং রচনা-ক্ষমতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি মত দিলেন।

দিনস্থির করিবার জন্য ভিতর-বাড়ী হইতে পঞ্জিকা আনানো হইল।

কাজল · চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর মাস তিনেক কাটিয়াছে। বৃষ্টি তেমন হইতেছে না। আকাশের রঙ কটা, তামার মত। গরমে দেশসুদ্ধ লোক হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। মাটিতে বড় বড় ফাটল, বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

গরমে কাকদের স্বরভঙ্গ হইয়াছে, ডাকিলে তীব্র কা-কা শব্দের বদলে একটা ফ্যাস-ফ্যাস শব্দ বাহির হইতেছে মাত্র। লোকে প্রতি দণ্ডে একবার আকাশের দিকে তাকাইয়া মেঘ আসিল কিনা দেখিতেছে।

অপু স্ত্রীপুত্রকে মালতীনগরে রাখিয়া নিশ্চিন্দিপুরে গেল। হৈমন্তীকে সে দেশে রাখিবে। মালতীনগর ভাল জায়গা হইতে পারে, কিন্তু মালতীনগরের সহিত তাহার আত্মিক যোগাযোগ নাই। যদি গৃহী হইতে হয়, নিশ্চিন্দিপুরে সে গৃহী হইবে।

রাধারমণ চাটুজ্যের কাছে খোঁজ করিতে বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। তাহাদের পুরানো ভিটার কাছেই ছোট পাকাবাড়ী, মন্দ নহে। দামও অপুর কাছে সস্তা বলিয়া বোধ হইল। নিজেদের ভিটায় নূতন করিয়া বাড়ী তুলিতে গেলে যা খরচ পড়ে, তাহা এখন অপুর পক্ষে যোগাড় করা মুস্কিল। বাড়ী একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে—তাহার উপর বাড়ী তোলা অনেক ঝামেলার কাজ। ফলে অপু এই বাড়ী কেনাই মনস্থ করিল।

রাধারমণ হাসিয়া বলিলেন—আমাদের বাড়ীর কাছে হলো। আমরা দু'ভাই ও-বাড়ীর একেবারেই পাশেই থাকি কিনা। বেশ গল্প-টল্প করা যাবে। আপনার মতো পড়শী পাওয়া, বুঝলেন কিনা, রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার।

অপু প্রথমে রাধারমণের গায়ে-পড়া ভাবটা পছন্দ করে নাই, কিন্তু পরে লোকটাকে ভাল লাগিয়া গেল। একটু বেশী কথা বলিলেও চাটুজ্যে লোক মন্দ নয়।

মালতীনগরে ফিরিবার আগে অপু একবার জঙ্গলাবৃত পুরানো ভিটার সামনে গিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে বলিল—বৌ-নিয়ে আবার আসছি তোমাদের কাছে ফিরে। দেখলে তো, কোথাও থাকতে পারলুম না। তোমরা আশীর্বাদ করো, কাজল, যেন মানুষ হয়। যেন ওর জীবনে পূর্ণতা আসে।

হৈমন্তীকে লইয়া নিশ্চিন্দিপুরে আসিলে বেশ বড় রকমের হৈ-চৈ হইল। রাণী আগে হইতেই অপুর কেনা বাড়ীতে আসিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিল। আরও অনেকে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছিল উঠানে। অপুরা আসিতেই রাণী সবার আগে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল, হৈমন্তীর পিঠে হাত দিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল।

গোলমাল মিটিলে অপু বলিল—বৌ কেমন লাগল, রাণুদি?

—সুন্দর হয়েচে। চমৎকার বৌ হয়েচে। তুই যে বিয়েথাওয়া করে আবার এসে গ্রামে উঠেছিস, এতে যে কি খুশী হয়েচি তা আর—এবার মন দিয়ে সংসার ধর্ম কর। বড্ড বাউণ্ডুলে হয়ে গিয়েছিলি তুই।

সর্বাপেক্ষা খুশি হইয়াছে কাজল। এই কাদন তাহাকে স্কুলে ৭।২৮৩ হইতেছে না, পড়া মুখস্থ করিতে হইতেছে না। বাবা বলিয়াছে, গ্রামের কাছেই স্কুলে ভর্তি করিবে। তাহাতে যে দু-একদিন লাগিবে, তাহা বেশ মজায় কাটিয়া যাইবে।

নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিবার সময় অপু ছেলের কথা ভাবিয়াছিল। শেষে ভাবিল—কি আর হবে, গ্রামের স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিই। বাদবাকি পড়া আমি নিজে দেখব'খন। আমি নিজেও তো একসময় গ্রাম্য স্কুলে পড়েচি, আমার কি পড়াশুনো কিছুই হয় নি?

প্রতিবেশীরা ফিরিয়া গিয়াছে। কাজল রাণীর সহিত তাহাদের বাড়ী গিয়াছে। দুপুরে অপু ঘরে ঢুকিয়া বলিল—প্রথম দিন আর বেশী কিছু রান্না করতে হবে না। যা-হোক একটা ছেঁচকি-টেচকি কিছু নামিয়ে ফেলো। এমনিতেই আসার কষ্ট গেছে—রাণুদি ডাল আর তরকারী পাঠিয়ে দেবে বলেছে? বলেছে, নতুন-বৌ এল তাকে খাটালে গাঁয়ের নিন্দে হবে যে।

হৈমন্তী মুখ তুলিয়া নতুন ঘরকন্না করিবার আনন্দে হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে একটা আনন্দের রেশ ছড়াইয়া পড়িল। সে সংসার করিতেছে স্ত্রীপুত্র লইয়া। সবাই খুশী। চারিদিক বেশ কেমন ভরিয়া উঠিয়াছে।

সে হৈমন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি অনেক বড বড় জায়গায় ঘুরেচো বাবার সঙ্গে। এই অজ গাড়াগাঁয়ে থাকতে পারবে তো?

—পারবো মশাই, পারবো। আমি সে রকম মেয়ে নই, তা হলে তোমাকে বিয়ে করতাম না। বরং শহরই আমার ভাল লাগে না।

—বিকেলে তোমাকে নিয়ে নদীতে যাবো গা ধুতে! এই পেছন দিয়েই পথ, বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে। দেখো, খুব ভাল লাগবে।

—তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, বেলা পড়ে এল যে, কাজল কই?

—সে রাণুদির এখানে খাবে। না, না, শুধু আমাকে নয়, তোমারটাও বাড়ো—এক সঙ্গে নিয়ে বসে যাই।

—তুমি খেয়ে ওঠো তো আগে, তারপর আমি বসবো।

বিকাল হইয়া আসিতেই অপু হৈমন্তীকে লইয়া পুরানো ভিটার কাছে গেল।

—এই আমার পৈতৃক ভিটে হৈমন্তী। এখানে আমার জন্ম। ঐ যে আকন্দগাছ দেখছ—ওখানে একটা ঘর ছিল, সেই ঘরে। আমার বাবা-মার পুণ্যস্মৃতি-মণ্ডিত মাটি এখানকার।

হৈমন্তী ভিটার দিকে মুখ করিয়া গলায় আঁচল দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল। বলিল—তাঁদের তো দেখলাম না। কপাল করে আসি নি

শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে ঘর করবো। তাঁদের আশীর্বাদ যেন পাই। কাজলকে যেন মানুষ করে তুলতে পারি।

ব্যাপারটা আদৌ নাটকীয় হইল না। বরং হৈমন্তীর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার মধ্যে অপু অনেক কিছু দেখিতে পাইল। সকাল হইতেই নানা মিশ্র অনুভূতিতে তাহার বুক ভরিয়া উঠিতেছিল। বৌ লইয়া জঙ্গলাকীর্ণ ভিটার সামনে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইল মায়ের স্নেহ বাবার আশীর্বাদ যেন তাহাদের দুইজনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। এতদিন বাদে অতীতের দিনগুলির সহিত যেন একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইল।

রাণুপিসি নানা কাজে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে বলিয়া কাজল বেড়াইতে বাহির হইল। রাণী বলিয়া দিল···বেশী দেরী করিসনে, দূরে যাস নে।

গ্রামের প্রান্তে যে মাঠ আছে, তাহার আল ধরিয়া পড়ন্ত বেলায় হাঁটিতে কাজলের খুব ভাল লাগে। মাঠের দূরে দূরে লোক থাকে, অধিকাংশ সময়েই মাঠ ফাঁকা। ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন হইতে শোনা গল্পগুলির পটভূমি হিসাবে এই ফাঁকা মাঠ ও বন্য ঝোপ তাহার মনে আধিপত্য বিস্তার করে। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রচণ্ড গরমে মরুভূমির ভিতর হীরকসন্ধানী দুইটি দলের মধ্যে যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই মাঠে সে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। দক্ষিণ-আফ্রিকার গরমের সহিত সংগতি রাখিবার জন্য সে হাতের উলটা পিঠ দিয়া শক্ত আলের উপরকার উত্তাপ অনুভব করে। মনে মনে ভাবে, আফ্রিকার মরুভূমির বালিও এমনি গরম। বাবার কাছে গল্প শুনিয়া সে লক্ষ্য করিয়াছে, যাবতীয় রোমাঞ্চকর ঘটনা আফ্রিকাতেই ঘটিয়া থাকে। আফ্রিকা তাহার কাছে রহস্যের দেশ। বড় হইলে সে আফ্রিকায় যাইবে, বাওবাব গাছ (বাবার কাছে নাম শুনিয়াছে) দেখিবে।

সূর্য দিগন্তরেখা স্পর্শ করিয়াছে। কাজল তাকাইয়া দেখিল মস্ত লাল সূর্যটা আস্তে আস্তে দিগন্তের নিচে নামিয়া পড়িতেছে। ততক্ষণে একটু ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়িয়াছে। আলের পাশে ছোট ছোট ঝোপের মধ্য দিয়া হালকা শব্দ তুলিয়া হাওয়া বহিতেছে। কেহ কোথাও নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, উদার বিশাল মাঠ পড়িয়া আছে। বিকালে কেমন-একটা ছায়া-ছায়া ভাব নামিতেছে। বাতাসের অদ্ভুত শব্দ। এর মধ্যে একলা দাঁড়াইয়া থাকিবার যে একটা ভয়মিশ্রিত আনন্দ আছে, তাহা কাজলকে অভিভূত করে। ঠিক ভয় নহে, একটা অচেনা অনুভূতি। এই সময় দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে বাড়ি হইতে দূরে মাঠের ভিতর পৃথিবীটাকে যেন অচেনা বোধ হয়।

ফিরিবে বলিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই কাজলের সেই লোকের সহিত দেখা

হইয়া গেল। মানুষটার হাতে খঞ্জনী, পরনে আটহাতি খাটো মোটা ধুতি। নাকে রসকলি, বগলে ছাতা—তাপ্পি মারা, কাঁধে ঝুলি। আপন মনে আসিতেছিল, সামনে কাজলকে দেখিয়া খঞ্জনীটা দ্রুতলয়ে একবার বাজাইয়া দিল।

কাজল প্রথমে ভয় পাইয়াছিল। পরে লোকটার চোখের দিকে তাকাইয়া বুঝিল, এ চোখ যাহার তাহাকে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

লোকটা হাসিয়া বলিল—বেড়ান বাবাজী? ভালো, বেড়ানো ভালো। বেড়ালে মানুষের চোখ ফোটে—তাঁর দুনিয়াটার রূপ দেখতে পায় মানুষ—

—কার দুনিয়া?

লোকটা আর একবাব দ্রত খঞ্জনী বাজাইয়া ওপরে আকাশের দিকে দেখাইয়া বলিল—ওই ওখানে যিনি থাকেন, তাঁব। সবই তো তাঁর বাবাজি।

সম্পূর্ণ টা না পারিলেও, কাজল লোকটার কথার খানিকটা অর্থ ধরিতে পারিল। বেশ কথা বলে মানুষটি। কাজল বলিল—তুমি বুঝি অনেক বেড়িয়েচ?

লোকটা মৃদু হাসিল।

—বেড়ানো আর হলো কোথায়? অকাজেই বড্ড বেলা হয়ে গেল। হ্যাঁ কিছু কিছু ঘুরেছি বাবাজি। বেশীর ভাগটাই না-দেখা রইল।

খঞ্জনী বাজাইয়া ভাঙা বেসুরো গলায় দু'কলি গান গাহিল—

ও মন তুই পোড়া সুখে রইলি ভুলে
যখন তোর মনের পদ্ম উঠল দুলে
প্রভুর পদপরশনে—

কাজল লোকটাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। সুন্দর মানুষ! গান গাহিতে পাবে—গল্প করিতে পারে, আর কি চাই? বলিল—তোমার কি তাড়াতাড়ি আছে? এইখানটায় বসে আমার সঙ্গে একটু গল্প করে যাও না। লোকটা ছাতাটা আলের গায়ে হেলান দিয়া রাখিয়া বসিল।

—তুমি যদি থাকতে বলো, তবে আমার কোন তাড়া নেই।

অনেক গল্প হইল লোকটার সহিত। লোকটা সুন্দর গল্প করিতে জানে। সাধারণ ঘটনাও তাহার বলিবার গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়া ওঠে। একটি মেয়ের বাপের বাড়ীর গাঁয়ে সে ভিক্ষা করিতে যাইত, মেয়েটির বিবাহের পর তাহাব শ্বশুর বাড়ীর গাঁয়েও ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল—না জানিয়াই। শ্বশুরবাড়ীতে ভিক্ষা চাহিয়া দাঁড়াইতে বাপের বাড়ির চেনা বলিয়া মেয়েটি তাহাকে অনেক কথা লুকাইয়া বলিয়াছে। ইহাতে লোকটা খুব খুশি।

—জগতে কেউ কারুর নয় বাব্যজি। আপন মনে করলেই আপন, পর ভাবলেই পর।

গল্প শেষ হইলে সে ঝুলির ভিতর হইতে একটি পাকা আম বাহির করিল—তুমি এটা নাও খোকন। বাড়ি গিয়ে খেয়ো।

—না, তোমার জিনিস কেন নেবো ?

—আমার আর কই ? এটা তোমারই, আমি তোমাকে দিচ্ছি।

—নিশ্চিন্দপুর এই তো, কাছেই। একদিন যেও না আমাদের বাড়ি।

—যাব, নিশ্চয় যাব।

খঞ্জনীতে আওয়াজ তুলিয়া গুনগুন করিতে করিতে সে বিদায় লইল। দুই পা হাঁটিয়াই কাজল তাহাকে ডাকিল—তোমার নাম তো বলে গেলে না ?

সে ফিরিয়া বলিল—আমার নাম রামদাস বোষ্টম। স্বল্প আলাপেই রামদাস কাজলের মনে গভীর ছাপ রাখিয়া গেল। কেমন সুন্দর জীবন, একা একা বেড়ায় মাঠে-ঘাটে, ঘরবাড়ির ঠিক নাই। কোন বন্ধন নাই—পিছটান নাই। আবার পিছুটান নাই বলিয়া দুঃখও নাই। খোলা আকাশের নিচে একা খঞ্জনী বাজাইয়া ফেরে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কাজল বাড়ির পথ ধরিল।

বিকালে নদীতে স্নান করিতে যাইবার কথা ছিল। অপু আর হৈমন্তী গল্প করিতে করিতে অনেক দেরী করিয়া ফেলিল।

হঠাৎ খেয়াল হইতে অপু ধড়মড় করিয়া মাদুরের উপর উঠিয়া বসিল—ঐ যাঃ এ যে প্রায় অন্ধকার হয়ে এল, চল, চল, আর কথা নয়। দু'খানা গামছা, তোমার শাড়ী, আমার ধুতি, আর শিশিতে একটু তেল নাও—ওবেলা মাথায় দিতে ভুলে গেছি একেবারে। ঘাটে মেখে নেব।

তাড়াতাড়ি গোছগাছ করিয়া বাহির হইতে আরও পনেরো মিনিট দেরী হইল। হৈমন্তী জিজ্ঞাসা করিল—কাজল এল না যে ?

—রাণুদির ওখানে আছে, সন্ধ্যে উতরে গেলে রাণুদিই দিয়ে যাবে'খন।

অন্ধকার নামিতেছে। নদীর পথে ঝোপে-ঝাড়ে বেশ অন্ধকার ঘনাইয়াছে। বাগান দিয়া যাইবার সময় একটা কি জন্তু ঝরাপাতার উপর দিয়া খড় খড় শব্দ করিয়া দূরে সরিয়া গেল। হৈমন্তী বলিল—ও কি গো ?

—ভয় পেয়েছ ? কিছু না, শেয়াল-টেয়াল হবে হয়তো কিংবা বেজী।

—সুন্দর লাগছে কিন্তু, না ? শহরে এ সময় গোলমাল, গাড়ীর ভেঁপু, মানুষের ভিড়। তার চেয়ে এই ভাল। মনের শান্তির চেয়ে বড় জিনিস নেই।

—তুমি যে একেবারে নাটুকে কথাবার্তা বলতে শুরু করলে।

—না গো, এ আমার মনের কথা। আমি এই চেয়েছিলাম। শহর আমার ভাল লাগে না। যখনই তোমার লেখা প্রথম পড়েছি, মনে হয়েছে—

—কি মনে হয়েছে ?

হৈমন্তী অপুর দিকে তাকাইল। —না, সে আমার বলতে লজ্জা করে।

—আহা বলোই না। আদ্দেকটা যখন বললে—

—প্রথম তোমার লেখা পড়েই মনে হয়েছিল—এ মানুষটার সঙ্গে আমার খুব মিল থাবে। প্রকৃতি যে এত ভালবাসে—

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া হাঁটিল। বেশ কেমন সন্ধ্যায় নদীতে স্নান করিতে যাওয়া বনপথ দিয়া। এইসব শান্তি ছাড়িয়া সে কিসের অন্বেষণে ঘুরিতেছিল সমুদ্রপারে ?

বাঁশবাগানেব মধ্যে হৈমন্তী হঠাৎ থামিয়া গেল। চারিদিকে তাকাইয়া বলিল—শোনো।

—কি ?

—একটা মজার ব্যাপার হয়েছে।

—তোমার তো দেখি দুপুর থেকে খালি মজার ব্যাপারই ঘটছে। কি ব্যাপার ?

—মালতীনগর থেকে আসবাব আগে পত্রিকায় একটা গল্প দিয়ে এসেছি না ? সেই গল্পে বাঁশবাগানের বর্ণনা আছে। মনে মনে একটা বাঁশঝাড়ের কল্পনা করে লিখেছিলাম। হঠাৎ এখানটায় দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখে মনে হচ্ছে অবিকল যেন আমার কল্পনার সেই বাগানটা। কেমন আশ্চর্য না ?

অপুর বেশ ভাল লাগিল ঘটনাটা। হৈমন্তী এ গ্রামের বউ হইয়া আসিবে, ইহা যেন ভগবানই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। নিজের অতীত জীবনটা এই আনন্দের মুহূর্তে গোটানো মানচিত্রের মত চোখের সামনে খুলিয়া গেল। বহু কষ্ট গিয়াছে, জীবনযুদ্ধে বহু রণক্ষেত্রের সে সৈনিক। এখন পুরস্কারের দিন—সার্থকতার দিন।

অন্ধকার ঝোপে-ঝোপে কীটপতঙ্গের ঐকতান শুরু হইয়াছে। বাতাসে দিনশেষেব আমেজ আর একটা বন্য গন্ধ।

অপু বলিল—নাও, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল। সন্ধ্যে উতরে গেল—

এক-একদিন রাত্রিতে চাঁদ থাকিলে মাদুর পাতিয়া তারা বারান্দায় শোয়। বাবার পাশে মাদুরে শুইয়া কাজল চাঁদ-নক্ষত্র আকাশ-পৃথিবী সম্বন্ধীয় অজস্র বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করিতে থাকে। অপুকে তাহার উত্তর দিতে হয়। অপু মাঝে মাঝে কাজলকে বিশ্বসাহিত্যের গল্প শোনায়—কাজল মনোযোগ দিয়া শোনে। বেশী রাত হইলে অপু ভাবে কাজল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে গল্প

থামাইয়া বলে—কি রে, ঘুম পেয়েছে?

অমনি কাজল বলে, বাবা, আমার ঘুম পায়নি। থামলে কেন? বলো—অপুকে গল্প চালাইতে হয়। এইভাবে কিছুদিনের মধ্যেই কাজল বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি গল্প শুনিয়া ফেলিল। একদিন অপু কাজলকে ডাকিয়া বলিল নে, চল। কাল আমার সঙ্গে কোলকাতা চল। যাদুঘর যাবি বলছিলি, কাল যাদুঘর দেখাব'খন। আমারও এমনি কাজ আছে কয়েকটা—সেই সঙ্গে সেরে ফেলব।

পরদিন সকালে অপু ছেলেকে লইয়া কলিকাতা রওনা দিল। কাজল একটা ঘিয়ে-রঙের হাফপ্যান্ট আর সাদা সার্ট পরিয়াছে। হৈমন্তী চুল আঁচড়াইয়া দিয়াছে পরিপাটি করিয়া। যাইবার সময় অপুকে বলিয়া দিয়াছে—ওকে ভাল করে দেখেশুনে নিয়ে যাবে। যা তুই—

কাজল অনেকদিন বাদে কলিকাতা আসিল। আবার সেই বড় বড় বাড়ি, লোকজন, হৈ-চৈ, রাস্তায় গাড়ীর ভেঁপু, ট্রামের ঘণ্টা। সব মিলিয়া জিনিসটি মন্দ লাগে না। বাবা তাহাকে বলিয়াছে বড় হইলে তাহাকে কলিকাতার কলেজে পড়াইবে। কলিকাতার বড় বড় কলেজের গল্প বাবা তাহার নিকট করিয়াছে, সেখানে লাইব্রেরীতে কত বই আছে—তাহা নাকি গণিয়া শেষ করা যায় না। এ সমস্ত বই সে পড়িবে।

অপুর কাজ ছিল বিকালে। খুব সকালে রওনা হওয়ায় তাহারা বেশী বেলা হইবার আগেই কলিকাতা পৌছিয়াছিল। ট্রামে করিয়া অপু এসপ্লানেডে আসিয়া নামিয়া বলিল—এইটুকু চল হেটে যাই। কেমন দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে।

যাদুঘরে ঢুকিতেই কাজলের সেই অদ্ভুত ভাবটা হইল—যাহা সে কিছুতেই কাহাকেও বুঝাইয়া উঠিতে পারে না। মাথার মধ্যে কেমন একটা ঝিম-ঝিম ভাব। যাদুঘরের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, তাহা কাজলকে পুরানো দিনের কথা মনে করাইয়া দেয়। নিজের জীবনের কথা নহে, বাবার কাছে শোনা ইতিহাসের কথা—মানব-সৃষ্টির আগেকার পৃথিবীর কথা। সমস্ত আবেদনটা সে ঠিক ধরিতে পারে না। কিন্তু তাহার মনে হয়, এই জীবনের বাহিরে আর একটা বৃহত্তর জীবন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে।

সারাদিন ভারী আনন্দে কাটিল। প্রাচীন স্তূপ হইতে গুহামানবের মাথার খুলি পর্য্যন্ত সব-কিছুই কাজলের কাছে সমান আকর্ষণীয়। প্রাচীন জীবজন্তুর কঙ্কালগুলি যে ঘরে আছে, সে ঘর ছাড়িয়া কাজল আর নড়িতে চায় না! উল্কাপিণ্ডটার সামনে দাঁড়াইয়া উত্তেজনায় তাহার চোখ কোটর হইতে বাহির

হইয়া পড়ে আর কি! ফসিলের ঘরে সে অপুকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি যে বলেছিলে পলিমাটিতে তারামাছের ফসিল আছে, সে কই বাবা?

এ সমস্ত অত্যন্ত পক্কতার লক্ষণ সন্দেহ নাই—অপু কাজলকে এইভাবেই মানুষ করিয়াছিল। এই বয়সে অন্যরা যাদুঘর গিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চতুর্দিক একবার দেখিয়া আসে মাত্র। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিয়া পা ব্যথা করিয়া বেতের ঝুড়িতে-আনা জলখাবার খাইয়া মা-বাবার সহিত বাড়ী ফিরিয়া যায়। কিন্তু কাজল বুঝিতে চায়, কাজল অনুভব করে।

বিকালে যাদুঘর বন্ধ হইবার সময় অপু বলিল—চল, এবার আমার কাজটা সেরে আসি। বই-এর দোকানের দিকে যেতে হবে।

পাবলিশারের কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল। দোকানে ঢুকিতেই মালিক হাসিয়া বলিল—আসুন অপূর্ববাবু, বসুন। এবার তো অনেক দিন বাদে এলেন। আপনার ও-বইটার স্টক প্রায় শেষ। নতুন এডিশন সম্বন্ধে একটু কথাবার্তা বলে নিতে হয়। এটি কে? ছেলে? বাঃ, বেশ বেশ।

অপুর এ সব আজ ভাল লাগিতেছিল না। সকালে খুব আনন্দ করিয়া বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুপুরের পর হইতেই শরীরটা ভাল বোধ হইতেছিল না। বুকের কাছটায় কেমন একটা ব্যথা-ব্যথা ভাব। এখন আবার নতুন এডিশন সম্বন্ধে বাক্যালাপের ঝামেলা আসিয়া জুটিল।

সমস্ত কথা মিটিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগিল। অপুর মাথা ঘুরিতেছিল। বুকের যন্ত্রণাটাও বেশ বাড়িয়াছে। কেন যে হঠাৎ এমন হইল, বোঝা যাইতেছে না। শরীর লইয়া পূর্বে সে কখনো চিন্তায় পড়ে নাই। দোকান হইতে বাহির হইয়া সে কাজলের হাত ধরিয়া রাস্তা পার হইবার জন্য ফুটপাথ হইতে পিচের রাস্তায় নামিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা যেন তাহার পায়ের নিচু হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল হু-হু করিয়া। সে যতই পা নামাইতেছে, পা আর রাস্তায় ঠেকিতেছে না। ফুটপাত হইতে রাস্তা এত নিচু? পরক্ষণেই বুকের বেদনাটা বাড়িয়া উঠিল। মাটিতে পড়িতে পড়িতে সে হাত বাড়াইয়া কাজলকে ধরিতে গেল। কাজল যেন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ধরা যাইতেছে না। সব দূরে সরিয়া গিয়াছে। সে একটা অন্ধকার অতল গহ্বরের মধ্যে পড়িতেছে।

প্রকাশক ভদ্রলোক দোকান হইতে ছুটিয়া আসিলেন, রাস্তায় লোক জমা হইয়া গেল। কাজলের হাত-পা কেমন ঝিমঝিম করিতেছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সে হতবুদ্ধি হইয়া সাহায্যকারীদের মুখের দিকে কয়েকবার তাকাইয়া দেখিল মাত্র। বাবা পড়িয়া গিয়াছে—ব্যাপারটা তাহার বিশ্বাস

হইতেছিল না। তাহার কাছে বাবা সর্বশক্তিমান, বাবার ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। বাবাকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়া কাজলের সমস্ত হৃদয় আতঙ্কে সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। অপুকে উহারা ধরাধরি করিয়া দোকানের ভিতর তুলিয়া আনিল। কাজলকে কেহ ডাকিল না। সে নিজেই আস্তে আস্তে হাঁটিয়া সবার পিছন পিছন দোকানে ঢুকিয়া দেখিল, তাহার বাবাকে একটা বেঞ্চির উপর শোয়াইয়া জলের ছিটা দিয়া বাতাস করা হইতেছে। কাঠের একটা টেবিলে হেলান দিয়া সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, বাবার কিছুই হয় নাই—ঘটনাটা একটা দুঃস্বপ্ন। স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়া এখনই দেখিবে সে বাবার পাশে শুইয়া আছে, গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মিনিট কুড়ি বাদে অপু তাকাইল। সে চিত হইয়া শুইয়া আছে, ওপরে যেন কালো কড়িকাঠ, চারপাশে লোকের কণ্ঠস্বর। বুকে কাহারা একটা ওজন চাপাইয়া দিয়াছে যেন। এটা কোন জায়গা? সে এখানে শুইয়া কেন?

একটু বাদেই সমস্ত কিছু মনে পড়িতে সে আচ্ছন্নের মতো হাত বাড়াইয়া বলিল—খোকা কোথায় গেল? খোকা?

কলিকাতার সেদিনকার সেই ঘটনার পর হইতেই অপুর শরীর খুব ভাল যাইতেছে না। কলিকাতার ভালো স্পেশালিস্ট দেখাইয়াছে। ডাক্তার বলিতেছে, ব্লাডপ্রেসার আছে, কিডনীও ভাল কাজ করিতেছে না। খাওয়ার ব্যাপারে নজর রাখিতে হইবে। লবণ কম খাইতে বলিয়াছে। অপু হাসিয়া বলিয়াছিল—এই বয়সে প্রেসার হয়? বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল, খুব-একটা কম বয়স তাহার নয়, দেখিতে দেখিতে বয়স বেশ বাড়িয়াছে।

ডাক্তার বলিলেন—সাধারণতঃ এই বয়সে প্রেসার হয় না। আমার মনে হয়, কিডনীর জন্যে এরকম হচ্ছে। কতকগুলো ওষুধ দিলাম, খেয়ে দেখুন কেমন থাকেন।

ঔষধ খাইয়া অপু বিশেষ উপকার বোধ করিল না। মাঝে মাঝে শরীর খারাপ লাগে, সে আমল দেয় না। হৈমন্তীর কড়া পাহারার জন্য নিয়মের হেরফের হইতে পারে না, খাওয়া শোওয়া ইত্যাদি বাঁধা সময়ে করিতে হয়। অপুর স্বাস্থ্যের জন্য হৈমন্তী বড় উদ্বিগ্ন—সে কোথাও বাহির হইলে না-ফেরা পর্যন্ত হৈমন্তী ঘর-বাহির করে। দেরী হইলে কাজলকে বলে—দেখ তো খোকা একটু এগিয়ে কাঁঠালতলার কাছে, তোর বাবা এল নাকি—

অপু বেশীক্ষণ ঘরে থাকিতে পারে না। তাহার ছেলেবেলা যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। বিকালে রৌদ্র পড়িতে না পড়িতে ছেলেকে লইয়া

বাহির হইয়া পড়ে। মাঠে-ঘাটে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা উতরাইয়া যায়। কোনদিন একাই বেড়াইতে যায়। বিকালগুলি তাহার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত। কোন কারণেই একটা বিকাল সে কাহাকেও দিয়া দিতে পারে না।

অসুখ হইবার পর হইতেই অপুর কেমন একটা ভাব হইয়াছে। প্রায়ই সে বিষণ্ণ মুখে কি যেন ভাবে। প্রকাশকদের নিকট পাওনা টাকার আগে সে হিসাব রাখিত না, এখন বড় একটা খাতা বানাইয়াছে। তাহাতে টাকাকড়ির কথা লিখিয়া রাখে। নিশ্চিন্দিপুরের হৈমন্তীর নামে কিছু জমি কিনিয়াছে, নূতন উপন্যাসখানির টাকা দিয়া হৈমন্তীকে গহনা গড়াইয়া দিয়াছে। হৈমন্তী একদিন চটিয়া বলিল—এ সব শুরু করলে কি! নবাব-বাদশা হয়েছ নাকি? রাজ্যের জমি-জমা, গয়না-পত্তর—এসব তোমার কাছে আমি কবে চেয়েছিলাম?

—তুমি চাও নি হৈমন্তী, আমি দিচ্ছি।

হৈমন্তীর ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল। —কেন দিচ্ছ? আমি এ সব চাই না।

—এ সবে তোমার প্রয়োজন নেই, আমি জানি। কিন্তু কাজলের তো ভবিষ্যৎ আছে। প্রথম জীবনটা যেন ওকে কষ্ট করতে না হয়। তারপর চাকরি-বাকরি করলে ও-ই তোমার ভার নেবে। অন্ততঃ ততদিন—

হৈমন্তীর চোখে কিসের একটা ঝলক খেলিয়া গেল। সে অপুর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—আমার ভার! শুধু আমার ভার? কেন, তুমি—তোমার ভার নেবে না? বলো?

অপু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল—হ্যাঁ, আমার ভারও নেবে বই কি।

তারপরই সে হাসিয়া ব্যাপারটা লঘু করিতে গেল বটে, কিন্তু নিজেই বুঝিল হাসিবার জন্য তাহাকে চেষ্টা করিতে হইতেছে।

গম্ভীর হইয়া থাকে সে। মন তা বলিয়া খুব খারাপ নহে। কেমন একটা আনন্দে সে বুঁদ হইয়া অস্তিত্বকে উপভোগ করে। শতকোটি নক্ষত্র এবং নীহারিকার ভিতর নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করিবার তীব্র আনন্দ অন্য সমস্ত-কিছুকে তুচ্ছ করিতে শিখাইয়াছে। মৃত্যুকে সে ভয় করে না। কারণ মৃত্যুর আগেই সে জানিতে পারিয়াছে, জীবন কাহাকে বলে। জীবনকে যে জানিতে পারিয়াছে—মৃত্যুকে তাহার ভয় কি?

আকাশটা দুপুরে ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলে, বিকালের দিকে স্নিগ্ধ হইয়া আসে। সন্ধ্যায় বাতাসে দিনশেষের সুর বাজে। অন্ধকার ঘন হইলে অপু নদীর ধারে ঘাসে-ছাওয়া ঢালু জমিতে শুইয়া দেখে আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহার ছোটবেলায় যেমন উঠিত। এ সময়টা সে নৌকায়

করিয়া নদীর উপর বেড়াইতো। ছোটবেলাটা কতদূর চলিয়া গিয়াছে !

মনে কোন দুঃখ নাই, কেমন উদার আনন্দ। পাড়ের নীচে নদীর বহিয়া যাইবার সহজ ভঙ্গির মত আনন্দ।

নদীর ওপারে দিগন্তের উপর উল্কাপাত হইল। রূপালী আগুনের তীব্র শিখা সন্ধ্যা-আকাশে একটা উজ্জ্বল সরলরেখা টানিয়া দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অপুর মনে সুদূরের চিন্তা জাগিয়া উঠিল। উল্কাটি এক বিশাল বিশ্বের দূত—মহা-জগতের সংবাদবাহক। তাহার মনটা হঠাৎ বড হইয়া, ব্যাপ্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে যেন সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া গেল।

কাজল — পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অপু ডাক্তার দেখাইতে গিয়াছিল। ডাক্তারবাবু চশমাটা নাকের উপর ঠিক ভাবে আঁটিয়া লইয়া বলিলেন—আসল কথা এই, বাংলাদেশের হিউমিড আবহাওয়া আপনার স্যুট করছে না। আপনি কিছুদিন বাংলার বাইরে থেকে দেখুন তো। মনে হয়, একটু সুস্থ হবেন।

কথাটা অপুর বেশ মনে ধরিল। মধ্যপ্রদেশে সে যে কয়েক বৎসর কাটাইয়াছে, সে সময় তাহার অসুখবিসুখ তেমন কিছু হয় নাই। প্রচণ্ড উল্লাসে হৈ হৈ করিয়া প্রায় একটা বন্য-জীবনযাপন করিয়াছে। বিহারের দিকে কোথাও গিয়া থাকিলে মন্দ হয় না।

রাত্রে শুইয়া একদিন সে হৈমন্তীর সঙ্গে পরামর্শ করিল। হৈমন্তী কিছুটা অবাক হইয়া বলিল—নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে চলে যাবে। অন্য কোথাও হয়ত ভাল লাগবে তোমার ?

—একেবারে যাব না হৈমন্তী। আমাদের গাঁ ছেড়ে পৃথিবীতে কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না। এ বাড়িও রইল, ইচ্ছে হলেই চলে আসব।

আসল কথা, অপুর রক্তে ভবঘুরেমি আবার জাগিয়া উঠিতেছে। স্থবিরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেছে—অসুখের জন্যই সে যাইতেছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এক জায়গায় সমস্ত জীবন কাটানো তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এ তাহার পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাঁহাদের ভবঘুরে রক্ত তাহাকেও স্থির থাকিতে দিতেছে না। সে যাইবে, আমৃত্যু সে পৃথিবীর ধূলিতে পা ডুবাইয়া হাঁটিবে।

সামান্য সময়ের ভিতরেই অপু কিছু টাকা যোগাড় করিয়া ফেলিল।

সবাই তাহাকে অগ্রিম টাকা দেয়, তাহার বই পাইবার জন্য হাঁটাহাটি করে। সকাল দুপুরে বিকালে প্রচুর চিঠি আসে—পাঠকেরা মুগ্ধ হইয়া লিখিতেছে। অপু সবার চিঠির উত্তর দেয়, সামান্য একলাইনে লিখিলেও। প্রত্যেককে দীর্ঘ চিঠি দেওয়া সম্ভব নহে।

জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আর কি প্রত্যাশা করিবার আছে? সে অর্থ পাইতেছে এবং নাম করিয়াছে এটাই বড কথা নহে—সে দু-চোখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া জগৎটা দেখিয়া লইয়াছে। আরও দেখিবে। সে থামিবে না। গার্হস্থ্য তাহার কপালে লেখা নাই।

টাকা আনিতে পাবলিশারের কাছে গিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিল—আপনার সন্ধানে কোন ভাল জায়গা আছে বিহারের দিকে? ভাবছি কিছুদিন ওদিকে থাকবো—

প্রকাশক হাসিয়া বলিলেন—আপনার ঘোরা বাতিকটা আর গেল না। হ্যাঁ, জায়গার খোঁজ দিতে পারি। অল্প কয়েকদিন থাকবেন, না—

—ভাবছি একটা ছোটমতো বাড়ি পেলে কিনে নিতাম।

অপুকে তিনি একটি জায়গার কথা বলিলেন, কলিকাতা হইতে খুব দূরে নহে, জামসেদপুরের কাছাকাছি। হাওড়া হইতে ট্রেনে মাত্র ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। পাহাড়ী এলাকা—অপুর বেশ ভাল লাগিবে, তিনি বারবার একথা বলিতে লাগিলেন।

—জঙ্গল আছে? প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন?

—খুব ভালো। সে আপনি নিজের চোখে দেখবেন। আপনাকে তো চিনি। ভাল না হলে আমি আপনার কাছে ও-জায়গার নাম করি কখনো!

অপু আরও দু'পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করিল। অনেকেই বিশেষ কোন খবর দিতে পারিল না। কেবল দুইজন লোক, যাদের কথার অপু মূল্য দেয়, জায়গাটার সম্বন্ধে প্রশংসা করিল।

প্রকাশকই খোঁজ করিয়া একটা বাড়ি বাহির করিলেন এবং অপু বিশেষ দেরী না করিয়া বাড়িটা কিনিয়া ফেলিল। কিনিবার জন্য সে নিজে যায় নাই, বাড়ীর ছবি দেখিয়াছিল মাত্র। টালির ছাদওয়ালা ছোট সুন্দর বাড়ী। পাশে দুইটা ইউক্যালিপটাস গাছ পাশাপাশি যমজ ভাইয়ের মতো উঠিয়াছে। বহু পিছনে একটা পাহাড় দেখা যায়। ছবিতে বেশ একটা রহস্যের ভাব ফুটিয়াছিল—বিশেষতঃ পিছনের পাহাড়টা অপুকে আকর্ষণ করিল। ছবিটা প্রকাশককে ফেরত দিয়া সে বলিল—আমি আর দেখতে যাবো না। আপনার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করেই কিনছি। আপনি লোক পাঠিয়ে দিন টাকা সঙ্গে দিয়ে। দলিল-

পত্রে আমি একেবারে গিয়ে সই করব।

রাত্রে শুইয়া অপু বলিল—খোকা, তুই পাহাড় তো দেখিস নি? এবার দেখবি'খন।

কাজল পাহাড় দেখে নাই। বাবার কাছে শুইয়া সে মনে মনে জিনিসটা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করে। চড়কতলার ডাইনে যে মাটির উঁচু ঢিবিটা আছে, অনেকটা সেইরূপ কি?

—সেখানে নদী নেই বাবা?

—আছে, নাম কি জানিস?

—কি বাবা?

—সুবর্ণরেখা।

নামটা তাহার পচ্ছন্দ হয়। সুবর্ণরেখা। এক-নিশ্বাসে বলিবার মতো নাম। সাই করিয়া একবার তলোয়ার ঘুরাইবার মতো। কত নূতন জিনিস সে দেখিবে—পাহাড, শালবন, সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা মিষ্টি নাম, সুন্দর নাম।

সুবর্ণরেখা—সু-ব-র্ণ রেখা—নামটা কাজলকে ঘুম পাড়াইয়া ফেলে।

কাজল ঘুমাইলে অপু বলিল—ঠিক বুঝতে পারছিনে হৈমন্তী, কাজটা ভাল হল কিনা। সবে এসে নিশ্চিন্দিপুরে বসতে না বসতেই আবার রওনা দেওয়া—অবশ্য ডাক্তার বলল যেতে, তবু—

হৈমন্তী একটু ভাবিয়া বলিল—না, চলো কিছুদিন থেকেই দেখি তোমার শরীরটা সারে কিনা। এই ভালো, এ জায়গায় না থেকে, বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। ও-রকম শেকড় গেড়ে সংসার গড়তে আমিও ভালবাসিনে।

—আচ্ছা, তোমার পাহাডী দেশ ভাল লাগে, না আমাদের এই পাড়াগাঁ ভাল লাগে।

—দুই-ই। এক-এক দেশের এক-এক রকম সৌন্দয—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অপু বলিল—তুমি তো সমুদ্র দেখনি, না?

—না। কি করে দেখবো বল? বরাবরই তো বাবার সঙ্গে ঘুরেছি। সমুদ্রের কাছাকাছি বাবা কখনও বদলি হননি।

—যাবে?

হৈমন্তী বিছানায় উঠিয়া বসিল। —সত্যি বলছো? কবে নিয়ে যাবে?

—চলো দু'এক দিনের মধ্যেই। কোথায় যাবে?

হৈমন্তী চিন্তা করিয়া বলিল—তুমি বলো।

—পুরী যাবে?

পুরী যাওয়াই ঠিক হইল। কাজলের কিছুদিন বাদেই পরীক্ষা। সে রাণীর

কাছে থাকিবে। অপুরা কাজলের পরীক্ষার আগেই ফিরিবে। রাণীর কাছে থাকিতে কাজলের কোন অসুবিধা নাই। কাজল সঙ্গে যাইবে বলিয়া অবশ্য অনেক হাত-পা ছুড়িয়াছিল, এবং অপু রাজিও হইয়াছিল। কিন্তু রাণী আসিয়া বলিল—তোরা যাচ্ছিস, যা। এ ছেলেটার সামনে পরীক্ষা। এটাকে আবার সঙ্গে টানছিস কেন! ও আমার কাছে থাকুক, দুবেলা পড়াতে বসাব এখন। তোরা একা যা—

কাজল রাণীর কাছে থাকিয়া গেল। অবশ্য অপুকে বারবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইল যে, পরীক্ষার পরেই কাজলকে লইয়া সে পুরী যাইবে।

অপু হাসিয়া হৈমন্তীকে বলিতেছিল—আমাকে কোথাও একদণ্ড তিষ্ঠোতে দিচ্চে না, বুঝলে? দুই জায়গায় তো সংসার পেতে ফেললাম, তাতেও দেখচি খালি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করচে। বেশীক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকলে মন কেমন হাঁপিয়ে ওঠে, জানো?

তোমার তো ওই রকমই। খালি বেড়ানো, খালি ঘুরে বেড়ানো। এখন তোমার যাযাবর বৃত্তি একটু বন্ধ রাখতে হবে, নইলে ছেলেটার পড়াশোনা আর কিছু হবে ভেবেছ?

—হবে, হবে। সে কি আমি ভাবি নি মনে করেচো? কাজল এতে ভাল করে মানুষ হয়ে উঠচে। পড়াশুনায় ওর ঝোঁক বড় বেশী, সবসময় বই মুখ করে বসে আছে। নতুন বাড়ীতে গিয়ে ওকে ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।

হৈমন্তী বলিল—আচ্ছা, সমুদ্রে স্নান করা যাবে তো? নাকি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ঢেউয়ের টানে?

—তা কেন, কত লোক চান করচে দেখবে। সবাইকে কি জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? তা ছাড়া নুলিয়া আছে—

—নুলিয়া কখনো ডোবে না, না?

অপু হাসিয়া বলিল—তুমি ছেলেমানুষ হৈমন্তী। একেবারে বাচ্চাদের মতো প্রশ্ন করছো। এই জন্যেই তোমাকে এত ভাল লাগে।

—আর তুমি খুব বড় হয়ে গেছ, না?

—হয়েছিই তো।

—উঃ, একেবারে তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপু বলিল—কাপড়চোপড় গুছিয়ে নাও, শীগগিরই রওনা দেবো।

অপু আর হৈমন্তী পুরী যাইবার দিন চারেক পর নিশ্চিন্দিপুরে একদিন

বৃষ্টি নামিল। রাস্তার ধূলা নিমেষের মধ্যে কাদায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। গ্রামের ভিতরের সমস্ত রাস্তা কাদায় ভর্তি, বালকের দল সেখানে আছাড় খাইতে লাগিল। বড় বড় আম কাঁঠাল গাছ হইতে টুপটাপ করিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে নিচের কচুবনের উপর। বৃষ্টি এক-একবার ধরিয়া আসে কিন্তু উঁচু গাছ হইতে জল পড়া থামে না।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে কাজলের বড় মন কেমন করে। কেন করে, তাহা সে বোঝে না। ঘন মেঘে আকাশ কালো, গুম গুম করিয়া মেঘ ডাকিতেছে, ঝুপ ঝুপ করিয়া অবিরাম বৃষ্টির শব্দ। কেমন একটা মন-খারাপ-করা চাপা আলো চারিদিকে—এই আলো কাজলকে উদাস করে।

রাণুপিসিদের উত্তরের জানলায় বসিয়া সে দেখে, বাহিরে অন্ধকার ক্রমশ ঘন হইতেছে, দুপুরটা সন্ধ্যাবেলার মত দেখাইতেছে! রাণী বৃষ্টিতে তাহাকে বাহির হইতে দেয় নাই। জানলায় বসিয়া সে দেখিল, চনু একটা পুঁটিমাছ-ধরা ছিপ আর একটা চটের থলে হাতে কোথায় যাইতেছে।

কাজল তাহাকে ডাকিয়া বলিল—কোথায় যাচ্ছিস রে?

—মাছ ধরতে।

—কোথায়? নদীতে?

—দূর! নদীর পথে বেজায় কাদা। বামনপুকুরে যাবো। যাবি?

কাজল মাথা নাড়িল।

—যাবি না?

—না।

—কেন রে, জ্বর হয়েছে?

—না।

—তবে?

—ইচ্ছে করছে না যেতে। তুই ধরগে যা মাছ।

ইচ্ছা খুবই করিতেছে। কিন্তু পিসি ঘরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে—এ কথা বলিলে চনুর কাছে দর কমিয়া যায়। চনুর মা-বাবা চনুকে কেমন ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহার বেলা সবার যত কড়াকড়ি।

একটু পরে রাণী ঘরে ঢুকিলে সে বলিল—চনু কেমন মাছ ধরতে গেল এই একটু আগে। ওকে তো বেশ ছেড়ে দিয়েছে, আমাকে তুমি একটু বেরুতে দাও না কোথাও···

—দিই না তো বেশ করি। ও সব হাভাতে ছোঁড়ারা তো ঘুরবেই—

অনুমতি মিলিল না। অতঃপর জানলায় বসিয়া শিকে গাল রাখিয়া

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাহিরে তাকাইয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই।

বাহিরে জল জমিয়াছে। একটা চড়ুই পাখি হঠাৎ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া রাস্তার ধারের জমা জলে স্নান করিতে লাগিল। মাথা ডুবাইয়া জল তুলিয়া গায় দেয়, কখনো সমস্ত শরীরটা ডুবাইয়া দেয় জলে। বৃষ্টি হওয়ায় মহাস্ফূর্তি—এদিকে ওদিকে অনেক পাখী ঝোপেঝাড়ে কিচমিচ করিতেছে। ভয়ানক গরম পড়িয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইয়া সবাই খুশী। একটা শেয়াল সামনের বাগানটা পার হইতে গিয়া একেবারে রাণুপিসিদের উঠানে আসিয়া পড়িল। কাজল দিনের বেলা এত কাছ হইতে কখনো শেয়াল দেখে নাই, উৎসাহে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। শেয়াল বড় চালাক—দিনমানে মনুষ্য-বসতির নিকটে ঘোরাফেরা করিতে বড় দেখা যায় না। কাজলের চোখ বিস্ময়ে কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। শেয়ালটা মিনিট খানেক স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া হঠাৎ তীব্রবেগে পাশের কচুবনে ঢুকিয়া পড়িল।

বিকেলের দিকে কাজলের মনটা খারাপ লাগিতেছিল। বাবা বাড়ী নাই—এ সময়টা সে সাধারণতঃ বাবার সঙ্গে কাটায়। পরন্তু বেলার চাপা আলো তাহার মনে বেদনার একটা সুর ছড়াইয়া দিল। শুধুই কি বাবার জন্য মন খারাপ? কাজল অবাক হইয়া আবিষ্কার করিল, মায়ের জন্যও তাহার মন কেমন করিতেছে। কদিনই বা হইল, মা তাহাদের দুইজনের সংসারে আসিয়াছে—তাহার জন্য মন খারাপ হয় তবুও।

জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া ভেজা গাছপালা দেখিতে দেখিতে কাজলের মনে হইল, মাকে সে সত্যই খুব ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

পুরী হৈমন্তীর ভাল লাগিতেছিল। জীবনের প্রথম সমুদ্র-দর্শনে তাহার মন অকস্মাৎ আকাশের মত খোলামেলা হইয়া গেল। সারাদিন বেশ গরম থাকে। বিকালে দুইজনে সমুদ্রের ধারে যায়। পায়ে পায়ে হাঁটিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করে শহর অনেকটা পেছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। বাঁ-পাশে উঁচু বালির ডাঙা—এদিকে বিস্তৃত একখানি নীল আয়নার মত সমুদ্র। প্রথম দিন রেল-স্টেশন হইতে আসিবার সময় পথের বাঁক ফিরিয়াই হঠাৎ সামনে সমুদ্র দেখিয়া হৈমন্তী অবাক হইয়া গিয়াছিল। সমুদ্র সম্বন্ধে মনে তাহার যে ধারণাটা ছিল, সেটাকে চুরমার করিয়া আসল সমুদ্র চোখের সামনে একটা অগাধ বিস্তৃতি খুলিয়া দিল।

সেদিন বেড়াইতে বেড়াইতে অনেকদূর গিয়াছিল। অপু বলিল—কেমন লাগছে?

—ভাল।

—শুধু ভাল? আর কিছু না?

—বিরাট ভালোর বর্ণনা কি করে দিই বলো তো? মোটামুটি ভাল লাগলে বেশ বড়ো করে বলা যায়। খুব বেশী ভাল লাগলে তখন আর প্রগলভ হওয়া যায় না।

অপু বলিল—ভালো করে অনুভব করে দেখো, সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের জীবনের একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য পাবে। জীবনও সমুদ্রের মত বড়। জীবনেও সমুদ্রের মত ঝড় ওঠে। সমুদ্র যেমন সৃষ্টির আদি থেকে অবিশ্রাম তীরে এসে আঘাত করছে, ধাক্কা পেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে—আবার নতুন করে আসছে, তেমনি জীবনও একটা লোহার পর্দায় বার বার আঘাত করছে যেন। কিছুতেই ভাঙতে পারছে না। কি-একটা যেন জানবার কথা আছে—কিছুতেই জানা যাচ্ছে না—

অপু থামিতেই হৈমন্তীব কানে সমুদ্রের শোঁ শোঁ শব্দটা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা নামিয়াছে। দিগন্ত পর্যন্ত অন্ধকার—কেবল এখানে-ওখানে সাদা ফেনা অন্ধকারেও দেখা যাইতেছে। হৈমন্তী চুপি চুপি প্রশ্ন করিল— কি জানবার আছে মানুষের?

অপু ঘাড় ফিরাইয়া চোখ তীক্ষ্ণ করিয়া দূরে তাকাইয়াছিল। অনেকক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে বলিল—প্রশ্নটা জানা আছে, উত্তরটা কেউ জানি না।

ফিরিবার সময় হৈমন্তীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অপু বলিল—কেন চিন্তা করতে শিখলাম বল তো? জীবনটা তো এমনিতেই বেশ কাটিয়ে দেওয়া যেতো।

পরের দিন সকালে অপু বলিল—সব ঠিক করে ফেললাম। চল কাল কোনারক থেকে ঘুরে আসি! পুরী এসে কোনারক না দেখে ফেরা যায় না।

হৈমন্তীর আপত্তির কোন কারণ ছিল না। আরও একটি পরিবার কোনারক দেখিতে যাইতেছে—অপুও তাহাদের সহিত যাইবে ঠিক করিয়াছে, কথাবার্তা সব ঠিক।

সারাদিন একটু একটু করিয়া কোনারকের ইতিহাসটা হৈমন্তী অপুর নিকট হইতে শুনিয়া লইল। ইতিহাস জানিবার পর কোনারক দেখিবার ইচ্ছা আরও বাড়িল। পরদিন সূর্যমন্দিরের চূড়াটা উঁচু গাছের পাতার ফাঁক দিয়া একটু একটু করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতেই আনন্দে হৈমন্তীর গলার কাছে কি-একটা পাকাইয়া উঠিল।

বিরাট মন্দির—প্রশস্ত উঠানের অপর প্রান্তে বিশাল প্রধান দ্বার।

মন্দিরের ভিত্তিতে রথচক্রের অনুকরণে বড় বড় পাথরের চক্র খোদাই-করা। হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। মন্দিরের ওপাশের উঁচু গাছে হাওয়া লাগিয়া একটা মাতামাতি কাণ্ড হইতেছে। চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। এত স্তব্ধ যে হৈমন্তী নিজের শান্তিপুরী শাড়ির খস-খস শব্দ শুনিতে পাইতেছে স্পষ্ট।

সহযাত্রী পরিবারটি খাওয়ার ব্যবস্থায় লাগিল। সঙ্গে লুচি-তরকারী ও মিষ্টি আনিয়াছে। সতরঞ্চি বিছাইয়া সেগুলিকে পাত্র হইতে বাহির করিয়া পাতায় সাজাইতে আরম্ভ করিল। কর্তাটি অপুকে ডাকিয়া বলিলেন—অপূর্ববাবু, খাবেন না এখন? আমার মশাই, সত্যি বলতে কি, ভীষণ খিদে পেয়েছে—

— আপনারা শুরু করুন, আমরা একটু ঘুরে আসি। আমাদেরটা রেখে দিন বরং।

অপু হৈমন্তীকে লইয়া মন্দিরটা ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল। বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে ধূসর পাথরের মন্দিরটা কেমন উদাসভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মাটি হইতে ক্রমশঃ চূড়ার দিকে উঠিবার কয়েকটি সঙ্কীর্ণ পথ আছে। তাহারই একটা দিয়া অপু হৈমন্তীকে লইয়া উঠিতেছিল। একদিকে মন্দিরের পাথর—অপরদিকে অনেক নীচে মাটি। হঠাৎ তাকাইলে মাথা ঘোরে। হৈমন্তী অপুকে ধরিয়া উঠিতেছিল। অপু বলিল—ভাল করে ধরে থেকো। হাওয়া দিচ্ছে বেশ, বেসামাল হলে ঝুপ করে পড়ে যাবে।

অদ্ভুত! অদ্ভুত! শতাব্দীর ইতিহাসবাহী মৌন প্রস্তর, দূরে গাছের সারি সুন্দর বাতাস। আকাশের রঙ তাহাদেরই মনোলোকের স্বপ্নের মত নীল। ধীরে ধীরে হৈমন্তীর মনের ভিতর কেমন একটা ঘুম-ঘুম ভাব ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বহু তার-বিশিষ্ট যন্ত্রের ঝিম-ঝিম বাজনার মত আবেশ।

কিন্তু এত সব ভালো লাগিবার মধ্যে একটা কি চিন্তা যেন হৈমন্তীকে খোঁচা দিতেছে। অনেক আনন্দের মধ্যে একটু কি অতৃপ্তির আভাস। কয়েকদিন হইতেই হৈমন্তী অতৃপ্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আজ এই সূর্যমন্দিরের ভগ্নসোপানে দাঁড়াইয়া সে উত্তরটা পাইয়া গেল। সে অনুচ্চ-কণ্ঠে বলিল—শুনছো?

—কি?

—এবার চলো বাড়ী ফিরে যাই।

—সে কি? এই তো সবে এলে। ভাল করে সব দেখাও তো হল না। তোমার জন্যেই তো আসা।

—তা হোক। আর ভাল লাগছে না।

—কেন?

একটু স্তব্ধ থাকিয়া হৈমন্তী বলিল—খোকাকে ছেড়ে থাকতে পারছি নে। ফেরা হইল।

কাজলের ষান্মাসিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। অপু ঠিক করিয়াছে এখন বিহারের নতুন বাড়ীতে যাইবে না, কাজলের বাৎসরিক পরীক্ষা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। নতুন জায়গায় একেবারে নতুন শ্রেণীতে ছেলেকে ভর্তি করিবে। এখন গেলে কাজলের একটা বৎসর নষ্ট হয়।

পরীক্ষার পর কাজল বেশ মজায় আছে। পডাব চাপ কমিয়াছে। সারাদিন সে ঘুরিয়া কাটাইতেছে। বনজঙ্গল ভাঙিয়া মাঝে মাঝে চলিয়া যায় পাশের গ্রামে।

একদিন কাজল বেড়াইতে বেড়াইতে একটা বাড়ীর উঠানে গিয়া হাজির হইল। বেশ সুন্দর ঝকঝকে বাড়ী, উঠানে ধানের গোলা, সিঁদুব দিয়া তাহাতে মঙ্গলচিহ্ন আঁকা। কয়েকটা ছেলে ছোটাছুটি করিতেছে। গোয়ালে একটা গরু বাছুরের গা চাটিতেছে। উঠানে ক্রীড়ারত চারিটি কুকুব-ছানা। সে মুগ্ধ-নয়নে হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চাগুলির খেলা দেখিতেছিল। এমন সময় একটি ছেলে আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল।

—কি দেখছ?

সে আমতা আমতা করিয়া বলিল—না, এই—মানে—ঐ বাচ্চাগুলো বেশ সুন্দব কিনা তাই—

—তুমি নেবে একটা?

অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যেব সম্মুখীন হইয়া কাজল প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না। পরে বলিল—একেবাবে দিয়ে দেবে? তোমাব বাড়ীর লোক কিছু বলবে না?

—দূর। আরও তো তিনটে রইল—তুমি একটা নাও।

প্রথমে কাজল ধরিতে ভয় পাইতেছিল। পরে গায়ে হাত বুলাইয়া বুঝিল তাহারা নিতান্তই নিরীহ।

একটা বাচ্চা বগলদাবা করিয়া দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল। প্রতি মুহূর্তে ভয় হইতেছিল, পেছন হইতে ছেলেটি ডাকিয়া বলিবে—না ভাই, বাচ্চা দেবো না। তুমি রেখে যাও।

দ্রুত বড় মাঠটা পার হইয়া কাজল নিশ্চিন্দিপুরে ঢুকিল।

হৈমন্তী রাগ করিয়া বলিল—এঃ, এটা আবার কোত্থেকে জুটিয়ে আনলি, নেড়ীর বাচ্চা—

হাত-পা নাড়িয়া কাজল দুর্বল জীবের পক্ষে অনেক ওকালতি করিল। অবশেষে অনুমতি মিলিল। এবারে বাচ্চাকে তো কিছু খাওয়ানো প্রয়োজন। কুকুরের বাচ্চা কি খায়, এ সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় হৈমন্তীর কাছে আবার গিয়া দাঁড়াইতে হইল।

—মা!

—কি রে?

—ওটাকে কি খেতে দিই এখন?

রাগ করিতে গিয়া হৈমন্তী হাসিয়া ফেলিল। ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—বড্ড বাচ্চা যে, দুধ ছাড়া কি অন্য কিছু খেতে পারবে? তুই বরং রান্নাঘরের কড়া থেকে খানিকটা দুধ নারকোলের মালায় নিয়ে খাওয়াগে।

খাদ্যের প্রতি বাচ্চাটার একটা দার্শনিকসুলভ নিস্পৃহতা। কাজল জোর করিয়া দুধের মধ্যে মুখ ডুবাইয়া দিলে নাকের মধ্যে দুধ ঢুকিয়া হাঁচিয়া সে অস্থির হইল। এক-মালা দুধ খাওয়াইতে বেলা গড়াইয়া অন্ধকার নামিল।

দুই-তিন দিনের মধ্যে কুকুরছানা নূতন জায়গায় অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কাজল বাবাকে বলিয়াছে কলিকাতা হইতে কুকুরের গলার চেন আনিয়া দিতে। চেন গলায় দিয়া সকাল-বিকাল কাজল তাহাকে লইয়া গ্রাম পরিক্রমা করিবে। ওয়াইডওয়ার্লড ম্যাগাজিনে কুকুরের বীরত্ব সম্বন্ধে ভাল ভাল গল্প ছাপা হয়—বাবার কাছে কাজল অনেক গল্প শুনিয়াছে। সে-ও ইহাকে সুশিক্ষিত করিয়া বীরত্ব-অভিযানের সঙ্গী করিবে।

কুকুরের নাম রাখা হইল—কালু। সাতদিনের মধ্যেই কালু কাজলের পরমভক্ত হইয়া উঠিল। কাজল নিজে আসিয়া খাইতে না দিলে খায় না—সর্বদা কাজলের পেছন পেছন ঘোরে। বেশ ভাল চলিতেছিল, কিন্তু মাসখানেক বাদে হঠাৎ কালুর কি অসুখ করিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝিমায়, খাওয়া দাওয়া একদম ছাড়িয়া দিয়াছে। প্রথমে কাজল আমল দেয় নাই, পরে দেখিল কালুর উঠিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। তিনদিন আগেও লাফালাফি করিয়া বেড়াইয়াছে, ইদানীং সর্বক্ষণ শুইয়া থাকে। কাজলের সাড়া পাইলে অতিকষ্টে একবার মাথা তুলিয়া তাকায়। অশক্ত ঘাড়ের উপর মাথাটা কাঁপে, কিছুক্ষণ বাদে আবার চটের উপর পড়িয়া যায়।

অপু দেখিয়া বলিল—আহা রে! কালু বোধহয় আর বাঁচবে না।

সারাটা বিকাল ধরিয়া কালু অস্পষ্ট আর্তনাদ করিল, রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কাতর গোঙানি। কালু মারা যাইতেছে, কালু ভীষণ কষ্ট পাইতেছে, অথচ কাজলের কিছুই করিবার নাই। চাপা গোঙানি তাহাকে কিছুতেই ঘুমাইতে

দিল না। রাত্রে মার বুকের কাছে তাহার মনে হইল, তাহার অসুখ করিলে মা-বাবা ব্যস্ত হইয়া সেবা করে—আর বেচারা কালু অন্ধকারের ভিতর একা একা কষ্ট পাইয়া মরিতেছে।

কাজল ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হৈমন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—কাঁদতে নেই মাণিক আমার। ছিঃ—

আদরের কথা শুনিয়া কান্নাটা আরও বাড়িল। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কাজল বলিল —কালু কত কষ্ট পাচ্ছে, অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে—

হৈমন্তী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—একা কোথায় পাগলা। ওর কাছে ঠিক ভগবান এসে বসে আছেন, জানিস। যারা কষ্ট পেয়ে মারা যায়, তাদের আত্মাকে ভগবান নিজের হাতে স্বর্গে নিয়ে যান। ঠিক ওর পাশে ভগবান এসে বসেছেন—

কাজলের দুঃখের বেগটা একটু কমিয়া আসিল। এ ভাবে সে কখনো ভাবিয়া দেখে নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে দুঃখের কিছুই নাই। ভগবান যদি আসিয়া থাকেন—তবে ভালই তো। কাজল স্পষ্ট দেখিল, কালুর পাশে এক জ্যোতির্ময়দেহ বিশাল পুরুষ—উন্নতললাট, দীপ্তনয়ন। তাঁর হাতে পৃথিবী শাসনের স্বর্ণদণ্ড। তিনি আসিয়াছেন ক্লিষ্ট আত্মাকে স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য।

কাজল — ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুবর্ণরেখা।

বালির চর বুকে করিয়া নদীটা সারাদিন পড়িয়া থাকে। স্বল্প জল এখানে-ওখানে বালির মধ্য দিয়া বহিয়া যায়। নদীর মাঝখানে বড বড কালো পাথরের চাঁই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত পড়িয়া আছে। উপরের প্রখর নীল আকাশ ধূসর দিগন্তের সহিত একটা অদ্ভুত বৈষম্য সৃষ্টি করিয়াছে। মাটির রঙ লাল। জমি সর্বত্র উঁচুনিচু। স্থানটিতে কেমন একটা বৈরাগ্যের ভাব আছে, মাটির গৈরিক রঙটির মত।

মৌপাহাড়ীতে লোকজন কম। দিনের বেলায় মনে হয় কিসের উপলক্ষে যেন ছুটি হইয়া গিয়াছে—সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যার সময় একটা কালো চাদর ক্রমশঃ সবকিছু ঢাকিয়া ফেলে। ঝি ঝি এবং অন্যান্য পতঙ্গের

ডাকের মধ্য দিয়া রাত্রি মৌপাহাড়ীকে গ্রাস করিয়া লয়।

অপু ইহার ভিতরে কি-একটা যেন খুঁজিয়া পাইয়াছে। মানুষের সঙ্গ—কেবল কাজল এবং হৈমন্তী ছাড়া—তাহার কাছে আর কাম্য নহে। বইখাতা বগলে দিনের প্রায় সময়টাই সে বাহিরে ঘুরিয়া কাটায়। নদীর ধারে একখানি বড় পাথরের উপর বসিয়া সে লেখে। জীবনকে সে অলসভাবে একদিক হইতে দেখে নাই। তাহার দেখা বিচিত্র জীবনের কথা সে আগামী যুগের জন্য রাখিয়া যাইবে। লিখিতে লিখিতে কখনো মুখ তুলিয়া দেখে সামনে সুবর্ণরেখার বিস্তৃত বক্ষ, ওপারে প্রান্তরের গৈরিক প্রসার। পড়ন্ত সূর্যালোকে নদীর বালির মধ্যে মিশ্রিত অভ্রকণা চিক্ চিক্ করিতেছে। আকাশে-বাতাসে কিসের একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত অপুকে বিচলিত করে। কি-একটা এখনই করিতে হইবে, কি-একটা করিবার আছে—কিন্তু কিছুতেই করা হইতেছে না। শরীরের মধ্যে একটা বিচলিত ভাব বাড়িয়া ওঠে। মনে হয়, সবটাই বাকি রহিল, নির্দিষ্ট কাজের ভগ্নাংশও করা হইল না। যাহা জানিবার ছিল, তাহার কণামাত্রের আস্বাদন হইল মাত্র।

শরীর লইয়া অপু খুবই বিব্রত। নিশ্চিন্দিপুর ছাড়িয়া আসার পর মৌ-পাহাড়ীতে তিন-চার বৎসর কাটিল, কিন্তু স্বাস্থ্যের খুব-একটা উন্নতি হয় নাই। প্রায়ই বুকে একটা যন্ত্রণা হয়। মাথা ভার ঠেকে, অম্বল হয়। এ সব কথা সে কাহাকেও বলে না। অসুখ গা-সহা হইয়াছে। সন্ধ্যা ঘনাইলে লেখা বন্ধ করিয়া নক্ষত্রের আলোয় বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে হঠাৎ ছোট টিলাটার গা ঘেঁষিয়া বিশাল বৃহস্পতি গ্রহটাকে উঠিতে দেখিয়া তাহার অসুখের কথা বিস্মরণ হইয়া যায়। সেতারের জলদের মত জীবনটা কাহার হাতের স্পর্শে যেন বাজিতেছে। কিসের স্পর্শে যেন জীবনের রঙ বদলাইতেছে, সুরের পরিবর্তন ঘটিতেছে।

সুবর্ণরেখার ধারে বসিয়া সময় কাটাইতে কাটাইতে অপু নদীর সঙ্গে নিজের মিল খুঁজিয়া পায়। একা থাকিলেও মনে হয় না, সে একা আছে। কাহার উপস্থিতি যেন রহিয়াছে আশেপাশে, অনুভব করা যায় কেহ পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, চোখ ফিরাইলে সরিয়া যায় দূরে।

একদিন একটা কাণ্ড ঘটিল! অপু বসিয়া লিখিতেছে, একটা প্রজাপতি আসিয়া বসিল তাহার খাতার পাতায়। সে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে সেটা উড়িয়া একটু দূরে একটা পুটুস গাছের উপর বসিল। অপুর হঠাৎ কেমন মনে হইল, সুন্দর প্রজাপতিটাকে ধরিতেই হইবে। এক টুকরা পাথর খাতার উপর চাপা দিয়া উঠিল।

প্রজাপতিটা ধরা গেল না। গাঢ় লাল আর বাদামি ডানা-ওয়ালা পতঙ্গ তাহাকে দূর হইতে দূরে লইয়া গেল। এক ঝোপ হইতে অন্য ঝোপ করিতে করিতে অপু আচ্ছন্নের মতো দৌড়াইল। বাতাস অপুর চুল অবিন্যস্ত করিয়া দিল, তাহার ধুতিতে চোরকাঁটা লাগিয়া গেল। পাথরে লাগিয়া পায়ের এক জায়গা কাটিয়াও গেল, কিন্তু প্রজাপতি পাওয়া গেল না।

মাইলখানেক দৌড়াদৌড়ি করিয়া অপু নিজের বসিবার জায়গায় ফিরিয়া আসিল। পাথরের উপর রাখা খাতার পাতা বাতাসে অল্প অল্প উড়িতেছে, চাপা আছে বলিয়া একেবারে উড়িয়া যায় নাই।

অপু পাথরটার এককোণে বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সুবর্ণরেখার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কাজলের দুষ্টামি কমিয়াছে। আগের মত লাফা-লাফি করিতে আর ভালবাসে না। মৌপাহাড়ীতে তাহার সমবয়সী কম। সমবয়সীদের সঙ্গে কখনই তাহার বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে নাই। বয়সে যাহারা অনেক বড, তাহাদের সঙ্গেই বরঞ্চ কাজলের জমে ভাল।

একদিন কয়েকটা ছেলে মিলিয়া মাইল তিনেক দূরের একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। কাজলের মনে হইয়াছিল, ছেলেগুলি এক একটি আস্ত বর্বর। ঢিল কুড়াইয়া ভীষণ জোরে ছুঁড়িতেছে, লাফাইতেছে, চীৎকার করিতেছে, নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ কারণে মারামারি করিতেছে। অথচ চারিপাশে কেমন সুন্দর পাহাড়ী পরিবেশ। নির্জন স্থানে স্তব্ধতা খাঁ খাঁ করিতেছে। মাঝে মাঝে বাসায়-ফেরা কি-এক ধরনের পাখী মাথার উপর দিয়া মধুর স্বরে ডাকিয়া যাইতেছে। সব মিলাইয়া বেশ ঘনিষ্ঠ আনন্দময় পরিবেশ। ছেলেরা এসব মোটে বুঝিতেছে না। কাজল ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিল। বড গোলমাল করে ইহারা। তাহার মনের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই। থামাইবার জন্য সে কিছুদিন আগে-পড়া একটা গল্প বলিতে শুরু করিল, কিন্তু সে গল্পে কেহ উৎসাহ পাইল না।

ধীরে ধীরে, অল্প বয়সেই, কাজলের ভিতর একটা বোধ জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহার সহিত অন্যের মনের মিল হয় না—হইবে না।

সে একা থাকে। অপু প্রচুর বই আনিয়া দিয়াছে। অনেক বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ সে পড়িয়া শেষ করিয়াছে। অপু তাহাকে নিজে ইংরাজী শিখাইতেছে, যাহাতে কাজল শীঘ্রই বিশ্বসাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। কাজলও অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়া ইংরাজী ভাষা-শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর

হইয়াছে। সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা তাহাকে বাবার কাছে বসিয়া পড়িতে হয়।

চোখের সামনে তাহার এ কি জগতের দ্বার খুলিয়া যাইতেছে! এ কি আনন্দ আর আলোর জগৎ! পৃথিবীর সাধারণ অকিঞ্চিৎকর বস্তুও এ আলোর স্পর্শে অসাধারণ হইয়া উঠিতেছে। এমন ভাবে যাহারা তাহাকে পৃথিবীটা দেখিতে শিখাইতেছে, তাহাদের কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

ফরাসী ছোটগল্পের অনুবাদ পড়িয়া প্রথম তাহার চোখ ফুটিয়াছিল। রোজকার জীবনে দেখা সামান্য ঘটনা লেখকের হাতে এক গভীর তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। এক জায়গায় একটি বৃষ্টির বর্ণনা এবং অপর জায়গায় একটি জ্যোৎস্নারাত্রির বর্ণনা তাহাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। এখনও বর্ষার দিনে এবং জ্যোৎস্নারাত্রিতে গল্প দুইটিকে সে মনে করিয়া থাকে।

একটু বয়স হওয়ায় সে বাবাকে চিনিতে পারিতেছে। বাবার কেমন একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে, সে বুঝিতে পারে। সেটা বাবার সাংসারিক অস্তিত্ব নহে —অন্য কিছু। সব-কিছুর ভিতরে থাকিয়াও বাবা সব-কিছু হইতে আলাদা। একদিন বাবাকে বড় অদ্ভুত লাগিয়াছিল। বেড়াইতে যাইবে বলিয়া বাহির হইতে গিয়া সে দেখিল, বাবা উঠানের প্রান্তে ইউক্যালিপটাস গাছটার নীচে সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া লিখিতেছে। হয়তো কিছু মনে আসিতেছে না, কোন উপযুক্ত শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তাই বাবা কলমটা হাতে ধরিয়া উদাস ভাবে দূরে তাকাইয়া আছে। ডানদিকের কাঁধটা একটু নিচু দেখাইতেছে। ফর্সা ঋজু দেহ বাবার। হঠাৎ বাবার জন্য ভীষণ মায়া হইল, ভীষণ—ভীষণ ইচ্ছা হইল বাবার কোলের কাছে গিয়া মুখ গুঁজিয়া থাকে। শরীরের ভিতরের প্রতি শিরায় সে পিতার প্রতি ভালবাসার স্রোত অনুভব করিল। বাবার শরীর মোটে ভাল যাইতেছে না—বাবা কাহাকেও বলে না, কিন্তু কাজল জানে।

হৈমন্তীর বাবা সুরপতিবাবু একদিন মৌপাহাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলেন। কি কাজে জামসেদপুর আসিয়াছিলেন—পথে মৌপাহাড়ী ঘুরিয়া যাইতেছেন।

হৈমন্তী দৌড়াইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। অপু ব্যস্ত হইয়া পড়িল খাওয়াইবার আয়োজনের জন্য। কাজল একটু থতমত খাইয়াছিল, কিন্তু লজ্জা কাটিয়া গেলে দেখিল দাদু খুব ভালমানুষ। কাজলকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, আজকে সারাদিন আমি তোমার সঙ্গে গল্প করব দাদু—কেমন?

হৈমন্তী বলিল—তুমি দু'একদিন থাকবে তো বাবা?

—না মা, সময় নেই হাতে একদম। পরের কাজে আসা—

আপত্তি টিকিল না। দুইদিন থাকিয়া যাইতে হইল। সারাদিন কাজল আর দাদুর গল্প চলিত, অপু যোগ দিতে পারিত না। সে একখানি বড় উপন্যাস লিখিতেছে। সন্ধ্যায় উঠানে সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া অপু শ্বশুরমহাশয়ের সহিত কথাবার্তা বলিত। সুরপতিবাবু জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক। জীবনের তিক্ত এবং মধুর দুইদিকের সহিতই নিবিড় পরিচয় আছে। পরলোকে অত্যন্ত বিশ্বাসী। সন্ধ্যায় পরলোক লইয়া অপুর সহিত কথা হইল।

দুইদিনের বেশী সুরপতিবাবু থাকিতে পারিলেন না। যাইবার সময় অপুকে শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন লইতে বারবার বলিয়া গেলেন। হৈমন্তীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—তোর কপাল ভাল হৈম, যে এমন স্বামী পেয়েছিস। জামাই সত্যিই বড়ো ভাল—এমন মানুষ দেখা যায় না। কাজলকে গোপনে দুইটি টাকা দিয়া তিনি ছাতা-ব্যাগ সহ রওয়ানা হইলেন। অপু তাঁহাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে গেল। ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ফিরিবার সময় অপুর বুকে কেমন একটা যন্ত্রণা বোধ হইল। বাঁদিকে একটা চিনচিনে ব্যথা, কমিতেছে না! বুকে হাত দিয়া অপু কিছুক্ষণ বসিল—কিছু হইল না। মাথাটা বেশ ঘুরিতেছে। অপু ঠিক করিল, ডাক্তারের কাছে একবার ঘুরিয়া যাইবে।

স্থানীয় ডাক্তার বিশ্বনাথ সোম অপুকে দেখেন—ডিসপেনসারিতে ঢুকিতেই তিনি অপুর মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে অপূর্ববাবু? বসুন ঐ চেয়ারটাতে—হ্যাঁ—

যন্ত্রণা বাড়িতেছিল। মাথার মধ্যে যেন ঝিমঝিম বাজনা। বিশ্বনাথ বাবু নাড়ি দেখিয়া কমপাউণ্ডারকে ডাকিলেন—সুরেন, মেজারগ্লাসে পনেরো ড্রপ কোরামিন চট করে নিয়ে এসো।

কোরামিন খাইয়া অপু একটু সুস্থ বোধ করিল। বিশ্বনাথ বাবু প্রেসার লইলেন। খুব হাই।

—কিছুদিন বিশ্রাম নিন। এরকম বারবার হওয়াটা তো ভালো নয় রায়মশায়। খাওয়াদাওয়া নিয়মমাফিক—আমাকে প্রতি হপ্তায় একবার করে দেখিয়ে যাবেন।

অপু বাহিরে আসিল। রাস্তায় লোক কম। মাথার ভিতরটা এখনও পুরাপুরি পরিষ্কার হয় নাই। একটু হাঁটিলেই মনে হইতেছে, আবার মাথা ঘুরিয়া উঠিবে। ডাক্তার বিশ্রাম লইতে বলিয়াছে, এইবার তাহাকে বিশ্রাম লইতে হইবে। একটা উপন্যাস সে লিখিতেছে, শেষ হওয়ার পূর্বে বিশ্রাম নাই। উপন্যাসটা শেষ করিয়া তবে ছুটি।

ক্লান্ত শরীর—সামনে একটি উপন্যাস লিখিবার পরিশ্রম। হঠাৎ অপুর

নিকট 'ছুটি' শব্দটা অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক বোধ হইল।

কলিকাতা হইতে প্রকাশকের পত্র আসিল, লেখাটা তাহাদের শীঘ্র প্রয়োজন। দেরী করিলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা।

সকালে জলখাবার খাইয়া অপু লেখা শুরু করে, দুপুরে খাইবার সময়টা বাদ দিয়া সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ক্রমাগত লেখে। সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে একটু নদীর দিকে বেড়াইতে যায়। ফিরিয়া আসিয়াই আবার রাত্রি বারোটা পর্যন্ত লেখে। শরীরের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে। উপন্যাসটি অপু হৃদয় উজাড় করিয়া লিখিবে। অপরিণত বয়সের ভাবাবেশ আর নাই—এখন জীবন-সত্য উপলব্ধি করিবার সময়।

কোন সময় লিখিতে লিখিতে মাথা একেবারে ফাঁকা হইয়া যায়, হাত-পা অবশ হইয়া আসে। কলমটা টেবিলে নামাইয়া অপু অনুভব করে, শরীর ভাঙিয়া আসিতেছে—আচ্ছন্নের মত সে কাজ করিয়া যাইতেছে। কিছুটা লোভে-লোভে বটে। কাজটা শেষ হইলে আপাতত ছুটি।

হৈমন্তী আসিয়া বকে—রেখে দাও তো। এরকম খাটলে শরীর দুদিনে ভেঙে পড়বে। শোবে চলো।

অপু চুলের ভিতর হাত চালাইতে চালাইতে বলে—আব একটু, চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলি।

হৈমন্তী বুঝাইয়া পারে না।

একদিন অপু টেবিলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হাত হইতে কলম খসিয়া পড়িয়াছিল। খাতার উপর মাথা রাখিয়া অপু স্বপ্ন দেখিতেছিল, মধ্যপ্রদেশের সেই বন্য জীবনটা আবার ফিরিয়াছে। সে তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া আদিগন্ত হাটুসমান জঙ্গলে তীব্রবেগে ভ্রমণ করিতেছে। কালপুরুষ পশ্চিম দিগন্ত ছুঁই-ছুঁই করিয়াছে। বাতাসে সেই সজীব ভাবটা।

বাধা দিবার কেহ নাই—মহাশূন্যে গাঢ় অন্ধকারে ভীমবেগে ধাবমান উল্কার মত জীবন, আবার ফিরিয়াছে। চিন্তা নাই, দুঃখ নাই, ক্ষোভ নাই। স্বপ্নের মধ্যেই সব পাইবার তৃপ্তি তাহাকে আচ্ছন্ন করিতেছে। খুব জোরে ঘোড়া ছুটাইয়াছে সে। দৌড়—দৌড়—দৌড়। সামনে কালোমত কি-একটা আসিতেছে, বিশাল পাহাড়ের মত। সে ঘোড়ার রাশ টানিল।

ঘুম ভাঙিয়া সে কলমটা আবার তুলিয়া লইল, কিন্তু আর লিখিবার উৎসাহ নাই। স্বপ্ন এখনও মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে। অর্থটা বোঝা যাইতেছে না বলিয়া অস্বস্তি হইতেছে। টেবিলের ওপাশে জানলা খোলা,

হু হু বাতাস আসিয়া কাগজপত্র এলোমেলো হইতেছে। সবাই ঘুমাইয়া, কেবল বহু দূরের কোন সাঁওতাল বস্তীর ক্লান্ত মাদলের শব্দ এখনও শোনা যায়।

চিঠি লিখিবার প্যাডটা টানিয়া লইয়া অপু মনে করিয়া করিয়া বহু পুরাতন বন্ধু-আত্মীয়কে এক একখানা চিঠি লিখল। অনেককে লেখা হইল না—তাহাদের ঠিকানা মনে নাই। লিখিল, ভালো আছো? অনেকদিন খবর নিতে পারি নি, স্বার্থপরের মত নিজের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু মানুষ একা বাঁচে না—তোমাদের সবাইকে আমার জীবনে বড দরকার। আমাকে মনে রেখো, একেবারে ভুলে যেও না যেন। মানুষের মধ্যে বেঁচে আছি—এ বোধটা আমার জীবনে যেমন প্রয়োজন, তোমাদের জীবনেও তেমনি।

চিঠিগুলি লিখিতে রাত শেষ হইয়া গেল। পূর্ব দিকের টিলাটার পাশের আকাশে লাল রঙ ধরিল। মেঘের লম্বা স্তরগুলিকে দেখাইতেছে যেন আঁকা ছবি। আলো ফুঁ দিয়া নিভাইয়া অপু বারান্দায় আসিয়া দাঁডাইল।

বিকালে অপু ছেলেকে ডাকিয়া বলিল—খোকা চল, বেরুই কোথাও।

উঁচুনিচু লালমাটিব ডাঙা ধরিয়া দুইজনে কিছু হাঁটিল। অনুচ্চ একটি পাহাড়ের কাছে আসিয়া অপু বলিল—আয়, এখানে বসি।

দুইটা ছোট পাথরে দুইজন বসিল। কাজল বলিল—বাবা, সেই যে গল্পটা। নির্জন দুর্গে একলা রাজকুমারী থাকতো, সেটা আজ শেষ করো—

সে কথা কানে না লইয়া অপু ডাকিল—খোকা!

—কি বাবা?

—আমার কাছে উঠে আয় তো একটু।

কাজল বাবার কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল।

—খোকা, তুই আমায় ভালবাসিস?

উত্তর না দিয়া কাজল বাবার বুকে মুখ গুঁজিয়া রহিল। তাহার বয়সী ছেলের পক্ষে ইহা বিসদৃশ হইলেও বাবা ও মায়ের আদর পাইলে সে এমনি করিয়া থাকে।

অপু ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। সূর্যাস্তের রঙে রঞ্জিত প্রান্তরে সে অনেকক্ষণ ছেলের সহিত বসিয়া রহিল। ক্রমে আলো কমিয়া কীটপতঙ্গের গুঞ্জন শুরু হইল। অপু উঠিয়া ছেলের হাত ধরিল।

—চল্, বাড়ি-চল্, তোর মা ভাববে।

বাবার হাত ধরিয়া কাজল হাঁটিতেছিল। বাবা আজ এত গম্ভীর কেন ?

কি একটা প্রাণী সুড়ুৎ করিয়া রাস্তা পার হইল, অন্ধকারে দেখা গেল না। হয়তো মেঠো ইঁদুর। বাড়ী ফিরিতেই হৈমন্তী বলিল—তোমাকে বলে আর পারা গেল না। এত দেরী করে ফিরতে হয়! খাবার এদিকে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—

অপু কাজলের হাত ছাড়িয়া দিয়া অদ্ভুত ছেলেমানুষির সুরে বলিল—আর করবো না। হৈমন্তী, সত্যি বলছি—আর কখনো না—

রাত্রে শুইয়া অপু হৈমন্তীকে ডাকিল—হৈমন্তী!

—কি গো?

—বাইরে কেমন জ্যোৎস্না উঠেছে দেখেছ?

সুন্দর জ্যোৎস্না উঠানটা ভাসিতেছে। অষ্টমী তিথি, চাঁদ দিগন্তের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বিষণ্ণ অথচ সুন্দর জ্যোৎস্না।

হৈমন্তী বলিল—সুন্দর।

—চল, একটু বাইরে গিয়ে বসি। ঘরে ভাল লাগছে না।

ঘুমন্ত কাজলের চারপাশে মশারী গুঁজিয়া দিয়া দুইজনে উঠানে গিয়া বসিল। শব্দহীন রাত্রি। চাঁদের আলোয় একটু বসিলেই কেমন-একটা আবেশ জড়াইয়া আসে দেহে-মনে।

—হৈমন্তী, কাল আমার উপন্যাস শেষ হয়ে যাবে। বড় ভাল লাগছে। যা লিখতে চেয়েছিলাম—ঠিক সেই রকমটি হোল না, কিন্তু অনেকখানি পেরেছি বলে মনে হচ্ছে।

কাছেই কোথাও ঝিঁঝি ডাকিতে শুরু করিল।

—ছোট বেলায় দূরে তাকিয়ে ভাবতাম, ঐ যেখানে আকাশ আর মাটি মিলেছে, তার ওপারেই আছে রূপকথার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেশ। তেমনি আমার লেখায় একটা দূর দিগন্তের ইঙ্গিত রয়েই গেল। সারাজীবন আমিও এগুলাম, স্বপ্নটাও মরিচীকার মত পিছিয়ে গেল।

হৈমন্তী অপুর হাঁটুতে হাত রাখিয়া বলিল—তোমার জীবনে কি কোনো দুঃখ আছে?

—না, আমি পরিপূর্ণ, আমি তৃপ্ত। কারণ আমি বুঝেছি সন্ধানেই আনন্দ, প্রাপ্তিতে পরিসমাপ্তি। আমি পথ চলতে ভালবাসি হৈমন্তী। আমি পথের শেষ চাই না।

দুইজনে কোন কথা না বলিয়া বসিয়া রহিল। ঝিঁঝির ডাকের বিরাম নাই। চাঁদ ইউক্যালিপটাস গাছ দুইটার মাঝখান দিয়া ধীরে নামিয়া

পড়িতেছে। তাহাদের ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া আসিল। চাঁদের আলো ম্লান হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। বাতাস একবার গাছের পাতায় হালকা দোলা দিল।

—হৈমন্তী!

—কি?

—না, থাক—

হৈমন্তী অপুর হাত ধরিয়া বলিল—বলো না, কি বলবে।

অপু একবার আকাশের দিকে তাকাইল, তারপর বলিল—বলা যায় না, বলা যায় না। ভাষা জানি নে—

পরের দিন সকালে যদু পিওন আসিল মনি-অর্ডার দিতে। কিছুদিন আগে কাগজে হৈমন্তীর গল্প বাহির হইয়াছিল। তাহাব পারিশ্রমিক পনেরটি টাকা আসিয়াছে। যদু পিওন এমনি মনি-অর্ডার আগেও কয়েকবাব বিলি করিয়াছে; মৌপাহাড়ীর নিবালায় হৈমন্তী বেশ কয়েকটি গল্প লিখিয়াছে।

মনি-অডার ফর্মে হৈমন্তী সই কবিতেছে, অপু আসিয়া পেছনে দাঁড়াইল।

—বঙ্গবাণীর টাকাটা এল বুঝি?

হৈমন্তী ফিরিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

যদু পিওন বলিল—এ তল্লাটে এমন রোজগেরে বৌ আর দেখি নি বাবু।

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল—তোমাকে আব বকবক করতে হবে না যদুদা। এই টাকাটা নাও, বাচ্চাদেব মিষ্টি কিনে দিও।

টাকা দুইটা হাত পাতিয়া লইয়া বলিল—দিদিব আরও অনেক মনি-অর্ডার আসুক।

হাসিতে হাসিডে যদু চিঠির ব্যাগ তুলিয়া রওনা দিল।

সারাদিন অপু টেবিলেই বসিয়া রহিল। লিখিতে লিখিতে কখন যে দিন কাটিয়া গেল, কে জানে। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ের শেষ বাক্যটি লেখা হইয়া গেল। স্তূপাকার কাগজগুলির দিকে তাকাইয়া অপুর অবাক লাগিল। শেষ হইয়া গিয়াছে। বিনিদ্র রাত্রির বেদনা-অনুভূতির ফল ঐ কাগজগুলি। এইবার প্যাকেট বন্দী হইয়া কলিকাতায় যাইবে, নাকের উপর চশমা নামিয়া-আসা বৃদ্ধ কম্পোজিটার বানান করিয়া কম্পোজ করিবে।

শরীরে ভীষণ ক্লান্তি। এত পরিশ্রম সে একসঙ্গে কখনও করে নাই। ডানহাত ব্যথায় টন টন করিতেছে।

হৈমন্তীকে ডাকিয়া অপু বলিল—একটু গরম জল করে দাও তো, হাতটা

বড্ড ব্যথা করছে, ডুবিয়ে রাখব।

কাজ মিটিয়া গেল। সামনে আর বড় কোন কাজ নাই। অপু আপন মনে বেড়াইতেছিল। ছেলেবেলাকার অভ্যাসমত হাতে সরু কঞ্চির মত এক লাঠি লইয়াছে। অনেকক্ষণ ঘুরিবার পর মনে হইল, সে আজ ভীষণ অন্যমনস্ক। অনেক পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে। অনেক পুরাতন মুখ। অপর্ণার কথা বড় বেশী মনে আসিতেছে। তাহাকে কিছু দেওয়া হয় নাই—তখন অপুর পয়সা ছিল না। অথচ অপর্ণা হাসিমুখে অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিয়াছিল—কখনো অভিযোগ করে নাই। বড় সিঁদুরের টিপ-পরা অপর্ণার সলজ্জ মুখখানি আজ অনেকদিন বাদে মনে পডিয়া গেল। তাহার চিবুকের টোলটা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে।

কাশীতে যখন বাবা মারা যায়—উঃ, কি দিন গিয়াছে! কনকনে শীতের রাত্রে সেই গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফেরা।

সবার হইতে বেশী মনে পডে মাকে। কখনো কিছু চায় নাই, আশা করে নাই। অপু সুখে থাকিলেই সুখী হইত। মনসাপোতার বাডীতে ফিরিয়া তাহার প্রতি ছাত্রীর অভিভাকদের সদয় ব্যবহারের কথা সে মাকে খুশী করিবার জন্য বানাইয়া বানাইয়া বলিত। মা সরল মনে সব বিশ্বাস করিত। ছিন্নবেশ-পরা মায়ের হাস্যময়ী চেহারা মনে পড়িয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে সুবর্ণরেখার তীরে আসিয়া পড়িয়াছে অপু। বসিলে মন্দ হয় না। যে পাথরটার উপর বসিয়া সে লিখিত জুতা ছাড়িয়া তাহার উপর অপু বসিল। জনপ্রাণী নাই কোনদিকে। সুবর্ণরেখার শূন্য বুকটা খাঁ খাঁ করিতেছে। কয়েকটি বক একপায়ে নদীর চরে ধ্যানমগ্নের মত দাঁড়াইয়া। সূর্য যেন জ্বলিতেছে। অপুর মনে হইল, সবদিকে কেমন-একটা নাই-নাই ভাব। আকাশ রিক্ত। এতটুকু মেঘ নাই। নদীর বুক রিক্ত—জল নাই। দিগন্ত পর্যন্ত প্রান্তর রিক্ত, নদীর ওপারে কেবল একটিমাত্র গাছ—পলাশ গাছ বিপুল একটি প্রাকৃতিক কবিতার যতি-চিহ্নের মত সোজা মাথা তুলিয়া আছে। গাছটার সর্বাঙ্গে যেন আগুন। নিঃস্ব প্রান্তরের পটভূমিতে পুষ্পিত পলাশ গাছটাকে সামান্য একটুকু সান্ত্বনার মতো দেখাইতেছে।

এমনি একটা দিনে কলিকাতা হইতে মায়ের জন্য সামান্য কিছু জিনিস কিনিয়া গ্রামের পথে হাঁটিয়া মনসাপোতায় ফিরিয়াছিল। দরজা খুলিয়া তাহাকে দেখিয়া মা কি খুশীই না হইয়াছিল! মাকে জড়াইয়া আদর করিলে কেমন সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাইত মায়ের গায়ে!

মাকে মনে পড়িতেছে। ছোটবেলায় মা তাহাকে পাঠশালায় যাইবার জন্য

খুব সকালে ঘুম হইতে তুলিয়া দিত, নিজের হাতে সাজাইয়া হাতে বই দিয়া বলিত—যাও বাবা, পাঠশালায় যাও। তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে বংশের নাম উজ্জ্বল হবে।

সে কি মানুষ হইতে পারিয়াছে? অথবা মা কি অন্য কিছু চাহিয়াছিল, যা সে হইতে পারে নাই?

একদিন রাগ করিয়া সে মায়ের দেওয়া তালের বড়া ছুঁড়িয়া উঠানে ফেলিয়া দিয়াছিল—অনেকদিন আগের ঘটনাটা। মায়ের কত কষ্টে জোগাড করা জিনিসে তৈয়ারী।

এসব মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছে কেন? আশ্চর্য! ইহা কি কাঁদিবার সময় হইল? এমন সুন্দর পরিবেশে? কিছু দূরে নদীর বাঁকের মুখটায় বালির উপর তাপতরঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, আকাশে সূর্য, ধূ-ধূ প্রান্তর—সব মিলাইয়া স্বরলিপির তীব্র মাধ্যমের মত।

একটা ঢিল তুলিয়া জোরে নদীর দিকে ছুঁড়িল, বেশ জোরে। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিল বুকের বাঁদিকে যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে। সামনে হইতে জোরে ধাক্কা মারিলে যেমন হয়, তেমনি ভাবে বুকে হাত দিয়া কিছুটা ছিটকাইয়া পেছনে সরিয়া আসিল। মুহূর্তে মাথা কি রকম খালি হইয়া গেল। সূর্যটা যেন একবার কাছে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আবার দূরে সরিয়া যাইতেছে।

অপু অনুভব করিল, পা দুইটা তাহাকে আর দাঁড করাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। পাথরটার গায়ে হেলান দিয়া সে মাটিতে বসিয়া পডিল। ব্যথাটা বাডিতেছে—শ্বাস লইতে কষ্ট হইতেছে। খুব গভীর ঘুম আসিবার আগে যেমন হয়, শরীরের তেমনি অবসাদের ভাব! দেহে-মনে অবসাদ মাকডসার জালের মত জডাইয়াছে। সে কি এইখানে একটু ঘুমাইবে?

বাবা বাডী আসিয়া বলিতেছে—দুর্গা কই? তার জন্যে শাডী কিনে এনেছি যে—

বাবা থলির ভিতর হইতে অনেক জিনিস বাহির করিতেছে। হঠাৎ অপুর মনে হইল—সত্যিই তো, দিদি কই? তাহাকে সবাই কোথায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। দিদিকে খুঁজিতে হইবে।

ঘুম-ঘুম-ঘুম। বুক বাহিয়া চিনচিনে ব্যথাটা উপরে উঠিতেছে। যন্ত্রণা ততটা আর বোধ হইতেছে না, তাহার খুব ঘুম পাইয়াছে। কানের কাছে তীক্ষ্ণস্বরে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল। নিশ্চিন্দিপুরে সেই পাখীটা যেমন ডাকিত।

সামনের ঐ ব্যাপ্তির ভিতর কোথায় যেন বাজনা বাজিতেছে। গম্ভীরনাদ

বীণার উদারার তারের আলাপের মত। তারের উপর এক-একটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সে একটু একটু ঘুমাইয়া পড়িতেছে। হাত-পায়ের সমস্ত শক্তি চলিয়া গিয়াছে। আর সে চলিতে পারিবে না, সমস্ত জীবনে অনেক ঘোরা হইয়াছে—এইবার সে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে। এইখানেই বিশ্রাম করিবে।

এ্যাশবার্টন সাহেব বলিতেছে—East opened my eyes, Roy. It really enthralls me, this call of the mysterious—this mystic span of the river—

এ্যাশবার্টনকে দেখিয়া সে উঠিবার চেষ্টা করিল। সে শুইবে না। সে অনড় হইয়া থাকিবে—না, কিছুতেই না। কিন্তু শরীর তাহার কথা মান্য করিতেছে না। তাহাকে কেহ উঠাইয়া দিতেছে না কেন?

ঐ বড় পাথরটার আড়ালে সে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে সে চিনিতে পারে নাই। এইবার সে বাহির হইয়া সামনে আসিয়াছে।

লীলা!

—পোর্তোপ্লাতায় যাবে না অপূর্ব? তুমি যে বলেছিলে, সোনা উদ্ধার করে আনবে সমুদ্রের তলা থেকে?

হ্যাঁ, যাইতে হইবে বৈকি! অতল সমুদ্রের নীচে তাহার জন্য যে রত্ন অপেক্ষা করিয়া আছে, তাহাদের সে সূর্যের আলোয় বাহির করিয়া আনিবে।

খোকা কোথায় গেল, খোকা? খোকা, আমার পাশে আয়—এইখানটায়। কোল ঘেঁসে বোস, উঠে যাসনে কোথাও। আমি তোকে কোলকাতা থেকে সেই বইটা এনে দেবো এবার। উঠে যাস নে বাবা আমার—তোকে না দেখে আমি যে মোটে থাকতে পারি না।

তাহার মা বলিতেছে—ঘুমো অপু, ঘুমো। আহা রে, বড্ড খাটুনি গেছে তোর—

ঘুমাইয়া পড়িবার আগে অপু জোর করিয়া একবার তাকাইল। দেখিল, লাল ফুল ফুটিয়া-থাকা পলাশ গাছটার পাশ দিয়া একটা পথ সমস্ত প্রান্তরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দূর দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে।

কাজল — সপ্তম পরিচ্ছেদ

বুধন সর্দার আর তার ছেলে সুবর্ণরেখার ধারে কি কাজে আসিয়াছিল। অপুকে বুধন চিনিত, বেড়াইতে বাহির হইয়া অপু বহুদিন তাহার বাড়ীতে জল

চাহিয়া থাইয়াছে। বুধন দেখিল, ঢালু পাড়ের উপর একখণ্ড পাথরে হেলান দিয়া বাবু ঘুমাইয়া রহিয়াছে। পাশেই চটিজোড়া খোলা রহিয়াছে—পাথরের উপর সরু কঞ্চি।

ছেলেকে দাঁড় করাইয়া বুধনই প্রথম লোক ডাকিয়া আনে।

বাড়ীতে শহরের লোক ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বিশ্বনাথ সোমও আসিয়াছেন। তখন আর কিছু করিবার ছিল না। বিশ্বনাথ বিষণ্নমুখে বলিলেন—রায়মশায়কে এইজন্যই বলেছিলাম পরিশ্রম কম করতে, শুনলেন না সে কথা—

অপুর অনেক ভক্ত আসিয়াছিল। জোগাড়-যন্ত্র করিয়া তাহারা দাহ করিবার ব্যবস্থা করিল। অনেক মানুষ, অনেক গোলমাল—তাহার মধ্যে অপু যেন চুপ করিয়া শুইয়া আছে। মুখ দেখিয়া হৈমন্তী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, শেষ সময়ে অপু বেশী কষ্ট পায় নাই। মুখে একটা তৃপ্তির ভাব মাখানো।

পাড়ার লোকেই হৈমন্তীর বাপের-বাড়ী টেলিগ্রাম করিয়াছে। ঘটনাগুলি হৈমন্তীর চোখের সামনে ছায়াবাজির মত ঘটিয়া যাইতেছিল। সে যেন ইহার সঙ্গে জড়িত নয়, যেন কোথাও বাহিরে এ সমস্ত হইতেছে—সে শুধু দর্শকমাত্র।

দাহ শেষ করিয়া শেষরাত্রে সবাই ফিরিল। খাটের পায়ার কাছে হৈমন্তী একভাবে বসিয়া আছে, একটুও নড়ে নাই। দিন তাহার চোখের সামনেই রাত্রি হইয়াছিল আবার রাত্রিও ভোর হইতে চলিল।

সবাই অবাক হইল কাজলকে দেখিয়া। শ্মশানে সে মুখাগ্নি করিয়াছে অত্যন্ত শান্তভাবে। ফিরিয়া সেই যে জানালায় দাঁড়াইল, পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আর সেখান হইতে নড়িল না। পাশের বাড়ীর ওভারসিয়ার বাবুর স্ত্রী আসিয়া সারারাত হৈমন্তীর কাছে বসিয়াছিলেন। তিনি পর্যন্ত কাজলের নিস্পৃহতা দেখিয়া অবাক হইলেন।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইয়া সব যেন বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। উনানে আগুন নাই, ঠাকুরের কাছে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। পরের দিন সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখনও কেহ ঘরে আলো জ্বালিল না। ওভারসিয়ার বাবুর স্ত্রী সমস্ত রাত জাগিয়া ক্লান্ত ছিলেন, বিশ্রাম করিতে তিনি বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। আবার সকালে আসিবেন বলিয়াছেন। কিছু ফল ও দুধ আনিয়া তিনি বারবার খাইতে বলিয়া গিয়াছেন। ফলের থালা এবং দুধের ঘটি এখনও জলচৌকিটার উপর পড়িয়া আছে—কেহ তাহাতে হাত দেয় নাই।

দুপুরে কাজল অপুর লেখার ঘরে গিয়া বসিল। সমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটা বড় খামের ভিতর টেবিলের উপর রাখা। টেবিলের এককোণে বাবার চুল

আঁচড়াইবার যশোরের-চিরুনিখানা, তাহাতে বাবার কয়েকটা চুল এখনও জড়াইয়া আছে। ঘাড়ের কাছে ময়লা হইয়া-যাওয়া দুইটা জামা দেয়ালের পেরেক হইতে ঝুলিতেছে। এসব দেখিতে দেখিতে কাজল জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইল। বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সূর্যটা কেমন করুণাহীন—কাহারও দুঃখের সমব্যথী নহে, সমস্ত দিন কেবল ঘুরিতেছে। একটা মাকড়সা দুই দেয়ালের কোণে জাল বুনিতেছে অখণ্ড মনোযোগে।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজল টেবিলে এবং হৈমন্তী খাটের পায়ের কাছে বসিয়া রহিল। ঝকঝক শব্দ করিয়া রাঁচী-এক্সপ্রেস জামসেদপুরের দিকে রওনা হইয়া গেল। সমস্ত দিন গরমের পর একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিতেছে। ঘরে আলো নাই, অন্ধকারের ভিতর সমস্ত বাড়ীর শূন্যতাটা হৈমন্তীর কাছে বেশী করিয়া ফুটিল।

হঠাৎ বাইরে পায়ের শব্দ। একটা পরিচিত গলার স্বর শোনা গেল। মানুষটি বারান্দায় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ওভারসিয়ার বাবুর গলা—রাঁচী-এক্সপ্রেসেই এলেন বুঝি?

একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া উঠিল অন্ধকারে। সেই আলোয় পথ দেখিয়া আসিতেছে। ঘরের মধ্যে আবার একটা কাঠি জ্বলিতে হৈমন্তী বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইল। কে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—ভয় নেই মা, আমি এসেছি। বাড়ি অন্ধকার কেন?

সুরপতিবাবু আসিয়াছেন।

মালতীনগরে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। সুরপতিবাবু হৈমন্তী ও কাজলকে মালতীনগরে লইয়া যাইবেন। জিনিসপত্র প্রায় সবই এখানে রাখিয়া যাওয়া হইতেছে, লইয়া যাওয়া খুব কষ্টকর এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। দুই'চারখানা কাপড় সঙ্গে যাইতেছে মাত্র।

সুরপতিবাবু দিন পাঁচেক মৌপাহাড়ী থাকিলেন। মেয়ে সদ্য শোক পাইয়াছে, একটু সামলাইয়া নিক। বিকালের দিকে সতরঞ্চি পাতিয়া তিনি উঠানে বসেন। অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়া থাকেন কোন একদিকে। কিছুদিন আগে এইখানে বসিয়াই অপুর সহিত গল্প হইয়াছে। অপু বলিয়াছিল—আত্মার বিনাশ নেই-বাবা। আত্মা একটা শক্তি। একটা ভীষণ শক্তি—শক্তির বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে মাত্র।

পরলোকে বিশ্বাসী সুরপতিবাবু চারদিকে তাকাইয়া দেখেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইতেছে। তাঁহার মনে হয়, এই মাটি-জল-বাতাসের ভিতর, ঐ দূরের নক্ষত্রটার ভিতর অপুর আত্মা রূপান্তরিত হইয়া মিশিয়া গিয়াছে।

সারাদিন ধরিয়া মৌপাহাড়ী ছাড়িয়া যাওয়ার তোড়জোড়—অথচ সবাই জানে তোড়জোড় করিবার কিছু নাই। সঙ্গে বেশী জিনিসপত্র যাইতেছে না। মৌপাহাড়ীর সহিত এতদিনে যে সম্পর্কটা বহু সুখস্মৃতির সঙ্গে জড়িত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, আসল কষ্ট সেটাকে ছিন্ন করা।

রাত্রি ঝিমঝিম করিতে থাকে। তখনও আলোকবিন্দুহীন অন্ধকারের ভিতর হৈমন্তী কাজলের পাশে শুইয়া চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকে। দূরের থানায় ঘণ্টা বাজিয়া যায়। অনেকক্ষণ পরেও হৈমন্তী বুঝিতে পারে, কাজল জাগিয়া আছে।

পর পর কয়েক রাত জাগিয়া চতুর্থ দিন শেষরাত্রে হৈমন্তী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুমাইয়া সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, সে বড় স্টিলের ট্রাঙ্কটা খুলিয়া তার সামনে দাঁড়াইয়া। কোথাও বেড়াইতে যাওয়া হইতেছে। পাশেই বই-এর আলমারি। অপু হাসিয়া বলিতেছে—শুধু জামাকাপড় নিলেই কি চলবে? আমি তো বই ছাড়া মোটে থাকতে পারি নে—

অপু তাহাকে বই আগাইয়া দিতেছে, সে সাজাইয়া লইতেছে ট্রাঙ্কের ভিতর। মন-ভরা বেড়াইতে যাইবার আনন্দ। যেন সব ঠিক আছে। যেন কিছুই বদলায় নাই।

পরের দিন ঘুম হইতে উঠিয়া হৈমন্তী সুরপতিবাবুর কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

—বাবা!

—কি মা?

—এখান থেকে আর কিছু নয়—শুধু বইগুলো নিয়ে যাবো।

সুরপতি হৈমন্তীর দিকে তাকাইলেন। কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া মুখ নিচু করিয়া বলিলেন—তাই হবে মা। একটা বইও ফেলে যাবো না।

কয়েকটা প্যাকিংবাক্সে বইগুলি ভর্তি করিয়া সুরপতি মালতীনগরের ঠিকানায় রেলে বুক করিয়া দিলেন। যাইবার দিন সকালে কাজল একবার সুবর্ণরেখার ধারে গেল। বাবা যে পাথরটার উপর বসিয়া লিখিত, সেটা একইভাবে পড়িয়া আছে। কাজলের অবাক লাগিল। যখন কাজলও পৃথিবীতে থাকিবে না, তখনও এটা এইভাবে এখানে পড়িয়া থাকিবে। এই নদী, এই চর, ঐ প্রান্তর—সবই একরকম থাকিবে। আকাশটা নীল থাকিবে। কেবল সে থাকিবে না। যেমন এখন বাবা নাই।

কি-একটা পাখী মাথা সামনে-পেছনে নাড়াইতে নাড়াইতে ক্রমশঃ চর বাহিয়া নদীর ভিতরে যাইতেছে। ওপারে বাঁদিকে টিলার মাথায় সূর্যটা যেন আটকা পড়িয়াছে। বাবা এই সময়ে অনেকদিন এইখানে বসিয়া লিখিত।

সে কতদিন আসিয়া বাবাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। একবার তাহার মনে হইল, পেছন ফিরিয়া তাকাইলেই বাবা একটা ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

—অমন লুকিয়ে ছিলে কেন বাবা?

অপু হাসিয়া বলিবে—দেখছিলুম, আমায় না দেখতে পেয়ে তুই ভয় পাস কি না।

এমন কতদিন ঘটিয়াছে। বাবা তাহার সহিত ছেলেমানুষের মত খেলা করিত। লুকোচুরি-খেলা শেষ হইলে খাতাপত্র গুটাইয়া তাহারা বাড়ির পথ ধরিত।

এবার বাবা বড় কঠিন জায়গায় লুকাইয়াছে। আর কেহ তাহাকে পাইতেছে না। আর তাহাকে কোনদিন কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না।

খেলিতে খেলিতে খেলাটা হঠাৎ যেন ভারী রকমের হইয়া গিয়াছে।

হৈমন্তী-জানলা খুলিয়া দিতেই প্রথম নজরে পড়িল ইউক্যালিপটাস গাছ দুইটা। সকালেও বাতাস তাহাদের পাতায় পাতায় সামান্য কাঁপন ধরাইয়াছে। এই গাছ দুইটার ফাঁক দিয়াই সেদিন রাত্রে চাঁদ ধীরে ধীরে দিগন্তের দিকে নামিতেছিল।

— এবার চল, আমার উপন্যাসটা শেষ হলে হরিদ্বার ঘুরে আসি।

—সত্যি বলছ?

—এমন ভাবে বলছ যেন কোনদিন কোথাও নিয়ে যাই নি। তৈরী হও, এবার বেরিয়ে পড়ব।

কথা রাখে নাই। একাই সে লম্বা পাড়ি জমাইয়াছে। বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। বিকালের গাড়িতে চলিয়া যাইতে হইবে। বাড়ীটার, ছোট্ট শহরটার প্রতি ধূলিকণায় তাঁহার স্মৃতি রহিল। সদর-দরজায় তালা ঝুলাইয়া যাইবার পরেও বাড়ীর ভিতরে সে থাকিবে একা। তখন হৈমন্তী থাকিবে না। সেই পরিচিত গলা শোনা যাইবে না—ভাত নেমেছে? না খাইয়ে আজ মারবার মতলব করেছ নাকি?

দিন কাটিয়া যাইবে, আসবাবপত্রে ধূলা জমিবে। মাস এবং বৎসর আপন খেয়ালে কাটিতেই থাকিবে। একটা অর্থহীন অস্তিত্ব হৈমন্তীকে সারা জীবন ক্লান্ত করিতে করিতে এক নিরালম্ব অবস্থায় আনিয়া দিবে।

সত্যই কি অর্থহীন অস্তিত্ব?

একটা কাজ অন্ততঃ তাহার এখনও রহিয়াছে। অপু শুরু করিয়াছিল, তাহাকে শেষ করিতে হইবে। অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞায় সে অপুর কাছে সত্যবদ্ধ।

ঘরের দরজায় শব্দ হইল, কাজল ফিরিয়াছে।

হৈমন্তী বলিল—তোর পড়াশুনোর বইগুলো বেঁধে নিয়েছিস বুড়ো?

দরজায় তালা লাগানো হইয়া গেল। সুরপতি তালাটা ভাল করিয়া টানিয়া দেখিলেন, ঠিকমত লাগিয়াছে কিনা। ওভারসিয়ারবাবুকে বলা রহিল, এদিকে একটু নজর রাখিবার জন্য।

কাজল বারান্দার রেলিংয়ে হাত দিয়া গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না, এখনই এসব ছাড়িয়া অনেকদিনের জন্য—হয়তো বা চিরদিনের জন্য, চলিয়া যাইতে হইবে। যাইতেই হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের ট্রেন এতক্ষণে জামসেদপুর ছাড়াইয়াছে।

হৈমন্তীর বুকের ভিতর কি-একটা আবেগ কোন বাধা না মানিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল। দরজা বন্ধ না হওয়া অবধি সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে শুইবার-ঘরের কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর পটটার দিকে চাহিয়াছিল। দরজার পাল্লা বন্ধ হইতে দৃশ্যটা আড়াল হইয়া গেল। কাজলের হাত ধরিয়া চলিতে শুরু করিয়াই হৈমন্তীর চোখের বাঁধ ভাঙিল, এতক্ষণে বিচ্ছেদটা যেন সম্পূর্ণ হইল। মৌ-পাহাড়ীর মাটি হইতে পা তুলিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মিটিয়া যাইবে।

কয়েকটা শুকনো পাতা বারান্দার উপর দিয়া খড়খড় শব্দে সরিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া উঠানে নামিতে নামিতে কাজল অবাক হইয়া ফিরিয়া তাকাইল। ঠিক মনে হইয়াছিল, কাহার পায়ের শব্দ।

উঁচু নিচু লাল মাটির পথে রিক্সা চলিল স্টেশনের দিকে। সেখানে তাহাদের বিদায় দিবার জন্য অনেকে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহারা ভিড় করিয়া আসিল। এই কয়েক বৎসরে যাহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, যাহারা অপুর লেখার ভক্ত—সবাই আসিয়াছিল। এত কলরবের মধ্যেও হৈমন্তী বার-বার স্টেশনের লাল রাস্তাটার দিকে তাকাইতেছিল। কি-একটা যেন ফেলিয়া আসিয়াছে।

মামাবাড়ীতে আসিবার আগে কাজলের মনে দ্বিধার ভাব ছিল। কিন্তু কয়েক-মাস কাটিবার পর সে অনুভব করিল, এ বাড়ীর সহিত তাহার মানসিকতা বেশ

খাপ খাইয়াছে। মামাবাড়ীতে সবসময়ই একটা সাহিত্য ও শিল্পের হাওয়া বহিতেছে। সেটাই তাহাকে ক্রমশঃ সুস্থ করিয়া তুলিল। প্রতাপ একটি গ্রন্থকীট। তাহার সহিত কাজলের চমৎকার সময় কাটে। দিদিমা তাহাকে খুব ভালবাসেন, তাঁর সম্বন্ধে কাজলের অস্বস্তি দু'দিনেই চলিয়া গিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা বেশী জমিয়াছে কিন্তু দাদুর সঙ্গে।

সুরপতি কাজলকে ছাড়া একটুও থাকিতে পারেন না। কাজলের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখেন নাই, নিজেই পড়ান। ধার্মিক মানুষ তিনি, কাজলের চারিত্রিক শিক্ষার জন্য তাহাকে শিষ্য বানাইয়া লইলেন। সন্ধ্যায় ঘরের বাতি নিভাইয়া দাদুর পাশে বসিয়া কাজলকে ধ্যান করিতে হয়। সুরপতি তাহাকে বলিয়াছেন, মনঃসংযোগ ব্যতীত জীবনে সিদ্ধি আসে না, সন্ধ্যায় কাজল তাই মনঃসংযোগ অভ্যাস করে। দুইগাছা রুদ্রাক্ষের মালা কেনা হইয়াছে—তাহার একটা সুরপতি নিজের গলায় দেন, অন্যটা ধ্যান করিবার সময় কাজল পরে।

এই তিন-চার বৎসরে মালতীনগর আরও অনেক উন্নত হইয়াছে। নূতন দোকানপাট বসিয়াছে, রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় বাড়িয়াছে, বাড়ীঘর অনেক তৈয়ারী হইয়াছে! কলিকাতা খুব দূরে নহে, কাজেই ব্যবসাপত্রের বেশ প্রসার হইতেছে।

মালতীনগরের গোলমাল ছাড়িয়া মাইল দুয়েক গেলে কয়েকটি সুন্দর গ্রাম আছে। পিচের রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া কিছুটা দূরে চমৎকার বাঁশবন, পুকুর, কলসী-কাঁখে গ্রামবধূ দেখা যায়। ধূলাবালি মানুষজনে বিরক্ত হইয়া কাজল মাঝে মাঝে হাঁটিয়া গ্রামের দিকে যায়। নিশ্চিন্দিপুরে যাওয়া হইয়া ওঠে না, এই ভাবেই কাজল প্রকৃতির সহিত সম্পর্ক বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

এক ছুটির দিনে কাজল দুপুরে বসিয়া পড়িতেছে, এমন সময় দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। দরজা খুলিয়া দেখে গোঁফদাড়িওয়ালা এক বলিষ্ঠদেহ লোক দাঁড়াইয়া, কাঁধে কাপড়ের ঝুলি, পায়ে সস্তাদামের চটি। কাজল প্রথমে চিনিতে পারে নাই। তারপরে সে অবাক হইয়া বলিল—মামা?

প্রণব জেলে গিয়াছিল। পুলিশ সন্দেহ করিয়াছিল, বিপ্লবীদের সহিত তাহার যোগাযোগ আছে। তিন বৎসর আগে সে গ্রেপ্তার হয়। জেলে বসিয়াই সে অপুর মৃত্যু-সংবাদ খবরের-কাগজে পড়িয়াছে। সব কাগজেই সাহিত্যিক অপূর্বকুমার রায়ের মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হইয়াছিল। নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া রাণীর নিকট হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া প্রণব এখানে আসিয়াছে।

দৌড়াইয়া কাজল হৈমন্তীকে ডাকিয়া আনিল। হৈমন্তী প্রণবকে কখনও দেখে নাই। ঝুলিটা নামাইয়া প্রণব বসিতে বসিতে বলিল—এ পৃথিবীতে

অপূর্ব আমার সবচেয়ে বড বন্ধু ছিল। তা ছাডা আর একটা পরিচয় আমার আছে—আমি কাজলের মামা।

বিকালে জলখাবার খাইয়া প্রণব কাজলের বইপত্র দেখিতেছিল। কাজলের আলমারীতে বেশ কিছু বই জমিয়াছে। কিছু অপু কিনিয়া দিয়াছিল, কিছু মালতীনগরে আসিবার পর কাজল প্রতাপকে দিয়া কেনাইয়াছে। কাজল এখন বেশ ইংরাজী পডিতে পারে।

বইগুলি নাডিতে নাডিতে প্রণব বলিল—অনেক পডে ফেলেছিস খোকা। তুই আর সেই বাচ্চা খোকন নেই।

সত্যিই, অবাক হইয়াছিল সে। বয়সের তুলনায় কাজল বেশী পড়াশুনা করিতেছে। তার বয়সী অন্য ছেলে এসব বই-এর নামও শোনে নাই।

—তুই বাপের ধারা পেয়েছিস। বাব্বাঃ, অপু তো কলেজ-লাইব্রেরী প্রায় শেষ করে ফেলেছিল।

—আমিও রিপন কলেজে পড়ব, পুলুমামা।

প্রণব নিজের ঘন দাডিতে একবার আঙুল চালাইল।—বেশ তো, তাতে আপত্তি কি? স্কুলে ভাল রেজাল্ট কর—

—আজকে রাত্তিতে তোমাদের কলেজের গল্প বলবে?

প্রণব হাসিল—আমাকে আজকেই যে চলে যেতে হবে খোকন।

কাজলের মুখ শুকনো হইয়া গেল। —সে কথা বললে শুনচি নে, তোমাকে থাকতেই হবে ক'দিন।

—আজকে রাতটা না হয় থাকবো, কিন্তু তার বেশী তো থাকবার উপায় নেই খোকা।

—কেন?

প্রণব কাপড়ের ঝুলিটা দেখাইয়া বলিল—কারণ এইটে।

—কি আছে ওতে?

—ওতে একটা যাদুকাঠি আছে, মানুষের দুঃখ দূর করার।

কাজল আবছাভাবে বুঝিল।—এটা নিয়ে কি করবে তুমি?

—আমি কিছু করব না। ঝোলাটা পৌছে দিয়ে আমার ছুটি।

সন্ধ্যেবেলা অনেক গল্পগুজব হইল। প্রতাপ, হৈমন্তী, কাজল, সরযু সবাই বসিয়া প্রণবের গল্প শুনিল। জেলের নৃশংসতার কথা শুনিয়া সরযু আর হৈমন্তী প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কাজল প্রণবের গা ঘেঁসিয়া বসিল।

—পুলুমামা, বলেছিলে তোমাদের কলেজ-জীবনের গল্প করবে।

—সে কি একদিনে হয় রে! কি মজাই না করতাম আমরা। তোর বাবা

আর আমি ছিলাম ছুটো পাগল। তবে আমার চেয়েও একটু উঁচু ধরণের পাগল ছিল। একবার তো মাঝরাতে আমাদের পুলিশে তাড়া করেছিল—

—কেন?

—পার্কে বসে মাতালের অভিনয় করছিলুম থিয়েটার দেখে বেরিয়ে। তাড়া করতেই দুজনে রেলিং টপকে দৌড়।

সরযূ বলিল—আপনি মানুষটিও দেখছি খুব শান্তশিষ্ট নন।

প্রণব কৌতুক বোধ করিয়া দাড়িতে ঘন ঘন আঙুল চালাইল, তারপর বলিল—শান্ত যে নই তা ভারত সরকারও জানে। দৌরাত্ম্য করার অভ্যেস একেবারে রক্তের ভেতরে মিশে গেছে।

পরের দিন সকালে প্রণব বিদায় লইল। যাইবার সময় হৈমন্তীকে বলিল—আপনাকে সান্ত্বনা দেবো না। অপু আমার জীবনে একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। সে চলে যাওয়ায় নিজেই অনুভব করছি, এর সান্ত্বনা হয় না। তবে আপনি তার সঙ্গে ছিলেন, ভরসা করি শোক সহ্য করবার ক্ষমতা আপনি তার কাছ থেকে পেয়েছেন।

থামিয়া বার দুই দাড়িতে হাত বুলাইয়া পরে কাজলকে দেখাইয়া বলিল—ওকে দেখবেন। ওর চোখে ওর বাবার আগুন রয়েছে।

রাত্রে কাজল ছাদে একটা মাদুর পাতিয়া শোয়, যতক্ষণ-না নিচে হইতে খাওয়ার ডাক আসে। আকাশে মেঘ না থাকিলে ছায়াপথটা দেখা যায়—আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিরাট সাদা নদীর মত দুই দিগন্তকে যুক্ত করিতেছে। বাবার জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইগুলি সে প্রায়ই নাড়াচাড়া করিয়া দেখে, তাই আকাশের আকর্ষণ তার কাছে অসীম। নক্ষত্রে গ্রহে নীহারিকায় একটা রহস্য লুকাইয়া আছে, সে ছাদে শুইয়া রহস্যের আমেজটা উপভোগ করে। বই দেখিয়া দেখিয়া সে অনেক রাশি এবং নক্ষত্রমণ্ডলী চিনিয়াছে।

একদিন হঠাৎ তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিয়াছিল। কোথায় অনন্ত শূন্যে ধূমকেতু গ্রহ-উপগ্রহ বিশাল নীহারিকা অনন্তকাল হইতে ভ্রমণ করিতেছে, আর কোথায় ক্ষুদ্র এক গ্রহ পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র শহর মালতীনগরে সে ছাতে শুইয়া তাহাদের কথা ভাবিতেছে। বিশ্বের বিশালত্বের নিকট তাহার তাৎপর্যহীনতা একেবারে স্পষ্ট হইয়া গেল।

পুরাতন সেই স্কুলেই সে আবার ভর্তি হইয়াছে। পড়াশুনায় সে সাধারণ ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক আগাইয়া আছে বলিয়া কয়েকজন শিক্ষক তাহাকে

স্নেহ করেন, কিন্তু বেশীর ভাগই বিরূপ। পরীক্ষার খাতায় বা হোম-টাস্কের খাতায় কাজলের-লেখা উত্তর তাঁহাদের নিকট অকালপক্কতা বলিয়া মনে হয়।

ছুটির দিনে দুপুরে সবাই ঘুমাইয়া পড়িলে বাবার বই যে আলমারিতে রাখা আছে, সেটা খুলিয়া বই নামাইয়া সে পড়ে। অনেক বইএর বিষয়বস্তু বুঝিতে পারে না, কিন্তু সব বই সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে। শুধুমাত্র বই নাড়াচাড়া করিয়া নীটসে, সোপেনহাওয়ার, ইমানুয়েল কাণ্ট, স্পিনোজা প্রভৃতির নাম মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। দুপুরবেলা কোথাও কোনো শব্দ নাই, রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়ার চলাচল কম, বাড়ীটা যেন ঝিমাইতেছে। সময়টা পড়াশুনা করিবার অত্যন্ত উপযুক্ত। বই খুলিয়া কোলের উপর রাখিয়া পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে। দুপুরবেলার নির্জনতার সহিত তাহার মনটা একাত্ম হইয়া আসে। বিভিন্ন বিষয়ের বই একটা অদ্ভুত জগৎকে হাতের কাছে আনিয়া দেয়—নীহারিকার জগৎ, প্রাণীজগৎ, বিভিন্ন দেশের বিচিত্র উদ্ভিদের জগৎ। ছোটবেলায় বাবা মুখেমুখে তাহাকে বিবর্তনবাদ বোঝাইত, এখন সে আলমারী হইতে বাবার নাম সই-করা 'অরিজিন অব দি স্পিসিজ'—বইটা নামাইয়া পড়িবার চেষ্টা করে। দাঁত ফুটাইতে পারে না, কিন্তু বইখানা খুব আকর্ষণ করে। চারিদিকে যেন শীতকালের শেষ বেলার রৌদ্রের মত একটা সুদূরের হাতছানি—অজানার আহ্বান।

সেদিন আকাশ দেখিয়া মনে হইতেছিল বৃষ্টি নামিবে। কিন্তু কাজলের মনটা সকাল হইতেই কি কারণে বেশ প্রসন্ন ছিল। বৃষ্টির আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া সে বিকালে বেড়াইতে বাহির হইল।

চারিদিকে যেন সন্ধ্যার ছায়া। মেঘ খুব নিচে নামিয়াছে। যে কোন সময়ে বৃষ্টি আসিতে পারে। আকাশে একটাও পাখী নাই, রাস্তায় লোক কম। গাছের ঘন সবুজ পাতা নীল মেঘের পটভূমিতে ভারী সুন্দর দেখাইতেছে। গুমগুম একবার মেঘ ডাকিয়া উঠিল।

রাস্তার ধারে ঘন ঘাসের মধ্যে অজস্র ঘাসফুল ফুটিয়া আছে। কাজলের ইচ্ছা হইল, ঘাসে একবার হাত লাগাইয়া দেখে। রাস্তা ছাড়িয়া নিচু হইয়া সে ঘাসের উপর হাত দিল। সুন্দর কার্পেটের মত পুরু হইয়া ঘাস জন্মিয়াছে। নরম, সবুজ, সজীব। অসংখ্য ঘাসফুল কালো আকাশে নক্ষত্রের মত ছড়াইয়া ফুটিয়াছে। কাজল লক্ষ্য করিয়া দেখিল, প্রত্যেকটি ফুলের তিন পাশে তিনটি করিয়া ঘাসের শীষ বাহির হইয়াছে। কোথাও নিয়মভঙ্গ হয় নাই। একটা করিয়া সাদা ফুল, পাশ দিয়া তিনটি করিয়া ঘাসের শীষ।

একটা ঘাসফুল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া কাজলের মনে হইল কি অদ্ভুত নিয়ম। কিছুতেই একটু এদিক-ওদিক হয় না। এই ছোট্ট সামান্য ফুলটিও সেই নিয়মের শিকল দিয়া আষ্টেপিষ্টে বাঁধা। নিহারিকাময় বিশ্বের কত ক্ষুদ্র নাগরিক, তবু নিজের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে বিশ্বে একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। কয়েকটা ঘাসফুল হাতে করিয়া লইল কাজল মাকে দেওয়ার জন্য। আর একটু হাঁটিয়া সে বাড়ী ফিরিবে।

কয়েক পা হাঁটিয়াই সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। সামনে রেললাইন। ডাইনে সেই ঘাসে-ছাওয়া ঢালু জায়গাটা, যেখানে অনেকদিন আগে বাবার সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়া মৃত গরু পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল।

বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। ভয় পাইয়াছিল বলিয়াই বাবা সেদিন সস্নেহে হাত ধরিয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছিল, আজ কেহ নাই।

একটা ভয়ের ঢেউ তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হনহন করিয়া হাঁটিয়া প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে হৈমন্তীর কাছে পৌঁছিয়া মুঠা খুলিয়া বলিল —এই ছাখো মা তোমার জন্যে কি এনেছি।

কাজল নবম পরিচ্ছেদ

কাজলের মনের গভীরে ছন্দপতনের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আছে। জিনিসটা সে সময় ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। সে জিনিসটার যেমন থাকিবার কথা, যেখানে যে জিনিসটা মানায়, সেখানে তাহা না থাকিলে কাজল ভীষণ অস্বস্তি বোধ করে। অস্বস্তিটাও অদ্ভুত। ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি পিছলাইয়া কি—চ্ করিয়া তীক্ষ্ণ শব্দ হয়—তাহা শুনিলে যেমন গা গুলাইয়া ওঠে, অনেকটা তেমনি। সুন্দর কিছুর মধ্যে সামান্যতম ত্রুটি, তাহার মতে, সমস্ত ব্যাপারটাকে একেবারে মাটি করিয়া দেয়। বাবার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া সুন্দর বিকালবেলাটায় রেললাইনের পাশে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল এই কারণেই। তখন কারণটা বুঝিতে পারে নাই, এখন আবছা ভাবে আন্দাজ করিতে পারে। জগতের সমস্ত দিক ব্যাপিয়া এক অতিমানবিক সঙ্গীত বাজিতেছে, তাহার মধ্যে অসুন্দর কিছু মানায় না। সেতার বাজাইতে বাজাইতে ভুল-তারে হাত পড়িয়া যাইবার মত লাগে।

বাবা তাহাকে একখানি 'ডেভিড কপারফিল্ড' কিনিয়া দিয়াছিল। বইখানি শিশুদের জন্য সংক্ষিপ্ত-করা। আজ তাহার ইচ্ছা হইল, বইখানি নির্জনে কোন

জায়গায় বসিয়া পড়িবে। এ জিনিসটা তাহার বাবাকে দেখিয়া শেখা। কোন ভাল বই অপু সাধারণতঃ বাড়ীর মধ্যে বসিয়া পড়িত না।

দুপুরে কাজল বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সোজা গ্রামের পথ ধরিল। হাতে বইখানা, পকেটে আনা দুই পয়সা—সকালে সুরপতির নিকট হইতে লইয়াছে।

পিচের রাস্তা যেখানে দূরের এক মহকুমা শহরের দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, কাজল সেখানে রাস্তা ছাড়িয়া মাঠে নামিল। মাঠে ধান বুনিয়াছে—গাছ এখনও খুব লম্বা হয় নাই, কাজলের কোমর বরাবর হইবে। মাঠের মাঝখানে আসিয়া চারিদিকে তাকাইলে ব্যাপারটাকে একটা সবুজ ধাঁধা বলিয়া মনে হয়। সামান্য বাতাসেই মাঠ জুড়িয়া সবুজের ঢেউ শুরু হয়, ভারী ভালো লাগে দেখিতে। একদিক হইতে ঢেউ শুরু হয়, একেবারে অপর প্রান্তে গিয়া শেষ হয়।

মাঠ পার হইয়া সামনে একটা বড় বাঁশবন পড়ে। দিনের বেলাতেও তাহার ভিতরটা আধো-অন্ধকার থাকে। লম্বা সরু বাঁশপাতা ঝরিয়া ঝরিয়া তলার মাটি একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছে। মাঠের উজ্জ্বল আলোক ছাড়িয়া বাঁশ-বনে ঢুকিলেই মনে হয়, হঠাৎ সন্ধ্যা নামিল। বেশ ঠাণ্ডা জায়গাটা। বাতাসে বাঁশগাছ দুলিয়া আওয়াজ হইতেছে কট্—কট্—কট্, ক্যাঁ—চ।

বাঁশের গা হইতে কতকগুলি খোলা টানিয়া ছিঁড়িয়া কাজল তাহার উপর বসিল। বই খুলিয়া পড়িতে পড়িতে সে মগ্ন হইয়া যায়। ডেভিডের দুঃখ, ডেভিডের সংগ্রাম করিতে করিতে বড় হওয়া, সব তাহার মনে দাগ কাটে। মানুষের জন্য লেখকের সমবেদনার অশ্রু তাহাকে ডিকেন্সের প্রতি আকৃষ্ট করে। অন্য কে এমনভাবে লিখিতে পারিত? অনাদৃত শুষ্কমুখ ডেভিডকে সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়।

একটা কঞ্চি সামনে বাঁকাভাবে মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর হঠাৎ এক টুনটুনি আসিয়া বসিল। কাজল তাকাইয়া দেখিতেছে, পাখীটা বাসায় আছে—ভয় পাইয়া উড়িয়া যাইতেছে না। কঞ্চিটা অল্প অল্প দুলিতেছে।

কাজল অনুভব করিল, মনে তাহার কোনো দুঃখ নাই, গতকাল রেললাইনের ধারে যে ভয়টা হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহাও অদৃশ্য। চারিদিকে শুধু ছায়া-ছায়া আলো, পাখীর ডাক, ঘন বাঁশবনে নিঃঝুম দুপুরে বাঁশ দুলিবার শব্দ। আর সব-কিছুর সঙ্গে মিলাইয়া রহিয়াছে—ডেভিডের জীবনচিত্র।

বইটা রাখিয়া কাজল চিত হইয়া শুইল্। গতকাল বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, মাটি সামান্য ভিজা। উপরে বাঁশপাতা জড়াজড়ি করিয়া একটা সবুজ চাঁদোয়া বানাইয়াছে, তাহার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখা যায়। মাটি হইতে সোঁদা গন্ধ আসিতেছে। আবার বোধহয় বৃষ্টি হইবে—একসার পিঁপড়া মুখে ডিম লইয়া

ছুটিতেছে। বৃষ্টি হইবার আগে পিঁপড়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘোরে।

একটা বাছুর গলার দড়ি এবং দড়ির প্রান্তে আটকানো খোঁটাসুদ্ধ তাহার সামনে আসিয়া পড়িল। ছোট্ট বাছুরটা, কাহাদের কে জানে—খোঁটা উপড়াইয়া এখানে হাজির হইয়াছে। বাছুরের চোখের শান্ত দৃষ্টি তাহাকে মুগ্ধ করিল। সে হাত বাড়াইয়া ডকিল—আয়, আয়।

নাক উঁচু করিয়া বাতাসে কি শুঁকিয়া বাছুরটা উল্টা পথ ধরিল।

কেমন আরামে তাহার সময় কাটিতেছে। কাজলের একবার দেবেশের কথা মনে পড়িল। সে এখনও মৌপাহাড়ীতে তেমনই বন্ধুদের সহিত অকারণে হৈ হৈ করিয়া কাটাইতেছে। একটা বই পড়া নেই, দু'দণ্ড একলা বসিয়া চিন্তা করা নাই। এই ছায়ায় বসিয়া বই হাতে সে চিন্তা করিয়া যে আনন্দ পাইতেছে, সে আনন্দের সন্ধান কি সারা জীবনেও উহারা পাইবে?

বিকাল হইয়া আসায় সে বাঁশবাগান ছাড়িয়া গ্রামের ভিতর চলিল। এক জায়গায় একটা পানাপুকুর টোপাপানায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। পানা সরাইয়া এক কিশোরী থালা মাজিতেছিল। কাজলকে দেখিয়া ত্বরিতপদে তালগাছের গুঁড়ির তৈয়ারী ঘাট বাহিয়া উপরে উঠিয়া দৌড়াইল। একটা কুকুর, বেশ স্বাস্থ্যবান, তাহার দিকে পুকুরের ওপার হইতে তাকাইয়া আছে। কাজলের মনে হইল—আমার কালু বেঁচে থাকলে ঠিক অত বড় হোত।

কালুর কথা মনে পড়িতে তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। কালু মারা যাইবার পরেও তাহার গলার চেনটা উঠানের কাঠচাঁপার ডালে ঝুলিত।

সামনে একটা খোড়োচালের বাড়ী। কাজল উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—শুনছেন?

খাটো ধুতি পরা একজন বাহির হইয়া আসিল।—কে? কি চাই?

একটু খাবার জল দেবেন?

লোকটা কাজলকে আপাদমস্তক দেখিয়া বলিল—আমরা কিন্তু মুসলমান।

কাজল বলিল—হোক গে, আপনি দিন জল।

—ওখানে কেন? এই দাওয়ায় এসে বোসো খোকা।

—এই গ্রামে বুঝি সবাই মুসলমান?

লোকটা হাসিয়া বলিল—না, না। সবাই নয়, আমরা কয়েক ঘর আছি আর কি।

তাহার পর যেন একটা খুব গোপনীয় কথা হইতেছে, এমন ভাবে মুখটা কাজলের কাছে আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল—মুড়ি খাবে দুটো?

ভাব জমিয়া গেল।

একটু পরেই কাজল দাওয়ায় বসিয়া মুড়ি খাইতে খাইতে গল্প করিতেছে, নাক দিয়া সর্দি-ঝরা একটা বাচ্চা পাশে-রাখা ডেভিড কপারফিল্ড খানা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

লোকটা বলিল—আর দেবে মুড়ি?

—না, এই অনেক। তোমার নাম কি?

লোকটা নাম বলিবার আগে গামছায় একবার মুখ মুছিয়া লইল, যেন তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।—আমার নাম আখের আলি।

ভিতর হইতে একটা বৌ আসিয়া তাহার সামনে একটা বাটি নামাইয়া রাখিল। কাজল অবাক হইয়া বলিল—একি। দুধ কে খাবে?

বৌটি বলিল—খেয়ে নাও। আমাদের গরুর দুধ, ছিটেফোঁটাও পানি নেই। চিনি দেওয়া আছে, মুড়ি দিয়ে খাও। শুধু-মুখে মুড়ি খেতে নেই।

কাজল আখেরকে জিজ্ঞাসা করিল—এ কে?

—আমার বৌ। ওর নাম রাবেয়া।

—এত দুধ খেতে হবে?

আখের আলি বলিল—উপায় নেই, রাবেয়া বিবি যখন ধরেছে, তখন আর—আমাকেই কেবল মোটে আদরযত্ন করে না।

রাবেয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল—আঃ!

কাজল ভাবিল, বড় হইয়া সে দেখা-মানুষ লইয়া—ইহাদের জীবন লইয়া উপন্যাস লিখিবে ডিকেন্সের মতো।

এমন সময় গলায়-খোঁটা সেই বাছুরটা গুটি গুটি আখেরের উঠানে আসিয়া ঢুকিল। আখের বলিল—ঐ এতক্ষণে এসেছে। সারাদিন ঘুরেফিরে এখন আসা হলো। আমি গিয়ে দেখি, বুঝলে, খোঁটা উপড়ে কোথায় হাওয়া হয়েছে। তারপর আসছে-আসছে করে এই এলো—

কাজল এক চুমুকে কিছুটা দুধ খাইয়া বলিল—তোমাদের বাছুর?

খাওয়া হইলে আখের কাজলকে লইয়া তাহার পোষা হাঁস-মুরগী ইত্যাদি দেখাইল। বলিল—কিছুদিন বাদে এসো, তোমাকে একটা হাঁসের বাচ্চা দেবো।

বইখানি বগলদাবা করিয়া কাজল আবার সেই বাঁশবন পার হইয়া মাঠে পড়িল। সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে। বাঁশবাগানে ঘন ছায়া। সে যেখানটায় বসিয়াছিল, সেখানে বাঁশের খোলাগুলি এখনও পড়িয়া আছে। ছোটবেলায় নিশ্চিন্দিপুরে এই সময়টায় অন্ধকার বনের মধ্য দিয়া যাইতে ভয় করিত, ভাবিলে এখন হাসি পায়। গা-ছমছমে অনুভূতি একটা হয় ঠিকই, তবে তাহা ভূতের ভয় নহে।

বাঁশবনটার মাঝখানে সে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল। ঘনায়মান অন্ধকারে সে একা! জনপ্রাণী নাই কোথাও কোনোদিকে। সন্ধ্যার শব্দহীনতায় বাঁশ দুলিবার শব্দটা আরও স্পষ্ট লাগে।

মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে কাজল দেখিল, দিগন্তে মেঘ জমিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। মনে অদ্ভুত আনন্দ। আথেরের সহিত সন্ধ্যাটা খুব ভালো কাটিয়াছে। অচেনা অজানা মানুষ কত তাড়াতাড়ি আপন হইয়া যায়। আবার সে এখানে আসিবে।

মাঠের উপরে সেই সন্ধ্যায় তাহার এক অপূর্ব অনুভূতি হইল। বুঝিল, তাহার জীবন অন্যদের বাঁচিবার প্রণালী হইতে একেবারে ভিন্ন রকম। অযথা সে পৃথিবীতে আসে নাই, তাহার একটা-কিছু করিবার আছে। দিগন্তের ঐ বিদ্যুচ্চমকের মতো সে জীবনের একঘেয়ে আকাশে চমক দিয়া যাইবে। উত্তেজনার প্রাবল্যে জোরে জোরে হাঁটিয়া বাড়ী পৌঁছিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতেই সুরপতি ডাকিয়া বলিলেন—কোথায় ছিলি দাদু?

—বেড়াতে গিয়েছিলাম দাদু, ঐ গ্রামের দিকে।

—রাত-বিরেতে মাঠে-ঘাটে বেশী থাকিস্ নে, সাপ-খোপ বেরোয়।

কাজল হাসিয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া মুখ ধুইতে গেল। সুরপতি ডাকিয়া বলিলেন—চট করে হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আজ একটু আলো নিভিয়ে বোস তো। বড় চঞ্চল হয়েছিস, তোর মনঃসংযোগ হবে না ইয়ে হবে—

মেঘ আকাশের অনেকখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বাতাস একদম বহিতেছে না। ঝড় আসিতে পারে।

আঃ! মনে কোনো ভার নাই, মালিন্য নাই। দুপুরের-দেখা সেই মাঠের মত দিগন্তবিস্তৃত সবুজ জীবন।

ঘরে ফিরিয়া হৈমন্তীকে জড়াইয়া ধরিয়া কাজল বলিল—বড় ভাল লাগছে মা, আজ বড় ভাল লাগছে।

কাজল · দশম পরিচ্ছেদ

হৈমন্তীর ঘরের দেওয়ালে দরজার মাথায় অপুর একখানা ছবি টাঙানো হইয়াছে। সারাজীবনে অপু ছবি তুলিয়াছে খুব কম। বিবাহের পরে পরেই হঠাৎ কি খেয়ালে কলিকাতার এক স্টুডিও হইতে ছবিটা তুলিয়াছিল। রোজ

স্কুলে যাইবার সময় কাজল বাবার ছবিকে প্রণাম করিয়া বাহির হয়। ছবিটা উঠিয়াছিল সুন্দর, মনে হয় অপু হাসি-হাসি মুখে ফ্রেমের ভিতর হইতে তাকাইয়া আছে। পারতপক্ষে হৈমন্তী ছবির দিকে তাকায় না, তাকাইলে বুকটা কেমন করিয়া উঠে।

স্কুলে মাঝে মাঝে সাপ্তাহিক পরীক্ষা লওয়া হয়। এক পরীক্ষায় কাজল বাংলা রচনা লিখিতে গিয়া বিদেশী উপন্যাস হইতে একটা উপমা দিয়াছিল, পরদিন তাহা লইয়া খুব হৈ-চৈ। বাংলার শিক্ষক অখিলবাবু ক্লাসে তাহার খাতাখানা লইয়া আসিলেন। প্রথমেই কাজলের খোঁজ করিলেন।

—অমিতাভ এসেছে? কোথায় সে?

কাজল ভীতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—এসেটা তোমার নিজের লেখা?

—হ্যাঁ সার।

অখিলবাবু চোখ লাল করিলেন।—আবোল-তাবোল এসব কি লিখেছ?

আবোল-তাবোল কোনখানটা কাজল ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

—কি সার?

—যে বইটার কথা তুমি লিখছো, সেটা পড়া আছে তোমার? না জেনে লেখো কেন? অন্য কারুর লেখা মুখস্ত করে লিখেছো? সত্যি কথা বলো।

কাজল লেখার মধ্যে ডুমার 'থি মাসকেটিয়ার্স'-এর উল্লেখ করিয়াছিল। ইংরাজীতে বইটির শিশুপাঠ্য সংস্করণ সে পড়িয়াছে।

—বইট আমি পড়েছি সার।

—আবার তর্ক? মিছে কথা বলছো কেন? এই বই পড়েছো তুমি?

—মিছে কথা নয় সার, গল্পটা আপনাকে আগাগোড়া বলতে পারি।

কাজলের বয়সী কোনো ছেলে যে 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স' পড়িয়া থাকিতে পারে, এ কথা অখিলবাবু বিশ্বাস করিলেন না। তাহার দৃঢ় ধারণা, কাজল মিথ্যাকথা বলিয়াছে, এবং একবার বলিয়া ফেলিয়া এখন আর কথা ঘুরাইতে পারিতেছে না।

অল্প বয়সে যাহা হয়—সে যে অনেক পড়িয়াছে, ইহা লোককে না জানাইয়া কাজল শান্তি পাইতেছিল না। বাহাদুরি দেখাইবার জন্য সে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বইটার কথা উল্লেখ করিয়াছিল। অখিলবাবু চটিয়া হেডমাস্টার মহাশয়ের কাছে গিয়া নালিশ করিলেন। ললিতবাবু হেডমাস্টার, তিনি কাজলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অন্য ছেলে ভয় দেখাইল—যাও না, মজা দেখবে। ফিরে এসে পিঠে মলম লাগাতে হবে।

ললিতবাবু বলিলেন—অখিলবাবু বললেন, তুমি তাঁর সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করেছ। সত্যি ?

—না সার। উনি বললেন আমি মিথ্যে কথা বলছি, আমি নাকি বইটা পড়িনি। আমি বললাম যে গল্পটা ওঁকে শোনাতে পারি।

—সত্যি পড়েছো তুমি ?

সত্যি সার।

—ইংরাজীতে ?

—হ্যাঁ সার। বাবা আমাকে বইটা উপহার দিয়েছিলেন। আমি এখন অনেক বই পড়েছি সার। কেন আমি শুধু শুধু অখিলবাবুর কাছে মিথ্যে কথা বলবো ?

—আর কি কি বই পড়েছো তুমি ?

—'ডেভিড কপারফিল্ড' পড়েছি, 'গালিভারস্ ট্রাভেলস', 'রবিনসন্ ক্রুসো' 'টলস্টয়ের গল্প,—

—'রবিনসন্ ক্রুসো' কার লেখা ?

—ডানিয়েল ডিফো-র।

ললিতবাবু টেবিলের ওপরে রাখা পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন—তোমাকে ইংরেজী কে পড়ান বাড়ীতে ?

—আমার বাবা পড়াতেন সার। বাবা মারা যাওয়ার পরে দাদু পড়ান।

—বেশ। পড়াশুনা করা ভালো, তবে মাস্টারমশাইদের মুখের ওপর তর্ক কোরো না। বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। পড়ে যাও—পড়া ভালো।

কাজল চলিয়া গেলে অখিলবাবুকে ডাকাইলেন। ছেলেটি মিথ্যেকথা বলেছে বলে তো মনে হলো না অখিলবাবু।

বাচ্চা ছেলে ঐসব বই পড়েছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন ? তা ছাড়া এই বয়সে ঐসব পাকামির বই পড়া কি ভালো ?

—জিনিসটা ও-ভাবে দেখবেন না অখিলবাবু। বই তো খারাপ নয়। বিষয়বস্তুর কথা যদি বলেন, তবে বলতে হয়—

অখিলবাবু আলোচনা চাপা দিয়া দিলেন। বইটি তাঁহারও পড়া নাই।

বিকাল চারটায় স্কুলের ছুটি হয়। মসজিদের পাশের রাস্তা দিয়া কাজল রোজ বাড়ী ফেরে। আজ ছুটির পরে বেশ ক্ষুধা অনুভব হওয়ায় অন্যদিন হইতে বেশি জোরে হাঁটিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল। পথে স্কুলের ইংরাজীর শিক্ষক আদিনাথবাবু ডাকিয়া বলিলেন—অমিতাভ, শোন্।

আদিনাথবাবু কাজলকে খুব ভালবাসেন। ক্লাসে ছেলেদের উপদেশ দেন তাহাকে অনুসরণ করিতে। পড়িতে পড়িতে কাজলের নিজস্ব একটা ইংরাজী লেখার ভঙ্গী তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা আদিনাথবাবুর খুব ভালো লাগে।

কাজল আগাইয়া গেল।—কি সার?

—আজ তোকে নিয়ে কি গোলমাল হয়েছে রে স্কুলে?

কাজল খানিকটা বলিতে তিনি বলিলেন—যে যা বলে বলুক। কারো কথায় আমল দিবি নে। পড়াশুনার অভ্যেস কখনো ছাড়বি নে, জীবনে উন্নতি হবে, দেখিস।

হৈমন্তী বসিয়া কি-একটা বই পড়িতেছিল। কাজলকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিল—আয়। আজ এত দেরী হল যে আসতে? হাত-মুখ ধুয়ে আয়, খেতে দিই।

স্কুল হইতে ফিরিয়া কাজল ভাত খায়। হৈমন্তী আসন পাতিতে পাতিতে বলিল—আজকে রাত্তিরে শুয়ে সেই গল্পটা বলবি কিন্তু—

রাত্রে মায়ের কাছে শুইয়া কাজল মাকে গল্প শুনাইয়া থাকে। অপুর একটা ইংরাজী বইতে সে একটা ভূতের গল্প পড়িয়াছিল—সেই গল্পটা সম্প্রতি হৈমন্তীকে বলিতেছে।

দাদুর কাছে পড়া সাঙ্গ হইলে হ্যারিকেন লইয়া সে সতরঞ্চির উপর বসিয়া গল্পের বই পড়ে। ভূতের গল্প হইলে পরিবেশটা অদ্ভুত জমিয়া ওঠে। হ্যারিকেনের আলোর পরিধির বাহিরে যেন অজানা রাজ্য—আলোকবৃত্তের সামান্য পরিসরের ভিতরেই তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে। গল্প খুব জমিলে কাজল কল ঘুরাইয়া পলতে আর একটু বাড়াইয়া দেয়।

খাওয়ার পর কাজল বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। হৈমন্তী বলিল—আবার বেরুবি নাকি? তোর মোটে দেখা পাওয়া যায় না সারাদিন। এখন আবার টই-টই করে বেরুবার কি দরকার? থাক, বাড়ীতে থাক—

বোধহয় খুব একটা ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই কাজল এক-কথায় রাজী হইয়া গেল। বলিল—তুমি খাটে শোও মা। আমি পাশে শুয়ে গল্প করি।

হৈমন্তী প্রায়ই ছেলেকে নিজের ছোটবেলার গল্প শোনায়। যে দিনগুলি কাজল দেখে নাই, কাজলের ধারণা সেগুলি বর্তমানের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। অতীতের প্রতি তাহার যে স্বপ্নময় কল্পনা রহিয়াছে, তাহাই হৈমন্তীর গল্পকে তাহার নিকট বাস্তব করিয়া তোলে। সেই দুর্গাপূজার আগে শিউলি ফুল তুলিতে যাওয়া, শিউলি ফুলের বোঁটা দিয়া কাপড় রঙীন করা। দল বাঁধিয়া হৈ হৈ করিয়া ঠাকুর দেখিতে বাহির হওয়া। কাজলের ধারণা সে

দিনগুলি অনেক ভালো ছিল—অনেক, অনেক ভালো। মাকে বলে—মা, সেই গল্পটা বলো—সেই ঢাকায় যা হয়েছিল।

ঢাকায় থাকার সময়, হৈমন্তী তখন খুব ছোট, কাজলের দিদিমা একবার গভীর রাত্রে উঠিয়া ঘুমের মধ্যেই দোতলা হইতে একতলায় আসিয়া গিয়াছিলেন। গভীর রাত, কেহ কোথাও নাই, হঠাৎ দিদিমা বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, বাবা এসেছেন—আমি দরজা খুলে দিই গে যাই। স্মরপতি উঠিয়া পেছন পেছন গেলেন। দরজা খুলিয়া দেখা গেল, কিছুই না। তখনও দিদিমার ঘুম ভালো করিয়া ভাঙে নাই।

গল্প শুরু হইল। এক গল্প হইতে অন্য গল্পে যাইতে যাইতে ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিল। জানলার বাহিরে দিনের আলো শেষ হইয়া আসিতেছে, ঘরের ভিতর এখনই আবছা অন্ধকার। হৈমন্তী গল্প থামাইয়া বলিল—যাই, সন্ধ্যেটা দেখিয়ে আসি। দিদি বোধহয় চা করে ফেলল এতক্ষণে।

কাজল চুপ করিয়া ছিল। পুরাতন দিনের গল্প, সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকাব তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। উঠিতে গিয়া হৈমন্তী কি-একটা মনে পড়িয়া যাইবার ভঙ্গীতে বলিল—একটা ব্যাপার হয়েছে, জানিস।

—কি ?

—আজ ক'দিন ধরে দেখছি, যার কথা খুব ভাবি সে এসে হাজির হয়। বিয়ের আগে বকুলের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, যাকে বলে গলায়-গলায়। তার বিয়ে হয়েছে কোন্নগরে। আজ দুপুরে বকুলের কথা খুব মনে পড়ছিল। ওমা হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, দুপুরেই বকুল এসে হাজির। বললে—বেড়াতে এসেছি, তোমাদের এখান থেকে ঘুরে গেলাম। দু'দিন আগে এল উমা, তার কথাও ভাবছিলাম সেদিন।

কাজল হৈমন্তীর দিকে তাকাইল।

—যাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, সেই এসে হাজির হচ্ছে ?

হৈমন্তী মাথা নাড়িল।

কাজল দরজার উপরে বাবার ছবিটার দিকে তাকাইল। যদিও ঘর অন্ধকার, তবুও বাবার মৃদু হাসি ঠিক ধরা যায়।

কাজলের স্কুল হইতে ফিরিবার পথে একটা দোকান পড়ে। ছাত্রেরা দোকান হইতে চকোলেট-বিস্কুট কিনিয়া খায়। সেদিন কাজল দোকানে ঢুকিল।

উদ্দেশ্য, বিশেষ এক ধরনের লজেন্‌স্‌ ক্রয় করা। একদিন খাইয়া ভাল লাগিয়াছিল, আবার কিনিবার জন্য স্মরপতির নিকট হইতে পয়সা লইয়া আসিয়াছে। দোকানদারকে সবাইকে আণ্টি বলিয়া ডাকে। ওষ্ঠদেশে প্রলম্বিত গুম্ফ-যুক্ত একজন দশাসই পুরুষের উদ্দেশ্যে কেন যে উক্ত বিদেশী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি প্রযুক্ত হয়, বোঝা মুশকিল। তবে মানুষটি ঐ ডাকে সাড়া দিয়া থাকে কোনো উষ্মা প্রকাশ না করিয়াই।

আণ্টি কাজলকে লজেন্‌স্‌ গণিয়া দিতেছে, এমন সময় দোকানের পিছন হইতে বেশ ভাল গলায়-গাওয়া গান ভাসিয়া আসিল। কাজল জিজ্ঞাসা করিল —কে গান গাইছে আণ্টি?

আণ্টি বলিল—আপনাদের ইস্কুলেরই ছেলে, এখানে এসে বসে মাঝে মাঝে।

আণ্টি তর্জনী আর মধ্যমা একত্রে ঠোঁটের কাছে ধরিয়া হুস-হুস করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল।

কৌতূহলী কাজল দোকানের পিছন দিকে ঢুকিল।

জায়গাটা আণ্টির শুইবার স্থান! দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, উপরে টিনের চাল। মেঝেয় কালি-পড়া মেটে হাড়ি, এনামেলের সানকি, তোলা-উনান এবং ঘরের কোণে-রাখা একটা প্যাকিংবাক্সে তৈল-তণ্ডুলাদি। একপ্রান্তে দড়ির-খাটিয়ায় ময়লা-কুটকুটে বিছানা, তাহার উপর বসিয়া একটি ফর্সামত ছেলে চোখ বুজিয়া হাত সামনে বাড়াইয়া রীতিমত ওস্তাদি ঢঙে গান গাহিতেছে। কোনো ষষ্ঠেন্দ্রিয় দ্বারা কাজলের উপস্থিতি বুঝিয়া সে গান থামাইল এবং চোখ খুলিয়া তাকাইল।

কাজল এবং ফর্সা ছেলেটি কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল। নীরবতা অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া কাজল বলিল—গাও না, বেশ তো গাইছিলে।

ছেলেটি হাসিল। এবং ময়লা বিছানার এক প্রান্ত হাত দিয়া ঝাড়িয়া বলিল—এখানে বসো।

এতক্ষণে কাজলের মনে পড়িয়াছে, ছেলেটি তাহাদেরই ক্লাসে অন্য সেকশনে পড়ে। আলাপ হয় নাই—দূর হইতে বার কয়েক দেখিয়াছে। কাজল জিজ্ঞাসা করিল—তুমি তো বি-সেকশনে পড়ো, না? তোমার নাম কি?

ছেলেটি মাথা পেছনে হেলাইয়া চোখ অর্ধনিমীলিত করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল—আমার নাম ব্যোমকেশ চৌধুরী। তাহার ভঙ্গী দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারিত, সে বলিতেছে—আমার নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

কাজল বুঝিল একটি অদ্ভুত চরিত্রের সহিত পরিচয় হইতে চলিয়াছে। সে

আণ্টির বিছানায় বসিল।

—তুমি কি গাইছিলে? সুন্দর সুর।

—মালকোষ গাইছিলাম, বেশ মেজাজ আসে গাইলে।

কাজল অবাক হইল। এ অঞ্চলে রবীন্দ্রসঙ্গীতই কেহ গায় না, তার উপর রাগসঙ্গীত!

—তুমি গান শেখো?

—ছোড়দা শেখে। ছোড়দা ওস্তাদের কাছে শেখে, আমি ছোড়দার কাছে শিখি। কাজেই আমিও শিখি বলতে পারো। তুমি সিগারেট খাও?

খাওয়া দূরের কথা, কাজল কল্পনাও করিতে পারে না।

—আমিই খাই তবে।

পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া আণ্টির বিছানার নিচে হইতে ব্যোমকেশ দেশলাই বাহির করিল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—আমাদের দেশ বগুলায়। বগুলার নাম শুনেছো? বগুলার কাছেই কুমারী-রামনগর গ্রামে আমাদের বাড়ী। বাবা ডাক্তার। তোমার বাড়ী কোথায়?

—আমাদের দেশ নিশ্চিন্দিপুরে, সে-ও গ্রাম। বাবা মারা যাওয়ার পর এখানে মামাবাড়ীতে থাকি।

—রবিঠাকুরের কবিতা কেমন লাগে?

কাজল বিপদে পড়িল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাহার খুব বেশী পড়া নাই, দুই-একটা যাহা পড়িয়াছে, সম্পূর্ণ মানে বোঝে নাই। বলিল—বেশী তো পড়ি নি, যা পড়েছি বেশ লেগেছে।

অনেক কথাবার্তা হইল। কাজল দেখিল, ব্যোমকেশ একটু ছিটগ্রস্ত। মনের খুশীতে ঘোরে, গান গায়, বই পড়ে। মাঠে মাঠে ঘুরিয়া গাছপালা চিনিয়া বেড়ায়। এমন সব গাছপালার নাম করিল, যাহা কাজল চিনিলেও অনেক শহুরে ছেলে নামও শোনে নাই। উঠিবার সময়ে আড়মোড়া ভাঙিয়া বলিল—তা-ও কতকিছু ভুলে যেতে বসেছি। গ্রামে থাকতে অনেক কিছু জানতাম—

গ্রাম ছেড়ে এলে কেন?

—ছোড়দা এখানে চাকরী করে। ছোড়দার কাছে থেকে পড়ি। বাবার একার আয়ে চলে না। নতুন পাস-করা ভালো ভালো সব ডাক্তার গিয়ে গিয়ে বাবার পসার মাটি করেছে। বাবা খুব তেজী লোক ছিলেন, জানো? অনেক দিন আগে সেটেলমেণ্টের লোক জমি জরিপ করতে গিয়েছিল—সঙ্গে ছিল, এক সায়েব। মায়ের কঠিন অসুখে পড়লে বাবা চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তোলেন! সায়েব বলেছিল বাবাকে বিলেতে নিয়ে যাবে। এক

রাত্তিরে বাবা তো পালিয়ে যাবার মতলব করলেন। বাবার বয়স তখন সাতাশ-আটাশ, রক্ত গরম। কথা ছিল মাইল দশেক দূরে এক জায়গায় দেখা করার, সেখান থেকে সায়েব বাবাকে নিয়ে চলে যাবে। ঠাকুমা কি করে জানতে পেরে আগে থেকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বাবা ঘোড়ায় চেপে বাড়ীর পাশের বড় আমবাগানটা পার হচ্ছেন, ঠাকুমা এসে পড়লেন একেবারে ঘোড়ার সামনে। বললেন—হরু, যেতে হয় আমার উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যা। বাবার আর বিলেত যাওয়া হলো না।

পরের দিন আবার দেখা হইবে বলিয়া কাজল বিদায় লইল।

ব্যোমকেশের সহিত কাজলের ঘনিষ্ঠতা বেশ বাড়িয়া উঠিল। তুইজনে শহর ছাড়াইয়া গ্রামের দিকে বেড়াইতে যায়, কাঁঠালিয়া গ্রামের আখের আলির বাড়ী যায়। ব্যোমকেশ মাঠের মধ্যে হাত-পা নাড়িয়া গান করিতে করিতে হাঁটে। কখনো বৃষ্টি আসিলে তুজনে দৌড়াইয়া চাষীদের ধান পাহারা-দেওয়া চালার নিচে আশ্রয় নেয়। বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ একটা সিগারেট ধরাইয়া বলে—চমৎকার বৃষ্টি, গাইতে ইচ্ছে করছে। দেশ আর মল্লার—এ তুটো ঝম-ঝম বৃষ্টিতে ভারী জমে, বুঝলে?

কোথায় একটা পাখী ডাকিয়া ওঠে—কুউ-কুউ কুউ-কুউ। স্বরটা খাদ হইতে আরম্ভ হইয়া চড়ায় গিয়া শেষ হয়। ব্যোমকেশ বলে—বর্ষাকোকিল ডাকছে, শুনছো?

কাজল ডাকটা আগেও শুনিয়াছে, কিন্তু নামটা যে বর্ষাকোকিল তাহা জানিত না—বর্ষার কোকিল আছে নাকি আবার?

—নেই তো ওটা কি ডাকছে?

চারিদিকে বুক-সমান ধানগাছ দেখাইয়া ব্যোমকেশ বলে—রামনগরে এইরকম ধানক্ষেতে বর্ষার দিনে আমাকে একবার সাপে তাড়া করেছিল। টিপ-টিপ বৃষ্টি হচ্ছে, আলের উপর দিয়ে হাঁটছি, এমন সময় ধানগাছের ভেতর থেকে বিরাট কেউটে এসে আলের ওপর উঠল। কি তার ফোঁস-ফোঁসানি, কি তার কুলোপানা চক্কর। নেহাৎ আমার কাছে বেদের-দেওয়া সাপের ওষুধ ছিল, তাই বেঁচে গেলাম।

—কি করলে ওষুধ দিয়ে?

—ওষুধ একরকম শেকড়। সাপের ভয়ে তাই সবসময় পকেটে নিয়ে ঘুরতাম—আমাদের ওদিকে ভীষণ সাপের উপদ্রব কিনা। ছোবল মারবে বলে সাপটা যেই ফণা তুলেছে, অমনি শেকড়টা বাড়িয়ে দিলাম। সাপ মাথা নিচু করে চলে গেল—না কামড়ে।

স্কুল-জীবনে ব্যোমকেশ কাজলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল—একমাত্র বন্ধু। পরে অবশ্য যোগাযোগ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিন দিন পরীক্ষা দিবার পর ব্যোমকেশ আর আসিল না। কে আসিয়া বলিল—স্কুলে আসিবার সময় সে দেখিয়াছে, ব্যোমকেশ মাঠের ধারে বসিয়া গান গাহিতেছে, পাশে খাতা-কলম-দোয়াত!

পরীক্ষা হইয়া যাইবার পর কাজল ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুই পরীক্ষা দিলি না কেন?

ব্যোমকেশ হাসিল। পরীক্ষা দিবে বলিয়াই খাতা-কলম লইয়া বাহির সে হইয়াছিল—পথে মাঠের দৃশ্যটা এমন ভাল লাগিয়া গেল যে বসিয়া একটা গান না গাহিয়া সে পারে নাই। গানটা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হওয়ায় দেড়ঘণ্টা সময় পার হইয়া গিয়াছিল।

ব্যোমকেশ কোনোদিনই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই। বৎসর চারেক বাদে একদিন কাজলের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল—তখন ব্যোমকেশের খুব দুঃসময় যাইতেছে। পড়াশুনা হয় নাই, চাকরী পায় নাই। বাবা মারা গিয়াছেন, দাদার সংসারে অনটন—সেখানে বসিয়া বসিয়া খাওয়া ভাল দেখায় না। শুষ্ক মুখে চাকরীর সন্ধানে ঘুরিতেছে। আর গান গায় না, আগের সে প্রাণোচ্ছলতা নাই। কাজলের খুব খারাপ লাগিতেছিল, কিন্তু করিবার কিছুই ছিল না।

প্রথম আলাপের মাসখানেক বাদে এক বিকালে ব্যোমকেশ কাজলের বাড়ীতে আসিল। কাজল ঘরে বসিয়া পড়িতেছে (পাঠ্য নহে—অপাঠ্য বই), হৈমন্তী আসিয়া বলিল—বুড়ো, তোকে কে ডাকছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আসতে বললাম, এলো না।

কাজল বাহির হইতেই ব্যোমকেশ বলিল—খুব বেশী হলে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া যেতে পারে। চট করে একটা জামা গলিয়ে বেরিয়ে পড়বি। দেরী করিস না, যা—

—কিন্তু যাবোটা কোথায়?

—সে সব পরে। আগে বেরিয়ে আয়।

বাহির হইয়া ব্যোমকেশ বলিল—বিপুলগড়ের শিবমন্দিরে যাবো, চল্। যাবো-যাবো করছিলাম, আজকে মনস্থির করে ফেলেছি।

—বিপুলগড়ে যাবি এখন? তোর কি মাথা খারাপ?

—মেলা বকিস না। খুব মজা হবে, দেখবি।

বিপুলগড় কাঁঠালিয়া ছাড়াইয়া অনেক দূরে। গ্রামের বাহিরে জঙ্গলের ভিতরে একটা পোড়ো-শিবমন্দির আছে। দিনের বেলাও কেহ সেখানে যায় না। কারণ প্রথমত ঘন জঙ্গল, দ্বিতীয়তঃ মন্দিরে আকর্ষণীয় কিছু নাই। বড়লোক জমিদার শখ করিয়া মন্দির বানাইয়াছিল—তাহারা সপরিবারে কলিকাতায় উঠিয়া গিয়াছে। সে প্রায় সত্তর বৎসর আগের কথা। তাহাদের বড়বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পাশেই পড়িয়া আছে—জঙ্গলাবৃত অবস্থায়।

কাজল একটু আপত্তি করিয়া বলিল—বৃষ্টি আসতে পারে, দেখছিস না আকাশে মেঘ। অমন জায়গায় যাওয়াটা উচিত হবে এখন।

—তবে থাক তুই।

ব্যোমকেশ সত্যই চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কাজল দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিল।—রাগ করছিস কেন? চল, আমিও যাবো।

আকাশে মেঘ ছিল—আরও মেঘ চাপিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। ব্যোমকেশ বলিল—অ্যাডভেঞ্চারের পরিবেশ তো এই! মেঘলা দিন, জঙ্গলের ভেতর পোড়ো-মন্দির, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। একেবারে পাঁচকড়িদে-র গল্প, এঁ্যা?

ততক্ষণে কাজলেরও ভাল লাগিতে শুরু করিয়াছে। ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন পড়িয়া বহু দুর্গম দেশে এ্যাডভেঞ্চার করিয়াছে সে মনে মনে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা সুঁড়িপথে তাহারা ঢুকিল। বেলা আছে, কিন্তু মনে হইতেছে সন্ধ্যা নামিল বলিয়া। শিবমন্দিরের চাতালে উঠিয়া দুইজনে দাঁড়াইল। মাথায় বটগাছ গজাইয়াছে, ভারী কাঠের দরজা ভাঙিয়া কজায় আটকাইয়া ঝুলিতেছে। চাতাল চৌকা-টালি বসাইয়া তৈয়ারী, এতদিন বাদেও বেশ মসৃণ। একটুও শব্দ নাই কোন দিকে, বাতাসে একটা বন্য গন্ধ।

কাজল চাতালের উপর বসিয়া পড়িল। কয়েকটা কালো ডেয়োপিঁপড়া এখানে-ওখানে ঘুরিতেছে। ঠিক নিচেই কতকগুলি বনতুলসীর গাছ জড়াজড়ি করিয়া আছে। দূরে ভাঙা নাটমন্দির দেখা যাইতেছে। কাজল ভাবিতেছিল, এই জায়গাটা না-জানি কত জাঁকমকপূর্ণ ছিল! দোল-দুর্গোৎসবে কুলবধূরা ভিড় করিয়া পূজা দেখিত, ঝাড়লণ্ঠনের আলো প্রতিমার মুখে পড়িয়া ঘামতেল চকচক করিত। সন্ধ্যায় শাঁখ বাজিত, বৃদ্ধারা মালাজপ করিতেন। কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কেহ নাই, কিছুই নাই। তাদের চিহ্ন পৃথিবী হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে, সাক্ষি হিসাবে রহিয়াছে কেবল এই [illegible] নাটমন্দির।

ব্যোমকেশ ডাকিল—অমিতাভ!

—কি?

—কি রকম একটা লাগছে না ?

কাজল ব্যোমকেশের দিকে তাকাইল। ব্যোমকেশের মুখ গম্ভীর, যেন একটা ভয়ানক-কিছুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

—কি রকম লাগছে মানে ?

—চারিদিকে কেমন একটা থম থমে ভাব, তাই না ? এমনি জায়গাতেই তো বহুদিনের মৃত আত্মারা নেমে আসে।

কাজল সমর্থন করিল। আসিয়াই জিনিসটা সে অনুভব করিয়াছে। বাতাসে রহস্যের গন্ধ—সাধারণত জীবনে যাহা ঘটে না, তাহা যেন এখানে এখনই ঘটিবে। কিছুদিন আগেই সে 'রিপ ভ্যান উইঙ্কল' পড়িয়াছে। ঐ সুঁড়িপথটির বাঁক হইতে এখনি হাফমুন জাহাজের কোন মৃত নাবিক বাহির হইয়া আসিলে সে বিন্দুমাত্র অবাক হইবে না।

ব্যোমকেশ বলিল—মন্দিরের ভিতর ঢুকে দেখি চল—

ভিতরে বেশ অন্ধকার। ব্যোমকেশ পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিল। কাঠি পুড়িতে যতটা সময় লাগে তার মধ্যেই দেখা, মন্দিরের ভিতরে কালো পাথরের শিবলিঙ্গ—তাহার মাথায় কয়েকটি ফুল। ঘরের ভিতরে আর কিছু নাই—দেওয়ালে একটা কুলুঙ্গি ছাড়া।

বাহিরে আসিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিল—একটু ভূপালী গাই।

কাজল হাঁটুর উপর থুতনি রাখিয়া শুনিতে লাগিল। ভূপালী রাগ ব্যোমকেশ ভালই আয়ত্ত করিয়াছে। দরাজ গলায় ষড়জ লাগাইয়া আলাপ শুরু করিল। এমন সময় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। গান থামাইয়া ব্যোমকেশ উপর দিকে তাকাইয়া বলিল—বৃষ্টি এলো বলে মনে হচ্ছে।

কথা শেষ হইতে না হইতে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি নামিল। ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—ঢোক মন্দিরে।

হুড়মুড় করিয়া মন্দিরে ঢুকিল। বৃষ্টির তোড় প্রতি মুহূর্তে বাড়িতেছে। সাবধানে শিবলিঙ্গের স্পর্শ বাঁচাইয়া দুইজনে এক কোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দরজার ফ্রেমে আটকানো বাহিরের বনজঙ্গল, মন্দিরের চাতালের কিয়দংশ প্রচণ্ড বৃষ্টিতে অদ্ভুত দেখাইতেছে। কাজল বলিল—মুশকিল হোলো, এখন ফিরবো কি কোরে ?

—ফেরবার তাড়া কিসের ? বেশ তো লাগছে। ব্যোমকেশের গলা স্বপ্নালু।

বৃষ্টি কমিল না! জোরে হাওয়া এক একবার ভীষণ ঝাপটে দরজার ভাঙা পাল্লাটাকে খট খট করিয়া নাড়িতেছে। বাতাসের জোর খুব বাড়িয়াছে,

অত্ত ভারী পাল্লাটা নড়িতেছে যখন। মাঝে-মাঝে বৃষ্টির ছাঁট আসিয়া পড়িতেছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত-শীত করিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর কিছু দেখা যায় না, ঘন অন্ধকার। ব্যোমকেশ বলিল—যখন আলো জ্বাললাম, ঠাকুরের মাথায় ফুল দেখেছিলি অমিতাভ?

—হুঁ।

—তার মানে, বোজ কেউ পূজা করে যায়। কুলুঙ্গিতে কি আছে দেখি দাঁড়া, মানুষ এখানে আসে যখন—

একটু পরেই অন্ধকারেব ভিতর আবাব ব্যোমকেশেব গলার স্বর—কি পেলাম বল তো?

—কি?

—মোমবাতি। দাঁড়া জ্বালি। মোমবাতির সঙ্গে আরও এক জিনিস আছে। গাঁজার কল্‌কে।

মন্দিরে অতএব শিবভক্তদের আনাগোনা প্রমাণিত হইল; কাজলের হাসি পাইতেছিল। মোমবাতি জ্বালাইয়া সেটাকে কোণের দিকে রাখিয়া ব্যোমকেশ গান ধরিল—দেশ রাগে।

বাহিরে হাওয়ার মাতামাতি—অন্ধকার, ভেতরে মোমবাতির কাঁপা স্বল্প আলো, তাহাব সহিত ব্যোমকেশের গান। কাজল ভুলিয়া গেল বাড়ী ফিরিতে আজ অনেক দেরী হইবে, মা ভাবনা করিবে। ভুলিয়া গেল যে স্থানে তাহারা বসিয়া আছে, তাহা আদৌ নিরাপদ নহে। বোমাঞ্চকর পরিবেশ তাহাকে সব ভুলাইয়া দিয়াছিল।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কাজল বাহিরে তাকাইল। ভাঙা নাটমন্দিরের দিকটা একেবারে ভূতের দেশ বলিয়া মনে হইতেছে। বিদ্যুৎ চমকাইলে চারিদিক পলকের জন্য আলোকিত হইয়া উঠিয়াই আবার আবছা অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। দরজার দুইদিকে হাত রাখিয়া সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

এক নাগাড়ে প্রায় চার ঘণ্টা বৃষ্টি হইয়া তারপর থামিল। ব্যোমকেশ আর কাজল পাশাপাশি হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। কাহারও মুখে কথা নাই। এই চার ঘণ্টার অভিজ্ঞতা তাহাদের প্রাণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। মেঘ জমিয়া আছে, তবে বৃষ্টি নামিবার আপাতত আশঙ্কা নাই।

রাত্রে কাজল চোরের মত বাড়িতে পা দিল, তখন তাহাকে খুঁজিবার জন্য লোক বাহির হইয়া গিয়াছে। *

একদিন কানে আসিল খঞ্জনীর বাজনা—কে যেন খঞ্জনী বাজাইয়া

গাহিতেছে। মানুষটা কাজলের চেনা চেনা লাগিল, তারপরই দৌড়াইয়া লোকটির কাছে গিয়া ডাকিল রামদাস কাকা!

রামদাস প্রথমে কাজলকে চিনিতে পারে নাই। একটু পরেই প্রসন্ন হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। পুরাতন দিনের অভ্যাস মত খঞ্জনীটা একবার দ্রুত বাজাইয়া বলিল—খোকন বাবা না? তুমি এখানে কোথায়? তোমাকে তো মাধবপুরের মাঠে দেখেছিলাম—

কাজল তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিল, শুনিয়া রামদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু পরে গলা সাফ করিয়া বলিল—বাবার সঙ্গে দেখা হলো না, আমারই দোষ। আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ি যাবো—গিয়ে উঠতে পারিনি।

কাজল দেখিল রামদাস একই রকম আছে, বিশেষ বদলায় নাই। কথায় কথায় হাসে, কথায় কথায় খঞ্জনী বাজায়। অপুর মৃত্যুর কথা শুনিয়া সে একটুখানি গম্ভীর হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই হাসিয়া বলিল—আমারই বা আর ক'দিন, খোকন বাবা? তাঁর নামেই জীবন, তাঁর নামেই মৃত্যু—নিজের নামে কিছু রাখলেই যত বখেড়া এসে জোটে। বেশ তো আছি তাঁর নাম করে—

কাজল বলিল—তুমি আজ আমাদের বাড়ি যাবে চলো, কোনো কথা শুনবো না।

—কিন্তু আজকাল আমি একবেলা আহার করি, ওবেলা একবার হয়ে গেছে।

—মিষ্টি খাবে চল, তাতে দোষ নেই। মা তো একাদশীর দিন মিষ্টি খান।

—মিষ্টি খাওয়া যায় হয়তো, কিন্তু অত হাঙ্গামার কি দরকার? খাওয়াটাই সব নয়, তার চেয়ে কোথাও বসে একটু কথা বলি তোমার সঙ্গে।

কাজল কিছুতেই শুনিল না, রামদাসকে বাড়ী লইয়া গেল। হৈমন্তী যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া বসাইয়া খাওয়াইল। খাইতে পাইয়া রামদাস ছেলেমানুষের মত খুশী হইল। খাইবে না খাইবে না করিয়া অনেকগুলি মণ্ডা খাইয়া ফেলিল। হৈমন্তী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—আর দেবো বাবা? রামদাস ব্যস্ত হইয়া বলিল—আর না, আর না। খোকোন বাবা, এবার তুমি খাও—

—আমি খেয়েছি কাকা, চলো তোমার সঙ্গে বরং একটু ঘুরে আসি।

বাহির হইবার আগে হৈমন্তী রামদাসকে বেশ বড় রকমের একটা সিধা আনিয়া দিল, সিধার চালের উপর একটা টাকাও আনিয়াছে। রামদাস হাসিয়া বলিল—এত সব কার জন্যে?

—এ আপনাকে নিতে হবে বাবা, সামান্য দিয়েছি।

—শ্রদ্ধার দান মাত্রই অসামান্য, সামান্য নয়। কিন্তু এ তো আমি নিতে পারবো না।

—কেন বাবা।

—প্রয়োজন মত আমি ভিক্ষা করি, প্রয়োজনের অধিক কখনও নিই না। তাতে আর একজনের অন্নে ভাগ বসানো হয়। আজ ভিক্ষা করে কালকের মত চাল পেয়ে গেছি—আজ আর নেবো না।

বহু অনুরোধেও রামদাস রাজী হইল না। রাস্তায় বাহির হইয়া কাজলকে বলিল—নিলে কেবল লোভ বাড়ে, লোভ বড় খারাপ জিনিস খোকন বাবা। লোভ কথাটা উচ্চারণ করিবার সময় সে এমন ভাব করিল যেন সামনে সাপ দেখিয়াছে।

কাজল বলিল—তোমাকে যদি এখন কেউ এক লাখ টাকা দেয়, তাও নেবে না?

—কি করবো নিয়ে? তাতে আমার মনের শান্তি চলে যাবে, সবসময়ে ভালো খেতে ভালো পরতে ইচ্ছে হবে। রাত্তিরে জেগে বসে থাকতে হবে, পাছে চোরে টাকা নিয়ে যায়। এই করে করে যখন বুড়ো হব, তখন হঠাৎ একদিন দেখবো আমার একলাখ টাকা কবে জমার খাতা থেকে খরচের খাতায় চলে গেছে, জমার খাতায় মস্ত বড় একটা শূন্য। না না খোকন বাবা, তিনি আমাকে যেন কখনো টাকা পয়সা না দেন—সে আমি সহ্য করতে পারবো না, মরে যাবো।

কাজলের রামদাসের প্রতি শ্রদ্ধা হইল। সে বলিল—কিন্তু সারাজীবন এইভাবে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াতে তোমার ভালো লাগবে? শেষ জীবনে একটা আশ্রয় তো দরকার—

রামদাস মৃদু মৃদু খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে বলিল—ছন্নছাড়া! আমাকে ছন্নছাড়া বলছো, তোমার সাহস তো কম নয় বাবাজী। আমাকে তিনি যেমন রেখেছেন, তেমনি আছি। তিনি যেমনভাবে যেখানে খেলা শেষ করতে বলবেন, সেখানে তেমনিভাবে খেলা শেষ করে দেবো। তাঁর হাতে আছি—তার মধ্যে আবার খারাপ ভালো কি?

কাজলের পক্ষে যদিও রামদাসের দর্শনের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভবপর নয়, তবুও তাহার কথা কাজলের ভালো লাগিতেছিল। সহজ বিশ্বাসের সুরটি তাহার হৃদয় অধিকার করিতে বেশী সময় নেয় নাই।

কাজল বলিল—এর মধ্যে অনেক ঘুরেছ তুমি, না? গল্প বলো না, শুনি।

হ্যাঁ, এই চার বৎসরে রামদাস অনেক ঘুরিয়াছে—অনেক নূতন জায়গা দেখিয়াছে। এক স্থানে সে বেশীদিন থাকিতে পারে না, প্রাণ পালাই-পালাই করে। দুনিয়াটা যদি ঘুরিয়াই না দেখিবে, তবে ঈশ্বর তাহাকে চোখ দুইটা দিয়াছেন কি প্রয়োজনে?

একবার তাহার এক সাকরেদ জুটিয়াছিল। সে জোগাড় করে নাই, লোকটা জুটিয়া গিয়াছিল। ভক্তিভাবের কথা বলে, গদগদ কণ্ঠস্বর। দিন সাতেক ছিল সঙ্গে। এক শহরে কোন এক বড়লোকের বাড়ী গান করিয়াছিল রামদাস। তাহারা খুশি হইয়া রামদাসকে একখানা নূতন কাপড় দিয়াছিল। রাত্রে সামান্য আহার করিয়া দুই জনে একটা হাট-চালায় শুইয়াছিল। পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে সাকরেদটি উধাও—নতন কাপড়খানাও নাই।

কাজল বলিল—তুমি কি করলে তখন?

—কি আর কোরব? ভারী দুঃখ হ'ল মনে। কাপড়টা চেয়ে নিতে পারতো আমার কাছ থেকে, আমি দিয়ে দিতাম। অনর্থক চুরি করে সে পাপের ভাগী হলো।

—তোমার রাগ হলো না?

—না বাবাজী। তার নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশী দরকার ছিল, নইলে সে নেবে কেন? তবে আমাকে বললেই পারতো। মানুষের অসাধুতা দেখলে বড় কষ্ট পাই মনে। কি লাভ অসাধুতায়! সেই তো একদিন সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে চিরদিনের জন্য, তবে আর কেন পিছনে কুকীর্তি রেখে যাওয়া?

রামদাস বিদায় লইবার আগে কাজল তাহাকে বলিল—তুমি মাঝে মাঝে আসবে তো রামদাস কাকা? আমাদের বাড়ী তো চেনা হয়ে গেল।

—বলতে পারি না বাবাজী। কখন কোথায় থাকি তার তো ঠিক নেই। আজ এখানে আছি, কাল থাকব আর এক জায়গায়। দেখ না, সেই মাধবপুরের মাঠের পর আবার কতদিন বাদে আমাদের দেখা হলো।

—তুমি বোধহয় কাউকেই বেশী ভালোবাসো না রামদাস কাকা, তাহলে কি না দেখে থাকতে পারতে? খালি ঘুরে ঘুরে বেড়ালে কি আর একজনকে ভালোবাসা যায়?

প্রশ্নটা শুনিয়া রামদাস কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, আনমনে খঞ্জনীতে টিনটিন আওয়াজ তুলিতে লাগিল। কাজল বলিল—সত্যিকথা বলি নি, কাকা?

মুখটা এদিকে ফিরাইয়া রামদাস বলিল—একজনকে ভালোবাসার জন্য তো

জীবনটা নয় বাবাজী, আমি চেয়েছিলাম সবাইকে ভালোবাসতে। তা আর হোলো কই ? একজনকে ভালোবাসলে জীবনটা বড ছোট হয়ে যায়। কিন্তু সবাইকে ভালোবাসার মত হৃদয়ও তো ভগবান আমাকে দেন নি, কি করি তুমিই বলো ?

একটু চুপ করিয়া রামদাস বলিল—এখন মনে হয় গাছ নদী ফুল ফল সবকিছুর ভেতরেই আলাদা করে দেখবার মত রূপ আছে, এমন কি পাথরের মধ্যে মাটির মধ্যেও আলাদা সত্তা—আমি তাই দেখি। কি পেলে চাওয়া আমার পূর্ণ হয় তা আমি এখনও জানি না—তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

অপুর শেষ উপন্যাসটা পাঠকমহলে আলোড়ন আনিযাছিল। জীবনকে এত বিচিত্রভাবে অন্য কোনো লেখক দেখেন নাই—এই বলিয়া বড বড় কাগজে সমালোচনা বাহির হইল। নূতন উপন্যাস খানিক কাটতি অত্যন্ত বেশী, অন্যান্য বইও ভাল চলিতেছে। অপুর মৃত্যুর পর পাঠকেরা হঠাৎ যেন তাহাকে লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

বইপত্র হইতে আয়ের হিসাব এবং টাকাকডির আদায় ইত্যাদি এখন সুরপতি ও প্রতাপ করিয়া থাকে। হৈমন্তীর ভাঙা সংসারের হাল সুরপতি এখন শক্ত হাতে ধরিয়াছেন। মেয়েকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন—তোর কোনো ভয় নেই হৈম, কাজলের ভবিষ্যতের ভার আমার হাতে রইল।

গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রে পৃথিবীটা পোড়াইয়া খাক্ করে, বর্ষায় ঝর-ঝর করিয়া বৃষ্টি পড়ে অদৃশ্য হস্তনিষিক্ত শান্তিবারির মত। হেমন্তের শিশির পড়ে, শীতে কুয়াশা পাক খায়—সমস্ত হৈমন্তী জানালায় বসিয়া দেখে। যে দেখিতে শিখাইয়াছিল, সে নাই।

কলিকাতা হইতে প্রথম প্রথম যখন প্রকাশকদের নিকট হইতে অপুর লেখার জন্য মনি-অর্ডার আসিত এবং হৈমন্তীকে সই করিয়া টাকা লইতে হইত, তখন হৈমন্তীর চোখে জল আসিত। সে যেন খালি টাকা চাহিয়াছিল। এ সব লইয়া সে কি করিবে ? শেষ বইটা এত নাম করিল, অপু দেখিয়া গেল না। স্বামীর এত সুনাম এত যশ লইয়া সে এখন কি করে ?

সুরপতির দৃঢ় বিশ্বাস কাজল বড় রকমের একটা-কিছু হইবে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট করিবার দিকে তাঁহার তেমন ইচ্ছা নাই, তিনি চান অপুর মত কাজলও একটা স্থায়ী কিছু করুক। সন্ধ্যায় পড়াইতে পড়াইতে তিনি ডাক দেন—হৈম, একবার শুনে যা এদিকে।

হৈমন্তী আসিয়া বলে—কি বাবা ?

—দেখ্, কাজল এই ইংরেজী এসেটা কি সুন্দর লিখেছে। বানান ভুল, ব্যাকরণের ভুল একটাও নেই। আমি বলে দিচ্ছি হৈম, এ ছেলে বংশের নাম উজ্জ্বল করবে।

—আশীর্বাদ করো বাবা, তাই যেন হয়।

হৈমন্তী নিজের ঘরে ফিরিয়া জানলার কাছে দাঁড়ায়। বাহিরে ঘন অন্ধকার। ঐ অন্ধকারের ভিতর সুরপতি আলোর প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কাজল মানুষ হইতেছে, সুরপতি বলিয়াছেন কাজল বড় হইবে।

ছেলেবেলা হইতে হৈমন্তী বাবাকে বড় বিশ্বাস করে।

স্কুল হইতে বাহির হইয়া কাজল রিপন কলেজে ভর্তি হইল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে খুব ভাল করিয়াছিল—বিশেষতঃ ইংরাজিতে। যে কোনো অধিকতর অভিজাত কলেজে সহজেই সে ভর্তি হইতে পারিত, কিন্তু এক রকম জিদ করিয়াই রিপনে ভর্তি হইল। কাজল একদিন আদিনাথবাবুকে প্রণাম করিতে গেল। আদিনাথবাবু আদর করিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেলেন। কাজল বলিল—আশীর্বাদ করুন সার, যেন মানুষ হতে পারি। সবাই বলছে রিপনে ভর্তি না হয়ে প্রেসিডেন্সী বা অন্য কোথাও যাওয়া উচিত ছিল।

আদিনাথবাবু চশমা খুলিয়া কোঁচার প্রান্তে কাচ পরিষ্কার করিতে করিতে বলিলেন—মানুষ হওয়া তোর কেউ আটকাতে পারবে না অমিতাভ। অনেক-দিন ধরে শিক্ষকতা করছি, চুল পেকে গেছে—আমি মানুষ চিনি। তোর মধ্যে ক্ষমতা আছে, সেটা নষ্ট হতে দিস্ না।

চশমা মুছিবার পর, না পরিয়া অনেকক্ষণ সেটা হাতে ধরিয়া রাখলেন। অন্যদিকে তিনি তাকাইয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহাকে যেন বেশি বৃদ্ধ দেখাইতে লাগিল। কাজল ভাবিল—বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন সার, বয়সের তুলনায়। চোখের নীচে কালি পড়ে গিয়েছে। একা মানুষ, কত আর খাটবেন!

মুখ ফিরাইয়া আদিনাথবাবু বললেন—কত আশা ছিল বড় হবো, নাম করবো। সেইভাবেই জীবনটাকে তৈরী করবার চেষ্টা করেছিলাম। তারপর সংসারের ঘানিকলে বাঁধা পড়ে ঘুরছি তো ঘুরছিই। বিলেত যাবার খুব ইচ্ছে ছিল। এখন সে কথা মনে পড়লে হাসি পায়। কত চিন্তা করেছি রাত্তিরে

শুয়ে শুয়ে, ভেবেছি পালিয়ে চলে যাই। কিন্তু ততদিনে বড়খোকা হয়েছে, ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি। আর যাওয়া হলো না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া আদিনাথবাবু বলিলেন—জীবন তো প্রায় শেষ হয়ে এলো অমিতাভ।

কাজল জানে মাস্টারমশাই খুব দুঃস্থ—মেয়েব বিবাহে সব টাকা যোগাড করিতে না পারিয়া চড়া সুদে ধার করিয়াছিলেন, এখনও তাহা শোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বামুনপাড়ার মতি মুখুজ্যে টাকাটা মাসিক দুই আনা সুদে ধার দিয়াছিল মওকা বুঝিযা। আদিনাথবাবু অনুরোধ করেছিলেন সুদের হার এক আনা কবিতে—মতি মুখুজ্যে শোনে নাই। ইস্কুলে কে যেন তাহাকে বলিয়াছিল কথাটা। মতি মুখুজ্যের পাশাপাশি তাহার রামদাস বোষ্টমের কথা মনে পডিল—চরিত্রেব অদ্ভুত বৈপরীত্যেব জন্য।

আদিনাথবাবু কাজলেব আপত্তি না শুনিযা তাহাকে পেট ভরিয়া জলযোগ করাইয়া ছাড়িলেন।

কলেজ সম্বন্ধে কাজলেব বিরাট ধাবণা ছিল। স্কুলে সে ব্যোমকেশ ছাডা মনের মতো সঙ্গী পায় নাই। ভাবিয়াছিল কলেজে তো কত ভালো ছাত্র পডিতে আসে দূর দূরান্ত হইতে, একজনও কি তাহার পছন্দমত হইবে না? প্রতাপ বলিয়াছিল, এই মফঃস্বলে তোর বন্ধু হবে না কাজল—কোলকাতার কলেজে যখন পডবি, দেখবি কত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আছে দেশে।

ব্রিলিযানট ছাত্র দিয়ে কি করবো মামা? আমি চাই এমন বন্ধু, যে আমার মনের কথা বুঝতে পারবে, আমার মতো যে চিন্তা করবে।

—হলে কোলকাতাতেই হবে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিল তাহা হইতেছে না। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই নিরীহ, গোবেচারা। দু'একটি বডলোকের ছেলে আছে—তাহারা গরমে আদ্দির পাঞ্জাবী শীতে সার্জের কোট পরিয়া কলেজে আসে, কথায় কথায় সিগারেট খায় এবং পরস্পরের পিতার কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। তাহাদের সহিত কথা বলিতে গিয়া কাজল বোকা বানিয়া ফিরিয়াছে, কাজলকে তাহারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই। মোটের উপর কাজল দেখিল গত কয়েক বৎসরে তাহার মানসিক বৃদ্ধি জ্যামিতিক হারে হইয়াছে, ফলে তাহার চারিধারে বহু দূর অবধি লোকজন নাই। অগত্যা সে লাইব্রেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ছেলেবেলায় বাবার কাছে রিপন কলেজের লাইব্রেরীর গল্প শুনিয়াছিল। প্রত্যেকটা বইয়ে যেন বাবার স্পর্শ লাগিয়া আছে। নানা বিষয় কৌতূহল থাকার দরুন লাইব্রেরীর ভিতরে সে যেন দিশাহারা হইয়া ওঠে। কোন বইটা

ছাড়িয়া কোন্‌টা পড়িবে, ঠিক করিতে পারে না। কতকগুলি পছন্দসই বইএর লিস্ট করিয়া ফেলিল সে, এক এক করিয়া পড়িবে। এই ব্যাপারে তাহার কিছু সুবিধা ছিল, এমন সব বইয়ের সে স্লিপ দিত, যাহা সাধারণতঃ কেহ নেয় না। দপ্তরী তাক হইতে বই পাড়িয়া তাহার হাতে আনিয়া দিলে সে ফুঁ দিতে দিতে বলে, বাব্বাঃ! বেজায় ধুলো জমে গেছে দেখছি।

দপ্তরী হাসিয়া বলিত—বহু কাল বাদে বেরুলো তো বাবু।

কাজল অবাক হইয়া যায়? এত ভালো বই কেহ পড়ে না কেন? তাহাকে যদি লাইব্রেরীতে থাকিতে দিত, দিনরাত সে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বই নামাইয়া নামাইয়া পড়িত। চাকরী হইলে সে টাকা জমাইয়া ভাল লাইব্রেরী করিবে—বাড়ীতে। মৌপাহাড়ীতে গিয়া থাকিবে তখন, সেখানকার স্কুলে মাষ্টারী করিবে। কলিকাতা হইতে বই কিনিয়া একটা ঘর সে ভর্ত্তি করিয়া ফেলিবে। দেওয়াল দেখা যাইবে না, শুধু আলমারী। সারাদিন বইএর মধ্যে কাটানো—উঃ! এত বেশী আনন্দ আর কিসে পাওয়া যাইতে পারে?

কাজলের উর্দু শিখিবার শখ হইল। কি-একটা বই পড়িতে পড়িতে সে মির্জা গালিবের দুইটা লাইন পাইয়াছিল। লাইন দুইটা তাহার এত ভাল লাগিল যে ক্রমশঃ উর্দু কবিতা সংগ্রহ করা তাহার বাতিকে দাঁড়াইয়া গেল। কলেজে এক সহপাঠিকে সে উর্দু কবিতা আবৃত্তি করিয়া শোনাইতে-ছিল, ছেলেটি তাহাকে উর্দু শিখিবার উপদেশ দেয়। কথাটা মনে ধরিল। অনেক সন্ধানের পর এক বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোককে পাওয়া গেল, তিনি সপ্তাহে তিনদিন সন্ধ্যায় কাজলকে উর্দু পাঠ দিতে রাজি হইলেন। সন্ধ্যাবেলা খাতা হাতে কাজল তাঁর কাছে গিয়া হাজির হয়। মালতীনগরের প্রান্তে এক মসজিদে তিনি থাকেন, সবাই মৌলবীসাহেব বলিয়া ডাকে। কাজল গেলে মৌলবীসাহেব হাসিয়া বলেন—সেলাম আলেকম্। ইহার প্রত্যুত্তরও কাজল তাঁহার নিকট হইতে শিখিয়া লইয়াছে—সে মাথা ঝুঁকিয়া বলে, ও আলেকম্ সেলাম। মৌলবীসাহেব বুঝাইয়া বলিলেন—এটা হচ্ছে শুভেচ্ছা জানানো, ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা। একজন বলছে—তোমার ওপরও ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসুক; অন্যজন বলছে—তোমার ওপরও ভগবানের আশীর্বাদ নেমে আসুক।

মৌলবীসাহেবের ছোট ঘরে মোমবাতি জ্বলে, মাদুরের উপর বসিয়া কাজল মনোযোগ দিয়া আপাত বৈসাদৃশ্যহীন উর্দু অক্ষরের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টা করে। মৌলবীসাহেব হাঁ-হাঁ করিয়া বলেন—নেহি, নেহি, এয়সা করকে লিখ্‌খো—ইয়ে হম্‌জা নেহি হুয়া।

কখনো কখনো তিনি মূল ফারসী হইতে কাজলকে ওমর খৈয়াম পড়িয়া শোনান। বলেন—এই কবিতা অনেক গোঁড়া মুসলমান অপছন্দ করে। এতে নাকি অধর্মের কথা, ভোগবিলাসের কথা লেখা আছে। আমি কিন্তু তা মানি না—যা ভালো কবিতা, তা না পড়ে আমি থাকতে পারি না।

ওমর খৈয়াম শুনিয়া কাজলের এত ভাল লাগিল যে সে একখানা ফিট্জেরাল্ড্ অনূদিত রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম কিনিয়া ফেলিল, কেননা ফারসী বুঝিবার ক্ষমতা তাহার নাই। ওমর খৈয়ামের জীবনরহস্য মধ্যপ্রাচ্যের অতীত দিনগুলির রোমান্টিক অনুভূতি কাজলকে মুগ্ধ করিল। কি সুন্দর এক একটি ছোট কবিতা—

They say the Lion and Lizard keep
The courts where Jamshyd gloried and drank deep;
And Bahram, that great hunter the Wild Ass
Stamps o'er his Head, but cannot break his sleep.

অনিবার্যভাবে মৃত্যু আসিয়া দাম্ভিক নৃপতি এবং বলদর্পী শিকারীকে চিরকালের মত ঘুম পাড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের সমাধির উপরে বাড়িয়া-ওঠা জঙ্গলে বন্য গর্দভের মাতামাতিও আর তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে পারে না।

মৌলবীসাহেব বলেন—তাড়াতাড়ি শেখার চেষ্টা করো, উর্দু সাহিত্যে ঢুকলে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া উর্দু হয়ে গেলে ফারসী শেখাও বিশেষ আর কষ্টকর হবে না।

মেজাজ ভালো থাকিলে তিনি বলেন—আজ পড়া থাক—এসো, তোমাকে কিছু শের শোনাই। সম্রাট বাহাদুর শাহের লেখা কবিতা শুনবে? একেবারে শেষ জীবনে লেখা, শোনো—

উম্রে দরাজ-মাঙ্কর লায়ে থে ইয়ে চার রোজ।
দো আরজুমে কাট্গয়ে, দো ইন্ত্জারমে॥

*   *   *

এত্না হ্যায় বদনসীব নাফর দফ্নেকে লিয়ে।
দো গজ জমিন না মিল মকি ইস্ কুয়েয়ার মে॥

কিছুদিন যাতায়াত করিয়া কাজলের উর্দু শিখিবার উৎসাহ গেল। জটিল ব্যাকরণ এবং ততোধিক জটিল লিখন-প্রণালী সে কিছুতেই আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অবশ্য উর্দু সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ তাহার থাকিয়াই গেল।

কলেজ হইতে ফিরিবার সময় একদিন কাজল কি কাজে কলেজ স্ট্রীটে

[illegible] পুরাতন বইয়ের দোকানে নজর পড়িল, ডস্টয়েভস্কির ব্রাদার্স ক্যারামাজভ্‌খানা। কাজল নগদ দেড় টাকা মূল্যে বইখানি হস্তগত করিয়া বাড়ি ফিরিল। খুব নাম শুনিয়াছে বইখানার—কিন্তু পড়িয়া ওঠা হয় নাই। বাড়ী ফিরিয়া সন্ধ্যায় অন্যদিনের মত বেড়াইতে বাহির না হইয়া সে বিছানায় শুইয়া হ্যারিকেন কাছে টানিয়া পড়া শুরু করিল।

সে ভাবিয়াছিল নামকরা উপন্যাস যখন, প্রথম পাতা হইতেই গল্প খুব জমিবে। তাহা হইল না। পাতার পর পাতা পড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু রস যাহাকে বলে, তাহা ঠিক জমিতেছে না। শতখানেক পৃষ্ঠা পড়িয়া সে বিরক্ত হইয়া বই মুড়িয়া তুলিয়া রাখিয়া দিল। মাস আটেকের মধ্যে আর সে হাত দেয় নাই। একদিন কি খেয়াল হওয়ায় তাক হইতে নামাইয়া নূতন করিয়া পড়িতে শুরু করিল।

জমিয়া গেল।

কষ্ট করিয়া, তেতো ওষুধ খাইবার মত করিয়া দুইশত পৃষ্ঠা পড়িবার পর বই আর হাত হইতে নামাইতে পারিল না। বৃহৎ পটভূমিতে জীবনকে এমনভাবে অঙ্কন করিতে সে অন্য কোন শিল্পীকে দেখে নাই। বিশেষতঃ দিমিত্রির চরিত্র তাহার কাছে অসাধারণ সৃষ্টি বলিয়া মনে হইল।

দিমিত্রির উন্মত্ততা, জীবনকে আকুল হইয়া জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা—এ সব সত্ত্বেও দিমিত্রির পরিণতিতে কাজল কেমন মুহ্যমান হইয়া পড়িল। মনে হইল, জীবনটা এক অদৃশ্য শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাহা ঈশ্বর নহে, মানবিক কিছু নহে —বরং মানবিকতা বিরোধী।

জীবনে ভালবাসিবার পরিণতি যদি এই হয়, তবে বাঁচিয়া লাভ কি?

ব্রাদার্স ক্যারামাজভ্‌ জীবনকে নূতন এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে শিখাইল।

কাজল — ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শীত আসিতেছে। সকালে ঘাসে আলগা শিশির লাগিয়া থাকে, শেষরাতের দিকে চাদর গায়ে টানিয়া দিতে হয়। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঘরে উনানে আঁচ পড়িলে ধোঁয়া জমিয়া যায়, বাতাস না থাকায় ধোঁয়া সরে না। রাত্রে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়, মেঘ আসিয়া নক্ষত্রদের ঢাকিয়া দেয় না। পাড়ায় পাড়ায় ধুনুরীদের হাঁক শোনা যায়—লেপ বানাবে নাকি মা-ঠাকরুন, বাছাই-করা ভালো তুলো ছিলো—

তারপর শীত আসিয়া গেল। কাজল শীতকাল ভালবাসে, শীত পড়িলে তাহার মনের ভিতরে একটা বড রকমের ওলটপালট হয়। যে মন লইয়া সে গ্রীষ্ম উপভোগ করে, তাহা লইয়া কখনই শীতের রিক্ত রূপ উপলব্ধি করা যায় না। শীত আসিবার আগে হইতেই সে মনে মনে প্রস্তুতি চালাইতে থাকে, মনের জানালা হইতে পুরাতন পর্দা খুলিয়া নূতন পর্দা লাগায়, ফ্রেম ছবি হইতে খুলিয়া বাখিয়া দেয় সেখানে নূতন ছবি লাগাইবে বলিয়া। হেমন্তের মাঠে মাঠে হাঁটিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে শীতের জন্য তাহার মন তৈয়ারী হইয়া ওঠে। খাইতে বসিয়া রান্নায় ধনে পাতাব গন্ধ পাইলেই বোঝা যায় আর দেরী নাই।

ঠাণ্ডার মধ্যে মাঠে ঘুবিতে আলাদা আমেজ। মৃদু বৌদ্রে পিঠ দিয়া দূরে তাকাইয়া থাকিলে ক্রমশঃ মনটা উদাস হইয়া যায়। কলকাতার কলরবেব ভিতর সে নিজেকে ঠিক মেলিয়া ধবিতে পারে না—নিজের মনে বসিয়া চিন্তা করিবার অবকাশও সেখানে নাই। সমস্ত সপ্তাহ নগব-জীবনেব কোলাহলের মধ্যে কাটাইয়া একটা দিন শীতের মাঠে কাটাইতে ভাল লাগে। আল ছাডাইয়া মাঠে নামিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের নিচে মাটির ঢেলা গুঁড়াইয়া যায়, রৌদ্রদগ্ধ মাটি হইতে কেমন গন্ধ আসিতে থাকে—সে গন্ধ নিশ্চিন্দিপুরে ছোটবেলায় সে পাইত।

একদিন হাতকাটা সোয়েটারটা লইয়া কাজল কাঁঠালিয়াব মাঠে বেডাইতে গেল। রৌদ্র তখন পড়িয়া আসিয়াছে, ঠাণ্ডা কিছুক্ষণ বাদেহ হাডেব ভিতব ছুঁচ ফুটাইতে আবম্ভ করিবে।

কাঁঠালিয়ার বাঁশবনটায় ঢুকিতে মনে হহল সে যেন স্বপ্নের রাজ্যে আসিয়া উড়িয়াছে। উৎসব-দিনে বাডীব ছাদে সামিয়ানা খাটাইলে তাহার নিচে দ্বিপ্রহরেও যেমন একটা নরম আলো থাকে, বাশবনের ভিতর তেমনি। না নড়িয়া চুপ করিয়া থাকিলে বাঁশপাতা ঝরিয়া-পডার হালকা শব্দ শোনা যায়। বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হইতেছে, কিন্তু শীতের আমেজ জমাইবার জন্য কাজল সোয়েটার পরে নাই। একটা বাঁশের গায়ে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া সে অনুভব করে, এ সমস্ত ছাড়িয়া সে বাঁচিতে পারিবে না। কলিকাতা তাহাকে প্রিয় বস্তু হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে।

পানাপুকুরের পাশ দিয়া কাজল আখের আলির বাড়ি গেল। আখের উঠানের কিছু অংশ লইয়া একটা মুদির দোকান দিয়াছে। জিনিসপত্র বেশী নাই, নূতন দোকান। ব্যস্ত হইয়া আখের তাহাকে একটা নড়বড়ে কাঠের টুলে বসিতে দিল। কাজল বসিয়া বলিল—কেমন আছ আখের ভাই?

—আমাদের আবার থাকা না থাকা, তুমি কেমন আছ সেইটেই বড় কথা।

তুমি তো এখন কলেজে পড়ো, না ?

—হ্যাঁ, আই-এ পড়ি।

—ক'বছর লাগে এটা পড়তে ?

—দু'বছর। তারপর পাশ করলে আবার দু'বছর লাগে বি-এ পড়তে।

—বাব্বাঃ! তোমাদের দেখছি সারা জীবন ধরে পড়া আর পড়া। পড়া শেষ হতে হতে তো বুড়ো হয়ে যাবে।

—পড়াশুনো না শিখলে চলবে না আখের ভাই, চাকরী তো করতে হবে।

আখের একটা বড় রকমের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তা তে বটেই। আমার মতো নয়, সারাটা জীবন এখানেই কাটল—কিছুই শিখতে পারলাম না।

—কতদিন আছ তোমরা এখানে ?

—অনেকদিন হয়ে গেল, আমার ঠাকুরদার বাবা প্রথমে এই জায়গায় এসে বসতি করেন। আমার সারাজীবন এই গ্রামে কাটল—বারকয়েক কোলকাতায় গিয়েছি বটে, কিন্তু দেশ বেড়ানো যাকে বলে তা কিছুই হয়নি আমার কপালে।

এর পর আখের তাহাকে খাওয়াইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কাজল খাইবে না, সেও ছাড়িবে না। দোকানের টিন হইতে একটা ঠোঙায় করিয়া মুড়কি তাহার হাতে দিয়া বলিল—খাও, ভাল মুড়কি। নিজেদের খাবার জন্য রয়েছে, বিক্রির নয়।

আখেরের দোকান হইতে উঠিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিছুতেই সে ছাড়িতে চায় না। শীঘ্রই আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া কাজল মাঠের দিকে রওনা দিল। ঠাণ্ডা আর সহ্য করা যায় না, সোয়েটার গায়ে দিতে দিতে কাজল দেখিল, গোধূলির শেষ আলোকচ্ছটাও আকাশের গা হইতে মিলাইয়া গিয়াছে।

অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া রোমাঞ্চকর যাত্রা। আকাশে চুমকির মন অজস্র নক্ষত্রের ভিড়। জীবনটা যেন হঠাৎ শরীরের সঙ্কীর্ণ পরিসর হইতে বাহির হইয়া দিক্‌হীন মহাশূন্যে মিশিয়া যাইতে চাহিতেছে। কাজলের মনে হইল, জীবন পৃথিবীর গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে—পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু পৃথিবীই শেষ কথা হইতে পারে না। অস্তিত্ব সে মহাবিশ্বে একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া অনুভব করিতেছে—তাহা কি মিথ্যা ?

কাজল আজকাল বুঝিতে পারিতেছে বাবার সহিত তাহার মানসিকতার একটা আশ্চর্য মিল আছে। বাবার উপন্যাসগুলি পড়িতে পড়িতে সে অবাক হইয়া ভাবে, এমন নির্ভুল ভাবে তাহার মনের কথা লিখিল কি করিয়া ? ছোটবেলায় সে যাহা ভাবিত, আকাশের দিকে তাকাইলে তাহার মনে যে ভাব হইত, সব বাবা হুবহু লিখিয়াছে।

কাজল জানে, তাহার জীবন সাধারণভাবেই কাটিয়াছে। বাবা দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া, প্রতিবাদে সংগ্রাম করিয়া তবে মানুষ হইয়াছিল। সে কিন্তু জন্মের পরে খুব একটা অসচ্ছলতা দেখে নাই, দারিদ্র্যের ভিতর যে কল্যাণস্পর্শ আছে তাহা সে কখনও অনুভব করে নাই। মাঝে মাঝে কাজলের মনে হয়, কিছুই তাহার বলিবার নাই। ইট-কাঠ-পাথরের ভিতর বাস করিয়া কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। তবু এ কথাও মিথ্যা নয় যে তাহার তীক্ষ্ণ অনুভূতি তাহাকে অনেক রহস্যের সম্মুখীন করিয়াছে ; জীবনের ভিতরও আর একটা গভীরতর জীবন আছে, তাহা সে বুঝিতে পাবে। কি করিয়া সে এসব কথা না বলিয়া পারিবে ?

একটা খাতায় দুইটি গল্প লিখিয়া সে বন্ধুদের পড়াইয়াছিল। কলেজের বন্ধুদের (মনে মিল বেশী না থাকা সত্ত্বেও দুই-একটি বন্ধু তাহাব হইয়াছে) মধ্যে অনেকেই তাহার বাবার ভক্ত। তাহার গল্প দুইটা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বলিল—ভালই হয়েছে, মন্দ কি! তবে ব্যাপার কি জানো, লেখার মধ্যে তোমার বাবার প্রভাব বড্ড বেশী।

কাজল মহা হাঙ্গামায় পড়িয়াছে। সে ইচ্ছা করিয়া বাবার বই দেখিয়া নকল করিতেছে না। তাহার চিন্তাধারার সহিত বাবার চিন্তাধারা মিলিয়া গেলে, সে কি করিতে পারে।

প্রকাণ্ড মাঠের অর্ধেক পার হইয়াছে—এমন সময় কাজল দেখিল, কিছুদূরে মাঠের ভিতর বসিয়া কাহারা আগুন পোহাইতেছে। বেশ দৃশ্যটা। চারিদিকে শূন্যমাঠ, উপরে খোলা আকাশ, তাহার নিচে বসিয়া খড়-বিচালি জ্বালাইয়া কেমন আগুন পোহাইতেছে লোকগুলি। কিসের আকর্ষণে সে পায়ে পায়ে আগাইয়া গিয়া অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়াইল।

লোকগুলি দরিদ্র। এই ভয়ানক শীতে গায়ে একটা করিয়া সুতির জামা তাহার গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া হাত আগুনের উপর ছড়াইয়া নিজেদের মধ্যে কি গল্প করিতেছিল। কাজল আসিয়া দাঁড়াইতে লোকগুলি অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে কাজল অপ্রস্তুতবোধ করিয়া বলিল—আগুন পোহাচ্ছেন বুঝি ?

অবাস্তর প্রশ্ন। শীতের রাতে আগুন জ্বালাইয়া তাহার হাত ছড়াইয়া এতগুলি লোক আগুন পোহানো ছাড়া অন্য কি করিতে পারে ?

একজন বলিল—হ্যাঁ বাবু, আপনি বুঝি শহরে থাকেন ? এই বুধো, সরে যা ওদিকে। বসুন বাবু ওইখেনটায়, আগুনের কাছে এসে বসুন।

বুধো তাহাকে সম্মান দেখাইয়া সরিয়া বসিল, কিন্তু বাকি কয়জন কেমন

আড়ষ্টভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের চোখে শুধু বিস্ময় নহে, একটু যেন আতঙ্কও মিশ্রিত আছে।

প্রথম লোকটি বলিল—এই বুধোই গল্প বলছিল বাবু। শ্বশুরবাড়ী থেকে ফেরবার সময় মাঠের মধ্যে ওকে এলে-ভূতে পেয়েছিল। এলে-ভূত জানেন তো? মাঠের মধ্যে পথ ভুলিয়ে লোককে দূরে বেজায়গায় টেনে নিয়ে যায়, তারপর মেরে ফেলে। তা বুধো তো সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েচে শ্বশুরবাড়ী থেকে, আর ভূত লেগেছে তার পেছনে—

একজন অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—নাম করিস্ না রাত্তিরে—

গল্পটা দীর্ঘ। কাজলকে সবটা শুনিতে হইব—কি করিয়া কাপড়টা ঝাড়িয়া উল্টাইয়া পরিয়া তবে বুধো ভূতের হাত হইতে রক্ষা পায়। শুনিতে শুনিতে অনেকে পিঠের উপর দিয়া পিছনে মাঠের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিল। এবং ক্রমাগত আগুনের কাছে অগ্রসর হইতেছিল। ইহাদের আতঙ্কের কারণ এইবারে কাজল বুঝিল। অন্ধকার মাঠে বসিয়া প্রেতযোনির গল্প হইতেছিল— রীতিমত গা শিরশির-করা পরিবেশ। এমনি সময় মাঠের ভিতর হইতে আচমকা কাজলের নিঃশব্দ আবির্ভাব। প্রথমটা তাহারা বেজায় চমকাইয়া ছিল, আগুনের আলোয় কাজলের ছাডা পডিতেছে ইহা না দেখা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাডিতে পারে নাই।

ঠাণ্ডা ক্রমশঃ বাডিতেছে। তাহারা আরো কাঠকুটা আনিয়া আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিল। শুকনা ডালপালা পুডিবার পটপট শব্দ উঠিতেছে, বাতাসে পোড়া পাতার গন্ধ। হাত বাডাইয়া আগুনের উত্তাপ উপভোগ করিতে করিতে কাজলের মনে হইল, এই লোকগুলি তাহার ভাবি আপন।

(কাজলের ডায়েরী হইতে)

আমার ডায়েরী লেখার অভ্যাস মোটেই পুরোনো নয়। ছোটবেলায় কিছুদিন লিখেছিলাম বটে, কিন্তু সে বাবাকে দেখে শখ করে। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমার এ বয়সটার একটা রেকর্ড রাখা দরকার—যাতে পরবর্তী সময়ে এব থেকে মানসিক প্রগতির হারটা ধরতে পারি।

কিছুদিন আগে কয়েকজন বন্ধু মিলে পুরী থেকে ঘুরে এলাম। কলেজে প্রথমে খুব খারাপ লাগছিল। পরে তিন-চারজন ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো, যাদের সঙ্গে এখন বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। তারাই উদ্যোগ করে বেড়াতে যাবার আয়োজন করলে, আমি তাদের সঙ্গী হয়ে পড়লাম।

মার এখনও ধারণা, আমি সেই ছেলেমানুষই আছি। ঘুমোলে আমার

গায়ে চাদর টেনে দেন—সকালে উঠে টের পাই। তাছাড়া আমার বইপত্র গুছিয়ে রাখা, কলেজে বেরুনোর সময় কলম-পেন্‌সিল খুঁজে দেওয়া, এসব তাঁকেই করতে হয়। কাজেই স্ব-নির্ভরতার পথে খুব-একটা এগিয়ে গেছি—এমন বলা চলে না। মার চোখে ছোটই রয়ে গেছি।

আমি পরমেশ, অমল আর রমানাথ একদিন সন্ধ্যেবেলা ট্রেনে চেপে বসলাম। সারা রাত্তির জেগে বসেছিলাম। ছোট স্টেশনে গাড়ী থামছে না, হু হু করে প্লাটফর্ম বেরিয়ে যাচ্ছে। কখনো নদীর ওপর দিয়ে গুম গুম করে ব্রীজ পার হচ্ছে—কখনো নীরন্ধ্র অন্ধকারের ভেতর তাকিয়ে দেখছি এঞ্জিন থেকে ভেসে-আসা জ্বলন্ত কয়লার কুচি।

সকালে কটক। আমার চোখ রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত। তাকিয়ে দেখলাম অদ্ভুত পোশাক পরা রেলওয়ে-পুলিশ প্ল্যাটফর্মে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পরমেশ চা খাওয়ালে সবাইকে। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চায়ের ভাঁড় নিয়ে চুমুক দিতে দিতে মনে হলো, সত্যিই একা বেড়াতে চলেছি তা হলে। জীবনে কখনো কোথাও একা বেরুই নি।

দুদিন আগে রাত্তিরে স্বপ্নে সমুদ্র দেখেছিলাম। তখন পুরী যাওয়ার কথা চলছে। দেখলাম, সমুদ্রের ধারে বালির উপর পায়চারী করছি। হলুদ বালির বেলাভূমি, তার ওপর শ্রেণীবদ্ধ নারকেলগাছ অশ্রান্ত হাওয়ায় থর-থর করে কাঁপছে। মাথার ওপরে দীপ্ত সূর্য। ভাল করে দেখতে পাই নি, কারণ সমুদ্র সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।

কটক ছাড়িয়া কেয়াঝোপ দেখতে দেখতে চললাম। লাইনের দু-দিক কেয়াঝোপে সবুজ হয়ে আছে। মনের মধ্যে উচ্চগ্রামে মাদল বাজছে যেন, একটু পরেই জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখবো।

ট্রেন মালতীপাতপুর ছাড়ল, সামনে পুরী। কি সুন্দর নামটা—মালতী-পাতপুর!

দু-হাত পেছনে রেখে সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল বাবার কথা। অনেকদিন আগে, আমি তখন ছোট, বাবা এসেছিল পুরীতে মাকে নিয়ে। বেলাভূমিতে বাবার পায়ের ছাপ কবে মুছে গেছে ঢেউ-এর অক্লান্ত তাড়নায় কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, পুরীর বাতাসে যেন বাবার গায়ের গন্ধ—ছোটবেলায় বাবার বুকে মুখ গুঁজে থাকলে যেমন পেতাম।

মৌপাহাড়ীতে বিস্তৃত প্রান্তর দেখছি, কিন্তু বিস্তৃত যে কতদূর প্রসার লাভ করতে পারে তা আজ বুঝলাম। ভালো লাগছে বলার চেয়ে কষ্ট হচ্ছে বলাই

বেশী সঙ্গত, কারণ সমস্ত সমুদ্রটা আমি একসঙ্গে বুকের ভেতর পুরে নিতে পারছি না। এত বিশালকে একই সঙ্গে সমস্ত দিক দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। ভীষণ ছটফট করছি কিছুতেই এক জায়গায় মন বসাতে পারছি না। সমুদ্র যেন ক্রমশঃ রক্তের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। প্রাণের স্পন্দন প্রথম জেগেছিল জলে। সূর্যের অনুকূল উত্তাপে প্রথম এককোষী-প্রাণীর সৃষ্টি সমুদ্রের বুকে। সমুদ্র জীবনের ধাত্রী। জীবন-সৃষ্টির কোটি কোটি বছর আগেও এই সমুদ্র এই রকম অশান্ত হয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করত বেলাভূমিতে। অন্য সব-কিছু থেকে সমুদ্র অনেক বেশী অভিজ্ঞ—বহুদর্শী। অন্ধকার ঢেউ-ওর মাথায় মাঝে মাঝে স্বতঃপ্রভ আলো। দিনরাত ভীষণ শব্দ করে সমুদ্র যেন কি-একটা জানাতে চাইছে, আমি তার ভাষা বুঝতে পারছি না। বাবা হয়তো বুঝতে পেরেছিল। এখন বেঁচে থাকলে বাবার কাছ থেকে জেনে নিতাম।

মানুষ বড় অসহায়, তার বলবার কথা সে কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারে না। সামনে ঐ elemental fury দেখে মনে একটা আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সমস্ত বিশ্বটার মধ্যে যে একটা master plan আছে, সেটা সমুদ্রের মতোই বিশাল, অতিমানবিক। কি রহস্য লুকিয়ে আছে আকাশে মাটিতে-জলে-জীবনে! দর্শন-গ্রন্থের সামনে সদ্য-অক্ষরপরিচয়প্রাপ্ত শিশুর মত আমাকে এই বিশালত্বের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

একটা জিনিস আমি বুঝেছি, আমার জীবনটা অন্যান্য মানুষের চেয়ে একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে যেদিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছি, সেদিন থেকে আমার ভেতরে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের বীজ একই সঙ্গে উপ্ত হয়েছে। চিন্তা দিয়ে আমার নিজের জন্য একটা ভিন্নতর জগৎ আমি তৈরী করে নিয়েছি। কিন্তু চিন্তা আমাকে আলোয় পথ দেখতে পারছে না, শুধুমাত্র একটা বৃত্তের মধ্যে ঘুরিয়ে ক্লান্ত করছে। মুক্তি চাইলেও পাবো না—যে চিন্তাশীল, তার মুক্তি নেই। বন্ধুরা আমার সান্নিধ্য থেকে আর যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছে না। তারা যে-ভাবে আনন্দ ভোগ করতে চায়, তা আমার আনন্দের ধারণা থেকে আলাদা। ফলে আমি অনেক মানুষের মধ্যেও একা বোধ করি। চেনা-মুখের ভিড়ে একলা থাকা বড়ো কষ্টের। আমি প্রাণপণে চাইছি ওদের সবার সঙ্গে ওদের মত হয়ে মিশে যেতে, ওদের মত ভাবতে, কথা বলতে। প্রত্যেকবারই কে পেছন থেকে টানছে, বলছে—হবে না, আর তা হয় না। বাবার সহজ আনন্দটা আমার মধ্যে কমে আসছে, আমি শুধু চিন্তার কঠিন মাটিতে খালি-পায়ে হাঁটছি।

কোনারক।

বন্ধুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক, আমি চুপ করে বসে আছি। সমুদ্রের দিক থেকে হাওয়া এসে প্রাঙ্গণের ধূলো ওড়াচ্ছে। নোনা বাতাসে মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য দিন দিন ক্ষয়ে আসছে। বন্ধুদের গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, দূর থেকে ভেসে আসছে কানে। কি নিয়ে যেন ওরা খুব হাসাহাসি করছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরের চাতালে একটা কোণায় বসে আছি। এখানটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন, কাছেপিঠে লোকজন নেই। মনে হয়, শব্দের জগৎ থেকে আমি নির্বাসিত। বন্ধুরাও হাসি থামিয়েছে।

আমার ডানদিকে পাথরের উৎকীর্ণ একটা পদ্ম। তাতে কনুই রেখে ওপরে তাকিয়ে দেখলাম মন্দিরের চূড়ার কাছে দুই পাথরের দেওয়ালের ফাঁকে নীল আকাশ ঝকঝক করছে। ফাঁকাটা দিয়ে একটুকরো সাদা মেঘ ত্বরিতগতিতে ভেসে গেল।

হঠাৎ দেখলাম, আমার মনে সেই বিশেষ ভাবটা জাগছে—বিপুলগড়ের শিবমন্দিরে যেমন হয়েছিল। ইতিহাস যেন চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। বহু শতাব্দী আগে যখন রোজ পুজো হতো, পুরোহিতের উদাত্তকণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যেতো, সেই আগেকার দিনগুলোকে বড্ড ফিরে পেতে ইচ্ছে করছে। আমার কাছে বর্তমান যেমন সত্য, উঠোনের ঐ ধূলোর ঘূর্ণী যেমন সত্য—সেইসব অতীতের মানুষদের কাছেও তাদের বর্তমান তেমনই সত্য ছিল। কিছুই আমরা চিরদিন আঁকড়ে থাকতে পারি না। সমুদ্রের ঢেউ সূর্যাস্তের রং -সব-কিছু একদিন আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে।

পরমেশ ফিরে আসছে।—কি রে অমিতাভ, আমাদের সঙ্গে না থেকে বড় যে এখানে একলা বসে আছিস ?

কি-ই বা উত্তর আমি দিই ? উঠে বললাম—চল্, তোদের সঙ্গেই যাই।

যেতে যেতে ওপরে তাকিয়ে চোখ-ধাঁধানো সূর্যটা দেখে মনে হলো, বছরের পর বছর ধরে সূর্য কর্কটক্রান্তি থেকে মকরক্রান্তি পর্যন্ত এইরকম ভাবে পরিক্রমা করবে, সমুদ্রে একবার জোয়ার একবার ভাঁটা আসবে। আমাদের স্মৃতিটুকুও উত্তরপুরুষদের মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে—কেবল মাথা তুলে সূর্যমন্দিরটা দাঁড়িয়ে থাকবে আরও অনেক শতাব্দী।

কাজল — **চতুর্দশ পরিচ্ছেদ**

শীতের শেষে সুরপতি অসুখে পড়িলেন। শরীর খুবই মজবুত ছিল, বাগানের প্রিয় গাছগুলিতে নিজের হাতে পাম্প করিয়া জল তুলিয়া দিতেন। প্রত্যহ

কয়েক মাইল হাঁটাহাঁটি চাকরী-জীবনের অভ্যাসের মধ্যেই ছিল। তবুও কোন এক রন্ধ্রপথে দেহে অসুখ ঢুকিয়া পড়িল। অসুখ সুরপতি গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতেন না, জরজারি হইলে তিনি আরও বেশী ঘোরাঘুরি করতেন। মনে ভয় ছিল, শুইলেই অসুখ তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলিবে। কাজল দাদুকে কখনো কোন কারণে শুইয়া থাকিতে দেখে নাই। একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলা সুরপতিকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অবাক হইল। পাশে সরযূ বসিয়া হাওয়া করিতেছে, বাড়িতে থমথমে আবহাওয়া।

হৈমন্তী বলিল—জরটা হঠাৎ বেড়েছে বুড়ো। দুপুরের দিকে আমায় ডেকে বললেন গায়ের উপর চাদরটা এনে দিতে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, বুকে খুব সর্দি। তুই খেয়ে নে, কি দরকার পড়ে কখন—

কাজল খাইতেছে, দিদিমা আসিয়া বলিলেন—খোকা, তুই খেয়ে সুরেশ-ডাক্তারকে একটা খবর দিয়ে আসিস তো, তোর দাদুকে যেন দেখে যায়।

অসুখটা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাড়ীর সবাই সে কথা বুঝতে পারিয়াছে। সুরেশবাবুও অনেকদিন হইতে সাবধান করিতেছিলেন, সিগারেট ছাড়িবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সুরপতি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

সুরেশডাক্তার সুরপতিকে দেখিয়া গেলেন। প্রতাপ তাঁহাকে আগাইয়া দিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভয়ের কিছু আছে নাকি ডাক্তারবাবু?

—ভয়ের তো বটেই। অনেক দিনের পোষা রোগ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি নে। দেখি দু'দিন—

সকালে খবরের-কাগজ আসিলে সুরপতি আগে পড়িতেন। প্লাস-পাওয়ারের চশমা চোখের লাগাইয়া কাগজটা আদ্যোপান্ত পড়িয়া শেষ করিতেন। আজ কয়েক দিন কাগজ আসিয়া তাঁহার টেবিলে পড়িয়া থাকে, প্রতাপ সময় পাইলে বিকালের দিকে একবার দেখে। কলিকাতায় সে ভাল কাজ করিতেছে কোন একটা সওদাগরী অফিসে, খুব সকালে বাহির হইয়া যায়।

রান্নাবান্নার দিকটা হৈমন্তী দেখে। কাজলের দিদিমা এবং সরযূ সুরপতিকে দেখাশুনা করে। খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে হৈমন্তী আসিয়া বাবার কাছে বসে। সুরপতির শরীরের শক্তি একেবারে চলিয়া গিয়াছে—মাসাধিক কাল শয্যাগত থাকিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, রোগ কঠিন। হৈমন্তী আসলে জিজ্ঞাসা করেন—ডাক্তার কি বললে রে?

—ভয় কি বাবা? বলে গেছেন, কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বলেছে এই কথা?

—নয় তো আমি কি মিথ্যে বলছি?

অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল, কমিবার লক্ষণ নাই। বুকে যেন কে দুই মণ পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, নিঃশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। সুরেশডাক্তার নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া বুকে টোকা মারিয়া বলিলেন—জল হয়েছে বুকে, ট্যাপ করতে পারলে ভালো হোত। কিন্তু এত দুর্বল রোগী—

সবাই এখন স্পষ্ট বুঝিয়াছে, সুরপতির আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার আশা নাই। বোঝেন নাই কেবল সুরপতি নিজে। কঠিন অসুখ হইয়াছে ইহা অনুভব করেন, কিন্তু অসুখটা যে তাঁহাকে পরপার-গামী খেয়ায় তুলিয়া দিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারেন নাই। দুর্বল গলায় প্রত্যেককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন অবস্থার কিছু উন্নতি দেখিতেছে কিনা।

শেষের দিকে বাঁচিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্য কাহারও কথা বিশ্বাস হইত না, দুপুরবেলা হৈমন্তী আসিয়া বসিলে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেন—হৈম, সত্যি বল। আমার কাছে লুকোস নে···আমি বাঁচবো তো?

কাজলের যেন কেমন লাগিল। দাদু ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, পরলোকে বিশ্বাস করেন, পুনর্জন্মের স্বপক্ষে অনেক কথা কাজলকে বলিয়াছেন—অথচ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে তিনি এত কাতর কেন?

বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন সুরপতি—দুইমাস আগে যাহারা দেখিয়াছে, এখন দেখিলে তাহারা চিনিতে পারিবে না। চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, হাড়ের উপর চামড়াটা কোনমতে লাগিয়া আছে মাত্র। নিঃশ্বাস লইবার সময় পাঁজরাগুলি প্রকট হইয়া ওঠে।

দিদিমা সমস্ত জীবন দাদুর দেখাশোনা করিয়াছেন। খাইতে বসিলে পাশে বসিয়া হাওয়া করিয়াছেন। শীতকালে আদা-চা এবং গরমকালে বেলের পানা করিয়া দিয়াছেন, বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে লাগাইয়া দিয়াছেন। কাজল বোঝে, এখন দিদিমা অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। অথচ তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া কেহ কিছু বলে না। সকলের মুখের দিকে তিনি শঙ্কিতভাবে তাকান—যেটা তাহারা গোপন করিতেছে, মুখভাব হইতে সেটা বুঝিবার চেষ্টা করেন।

ডাক্তার একদিন বলিলেন—আর ভরসা দিতে পারছি না, আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

প্রস্তুত সকলেই। সুরপতি মানুষ চিনিতে পারিতেছেন না। কষ্ট করিয়া শ্বাস লইবার সময় মুখ দিয়া হা-হা করিয়া শব্দ হইতেছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, অর্থহীন। দুপুরে সবাইকে বিশ্রাম করিতে পাঠাইয়া হৈমন্তী বাবার কাছে বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অপুর মৃত্যুর পর সুরপতি বিরাট মহীরুহের নিচে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সে আশ্রয় এইবার নষ্ট হইতে চলিল।

সুরপতি তাকাইয়া চিনিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন—কে? হৈম?

—হ্যাঁ বাবা, আমি।

সুরপতির কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল অস্বাভাবিক স্বরে বলিলেন—কাঁদিস নে, তোদের কান্না দেখিলে আমি মনে জোর পাই নে।

কান্নার বেগটা হৈমন্তী জোর করিয়া দমন করিল।

—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো বাবা?

মাথা নাড়িয়া সুরপতি সম্মতি দিলেন। হৈমন্তী মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে, এমন সময় সুরপতি হঠাৎ বলিলেন—দাদু কই?

—কাজল কলেজে গিয়েছে বাবা।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুরপতি বলিলেন—হৈম, দাদু খুব বড় হবে, দেখে নিস। ও অন্য রকম—

—তুমি ঘুমোও বাবা, কথা বোলো না—

—আমি বলে গেলাম হৈম, তুই মিলিয়ে নিস।

একটু পরে সুরপতি বলিলেন—গায়ে চাদর দিয়ে দে, আমার শীত করছে।

একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া কাজল শুনিল পাশের ঘর হইতে দাদুর ক্ষীণ গলার স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। দাদু কি বলিতেছেন, কেহ উত্তর দিতেছে না।

মশারী তুলিয়া কাজল সুরপতির ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। প্রথম-রাত্রে সরযুর জাগিয়া থাকার কথা, অতিরিক্ত ক্লান্তিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পর পর কয়েকরাত্রি জাগিয়া দিদিমাও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কোথাও কেহ নাই, সমস্ত বাড়ীতে নীরবতা খাঁ-খাঁ করিতেছে।

সুরপতির মাথা বালিশ হইতে নিচে বিছানার চাদরে গড়াইয়া পড়িয়াছে। মাথা তুলিবার বারবার চেষ্টা করিয়াও পারিতেছেন না। কাজলকে দেখিয়া বলিলেন—মাথাটা তুই বালিশে তুলে দিয়ে যা দাদু, কেউ তো আসছে না।

কাজলের বড় খারাপ লাগিল। জীবনের পরিণতি যদি এমনি হয়, তবে মানুষ বাঁচে কিসের আশায়? যৌবন অতিক্রান্ত হইবার আগেই তো আত্মহত্যা করা উচিত পরবর্তী দুর্দশার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য।

পরের দিন সকালে সুরেশডাক্তার বলিলেন, দিন কাটে কিনা সন্দেহ। কাজল কলেজ এবং প্রতাপ অফিস কামাই করিয়া বাড়ীতে থাকিয়া গেল। দুপুরে অনেক মাছ রান্না হইয়াছিল—সুরযু আর হৈমন্তী পরামর্শ করিয়া কাজটা করিয়াছিল। অন্য দিন হইতে বেশী মাছ দেখিয়া দিদিমা বলিলেন—এত মাছ কেন রে?

সরযূ বলিল—খাও না মা। সন্তা পেয়ে প্রতাপ নিয়ে এসেছে।

দিদিমা হাটুর ওপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—আমাকে তোরা সবাই কেন ঠকাচ্ছিস, আসল কথাটা কেন বলছিস নে?

কিছুতেই তাঁহাকে খাওয়ানো গেল না।

দুপুরবেলা সুরপতির শ্বাসকষ্ট ভীষণ বাড়িল। এক একবার দম লইবার সময়ে মনে হইতেছিল, প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

হৈমন্তী কাজলকে বলিল—একবার তুই চট করে সুরেশবাবুর কাছে যা, সঙ্গে করে নিয়ে আসবি অবস্থাটা বলে—

গায়ে একটা জামা গলাইয়া কাজল সুরপতির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরপতি তাকাইয়া আছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন কিনা কাজল বুঝিল না। সে ঝুঁকিয়া বলিল—দাদু, আমি কাজল।

সুরপতি কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন। বুকটা হাপরের মতো সমানে ওঠা-পড়া করিতেছে। গোঙানির স্বরে সুরপতি বলিলেন—দাদু, বুকে বড় কষ্ট—

আর্তস্বর কাজলের ভীষণ খারাপ লাগিল, সে দৌড়াইল সুরেশবাবুর বাড়ীতে। রিক্সা করিয়া সুরেশবাবুর সঙ্গে ফিরিবার সময় দেখিল, প্রতাপ খালিপায়ে বাহির হইতেছে। বলিল—বাবা মারা গেছেন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবুর ঘড়িতে তখন তিনটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট। কুড়ি মিনিট আগেও কাজল দাদুর সহিত কথা বলিয়াছে।

সুরপতির সঙ্গে দেওয়ার জন্য কাজল পাঞ্জাবী কিনিতে গিয়াছে। একটা নামাবলীও কিনিতে হইবে। পাড়ার ছেলেরা ফুলের মালা ধূপকাঠি ইত্যাদির জোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে। দোকানী রেডিমেড পাঞ্জাবির স্তূপ সামনে আনিয়া বলিল, কি মাপের চাই?

কাজলের শুনিয়া অদ্ভুত লাগিল। গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল—মাপের দরকার নেই, মাঝারি দেখে দিন। যার জন্যে যাচ্ছে, তিনি মারা গেছেন।

দোকানীর এই মাপ জানিতে চাওয়ার কথা কাজলের বহুদিন মনে ছিল।

দাহ অন্তে লোহা এবং আগুন স্পর্শ করিবার জন্য শ্মশানবন্ধুরা বাড়ীতে ঢুকিতেই দিদিমা অনেকদিন বাদে কাঁদিয়া উঠিলেন—ওরে তোরা কোথায় শীতের মধ্যে রেখে বুড়োকে—ও যে মোটে একলা থাকতে পারে না—

(কাজলের ডায়েরী হইতে)

এখন অনেক রাত। সবাই ঘুমুচ্ছে আমার পোষা বিড়ালটাও গুড়িসুড়ি মেরে মার ট্রাঙ্কের ওপর শুয়ে আছে। বহু দূরের রেলওয়ে-সাইডিং থেকে

শানটিংএর শব্দ শুনিতে পাচ্ছি। পাশের বাড়ীর মুকুলবাবুর পোষা কুকুরটা ঘুমের মধ্যেই স্বপ্ন দেখে গরগর করে উঠছে।

আমার কেন ভাল লাগছে না, জানি না। দাদু মারা যাবার পর থেকেই কেমন একটা চিন্তার পোকা মাথার ভেতরের সুস্থ কোষগুলি কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে। বাবার মৃত্যুর পর আমার চিন্তাশক্তি বেশ কিছুদিন অবশ হয়েছিল, তা ছাড়া আমার বয়সও তখন ছিল কম। কিন্তু দাদুর মৃত্যু আমি খুব কাছ থেকে দেখলাম, মৃত্যুর কালো পোশাকপরা অতিলৌকিক শরীরটা একেবারে আমার গা ছুঁয়ে গেল। সে চলে গেল বটে, কিন্তু তার ক্ষণিক উপস্থিতির নিদারুণ মুহূর্তগুলো আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

পাশের ঘরের দরজা খোলা। ঐ ঘরে এই একমাস আগেও দাদু শুয়ে থাকতেন। আলো পছন্দ করতেন না বিশ্রামের সময়, আলো নেভানো থাকতো। অন্ধকারে দাদুর সিগারেটের আগুন দেখতে পেতাম। গরমকালে দাদু হাত-পা নাডতে নাডতে আপন মনে গাইতে—'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।'

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এ কথা জানবার জন্য সন্ন্যাসী হওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু মৃত্যু এসে একদিন সব কেড়ে নিয়ে বিষাণ বাজাতে বাজাতে চলে যাবে—এটা সহ্য করতে হলে দৃঢ় মন দরকার। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছি, আমার সে শক্তি নেই। মৃত্যু এসে অলক্ষ্যে আমার ঘরে দাঁড়াবে, তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করে কঠিন আদেশ উচ্চারণ করবে—এসো; আমাকে চলে যেতে হবে। আমি পৃথিবীকে ভালবাসি, জীবনকে শীতের রোদ্দুরের মত ভালবাসি। বৃষ্টির দিনে জানলায় বসে ক্রমঘনায়মান অন্ধকারে অবিশ্রাম বৃষ্টি দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে হয়, মাটির পৃথিবী ছয় ঋতু সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত বর্ষণক্লান্ত আকাশের ময়ূরকণ্ঠী রঙ—এসব ছেড়ে কখনো আমি যেতে পারবো না। কবিতা লিখি না—কিন্তু আমি কবি, আমি রসিক। মাটির সঙ্গে যে নাড়ীর বন্ধন, তাকে ছিঁড়ে যেতে আমি পারবো না। অথচ সে আমার কথা শুনবে না, সে আমায় ছেড়ে যাবে না, প্রতিজ্ঞা শুনে নিঃশব্দ অট্টহাস্য করে দিকচিহ্নহীন অন্ধকারে আমাকে চিরকালের জন্য ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

বেঁচে থাকার তবে অর্থ কি? সমস্ত পৃথিবীটার সৃষ্টি না হলেও ক্ষতি ছিল না। আমি তো চিরদিনের জন্য তাকে নিজের কাছে রাখতে পারবো না, তবে সামান্য সময়ের জন্য ধরে রাখার কি অর্থ?

অথচ ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে মনে হয়, জীবনের কি-যেন গূঢ় অর্থ আছে। জীবনের সার্থকতা কোথায়, কে যেন আমাকে কানে কানে বলে

যায়। আধো-ঘুমের মধ্যে আমি হাতড়ে বিছানায় খুঁজি—যেন সার্থকতার চাবিকাঠি কেউ আমার কাছেই রেখে গেছে। পাই না, হাতে ঠেকে মায়ের গা। শেষ-রাত্রের তরল অন্ধকারে হঠাৎ জেগে-যাওয়া চোখে মাকে আঁকড়ে শুয়ে থাকি। যেন মাকে ছেড়ে দিলেই আঁধার-সমুদ্রের ঢেউ আমাকে ভাঙা-পানসীর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোথায়।

আমার স্বভাব বড় রুক্ষ হয়ে উঠছে। হয়তো মানসিক অসন্তুষ্টিই এর কারণ। আমি বুঝতে পারি না, সবাই কি করে একে অস্বীকার করে হাসিমুখে বেঁচে আছে। হয় তারা সবাই একযোগে বোকা, নয়তো আমার থেকে অনেক জ্ঞানী। আজকাল বেড়াতে গিয়ে মাঠের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে সব জায়গায় অতৃপ্তি অনুভব করি। কালো পোশাক-পরা কে-একজন আমার পেছন পেছন আসে—তাকে আমি দেখতে পাই না, তাকে অনুভব করি। জানি দিন যত কাটাবে, তার আর আমার ব্যবধান ততই কমে আসতে থাকবে।

পরমেশের বোনের শ্বশুরবাড়ী ব্যারাকপুরে। বোনকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দিতে সে গিয়েছিল, আমায় সঙ্গে নিয়েছিল। দুপুরবেলা তার ভগ্নীপতির বাড়ী খাওয়াদাওয়া সেরে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলাম। এধারে লোকজন কম, কাছেই মিলিটারী ব্যারাক। গঙ্গার পাড়ে বাবলার বন, দূর থেকেই দেখা যায় বাবলাগাছের ফাঁকে ফাঁকে নদীর জল চিকচিক করছে।

উঁচু পাড়ে বসে ওপারে শ্রীরামপুরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছি, এমনি সময় নজরে পড়ল পাড়ের নিচেই কাদার ওপরে পড়ে আছে একটা ছোট কাগজের বাণ্ডিল—নীলসুতো দিয়ে বাঁধা। কি রকম মনের ভাব হলো—জুতো খুলে টপ করে নিচে নামলাম জলের কাছাকাছি। তখন ভাঁটা চলছে, জল এসে। কাগজগুলোকে স্পর্শ করে নি। যে ফেলেছে, কিছুক্ষণ আগেই সে এখানে ছিল।

সুতোটা না খুলে ভাববার চেষ্টা করলাম, এগুলো কি হতে পারে। বাজে কাগজ? দলিল? বাড়ীভাড়ার পুরোনো রসিদ? প্রেমপত্র?

খুলে দেখি প্রেমপত্রই বটে। ঘটনাটা উপন্যাসের মত শোনাচ্ছে—ডায়েরীর ছেঁড়া-পাতায় কাঁচাহাতের লেখায় ভুল-বানানে প্রায় পনেরো কুড়িটি প্রেমপত্র নীলসুতো দিয়ে বাঁধা। যাকে লেখা, তার জীবনে হয়তো এগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এতদিন সযত্নে রাখা ছিল বাক্সের কোণে, বের করে আজ গঙ্গার বুকে ফেলে দিয়ে গেছে।

চিঠিগুলি তখন পড়ি নি। বাড়ী এসে পড়বার-ঘরে টেবিল-ল্যাম্প জেলে এক একখানা করে পড়ে ফেললাম। নাম দেওয়া নেই। তবে একটু বোঝা যায়,

কোনো মেয়ে তার প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে চিঠিগুলি লিখছিল। চিঠির নিচে লেখা—'ইতি তোমার মিতা'। সম্বোধনেও 'প্রাণের মিতা'। কাজেই মিতা তার নাম নয়। এদের ভালোবাসা পরিণতি লাভ করে নি, চিঠি ফেলে দেওয়া থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। একটিতে লেখা—তোমাকে অনেকদিন পরে দেখলাম। মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। সত্যি, আজ সকাল থেকে দিনটা খুব ভালো যাচ্ছে। তোমার কাছ থেকে যা আশা করেছিলাম, তার থেকে অনেক বেশী পেলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাকে সারাজীবন যেন এমনি করেই পাই। ইতি—তোমার মিতা। আর একটিতে—তুমি চলে গেলে, কিন্তু একবারও তো বললে না—যাচ্ছি। হয়তো তোমার ভুল হয়ে গেছে, হয়তো তুমি দেখো নি দরজার পাশে আমি দাঁড়িয়েছিলাম তোমার পছন্দসই সেই ডুরে-শাড়ীটা পরে। আমার এক বন্ধু বলেছিল, ভালোবাসলে দুঃখ পেতে হয়। আমার ভাগ্যে তাই আছে। সারাজীবন হয়তো কেবল দুঃখই পাবো। কেন যে এমন ভুল করলাম! ইতি—তোমার অবুঝ মিতা।

অন্য কেউ পড়লে হয়তো মনে মনে বিরাট এক গল্প তৈরী করে নায়িকার দুঃখে সন্ধ্যেটা মূহ্যমান হয়ে কাটাতো। এক বছর আগে চিঠিগুলি পড়লে আমিই অচেনা মেয়েটির কথা ভেবে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ আমার মনে এক উল্টো প্রতিক্রিয়া হলো। বাইরে থেকে বাতাস এসে বার বার টেবিল-ল্যাম্পের আলো কাঁপিয়ে দিয়ে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের পাতা নিয়ে খেলা করছে, বাড়ির সামনে শম্ভুপাগলা এসে প্রতিদিনের মত খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখ তুলে টানা-স্বরে বলে যাচ্ছে—ভাত খাবো ভাত খাবো, ভাত—ভাত—ভাত! পাশের বাড়ীর ছাদে কে দুমদুম করে কয়লা ভাঙছে। এর মধ্যে আমার মনে বিচিত্র অসন্তোষের ঝড়। চিঠিগুলোর প্রেরক এবং প্রাপককে যেমন আমি কোনোদিনই জানতে পারবো না, তেমনি আমার প্রশ্নের উত্তরও আমি কোনোদিন পাবো না। আমার অস্থিরতার সঙ্গে চিঠির ব্যাপারটা হঠাৎ মিলেমিশে এক হয়ে গেল। বাতি নিভিয়ে দিতেই তাহাদের ছায়া নিয়ে একরাশ জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়লো মেঝের ওপরে। বাতাস বাইরে গাছগুলোকে ধরে খুব করে একে একবার ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল। বাতিটা থেকে পোড়া-সলতের কেমন একটা গন্ধ আসছে, নামিয়ে রাখতে গিয়ে নজরে পড়লো মেঝের জ্যোৎস্নার ফালি। আমার মাথার ভেতরে চেতনাটা অতীতকে ভালোবাসে, নাম-না-জানা ফুলের গন্ধে ভারাক্রান্ত অতীতের সন্ধ্যেগুলোয় ফিরে যেতে চায়—সেই চেতনা শেকল ছিঁড়ে হঠাৎ লাফালাফি শুরু করে দিল। চাঁদের আলোটুকুর দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম একশো বছর

আগেকার স্বাভাবিক সরল সুন্দর জীবনের কথা, যেমনটি পড়ছি বই-এ। সে-জীবনের সঙ্গে তুলনা করে বর্তমানের ওপর আমার বিতৃষ্ণা হল, অসন্তুষ্টি বেড়ে উঠে মনে হতে লাগলো—পাই নি, পাবো না।

তখনও শম্ভুপাগলা সামনে চিৎকার করে চলেছে—ভাত—ভাত—ভাত।

একদিন মিউজিয়ামে গেলাম। বহুদিন আগে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম, আর এই। সময়ের দিক দিয়ে দেখতে গেলে খুব বেশী দিন নয়—কিন্তু আমিই পালটে গেছি।

মিউজিয়ামের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ঘুম-ঘুম ভাবটা আমার ভালো লাগে। করিডোরের সারি সারি ধ্যানীমূর্তি, স্বল্প আলোয় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কঙ্কাল, মৃত্তিকাভ্যন্তর থেকে আনা বিচিত্র পাথর—এসবের মধ্যে, আমার মনে হয়, কি যেন লুকিয়ে আছে। বহুদিন আগের হারিয়ে-যাওয়া মানুষের উপস্থিতি আমার চোখের সামনে আমার মনের ভেতরে অনুভব করতে পারি।

লম্বা ঘরগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকিয়ে মন বাধাবন্ধ মানতে চায় না—ইচ্ছে করে, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ফেটে পড়ি। ভূ-বিজ্ঞান প্রত্নতত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যে লুকানো আছে মানুষের জন্মের ইতিহাস—সবকিছু একসঙ্গে না জানতে পেরে খালি মনে হয়, ঠকে গেলাম—বোকাই রয়ে গেলাম। একটি ঘরে বৌদ্ধযুগের মূর্তিশিল্প সংগৃহীত। আমি ইকনোগ্রাফির ধার ধারি না, অথচ কি-এক আকর্ষণে আজ ঢুকেছিলাম। ভালোই করেছিলাম, তার ফলে আমার এক চমৎকার অভিজ্ঞতা হলো।

পাথরের এক নারীমূর্তি আমার বড় ভালো লেগে গেল। মূর্তিকারের নাম নেই। শুধু লেখা : মূর্তিটি খ্রীস্ট-জন্মের আগে তৈরী, সম্ভবত শিল্পীর প্রেয়সীর প্রতিকৃতি। ঘরের আয়তনের তুলনায় আলো যথেষ্ট নয়। ফলে সব সময়ই কেমন আধো-আলো আধো-অন্ধকার পরিবেশ। সেই মৃদু আলোকিত স্বপ্ন-পরিবেশে মূর্তিটির সামনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

স্পষ্ট দেখলাম, মেয়েটি হাসছে।

তখন কাছাকাছি কোনো মানুষ ছিল না, খুব কাছে গিয়ে আমি মুখের দিকে তাকালাম। হাসি পাথরের উৎকীর্ণ বটে, কিন্তু আমার মনে হলো সে যেন এইমাত্র আমাকে দেখে হেসে উঠেছে!

আমার সে সময়কার মনের অবস্থা বোঝানো যায় না বলেই তেমন চেষ্টা করছি না। দরকারই বা কি, এ ডায়েরী আমি ছাড়া যখন অন্য-কেউ পড়বে না।

খালি মনে হতে লাগল, কবে যেন এর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বহুদিন আগে উপহার পাওয়া আতরের শিশি বাক্স থেকে বার করে শুঁকলে তার গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পুরনো দিনটা আবার ফিরে আসে, তেমনি ওখানে দাঁড়িয়ে মনে হোল অতীত আমার সবাঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ধূপের মৃদু গন্ধ পেলাম, প্রাচীন যুগের মহিলারা ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকোতে বসলে যেমনটি পাওয়া যেতো। অনুভূতি এত তীব্র ও স্পষ্ট যে, আমি নিজেকে সরাসরি সে-যুগটার সঙ্গে জড়িত বলে বোধ করলাম।

বাড়ী আসতে আসতে মনে হলো, আমি এবং সে-অস্তিত্ব একই সমতলে অবস্থিত নই—দেশকালের বিভিন্ন দুই স্তরে কবে থেকে আমরা পরস্পরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই কোনো এক ধ্রুবকেন্দ্রে এসে মিলিত হতে পারছি না। শুধু খুঁজছি, শুধু খুঁজছি।

কবে যেন সে আমার জন্য কুটিরাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে থাকত। সমস্ত মনে কি-যেন হারানোর যন্ত্রণা, খুঁজে না-পাওয়ার অতৃপ্তি।

কলেজে যাইবে বলিয়া কাজল বইপত্র গোছাইতেছে, হৈমন্তী ডাকিয়া বলিল —হ্যাঁ রে, কোলকাতার অবস্থা কেমন? শুনলাম লোকজন নাকি খুব পালাচ্ছে? ভট্‌চাযপাড়ায় বকুলের বাবার যে-বাড়ীটা খালি পড়েছিল, সেটায় এক পরিবার এসে উঠেছে। এখানে থাকবে না বলছে, আরও গাঁয়ের দিকে চলে যাবে।

কাজল বলিল—আমি তো এখন পর্যন্ত ভয়ের কিছু দেখলাম না। লোকজন কিছু গাঁয়ের দিকে পালিয়েছে ঠিকই, রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা ঠেকে আগের চেয়ে। তবে অফিস-কাচারী ঠিকই চলছে—

—আমাদের এদিকে ভয়ের কিছু নেই, না?

--দূর! কোথায় রইল যুদ্ধ কোথায় আমরা! যারা পালিয়েছে তারাও ফিরলো বলে, দেখ না।

একদিন কলেজ হইতে ফিরিবার সময় কাজল দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার খবর পায়। শেয়ালদহের মোড়ে হকার হাঁকিতেছে টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম বহুলোক ভিড় করিয়া পড়িতেছে এবং সরব আলোচনা করিতেছে। একখানা কিনিয়া কাজল পড়িয়া দেখিল। পোলিশ-করিডর দাবী করিয়া হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছেন, যুদ্ধ শুরু হইয়াছে।

ক্রমে কলিকাতার চেহারা পাল্টাইল। ল্যাম্প-পোস্টের আলোয় কালো ঠুলি

পরাইয়া দেওয়া হইল। এ, আর, পি, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নাম-ধাম লিখিয়া লইতে লাগিল, প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে লাগিল। অন্ধকার রাস্তা হাঁটিতে হাঁটিতে, কাজলের মনে একটা বিশ্রী ভাব যেন চাপিয়া বসিত। শীতকালে সন্ধ্যা হয় বিকাল শেষ হইতে না হইতেই—কলেজ হইতে বাহির হইয়া কাজল দেখিত, বিশাল শহরের উপরে অন্ধকার দুঃস্বপ্নের মত চাপিয়া আসিতেছে।

মালতীনগরে বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কেবল কাঁঠালিয়ার কাছে একটা বিরাট মাঠ সৈন্যেরা কাঁটাতারে ঘিরিয়া সেখানে রাইফেল প্র্যাকটিস করে। সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

সকালে উঠিয়া শোনা যায়, দূর হইতে রাইফেলের আওয়াজ আসিতেছে। সুন্দর সকাল। জানলার পাশে টগর গাছটায় সকালের রোদ্দুর আসিয়া পড়িয়াছে, একটা টুনটুনি পাখি বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার ডালে আসিয়া বসিতেছে। মিষ্টি আমেজের ভিতর রাইফেলের শব্দে কাজলের মেজাজ খারাপ হইয়া যায়। তাহার জীবনের সহিত বন্দুকের শব্দ মোটেই খাপ খায় না।

একদিন রাস্তায় আদিনাথবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। সে প্রণাম করিয়া বলিল—ভালো আছেন সার?

আদিনাথবাবু কাজলকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—তুই কেমন আছিস অমিতাভ? তোর চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, অসুখবিসুখ করেছিল নাকি?

—না সার।

—তবে এমন চেহারা কেন?

কাজলের মনে হইল আদিনাথবাবু তাহার মনের কথা বুঝিবেন, তিনি তাহাকে সমাধানের পথ বলিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু বলিতে গিয়া দেখিল, জিনিসটা সে সহজে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। জীবনের কোন অর্থ নাই, এ কথা ভাবিয়া তাহার বয়সী একটি ছেলের রাত্রে ঘুম হইতেছে না, ইহা রীতিমত হাস্যকর! এই কথা ভাবিয়া শরীর খারাপ হওয়া নিঃসন্দেহে অন্যদের কাছে অবিশ্বাস্য। সে বলিল—আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না সার। ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, তার সঙ্গে আমার মন যেন আর খাপ খাচ্ছে না।

—পরিষ্কার করে বল্।

—সার, এত দীর্ঘ দিন ধরে বেঁচে থাকার মানে কি? এত কষ্ট করে পড়াশুনা করা, জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, জীবনকে ভালবাসা—এর কি অর্থ? মৃত্যুর পর তো একটা ভয়ানক অন্ধকার আমাদের গ্রাস করে নেবেই।

মালতীনগর স্টেশনের লোকের ভিড়ে ব্যাগ হস্তে আদিনাথবাবুর সামনে

দাঁড়াইয়া কথাটা ভীষণ নাটকীয় শোনাইল। কাজল বুঝিতে পারিল, বিষয়টা সে পরিষ্কার করিতে পারে নাই—কিছুটা ফাঁকা আওয়াজ হইয়াছে।

কিন্তু আদিনাথবাবুর মুখ আস্তে আস্তে গম্ভীর হইল। কাজলের কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—চল্, কোনো জায়গায় বসে কথা বলি।

স্টেশন ছাড়িয়া নির্জন পথে পড়িয়া একটা বাঁধানো কালভার্টের উপর আদিনাথবাবু বসিলেন। বলিলেন—বোস আমার পাশে।

কাজল বসিল।

কিছুক্ষণ আদিনাথবাবু কথা বলিলেন না, ব্যাগটা পায়ের কাছে নামাইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। কাজলও পাশে বসিয়া রহিল। সময় কাটিতেছে, কাহারও যেন কথা বলিবার চাড় চাই।

আদিনাথবাবু হঠাৎ কাজলের দিকে তাকাইয়া গম্ভীর স্বরে মন্ত্র পড়িবার মত করিয়া বলিলেন—তোর জীবনের সুখ একেবারে চলে গেছে অমিতাভ, আর কখনও আসবে না।

কাজল চমকিয়া উঠিল। কথাগুলি তাহার অন্তরের গভীরে যেন তীক্ষ্ণমুখ শলাকার মত বিঁধিয়া গেল। মাস্টারমশাই ঠিকই বলিয়াছেন—তাঁহার মত করিয়া আর কে বুঝিয়াছে যে সুখ আর কখনও আসিবে না? সঙ্গে সঙ্গে কাজলের মেরুদণ্ড বাহিয়া একটা ভয়ের স্রোত নিচে নামিয়া গেল। যে অসুখ শুরু হইয়াছে, তাহা কখনও সারে না।

—অমিতাভ।

—সার?

আদিনাথবাবু বলিলেন—যে চিন্তা করে, তার জীবনে কখনো সুখ আসে না। তুই জীবনের একেবারে আসল জায়গায় ঘা দিয়েছিস। ভাবতে অবাক লাগছে, এত অল্প বয়সে তুই এ চিন্তা পেলি কোথা থেকে।

—একটা কথা বলবো সার?

—বল্।

—কি মনে হয় আপনার জীবন সম্বন্ধে? আপনি কি বিশ্বাস করেন মৃত্যুতেই জীবনের শেষ?

—সত্যি উত্তর দেবো?

—তা নইলে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো কেন?

—আমার কিছুই মনে হয় না। অনেক দিন আছি পৃথিবীতে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগেই আমার চিন্তাশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। এখন আমি দেনায় জর্জরিত—ভবিষ্যৎহীন বৃদ্ধ। আমার এই

বর্তমানের চেয়ে বেশী ভয়ঙ্কর আর কি হতে পারে? তবুও অমিতাভ আমার মন চায়, একটা-কিছু অর্থ থাকুক এ-সবের। কিন্তু আমি জানি, সমস্ত জিনিসটা signifies nothing—কেবল sound অমিতাভ, কেবল fury, আর কিছু নয়।

অকস্মাৎ আদিনাথবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ওসব চিন্তা একদম বাদ দিয়ে দিয়েছি। এককালে খুব ভাবতাম, বুঝলি? এখন তোদের জন্যেই বেঁচে আছি বলতে পারিস। তোরা মানুষ হবি বড় হবি—বিশ্বাস কর্, আমার খুব ভাল লাগবে দেখতে।

আপনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন সার?

—তুই বিশ্বাস করিস?

—করতে ইচ্ছা হয়, পাবি না।

—কেন?

—বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখলে কোনো মানে হয় না বলে।

—বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় না, তা মিথ্যে?

—তাকে হৃদয় দিয়ে মেনে নেওয়া যায়, বাস্তবে স্বীকার করা যায় না।

—স্বীকার না করায় বাহাদুরি কি অমিভাভ? তাতে তো শুধু কষ্ট—

—কষ্ট তো বটেই মাস্টারমশাই। স্বীকার না করায় কিছু বাহাদুরি নেই, আমি বিশ্বাস করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু বুদ্ধিতে বাধা দেয় যে।

—অমিতাভ, আমি তোকে আশীর্বাদ করি, তোব জীবনে যেন বিশ্বাস আসে, তুই যেন কখনো পরাজিত না হোস।

—শুধু বিশ্বাস দিয়ে কি হবে সার, যদি আসলে কোনো অর্থ না থাকে? শূন্যতায় বিশ্বাস করা কি নিজেকে ঠকানো নয়?

আদিনাথবাবু কাজলের কাঁধে হাত দিয়া একটা ঝাঁকুনি দিলেন, তারপর বলিলেন—তবু সে নিছক sound আর fury থেকে ভালো। বড় হয়ে তোর মনে হবে, বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে। মনে হবেই দেখিস।

আদিনাথবাবুর সঙ্গে কাজলের এই শেষ দেখা। এর কিছু দিন বাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। ব্যোমকেশ হঠাৎ আসিয়া খবরটা দিয়াই আবার চলিয়া গিয়াছিল। রাত্রে বিছানায় শুইয়া পরদিন আদিনাথবাবু আর ঘুম হইতে ওঠেন নাই। ঘুমের ভিতরেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সংসারের জন্য একপয়সাও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু দেনা পাই-পয়সা পর্যন্ত মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের শুরু। ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যুদ্ধে নামিল। ১৮ই সেপ্টেম্বরের ভিতর পোল্যাণ্ডের পতন

হইল। ওয়ারশ-তে নাজী-বাহিনীর এমুনিশন-বুটের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল!

প্রথম দিকে কাজল কলিকাতায় বিশেষ-কিছু অস্বাভাবিকতা দেখে নাই। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, মানুষ ততই দিশেহারা হইয়া পড়িল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে জাপান হঠাৎ পার্লহারবার আক্রমণ করায় আমেরিকা যুদ্ধে নামিল। ইহার কিছুদিন বাদে ব্রহ্মদেশের পতন হওয়ায় ভারতবর্ষ অনুভব করিল, বিপদ একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শুরু হইল বাক্স-বিছানা ঘাড়ে গ্রামের দিকে সদলে পলায়ন। তাড়া-খাওয়া প্রাণীর মত অবস্থা।

অনেক সময় কাজলের ক্লাস করিতে ভাল লাগিত না। পরমেশের সঙ্গে রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হইত, মানুষ খামাকা যুদ্ধ করে মরছে কেন? এমনিই তো মরবে ক'দিন বাদে।

সে বলিত—পরমেশ, যুদ্ধ বড় বিভৎস আর অর্থহীন, না?

—হয়তো তাই, কিন্তু যুদ্ধেরও অনেক সৃষ্টিশীল দিক আছে। কলকারখানা বাড়ছে, নতুন-নতুন আবিষ্কার হচ্ছে। কত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হবে হয়তো পরে। প্রথম মহাযুদ্ধের ফসল যেমন রেমার্ক রুপার্ট ব্রুক—

—ভালো সাহিত্যের জন্য, নতুন আবিষ্কারের জন্য কি মানুষ মারতে হবে?

পরমেশ হাসিল। বলিল—তুমি নিজেই বলে থাকো জীবনের কোন অর্থ হয় না, জীবনটা দীর্ঘ দিন ধরে ক্লান্ত হবার একটা পন্থা মাত্র। মানুষের জীবন থাকলো কি গেল, তাতে তোমার দুঃখিত হবার কারণ নেই।

কাজল ভাবিয়া দেখিল, পরমেশ ঠিকই বলিয়াছে। তাহার দর্শন অনুযায়ী যুদ্ধে মনমরা হইবার কারণ নাই।

অথচ এ কথাও ঠিক যে, সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার আলোকহীন নিষ্প্রাণ সন্ধ্যা, লোকজনের পলায়ন, প্রতিদিন যুদ্ধের নূতন নূতন নারকীয় সংবাদ তাহার মনে এত অবসাদ আনিয়াছে যে, আই-এ পরীক্ষায় যেমন করা উচিত ছিল, তাহা সে পারে নাই। পরীক্ষার হলে বসিয়া অনেকবার কাগজ জমা দিয়া উঠিয়া আসিবার কথা ভাবিয়াছে, কিন্তু মায়ের কথা ভাবিয়া পারে নাই।

মায়ের আশা সে বড় হইবে। টাকার দিক দিয়া নহে, যশের দিক দিয়া। রাত্রে শুইয়া সে বাচ্চাছেলের মত মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া থাকে। সারাদিনের চিন্তায় পরিশ্রমে ক্লান্ত মস্তিষ্ক তাহাতে বিশ্রাম পায়। পৃথিবীর বড় বড় ফাঁকির ভেতরে মায়ের ভালোবাসাই তাহার কাছে একটুকু সার-পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। প্রায় রাত্রে দুইজনে নিশ্চিন্দিপুরের গল্প করে, মৌপাহাড়ীর গল্প করে। গল্প কিছুক্ষণ চলিবার পর কাজল টের পায়, মা কাঁদিতেছে। তখন সে বলে—মা, তোমার ছোটবেলার গল্প বলো।

হৈমন্তী কাজলকে বুকের কাছে লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার রঙীন শৈশবের গল্প করে।

ভারী সুন্দর ছিল সে-সমস্ত দিন। কত জায়গায় ঘুরিয়াছে বাবার সঙ্গে। এক জায়গায় সংসার পুরাতন হইতে না হইতেই সব-কিছু গুটাইয়া আবার নতুন স্থানে যাত্রা শুরু হইত। জামালপুরে তাহাদের পাশের বাড়ীর সেই সুমিত্রাদি কি ভালোই না বাসিত তাহাকে। স্বামী রাত্রে মদ খাইয়া বাড়ী ফিরিত, হুঁস থাকিত না। সুমিত্রাদি জামাকাপড় ছাড়াইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া বাতাস করিয়া ঘুম পাড়াইত। একদিন অভিযোগ করিতে গিয়া কি মারটাই না খাইয়াছিল স্বামীর হাতে। হৈমন্তীকে ডাকিয়া সে একদিন গহনাপত্র দেখাইয়াছিল। শখ করিয়া কত-কিছু গড়াইয়াছিল সুমিত্রাদি, খুব শখ ছিল ভালো করিয়া সংসার করিবে। হয় নাই। মাতাল অপদার্থ স্বামী কোথা হইতে আর একজনকে বিবাহ করিয়া আনিল। অনেকদিন বাদে সুমিত্রাদি গেল পাগল হইয়া। তাহাকে বাপের-বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সুমিত্রাদি আর সারিয়া ওঠে নাই, তাহার সংসার করিবার সাধ পূর্ণ হয় নাই।

—তখন ভারি টক খেতে ভালোবাসতাম, জানিস বুড়ো। আমি আর দিদি সারাদিন এ-বাগানে ও-বাগানে ঘুরতাম চালতে করমচার খোঁজে। এক বুড়োর বাগানে লুকিয়ে ঢুকেছিলাম। বুড়ো দেখতে পেয়ে আমাদের ডেকে বলল—লুকিয়ে নিচ্ছ কেন খুকীরা, যত ইচ্ছে নিয়ে যাও, কেউ কিছু বলবে না। কোথায় থাকো মা তোমরা?

কাজলের মায়ের জন্য দুঃখ হয়। মা জীবনে কিছু পায় নাই। কত অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, এখন পুরাতন স্মৃতিমন্থন করিয়া দিন কাটায়। বাবা মারা যাইবার পর হইতে কি-ই বা রহিয়াছে! একটা বড় রকমের কিছু করিয়া মাকে খুশী করিতে হইবে। সে বলে—একটা গল্প শুনবে মা?

—কি গল্প রে খোকন?

সে ফিয়োদর সোলোগাব-এর 'দি হুপ' গল্পটা মাকে বলে। সোলোগাব এমন-কিছু বড় সাহিত্যিক নয়। কিন্তু গল্পটা তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। আশি বছরের এক বৃদ্ধের গল্প। মায়ের সহিত বাচ্চাকে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া বৃদ্ধের শিশু হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। বাচ্চাটি বেশী দূরে গিয়া পড়িলেই মা ডাকিয়া বলিতেছে—ওদিকে যাস নে, পড়ে যাবি। পরের দিন বৃদ্ধ কাজ কামাই করিয়া সারাদিন বালকের মত নির্জন পাহাড়ের ধারে খেলিয়া বেড়াইল। বৃদ্ধের কেহ ছিল না। শৈশবে সে মায়ের স্নেহ পায় নাই। অশক্ত শরীরে পাহাড়ের পথে দৌড়াইতে দৌড়াইতে কেবলই তাহার মনে

হইতেছিল, মা পিছন হইতে সাবধান করিয়া দিতেছে—ওদিকে যাস নে, পড়ে যাবি।

সম্বলহীন আত্মীয়হীন বৃদ্ধের গল্পটা কাজলের মনে দাগ কাটিয়াছিল। বলিতে বলিতে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। শেষ দিকটায় তাহার গলার কাছটায় একটা কান্না আটকাইয়া যাইতেছিল। অবাক হইয়া সে লক্ষ্য করিল, জীবনের অর্থহীনতা আবিষ্কারের পরেও সে জীবনকে কত ভালবাসে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—কত লোক জীবনে কিছু না পেয়েই মরে যায় মা।

হৈমন্তী তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—ওমা, বুড়ো তুই কাঁদছিস? তুই না বি এ. পড়িস? বই পড়ে কান্না।

—আমি মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য একটা কিছু করবো, দেখে নিও। সারাজীবন যারা কেবল কষ্ট পায়, চোখের জলে ডুবে থাকে, আমি তাদের নতুন-পৃথিবী তৈরী করে দেবো।

—আমি জানি বাবা, তুই পারবি।

—বি এ.টা দিয়ে আমি চাকরী নিয়ে চলে যাবো কোন নির্জন জায়গায়। মৌপাহাড়ী স্কুলে মাস্টারী করবো হয়তো। তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো মা?

—তোকে ছেড়ে কোথায় থাকব বুড়ো? তুই তো আমার সব।

আমি বেশী টাকাপয়সা দিতে পারবো না মা, কিন্তু তোমাকে শান্তি দিতে পারবো। তাতে তুমি তৃপ্তি পাবে না?

—আমার কিছু চাই নে। কীর্তিমান স্বামী পেয়েছি, পুত্র যদি বিদ্বান হয় তবেই আমার সমস্ত পাওয়া হবে।

কাজল আবার শুইল বটে, কিন্তু ঘুম আসিল না। বলিল—মা, আমার একদম ভাল লাগছে না এই জীবন। পড়াশুনো হয়ে গেলেই বেরিয়ে পডব যেখানে হোক। এই তো আর ক'দিন পর থেকে মাঠে শিশির পড়তে শুরু করবে। রাত্তিরের পরিষ্কার আকাশে ঝকঝক করবে নক্ষত্র। পৃথিবীটা আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে—আমি বাইরে বেরুব মা, আমি কিছুতেই ঘরের কোণে সারাজীবন কাটাব না।

—তোর বাবার রক্ত রয়েছে যে তোর শরীরে, কে তোকে আটকাবে খোকন?

—বাঁচতে গেলে যে বিশ্বাস লাগে, তা কেন পাই না?

—ঈশ্বরে বিশ্বাস?

—শুধুই ঈশ্বরে নয়, জীবনে বিশ্বাস।

—বিশ্বাস আসবে, দেখতে পাবি। মনটা খুব উদার খুব বড় করে রাখিস,

যাতে সুখ-দুঃখ সবাই সেখানে ধরে। দেখবি, দুঃখ আর সুখ তুল্যমূল্য হয়ে গেছে—দুঃখের জন্য আর কোন কষ্ট নেই।

কাজলের মনে হইল, মা এইভাবে দুঃখকে জয় করিয়াছে। সুখ আর দুঃখের বিরাট ভার মনের ভিতর জমা করিয়া দুইটাকে এক করিয়া দেখিতে সক্ষম হইয়াছে মা—এইটাই মায়ের স্থৈর্যের মূলকথা।

পরমেশ বলিল—কি অমিতাভ, চুপ করে আছ যে?

কাজল মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইতে সে অবাক হইল। পূর্বের সে আশাহত পাণ্ডুর ভাবটা কাটিয়া গিয়া নূতন একটা উদ্যমের আলো কাজলের মুখে প্রতিফলিত হইয়াছে। চোখদুটো চকচক করিতেছে।

—তোমাকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে।

—পরমেশ, আমি বোধহয় ভুল করছিলাম। জীবনের অর্থ হয়তো সত্যিই নেই—আমার এক মাস্টারমশাই বলতেন, জীবন শুধুই sound আর fury, আর কিছু নয়। শেকস্‌পীয়রই হয়তো ঠিক, তবু বেঁচে থাকার মানে একটা খুঁজে বের করবোই পরমেশ। লোক-ভুলানো দর্শন নয়, বাস্তবে একটা কিছু দিয়ে যাবো—

পরমেশ কাজলের হাত চাপিয়া ধরিল।—আমি বিশ্বাস করি অমিতাভ, তা তুমি পারবে—

—আমাকে দূরে চলে যেতে হবে মানুষের থেকে, আরও বেশী করে মানুষের ভেতর ফিরে আসার জন্য। আমি পেছনে হাঁটবো পরমেশ।

দুইজনে হাঁটিয়া মিউজিয়ামে গেল। পরমেশ জানে, কাজল সঙ্গে থাকিলে মিউজিয়াম দেখার আলাদা আনন্দ। বেলা গড়াইয়া বিকালের দিকে ঝুঁকিয়াছে। মিউজিয়ামে লোক প্রায় নাই বলিলেই হয়। বড় বড় মূর্তি এবং দুষ্প্রাপ্য অনেক বস্তু বোমার ভয়ে মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘরগুলি কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে।

পরমেশ বলিল—অনেক কিছু নেই—'রিমুভড'-লেখা টিকিট পড়ে আছে।

—ইউনিভার্সিটিও বহরমপুরে উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে, জান না?

বহুদিন বাদে কাজলের মনে আবার পুরাতন আনন্দটা ফিরিয়াছে। মিউজিয়াম হইতে বাহির হইয়া দেখিল রৌদ্র পড়িয়া গিয়াছে, শীতকালের বেলা নাই বলিলেই চলে। গেটের সামনে ফুটপাতের উপর ইটের বেড়া দিয়ে ঘেরা কৃষ্ণচূড়া গাছ। তাহার ডালগুলি অস্তদিগন্তের পটে আঁকা বলিয়া মনে হইতেছে। বাতাস নাই, সব নিঝুম। সন্ধ্যার কেমন একটা বিষণ্ণতা—

তাহাদের দিকে তাকাইয়া বুঝি ওষ্ঠে তর্জনী রাখিয়া চুপ করিতে সঙ্কেত করিতেছে।

পাতলা জামা গায়ে কাজলের শীত করিতেছিল। ফিরিতে এত দেরী হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। পরমেশকে বলিল—চলো, রাত হয়ে এলো।

ধর্মতলার মোড়ে একটা বাচ্চা মেয়ে, নোংরা জামা-পরা, কাজলের গায়ে ধাক্কা খাইল। কাজলের হাত হইতে বইখাতা ধূলায় পড়িয়া গেল। পালায় নাই মেয়েটি, ভয়ে পালাইতে পারে নাই। আতঙ্কে কেমন-যেন হইয়া গিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। বয়স বেশী নহে, নয় কি দশ হইবে—হতদরিদ্রের চেহারা, কিন্তু চোখদুটি উজ্জ্বল। কাজলের হঠাৎ 'ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ'এর ডিক সইভেলারের ছোট্ট বান্ধবীটির কথা মনে পড়িল। কাজল ভাবিল—ও ভেবেছে, আমি ওকে বকবো। কি সুন্দর চোখ দুটো ওর!

মেয়েটির হাতে একআনা দামের পাউরুটি, এটা কিনিতেই সে আসিয়াছিল, রাস্তা পার হইয়া ফিরিবার সময় ধাক্কা লাগিয়াছে। পাউরুটি শক্ত করিয়া ধরিয়া মেয়েটি কাঠ হইয়া আছে। মেয়েটির চোখ, পাউরুটি আঁকড়াইয়া ধরিবার ভঙ্গি, সন্ধ্যাবেলার বিষণ্ণতা—সব মিলাইয়া কাজলের মনে একটা ঢেউ তুলিল—মেয়েটির চোখে চোখ রাখিয়া সে হাসিল। মেয়েটি হাসিল না।

কাজল বলিল—তোমার নাম কি খুকী? কোথায় থাকো?

উত্তর না দিয়া মেয়েটি রাস্তার ওপারে তাকাইল, সেখানে এক অন্ধ ভিখারী ঘোড়ার জল খাইবার চৌবাচ্চার কিনারায় বসিয়া আছে। কাজল বলিল—ও কে হয় তোমার—বাবা?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল। কাজল পকেট হইতে একটা আনি বাহির করিয়া বলিল—এটা তুমি নাও। কিছুতেই লইবে না। অনেক সাধ্যসাধনার পর হাত হইতে আনিটা লইয়া সে সঙ্কুচিত ভাবে হাসিল, তারপর হঠাৎ ফিরিয়া লোহার চৌবাচ্চাটা লক্ষ্য করিয়া দৌড় দিল।

ট্রেনে জানলার পাশে বসিয়া কাজল সমস্ত রাস্তা ভাবিতে ভাবিতে চলিল। ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ের ভিতরে কাঁপন ধরে। গলা বাড়াইলে দেখা যায়, কালপুরুষ-মণ্ডলীর বেটেলজিয়ুস নক্ষত্রটা লালচে আভায় ঝকঝক করিতেছে।

কাহারা গোপন-ছাউনির নিচে আগুন করিয়া হাত-পা সেঁকিতেছে। হাওয়ায় শীতের ঘ্রাণ, পোড়া ডালপালার ঘ্রাণ। বোমারুবিমানের ভয়ে উন্মুক্ত স্থানে আগুন জ্বালায় নাই।

ট্রেনের এঞ্জিন হইতে বার দুয়েক হুইস্‌লের শব্দ ভাসিয়া আসিল।

(কাজলের ডায়েরী হইতে)

গতকাল আমাদের একজন অধ্যাপক না-আসায় একটা পিরিয়ড ছুটি পাওয়া গেল। পরমেশ লাইব্রেরীতে বসে পড়ছিল, তাকে না-ডেকে আমি একাই একটু হাঁটছিলাম রাস্তায়।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে ভেবে দেখলাম, আমার ভেতরে যে দ্বন্দ্বটা চলছে সেটা মোটেই আকস্মিক নয়। ছোটবেলা থেকেই ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয়ে উঠছিল, হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়েছে। আমাব সমস্যা অন্যের কাছে অবাস্তব, কিন্তু আমার কাছে অন্ধকারের ভেতর প্রজ্বলন্ত আগুনের মত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ। চিন্তার একটা বিশেষ ধাপ পর্যন্ত এসে আটকে গেছি, আমি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারছি না। হয়তো কেউ তা পারে না।

হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, চলা বন্ধ করে আমি সামনের তেতলা বাড়ির ছাদের ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছি। চোখ নামিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করবো, দেখি রাস্তার ওপারে মিষ্টির দোকানে গোলমাল—রোগা মত একটা লোকের ঘাড় ধরে বিশালদেহ দোকানদার ঝাঁকানি দিচ্ছে, আর একজন তার কাপড়চোপড়ের ভেতর হাতড়ে কি খুঁজছে। রোগা লোকটি হাতজোড় করে কি বলতে গেল—মারল তাকে এক রদ্দা, ছিটকে সে ফুটপাথে গিয়ে পড়ল।

ভারি খাবাপ লাগল ব্যাপারটা। হাতজোড় করে লোকটা কি বলতে চাইছে, কেউ শুনছে না। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে গেলাম—ততক্ষণে সে একহাতে ভর দিয়ে উঠে বসেছে। থমকে গেলাম আমি। লোকটি রামদাস বৈষ্ণব।

রামদাস বৈষ্ণবকে এরা মারছে। রামদাস-কাকা!

রামদাস চমকে আমার দিকে তাকাল। কি চেহারা হয়ে গিয়েছে তার! চোখের নিচে গভীর কালি, চুল লালচে উস্কোখুস্কো। শরীর শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। মারের চোটে এখনও সে অল্প অল্প কাঁপছে।

রামদাস আমায় চিনতে পেরেছে। পুরনো দিনের মতই খুশী-খুশী গলায় বলে উঠলো—বাবাজী, তুমি!

দোকানদার এবং তার দুই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে? আপনারা মারছেন কেন একে?

দোকানদার খিঁচিয়ে উঠল—মারবে না তো কি সিংহাসনে বসিয়ে পুজো করবে? চারআনার জিলিপি খেয়ে এখন বলছে, পয়সা নেই। শালা ইয়ের বাচ্চা—

ইতর কথা এবং তাদের মুখ-চোখের ইতর ভাব দেখে আমার খারাপ

লাগলো। বললাম—বৈষ্ণবকে মারছে হাত [illegible] আপনারা আবার গালাগালও দিচ্ছেন—

—যান যান মশাই, অমন অনেক বোষ্টম দেখেছি। ভেক নিলেই বোষ্টম হয় না, ওসব লোক ঠকাবার ফন্দি—

রামদাসকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে রামদাস-কাকা?

রামদাস তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে। বলল—গেঁজেতে পয়সা রেখেছিলাম। কখন পড়ে গেছে বুঝতে পারি নি। সারাদিন ঘুরছি তো রাস্তায় রাস্তায়। তুমি তো জানো বাবাজী, পয়সা নেই জানলে আমি একদানাও মুখে দিতাম না এখানে—

দোকানদারের লোক বলল—ওরে আমার ধার্মিক যুধিষ্ঠির রে!

তাকে থামিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কত পয়সা আপনাদের? চার আনা? এই নিন, ছেড়ে দিন একে। চলো রামদাস-কাকা—

রামদাস বলল—আমার একটা থলে ওরা রেখে দিয়েছে। একটা দোতারা ছিল সঙ্গে, সেটা ভেঙে দিয়েছে—

দোকানদার ভেতর থেকে দোতারা এবং ছেঁড়া ক্যাম্বিসের থলে এনে দিল। খানিক দূর এসে দোতারায় হাত বুলিয়ে রামদাস বললো—একদম ভে- দিয়েছে বাবাজী। তারগুলো ছিঁড়ে দিয়েচে, আর বাজানো যাবে না—

থলের ভেতর হাতড়ে খঞ্জনীটা বের করল সে, হেসে বলল—এটা যাক, একটা তবু রইলো—

খঞ্জনী বাজিয়ে সে তার অভ্যেস মতো হাসলো। বলল—জয় গুরু জয় গুরু।

তুমি হাসছ রামদাস-কাকা। তোমাকে ওরা অপমান করল, মারল—তার পরেও হাসছ?

—হাসবো না কেন? দুঃখ করার সময় কোথা আমার?

— ওদের ওপর রাগ হচ্ছে না?

—না বাবাজী, সত্যি বলছি—ওরা যদি বুঝতো খারাপ কাজ, তা হলে কি আর মারত আমাকে? না বুঝে যা করেছে, তার জন্য ওদের আমি দোষ দেব না। গুরু ওদের ভালো করুন।

—তুমি বড় ভালোমানুষ রামদাস-কাকা, আমরা হলে অপমান সইতে পারতাম না।

মার খাওয়াটা যেন ভারি একটা মজার ব্যাপার, রামদাস এমনি ভাবে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল—একটা কথা তো তোমায় বলা হয় নি বাবাজী, আমার যক্ষ্মা হয়েছে।

...না বলে দিব্যি হাসছিল সে!

—কি বলছো রামদাস-কাকা! যক্ষা?

—হ্যাঁ বাবাজী। ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম কোলকাতায়। গাঁয়ের ডাক্তার বললে শহরে গিয়ে দেখাতে। হাসপাতালে হাঁ করে বসেছিলাম সারাদিন, আমার ডাক আসার আগেই ডাক্তারের রুগী দেখার সময় পেরিয়ে গেল। চাপরাসী বলেছে, কাল যেতে। কাল যাব আবার—

—রাত্তিরে থাকবে কোথায়?

—শুয়ে পড়ব রাস্তার ধারে কোথাও কাপড় মুড়ি দিয়ে। রাস্তায় শুলে তো মারবে না।

এই হিমবর্ষী রাতে রামদাস অচেনা শহরের ফুটপাতে শুয়ে থাকবে, খাওয়া মিলবে কিনা ঠিক নেই। তা সত্ত্বেও সে হাসছে।

—তুমি আমার সঙ্গে চলো রামদাস-কাকা, আমাদের বাড়ী চলো। আমি তোমায় ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করে দেবো।

খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে রামদাস বললো—তা হয় না। কালব্যাধি হয়েছে, বড্ড ছোঁয়াচে। এ রোগ আমি তোমার বাড়ীতে ছড়াতে পারবো না। এই জন্য দোকানেও আজকাল শালপাতায় খেয়ে আঁজলা ভরে জল খাই। এঁটো ...স-থালায় খেয়ে অন্য লোকের যদি অসুখ করে!

...ই সে যেতে রাজী হলো না। পকেট থেকে তিন টাকা (এ ছাড়া আমার কাছে আর ছিল না) বের করে বললাম—টাকা ক'টা ...িতে হবে। কোনো আপত্তি শুনবো না—তোমার এখন টাকার ...

...দিকে তাকিয়ে রামদাস একটুখানি ভেবে তারপর বলল—দাও। ...ভেতরে কিছুতে বেঁধে রাখো, আবার না হারায়।

...খুটে সে শক্ত করে বেঁধে নিল। বাঁধবার সময় ফ্যাঁস করে একটু ...কাপড়টা। রামদাস মুখ তুলে অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলল—বড্ড ...

...া।

...র দেখা কোরো, আমাদের বাড়ীতে যেও কাকা।

...বান ... টেনে না নেন, নিশ্চয় যাবো খোকন।

...কে খোকন বলছো, আমি কি আর ছোট নই?

রামদাস ... হেসে স্নেহপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল। একটা হাত আমার ... কি বলতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল। বলল—তোমাকে না ... ছোঁলা। যদি তোমার—

তাকিয়ে দেখলাম, ভবঘুরে রামদাস গুনগুন করতে করতে ক্রমশঃ দূরে চলে যাচ্ছে। জানি না, আর দেখা হবে কি না।

(কাজলের ডায়েরী হইতে)

আজ রাত্তিরে অপূর্ব জ্যোৎস্না উঠেছে। রাস্তার পাশের গাছে বাসা বেঁধে-থাকা পাখিগুলো ডাকছে সকাল হয়ে গেছে মনে করে। চাঁদের আলোয় একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘাসের ওপর হালকা শিশির চক্-চক্ করছিল।

অনেকদিন আগে আমার পোষা কুকুর কালু যখন মারা যায়, মা বলেছিলেন—দেখিস বুড়ো, ভগবান ঠিক এসে বসে আছেন ওর কাছে। সেদিন আমি মার কথা বিশ্বাস করতে পেরেছিলাম, আজ হয়তো আর পারবো না। তবে এক নতুন বিশ্বাসে আমার মন ভরে উঠছে। ধর্মতলার মোড়ে সেদিনকার সেই খুকীটা যে পাউরুটি শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছিল, সোলোগাব-এর গল্পের সেই আশী বছরের দুঃখী বুড়ো—সবাইকে আমার কত আপন বলে মনে হচ্ছে। এদের প্রতি ভালবাসায় আমার অন্ধকার ঘরে একটা নতুন জানলা খুলে দিয়েছে।

ক'দিন খুব নিশ্চিন্দিপুরে যেতে ইচ্ছে করছে। এখন সেখানে শুকনো বাঁশপাতা ঝরে বাঁশবাগানের পথ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সোঁদা গন্ধ উঠছে বাঁশতলা থেকে। দুধরঙের সজনেফুল ঘননীল আকাশের পটে থোকা থোকা ফুটে আছে। আমাদের পুরনো ভিটের সজনে গাছটা—যেটা ঠেলে উঠেছে আকাশে মাথা তুলে অনেকখানি। নদীতে নৌকোয় বসে-থাকা মাঝি হঠাৎ বোঝে, জলে জোয়ারের টান লেগেছে। একটু একটু করে কর্দমময় তীরে ঢেকে গিয়ে জল বাড়তে থাকে।

আমাদের পুরনো ভিটে কি চিরকালই অমনি পড়ে থাকবে—চামচিকে আর বাদুড় বাসা বানাবে কেবল? বাবার স্মৃতি কি একেবারে মুছে যাবে আমাদের সুন্দর গাঁ নিশ্চিন্দিপুর থেকে? আমি তা হতে দেবো না। আমি মাকে নিয়ে আবার ফিরে যাবো গাঁয়ে। শহর আমার থেকে যা কেড়ে নিয়েছে, আমার গ্রাম আমাকে তা ফিরিয়ে দেবে।

বেচারী রামদাসের কথা বড় মনে পড়ছে এ-সময়। এবার দেখা হলে বলবো—দুঃখ কোরো না রামদাস-কাকা, আমি তোমাকে একটা নতুন আস্তানা বানিয়ে দেবো।

॥ সমাপ্ত ॥